মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমগ্র রচনা

মানিক গ্রন্থাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ১২

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২ থেকে
যোগজীবন চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রাকর :
শ্রীবংশীধর সিংহ
বর্ণ মুদ্রণ
১২, নয়েন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

পূর্ণেন্দু পত্রী কর্তৃক অংকিত প্রচ্ছদচিত্র

মূল্য। চোদ্দ টাকা

..... গ্রন্থ-সূচী ....

উপন্যাস : চিন্তামণি ১ ॥ চিহ্ন ৭৩ ॥
আদায়ের ইতিহাস ১৮১ ॥
চতুষ্কোণ ২৩৩ ॥

গল্পগ্রন্থ : আজ কাল পরশুর গল্প ৩৫১ ॥
আজ কাল পরশুর গল্প ৩৫৫ ॥
দুঃশাসনীয় ৩৭০ ॥ নমুনা ৩৭৯ ॥
বুড়ী ৩৮৮ ॥ গোপাল শাসমল ৩৯২ ॥
মঙ্গলা ৩৯৬ ॥ নেশা ৪০৪ ॥
বেড়া ৪০৯ ॥ তারপর ? ৪১৫ ॥
স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই ৪২৩ ॥
শত্রুমিত্র ৪৩৪ ॥ রাঘব মালাকার ৪৩৯ ॥
যাকে ঘুষ দিতে হয় ৪৪৭ ॥
কৃপাময় সামন্ত ৪৫১ ॥ নেড়ী ৪৫৬ ॥
সামঞ্জস্য ৪৬১ ॥

পরিস্থিতি ৪৬৯ ॥
প্যাণিক ৪৭৩ ॥
সাড়ে সাত সের চাল ৪৮৫ ॥
প্রাণ ৪৮৯ ॥ রাসের মেলা ৫০০ ॥
মাসিপিসি ৫১৪ ॥ অমানুষিক ৫২৪ ॥
পেট ব্যথা ৫৩৪ ॥ শিল্পি ৫৪৩ ॥
কংক্রীট ৫৫২ ॥ রিক্সাওয়ালা ৫৬৩ ॥
প্রাণের গুদাম ৫৬৯ ॥ ছেঁড়া ৫৭৭ ॥

নাটক : ভিটে মাটি ৫৮৭ ॥

পরিশিষ্ট : গ্রন্থপরিচয় ৬৫৩ ॥

লেখকের কথা

"চিহ্ন" বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছি। বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই। এ ধরনের কাহিনী, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঘ, ১৩৫৩

চিন্তামণি

এক

খিদিরপাড়া, ২৪ পরগণা

তাং ২০শে শ্রাবণ

বৈন চিন্তামণি তুমি ২।৩ খানা চিঠি দিয়াছ তাহা আমি পাইয়াছি। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব বলিয়া পত্রখানার উত্তর দিতে গৌণ হইল, দাদার আমাশা ১ মাস যাবত ভুগিয়াছে, আমি কাহাকে লইয়া যাইব। বর্তমানে অসুখ সারিয়াছে। আজ ৫।৭ দিন যাবত এখানে ঝড তুফান হইতেছে এইরূপ অবস্থাতে আমি কি করিয়া যাইব। নৌকা যে করিয়া যাইব এমন সাধ্য আমার নাই। ২।১ দিনের মধ্যেই আমি যাইব, ওখান হইতে আসিয়া আমি মাল লইয়া তোমার নিকট পত্র দিব। একা লোক খালি ঘর ফেলিয়া ১টি গাভি ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাইব। এই দুদিনে আমি তোমাকে আনিয়া রাখিতে পারিলাম না। তুমি পেটের খুধায় মধুবণী গিয়াছ, এই দুক্ষ আমারই অন্তরে জানে। আমি কি হুঁসে আছি তাহা ভগবানই জানে। উহাদের তিনজন যাওয়াতে আমার শরীরে একটুক বল পাইতেছি না। চাঁপাবালা বসিরহাট গিয়া শ্বশুড়ের বাসায় ১৫ দিন মাত্র ছিল, উহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সোণার গয়ণা ইত্যাদি নেওয়াতে মানে আর কি বুঝিয়া লইবে। হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। বৈশাখ মাসের ২০ তাং গিয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৭ তাং বিবাহ দিয়াছে। হেমীর মাকে বিবাহেতে লয় নাই। হেমীর মা তাহার কাকার বাড়ীতে আছে। ডাকাতের হাতে হেমীকে বিবাহ দিয়াছে ঐ শোকে হেমীর মা পাগল হইয়াছে। হেমই বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে উহার মা ঐ বা কত কান্দাকাটি করিয়াছে, কাকা ধরিয়া স্নান করায় ও খাওয়ায় এই অবস্থাতে আছে। ছেলের বাড়ী মোদের দেশে বিন্দীপাড়া বিপিনের ভাই। এই মেয়ার বিবাহে কত আমোদ আহ্লাদ করিব। তাহার মধ্যে

ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়া এইরূপ কার্য করিল। হেম যে মায়ের জন্য কি প্রকার কান্দাকাটা করিয়াছে। তাহা আর এই ক্ষুদ্র পত্রে কি লিখিব। তবু চাঁপাকে বাড়ীতে লইল না। জামাতার মুখ দেখে নাই বিবাহের নিয়ম কাজ মায়ে করে তাহাও করে নাই। আমি এই অশান্তিতে আছি তুমি সর্বদা পত্র দিবে। তোমার পত্র পাইলে একটু শান্তিতে থাকি। মেয়ে জামাই লইয়া বাড়ীতে আসে নাই তাহার জন্য আশীর্বাদ করিও। তোমাকে জানাইব। টাকা ত লইয়া যায় নাই। নবিন আষাঢ় মাসে ধান্যের কাজ করিয়া ১০৲ টাকা দিয়াছে কি কাজ করে জানি না। চাঁপার পত্র পাই নাই। আমার খাওয়া চলে না।

"দিদি"

চিঠি পড়ে পটল বলে, 'লেখাটি কার রে? কুচি কুচি লিখতে জানে পিপড়ের ঠ্যাং।'

'নন্দ গোঁসাই হবে। আগে নিত এক পয়সা, এখন দু'পয়সার কম কথাই কয় না। তবে লেখে বটে, হ্যাঁ। যত খুশী বলে যাও সব ধরিয়ে দেবে একখানি পোষ্টকার্ডে। একবারটি আমি ভাবনু, ঘোষাল বাড়ীর মেজো বৌ পাশ দিয়েছে, পয়সা দিয়ে লেখাই কেন গোঁসাইকে দিয়ে? তা বললে তুমি হাসবে পটলবাবু, বলতে শুরু করেছি কি করিনি, মেজ বৌ বললে আর তো জায়গা নেই চিন্তামণি! এত কথা লিখবে তো খামে লিখলে না কেন?'

'তা—তা—'

'কি হল তুমার?'

'সত্যি কথাই বটে তো।'

'কি সত্যি কথা?'

'খামে লেখোনা কেন?'

'একটা পয়সা লোকসান হয়। তাছাড়া, কাগজ কই? মাগো বাবাগো! কি ফ্যাকড়া বেঁধেছে কাগজ নিয়ে! না চেয়ে মিলতো আগে যত চাও ততো, চাইলে পরে খিঁচড়ে ওঠে এখন! নবীনকে দিয়ে দিস্তে দিস্তে কাগজ হেডমাস্টার বেচে দিত দোকানে। এবার মোটে দু'চার দিস্তে বেচলে—পায়নি তো বেচবে কি! তা দর যা হয়েছে কাগজের, ক'দিস্তে বেচে লাভ কিছু কম হয়নি।'

'আর কিছুর দর বাড়েনি?'

'আ কপাল আমার !' থপ করে কপাল থাপড়ে দেয় চিন্তামণি, 'দর যদি না বাড়বে তবে দেশ-গাঁ ছেড়ে হেথায় আসি ?'

পটল ভাবে, কাণ্ড বটে ! রাঁড়ীর নাকি ঘরের অভাব, ভাতের অভাব ঘটে ! —তা সে একবার হবিষ্যি করুক আর তিন বেলা থাক ? বাবুর বাড়ী কচিকাঁচার পাল, কাপড় যত আছে, ছিঁড়তে লেগেই বনে যায় কাঁথা, এমনি রাঁড়ী ঘরে পুষতে বাবু একদম পাগল। কাঁচা নয় যে খাটতে নারাজ, বুড়ী নয় যে চক্ষুশূল। এদের কত দাম এমনি সব বাবুদের কাছে।

পটল যাবে কলকাতা, তার দাদার ফিরতি বিয়ে। বাবু বললে, 'ওহে পটোল শোন, ঝি টেঁকে না জানো। বলে, পয়সা পাব বেশী, তোমার কলে খাটাও বাবু! সবাই যদি কলে খাটবে তো ঝি কে থাকবে ঘরে ? হিসেব বুঝিয়ে দি, জলের মতো সাফ—পয়সা পাবি বেশী, এমন খাওয়া পাবি কোথা ? কাঁকড়ে চালের মোটা ভাত দু'বেলা খেতে যে বেশী পয়সায় কুলোবেনা হারামজাদি ? তা কে শোনে কার কথা। মাসটি গেলে মাইনে নিয়ে ভাগে, অন্য কলে খাটতে যায়।'

'আজ্ঞে ভালো খাওয়া ভাল লাগে না মাগীদের। পয়সা পেলে আধ পেটাতে খুশী।'

'মন্দো দিনকাল পটোল। সবদিক দিয়ে মন্দো। বাপের কালের ধানকল আমার, ইদিকে সেই প্রথম। আজকে ছাখো, দেড় গণ্ডা কল বসেছে। দু' চারটে সাঁওতাল ছাড়া যোয়ান মাগী একটাও আসে না কলে! ভাদুরী ব্যাটার সয়তানী চাল সয়না পটোল।'

'দাড়ান না, ব্যাটা ডুববে।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম তোমায়। দেশের দিকে যাচ্ছ, যদি ঘর গেরস্ত এমন কাউকে পাও, আশ্রয় নেই কষ্ট পাচ্ছে, পারলে এনো দিকি একটা। খাবে পরবে ঘরে থাকবে ঘরের মানুষের মত, বাচ্চা কাচ্চাকে দেখবে আর এটা ওটা করবে। মাইনে পাবে না, ঘরের লোকের মাইনে কি ? নেহাৎ যদি চায় তো না হয় দু'টো টাকা হাত খরচ বাবদ দেওয়া যাবে। বুঝলে না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খোঁজ করব।'

'বুড়ী ব্যারামী যেন হয় না বাপু। মাঝ বয়েসী স্বাস্থ্য ভাল এমনি কাউকে এনো।'

তা হাওড়ায় তার দেশের গাঁয়ে অমন কাউকে মেলেনি—বয়স আছে, স্বাস্থ্য ভাল ! এমন মেয়েই কম গাঁয়ে। দুটো চারটার বেশী কোনকালে ছিল না। আজ

তারা যেন কোথায় উধাও হয়েছে। উধাও কি হয়েছে? না রোগাপটকা বনে' গাঁয়েই আছে তাই ওই বন্ননা খাটে না?

বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে গেছে কালীঘাটে, সেখানে দেখা চরণ দাসের সাথে।

একথা সেকথার পর আপসোস করে বলে, 'ইকি ব্যাপার আঁ? কমবয়সী নয়, মাঝ বয়সী নাদুস-নুদুস মেয়ে একটা গাঁয়ে নেই? বাবুর ফরমাস ছিল।'

চরণ বললে, 'হালে এয়েছে গাঁয়ের মেয়েদের সাথে একটা। যোয়ান মেয়ালোক। চেনা লোকের জানা বাবুর বাড়ি খুঁজছে—'

'আমার বাবু রাখবে।'

'তোমার সেথায়? ও খুঁজছে কলকাতায়।'

'শুধোও, যদি যায়।'

অনেক কথা, অনেক দ্বিধা, অনেক ধাঁধাঁর পর চিন্তামণি রাজী হল। শেষ মুহূর্তে চরণ বললে পটলকে, 'একটা কথা বলি। দায়ী করবে শেষে? স্বভাব তেমন ভাল নয় শুনি চিন্তামণির।'

পটলের যেন তা জানতে বাকী ছিল! নয়তো এই বাজারে এত বছর মিহি কোড়া থানকে ফেরতা দিয়ে পরে আর কপাল-ঢাকা ঘোমটা টেনে চাবির গোছায় ভারি রিং আঁচলে বেঁধে পিঠে ঝোলায়, যার স্বভাব ভাল? নানা বর্ণের নানা ধাঁচের সেলানো পাড়ের ঢাকনা তার তোরঙ্গের, শোয়ার কাঁথা তোষক-সমান পুরু! ওসব জানে পটল, ওতে যায় আসে না কিছু, ধোপা নাপিত কামার কুমার যারা, সমাজ তাদের এমনি মেয়ের কেলেঙ্কারি সয়, যদি সেটা সত্যমিথ্যা গুজব ছাড়া আর কিছু না হয়।

রাত্রিগুলি অন্ধকার। পাপ যে করে চুপেচাপে তার বিচারের ভার সেই বিচারকর্তার যার সৃষ্টি সেই অন্ধকার। হাওয়ায় ভাসা কথার বেলা সমাজ তাই কাণা। পিছে যদি কেউ লাগে আর হাতে নাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, হা ভাখো, তখন সমাজ দণ্ড দিয়ে বলে যে আজ থেকে তুমি পতিত হলে, প্রাচিত্তির করে যদি ভোজ দেও সমাজকে তবেই উঠতে পারো সমাজে, নইলে নয়।

চিন্তামণিকে সে পৌছে দিল বাবুর বাড়ী। তার বাবুর নাম নীলকণ্ঠ ঘোষাল, দুপুরুষে হরের্নাম রাইস মিলের মালিক।

পরদিন বাবু বললে, 'অ পটোল, এ করছ কি? ওনা যে বলছে দূর! দূর! খেদিয়ে দাও—বিদেয় কর আজকেই? ওনার চেয়ে সাফসুরুৎ এ ঝি, চাল চলন

যেন রাজকন্যের দাসী। বললে না পিত্যয় যাবে পটোল, রোয়াকটুকু পেরিয়ে যেতে সময় লাগে নতুন বোয়ের বেশী। আমি বলি যাহোক নাহোক এসেছে যখন এ্যাদ্দুরে, থেকেই যাক একটা দুটো মাস। তা ওনা বলছে আজ নয় তো, কালকে, ওকে বিদেয় করা চাই। তুমি যদি তোমার বাসায়—,

'আমার বাসায় ঝি!' পটল প্রায় চোখ উল্টে বলেঃ 'বাবু মাইনে কিছু আর চাল কিছু যদি না বাড়ান, আধেক মাস উপোস দিতে হবে।'

বাবু চুপ। মুখে বড়ই অসন্তোষ। সব কথাতে এই কথা আনা চাই পটোলের আজ কাল। একবার নয়, দু'বার নয়, দশবার। কলে যখন পুরোদমে কাজ, সবদিকে নজর রাখতে বাবু একদম অপারগ, চাল যেন পটল সরায় না তার বছর খোরাকী আর বছর পোষাকীর মত। কি করে সরায় তাই না শুধু জানা নেই বাবুর।

পটল তখন বলল, "এক কাজ করেন বাবু। মার সামনে ধমক ধামক দিয়ে বলেন, মাইনে পাবেনি একটা পয়সা। খাওয়া পরায় থাকবে থাকো, নইলে তুমি ভাগো বাছা। আর মাকে বলেন, মাগীর হাতে জল খেতে আমার ঘেন্না করে, এমন নোংরা মাগী।'

বাবু কিছু বলল কি বলল না বাবুই জানে, চিন্তামণি সেই থেকে আছে। তেমন সাফসুরুৎ আর নয়, ঘোমটা অনেক খাটো, চলন বেশ জোরে।

এতদূর এসে পথের ধারে শিরীষ গাছের তলায় বসে আছে, সাইকেল চড়ে বাড়ী যাবার সময় তাকে দিয়ে চিঠি পড়াবে বলে! বাবুর বাড়ীতে যেন লোক নেই চিঠি পড়বার। বাবুর ছেলে মেয়ে একসাথে ম্যাট্রিক দিয়েছে এবার, ছেলেটা ফেল করেছে খবর এসেছে দিন সাতেক আগে। আহা, পাশ করেও মেয়েটার কি কান্না।

'নাক সিট্‌কানো স্বভাব বড় মেয়েটার পটলবাবু। বলেছিল বটে, চিঠি পড়ে দেব চিন্তামণি? আমি ভাবলাম, কাজ নেই বাবু চিঠি পড়ে ঘরের কথা জানাব! আমায় দাও, পড়তে জানি আমি, বলে তাই নিয়ে নিলাম চিঠিটা। ওগো মাগো কি যে তখন দেমাক দেখালে ছুঁড়ি।'

'দেমাক নাকি।' বললে পটল আর হাতল ধরে খাড়া করলে সাইকেলটাকে।'

'দেমাক নয়? আকাশ থেকে পড়ে যেন আশ্চর্য্যির পার নেইকো এমনি করে বললে' পড়তে জানো তুমি?'

'জানো নাকি সত্যি?' উৎসুক পটল শুধোল।

'জানি নে তা ঠিক। কিন্তু জানলে অবাক হবার কি আছে শুনি?'

সাইকেল চেপে পটল যখন অনেক দূরে গেছে তখন যেন চিন্তামণির মনটা উঠল কেমন করে। শ্রাবণ শেষের বৃষ্টি ছাড়া বাতাস-ছাড়া দিন, ভাদ্র মাসের উজ্জ্বল কড়া রোদে ঘাম ছোটানো গরম। পূজোর আর কটা দিন বা বাকী। এমন দিনে এই বিদেশে সে বিদেশিনী গো! একেবারে একাকিনী সে!

লাল কাঁকরের পথটা এখন ধূলোর কাদায় কাদা, হেথায় হোথায় গাড়ীর চাকার গর্তে জমা জল। দুপুর বলেই লোক চলাচল কম, নইলে পথে মানুষ কিছু কম চলে না। এদিক ওদিক দূরে কাছে গাঁ চোখে পড়ে ঢের, তবু যেন ক্ষেত আর ডাঙ্গায় চারদিকটা তেপান্তরের মাঠ। ডোবা নালায় খাল-বিলে ঝোপে ঝাড়ে বনবাদাড়ে গাছ-আগাছায় ঘেঁষাঘেঁষি চব্বিশ পরগণার গাঁ, খিদিরপাড়ার চারিদিকে। ছায়া যেন আপনি নিবিড়, কচুরিপানার পাঁকাল গন্ধে ভরা। এখানে সব ফাঁকা, আশপাশের গাছগুলিকে যেন গুণে নেওয়া যায়। পথের দু'পাশে খানিক দূরে দূরে মানুষ গাছ রেখেছে, তার বেশীর ভাগই শাল, শিরীষ আর কদম,—দুদিক পানে দূরে তাকালে তবেই চোখে পড়ে তাদের সারি বাঁধা রূপ।

ক্ষেতগুলি আজ ফসলে ঢাকা, ডাঙ্গা মাঠে বড় বড় তৃণ। ঝাঁকাটি ঝোপের পর্যন্ত সরস নবীন রূপ। কালচে রাঙ্গা কাঁকর মাটির পথটি ছাড়া ক'দিন আগের এবড়ো খেবড়ো রাঙ্গামাটির শুকনো দেশ সবুজ হয়ে গেছে। অনেক দূরে শালবনের সবুজ সেদিনও ছিল, লাল মাটির ধূলোয় যেদিন এই শিরীষ গাছের পাতা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল লাল।

প্রথম বর্ষণে তখন গাছের পাতার ধুলো ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। কোন ক্ষেতে লাঙ্গলের মুখে মাটি উঠছে ডেলা ডেলা, মই লাগিয়ে ভাঙ্গতে হবে। কোন ক্ষেতে, হয়তো ঠিক পাশের ক্ষেতেই লাঙ্গলের ফলা ডাবছে না মাটিতে। বড় বড় ফাটল ছিল এ ক্ষেতে শোঁ শোঁ করে জল শুষে নিয়েছে, সবটা ক্ষেত নরম হয়নি।

গৌরাঙ্গের বড় ক্ষেতটার একপাশে একটুখানি জমিতে লাঙ্গল চলল, তাইতে কাহিল হয়ে পড়ল বলদ দুটো। লাঙ্গল যেন নোঙর হয়ে ঠেকে যাচ্ছে।

'খেটে দি চাঁদকাকা?'

'না।'

চন্দ্রকান্ত গৌরাঙ্গের আসল কাকা, সম্প্রতি ভাইপোর সঙ্গে ভিন্ন হয়েছে। ভাবে ভাবে ভিন্ন হওয়া, ঝগড়া বিবাদ নালিশ করিয়াদ কিছুই ঘটেনি। মাসের

পরে কি কারণে চাঁদের মন বড়ই বিরূপ হয়েছে ভাইপোর পরে। কেন যে তার মন বিগড়েছে অনেক ভেবে গৌরাঙ্গ তার হদিস পায়নি। আকাশ থেকে যেন মনোমালিন্য নেমেছে তাদের মধ্যে। কথা কয় না, খবর নেয় না, গৌরাঙ্গ যদি বা বাড়ীতে যায় তো কাকী পর্যন্ত বলেনা যে, আয় রে বাপ, বোস।

আরেকটু জল না পেলে ক্ষেতে তার কাজ চলবে না। বলদ তার নেই, ফের সেদিন ভাড়া করতে হবে। সারাটা দিন সামনে পড়ে আছে, কারও ক্ষেতে আজ খেটে দিলে একটা দিনের হাল বলদ আর খাটুনি তার পাওনা হয়ে থাকতো।

জোড়া বলদের বদলিতে কাকা তাকে তিন বিয়োনীর গাই দিয়েছে একটা আর একটা মদ্দা বাছুর। ঠকিয়েছে নাকি তাকে তার চাঁদকাকা ? খেটে দিতে বারণ করলে কেন ? কাজ ফুরিয়ে গেলেও বলদ জোড়া দেবে না নাকি তাকে ?

'কাল তুমার শেষ হবেনি চাঁদকাকা ?'

'হবে। তাই কি ?'

'আরেক বর্ষা নামলি মোরে বলদ জোড়া দিও।'

'মোর কাজ নেই কো ? আদুলির ডাঙ্গা জমিতে হাল দিতি যাব আরেক বর্ষায়।'

'আদুলির নামা জমি ? কুথা পেলে বটেক তুমি, আঁ ?'

'কিনতে পারি। পেতি পারি। জুটতে পারি। তোব কাজ কি অত খপর নিয়ে ? তোর বাপের জমি নয়।'

আদুলির নামা জমি বিলি হয়েছে সতর বিঘা, চড়া সেলামীতে। টাকা থাকলে গৌরাঙ্গও দু'এক বিঘা নিত। কিন্তু কাকা তার টাকা পেল কোথায় ? ক'বিঘে জমি সে নিয়েছে ? ভিন্ন হবার এতদিন পরে হঠাৎ আজ গৌরাঙ্গ ঈর্ষার তীব্র জ্বালা অনুভব করে। এইজন্য—শুধু এইজন্য চাঁদকাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। চাঁদকাকা সম্পত্তি বাড়াবে, বড়লোক হবে!

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ ভাবছিল, খানিকদূর থেকে ব্যাপার অনুমান করে রঘু সামন্ত হাঁক দিল, 'খাটবি নাকি গৌর ?'

'খাটতি পারি।'

'আয়।'

গৌরাঙ্গ খুশী হয়ে জোয়াল থেকে বলদ দুটিকে মুক্তি দিল। লাঙ্গলটা কাঁধে তুলে বলদ তাড়িয়ে খাটতে গেল রঘুর জমিতে।

বীজধানের অভাবে এবার অল্প বিস্তর সবাই কাতর। অনেক চাষীর এ

অভাবটা চিরস্থায়ী দায়, কোন বছর বাদ যায় না। বীজধান তুলে রাখে, আশা করে এবার হয়তো হাত না দিয়েই চালানো যাবে খেটে খুটে পয়সা কামিয়ে ভগবানের দয়ায়। বীজ যে লক্ষ্মী সবাই জানে, একমুঠো ছড়িয়ে দিলে ফিরে আসে দশ মুঠো হয়ে। কিন্তু প্রতি বছর পেটের জ্বালায় শেষ মুঠোটি উজাড় হয়,—যদিও পেট তখনো জ্বলে। খুঁজে পেতে কেঁদে কেটে বীজ যোগাড় হয়, অবিশ্বাস্য চড়া ধানের সুদে। এবার এই স্বাভাবিক অভাব নয়, ফাঁদে পড়া সর্বজনের সার্বজনীন অভাব। চাষীরা সব চিরকালই চাষী, চাষাড়ে জ্ঞান, চাষাড়ে মতিগতি। ধানের দাম এমন চড়ে গেল যে দাদা, বাপ আর নিজের এই তিন পুরুষে তেমন শুধু স্বপন দেখা ছিল। ধানের এমন দাম চড়া মানেই চাষীর লক্ষ্মী বাড়া—চাষীরা জানে এ ছাড়া আর অন্য নিয়ম নেই, অন্যথাও নেই। সোজা হিসাব, সোজা নিয়ম, প্যাঁচ থাকবে কোথায়? তিনের দরে একমণ বেচে তিন টাকা পাই, সাতের দরে একমণ বেচে পাই সাত টাকা। চারটে নগদ টাকা, কড়কড়ে চারটে নতুন ছাপা নোট যে বেশী পাই তাতে কি আরও সন্দেহ আছে ভাই?

হরেনাম রাইস মিলের নীলকণ্ঠবাবু, ভাদুরী রাইস মিলের জলধরবাবু আর মডার্ণ রাইস মিলের বিনোদবাবু তিনজনেই দর বাড়ায়, কিন্তু তাদের চেয়ে চড়া দর দেয় অজানা অচেনা বিদেশী ক'জন লোক! মানুষ তারা অচেনা বটে কিন্তু তাদের টাকাগুলি চেনা। ধান নিয়ে তারা পালিয়ে যায় না, গাড়ী বোঝাই দিয়ে রাইস মিলেই ধান নিয়ে ফেলে। খালি মধুবণীর তিনটে মিলে নয়, সাত ক্রোশ দূরে গোদাপাড়ার মিলে পর্যন্ত যায়। গোদাপাড়া জায়গা ছোট, মিলটা কিন্তু মস্ত আর একেবারে রেল লাইনের ধারে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে কল চালাতে শুরু করে তিনটি মিলের তিনটি বাবুই যেন ধান কিনতে উদাস ভাব দেখায়। যেমন তেমন ছাঁটা ধুলো কাঁকর মেশাল দেয়া চালগুলি প্রায় চালান হয়ে এলে, মিলের কাজে কমবেশী ক্ষান্তি পড়ে গেলে, তিনটি বাবুই দর কমিয়ে ধানের দাবী জানায়, পাওনা ধান, ঋণের ধান, ছাঁটাই করে চাল ফিরিয়ে দেবার ধান।

দাদন যারা দিয়েছিল তারা অনেকে চেয়ে চেয়ে পুরানো দরে ধান পায়নি, টাকার গরম চাষীর তখন মগজ ছুঁয়েছে। বলে দিয়েছে, সুদে আসলে টাকা ফেরত নাও, ও দরে আর ধান পাবেনি। কিন্তু দাদন নিয়ে কি চাষী রেহাই পায়? দাদনদার চেপে ধরে ভয় দেখিয়েছে যে দাদন ঋণ নয়, গচ্ছিত ধান বেচে দেওয়া

চুরির সামিল পাপ—ধান না দিলে ফৌজদারীতে একেবারে জেল! ধান যদি নেই, হিসাব মত বাজার দরে পাওনা ধানের দামটা দিয়ে দাও।

চাষীর হাতে টাকা এসেছে ঢের। যাই বাড়ুক তার খাজনা বাড়ে নি। সবাই ভাবছে, এতদিনে চাষীই এবার সুখী, খাজনা দেবার খরচটা সে টেরও পাবে না। কিন্তু বাঁধা খাজনার বাঁধন অটুট রেখে জমিদার যে চাষীর লাভে ভাগ বসাতে পারে এ হিসাবটা সবার ফস্কে গেছে। আইন রেখে আইন ভাঙ্গার পেশায় যিনি মেডেল-যোগ্য গুণী, তিনি যেন প্রজারই ধনলাভে খুশী হয়ে ঘুমোতে পারবেন।

জমিদারও খাজনা চাইলে,—ধান। ভুলানো নয়, ঠকানো নয়, টাকার বদলে ধান। আগের চেয়ে দাম বেড়েছে ধানের? বেশ, আগের চেয়ে একেবারে একটাকা বেশী ধরো। জমিদার যে অবুঝ তাও নয়। ধান যার নেই সে টাকায় খাজনা দিক্, কি আর করা যাবে।

ধান যার কম আছে সে টাকায় আর ধানে দিক, কি আর উপায় আছে।

ধান যার আছে তার ভাবনা কি, ধানেই খাজনা শোধ!

ধানের তাই বড় অভাব ঘরে ঘরে, বীজধানেরও চমক্‌প্রদ অভাব।

সদরে বীজ ধান দেওয়া হচ্ছে। গৌরাঙ্গ, রঘু আর সদয় সামন্ত সদরে গেল বীজধান কিনতে। তিনজনই চাষা কিনা, বীজধান দেখে তাই তিনজনেরি সে কি জবর হাসি।

দম নিয়ে গৌরাঙ্গ বলল, 'যে ধান গাছে তক্তা হয়, এতে সেই গাছ হবে।'

চাপরাসী কান ধরে তাদের বার করে দিল।

অনেকেরই বীজধান ছিল না, তবু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত আবাদের জন্য তৈরী সমস্ত জমির জন্য যত বীজধান দরকার ছিল যোগাড় হয়ে গেছে। বীজধানের জন্য সামান্য যা কিছু ছিল বাঁধা পডল, ঋণের বোঝা বেড়ে গেল, যারা কিনল বীজধান—জমির আগামী ফসলের মোটা অংশই মহাজনের কবলগত হয়ে গেল অনেকের। সরকারী কৃষি বিভাগের লোভ, লাভ ও অব্যবস্থার স্তর থেকে মহাজনের ঘর থেকে বীজধান নেমে এল আগামী দুর্দশার বীজ হয়ে চাষীদের ঘরে। অন্য সমস্ত কিছুই যেমন যার যত দরকার তার তত জোটে না,—কয়েকজন পায় অনেক, তার চেয়ে বেশী কয়েকজন পায় যথেষ্ট এবং অধিকাংশই পায় কম—প্রাণপাত সংগ্রহ প্রচেষ্টার ফলে চাষীদের বীজধানও ঘরে এল সেই নিয়মে।

বুড়ো হারাণের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে, তিন বিঘে বাঁজা হয়ে থাকবে উর্বরা বিধবা মেয়ের মত। হারাণ করে কি, তিন্নুর কাছে

গেল। তোমার অনেক বিঘে জমি তিনু, শ' বিঘে হোক তাই কামনা করি, লক্ষীমন্ত হও। তুমি দানা পেয়েছো ঢের, ভাল সরকারী দানা। তোমার দীনু ভাইটি তক্‌মাধরী চাপরাসী, আহা, তার ভাল হোক, তোমার ভাল হোক। তুই আমার বাপ তিনু, আমার জন্মদাতা বাপ, গড করছি তোর দু'টি পায়ে, আমায় দানা দে। দাম নে, নগদ নে, বেশী নে, কিন্তু দে।

তিনু। নেই।

হারাণ। আছে বাবা, আছে। ভাই তোর চাপরাসী, তোর নেই তো আছে কার?

তিনু। বাড়তি নেই।

হারাণ। দামও বেশী নে বাবা, দু'আনা ফসলও নিস্।

তিনু। জমি দাও, তিন আনা তুমি পাবে।

হারান। শালা! চোর! খচ্চর।

তিনু। ভাগ্ তবে ব্যাটা বুড়ো বাঞ্চোত্ ভাগ্। মেঁথি ঘাস রুঁয়ে দিবি যা, মাগনা পাবি। বোঝায় বোঝায় বেচবি ঘাস।

হারাণ। অ বাবা তিনু, একটু বিবেচনা করো বাবা। দয়া ধম্মো করো বাবা একটু। মোর জমি, মোকে তিন আনা দিবি, ই কি একটা কথা হল রে বাপ্?

তিনু। তিন আনাই তো মাগনা পাবে, মফত্ পাবে। একপাই জুটবে তোমার জমি ফেলে রাখলে? আচ্ছা যাও, রুয়েটুয়ে খেটেখুটে সব করবে, চার আনাই দেবো তোমায়।

সময় নেই, উপায় নেই যে আর দশ জায়গায় চেষ্টা করবে। যত চেষ্টা সম্ভব ছিল সব সমাপ্ত হয়ে গেছে। তিনু শুধু মহাজন নয়, চাষী মহাজন, গত সনে তার প্রত্যাশা ছিল না, আগামী সনেও তার প্রত্যাশা নেই যে তিনুর হিসাব, বিবেচনা আর দরদ থাকবে মহাজনের মত, যতই সেটা হোক নিজেরই স্বার্থের হিসাব আর বিবেচনা, মেকি দরদ। তিনু মহাজন চাষী, তিনু তার শত্রু। স্বার্থের সংঘাতে ভাই যেমন শত্রু হয় ভাই-এর। তিনু তাই হারাণের জমি পেল আগামী ফসলের চার আনা ভাগের ভাড়ায়। খাজনার দায়িক হল না, ফলাবার শ্রমিক হল না, শুধু হল উর্বরতার মালিক। দাঁও মারার গৌরবে তিনু পুলকিত হয়ে রইল এবং হারাণের তিন বিঘে জমিতে ঘাস গজানোর বদলে ফসল হল!

এমনি অনেক রকমারি জটিলতার ভূমিকা তৈরী হবার পর সব ক্ষেতে ফসল ফলেছে। ফলেছে ভালই। বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে নিবিড় সতেজ তরুণ তৃণে,

মোটা মোটা শীষের গোছ এদিক ওদিক দুলছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মন কেঁপে কেঁপে ওঠে। আতঙ্ক জড়িত ক্লেশের মত একটা অনুভূতির খোঁচায় সর্বদা মনে হয়, এ ফসলে কারো পেট ভরবে না। এ শুধু ফসল, অন্ন নয়। দাদ চুলকানোর আরাম ভুলে চাষীরা মাথা চুলকায়। ভাববার ও বুঝবার চেষ্টা করে যে এ সব কি ব্যাপার। ধারণা করার ক্ষমতা দিয়ে কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, শুধু গত দিনগুলির অভিজ্ঞতা তাদের ব্যাকুলতা এনে দেয়, অনির্দিষ্ট ভয়ের সাড়া জাগায়। কি একটা প্যাঁচে যেন তারা পড়েছে, কি যেন মুস্কিল ঘটবে তাদের, বিপদ আসবে। অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে, দুর্ভোগ চড়ে নামে, ওসব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উল্টোপাল্টা, গোলমেলে, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভাল ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের যাতনা ভোগ। জমিদার মহাজন উকিল ডাক্তার দোকানী পশারী আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের কারবার, কটা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিৎ নিষ্ঠুরতায়, লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য — আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরো তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে।

কে জানে এসব কিসের সূচনা, কি আছে তাদের ভাগ্যে।

বৈন চিন্তামণি,

তোমার যে পত্রখানা দিয়াছ ইহাতে পরম সুখী হইয়াছি। অদেষ্টে সুখ নাই আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। কে দিবে যে আমার মন্দ অদেষ্টে আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। আমার জমিটুকু ৮ওনার বড় ভাই জোর করিয়া গার দাপটে ভোগ দখল করেন তুমি জানিবা এবং কতকাল আমার বলিবার কিছু মুখ নাই কারণ গুরুজন বেটাছেলা তাঁহার অমান্য করিলে লোকে থুথু দিবে। বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া এবার বলাইলাম যে এই দুর্দিনে আমার ভাগ দিবেন আমি এতকাল চাই নাই এখন ভাগ না পাইলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। পেটের খুধায় তুমি মধুবণী গিয়াছ বলিয়া আমার অন্তরে কত দুক্ষ জানিয়া গ্রাহ্য করিল না। সাফ জবাব দিল এমন পাষাণ। আমি কত সাধাসাধি করিলাম দাদা গিয়া কিছু বলিল না। ১ মাস যাবত আমাশায় ভুগিবার কালে কত সেবা করিয়াছি, গু মূত ঘাটিতে ঘিন্না করি নাই। বর্তমানে অসুখ সারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসাও

করে না। বৌ আংটি চাহিয়াছিল আমি দিই নাই তৎকারণে শত্তুর হইয়া আছে তুমি জানিবা, বৌর পরামর্শ দাদাকে বিরাগ করিয়াছে। আংটি বাঁধা দিয়া টাকা লইয়াছি আমি কেমন করিয়া আংটি দিব। বৌর কথার মার পেটের বৈনকে ভাসাইয়া দিল। দাদা বলিল না আমি কি করিব, বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া ৶ওনার বড় ভাইকে বলাইলাম। বিপিনের ভাইর সঙ্গে হেমীকে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছে। ডাকাতের হাতে মেয়ের বিবাহ দিয়া কি অশান্তিতে আছি আমারই অন্তরে জানে। দাদা বলিল না আমি কি করিব। বিপিনকে বলিলাম সে গিয়া বলিল। আমি মেয়ালোক কেমন করিয়া বলিব। জামাই হেমীকে লইয়া কাকীর বাড়ীতে চাঁপাবালাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল। মাত্র ২দিন ছিল। কাকী পত্র লিখিয়াছে জামাই শাশুড়িকে প্রণামি ১ থান কাপড় দিয়াছে তাহা গামছার মত। সোনার গহনা ইত্যাদি চাহিদা অনেক গোলমাল করিয়া হেমীকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। জোর করিয়া বিবাহ দিয়া চাঁপাবালার শ্বশুর এইরূপ কায করিল। কাকী চাঁপাবালা আর হেমীকে রাখিতে পারিবে না বলিয়াছে। শ্বশুড়ের কাছে টাকা চাহিতে গিয়া পায় নাই, দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে এমন শ্বশুড দেখি নাই। গোসাই ঠাকুর বলিতেছেন আর কুলাইবে না অধিক আর কি লিখিব। আমি ডায়মণ্ডহারবার যাইব না, কেমন করিয়া যাইব। নবিন ধানের কাজ করিয়া টাকা পায় নাই। নূনা জলে ধানের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তুমি সবদা পত্র লিখিবে। আমার যাওয়া চলে না। তুমি পেটের খুধায়।

'দিদি'

দুই

রঘুর অবস্থা এদের মধ্যে একটু ভাল। বছরের বারোটা মাসেরই খোরাক তার জোটে, ছেলেপুলে আর বুড়ো বাপ একটু দুধ পায়, ঘরের চালা ঝাঁঝরা হয়ে জল পড়ে না, মাঝে মাঝে সকলে নতুন কাপড় পরে, মেয়েরা চুলে তেল দেয়।

রঘুর দুটি বৌ, বিরজা এবং দুর্গা। বিরজা বড় বৌ, দশ এগার বছর স্বামীর ঘর করছে। দুর্গা এসেছে তার বছর চারেক পরে। বয়সে বিরজা তার সতীনের চেয়ে বড় হবে কি না সন্দেহ, হয় তো বা ছোটই হবে দু'এক বছরের। তবে কি না চাষী গেরস্ত ঘরে অত বছর গুণে বয়সের হিসেব রাখার গরজ কারো নেই,

দরকারও হয় না। যে বয়সে বিরজা যতখানি বিয়ের যুগ্যি হয়েছিল তার চেয়ে চার বছর বেশী বয়সেও দুর্গা সে যোগ্যতা পায়নি।

আকারে বিরজা দুর্গার চেয়ে অনেক বড়, লম্বায়, চওড়ায়, মাংসের সংস্থানে। ছোটখাটো বেঁটে আর রোগা প্যাটকা চেহারা দুর্গার। অনেক চেষ্টায় দেড়মাস জীইয়ে রাখবার মত একটা খুদে ছেলে বিয়োবার পরেও তার বিয়ের সময়কার চেহারা বিশেষ বদলায় নি, শুধু মুখখানা একটু প্যাণ্ডাসে মেরে গেছে, উপোসীর মত। বিরজার ছেলেমেয়ে হয়েছে মোট সাতটি, তার মধ্যে তিনটি বেঁচে নেই। বিরজার এই বাড়াবাড়ির জন্যই দুর্গাকে রঘুর বিয়ে করা, ঘন ঘন দীর্ঘকালের জন্য শূন্য শয্যার ফাঁকা অসম্পূর্ণ জীবন তার সয়নি। নইলে বিরজার জন্যই চিরদিন তার দরদ বেশী। বিরজা তার প্রথম বয়সের সোহাগিনী, তার ছেলেমেয়ের মা, তার সঙ্গে কি অন্য কারো তুলনা হয়! আজও সেই তার সব, বাড়তি একটা বৌ ছাড়া দুর্গা আর কিছুই নয়।

ঈর্ষায় আতঙ্কে বিরজা প্রথমে ক্ষেপে গিয়েছিল। তারস্বরে ঘোষণা করেছিল যে সতীনকে মেরে নিজে সে বিষ খেয়ে মরে যাবে, তারপর রঘু যেন আবার বিয়ে করে, দশটা বিশটা বিয়ে করে, বিয়ের সাধ মেটায়, সে কিছু বলতে আসবে না। দুর্গাকে দেখে, রঘুর মন বুঝে, নিজের যা কিছু ছিল সব বজায় আছে এবং থাকবে জেনে, শেষে বিরজা শান্ত হয়েছিল। তার মনে আর কোন ক্ষোভ থাকে নি। তাকে ছেড়ে তাকে ভুলে ছেলে তার খেলার পুতুল নিয়ে মেতেছে দেখলে তার যেমন স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় জাগে, রঘুর আবার বিয়ে করাকেও সে তেমনি তার জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা করার ছেলেমানুষী বলে গ্রহণ করেছে। চারদিক বিবেচনা করে মনে মনে বরং একটু খুশীই হয়েছে বিরজা, স্বস্তি বোধ করেছে। পুরুষ মানুষের আলগা সখের জন্য এই ব্যবস্থাই মন্দের ভাল। স্বভাব বিগড়ে পুরুষ সংসারধর্মে উদাসীন হলে বড বিপদ ঘটে, তার চেয়ে এ অনেক ভাল। আর যাই হোক, ঘরমুখো মানুষ এতে ঘরমুখোই থাকে।

দুর্গাকে বিরজা শাসন করে, কেটে ছেঁটে তার অধিকার খর্ব করে রাখে কিন্তু তেমন কিছু অত্যাচার করে না। রঘুর পক্ষপাতিত্বই দুর্গাকে সতীনের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে। বিরজা যাই করুক তাকেই রঘু চিরদিন সমর্থন করেছে, কখনো ভুলেও দুর্গার পক্ষ নেয়নি। দুর্গাকে বেশী কষ্ট দেবার তাগিদও বিরজা তাই কখনো অনুভব করেনি।

দুর্গাও বিরজার মন যুগিয়ে চলে, তার হুকুমে ওঠে বসে। ভারি ভারি কাজ

করা তার শক্তিতে কুলোয় না, ছোট খাটো খুঁটিনাটি কাজ সে অবিশ্রাম করে যেতে পারে। ছেলেমেয়ে গাই বাছুর নিয়ে যে গেঁয়ো চাষীর সংসার সেখানে এরকম কাজেরও অভাব নেই। বিরজার সেবাও দুর্গা করে, তার চুলের জট ছাড়িয়ে, পিঠের ঘামাচি মেরে, পায়ের হাজায় তেল লাগিয়ে। এতে তার আপসোস কিছু নেই। মনে নালিশ পুরে রেখে বিরজাকে সে খুশী রাখতে চেষ্টা করে না, সতীনের মন যোগানোর স্বভাবটা তার আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। পায়ের নীচে দাঁড়াবার মাটি কোথায় নরম, কোথায় শক্ত টের পাওয়ার মত স্পষ্টভাবেই পরাশ্রয়ী মেয়েমানুষ জানতে পারে কোথায় তার আশ্রয়। মানিয়ে চলাটা তাদের মজ্জাগত ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

রঘুর অবাধ্য হতে দুর্গা ভয় পায় না, কসুরও করে না তাকে চাপা গলায় দু'চারটে মন্দ কথা শুনিয়ে দিতে। কিন্তু বিরজার সব কথা সে মেনে চলে। নির্বিচারে মেনে চলে।

এবার এক কাণ্ড করে বসেছে এই দুই সতীনে। দু'জনে পোয়াতি হয়েছে প্রায় এক সঙ্গে। ক্ষেতে ফসল কাটার কাছাকাছি সময়ে তাদের সন্তান ভূমিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

সে পর্যন্ত টিকে থেকে দুর্গা যদি অবশ্য হাঙ্গামাটা সইতে পারে। দুর্গার শরীর বড় খারাপ, তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দিতে হয়েছে। সময় আসা পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ জেগেছে সকলের মনে এবং এ বিষয়ে সকলেই প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে যে কোনরকমে ততদিন বেঁচে থাকলেও প্রসবের ধাক্কাটা সে সামলাতে পারবে না। সন্তান ভূমিষ্ট হবার আগেই সে মারা যাবে।

ডাক্তার কবিরাজ একথা বলেনি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজেরাই তারা জেনেছে। বাড়ীর মানুষ শুধু নয়, গাঁয়ের মেয়েরাও দেখতে এসে সায় দিয়ে গেছে এই আন্দাজে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক যারা মরে ছেলে হবার সময় এমনি অবস্থাই তাদের হয় শরীরের প্রথম থেকে। এমনি যারা সুস্থ সবল তারাই এরকম অবস্থা হলে আর বাঁচতে পারে না, দুর্গা তো চিরদিন দুর্বল, ক্ষীণজীবী।

আপদ চুকে যায় তো যাবে, বিরজার মনে হয়েছে একথা। এরকম অনেক কথাই মানুষের মনে হয়, অধিকাংশ সময়েই কিছু তাতে এসে যায় না। তাছাড়া, ওকথা মনে হওয়ার মানে এই নয় যে আপদ চুকে যাবার প্রক্রিয়াকে বাতিল করার জন্য চেষ্টা করতে সাধ জাগবে না। বিরজা নিজেই গরজ করে রঘুকে দিয়ে দুর্গার চিকিৎসার জন্য মথুর ডাক্তারকে আনাল।

মথুর ডাক্তার বলল, 'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। নাড়ী একটু দুর্বল, জ্বরের লক্ষণটা ভাল নয়। এরকম পেট খারাপ থাকলে চলবে না। তা, একরকম ঠিক হয়ে যাবে ও সব।

মথুর ডাক্তারের অভয়বাণী শুনে রঘু হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তারের পরীক্ষার সময় সেও কাছে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দুর্গাকে দেখেছে। তারও জানা ছিল দুর্গা এবার মরতে পারে, আজকেই দুর্গা তার নজরে পড়েছে কয়েকবার, অথচ সে সত্য সত্যই জানত না এমন বিশ্রী হয়ে গেছে তার ছোট বৌটার চেহারা। গলা পর্যন্ত কাঁথা ঢাকা দিয়ে চিৎ হয়ে দুর্গা বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে, পেটটা শুধু তার উঁচু। শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দুটি কোটরে জ্বরের ধমকে জ্বল জ্বল করছে কালো দুটি চোখ। বাড়ীতে ডাক্তার এলে এমনিই মনটা দমে যায় মানুষের, ভুলে যাওয়া রোগ শোক অজানা বিষাদ হয়ে ঘনিয়ে আসে, সমবেদনায় থমথম করে অনুভূতির জগত। দুর্গার দিকে চেয়ে থেকে তার যে কঠিন অসুখ হয়েছে অনুভব করে রঘুর ভেতরে অস্থির অস্থির করছিল। মথুর ডাক্তারের মুখে রোগের আশাপ্রদ আলোচনা শুনে সেটা ভয়ে পরিণত হয়ে গেল।

'বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?'

'বাঁচবে না? কেন, ওর হয়েছে কি! ছেলেপিলে হবে বলে একটু যা ভাবনার কথা, নইলে অসুখ তো সেরে যাবে দু'দাগ ওষুধে।'

ওষুধ লিখে দেবার কাগজ বাড়ীতে না পাওয়ায় মথুর চটে গেল। রোগের এই মরসুমের সময় চারদিকে তার অসংখ্য রোগী, তার কি বসে থেকে নষ্ট করবার মত সময় আছে?

'দাও বাপু, ওই ঠোঙ্গাটা এগিয়ে দাও।'

ঠোঙ্গার কাগজেই মথুর ওষুধ লিখে দিল। তার নিজের দোকান থেকেই ওষুধ আসবে। এমনভাবে সে প্রেসক্রুপসনে লেখে যে সে ছাড়া আর কারো পড়বার ক্ষমতা থাকে না। অনেকদিন কম্পাউণ্ডারী করে মথুর ছোটখাট একটি ওষুধের দোকান খুলে সস্তায় ডাক্তারী আরম্ভ করেছিল, চাষী মজুরদের মধ্যে তার খুব পশার। ফি সে যে শুধু কম নেয় তা নয়, তার সঙ্গে দরদস্তুর করে আরও দু'চার আনা কমানো যায়, পয়সার বদলে ফলমূল ধান চাল দুধ দই দিয়েও তার পাওনা মেটানো চলে। চাষারা তাই অত্যন্ত পছন্দ করে তাকে। যাবার সময় মথুর বলে যায়, শুধু বার্লি আর ওই ফুডটা খাওয়াবে বাপু। যেমন বললাম তেমনি করে খাওয়াবে। ফুডটা কোথা পাবে জানিনা। আমার কাছে নেই। পাও যদি তো

দাম দিতে কান্না আসবে, তাও বলে যাচ্ছি আগে থেকে। কিন্তু ওটা চাই। গায়ে জোর নেই কো একদম, পেটে কিছু সইবে না, ওটা এনে খাওয়াতে হবে। দুধটুধ ভাততাত আর দিওনা কিন্তু, খবর্দার!

রঘু নিজের মনে খানিক চিন্তা করে বলে, 'হ্যাঁ শালার ডাক্তার' ভালো। ঠিক ধরেছে। ছোট-বৌ, শুনছ? যা তা খেয়োনি।'

চিঁ চিঁ গলায় দুর্গা বলে, 'খেতে দেয় নাকি মোকে? খিদেয় মরে যাইনা?'

রঘু বিরজার মুখের দিকে তাকায়।

বিরজা মাথা নেড়ে বলে, 'চোখের খিদে। কাঙ্কার হয়েছিল মনে নেই? যেমন খায় ঠিক তেমনি সব বেরোয় আর সারাখন খাই খাই করে মরে? কতো খাওয়ানু তবু পাঁকাটি হয়ে গেল না অমন ছেল্যা মোর, মরে গেল না! চোখের খিদে মরণ খিদে। বার্লি তোলা রইতে পারে একটুকু, ফুটিয়ে দিচ্ছি, খাওয়াও না কেন।'

বিরজা যেন রাগ করেই বার্লি ফুটিয়ে আনতে যায়। কিন্তু রঘু জানে এটা তার রাগ নয়। মৃত সন্তানের কথা মনে পডলেই বিরজার সব কথায় কলহের সুর আসে, দুপদাপ পা ফেলে সে হাঁটে। দুর্গার কাছে গিয়ে রঘু তার কপালে হাত দিয়ে জ্বর অনুভব করে, হাতের তালু এবং উল্টো পিঠ দুদিক দিয়েই জ্বরটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে। মথুর ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে বলে গেছে জ্বর কত, কিন্তু রঘুর কাছে স্পর্শ না করে তাপ টের পাওয়ার কোন অর্থ নেই। একশো তিন বেশী জ্বর তা সে জানে, কেমন ধারা বেশী সেটা তো জানতে হবে গায়ে হাত দিয়ে।

হ্যাঁ, কপালটা পুড়ে যাচ্ছে দুর্গার। গলার নীচে বুকের তাপটাও রঘু পরীক্ষা করে। ডানহাতটি বার করে দুর্গা গায়ের কাঁথার ওপরে ফেলে রেখেছিল, মরা সাপের মত হাত। মায়া দেখাতে নয়, তাপ দেখবার জন্যেই সে হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে রঘুর যেন ধাঁধা লেগে যায়। নিজের পরিপুষ্ট সবল হাতের মস্ত থাবায় এইটুকু হাত নেতিয়ে আছে দেখে দুর্গাকে তার খানিক আগের চেয়েও অনেক ছোট্ট, অনেক ক্ষীণ মনে হয়। একটু হতভম্ব হয়ে থাকে রঘু, তার গা ঘিন ঘিন করে। কিছু দিন আগে চাঁদ মাইতির আট বছরের মেয়েটাকে নিয়ে গায়ের ভূতনাথ সা'র কীর্ত্তির কথাটা মনে পড়তে থাকে। ভূতনাথের জেল হয়েছে সাত বছর। যত সে নিজেকে বোঝায় যে এ তার বিয়ে করা বৌ, বয়স এর কম হয়নি, অনেককাল এ তার ঘর করেছে, একবার মা হয়েছে তার ছেলের, ততই যেন শায়িতা দুর্গা ম্যালেরিয়ায় পেট মোটা কঙ্কালসার কচি একটা মেয়ে হয়ে তার আরও বেশী ঘেন্না ধরিয়ে দেয়।

বার্লি করে এনে বিরজা দেখল রঘু বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

ষ্টেশনের কাছে বাজার, সেখানে সবগুলি দোকান খুঁজে ফুড মিলল না। হাফেজের মনোহারী দোকান আর রামশরণের ডিস-পেন্সারীর সমান কিছু এ অঞ্চলে নেই। ফুডটা দু'জনের দোকানেই ছিল, কিন্তু বিক্রী করার গরজ ছিল না মোটেই। এসব জিনিসের দাম তখন দিন দিন চড়ছে চোরাবাজারে।

'এ যে মুস্কিল হ'ল গৌর?'

'সদরে গেলে হয়।'

দুর্গাকে দেখে অবধি গৌরাঙ্গের চোখ দুটি ছলছল করছিল। বয়স তার বেশী হয় নি, যদিও সাধারণ হিসাবে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে অনেকদিন। রঘু সদয় তিনুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যতই কাবু হয়ে পড়ার ভান করুক, বিয়ে করতে পারেনি বলে সংসারের ভাবনাগুলি তার এখনো খুব হাল্কা। এক মা, এক বিধবা ভাজ আর তিন ভাইবোনের ভার অবশ্য কম নয় তার মত গরীবের পক্ষে, এই ভারেই সে নির্ঘাত কাবু হয়ে পড়বে কয়েক বছরের মধ্যে, যদি না তার আগেই ওদের মরণ বাঁচন সম্বন্ধে উদাসীন হতে শিখে যায়। গৌরাঙ্গের চেয়েও অনেক বেশী কোমল হৃদয় যুবকের যে উদাসীনতা আসতে দেখা গেছে। বৌ আর ছেলে মেয়ের ভালমন্দ সম্বন্ধেও মানুষের উদাসীনতা আসে, কিন্তু সেটা সাধারণত জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসে ভোঁতা নির্বোধ হয়ে যাবার লক্ষণ। সদয়ের ভাই হৃদয়ের যেমন হয়েছে, যোয়ান মদ্দ মানুষটার বেঁচে থাকতেই যেন গা নেই।

সদরে যাবার আগে পটলের পরামর্শে রঘু নীলকণ্ঠের কাছে গেল। গৌরাঙ্গও তার সঙ্গে গেল। এ বাড়ীতে কিছুদিন থেকে সে দুধ যোগান দিচ্ছে, এই সম্পর্কের জোরে ফুড সংগ্রহ সম্পর্কে বাবুর-কৃপা দাবী করা হয়তো একটু জোরালো হবে। পটল আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল সে শুধু কাঁদাকাটায় ফল হবে না, একেবারে নগদ টাকা সামনে রেখে বাবুকে ধরে পড়তে হবে। দুটি টাকা নীলকণ্ঠের পায়ের কাছে রেখে কাঁদাকাটার বদলে গম্ভীর উদাস কণ্ঠে রঘু তার নিবেদন জানাল। প্যান প্যান করা তার আসে না। গৌরাঙ্গের কথাগুলি বরং শোনাল ঢের বেশী করুণ যেভাবে হোক বাবু যদি যোগাড় করে না দেন তাহলে রঘুর ব্যারামী বৌটা যে মরে যাবে, এইটুকু জানাতে গিয়েই গলাটা ধরে এল তার।

নীলকণ্ঠ বৈঠকখানায় তামাক খেতে খেতে এই সকাল বেলাই অর্ধেক চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছিল,—টাকার স্বপ্ন। দু'জনের কথা শুনে সজাগ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'তোরাও মজেছিস? বলি বাবা, রোগ ব্যারাম কি আগে ছিল এদেশে, না, বোতল ভরা ফুড না খেয়ে রোগ সারেনি কারো? বাপ ঠাকুর্দা তোদের চোখে দেখেছিল না নাম শুনেছিল ফুডের?'

রঘু সাগ্রহে বলল, 'আমিও তো তাই বলি। ডাক্তারবাবু কিনা ফুড ফুড করে খ্যাপা তাইতে নিরুপায়।'

কাল থেকে রঘুর মনে হচ্ছিল ফুডটা নিয়ে চরম দায়ে ঠেকেছে। ফুডটা দুর্লভ হওয়ায় তার কেমন ধারণা জন্মে গিয়েছিল, এই বস্তুটি সংগ্রহ করার উপরেই দুর্গার বাঁচন মরণ নির্ভর করছে, ফুড খেলে দুর্গা বাঁচবে, নইলে বাঁচবে না। নীলকণ্ঠের কথায় দায়বোধটা একটু হাল্কা হওয়ায় স্বস্তি পেল।

'ডাকিস কেন ডাক্তার? ও হল বিলিতী চিকিচ্ছে, বিলেতের লোকের জন্যে। যেমন দেশ, যেমন লোক, তেমনি হবে চিকিচ্ছে, এই হল রীতি। আমরা আর সায়েবরা সমান নাকি? ওরা হল গে ম্লেচ্ছ, বর্বর—দেহসর্বস্ব জাত। একটা লোক প্রেমভক্তির সন্ধান জানে ওদেশে? একটাও না! ওদের চিকিচ্ছে এদেশে খাটবে কেন বাবু? এদেশের ডাক্তারী নেই? আয়ুর্বেদ হয়নি এদেশে? কোবরেজ মশায়কে ডাকতে পারলে না।'

'আজ্ঞে ভুল হয়ে গেছে। ফুডের বদলিতে তালি কি খাওয়াই?'

রঘুর এ প্রশ্নের জবাব নীলকণ্ঠ দিতে পারল না। বোতল ভরা ফুডের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ পথ্য আছে ঢের, কিন্তু নীলকণ্ঠ কি মুখস্থ করে বসে আছে তার নামগুলি? কবিরেজকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে। শুনে রঘু আবার দমে গেল। দায়বোধটা ভারি হয়ে উঠল আবার।

'তালি ওই এইগোটা যোগাড় করে দেন বাবু।'

'আমি কোথা যোগাড় করব ফুড?'

নীলকণ্ঠের মেয়ে সুনীতি ধিনিক ধিনিক নাচের ভঙ্গিতে অকারণেই ঘরে এসেছিল, এবার সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। একটা ফুডের অভাবে একজনের বৌ মরে যাবে শুনে মনটা কেঁদে উঠেছিল বলে নয়, ভেবে চিন্তে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই সে বলে ফেলল, 'আমাদের তো দুটো আছে, একটা দিয়ে দাও না বাবা?'

মেয়েকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে নীলকণ্ঠ বলল, 'ওর একটাও দিতে

পারব না বাবু, আমি কি দোকান খুলে বসেছি ? বিপদ-আপদের জন্য রেখেছি ও দুটো, কখন দরকার হয়।'

'আনিয়ে দেবেন বাবু ?'

'না—না—না। আমি পারব না।' নীলকণ্ঠ গর্জন করে উঠল। তার রাগ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রঘু আর গৌরাঙ্গ জানল কেন যে তার বাড়ীতেই দু'টো ফুড আছে ? এ এক দুর্ঘটনা বৈকি ! কপালটাই মন্দ রঘুর। বাড়ীর জিনিষ না দিক, নীলকণ্ঠ দয়া করে একটা ফুড আনিয়ে দেবার ভারটা নিশ্চয়ই নিত। কিন্তু রাগ হলে মানুষ কি করে দয়া করে ?

ভোরে গৌরাঙ্গ নীলকণ্ঠের বাড়ী দুধ দিতে যায়, গাছের মাথা থেকে রোদ মাটিতে নামার আগে। গায়ের জ্বালায় পরদিন সে অনেক বেলা ক'রে গেল আর এমন জল মেশালো দুধে যে জিনিষটা দাঁড়িয়ে গেল দুধ মেশানো জল। সময়মত চা না পেয়ে সকলে ক্ষেপে ছিল, হিসাব মত অভ্যর্থনা পেয়ে গৌরাঙ্গ খুসী হল। তার এই প্রথম ত্রুটিকে সবাই উদার ভাবে ক্ষমা করলে সে বড়ই ক্ষুণ্ণ হত !

'এত দেরী করলি যে বজ্জাত ?'

'দেরী হয়ে গেল বাবু।'

'একি দুধ রে হারামজাদা ?'

'মেরি দুধ ওমনি বাবু।'

নিজেকে বেশ নির্দয় ও নির্ভীক মনে হয় গৌরাঙ্গের, যেটুকু রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তার চেয়ে বিশগুণ রাগ বাবুদের হয়েছে সন্দেহ নেই। যতটা রাগ চাপা যায় চেপে রেখে শুধু যে বাড়তি অসহ রাগটুকুতে বাবু আর তার মাগ-ছেলেরে চোটপাট, একি আর টের পেতে বাকী আছে গৌরাঙ্গের। তাকে ধরে মারতে না পেরে কি কষ্টই না হচ্ছে এনাদের ! দুধের বেশ টানাটানি পড়েছে চারিদিকে। গোয়ালার গরু কমেছে, গেরস্তের গরু কমেছে, রোগা গরু আরও রোগা হয়ে দুধ দিচ্ছে কম। কিছু কম দামে প্রায় খাঁটি দুধ তার কাছে এতদিন পাওয়া গেছে, তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে মুস্কিলে পড়বার ভরসা এনাদের নেই। নীলকণ্ঠের বন্ধু উকিল মধুবাবু চুপিচুপি তাকে সেধে গেছে এখানে যোগান বন্ধ ক'রে তাকে দুধ দিতে— দাম সে বেশী দেবে, আগাম দেবে। কিন্তু তখন নীলকণ্ঠকে গৌরাঙ্গ খাতির করত,

পোয়াতি একটা মেয়েছেলের প্রাণ বাঁচাতে একটা ফুড না দিয়ে সে তখন তাকে চটায় নি। কাকার সঙ্গে ভিন্ন হয়েই দুধের বদলে নীলকণ্ঠের কাছ থেকে অতি দরকারী কটা টাকা পেয়ে গৌরাঙ্গ কেনা হয়ে গিয়েছিল। কাল পর্যন্ত সে ধারণাও করতে পারেনি এ কৃতজ্ঞতার তার কারণ নেই, বাবুর দরদ সেরেফ ফাঁকি। অভিভাবকের, ভালমন্দের দায়িকের ঋণ যেন সে শোধ করছে কাল পর্যন্ত ভোরে উঠে সবার আগে একটুখানি জল মেশানো দুধ পৌঁছে দিয়ে। হুস করে উপে গেছে সে ভাব তার মনের বিরাগে শুধু নীলকণ্ঠের কালকের অপরাধ নয়, এতদিন ধরে তাকে ঠকানোর অপরাধেরও শোধ নিতে পারছে ভেবে হিংসার সুখে মনপ্রাণ তার তাজা হয়ে ওঠে।

অনেক লম্পটের শোষণে ছিবরে বনা বাজারের মেয়েলোকের মত এ বাড়ীর গিন্নির চেহারা, গলায় মোটা চেন হারটি সোনার শিকলের মত। এতদিন কিছু মনে হয়নি গৌরাঙ্গের ভদ্রমহিলাকে দেখে মৃদু একটা অস্বস্তিবোধ ছাড়া, আজ বারে বারে তার গরুর কথাটা মনে পড়তে লাগল, যার গলায় হারের মত একটা কুকুর বাঁধা শিকল জড়ানো আছে আজ তিন বছর।

সবার শেষে গিন্নি থামল। গিন্নি থামা পর্যন্ত ঠায় বসে রইল গৌরাঙ্গ বারান্দার একপাশে উবু হয়ে। শেষের দিকে একবার তার সাধ হল যে বেয়াদবির পালা সাঙ্গ করে নাকে খত দিয়ে আবেগে গদগদ ভাষায় ক্ষমা চেয়ে জানিয়ে দেয় যে, এমন আর হবে না কোনদিন, ফিরে আবার প্রার্থনা জানায় একটা ফুডের জন্য।

কিন্তু সাধ জাগলেও সঙ্কোচের জন্য সেটা গৌরাঙ্গ পেরে ওঠে না। বড় স্পষ্ট হয়ে যাবে তার বজ্জাতির মানে। বড় খাপছাড়া ঠেকবে পরের বৌয়ের জন্য তার এমন ধারা ব্যাকুল হওয়া। হঠাৎ সে যেন দিশে পায়। কেউ যা করে না, মোটেই নিয়ম নয় সংসারের যা করা, সে তো তাই করেছে হাবার মত খেয়ালের বশে অসঙ্গত কাজ—তার যে সাত পুরুষের কেউ নয় সেই একটা রোগা ক্যাংটা মেয়েলোকের মরণ বাঁচন নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে! টের পেলে লোক হাসবে। তাকে ভাববে ছেলেমানুষ, ছ্যাবলা। সকলে হাসি তামাসা করবে, টিটকারী দেবে।

গোবর্ধনের ছেলে কালীচরণ ছিল তার স্যাঙাৎ। বছর চারেক আগে কালীচরণ কলেরায় মারা যেতে পৃথিবী শূন্য দেখে শোকে একটু বাড়াবাড়ি রকম কাতর হওয়ার ফলাফল গৌরাঙ্গের মনে পড়ে যায়। শুধু তাকে ভেংগিয়েই সবাই ক্ষান্ত হয়নি, বড়দের পরামর্শে তাকে ধরে বেঁধে জোর করে মাথা ন্যাড়া করে জল ঢালা হয়েছিল কলসী কলসী, মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল মনসা পাতার রস।

'ওবেলা দুধ দেব দিদিমণি।'

সুনীতি পালিশ করা চকচকে আওয়াজে বললে, 'আদ্দেক আর আদ্দেক দুধ জল তো। তোমার নামটি কেন গৌরাঙ্গ? ফর্সা ছিলে বুঝি ছেলেবেলা?'

তামাসায় গৌরাঙ্গের প্রাণে আঘাত লাগে। জীবন তার কাছে ভয়ানক ভারী আর গভীর, একটুখানি কুঁড়ে ঘরে বুড়ী মা, কচি বোন আর গাই-বাছুরটি নিয়ে সমারোহহীন যে জীবনটুকু সে যাপন করে। বিয়ে করে গাদাখানেক ছেলেপুলে না হলে এ ভাবটা তার কাটবে না, বোধশক্তি ভোঁতা হবে না।

খিড়কি দিয়ে গৌরাঙ্গ এ বাড়িতে আনাগোনা করে। মেঠো রাস্তায় তার পথ সংক্ষেপ হয় না, কিন্তু মেঠো রাস্তায় চলে তার আরাম হয়। তার ভারি আশ্চর্য লাগে যে মানুষের পায়ে পায়ে এমন সরু সুন্দর নির্দিষ্ট পথ কি করে গড়ে ওঠে। কে সকলকে বলে দেয় কোন আধ হাত পরিসরের মধ্যে পা ফেলতে হবে? খেলার মাঠের বুক চিরে নতুন পথের রেখা সৃষ্টি হতে দেখেও সে বুঝতে পারেনি কি করে কি হল। প্রথমে শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন এখানে ওখানে ছড়ানো, পায়ের চাপে শুয়ে পড়া ঘাস, তারপর মরা ঘাসের বিবর্ণতার অনির্দিষ্ট রেখা ও ধীরে ধীরে সেই রেখার উদলা মাটির পথে পরিণতি। আরও কি অদ্ভুত ব্যাপার, আবর্জনার পাশ কাটাতে গোড়ার দিকে পথটি যেখানে একটু বেঁকেছিল, আবর্জনা নিশ্চিহ্ন হবার পরেও পথের সে বাঁক থেকে গেল—কেউ চেষ্টা করল না সে বাঁকাকে সোজা করতে। মানুষের এসব একর্থকতার প্রমাণ বড়ই দুর্বোধ্য আর রহস্যময় মনে হয় গৌরাঙ্গের। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কথা বেছে বেছে গান রচনা করে সে তার এই অনুভূতিকে রূপ দেবার চেষ্টা করে।

বাঁকা পথে ছাতিমপাড়া যাতি হবে গো
উদাস নগরে পথ দেখাবে কে।
মানুষ চলা পথে যাবার নাগর কি গো সে॥
আহা হৈ……!
আলো সই!

নীলকণ্ঠের বাড়ীর খিড়কির দরজার পরেই একটা পড়ো চালা, তার ওপাশ থেকে হাঁটা পথ গেছে দুদিকে। এদিকে মাঠ পেরিয়ে পুকুর ঘুরে বড় রাস্তার ধারে সেই শিরীষ গাছের কাছে, যার তলে দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তামণি পটলকে সাইকেল থেকে নামিয়ে তার চিঠি পড়ায়। আর পূবদিকে পথ গেছে ছোট জঙ্গল ভেদ করে তাঁতিপাড়ার গা ঘেঁষে গৌরাঙ্গের বাড়ীর দিকে।

চালার পিছনে চিন্তামণি দাঁড়িয়েছিল। আঁচলের আড়াল থেকে একটা ফুড বার করে সে গৌরাঙ্গের গামছায় জড়িয়ে বেঁধে দিল, ভৎর্সনা করে বলল 'তোমার কাণ্ডখানা কি, দুধ মাপতে বেলা কাবার হল? এটা খাইয়ো তাকে সেই যার ব্যারাম। কাল যে জন্যে বাবার কাছে এইছিলে গো তোমরা, কি জ্বালা!'

'কোথা পেলে?'

'বাবুর ঘর থেকে সরিয়েছি, কোথা আবার পাব? জানাজানি হয়নি যেন বাবা, দূর করে খেদিয়ে দেবে মোকে। বৌটা কেমন আছে?'

'বাঁচে কি না বাঁচে।'

আপসোসের একটা আওয়াজ করে চিন্তামণি মুখখানা করুণ করতে চায়। গৌরাঙ্গের মনে পাক খেতে থাকে জিজ্ঞাসা যে চিন্তামণির কাজের মানে কি।

চিন্তামণির মনে দরদ আছে নিশ্চয়। অজানা অচেনা পরের বৌয়ের জন্য নইলে কে সাধ করে চুরি করতে যায়? অথচ মুখ দেখে আর গায়ে পড়ে কথা বলতে শুনে মনে হয় সে যেন ভারি চালাক মেয়েমানুষ, প্যাঁচ আছে তার মধ্যে।

তাকে আরেকটু চিনবার ইচ্ছায় গৌর শুধোয়—'তুমার ঘর কুথা গো?'

শুনে চিন্তামণি মুচকি হাসে।—'ওটা পৌঁছে দাওগে যাও। আলাপ কোরো'খন পরে যখন সময় পাবে।'

বলেই দমক মেরে পিছন ফিরে সে হাঁটতে সুরু করে দেয় তাড়াতাড়ি ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গিতে। অনেকদিন থেকে সে জানে এমনি করে হাঁটার সময় কোমরের নীচে দেহের গাঁথুনি তার মানুষের নজর টেনে নেয়। কোনদিন তাব কোমর দুলিয়ে হাঁটা দেখার কপাল যদি নাই হয়ে থাকে এ ছোঁড়ার, আজকে দেখুক। বাবুর মেয়ে নাচে,—কি ছাই সে নাচ! সাপের মত হাত দুলিয়ে এপাশ ওপাশ করে হাঁটু পেতে বসে আর উঠে দাঁড়িয়ে যদি নাচ হত ওই রোগা প্যাটকা শরীর নিয়ে, মানুষ তবে কাঠিকে শাড়ী পরিয়ে খুসীমত নাচাত, মেয়েমানুষ চাইত না। মেয়ে নাকি আবার প্রাইজ পেয়েছে নাচ দেখিয়ে! গৌর যদি কোনদিন দেখে থাকে তার দেশের ওই মেয়ের নাচ, আজ বিদেশিনী তার শুধু চলনটা দেখুক। বুঝুক, ভগবান যাকে দ্যান তার চলার মধ্যেও কত পরাণ আকুল করা নাচ। খানিক গিয়ে চিন্তামণি মুখ ফিরিয়ে তাকায় তার ঈষৎ হাসির চটুল ভাষা নিয়ে আর গৌরাঙ্গের মুখে সেরকম জবাবী হাসির বদলে সরল সহজ বিহ্বলতা দেখে একটু অবাক হয়ে বাড়ী ঢোকে। মানুষ যে কাঁচা থাকে, নিজে যে সে একদিন কাঁচা ছিল, কতকাল মনে পড়েনি চিন্তামণির! নীলকণ্ঠ আর পটলের

বয়স পেতে অনেক দেরী গৌরাঙ্গের, আজ তক্ হয় তো সে কোন মেয়েছেলের গলা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরেনি একটিবারের জন্য। মৃদু একটা ব্যাকুলতা মনে আসে চিন্তামণির, বিয়ের আগে গৌরের বয়সী সেই যে একজন তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল মৃদু বেদনার সঙ্গে তার কথা মনে পড়ে এতকাল পরে। আর সেই সঙ্গে সস্তা মনে হয় নিজেকে, ফাঁকা মনে হয়, ফুরিয়ে যাওয়া চিকন গুড়ের চ্যাটালো হাঁড়ির মত।

সেদিন বিকালে দুর্গা মারা গেল। আকাশ ফুঁড়ে ফুডটা পাওয়া গেল, বার চারেক ক্ষীরের মত ঘন করে অনেকখানি ফুড খাইয়ে দেওয়া হল, তবু যে সে বাঁচল না তাতে কারো সন্দেহ রইল না স্বয়ং ভগবান তাকে মেরেছেন। খবর শুনে গৌর ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে দেখল, ফুডটা যোগাড় করে ছোট বৌকে যে খাওয়ানো হয়েছে এই সান্ত্বনায় রঘু নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে।

'ডাক্তর যা বলেছে সব করিছি। করিনি? অ গৌর, করিনি?' এই বলে কপালটা দু'বার চাপড়ে দিয়ে পাঁচুর হাত থেকে কলকেটা নিয়ে তিনবার সাঁ সাঁ শব্দে জোরে জোরে টেনে সে কাসতে থাকে। দুদিন ধরে দুর্গার জন্য তার দুর্ভাবনার বাড়াবাড়িতে গৌরের বড় ভয় হয়েছিল। বৌটার ভালমন্দ কিছু হলে রঘু সে আঘাত সহজে সামলাতে পারবে না, হয়তো ভেঙে পড়বে অনেকদিনের জন্য, যতদিন না ভগবান শোকটা সইয়ে দেন। ভাবতেও কত যে আলোড়ন উঠে মনটা মোচড় খেয়েছে গৌরের। মানুষের মন যে কি অবাক জিনিষ ভেবে সে প্রায় রোমাঞ্চ অনুভব করেছে অনেকবার। মনের তলে ছোটবৌয়ের জন্য, দুর্গার জন্য, রঘু যে এমন পাগল এতগুলি বছর রঘুর সঙ্গে মিশেও কে তা ভাবতে পেরেছিল? রঘুর সুখদুঃখ চিরদিন তার মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে বলেই না গৌরের বুকেও সহানুভূতির বান ডেকেছিল দুর্গার জন্য। অথচ কি সহজ আর স্বাভাবিক শোক হয়েছে ছ্যাখো রঘুর! তার গত দুদিনের উদ্ভট ব্যবহার বাদ দিলে যেমনটি হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনি।

শোকে উন্মত্ত প্রায় রঘুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে শোকার্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে সাধারণ চলনসই দুঃখ বোধ করতে গৌর খানিকক্ষণ নারাজ হয়ে থাকে। গরুটা পর্যন্ত দুয়ে রেখে আসেনি ভেবে তার একটু রাগও হয়। ছেলেমানুষী করে করেই সে ঠকছে চিরকাল। দুধটা চট করে বাবুর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আর দেখা হলে চিন্তামণিকে দুর্গার মরণের খবরটা জানিয়ে এখানে এসে অনায়াসেই সে আটকা পড়তে পারত। কি এসে যেত আধঘণ্টা একঘণ্টা দেরীতে, দুর্গা যখন

মরেই গেছে আর রঘু যখন দিশেহারা হয়ে যায়নি সেই মরণে।

ঘরে কাঁপা কাঁপা স্বরে মেয়েরা গান করে যায় মড়াকান্নার, পাড়ার আত্মীয় বন্ধু বাঁশ কেটে আনে মাচা বাঁধার জন্য। রঘু এদিক গিয়ে ওদিক গিয়ে ধীরে শান্তভাবে ছটফট করে বেড়ায়, কখনো একটু দাঁড়ায় অথবা উবু হয়ে বসে, খানিক শূন্যে তাকিয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে আর দু'এক মুহূর্তের জন্য চামড়া কুঁচকে-কুঁচকে মুখখানা তার বিকৃত হয়ে যায়। দু'টো কলকে অনেকের হাতে হাতে ঘুরছে। রঘু মাঝে মাঝে তামাক টানে আর কাসে। সাঁ সাঁ করে বে-কায়দায় টানে বলেই কাসে, নইলে এমন কড়া তামাক ভূ-ভারতে নেই যে রঘুকে কাসাবে, চিটায় মিঠা দা-কাটা তামাকের তো কথাই নেই।

'ধর, গৌর।'

গলাটা ভারি রঘুর। ভিজে ঢাকের মত ভারি!

এইসব মিলেমিশে কখন যে গৌরের হৃদয়ে যথোচিত বেদনা এনে দেয়! সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে তার হৃদয়ের সেই বেদনাবোধ কি সব কারণে কয়েকবার খিচ ধরে ধরে তার কান্না পায়। দুঃখ তার বৈরাগ্য হয়ে দু' চোখ দিয়ে গলে গলে পডতে থাকে টস টস করে। জীবন-যৌবন ঘর-দুয়ার গরু-বাছুর ক্ষেতের ফসল সব মিছে, এ জগতে কেউ কারো নয়। বৌ কিসের, মেয়েমানুষ কি, সব মায়া, সব ফাঁকি!

'দুধ লিতে এইছে দাদা।'

গৌরের কচি বোন আন্না তাকে ডাকতে এসেছে। খানিক মূঢ়ের মত বসে থেকে গৌর নীরবে উঠে দাঁড়াল।

'যাসনি গৌর। অ গৌর, যাসনি মাইরি।'

'এখুনি এসবো'খন – এক দণ্ডে।'

রঘুর সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে গৌর বেরিয়ে যায়। রঘুর জন্য তার আর চিন্তা ছিল না। ওর কিছু হবে না।

দুধ নিতে এসেছিল চিন্তামণি। তাকে দেখে গৌরের একবার মনেও হল না যে নীলকণ্ঠের চাকর-বাকর কুলি মজুর থাকতে চিন্তামণি কেন দুধ নিতে এসেছে। মনটা তার এতখানি বিগড়ে গিয়েছিল।

ছেলেকে দেখেই গৌরের মা ব্যগ্রকণ্ঠে জিগ্যেস করল, 'বার করেছে? নিয়ে গেছে?'

গৌর বলল, 'না।'

রঘুর বাড়ী গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে হাহুতাশ করার জন্য গৌরের মা উতলা হয়েছিল, ছেলের জবাবটা শোনামাত্র সে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

'ফের যাস্ তো ঘরে কুলুপ দিয়ে যাস্।'

ঘরে একটা কুলুপ আছে, তাতে চাবি ঘোরে না। কুলুপ দেবার উপায় থাকলে গৌরের মা কি আর এতক্ষণ আগলে বসে থাকে।

চিন্তামণির সাবান-কাচা সাদা কাপড় একদাশীর চাঁদের আলোর রঙ ফিরিয়ে দিয়েছে গৌরের একরত্তি উঠোনে। তার পায়ের কাছে পেঁপে গাছের ছায়ার ডগাটাকেও ঝাঁকড়া চুলো দৈত্যের মাথা বলে কল্পনা করা যায়। মানুষ-মরা সন্ধ্যার আলো ছায়া দিয়ে পৌরাণিক রহস্য চারিদিকে ঘনিয়ে আনা পুরাণ-ঘেষা কল্পনারই কাজ।

'বৌ বুঝি হোথা?'

'বৌ? কার বৌ?'

'ওমা! বৌ নেই?' আঁচলের তল থেকে হাত বার করে গালে দিয়ে চিন্তামণি অবাক হয়ে যায়।—'পালাই বাবা তবে।'

'দুধ নিয়ে যাও।'

গৌরাঙ্গ বিরক্ত হয়েছে বুঝে চিন্তামণির একটু রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি তার ভাল লাগে না। প্রথমে সে ভেবেছিল রঘুর বৌ গৌরের বোন টোন কেউ হবে, তারপর পটলের কাছে শুনেছে সে ওর কেউ নয়। ওর জন্যে মানুষ কি মরতে পাবে না সংসারে? গাঁয়ের কেউ মরলেই যদি এমনি ধারা করতে হয়, টেঁকাই যে ভার হবে মানুষের।

দুধের পাত্র হাতে নিয়ে চিন্তামণি নালিশের সুরে বলল, 'একলাটি কি করে যাব ভাবছি।'

'কি করে এলে?'

'এখন এইছি? সন্দে না লাগতে এসে ঠায় বসে রইছি তোমার জন্যে।'

বাছুর ছেড়ে দিয়ে গৌর চিন্তামণির অনেকখানি তফাৎ দিয়ে গিয়ে দাওয়ায় উঠল। সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাধ জাগলেও কেমন যেন সাহস হল না। চিন্তামণি একটু পিছিয়ে গেলে সে সরমে মরে যাবে। তার ফাঁকা বাড়ীর উঠোনে তাকে সামনে দাঁড়াতে দেখে চিন্তামণি পিছিয়ে গেলে তার যে লজ্জা আর অপমান হবে তার বড়ো লজ্জা আর অপমান জীবনে যেন তার জোটেনি, জুটবে বলেও মনে হ'ল না।

'সড়ক ধরে যাওগে না, যদি ইদিক পানে ডর লাগে? রাত হয়েছে কত, সড়কে লোক চলছে, সাথী পাবেখন।'

'ডর তো সেখানে গো, কেমন সাথী জুটবে তাকি জানি? তোমাদের দেশের মানুষ কেমন তোমরাই জানো ভালো, আমি হলাম ভিন্ দেশের লোক।'

একাই ফিরবে ভেবেছিল চিন্তামণি, আগে তার ভয় ছিল কম। ভয়ের কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এতক্ষণে ভয়টা তার সত্যই বেড়ে গেল। এদিকে মেঠো পথের নির্জনতা আর ওদিকে বাঁধা সড়কের বিদেশী অজানা পুরুষের কথা ভেবে গা তার ছমছম করতে লাগল। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে এল দাওয়ার কাছে। মিনতি জানিয়ে বলল যে গৌর তাকে পৌছে দিয়ে আসুক! ঘরে কুলুপ না দিলে কিছু হবে না, কতক্ষণ আর লাগবে তাকে এগিয়ে দিয়ে গৌরের ফিরে আসতে? এসেই বোকামি করেছে চিন্তামণি—ঘাট সে মানছে গৌরের কাছে।

'শোন বলি কেন এলাম।'

বিদেশ বিভুঁয়ে একা পড়ে গিয়ে কি যে কষ্ট চিন্তামণির! এসে থেকে সে সমান একটা মানুষ পায়নি, চাষী-গেরস্থ ঘরের মানুষ, এক ধাঁচের মানুষ, যে মন খুলে দুটো কথা কয়ে বাঁচবে। বাবুর বাড়ী মানুষ আছে ঢের কিন্তু সবাই তারা ভিন্ন জাতের আলাপ করে সুখ নেই। ঝি আর মজুর মাগীদের সাথে কি তার বনে, সে ছিল চিরটা কাল ঘরের মেয়ে, ঘরের বৌ আর ঘরের রাঁঢ়ী! ওই যে কথায় বলে জলের মাছের ডাঙ্গায় ওঠা, সেই দশা হয়েছে চিন্তামণির। তাই না সে এসেছিল দুধ নেবার ছুতোয় গৌরাঙ্গর মা বোন মাগের সাথে দু'দণ্ড কথা কইতে।

'পৌছে দেবে না মোকে?'

'দেব না বলিছি?'

মেঠো পথে সাপের ভয়। চিন্তামণিকে সঙ্গে নিয়ে গৌর সডকের দিকে এগিয়ে গেল। অপরিচয়েব সব ব্যবধান তাদের তখন ঘুচে গেছে। বাবুর বাড়ীর দাসী বলে চিন্তামণিকে একটু পর মনে হয়েছিল গৌরাঙ্গের, কি ভাবে তাকে নিতে হবে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি। ওরা কোন জাতের মেয়ে-মানুষ আর কেমন ওদের হালচাল তা কে জানে! নইলে চিন্তামণির সঙ্গে কথা কইতে কি গৌরাঙ্গের ভাবতে হত, না কোন ব্যবহার উচিত হবে ঠাহর করতে তার ফাঁপর লাগত এতক্ষণ? চাষীর মেয়ের মন না জানুক, মনের গড়ন চাষী জানে। মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে বুলিও চাষীদের এক,—কথার ও ভাষার মানের গণ্ডী সম। এইটুকু পথ যেতে যেতে তাই দু'জনের ব্যগ্রতাহীন অনায়াসে কথোপকথনে অনেক কথার আদান

প্রদান হয়ে গেল—পরস্পরের নানা বৃত্তান্ত। হরের্নাম রাইস মিলের সামনে যখন তারা পৌঁছল, চিন্তামণি তার চোখের কথা বলছে। গত বছর চোখের অসুখ হয়েছিল বলে ক'দিন থেকে মাঝে মাঝে বাঁ চোখটা একটু কটকট করায় ভাবনা হয়েছে চিন্তামণির।

'চোখে কম ছাখো ?'

'না গো, কম কেন দেখব ? ত্বপুরবেলা চোখটা কেমন টাটায়। যা ধুলো বাবা তোমাদের দেশে !'

আজ সকালেও তার দেশ সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ মন্তব্য গৌরের পছন্দ হত না হয়তো কলহের স্থরে পাল্টা জবাব দিয়ে বলত যে তোমার দেশে ধুলো নেই ? এখন কথাটায় সায় দিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'পদ্মমধু দিও দিকিন চোখে একটু। ও বড় ভাল ওষুধ।'

সেখান থেকে মেঠো পথেই গৌর সোজা রঘুর বাড়ী গিয়ে হাজির হল। মাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে হৈ চৈ করে দুর্গাকে পোড়াতে গেল বালিময় শুকনো নদীর বুকে। কানাই বংশী আর হরিধনের জন্য একটা দেশী মদের বোতল রঘুকে কিনতে হয়েছিল, গৌরও একটু চেখে দেখল। ভাল করে গেঁজে ওঠেনি এরকম অল্প নেশালো তাড়ি সে দু'এক ঢোঁক খেয়েছে মাঝে মধ্যে, মদ কোনদিন ছোঁয়নি !

খেদির পাড়া, ২৪ পরগণা

৪ঠা ফাল্গুন

বৈন চিন্তামণি তোমায় কি লিখিব আমার লিখিবার মুখ নাই। আমি কেন জীবন্ত আছি আমার মরণ হয় না ভগবানকে দিবারাত্র জানাইতেছি। কি সর্বনাশ হইয়াছে তুমি কাঁদাকাটা করিবা বলিয়া জানাইতে বিলম্ব করিলাম। ইহার পর আর বাঁচিবার সাধ নাই কিন্তু পোড়া কপালে মরণ নাই আমি কেন মরিব একচক্ষু ভগবান আমাকে কেন লইবে। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে জানিবা। ইহার সব বিত্তান্ত ভাবিলে আমার মাথা ঘুরায় আমি দিবারাত্র মরণ কামনা করি। কাকী থাকিতে দিবে না বলিয়াছে লিখিয়াছিল ইহাতে কেমন করিয়া জানিব কাকী চাঁপাবালাকে মেয়া শুদ্ধু খেদাইয়া দিয়াছে যে তাগো খাওয়া জুটে না হৈমী এবং তাহার মাকে কেমন করিয়া রাখিবে। ইহা কথার কথা ভাবিয়াছি তাই

টাকা পাঠাই নাই। আমি কেমন করিয়া জানিব টাকাই বা কোথায় পাইব। গলায় দড়ি দিবে জানাইলে চুরি ডাকাতি করিয়া পাঠাইতাম কিন্তু হতভাগী ইহা জানাইল না। নবিন টাকা পাঠায় নাই। তাহার দোষ কি নূনা জলে ধানের সর্বনাশ হইয়াছে সে কাজ করিয়া টাকা পায় নাই এবং তাহার কি দুর্দশা সে কলে কুলির কাজ করিতে গিয়াছে। চাঁপাবালা কয়দিন খাইতে পায় নাই হৈমীকে লইয়া কোথায় পড়িয়া থাকিয়াছে এজন্য আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছে। গজেন মুক্তারের বাড়ীতে উঠিয়া গলায় দড়ি দিয়াছে তাহা হৈমীর জন্য। গজেন মুক্তারের মুহুরির সাথে হৈমী কোথায় চলিয়া গিয়াছে এই কলঙ্কে বুক ফাটিয়া চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিয়াছে। সব গজেন মুক্তারের কারসাজি বলিয়া শুনিতেছি জানিবা। বিন্দী পাড়ার বিপিন হৈমীর জামায়ের বড় ভাই সে গিয়া শুনিয়া আসিয়া বলিয়াছে। সব লোকে আমার মুখে থু থু দিতেছে আমি কেন জীবন্ত আছি। গজেন মুক্তার টাকার কুমীর হইয়া এমন কাজ করিল। মুহুরিকে দিয়া হৈমীকে পলাইয়া লইয়া গেল। গজেন মুক্তার থানায় গিয়া মুহুরির নামে থানা পুলিশ করিয়াছে। বিপিন বলিল ইহা তাহার কারসাজি বর্জ্জাতি করিয়া করিয়াছে যে লোকে বলিবে সে নির্দুষী। মুহুরিকে তুমি চিনবা সে চাঁপাবালার পিসাতো ভাসুরের ছেলে শরৎ। চাঁপাবালার শ্বশুরবাড়ী থাকিবার কালে হৈমীর কাছে আসিয়া হৈমীকে কত আদর করিত। কাকী তাডাইয়া দিলে সেই নাকি চাঁপাকে গজেন মুক্তারের বাডী ঠাঁই দিয়াছিল। শরৎ এমন ভালোমানুষ আর অল্পবয়সে তাহার কেন এমন সাহস হইবে। আমি এই হুঁশে আছি আমার মরণ নাই। চাঁপাবালা গলায় দড়ি দিল হৈমী কলঙ্ক করিল আমি কি করিব। শুধু বুক চাপড়াই মরিব। আমার খাওয়া জোটেনা। কয়টা টাকা পাঠাইতে লিখিলাম তুমি পাঠাইলে না। কয়মাস বেতন পাইয়াছ তথাপি ইহা কিরূপ। তোমাকে কতকাল খাওয়াইয়াছি ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি মধুবনী গিয়া সুখে আছ। আমি না খাইয়া মরিব। পত্রপাঠ কয়টা টাকা পাঠাইবা।

'দিদি'

তিন

চোখ মেলে চাইলেই শরৎকালের শোভা নজরে পড়ে, সে শোভার রঙ ভারি সবুজ। লাল ধূলোর কথা তুলে গৌরের এদেশকে নিন্দে করার ছুতো চিন্তামণির বর্ষায় ভেসে গিয়েছিল, এখন যদি বা এখানে ওখানে শুকনো কাদার ডেলা গুঁড়িয়ে ধূলো উড়ছে দু'এক ঝলক, সেটা কিছু নয়। কুয়াশার দিনগুলি পেরিয়ে গিয়ে আবার ভালো করে ধূলো উড়তে স্বরু হবে, ফাল্গুনের দখিণায় হবে তার ওড়নের চরম বড়াই।

মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর থেকে অলস অকর্মণ্য জীবন যাপন করতে করতে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে। ধান কাটার সময় এলো এই যা ভরসা। শীষের প্রৌঢ়তা প্রাপ্তির দিন থেকে সবাই নজর পেতে আছে ধানে রঙ ধরবে কবে। খাটুনি আসবে কঠিন, ঝর ঝর ঘাম ঝরবে, গায়ে হাতে ব্যাথ্যা হবে, কোমর বাঁকা হয়ে যাবে তাদের বয়স যাদের একটু বেশী হয়েছে। কাজে সুখ নেই, বড় কষ্ট কাজে। নতুন আলু, সোনালী আখ, শাক-সব্জী, বুট মটর সব কিছু কাটা তোলা ধোয়া চাঁছা বয়ে নেওয়া যোগান দেওয়ার কাজে। কাজ স্বরু করার খানিক পরেই মনে হবে কি যেন নেই শরীরে,—একটুখানি ছিল কিন্তু ফুরিয়ে গেছে। তারপর থেকে বাকী দিনের কাজ শুধু সহ্য করার ধৈর্য্য দিয়ে, বাঁধা গতিতে বাঁধা নিয়মে কলের মত। গৌর যে এমন ব্রহ্মচারী যুবক, খেটে যাতে সুখ মেলে তা তারও যেন শরীর মনে মোটে ছটাকখানেক আছে। অকেজো দিনগুলির চাপে কাতর হয়ে পড়ে বলেই তারা কাজের কষ্ট চায়। বছরে কতকাল যে চাষীর বেকার কাটাতে হয়!

সবাই নয়। নিজের ও ছেলেমেয়ে মা-বোনের সরু হাড় আর অলম্ব মাংসপেশী কোনমতে যারা টিকিয়ে রাখতে পারে তারা অন্য কাজ খোঁজে না। মজুর হতে খাঁটি চাষী মরমে মরে যায়। ভূমিহীন চাষী পর্যন্ত। পরের জমিতে মজুরগিরিই সে করে, তবু চাষ আবাদ ছাড়া আর কিছু করে না সে চাষী।

সদয়, পচা, ছোলেমান, মৈনুদ্দিন কয়েক টুকরো জমি চষে বটে কিন্তু তাঁতও বোনে বলে তারা তাঁতি। আকবর, যদু, নাসের, সুখলাল ফসল বোনা আর ফসল তোলার সময় ছাড়া বাড়ী থাকে না; কয়লা তুলতে যায় ঝরিয়ার খনিতে, ওরা তাই

কুলি। গাঁওতলীতে ঘরের লাগাও সাত কাঠা জমি আছে জগুর, তাতে জগু বরাবর লাঙ্গল দিয়ে ফসল ফলিয়ে আসছে নিজে, কিন্তু মুচীকে কে চাষী বলবে সেজন্য, সরোজ বাঁড়ুয্যে মুদীখানা খুলেও যখন মুদী নন।

সরোজ বাঁড়ুয্যের দোকানের সামনে রাস্তার ধারে জগু জুতো সেলাই করতে বসে, প্রায় আপিস টাইম থেকে সন্ধ্যাতক। থানা আদালত জেলখানার বাঁকা আর সাফসুরৎ এলাকা থেকে মধুবণীর অভিজাততম পথটি আভিজাত্য হারাতে হারাতে গোটা কয়েক মোড় ঘুরে এইখানে বাঁক নিয়ে বাজারের ঘিঞ্জি অঞ্চলে ঢুকছে, নোংরা আর সঙ্কীর্ণ হয়ে। বাঁকেরই আন্তরিক কোণটার ওপর বাঁড়ুয্যের মুদীখানা— দোকানও বড়, বিক্রীও খুব। জগুর রোজগার মন্দ হয় না, মাসে অন্ততঃ পাঁচ সাতদিন শ'টাকা পুরে যায়। গড়পড়তা তিনদিনে একদিন জগু দু'নম্বর দেশী গিলে বাড়ী ফেরে—সন্ধ্যা পার করে রওনা হয়। অন্যদিন দিনের আলো খানিকটা বজায় থাকতেই উঠে পড়ে। বড় পথটা ধরেই তাকে আসা যাওয়া করতে হয়—থানা আদালত আর জেলখানার সরকারী পাড়া পেরিয়ে। জেলটা তার চেনা, ভেতরে দু'দফায় কিছুকাল বাস করেছে।

বাজার আর আদালতের মাঝে পথের দু'ধারে বাড়ীগুলি বেশীর ভাগ ভাঙ্গা-চোরা ইঁট বার করা সেকেলে ধাঁচের পুরাণো অথবা বদরঙা সেকেলে ধাঁচের নতুন। কয়েকটি বাড়ীর চেহারা শুধু খানিক আধুনিক। সকালে ও বিকেলে এসব বাড়ীর কোন কোনটা থেকে ডাক আসে :

'এই মুচি! মুচি!'

সকালে আসবার সময় জগু ডাক শোনে, দরে বনলে জুতো সারায়। বিকালে হাজার গলা ফাটানো শুনে সে ফিরেও তাকায় না।

মরা খিদেয় আর শ্রান্তিতে মন তখন তার উদাস হয়ে আছে।

পূজা উপলক্ষে পটল একজোড়া জুতো কিনেছিল। দু'দিন পায়ে দিতেই জুতোর একটা পেরেক ডান পায়ে বিঁধতে লাগল। জুতোটা হাতে নিয়ে সে গ্যাখে, খানিকটা সোল কি করে যেন কোথায় খসে পড়ে গেছে। সস্তায় জুতো কেনার প্রায়শ্চিত যে দু'দিনের মধ্যে স্থরু হয় পটলের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। জুতোটা সারাতে দিয়ে বাঁড়ুয্যের দোকানের ময়লা বেঞ্চে বসে খানিকক্ষণ সে একটানা সেই জুয়াচোরদের গাল দিতে লাগল, মানুষকে যারা নতুন বলে পুরাণো খারাপ জুতো দিয়ে ঠকায়। তার সমালোচনার মোট কথার মানে হল, ওরা ছাড়া পৃথিবীতে আর বুঝি জুয়াচোর নেই।

জগু তার কামানো চিবুক নামিয়ে ঝাঁটার মত আছাটা মোটা গোঁফের নীচে হাসি ফোটায়, উল্‌ল্ ল্… । বলে, 'ফরমাস দিয়ে জুতো বানান, সাতটি বছর ছুঁতে হবে না জুতো।'

'তুই বানাবি ?'

'লয় কেনে ? বানাই নি কো ফরমাসি জুতো ? ঠাকুরমশায় জানে—কুকুরে যদি না লিয়ে যেতো—'

দু' আড়াই বছরের কথা, জুতোর শোকটা সরোজ বাঁড়ুয্যের কেটে গেছে মুখে তাই তার কথাটা স্মরণ করে হাসি ফুটতে পায়। শক্ত লোহার মত একজোড়া জুতো তাকে জগু বানিয়ে দিয়েছিল, কয়েক মিনিট পরবার পরেই বাঁড়ুয্যের পায়ে আর ফোস্কা পড়ার স্থান থাকে নি। জুতো জোড়া খুলে রাখা হয়েছিল চৌকীর নীচে। প্রথম দিনটা পরিষ্কার বোঝা যায় নি, পরের দিন টের পাওয়া গিয়েছিলো যে ঘ:র বেশ একটু গন্ধ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে তিন চার দিনে ঘর ম ম করতে লাগল সেই জুতোর গন্ধে! বাইরে বার করে রাখা মাত্র রাস্তার এক নেড়ে কুত্তা এসে একপাটি মুখে করে পালিয়ে গেল।

'যদি না নিয়ে যেত—'

'কাঁচা ছাগলের চামড়া দিয়ে ব্যাটা জুতো বানিয়েছিল। না যায় পায়ে দেয়া, না যায় গন্ধের চোটে ঘরে টেঁকা। মুচির কাছে জুতো কিনো না, খপরদার !'

জগু নিজেই কথাটায় সায় দিয়ে বলল, 'মুই মুচি লই। জাত মুচি লই।'

পটল বলল, 'ছাগলের চামড়া ? গরুর চামড়া বলুন।'

বাড়ুয্যে বলল, 'গরুর চামড়া ? খেপেছ! গরুর চামড়ার জুতো পরব আমি!'

চামড়ার মধ্যেও সে যেন টের পায় কোনটা গরু কোনটা ছাগল! সবার বুদ্ধি ভোতা তাই রক্ষা, নইলে হয়ত কেউ জিজ্ঞেস করে বসত, গরুর চামড়া আর ছাগলের চামড়ার জুতোর তফাৎ জানবেন কি করে ?

এমনি সময় গৌর আর রহিমকে আসতে দেখা গেল কোর্টের দিক থেকে। গৌরের হাতে একটি দলিল।

গৌরের মুখে বজ্জাতি মুচকি হাসি। দেখলেই সন্দেহ হয় কোন একটা দাঁও মেরেছে। গরীব চাষী মজুরের মুখে এই দাঁও মারা হাসি ভাষার চেয়ে প্রাঞ্জল। দেখেই কাঁচ্চা খানেক এক ঝলক বাড়তি রক্ত পটলেরবুকে উঠে গিয়েছিল। চিন্তামণির জন্য তার মাথা ব্যথা নেই। তবু চিন্তামণি তো মেয়েমানুষ আর

বেদখলী মাল ! গৌরের সঙ্গে কিছুদিন থেকে চেনা হয়েছে চিন্তামণির। গৌর কি তবে চিন্তামণির—?

'আড়ুলির ভাঙ্গা জমি পেলাম খানিক পটলবাবু।'

'কিনলি নাকি ?'

পটল যে বেঞ্চে বসেছিল পটলের সম্মান বজায় থাকে এতখানি তফাতে সেই বেঞ্চেই জাঁকিয়ে বসে গৌর বলল, 'কিনতি যাব কেনে ? ভাগ পেলাম। চাঁদকাকা নিয়েছে জমি, আমি ভাগ পেলাম—ফসল শুদ্ধু। কাকা দাপডাবে, কাটা ছাগলের মত দাপড়াবে।'

রহিমকে সে খাতির করে বিড়ি এগিয়ে দেয়। জিভ দিয়ে গোড়ার দাঁতের ফাঁক থেকে শাকের কণা খসিয়ে এনে উত্তেজনায় সামনের দাঁত দিয়ে কুট্ কুট্ কাটতে থাকে। রহিমের কাছ থেকে তার চাঁদকাকা আড়ুলির ভাঙ্গা জমি কিনেছে,—তারা ভিন্ন হবার আগে। গৌর তা জানত না ! এবার মাঠে প্রথম লাঙ্গল দেবার সময়ে খবরটা শুনে মনটা তার গিয়েছিল বিগড়ে, জমি জায়গা কিনবে বলে চাঁদকাকা তবে তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে, তাকে ঠকিয়েছে ! তলে তলে সংসার থেকে সরিয়ে টাকা জমিয়েছে কাকা তাকে ভিন্ন করে দিয়ে নিজে একদিন এই সব করবে বলে ! পরশু তক্ কাঁটাটা খচ খচ করছে গৌরের মনে। পরশু আড়ুলিতে রহিমের সঙ্গে তার দেখা। নেহাৎ বিপাকে পড়ে রহিম তার জমিটুকু বেচে দিয়েছিল, আজ সেই জমিভরা জমকালো ফসল দেখে তার মনটা আঁকুপাঁকু করছে, গাটা জ্বালা করছে, চোখে জল আসছে। তার হাতে কোনবার তো এমন ফসল হয়নি। বেইমান মাটি !

রহিম। বিশ রুপিয়ায় দু'আনা ফসল দিবে না ? না দিলে। খোদা আছেন। না—দিলে !

গৌর। আমায় বলছ ?

রহিম। সরম নাই, অঁা ? জমিটা দিয়ে দিলাম তোমাদের আধা দামে, পয়লা বছরের দু'আনা ফসল বিশ রুপিয়ায় দিবে না ! বহুত আচ্ছা। দেখে লিব।

আড়ুলিতে চাঁদকাকা কার জমি কিনেছে কিছুই গৌরের জানা ছিল না।

রহিমের সঙ্গে খানিক আলাপ করেই জানা গেল কাকাটা তার কত বড় ঠক্ ! ভিন্ন হবার আগে জমি কিনেছে তার কাকা তাকে ভাগ দেয়নি !

চাঁদকাকার নামে গৌর তাই নালিশ ঠুকে দিয়েছে। নিজের ভাগটা পেলেই সে রহিমকে মাগনা দু'আনা ফসল দেবে।

সরোজ বাঁড়ুয্যের হাসির শব্দে গৌর চমকে গেল। বাঁড়ুয্যে হাসে খুব কম, যখন হাসে হাসিটা তার বাজীর বোমার মত দমাস করে ফেটে চীনা পটকার মত পটাস পটাস ফেটে চলে। দেহের অনুপাতে গলার নালিটা তার একটু সরু!

'গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল!'

'আজ্ঞে না মুক্তারবাবু বললে—'

বাঁড়ুয্যের হঠাৎ ফাটা হাসি আচমকাই থেমে যায়! ধমকের সুরে সে বলল, 'মোক্তারবাবুরা অমন বলে! আরে মুখ্যু, তোর কাকীর নামে যদি জমি কিনে থাকে? যদি বলে ভিন্ন হবার পর কিনেছে? যদি বলে সম্পত্তি সব তার, তোকে শুধু মানুষ করেছে খাইয়ে পরিয়ে?'

মুখখানা শুকনো করে গৌর দলিলের নকল দেখায়—তাকে ভিন্ন করার প্রায় আড়াই মাস আগে চাঁদকাকা নিজের নামে জমি কিনেছে। রহিম আদালতে হলপ করে বলবে যে জমি কেনার সময় গৌর আর চাঁদ এক বাড়ীতে একান্নে ছিল। গৌরের বাপ এ-বাড়ীতে বাস করেছে স্বর্গে যাওয়া পর্যন্ত, চাঁদ কি করে বলবে যে দয়া করে আশ্রয় দিয়ে তাকে মানুষ করেছে? না, কোনদিকে ফাঁক নেই। সনৎ মোক্তার তাকে সব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে।

এবার পটলের সঙ্গে চোখ চাওয়া চাওয়ি করে বাঁড়ুয্যে মুচকে হাসল। রহিমের ঠোঁটের কোনেও যেন হাসি দেখা গেল একটু।

'তোমার কাকা কি বলে গৌর?' পটল জিজ্ঞেস করল।

'কাকার কাছে যাইনি।' গৌর দু'বার ঢোক গিলল, 'যেমন ঠকিয়েছে আমায় তেমনি জব্দ হোক।'

'ও, ঝাল ঝাড়ছ?' পটল বলল। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছে।

'জব্দ তুমিও হবে। বরং বেশী করে হবে। চাঁদার সঙ্গে লড়তে পারবে তুমি? তার চেয়ে আপোষে ভাগটা আদায় করে নিতে পারলে কাকা তোমার জব্দ হত গৌর।'

বাঁড়ুয্যে এক খদ্দেরের জন্য আড়াই সের চিনি ওজন করতে করতে বলল।

'আমিও তাই বলছিলাম বাবু। ও মোটে কান দিলে না।'—রহিম সাগ্রহে সায় দিল।

একেবারে নালিশ ঠুকে কাকাকে শাস্তি দেবার কথা সনৎ মোক্তারের পাল্লায় পড়ার আগে গৌরও ভাবেনি। উত্তেজিত, উল্লসিত, অভিভূত করে সনৎ মোক্তার কি যেন করে দিল তাকে, কি যেন করিয়ে নিল তাকে দিয়ে! এখানে এই পাকা

লোক দুটির ঠাণ্ডা সাহচর্যে জুড়িয়ে গিয়ে ক্রমেই মনটা দমে যাচ্ছে, একটু বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে। সনৎ মোক্তারের হাতে গিয়ে যে কি করে পড়ল তাও সে এখন ঠিকমত ঠাহর করে উঠতে পারছে না। তার জন্যই যেন ওৎ পেতে অপেক্ষা করেছিল সনৎ মোক্তার, ছোঁ মেরে তাকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল চোখের পলকে। খানিক আগে পর্যন্ত তার মনে হয়েছিল ওর মত ক্ষমতাবান দরদী ও শুভার্থী যেন জগতে আর নেই, এই একটি লোকের হাতে সব ভার, সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমোতে পারে!

নালিশ করার আগে রঘুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করার কথা বা মাকে একবার জানাবার কথা পর্যন্ত তার মনে পড়তে দিল না সনৎ মোক্তার!

বাঁড়ুয্যে বলল, 'ফসল চাঁদাকাকা বেচে দিয়েছে জানিস? নীলকণ্ঠবাবুকে বেচে দিয়েছে, তোদের ওই হরের্নাম নীলকণ্ঠবাবুকে।'

ভয়ের জেদি সাহসে গৌর বলল, 'বেচে দিক্না। টাকার ভাগ দেবে।' সাহসটা আরো বেশী প্রকট করে দেখাতে চেয়ে রহিমকে বলল, 'দু'আনার দামটা তোমায় দেব, তুমি ভেবোনা।'

আর দুজন খদ্দের এসেছে সওদা নিতে—ছেঁড়া ময়লা শাড়ী পরা শীর্ণ রুক্ষ একটি বৃদ্ধা আর পথে কুড়ানো তালি দেওয়া হাফ্প্যাণ্ট পরা সাত আট বছরের একটি ছেলে। বাঁড়ুয্যে এদের সওদা দেয় না, বাম প্রান্তে নীচু কাঠের বাক্সে বসে এদের কম কম জিনিস দেয় বিস্তি। বিস্তির চারিপাশে মুদীখানার সব জিনিসই সাজানো আছে, তবে ছোট ছোট পাত্রে, কম পরিমাণে। বাঁড়ুয্যের এই আড়তের মত বড় মুদী দোকানের কোণে ওখানে যেন আরেকটি ছোটখাট ভিন্ন দোকান করা হয়েছে। বিস্তির বাটখারাটিও ছোট—অনেকের অধিকাংশ সওদা দিতে সেটা ব্যবহারও হয় না। এক পয়সা আধ পয়সার জিনিষ কি কেউ ওজন করে বেচে!

বুড়ি বলে, 'এক ছিদাম নুন, এক ছিদাম ধনে, আধপয়সা—'

বিস্তি বলে, 'ছিদাম নেই গো! আধপয়সার কম নেই।'

ক'মাস আগেও ছিদামে বেচা ছিল। মোট এক পয়সা পূরলেই হত। কেবল বাঁড়ুয্যের দোকানে নয়, অনেক দোকানেই। দু'পক্ষেরই এতে লাভ। শাকপাতা শুঁকা বা মেছোবাজার কসাই খানার কুড়ানো পটকা হাড় কাঁটা, নাড়ী ভুড়ী কাণ যাকে রাঁধতে হবে দু'পয়সার তেল মশলায়, সে একটু একটু সব জিনিষ কিনতে পারে। ছিদামের জিনিষ বলে দোকানীও এতটুকু দিতে পারে জিনিষ যে একসের জিনিষ বেচে দাম ওঠে দু'সেরের। রমেশবাবু একবার এক ছিদামের

নুন আর তিন ছিদামের চিনি কিনে কিনে পয়সা পুরিয়ে সওদা করিয়ে ছিলেন মোট চার আনার—এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। তারপর একসঙ্গে পয়সা দিয়ে ওজন করে কিনিয়ে ছিলেন এক আনার নুন আর তিন আনার চিনি। ষোলবারে কেনা সমান পয়সার নুন একবারে কেনা নুনের হল অর্ধেক, চিনি তারও কম। ডগসন মাঠের এক সভায় রমেশবাবু তার এই অর্থ-নৈতিক পরীক্ষার কথাটা এমন ভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে গৌরের ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তারপর ভেবে চিন্তে সে দেখেছে, এক-আধপয়সার জিনিষ কিনলে দোকানী ঠকায়, তার এবং সকলের এই জানা কথাটাই রমেশবাবু একটু অন্যভাবে জটিল করে বলেছেন।

ছিদামের কারবার এখন আধপয়সায় উঠেছে। কারণ সবচেয়ে কম দামী জিনিষও ছিদামে যতটুকু দেওয়া হত, তার চেয়েও কম জিনিষ কোন কিছুর বিনিময়েও মানুষ মানুষকে দিতে পারে না।

বুড়ী বলল, 'তবে আদলার নুন আর আদলার হলুদ দাও।'

'আরেক পয়সার ?'

'আর নয়।'

'পয়সা আছে ?'

বুড়ী একটা আনী বাড়িয়ে দিল। বাকী তিন পয়সা তার কিসের বরাদ্দ কে জানে!'

বঙ্কি মাথা নাড়ল।—'দু' পয়সার কম সওদা নেই।'

এতক্ষণে বুড়ী গেল চটে।—'নেই তো নেই। ভারি দুকান দিয়েছে।'

বুড়ী চলে যায় কিন্তু আধপয়সা একপয়সা করে' আনা দু'আনার খদ্দের ক্রমে বাড়তে থাকে। বঙ্কি ক্ষিপ্রহস্তে একটু মসলা, এক চামচ নুন, আধপলা তেল, কিছু চাল কিছু ডাল ইত্যাদি বেচতে থাকে। এত তাডাতাড়ি এত জনকে এত জিনিষ এত বিভিন্ন দামে সে বিক্রী করে কিন্তু পয়সার হিসেবের জন্য তাকে ভাবতে হয় না, হিসাবে ভুলও হয় না একটা আধলার।

দেখে, চাঁদকাকাকে জব্দ করতে সনৎ মোক্তারকে, আদালত আর আদালতের লোককে দিতে যা খরচ করেছে তার জন্য বড়ই আপসোস জাগে গৌরের। আত্ম-প্রসাদের সঙ্গে জাগে। সে গরীব চাষী, কিন্তু এদের মত গরীব নয়। এরা সব বাড়তি ফেলনা মানুষ। চাষীও নয়, কুলীও নয়।

দুধ দিতে গৌরকে আর নীলকণ্ঠের বাড়ী যেতে হয় না। দাম বাড়িয়ে দুবেলা

সামনে দুইয়ে দুধ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ধর্ম সাক্ষ্য রেখে সকলেই নির্জলা খাঁটি দুধ কষ্ট করে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, কিন্তু অপর পক্ষ কষ্ট করে এসে সামনে দুইয়ে দুধ নিতে চাইলে দর একটু বাড়াতে হয়। ধর্মের দুধের চেয়ে সামনে দোয়া দুধ বোধ হয় খাঁটি হয় বেশী।

কাজটা আয়ত্ত করেছে চিন্তামণি। ভোর যখন শুধু আবছা আঁধার তখন সে পাত্র হাতে ঘুমন্ত পুরী থেকে বেরিয়ে যায়, গৌরের সজাগ বাড়ীতে পৌঁছায় আবছা আলোর ভোরে। বিকালে একটু বেলা থাকতেই আসে, সঙ্গে আনে গিন্নিমার কোলের ছেলেটিকে। ঠেলাগাড়ি চেপে বেড়াবার বয়স হয়েছে ছেলেটার।

ভোরে গৌর বাড়ী থাকে। বিকালে কোনদিন থাকে, কোনদিন থাকে না। ভোরে দুধ নিয়ে ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি, বাবুদের চা হবে। বিকালে সময় থাকে, পাড়ার এবাড়ী ওবাড়ী একটু বেড়ায় চিন্তামণি। বিকালের দুধটা তার সামনে দোয়া হয় কদাচিৎ।

তাতে অবশ্য আসে যায় না কিছু। দুধে জল একটু তার সামনেই মেশানো হয়। সে সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছে।

গৌরের মা থ্যান থ্যান করত, 'একপো কমিয়েছে টাকায়, একপো! পোষায় বাছা দুধ জুগিয়ে এ আক্রার বাজারে?'

গৌর সায় দেয়।—'ভাল মানুষ পেয়েছে কিনা, সবাই মোকে ঠকায়।'

একদিন দু'দিন চিন্তা করে চিন্তামণির মাথায় বুদ্ধি খেলেছে।

'জল মেশাও না কেন? যাতে পোষায় এমনি করে জল মিশিয়ে দাও!'

'তুমি গিয়ে লাগাবে না?'

'ইস্, সাতপুরুষের কুটুম কিনা ওনারা, লাগাতে যাব! মেশাও তুমি জল।'

তার আপনপণার ঘটা দেখে গৌরের মা কুরিয়ে কুরিয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। ছেলে তার পুরুষ তো বটে, বিয়ে যদ্দিন না করছে মেয়েলোক একটা ঘাঁটে তো ঘাঁটুক, সস্তা আর বাজে মেয়েলোক। কিন্তু পীরিত জানা সোহাগ-বেতর পুরুষচাটা এ মাগীর খপ্পরে পড়লে ছেলে তো তার বিগড়ে যাবে!

দুধ নিতে এসে চিন্তামণি বেড়াতে গেছে রঘুর বাড়ী, কাকার নামে নালিশ করার বিগড়ানো মন নিয়ে নিজের বাড়ী না ঢুকে গৌরও এল রঘুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। বাবুর ছেলেকে চিন্তামণি কোলে নিয়েছে, রঘুর মেয়ে তার ছোট ভাইবোন দুটিকে ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে মহোল্লাসে উঠানময় হাওয়া খাইয়ে বেড়াচ্ছে।

চিন্তামণির কাঁখে বাবুর ছেলে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে, তার খেয়ালও নেই।

তার নিজের চোখে জল, ধরা গলায় সে বিরজাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছে। রঘু বসেছে একটু তফাতে, তাকেও শোনাচ্ছে। দুঃখের কাহিনী কোন জাতের কোন মেয়ে কোনদিন বলে শেষ করে উঠতে পারে নি। গৌর এসে পড়ায় চিন্তামণিকে থামতে হল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে হল।

গৌর তাকিয়ে থাকে। চিন্তামণির দরদ আছে তার জানা ছিল কিন্তু সে যে কাঁদতে পারে আজ এই মাত্র যেন তার সে বিশ্বাস জন্মালো একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে।

'কাঁদছ কেন গো?'

'কপালে আছে কাঁদছি।'

এ জবাবে রহস্যের মুখ ঝামটা আছে। সেটা বেমানান হওয়ায় গৌর অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কাল পর্যন্ত চিন্তামণি তাকে তার সমস্ত দুঃখের কথাই বলেছে। এর মধ্যে এমন কি ঘটল তার কপালে যে বলতে গিয়ে তাকে কাঁদতে হচ্ছে?

'সবতো জান, আর জিগ্‌গেস করছ কি?'

তখন গৌর বুঝতে পারে যে নতুন কিছু হয় নি, তাকে যে সব কাহিনী বলবার সময় সে শুধু অদৃষ্টকে শেপেছিল আর ভগবানকে বলেছিল মুখপোড়া, বিরজা মেয়েমানুষ বলে আজ তাকে সেই সব কাহিনী বলার সময় সে আজ কেঁদেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে গৌর রঘুকে বলল, 'তোমার কাছে এলাম রঘুদা। একটা কাণ্ড করেছি।'

'বটে?' রঘু বলল।

'ওমা, সিকি!' বলল চিন্তামণি।

গৌর তার নালিশ করার কথা বলে, মেয়েরা উৎসুক হয়ে কাছে সরে আসে। বাবুর ছেলের কান্না থামাতে একটু আদর করেই চিন্তামণি বিরক্ত হয়ে তাকে একটা চড় বসিয়ে দেয়। তাতে কান্না আরও বেড়ে গেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন উপায় না দেখে সে করে কি, কাপড়ের তলে খোকার মাথাটা ঢুকিয়ে স্তনের বোঁটা তার মুখে গুঁজে দেয়। বিরজা মুচকে একটু হাসে।

রঘু যেন আনমনে শুনে যায়, না করে কোন আওয়াজ, না দেখায় কোনরকম ঔৎসুক্য। একটু কেমন ঝিমিয়ে গেছে রঘু আজকাল, কেমন একটু নিরাসক্ত ভাব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। চল্‌তি কিছুর গতি একটু কম হওয়ার মত জীবন্ত থাকার হাজার হাজার রকমসকমগুলি আগের চেয়ে একটু শ্লথ হয়েছে—একটুখানি। দুর্গার শোক এখনো তার থাকা সম্ভব নয়, নেইও। শোক কারও চব্বিশ ঘণ্টা থাকে না।

একটা মানুষ আছে আছে হঠাৎ একটু ডুকরে কাঁদল নয় বুক চাপড়ে হায়হায় করল নয় মুখে মেঘ নামিয়ে আনল—সেটা হল শোক। রঘুর একটু বদল হয়েছে, যার বাড়া কমা নেই, যাতে অসাম্য নেই। বরাবর সে এমনি হলে লোকে জানত যে লোকটাই এমনি। কিন্তু দুর্গা মারা যাবার পর সে বদলেছে বলে সময় সময় মানুষ সেটা টের পাচ্ছে।

সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে গৌর বলে যায়, এদিকে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে আকাশে। সন্ধ্যার আগে বাবুর ছেলেকে বাড়ী ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে মুস্কিল হবে চিন্তামণির, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না শুনে সে উঠেই বা যায় কি করে? উসখুস করতে করতে সে একসময় উঠে দাঁড়ায়।

'শোন, তোমায় বলতে ভুলে গিইছি। বাবু তোমায় ডেকেছেন!'

'সকালে যাব।'

'উঁহু, আজকেই যেও। এখ্খুনি নয়, খানিক পরেই যেও কথাটথা বলে। যেও কিন্তু, হ্যাঁ। ভারি দরকার—বাবু বললেন, চিন্তামণি, গৌরকে সন্দের পর আসতে বোলো, ভারি দরকার।'

চিন্তামণি চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে গৌর রঘুকে প্রশ্ন করল, 'কি করিব বল দিকি এবার?'

'কি করবে? তাই তো বটে। মুস্কিল হল।'

ভেবেচিন্তে পরামর্শ একটা রঘু দিল, গৌরের সেটা পছন্দ হল না। মামলা যখন ঠুকেই দিয়েছে তখন মামলা চলুক, একি একটা পরামর্শ হল! মামলা করার, সাক্ষী দেওয়ার অভ্যাস রঘুর, সে কি বুঝবে প্রথম উত্তেজনা কেটে যাবার পর ফাঁদে পড়া জন্তুর মত এখন কি হচ্ছে গৌরের মধ্যে!

কিন্তু না, দুর্গা রঘুকে কাবু করে বোকা বানিয়ে দেয়নি।

'আপোষ? তুই বড় বোকা গৌর! মামলা হলে কি আপোষ হয় না? আগে আপোষের চেষ্টা যখন করিসনি, এখন চুপ করে থাক। সমন পেলে চাঁদ মাইতি নিজে আসবে নয়তো তোকে ডেকে পাঠাবে। তখন আপোষের কথা হবে।'

বিরজা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'ওকে তুমি কি শেখাবে? সাঁতরাদের ও সাত-ঘাটের জল খাইয়েছে।'

প্রশংসায় খুশী হওয়ায় রঘুর মুখে হাসি ফুটল। হাত বাড়িয়ে বিরজার বুক থেকে সে মেয়েটাকে টেনে নিল নিজের কোলে। মেয়েটা মাই টানছিল বিরজার, মুখ থেকে মাইটা ছেড়ে যাবার সময় একটা শব্দ হল অদ্ভুত, যুবক-যুবতীর সাবেগ ও

স্বাধীন চুম্বনের মত।

গৌর বিদায় নিচ্ছে, রঘু শুধোল, ফসল বেচে দিয়েছে তোর কাকা? ব্যাপার ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না রঘু। অনেকে বেচছে। কত লোক দর দিচ্ছে, বেঁচার জন্য ফুসলাচ্ছে, সবুর সইছে না। মাঠের মাল বেচাকেনা হয়, এত তাগিদ কিসের এবার?'

'ঠিক। আমিও তাই ভাবছি। মিল কটার তাগিদ বেশী—আর ওই ভুবন সা আর বাঁড়ুয্যের। বেচবে নাকি?

'নাঃ। ধরে রাখছি।'

হরেনাম রাইস মিলের পূবের প্রাচীর ঘেঁষে বড় রাস্তা থেকে নীলকণ্ঠের বাড়ীর সদর পর্যন্ত কাঁকড়ের সড়ক। আধখানা চাঁদের মৃদু আলোয় এই সড়ক ধরে গৌর চলেছে, প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোট দুয়ারটির ওপাশ থেকে চিন্তামণি চাপা গলায় ডাকল, 'এই! এই! গৌর? এই!'

গৌর ভাবছিল তার সঙ্গে নীলকণ্ঠের হঠাৎ কি জরুরী দরকার পড়ল, ডাক শুনে সে চমকে উঠে ভড়কে গেল একেবারে। আরও ভড়কে গেল চিন্তামণি যখন দুয়ারটা ভেতর থেকে বন্ধ করে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল মিল অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নির্জনতায়, টিনের সেডটার গোপন আড়ালে। চমক লাগার দপদপানি কমবার আগেই বুকটা তার টিপ টিপ করতে লাগল অসম্ভব কল্পনায়।

মিলের কাজ একরকম বন্ধ হয়ে আছে আজকাল, যদিও নতুন ধান নিয়ে জোর কাজ আরম্ভ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। পাকা উঠানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে ধানের মড়াইএর চালার মত ধানঢাকা মটকাগুলি,—শেডের ভেতর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় রহস্যের মত কিছু একটা নিশ্চয় চাপা দেয়া আছে ওগুলির তলে, তলার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এসে উঠানময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে চোখের ধাঁধার মত।

কি সে না শুনেছে আর কি সে না জানে নারীপুরুষের ব্যাপার? তবু ক্ষণে ক্ষণে হৃদ্‌কম্প হতে থাকে গৌরাঙ্গের। মানুষ কি বলে আর কি করে মেয়েমানুষকে নিয়ে এ অবস্থায়? চিন্তামণি যদি হেসে ফেলে! চিন্তামণি যদি নীলকণ্ঠের সেই বড় মেয়ে তরুবালার মত গালে টোকা মেরে বলে, 'আ মরণ্!'

'রাগ করেছ? বাবুর নাম করে ডেকে এনেছি বলে?'

'উঁহুঁ। না।'

'ওদের সামনে কি করে বলি আমার সাথে দেখা কোরো? তাইতো বাবুর নাম করলাম।'

'বাবু ডাকেনি?'

'না গো না। আমি ডেকেছি, সব শুনব বলে। না শুনে যে চলে এলাম। তবু কত কথা শোনালে মাগী একটু দেরীর জন্যে, দাসী বৈ তো নই! তারপর কি হল? ওই যে বলছিলে ফসল বিক্রী করে দিয়েছে না কি করেছে তোমার কাকা?'

গৌর একটু ধাতস্থ হয়। একটু জ্বালাও বোধ করে কেমন এক ধরণের।

'এই জন্য ডেকেছ? সকালে শুনলে হ'ত না?'

'রাতে ঘুম হত ভেবেছ আমার?'

শুনে দেহমন যেন চোখের পলকে উল্লসিত হয়ে সাম্য লাভ করায় গৌরের ভয়ভাবনা উপে গেল। উঁচু টানে বাঁধা তারের মত টনটন রণরণ করতে লাগল সে।

সহজ সরল ভাবে সে বলে গেল সব কথা। রঘুকে যতটা বলেছিল তার চেয়ে বেশী; অন্য ভাষায়, অন্য কায়দায়। তার ভয় ভাবনা আপশোষের কথা সে বর্ণনায় আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে গেল।

চিন্তামণি জোর দিয়ে বলল, 'না, মামলা কোরো না। কাল গিয়ে বাতিল করে দিও নালিশ। আপোষে যদি পাও তো পাবে নইলে কাজ নেই।'

'টাকাটা মাঠে মারা যাবে নালিশের।'

'বোকার মত কাজ করলে ওমনি যায়।'

অতি বেশী অন্তরঙ্গ আপনজনের মত চিন্তামণির এই বকুনি শুনে গৌরের সাহস যেন বেড়ে গেল। শেড়ে ভেজা ধানের পচাটে গন্ধ অনুভব করতে করতে ফাটল ধরা চোকলা ওঠা সিমেন্টের নোংরা মেঝেতে ঘষরে গিয়ে সে চিন্তামণির গা ঘেঁষল। চিন্তামণি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আ মরণ!'

চার

ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। ঋণের বোঝায় চাষী কাতর। ফসল ঘরে তোলা তক্ কটা দিনও কিছুতে কাটাতে না পেরে এখনো বাজু পৈছা ঘটি বাটি বাঁধা পড়েছে। পেট ভরে কজনেই বা কবে তারা খায়, এখন তাতেও টানাটানি পড়েছে ফসল তোলার আগে, সিকি থেকে আধেক নেমে গেছে সেই অ্যাত্‌টুকু খোরাক। মাটির কুঁড়েয় কজনেই বা কবে তারা হাসে, এটুকু তবু যে ভোঁতাটে খুসী খুসী দেখাত তাদের মুখ সে মুখে ঘনিয়েছে প্রাণহানিকর বিমর্ষতা। মাঠে মাঠে এমন যে ভাল ফসল হয়েছে এবার, তা দেখেও না জুড়োচ্ছে তাদের চোখ, না থামছে দেহমনের শোষমানা শান্তশিষ্ট নালিশ-ভোলা জ্বালা। এমন দিনে চাষী হয়েও গৌরের মনে কিনা থৈ থৈ করছে মহুয়ার মিঠে নেশার মত সুখের মাতলামি! একটা মা নিয়ে তার সংসার, সে সংসার ঘাড়ে চেপেছে এই সেদিন, সে কি জানবে চাষ করে বাঁচার কত মজা! চাঁদ বেশ কৃপণ আর হিসেবী। তার সাথে থাকার সময় বরং গৌর খানিক খানিক স্বাদ পেয়েছে গরীব চাষীর খাওয়া পরার কষ্টের। শুধু ওই কষ্ট, মনের কিছু নয়। অনেকের দায়িক হয়ে অবিরাম ঠেঙ্গানো খাওয়া ভীরু মন ভাবনার ভারে যে ভাবে ধুঁকতে থাকে সেটা সে এখনো শিখতে পারেনি। কম করে শ'খানেক ওরকম আধমরা মানুষের সঙ্গে তার জানা শোনা আছে, তবু। চাঁদকাকার কাছে ভাগ পেয়ে সবে ভিন্ন হয়ে মা আর গাইটা পুষে সে একরকম সুখেই আছে এখনো। গাইটিও আবার রোজগেরে। অঢেল প্রেমে গা ঢেলে দিতে তার বাধা কই?

চিন্তা বলে যায়, 'আজ যেও।'

বলে যায় সাঁঝের আগে। তারপর সন্ধ্যা নামে তো রাত আর বাড়ে না গৌরের। মন-যত চনমন করে অধীরতায়, গা যেন ততই থমথম করে ধৈর্য ধরার জ্বরে। সেদিনের চাঁদ ক্ষয়ে গেছে অনেকখানি, মাঝ রাত্রি পেরিয়ে তবে ওঠে। মাঝ রাত্রির অনেক আগেই গৌর তারার আলোয় পথ দেখে রওনা দেয় হরের্নাম রাইস্ মিলের দিকে।

মা বলে, 'কুথা যাস বাবা? রেতে?'

'রঘুর সাথে সলা আছে।'

দরজার হুড়কো খোলা তক মা চুপ মেরে থাকে। তারপর আচমকা বলে, 'বিয়া করলে হয়। রেত বিরেতে বাইরে যাওয়া ভাল না বাবা।' বাইরে যেতে নিষেধ করা নয়, সমালোচনা নয়। একটু বিবেচনা করতে বলা, ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখতে বলা যে একটা বিয়ে করলেই যখন চলে, এত হাঙ্গামার কাজ কি।

'ও সব কিছু না। কপাট দে।'

তা বটে। বিয়ে একটা করলে হয়। চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে কথাটা বেশী করে গৌরের মনে জাগছে, মার মনে পড়িয়ে দেবার কোন দরকার ছিল না। বিয়ে করার মানেও যেন তার কাছে বদলে গেছে, একটা অস্পষ্ট অভাব বোধের চাপ পরিণত হয়েছে নতুন পীড়িতের মন-কেমন করা ঔৎসুক্যে। চিন্তামণির জন্য সারাদিন তার ছটফট করার ভাগ কচি বয়সের বাড়ন্ত বৌদের পাওনা হচ্ছে, তাকে তারা টানছে চিন্তামণিকে নিজেদের টান ধার দিয়ে। নইলে চালকলের দিকে রওনা দিয়েও যার জন্য রওনা দেওয়া সেই একজনকে ছাড়া তার কেন মনে পড়বে ভোলার মেয়ে কালী, রঘুর ভগ্নী পাঁচী, কেষ্ট শম্ভু পরাণ রসিকদের নতুন বৌ আর দাঁতপুরে তার মামাবাড়ীর পাড়ায় যে একটা মোটা সোটা মেয়ে থাকে, এদের কথা? এসব ভাল লাগে না গৌরের। ভেসে যাওয়ার সুখে মসগুল হয়ে তীরে ওঠার কথা ভাবে, একি জলের বানে ভাসা নাকি তার, অ্যাঁ?

চাষীর গাঁ কখন ঘুমিয়েছে, তার কত পরে বাবুর বাড়ী সংসারের পাট শেষ হয়ে ঘরে ঘরে আলো নিভেছে আন্দাজ করে সে পথে বেরিয়েছে। হয়তো এই একটানা দীর্ঘ প্রতীক্ষার উত্তেজনা শেষ হওয়ার সময় এসেছে বলেই মনটা তার বিমর্ষ হয়ে ঝিমিয়ে যায়। এ প্রণয় তার জুড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে একটা তামাসায় দাঁড়িয়ে যাবে? সে তামাসা আজ কি গৌরের সয়!

ঘেরা শেডের নীচে পচা ধানের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, কিন্তু তারপর চিন্তামণি এলে তার একরাশি চুলে পচা নারকেল তেলের গন্ধ তাকে বাঁচায়। চোখের পলকে সে টের পায় চিন্তামণিকে ছাড়া সে তো বাঁচবে না!

কিছু রাত হাতে রেখে চিন্তামণি বলে, 'ইবারে এসো। এট্টু না ঘুমোলি বাঁচবোনি।'

শক্ত মেঝেতে শুধু একটা চাদর বিছানো বালিশহীন শয্যা ছেড়ে গৌর উঠতে চায় না। বেজার হয়ে বলে, 'কাল ঘুমিয়ো, দুকুর বেলা।'

চিন্তামণির হাসির সঙ্গে হাই উঠে।—'কাজ নেই কো? মোর কাছে বাচ্চা

দুটো গছিয়ে গিন্নিমা দুপুরে ঘুমোয়। মজার কথা বলি শোন, ঘুমুলে গিন্নিমার নাক ডাকে! মাইরি বলছি—তোমায় ছুঁয়ে। মেয়ে মানুষের নাক ডাকা। হাসি যা পায়।' আবার হাই তুলে চিন্তামণি বলে, 'দিন-ভোর খাটতে হয়। ঘুম পাচ্ছে, সত্যি। দুটি ভাতের জন্যে দেহ পাত করে খাটছি। ভাতার তো নেই দুটি ভাত যোগাবে পোড়া পেটের জন্যে।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে এই কথাটা দু' একবার বলে চিন্তামণি, তার কেউ নেই বলে পেটের জ্বালায় দাসীগিরি করে তার জীবন গেল। শুনে মন খারাপ হয়ে যায় গৌরের। দরদ আর সহানুভূতিতে বুকটা তার ব্যথা করে।

'সত্যি, পরের খাওয়া বড় কষ্ট।'

এত রাতে আদর দিয়ে তার এই কষ্ট দূর করার চেষ্টা চিন্তামণি কাঠ হয়ে গ্রহণ করে। তারপর সে এলিয়ে যায়। তারও পরে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে।

গৌর প্রথমে শুধোয়, 'ঘুমোলে নাকি?' তারপর চোখের জলের সন্ধান পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে তার কান্না কেন, কিসের জন্য। শেষে গভীর দুঃখে আর অভিমানে কাতর হয়ে উঠে বসে বিড়ি ধরায়, নিজের হাঁটু মোড়া পা দুটিকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে।

তখন এক কাণ্ড ঘটে অদ্ভুত। তার পায়ের পাতায় হাত রেখে সলজ্জ খেদের স্বরে চিন্তামণি বলে, 'মাপ করো। শুনছ? মাপ চাইছি তোমার ঠেঁয়ে। আর কিছু চাইনে আমি, সত্যি চাইনে। যদি চাইতো খান্‌কি বোলো মোকে।'

ঘুমে যে ঝিমিয়ে গিয়েছিলে এমন হঠাৎ তার আবেগের তীব্রতায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গৌরের। পা ছেড়ে মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে এত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে চিন্তামণি যে এক মুহূর্তে যুবক গৌর নিজের কাছে শিশু হয়ে যায়।

ভোরের আগে একটু শীত শীত ভাব দেখা দিয়েছে। বাড়ী ফেরার পথে শান্ত অবসন্ন মন দিয়ে গৌর বুঝবার চেষ্টা করে, তার কাছে কি চায় না চিন্তামণি, কি চাইবে না কখনো। এর মধ্যে কোনদিন সে কি কিছু চেয়েছিল তার কাছে, কোন আবদার জানিয়েছিল, সে কানে তোলেনি? সে কি পয়সা কড়ি চায় তার কাছে? কাপড় গয়না? মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞেস করতেও খেয়াল হয়নি বলে গৌরের আপশোসের সীমা থাকে না।

পরদিন দুধ নিতে এলে দেখা গেল চিন্তামণির মুখচোখ ভারি দেখাচ্ছে। একনজর তাকিয়েই গৌরের মনে হল সে ভয়ানক রাগ করেছে, মুখ ভার করে

আছে দুরন্ত অভিমানে। তাদের ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছু যে ঘটতে পারে জগতে গৌরের আজকাল সেটা খেয়াল হতে চায় না।

'না না। রাগ করিনি। গিন্নিমাকে ফাঁকি দিয়ে দুকুরে খুব একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছি। তুমি বললে না কাল?'

'জ্বরজারি হয়নি তো?'

'এট্টু হয়েছে।' দুধ দোয়া বন্ধ করে গৌর ফিরে তাকাতে সে বাঁকা চোখে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'পীরিতের জ্বর গো। তোমায় দেখে সারল।'

গাই বাছুরের গা চাটে, দুধের পাত্রে চোঁক-চোঁক শব্দ হয়, মৃদুস্বরে তারা আলাপ করে। গৌরের প্রশ্নের জবাবে চিন্তামণি গভীর এক রহস্য সৃষ্টি করে জানায় যে কই, সে তো কিছু চায়নি গৌরের কাছে। কিছু যদি তার চাওয়ার থাকেই, গৌর নিজে থেকে তাকে তা দেবে, সে চাইতে যাবে কেন! তবে কিনা, একটু ভয় করছে চিন্তামণির, এভাবে কতদিন তাদের দেখাশোনা চলবে? রোজ তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ দেখে গিন্নিমা বোধহয় সন্দেহ করেছে মনে হয়। এমন করে তাকাচ্ছে গিন্নিমা আজ কদিন থেকে, এমন সব কথা বলছে তাকে বকবার সময়!

'আজ আবার পটলবাবু মস্ত একটা তালা সেঁটে দিয়েছে মোদের ঘরটার কপাটে।'

'জেনেছে নাকি পটলবাবু?'

গৌরের বিবর্ণ মুখ দেখে আর তার সচকিত প্রশ্ন শুনে চিন্তামণি খানিক তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, শেষে নীচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে নিয়ে বলল, 'নতুন ধান আসবে বলে তালা দিতে পারে।'

'জানাজানি হলে মুস্কিল।'

'কি মুস্কিল। কার মুস্কিল! তোমার নাকি?'

গৌর চুপ করে থাকায় সে আবার বলল, 'তুমি তো পুরুষ মানুষ।'

পাকা লোক হলে গৌর মনে করিয়ে দিতে পারত যে সে বিদেশিনী, শুধু দেশে ফিরে গেলেই যার আসান হয় সে আর এমন কি মুস্কিল! অত হিসাব গৌর এখনো শেখেনি।

'তোমার আমার দু'জনেরি মুস্কিল। তুমি কি করবে?'

'কি আর করব, দেশে চলে যাব।'

তা বটে। চিন্তামণির সে উপায় আছে। আটকা পড়বে সে, তার তো পালাবার পথ নেই। অবেলার ঘুমে চিন্তামণির ভারি মুখ যে অন্ধকার হয়ে এসেছে

গৌরের আর তা নজরে পড়ল না। নিজের মুখ তার শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। তার গোপন প্রেমের অনেকগুলি বিপজ্জনক পরিণতির সম্ভাবনা আচমকা হুড়মুড় করে তার বুদ্ধি-বিবেচনার ঘাড়ে এসে পড়ায় সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ঘুরে ফিরে একটা কথাই কেবল তার মনে পড়তে থাকে যে এ শুধু তার চাষীর সমাজে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের জানাজানির ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে যোগ আছে বাবুদের। চিন্তামণিকে মধুবনীতে নিয়ে এসেছে পটলবাবু। বাবুরা যদি তাকে শাস্তি দেয়, যদি বিপদে ফেলে, যদি জেল খাটায়, জানাজানি হয়ে গেলে! চাষীর সমাজে তার শুধু একটু দুর্নাম হবে, কিন্তু বাবুরা রাগী, মানী, নিষ্ঠুর মানুষ, প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের গায়ের জ্বালা কি জুড়োবে সহজে!

পরদিন সকালে গৌর মামাবাড়ী রওনা হয়ে গেল। তার মনে হল, কদিন একটু দূরে গিয়ে থেকে আসাই ভাল। রঘুকে বলে গেল, মাকে যেন দেখাশুনা করে, গরু দুইয়ে দুধ যেন যোগাড় দেয় বাবুর বাড়ী।

'মামাবাড়ী হঠাৎ কেনে?'

'বড়মামা একটা বাছুর দেবে বলেছিল, নিয়ে আসি।'

গৌরের মামাবাড়ী দাঁতপুরে! বাসে প্রায় আধঘণ্টার পর পৃথীপুর, সেখান থেকে দু'কোশ দূরে সিউতি নদী পেরিয়ে দাঁতপুর। নদী খুব চওড়া কিন্তু মোটেই গভীর নয়, দুটি তীর নদীর তল থেকে মানুষ সমান উঁচু হবে কি হবে না। বর্ষার ক'মাস নদীতে লাল জলের স্রোত বয়ে যায়, ময়লা থিতিয়ে জল পরিষ্কার হতে না হতে জল যায় ফুরিয়ে। এক তীর ঘেঁষে ছোট একটি ঝরণার মত স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে যায়, নদীর বিস্তীর্ণ সমতল বুকে বালি চিক চিক করে!

বাস আজকাল বন্ধ। ট্রেনে চেপে গৌর সিউতি নদীর পুল পেরিয়ে সানকানি ষ্টেশনে নামল। এদিকে শালবন বেশী, ছোট ষ্টেশনটি লাল কাঁকড় বিছানো প্ল্যাট-ফর্মে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে কিছুদূর গিয়েই রেললাইনের দুপাশে শালবন সুরু হয়েছে।

ষ্টেশনের বাইরে একদল সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো কোথায় কুলির কাজ করতে যাবে, রান্নাখাওয়ার জন্য এবেলা এইখানে ঠাঁই গেড়েছে। কালো মাটির হাঁড়িতে ভাত চেপেছে, কুপিয়ে কাটা হচ্ছে মোটা একটা ঢ্যামনা সাপ। রান্নার এই মাটির হাঁড়ি কুড়ি সব সঙ্গে নিয়েই এরা রওনা দেবে, পুরুষ ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা টানবে শালপাতা পাকানো মোটা বিড়ি, মায়েরা কাপড় দিয়ে শিশুদের বেঁধে নেবে পিঠে। সাঁওতালদের চাষের কাজ অতি সামান্য, বনের ধারে বা বনের মধ্যে জঙ্গল সাফ করে যেমন তেমন খানিক ফসল ফলায়, তাও

সকলে নয়। তবু এদের বড় ভাল লাগে গৌরের, জন্ম থেকে এদের চলাফেরা দেখে এলেও ওরা তার মনে একটা রহস্যের সৃষ্টি করে রেখেছে, একটি ছিপছিপে কিন্তু পরিপুষ্ট সাঁওতালী মেয়েকে বিয়ে করার অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা আজও তার মনে উঁকি দিয়ে যায়। অমন মেয়ে চাষীর ঘরে জন্মায় না।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক বেলায় মামাবাড়ীর কাছাকাছি পৌছে গৌরের কানে এল একক একটি শানাই-এর সুর। শানাই শুনলে গৌরের মন কেমন উদাস হয়ে যায়, মনে হয় বাকী জীবনটা ঠাকুরদেবতাকে ভক্তি করে, গুরুজনকে মান্য করে আর পরস্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে কেবল ভাল কাজ করে কাটিয়ে দেওয়া চাই। সে মরলে সবাই যেন বলে, লোকটা বড় ভাল ছিল গো।

গৌরের মামাদের মস্ত সংসার, পায়ের ধুলো নেওয়া দেওয়ার পালা সাঙ্গ করে গৌর শুধোল, 'শানাই বাজে কার বাড়ী গো ?'

'কুনুর মেয়্যার বিয়া—লক্ষীর। সেই যে মুটকী মেয়েটা ঘন ঘন আসত মোদের বাড়ী—'

'বটে !'

বর আজ এসে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলা বিয়ে। আজ কুটুম ভোজন কাল স্বজাতি ভোজন হবে। কুনুর নাকি ভয়ানক ফাঁকি দেবার মতলব আছে শোনা যাচ্ছে, দই চিঁড়ে আর মোটে একটা করে মিষ্টি দিয়ে সেরে দেবে। জোড়া মিষ্টি না দিলে গোলমাল হবে শোনা যাচ্ছে। কুটুমদের দেবে জোড়া মিষ্টি আর মোয়া স্বজাতির বেলা শুধু একটা মিষ্টি—সইবে কেন স্বজাতিরা ?

'তোর বিয়েতে নুচি খাব গৌর।'

বড়মামী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল। বড়মামী জীবনে আঁতুরে গিয়েছে সতেরবার, একটা বয়সে স্ত্রীলোকমাত্রেরই সন্তান ধারণের ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবার ব্যবস্থা বিধাতার না থাকলে হয়তো আরও দু'চারবার যেত। সতরটি এলেও আটটি সন্তান অতি শৈশবে এবং দুটি অল্প বয়সে চলে গিয়েছে তাই রক্ষা। সাতটির মধ্যে তিনটি মেয়ে পরেরা ঘরে নিয়ে পুষছে, তাও রক্ষা। তাছাড়া, সবগুলি এসে পড়বার আগেই বড় দুটি ছেলে পরপর বড় হয়ে পরপর রোজগার করতে শিখেছে। শেষ বিয়োনোর পর দু'বছর কেটে গেছে, কেন বেঁচে আছে না জেনেই বড়মামী টিকে আছে ক্ষয়রোগিনীর মত জীর্ণ শীর্ণ শরীর নিয়ে। জ্বর হয় মরে না, কাসি হয় মরে না, হজম না হওয়ায় প্রায়ই কাপড় বিছানা নষ্ট করে আর নিজের মনে অনর্গল কথা বলে বেঁচে থাকে।

বড়মামা অদ্বৈতের বয়স ষাট হবে। চুল টুল পেকে সে বুড়ো হয়নি কিন্তু বৈষ্ণব হয়েছে।

তার অসাধারণ কৃষ্ণ ভক্তির কথা দাঁতপুর আর আশে পাশের গাঁয়ে ছড়িয়ে গেছে। কত লোক স্বচক্ষে দেখেছে কৃষ্ণলীলার যাত্রার গান ভেঙ্গে চুরে গাইতে গাইতে দু'চোখে তার জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

এত লোকের মধ্যে সেই প্রথম উদাসীন আপনভোলা স্বরে গৌরের আসবার কারণ জিজ্ঞেস করল।

'বাছুর? বকনাটা? তোকে দিব কথা ছিল না কি বটে?'

'ছিল না? মা'কে নাহক্ বিশবার বলেছ দুধ ছাড়লে পাঠিয়ে দেবে, মাস দুয়েকের মধ্যে নয়তো খবর দেবে, আমি এসে লিয়ে যাব। ও বাছুর আমার মামা, দিতে হবে, চালাকি নয়, হাঁ।'

অদ্বৈত চোখ বুজে গদগদ হয়ে বলল, 'অ গৌর, তোর ভাগ্যি ভাল, বড় ভাল তোর ভাগ্যি।'

গৌর সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিসে?'

'বাছুরটি প্রভু গরৃহণ করেছেন।'

অদ্বৈতের গুরুঠাকুর এসেছিলেন মাঝখানে, যাবার সময় পাটল রঙের বাছুরটির গলার দড়ি স্বয়ং শ্রীহস্তে ধারণ করে নিয়ে গেছেন। বাছুরটি আগেই যখন গৌরকে দেওয়া হয়েছিল, পুণ্যটা তারই হয়েছে সন্দেহ কি!

'জানিস গৌর, অ বাবা জানিস? বলি শোন তোকে। শোন কি অবাক কাণ্ড। যাবার আগে বলা নেই কওয়া নেই প্রভু তোর কথা শুধোলেন। তখন টের পাইনি, আজ জানছি, তেনা জানতেন্। কিরপা করলেন তোকে। ভক্তির লেশটুকুতো মনে তোর নাই কিনা তাই তোর বাছুরটি গরৃহণ করে তোকে কিরপা করলেন।'

গৌরাঙ্গ থ' বনে থাকে, আপশোসে আর বিস্ময়ে। কুনুর মোটা মোটা মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে শুনে মনটা তার মস্ত একটা ক্ষতি বোধের চাবুক খেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ছিল ন্যায্য পাওনা ফসকে যাওয়ার ক্ষোভ। এ আরেকটা ক্ষতি, পাওনায় ফাঁকি পড়ায় কিন্তু ভাল করে ক্ষুব্ধ সে হতে পারল না। তার বাছুরটি একজন বাগিয়ে নিয়েছে ভেবে সে রেগে উঠতে যায়, কিন্তু সেই একজনটি এমন আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে মামারা তাকে বাছুরটি দিয়েছে একথা না জেনেও জানতে পারেন বলে রাগ আর তার করা হয় না।

পুঁই ডাঁটার চচ্চরি আর কুচো চিংড়ির টক দিয়ে তিনটে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে সে ভাত খায়। কাঁসার ভাত শেষ করে একবার চেয়ে ছোট একমুঠো ভাত পেয়েও আবার সে ভাত চাইতে তার মেজ-সেজ দুই মামী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আর দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে অনেক দুঃখের পোড়া একটু হাসি হেসে গৌরকে আরও ভাত দেয়! ভাগ্নে এসেছে মামার বাড়ী, নিজেরা উপোস দিয়েও তার পেটটা ভরাতে হবে বৈ-কি মামীদের।

গৌরের মামাদের অবস্থা চিরদিনই মন্দ, দুর্বৎসরে বড় কষ্টে দিন যায়। কিন্তু মানুষ তারা পরম শান্ত, সন্তুষ্ট এবং ধার্মিক, একান্নবর্তী আদর্শ চাষীর পরিবার। গোঁয়ার শুধু গৌরের ছোট মামা রাধাচরণ। তার ঘরে মন নেই, চাষে মন নেই। গাঁয়ে মন নেই। বছরে দু'তিন মাসের বেশী সে বাড়ী থাকে না। কোথায় যায়, কি করে স্পষ্ট করে কোনদিন সে কিছু বলেনা, হঠাৎ একদিন কিছু টাকা নিয়ে বাড়ী আসে, বাকী খাজনা বা ঋণ বা অন্যান্য আপদ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয় সংসারকে তখনকার মত, কিছুদিন পরে আবার উধাও হয়ে যায়।

অদ্বৈত বলে, 'মজুরগিরি করে নির্ঘাৎ, কুলি খাটে। চেহারা দেখছ না মজুরের মত হচ্ছে দিনকে দিন?'

কেউ বলে, 'মজুরগিরি করে টাকা আনবে ইস্ রে!'

অদ্বৈত বলে, 'ভারি টাকা। বিশ পঁচিশটাকার বেশী টাকা এনেছে কোনবার?'

গৌরের এই ছোট মামাটির একখানি চিঠি এসেছে অদ্বৈতের নামে দিন তিনেক আগে, এখনো সেই চিঠি নিয়ে পাড়াশুদ্ধ মামার বাড়ীটি সরগরম হয়ে আছে। কলকাতার কাশীপুর থেকে শতকোটি প্রণাম দিয়ে রাধাচরণ নিবেদন জানিয়েছে যে চার চারটে জোয়ান মদ্দ পুরুষের বাড়ীতে বসে থাকার কি দরকার আছে বাড়ীর ভাত ধ্বংস করে? বড় আর মেজ ভায়ের বয়স বেশী—তারা ঘরে থেকে চাষ আবাদ দেখুক, তার, সেজভাই আর যোয়ান ভাইপোরা চলে যাক তার কাছে সেই কলকাতার কাশীপুরে, কাজ করে রোজগার করুক তার মত। সে কাজ জুটিয়ে দেবে।

গৌরের কৌতুহল জাগে। 'কি কাজ লেখেনি কো?'

'লিখবার দরকার? মজুরগিরি, কুলিগিরি কাজ, আবার কি। জানিস গৌর, পরভু বলেন, ওটা কংসের সম্বন্দির অবতার, আমার ওই ভাইটা। সংসারটা ওই ছারেখারে দেবে। বাপের কোন অভাব ছিল মোদের? জমিজমা, গাইগরু,

গাছপুকুর সব ছিল সে থাকার মত। ওটার জন্মো থেকে অবস্থা পড়তে লাগলো মোদের।'

নাম জপের প্রক্রিয়ায় অদ্বৈতের ঠোঁট নড়তে থাকে।

'জবাব দাওনিকো?'

'দিব। জবাব দিব।'

গৌরের যোয়ান যোয়ান মামাতো ভাই রাখাল, প্রসাদ, কানাই বংশীরা মুখ বাঁকায় আর হাসে, হাসে আর মুখ বাঁকায়। ওরা প্রায় সকলেই জোতদার ভূষণ নন্দীর মজুরী করে—জমিতে, চাষের কাজে।

কুন্থর বাড়ী শানাই বাজায় চণ্ডী। সস্তা শানাই, খাওয়া আর দৈনিক চার আনা। শানাই বাজানো চণ্ডীর ব্যবসা নয়। বাড়ীতে একটা বাঁশী আছে, আশে পাশে গাঁয়ের কেউ ডাকলে বাজিয়ে আসে। পোঁ ধরারও কেউ তার সঙ্গে থাকে না। তবু তার সেই বেসুরা বেতালা শানাই গৌরকে উতলা করে দেয়। রাত্রে চাটায়ে শুয়ে শানাইয়ের সুর কানে না এলেও ব্যাকুলতা তার বেড়েই চলে। হাঙ্গামার ভয়ে গণ্ডগোলের প্রথম চোটটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই সে যে পালিয়ে এসেছে এ চিন্তাটিকে সারাদিন আমল দিতে অস্বীকার করেই নিজের কাছে সাফাই গাওয়ার প্রয়োজনকে সে এড়িয়ে গেছে, এখন এসব ভণ্ডামি তার ভাল লাগে না, কাজেও লাগে না।

চিন্তামণির দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। নীলকণ্ঠবাবু তাড়িয়ে দিলে সে হয়তো তার বাড়ীতে আসবে তার খোঁজে, কিন্তু তাকে কিছু না জানিয়ে সে মামাবাড়ী চলে গিয়েছে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে। ভাববে, এমনিই হয়, গৌরেব মত লোকের সঙ্গে পীরিত করলে এমনিই হয় শেষতক্।

মামাদের সঙ্গে সে দুপুরে কুন্থর বাড়ী ফলার করতে গেল। বিয়ে আজ গোধূলি লগ্নে কিন্তু জাতভায়েরা অনুমোদন না করলে বিয়ে হতে পারবে না। দুপুরে সকলের ভোজনটা হবে অনুমোদন। প্রায় জন ত্রিশেক লোক হয়েছে, ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে। এদের মাত্‌বর নবকান্ত মাইতি। তারই আশে পাশে এলোমেলো ভাবে বসে বয়স্কেরা জোড়ায় দু'জোড়ায় নানা কথা আলাপ করছে আর মাঝে মাঝে খিদেয় কাতর ছেলেমেয়েগুলির ওপর খিঁচিয়ে উঠে চড় চাপড় মারছে। কুন্থ দু'বার জোড় হাতে সকলকে তাগিদ দিয়েছে কিন্তু কেউ উঠে গিয়ে খেতে বসেনি। খিদে পেয়েছে সকলেরই, খিদে নিয়েই সকলে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে, কিন্তু খাওয়া সম্বন্ধে সবাই যেন একান্ত উদাসীন!

কুন্নু আবার আসে, বলে, 'বেলা যে অনেক হল! দয়া করে গা তুলতে আজ্ঞা হয় মাইতি মশয়।'

এবার নবকান্ত বলে, 'কুটুমদের একগণ্ডা মিষ্টি মিলেছে কুন্নু ?'

'একগণ্ডা ?' কুন্নু কপালে চোখ তুলে জবাব দেয় 'একটার বেশী মিষ্টি দেবার খেমতা আছে যে দেব? একটা মিষ্টি দিইছি, নার্কলে—। আপনাদের জন্যে চন্দ্রপুরি আর মোয়া।'

'মোয়া ?'

'মুড়কি নয়তো মোয়া, যার যা পছন্দ।'

'কটা মোয়া ?'

কুন্নু একটু ভাবে। চকিতে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়।

'দুটো মোয়া। মোয়ার বদলে পোয়া মুড়কি।'

তখন সকলে গাত্রোত্থান করে খেতে গেল। কুটুমদের সমান সম্মান আদায় করা হয়েছে, এখন আর ভোজন করতে অপমান নেই।

দাওয়ায় বসে খেতে খেতে লক্ষী বার তিনেক গৌরের নজরে পড়ল। কাঁচা হলুদ মাখিয়ে মাখিয়ে তার নিজের বাদামী রঙ মেয়েরা প্রায় লোপ করে দিয়েছে। কেমন শুদ্ধ আর পবিত্র দেখাচ্ছে মোটা মেয়েটাকে।

গৌর তাকে না বলে আচমকা মামাবাড়ী চলে গিয়েছে শুনে প্রথমটা চিন্তামণি রাগে অভিমানে চারদিক অন্ধকার দেখেছিল, তারপর ভেতরে কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গিয়ে তার নিজেরই মনে হল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেছে। এমন ভীষণ ভাবে কোন মানুষের কাছে ধরা পড়ার স্বভাব তার নয়। গৌরকে নিয়ে নিজেকে একেবারে বেমালুম ভুলে যেতে বসেছিল, কি এমন মানুষটা গৌর? চালচুলো ছাড়া কিইবা আছে ওর যে ওকে নিয়ে মেতে থাকলে তার সুখের সীমা থাকবে না ? কি প্রত্যাশা আছে ওর কাছে ?

অন্ততঃ ক'দিনের জন্য গৌর দূরে চলে গেছে, দিনান্তে তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হবার সম্ভাবনাও এখন নেই, এটা খেয়াল করার সঙ্গে চিন্তামণি আজ প্রথম সচেতন হয়ে উঠল, মনটা তার কিভাবে গৌরময় হয়ে উঠেছিল দিন দিন। ঘুম ভেঙে সে ভাবতে আরম্ভ করত গৌরের কথা, দেখা হলে কি বলবে, কি করবে আর কি হবে এই কথাই ভাবত বিভোর হয়ে সারাটা দিন। বাড়ীর গিন্নি আর তার মেয়ের কাছে এজন্য কতবার যে বকুনি খেয়েছে, যা হয়েছে তার জন্য

চিন্তামণির কোন আপশোস নেই। অপরূপ স্বপ্ন দেখার ত
ভরাট হয়ে আছে। গৌরের কথা সে এখনো ভাববে, (
করছে তাও মানবে, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আর নয়। ‹
নিজেকে, চারিদিকে তাকাতে হবে। দু'একজন যে কাক
কিছু প্রত্যাশা করা যায় এমন দু' একজন, তাদের সম্বন্ধে ·
তার চলবে না। গোপনে দু'দণ্ড দেখা দেওয়া ছাড়া গৌ
জানে। তাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে বসবাস করার
থাকলেও ভরসা পাবে না। জানাজানি হবার আশঙ্কায় (
পাংশু হয়ে গিয়েছিল চিন্তামণি তা ভুলতে পারেনি।

এই জ্বালাটাই তার বেশী। যোয়ান ছেলে, মা ছাড়া সংসা... কোথাও কারও কাছে বাঁধন নেই কোনরকম, তার কেন এত ভয় তাকে নিয়ে ঘর করার, তাকে ভাত কাপড় দেবার ! পটলের অস্তিত্বই সে একরকম ভুলে গিয়েছিল। চিঠিপত্র লেখা আর পড়ার কাজটা আজকাল তার গৌরই করে দিত—পটলের মত অনায়াসে অবশ্য নয়, অতি কষ্টে। প্রত্যেক চিঠির দু'দশটা কথা সে তো পড়তে পারে নি। চিন্তামণি যেচে পটলের সঙ্গে আবার আলাপ জমায়। বলে, 'কথাই দিকি বলেন না পটলবাবু।'

পটল বলে, 'যা তোমার দেমাক।'

মুখখানা কাঁদ কাঁদ করে চিন্তামণি করুণ সুরে বলে, 'দেমাক দেখলেন ? আমার দেমাক ? দুঃখী মানুষ আমি দাসীগিরি করে খাই—'

পটল তখন মুচকে হেসে বলে, 'না করলেই হয় দাসীগিরি !'

দিনের আলোয় মানুষটার মুখের পাকামির ছাপের মধ্যে চিন্তামণি সাংসারিক বাস্তব দেনা-পাওনার সম্পর্ক গড়ে তোলার শক্ত পাকা বনিয়াদ খুঁজে পায়। এ যা নেবার নেবে, যা দেবার দেবে। তাদের দুজনের কারো বলবার থাকবে না আদান -প্রদান কোন দিন কোনপক্ষ ফাঁকি দিয়েছে। সম্পর্ক হবে সহজ সাধারণ, দিনগুলি কাটাবে নিশ্চিন্ত স্বাভাবিক সুখে। গৌরের কাছে তো চড়া নেশা আর বুক ধড় পড়ানির আনন্দই শুধু মেলে। পর পর দু'রাত্রি গৌরের জন্য বড় বেশী মন কেমন করার যন্ত্রণা সয়ে চিন্তামণির মেজাজটা তাই আরও বেশী খিচড়ে গেল। দিনের বেলা খুঁজে খুঁজে যেচে যেচে আরও বেশী আলাপ করল পটলের সঙ্গে।

পরদিন বিকালে একখানা চিঠি এল চিন্তামণির নামে। পড়ে দেবার জন্য চিঠিখানা হাতে নিয়েই পটল পকেটে পুরে দিল।

। চিন্তামণি।'

; যখন ঘুমোবে। আজ এখানে শুয়ে থাকব, বৈঠকখানায়।
, তাই হোক। গৌর কবে এসে পড়ে ঠিক নেই, আজ
াক পটলের সঙ্গে। সাতটা দিনও আর সে পার হতে দেবে
সার পাতবে। নিজের রান্না করবে নিজে, পরবে নিজের
া মাজা ঘর মোছা বিছানা পাতার কাজ করবে নিজের,
নজের পুরুষটিকে। কি জ্বালাতেই জ্বলে যাবে গৌরের

ৌর ?

সকাতর গৌরকে নানাভাবে কল্পনা করার চেষ্টায় সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়, অন্ধকারের সঙ্গে এক অজানা আতঙ্ক ঘনিয়ে আসে চিন্তামণির মনে। হিংসায় বুক ফেটে কি যাবে গৌরের ? দুঃখে সে কি মুহ্যমান হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য ? জীবনের সাধ-আহ্লাদ কিছুই কি তার অবশিষ্ট থাকবে না ? কে জানে কি করবে গৌর ! হয়তো হাঁপ ছেড়েই সে বাঁচবে যে যাক, সব চুকেবুকে গেল ! হয়তো দেখাই সে আর কোনদিন পাবে না গৌরের !

তা পাবে না। পটলের ভাড়া করা ঘরে গেলে কি করে সে গৌরের দেখা পাবে ? এ বাড়ী ছেড়ে গেলে গৌরকেও তার ছাড়তে হবে জন্মের মত।

চিন্তায় ভাবনায় যেন অম্বল হয়েছে মনে হল চিন্তামণির। না খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। বৈঠকখানায় যাবে কি যাবে না স্থির করতে করতে রাত তিনটে বাজিয়ে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ক্রুদ্ধ পটলের কাছ থেকে চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে সে তোরঙ্গে তুলে রাখল। কাউকে দিয়ে চিঠিখানা পড়িয়ে শুনবার জন্য মনটা তার এমন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল যে চারদিন পরে তার মনে হল এ যাতনা সহ্য করা যায় না। গৌরের ভাবনার চেয়ে না-পড়া চিঠির জ্বালা তার বেশী হয়েছে।

পরদিন দুপুরে গৌর ফিরে এল।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি আমি বড়নিছিপুর আসিয়াছি জানিবা। না আসিয়া কি করিব আমার কে আছে আমাকে পুষিবে। পোড়া কপালে এত কষ্ট ভগবান কেন দিয়াছিল মরিয়া গেলে সুখ পাইতাম তা মরণ অদিষ্টে নাই। তুমি আমি দুই বইন মন্দ অদিষ্ট তুমি আট টাকা পাঠাইয়াছ তাহাতে কি হইবে জিনিষপত্র আগুন হইয়াছে। বাবুরা শুদ্দ দিশা পাইতেছে না কি দিয়া কি করিবে। ছেলাপিলা মাগের ভাত কাপড় দিতে মাথায় হাত দিয়া কান্দে। তুমি আমাকে টাকা পাঠাইয়াছ তাতে কত সুখী হইয়াছি যে দিদিরে তুমি ভুলিলা না নিজে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইলা। নিজ বয়স বুঝিয়া সাবধানে চলিবা মন্দ লোক বুঝিলে কোন সংসর্গ রাখিবা না। পেটের খিদায় তুমি মধুবনী গিয়াছ ইহা আমারই অদিষ্ট। বড়নিছিপুরে আমি ভূষণবাবুর বাসায় আসিয়াছি। ভূষণবাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের হালদার মশায়ের বড় জামাই তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়াছিলাম কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রকাশ করি নাই। আমি ভূষণবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আছি। ইনি এমন ভালো লোক তাহা জানিতাম না। আমাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। খিদিরপাড়ায় বাপের বাড়ী বৌ প্রসব হইতে আসিয়াছিল তাহাকে আনিতে আসিয়া বলিলেন যে হরমণি তুমি জানাশুনা লোক তোমারে চাকরাণী হইতে বলিতে পারিব না। তুমি খাওয়া পরা পাইবা সব পাইবা আপনজনের মত ঘরে থাকিবা। বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া সব কাজ করিবা তাহাতে তোমার কিসের অপমান, আমার মা বৈন সংসারের কাজ করে না। তুমি জানিবা যে আমি নীচু জাতের মেয়ালোক আমার সহায় সম্পদ কিছু নাই ছাড়াও এখন না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছি তথাপি আমার মান রাখিলেন। ভূষণবাবুকে দেবতা বলিয়া জানিয়া পায়ধরিয়া কত কাঁদিয়াছি তাহাতে কিরূপ লজ্জিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন তুমি কেন কান্দিতেছ পায় ধরিতেছ কেন আমি নিজ কর্তব্য করিয়াছি ইহা কিছু নয় তিনি এরূপ দেবতা অপেক্ষা বড়। বড়নিছিপুরের যে মস্ত কারখানা আছে তাহাতে ইনি কাজ করেন। কারখানা তুমি কি দেখিয়াছ এখন কি হইয়াছে। সিংপাড়া গাঁয়ের চিহ্ন নাই সেখানে কারখানা বসিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া থ বনিয়া গিয়াছি।

আশীর্বাদিকা দিদি

পাঁচ

পৃথিবীতে বড় একটা যুদ্ধ বেধেছে খবর পেয়েছিল মধুবনী ও তার আশেপাশের সবাই। বাতাসে বাতাসে খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। তা যুদ্ধ যদি বেধে থাকে থাকুক, বিলাত দেশে যুদ্ধ বাধবে সেটা আশ্চর্যের কথা কি এমন, গরু শূয়োর মদ খাওয়া ম্লেচ্ছ জাত, রক্ত গরম, মাথা গরম, ওরা তো যুদ্ধ করবেই যখন তখন। হিংস্র পশুর মত ও লালমুখো জাতের পরিচয় কি আর জানতে বাকী আছে কারো। ছাব্বিশ আর পঁয়ত্রিশ সালে বাপ বলানো গুঁতোর চোটে মর্মে মর্মে টের পেয়েছে সবাই। ওরা যদি হানাহানি কাটাকাটি না করে, করবে কারা?

এই তো সেদিনও একটি কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছিল ওদের নিজেদের মধ্যে। বেশীদিনের পুরানো কথা নয় যে বুড়োদের শুধু মনে থাকবে, যোয়ানদেরও স্পষ্ট মনে আছে সে যুদ্ধের কথা। পুরো একটা যুগ ধরে এরা কি হানাহানি করে মরেনি নিজেদের মধ্যে, সাবাড় হয়ে যায়নি বেশীর ভাগ পুরুষ? মাঝখানে এতদিন যে ওরা যুদ্ধ করেনি সে তো শুধু এই জন্য যে যুদ্ধ করার পুরুষ ছিল না দেশে।

জিনিষ ওজন করা স্থগিত রেখে বাঁড়ুয্যে বলে, 'কথা তুললে যদি তো বলি শোনো রঘু। লড়াই থামলে সবাই দেখলো কি জানো? দেখলো দেশ ভরা শুধু মেয়েলোক, বুড়ী মাঝবয়সী যুবতী কিশোরী সব বয়সের গাদা গাদা মেয়েলোক—পুরুষ যে কটা হাতের আঙ্গুলে গোনা যায়, তার আবার আদ্দেক কাণা খোড়া। সর্বনাশ! এ যে জাত শুদ্ধু লোপ পাবার যোগাড়! সবাই মিলে তখন ঠিক করলে বিয়ে টিয়ে তুলে দাও, বল নাচ চালাও। বল নাচ জানো না?'

রঘু, গৌর, নিতাই, পচা, সুবলদের অজ্ঞতায় আমোদ পেয়ে বাঁড়ুয্যে বেশী করে খ্যা খ্যা করে খানিকটা হেসে ফট করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয়।

বলে, 'বল মানে ফুটবল নয় হে, গর্ভ। বল নাচ গর্ভ ধারণের নাচ, আমাদের শাস্ত্রে যাকে গর্ভাধান বলে। যেদিন যত মেয়েছেলে মাস কাবারি চান করে, তারা সবাই সেদিন থেকে বল নাচের আসরগুলিতে যায়,—সেদিন থেকে দশদিন, ব্যাস্। যে কটা পুরুষ বেঁচেছিল যুদ্ধে, কাণা খোড়া সবশুদ্ধ বলনাচের আসরে থাকে। খানিক নাচানাচি হয়, তারপর—'

বাঁড়ুয্যে গম্ভীর হয়ে বলে, 'উপায় কি বলো, জাত কি লোপ পেয়ে যাবে? আমাদের গাই গরুর কথাই ধরো। এতগুলো গাই, ষাঁড় আছে কটা? গাই নিয়ে সবাই ছোটে একটা দুটো ষাঁড়ের কাছে, উপায় কি!' যুদ্ধ বেধেছে বাধুক! যুদ্ধের জন্যই যারা এমন করে বংশবৃদ্ধি করে, যুদ্ধ করে তারা ধ্বংস হয়ে যাক!'

বিদেশে বিদেশীদের যুদ্ধ, মধুবনীর চাষীদের কি সম্পর্ক সে যুদ্ধের সঙ্গে? জাপান যুদ্ধে নেমেছে? জাপানও তো বিদেশী। বিলিতী মাল আসে মধুবনীতে, জাপানী মাল আসে। বিলাতও যেমন বিদেশ, জাপানও তাই।

বঞ্চিত নিষ্পেষিত জীবন এদের কাছে স্বাভাবিক সঙ্গত ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, সুদূরের বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করে ধীরে সুস্থে। কোনমতে বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলি এলোমেলো হয়ে থাকার চাপ। কোনদিকের চাপটা বাড়ে ক্রমে ক্রমে কোনদিকের চাপ অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে তাদের দিশাহারা করে দেয়। তেল নুন মশলার দোকানে আধলা ছিদামের বিক্রী বন্ধ হওয়ার মধ্যে তারা ব্যক্তিগত ভাবে টের পায় যুদ্ধের ধাক্কা।

জিনিষের দর বাড়ে। কতগুলি জিনিষের দাম একেবারে হয়ে যায় চড়ক গাছ! কতগুলি দরকারী জিনিষ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় বাজার থেকে। সারা মধুবনীতে বিলেতী ফুড কেনার সমস্যা চাষীদের মধ্যে এক রঘু ছাড়া আর কেউ বোধ করেনি, কিন্তু লাঙ্গলের ফাল, দা কাস্তে পেরেকের সমস্যায় ভুগেছে অনেক চাষী। নিতাই কামারের হাপর বন্ধ নয়, কিন্তু হাপর চলেছে শুধু সারাইয়ের কাজে, কিছু তৈরী হবে না, লোহা নেই। বাজারের পুরানো লোহার কারবারী রামচরণ কদিন আগে হঠাৎ এসে ডবল দাম দিয়ে লোহার গুঁড়োটির পর্যন্ত কুড়িয়ে নিয়ে গেছে নিতাই এর দোকান থেকে। নিতাই কি জানত তখন এমন ব্যাপার হবে? গরুর গাড়ীর একটা লোহার ডাণ্ডা রামচরণ কিনে নিয়ে গিয়েছিল সাড়ে পাঁচটাকায়, আড়াই টাকা লাভ হয়েছিল নিতাই-এর। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ীটার জন্য সেই ডাণ্ডা হরেকৃষ্ণবাবু কিনেছেন তের টাকায়। সাড়ে সাতটাকা লোকসান নিতাই-এর!

লাজনতলার সোমবারের হাটে কাপড় কিনত চাষীরা, আট দশ আনা চড়া দেখে দু'তিন হাট তারা কেনা বন্ধ রেখেছিল। পরের সোমবার ত্মাখে কি হাটে কাপড় এসেছে মোটে দু'চারখানা।

ইদুনাখার বরুল তাঁতি কেঁদে বলল, 'হায়রে ঝকমারি! একা বুনি দু'চারখানা তাতে কি ভাই সংসার চলে? দশজনেরটা কিনে এনে বেচে আছি দু'চার গণ্ডা লাভ পেয়ে। শালা ছিনাত নন্দী টাকা দিয়ে সাপটে সব কিনে নিল; ভাবলাম

বড় দাঁও মেরেছি। দেখবি যা নন্দীর ঠেঁয়ে, দু'য়ের তিনের কাপড়ের দর হাঁকছে সাত আট নয়। ইদিকে সুতো পাইনে মাইরি। নন্দী বেটা বলছে সুতোর আমদানী নেই, কোথা পাব সুতো! কিছু আছে দিতে পারি, তা দর কিছু বেশী লাগবে। কি দর জানো? সোনার দর! আর সালে সোনা কিনিছি ওই দরে নেতার মার নাকছাবির জন্যে। তাঁত বন্ধ গাঁয়ে। সব কটা তাঁত বন্ধ। এ কি হল কাণ্ডখানা?'

এখনো কিছু কাপড় আছে বকুল তাঁতির ঘরে। দিবারাত্রি তার স্বস্তি নেই, ঘুম নেই। যে কাপড় বেচে দিয়েছে সামান্য কিছু বেশী লাভে তার জন্যে আপশোস, বাজারের দর দেখে বাকী কাপড় ছেড়ে দেবার তাগিদ, দর আরও চড়ছে দেখে অপেক্ষা করার লোভ, দর পড়ে যাবার ভয়—কত কি চিন্তা যে ঘুরপাক খাচ্ছে বেচারীর মাথায়! সাতান্ন জোড়া কাপড় একশো তেইশ জোড়া গামছা, দু'চার-খানা গামছা আবার বেশী দরে কিনেও রেখেছে।

এসব অভ্যাস নেই বেকুলের, বেশীদিন টিকবার সাধ্য তার হয় না। ভেবে ভেবে এমন মাথা ঘোরে আর বুক ধড়ফড় করে তার যে নন্দী বাবুর লোক এসে আরও আট আনা বেশী দিতে চাওয়া মাত্র সব মাল ছেড়ে দিয়ে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'মিলের কাপড় মেলা কষ্ট।'

'মিল কাপড়ের দর চড়িয়ে দিলে। এই ফাঁকে সুতো পেলে মোদের কিছু হত।'

চালের দাম বারো টাকা। ঘরে গৌরের চাল বাড়ন্ত, দুধ বেচা পয়সা নিয়ে চাল কিনতে গিয়ে সে শোনে, চালের মণ বারো টাকা, মোটা ভাঙ্গা চাল। আড়াই টাকায় গত ফসলের যে ধান সে নিজে বেচেছে, সেই ধানের চাল বারো টাকা।

রঘুর কাছে গিয়ে সে বলে, 'এত ভারি মুস্কিলের কথা হল?'

রঘু হেসে বলে, 'ভড়কে গেলি তো? চুপ করে থাক না কদিন। তড়কানি খেলছে ওরা, যুদ্ধ লেগেছে খবর এয়েছে কিনা তাই ভেবেছে তড়কিয়ে দিয়ে মেরে নেবে ফাঁকতালে। শালার বোয়ের মাই কিনা চাল, বারো টাকা মণ বেচতে চান যুদ্ধুর নামে। কোথায় যুদ্ধ, কোথায় কি, মোর পান্তায় নেই কো ঘি। যেমন হাবা তুই, ঘাপটি মেরে থাক না বসে চুপটি করে দশটা দিন?'

'চাল যে বাড়ন্ত ঘরে, কিছু বোঝনা তুমি।'

'চাল বাড়ন্ত, চাল নে যা দু'কুনো। কথা কিসের অত?'

রেজকি যখন সবে কর্পূরের মত উড়ে যেতে আরম্ভ করেছে বাজার থেকে, গৌরের চাঁদকাকা একদিন শম্ভু সা'র দোকানে যায় তার মেয়ে পুঁটুর পায়ের মল সারাতে। ফিরে সে আসে চাপা উত্তেজনা আর মলের বদলে টাকা নিয়ে, কাগজের টাকা অবশ্য।

পুঁটু পোঁ করে কান্না ধরতেই চাঁদ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে চাপা গলায় গর্জাতে থাকে, 'চুপ যা চুপ যা, বলছি হারামজাদি। টুঁ শব্দটি করবি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।'

মেয়ে ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে চুপ করলে মুখ থেকে হাত সবিয়ে চাঁদ শুধোয়, 'কান্না কিসের শুনি?'

পুঁটু বলে, 'মল কই মোর? মল এনে দাও মোকে।'

'সারাতে দিলাম যে মল?'

পুঁটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলে, 'তবে যে বললে মাকে মল বেচে টাকা এনেছ?'

'কই বললাম। বলিনি তো, কি বললাম তুই কি শুনলি আবাগীর বেটি।' মেয়ের সন্দেহ উড়িয়ে দেবার জন্যে চাঁদ জোর করে সস্নেহ কৌতুকের হাসি হাসে, মেয়েকে কাছে টেনে তার মাথা চাপড়ে বলে, 'পরশু মল এনে দেব তোর, পরশু। হা দ্যাখ মলের রসিদ দিয়েছে শম্ভু সা।'

পকেট থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বার করে চাঁদ মেয়েকে দেখায়। তারপর আর বিলম্ব না করে ঢক্ ঢক্ করে আধঘটি জল খেয়ে যায় পাশের বাড়ীতে কালাচাঁদের কাছে।

কালাচাঁদের অবস্থা বড় শোচনীয়। ক'বছর আগেও তার অবস্থা এখানকার অনেকের চেয়ে ভাল ছিল, সারাবছর একটি দিনের তরেও বৌ ছেলেমেয়ের তার পেটভরা খাবারের অভাব হয়নি, জোতদার করালী শাসমলের অতি বড় একটা অন্যায় মেনে নিয়ে আপোষ করতে রাজী না হওয়ায় তার হয়ে গেল সর্বনাশ, মামলা মোকদ্দমায় আর একদিন অন্ধকার রাতে অজানা কার লাঠির আঘাতে ডান হাতটা দু'জায়গায় ভেঙ্গে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়ায়। কপাল মন্দ হলে যে সবদিক দিয়ে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে তার প্রমাণও কালাচাঁদ পেয়েছে, রোগের বাড়াবাড়িতে। অসুখ বিসুখ আগেও তার সংসারে ছিল, সব সংসারে যেমন থাকে, যার তাল সামলাতে রীতিমত খানিকটা বেগ পেতে হয় শুধু, কিন্তু দিন খারাপ পড়ার সঙ্গে জগতের সব রোগ যেন ভিড় করে আসছে শুধু তারই বাড়ীতে!

চাঁদ তাকে বলে, 'ঘেঁটুর মা কেমন আছে আজ কালাচাঁদ ?'

কালাচাঁদ বাঁ হাতে চোখ কচলে একটা অস্ফুট শব্দ করে, কথার চেয়ে মানে যার বেশী স্পষ্ট।

চাঁদ একেবারে তামাক সেজে থেলো হুকোয় কল্‌কে বসিয়ে টানতে টানতে এসেছিল, দাওয়ায় উবু হয়ে বসে হুঁকোটা সে এগিয়ে দেয় কালাচাঁদকে। খানিক একথা সেকথা বলে নিয়ে শুধোয়, 'পৈছেটা বেচে দেবে শুনেছিলাম, দিয়েছো নাকি ভায়া ?'

দু'বছর যার সঙ্গে সে কথা কয়নি আজ তাকে চাঁদ ভায়া বলে!

'দেব আজকালের মধ্যে।'

'অ্যাদ্দিন বেচো নি ওটা, এ বড় আশ্চর্য!'

'ঘেঁটুর মা লুকিয়ে রেখেছিল। নিশ্চিত মরবে জেনে ভয় পেয়ে তবে না ফাঁস করলে। ওটা বেচে ডাক্তার আনব, ওকে বাঁচাব, সখ কত বাঁচার! ডাক্তার এসে বাঁচিয়ে দেছে আমার ন'কড়ি, সাত কড়িকে, জন্মের মত বাঁচিয়ে দেছে। এবার এসে বাঁচাবে ওকে ?'

হুঁকোয় জোরে টান দিতে গিয়ে কাশির ধমকে দম আটকে আসবার উপক্রম হয় কালাচাঁদের, এক হাতে হাড় পাঁজর বার করা শীর্ণ বুকটা চেপে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে গিয়ে হুঁকোটা কাত হয়ে কল্কের আগুন ছড়িয়ে যায়।

'বেচবে যখন, দাও, আমিই কিনে নি।' কালাচাঁদ একটু সুস্থ হলে চাঁদ বলে, 'কিনতে একটা হবে আমার পুঁটুর জন্যে, পৈছে পৈছে করে ক্ষেপে গেছে একদম। বড়ও হয়েছে, বিয়ে শীগগির না দিলে নয়। তাই ভাবছি কি, বিয়ের সময় করতে হবে একটা, দুদিন আগেই কিনি, মেয়েটা বায়না ধরেছে যখন। মজুরি বাদে যা পড়েছিল তোমার তাই দেব'খন। রূপো আছে কতটা ওতে ?'

কালাচাদ চুপ করে থাকে। তার পক্ষে উৎসাহের একান্ত অভাবটা বড় খাপছাড়া, বড় বিচ্ছিরি লাগে চাঁদের।

'নগদ দেব—সব টাকা নগদ। বাকী কিছু রাখব না।'

'রূপোর দর খুব চড়েছে শুনলাম ?'

কথা শুনে চাঁদের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

'গৌর যাচ্ছিল কাল রাস্তা দিয়ে, ডেকে বললাম, ও বাবা গৌর, পৈছেটা বেচে দিবি বাবা কারো কাছে, দুটো টাকা যাতে বেশী পাই ? গৌর বললে—রূপোর দাম

বেড়েছে, দেড়গুণ দুগুণ টাকা। সা'র দোকানে দর কষিয়ে গৌর নিজে কিনবে বললে পৈছেটা। বলি বিয়েটিয়ে করবে না কি ভাইপো তোমার?

'কি জানি।'

'শুধিয়েছিলাম। তা চাপা দিয়ে দিলে কথাটা। মন লাগে কি, বিয়েটিয়ে করবে নয়তো পৈছে দিয়ে কি করবে ও, বৌ আছে না বোন আছে না মেয়ে আছে ওর? যোয়ান ছেলে, তুমি তো দিলে না, পিথক হয়ে নিজেই জোগার করেছে বিয়ের। ছেলেটা ভাল চাঁদ, ওর ভালো হবে। দেখে নিও ভাল হবে তোমার ভাইপোর।'

সবাই তবে জানে রূপোর দাম চড়ার খবর? কেন সবাই জানলো ভেবে বুকটা জ্বলে যেতে থাকে চাঁদের। সে একা না জেনে কেন সবাই জানল!

জ্বলতে জ্বলতে একটা কথা স্মরণ করে মনটা শান্ত হয়। মল কিনে সা তাকে শুধিয়েছিল; কাঁচা টাকা আছে চাঁদ? থাকলে এনো।' কাঁচা রূপোর পুরানো টাকা, এডোয়ার্ড মার্কা, রাণী মার্কা টাকা। চাঁদ জানে তারই বাড়ীর ঘরের ভিটিতে মাটির তলায় পোঁতা আছে এক ঘটি পুরানো টাকা, তার বুড়ী শাশুড়ীর চাটাই কাঁথার বিছানার নীচে।

প্রায় চাড়কুড়ি বয়স হবে চাঁদের শাশুড়ীর, কাঁকাল বাঁকা হয়ে সামনে নুয়ে গেছে, লোল চামড়া ঢাকা কঙ্কালসার দেহটা, লাঠি ধরে ছাড়া দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তবু এই একভাবে বুড়ী দিব্যি টিঁকে আছে চাঁদের বাড়ীতে আজ পাঁচ বছর। তবু, টাকা ওরা ঘটিটা কোলে রেখেই বুড়ীকে একদিন স্বর্গে যেতে হবে জেনে এতদিনে চাঁদ নিশ্চিন্ত ছিল। ধরতে গেলে ও টাকা তো তার নিজেরই সঞ্চয় বলা যায়।

সারাদিন চাঁদ চঞ্চল হয়ে থাকে ঘটিটার কথা ভেবে। একটা টাকার দাম হয়েছে এক টাকার বেশী, এমন কথা শুনেছে কেউ কোনদিন? এমন সুযোগ এসেছে কোন কালে? কে জানে ক'দিন থাকবে এই সুযোগ!, আর শুধু কি এই একটা সুযোগ? রূপোর গয়নার কথাটাই ধর। সত্যি সত্যি কি আর দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেছে রূপোর দাম চড়বার খবর, রেলের কাছে মধুবনী বড় জায়গা, এখানে হয়তো জানাজানি হয়ে গেছে। দূরে ছোট ছোট গাঁয়ে হয়ত খবরও পৌছায়নি এ ব্যাপারের। মধুবনীরও সবাই হয়তো জানে না। গৌর চালাক চতুর, বাজারে যাতায়াত আছে, দশটা লোকের সঙ্গে মেলামেশা আছে, ওরা জানতে পারে। সবাই কি ওদের মত মধুবনীর? বোকাহাবা লোক কি নেই এখানে? রূপোর পুরানো টুকিটাকি গয়না যদি সে কিছু কিনতে পারে ওদের

কাছ থেকে! মাটির টাকাগুলো যা'কে বেচে লাভ হবে, টাকার বদলে পাওয়া বেশী টাকাটা এভাবে খাটিয়েও তার লাভ হবে!

চাষী চাঁদের মনে এই সব চিন্তা পাক খেয়ে বেড়ায়—অনভ্যস্ত এলোমেলো চিন্তা বলে একেবারে উতলা করে দেয় তাকে। রূপোর মল বেচে আশাতীত লাভ করেছে বলে শুধু এই পণ্যটির কথাই সে ভাবে, আরও কত কিছু কেনা-বেচার মধ্যেও যে এরকম লাভের সুযোগ দেখা দিয়েছে সে সব তার মনেও আসে না, সোনার কথাটা পর্যন্ত নয়!

দেখা গেল, বুড়ীর ঘটি চুরি করার কাজটা মোটেই সহজ নয়। ঘর ছেড়ে বুড়ী বড় একটা কোথাও নড়ে না। বেশীর ভাগ সময় ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকে, বাকী সময়টা ঘরেরই সামনে দাওয়ায় উবু হয়ে দু'পায়ের হাঁটু মাথায় ঠেকিয়ে বসে থাকে, কখনো আপন মনে বিড়বিড় করে, কখনো কাঁপা গলায় তারস্বরে চেঁচিয়ে একে ওকে গাল দেয়। নাইতে খেতে ও প্রকৃতির তাগিদে বুড়ীকে অবশ্য সরে যেতে হয় কিছু কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু চাঁদ ভরসা পায় না। বিছানা তুলে মাটি খুঁড়ে আবার গর্ত বুজিয়ে এমন ভাবে বিছানা পেতে রাখতে হবে, বুড়ীর যাতে সন্দেহ না হয়। বুড়ীর অনুপস্থিতির সময়টুকুতে সেটা সম্ভব নয়।

'চণ্ডীতলায় পূজো দিতে যাবে বলছিলে না মা? তা যাও না, দিয়ে এসো পূজো।' চাঁদ বুড়ীকে জপায়।

হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বুড়ী বলে, 'মাথায় থাক পূজো দেয়া। অদ্দূর কি চলতে পারি? তুই যা না বাপ, দিয়ে আয়না পূজোটা?'

'বুড়ো মানুষ, সাধ হয়েছে, ডুলি করেই যাও। ডুলির পয়সা দেব'খন আমি। বিন্দুকে বলে দিচ্ছি।'

ডুলি চেপে চণ্ডীতলায় পূজো দিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বুড়ী চাঁদকে দিয়েই ঘরের দরজায় কুলুপ আঁটায়। শিকল কপাটের নীচের দিকে, কুলুপটা বুড়ী আবার নিজে টেনে ছাখে ঠিকমত লাগল কি না!

ডুলি ভাড়া গচ্ছা যাবার দুঃখের সঙ্গে নতুন নির্ঘাৎ মতলব ঠাউরাবার চেষ্টায় মাথা ঘামানোর পরিশ্রম মিশে প্রায় কাবু করে আনে চাঁদকে। ভাবতে হয় একা, বৌয়ের সঙ্গে যে একটু পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই। যতই হোক, সে তো মেয়ে বুড়ীর। বোকা মেয়েমানুষ, হয়তো গণ্ডগোল করে বসবে। বুড়ী চণ্ডীতলায় গেলে ছুতো করে বৌকে গৌরের রুগ্না মার খবর আনতে পাঠিয়ে কাজ হাসিল করবে ভেবে রেখেছিল। পুরানো মর্চে ধরা এক কুলুপের জন্য সব ফস্কে গেল!

গৌরের গরুর দুধ কমে গেছে। নীলকণ্ঠবাবু চাঁদের কাছ থেকে একসের করে দুধ নেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ বাড়ীতে দুধ নিতে আসবার কোন তাগিদ চিন্তামণির ছিল না। কিন্তু সাধ করে গৌরের বাড়ী দুধ নিতে আসবার ভারটা নেওয়ায় এ বাড়ীতেও তাকে খুব যেতে হয়। দুজনের বাড়ী বেশী দূরে নয়।

পরদিন সকালে চিন্তামণি এসেছে দুধ নিতে, চাঁদ চেয়ে ছাখে কি বিধবা মেয়েটা রূপোর পৈছে পরেছে বেহায়ার মত। ঘেঁটুর মার গায়ে যেটা লটকে থাকতো এ পৈছেটাও যেন তারই মত।

'পৈছে দিল কে ?' চাঁদ শুধায়।

'কে দেবে, কিনিছি।'

'কার কাছে কিনলে ? গৌরের কাছে নাকি ?'

'অত খোঁজে কাজ কি তোমার ? দুধ নিতে এইছি, দুধ দুয়ে দাও, নিয়ে চলে যাই!' চিন্তামণি ঝাঁঝালো স্বরে জবাব দেয়। ঝোঁকের মাথায় সখের বশে পৈছেটা গায়ে চড়িয়ে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, ভোরের এই সুন্দর পৃথিবীতে সব মানুষ সব ভুলে তার এই গয়নাটির দিকেই শুধু তাকিয়ে থাকছে হাঁ করে।

'তোমার তো বড় মুখ বাছা ?' বলে চাঁদ চুপ করে যায়।

রাত্রে পুঁটু তার দিদিমার কাছে শোয়। দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে সে কেমন এক খাপছাড়া ভীত কণ্ঠে ডাকে, 'বাবা।'

দুধ দোয়া স্থগিত করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদ বলে, 'কিরে পুঁটু ?'

'দিদিমা যেন কেমন করে শুয়ে আছে, ছাখোসে বাবা।'

'ডাক না ?'

'ঠেললাম তো। নড়ে চড়ে না।'

তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে একনজরে তাকিয়েই চাঁদ টের পায় বুড়ী মরে গেছে। বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে, মাথা ঝিম ঝিম করে। তার মনে হয় সেই যেন মনে প্রাণে জোরালো কামনা করে বুড়ীকে মেরে ফেলেছে। আর কি এ মরণ! রোগবালাই নেই, সাড়াশব্দ হৈ চৈ নেই, রাত্রে ঘুমের মধ্যে চুপি চুপি নিঃশব্দে স্বর্গে যাওয়া।

পুঁটু কেঁদে ওঠে, তার মা ছুটে এসে কান্নায় যোগ দেয়, আশে-পাশের বাড়ীর লোক দু'চারজন এসে জুটতে আরম্ভ করে। দুধ আর চিন্তামণির নেওয়া হয় না। বুড়ীর শোকে চাঁদের দুধ দোওয়ার শক্তি লোপ পাওয়ার জন্য নয়, যে বাড়ীতে

সন্থ সন্থ একটা মানুষ মরেছে সে বাড়ী থেকে দুধ নেওয়া চলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখে শুনে চিন্তামণি চলে যায়। ভাবে, গৌরকে খবরটা দিতে হবে।

বুড়ীকে পুড়িয়ে এসে চাঁদ খন্তা নিয়ে ঘটি উদ্ধার করতে যায়, পুঁটুর মা ডেকে বলে, 'ও কি করছ ?'

'টাকার ঘটিটা বার করি মেঝে থেকে ?'

পুঁটুর মা বলে, 'ওখানে ঘটি কই ? ঘটি নেই ওখানে।'

চাঁদ অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় আছে তবে ? এইখানে তো পোঁতা ছিল ঘটি ?'

পুঁটুর মা বলে, শোন ইদিকে, বলছি সব। ব্যাপার আছে অনেক।'

ভূমিকা শুনে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় চাঁদের। তীব্র জ্বালাবোধের সঙ্গে সে ভাবে আশাভঙ্গের কি শেষ নেই তার ?

পুঁটুর মা বলে, 'ব্যাপারখানা কি জানো, ঘটি থেকে টাকাগুলো মা বার করে নিয়েছিল। বাবুকে বলে পোষ্টাপিসে জমা রেখেছে ওবছর। বলাই ঘোষের ঘর পুড়ে মাটির টাকাগুলো গলে তাল পাকিয়ে গেলো না সেবার, মা তখন ভয় পেয়ে গেল।'

টাকা তবে আছে ? চাঁদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

'আমায় বলনি কেন ?'

'তুমি যদি গোলমাল কর ?'

কিছু হাঙ্গামার পর চাঁদ টাকাগুলি পেল—রূপার টাকা নয়, নোট। কাগজের নোট।

বিয়ে করা কচি বৌকে নিয়ে সংসার করার অস্পষ্ট সাধটা গৌর মামাবাড়ী থেকে আরও জোরালো করে নিয়ে ফিরে আসে। চিন্তামণির শক্ত বাঁধন কেটে নিজেকে সরিয়ে নেবার অস্পষ্ট ইচ্ছাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিন্তামণির সম্পর্ক তুলে দেবার কথা ভেবে মনটা বড় বেশী কেমন করায় তার ভয় বেড়ে যায়। এভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে চিন্তামণিই হয়তো শেষে তার সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পাইয়ে দেবে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যা থাকে কপালে বলে চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মনের অবস্থা তার ঘটিয়ে দেবে চিন্তামণি।

না, এ পিরীত টেনে চলে তার মঙ্গল নেই। সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে চিন্তামণির সঙ্গে।

বড় কষ্ট পাবে চিন্তামণি।

অদ্ভুত উল্লাসভরা গর্ব অনুভব করে গৌর। তার জন্য চিন্তামণি পাগলিনী, সে বর্জন করলে বুক চিন্তামণির ভেঙ্গে যাবে, চোখের জল ফেলে ফেলে তার দিন কাটবে, একথা ভাবলে টনটনে একটা ব্যাথা-বোধের সঙ্গে গৌরের পুরুষ মন অহঙ্কারে ভরে যায়।

ভোরে এসে চিন্তামণি শুধোয়, কেমন যেন ভাসাভাসা গাছাড়া গাছাড়া ভাবে শুধোয়, 'ফিরলে কবে?'

'কাল ফিরেছি।'

'ও। কাল ফিরেছ।'

তারপর চুপ করে থাকে চিন্তামণি, উদাস গম্ভীর মুখে। দুধ দুইতে দুইতে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকিয়ে গৌরের মনটা বিগড়ে যাবার উপক্রম করে। চিন্তামণির এ ভাব তার ভাল লাগে না।

'একটা কাজ করবে? চিঠিখানা পড়ে দেবে আমায়?'

পাঠশালায় পড়া বিদ্যায় টানা হাতে লেখা চিঠি পড়তে গৌর গলদ ঘর্ম হয়ে ওঠে। চিঠির সিকি অংশের বেশী পাঠোদ্ধার করার ক্ষমতা তার হয় না। দু' কান তার ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে।

চিন্তামণি টের পেয়ে বলে, 'ওই হয়েছে নাও। আমি তো ভাবছিলাম তুমি পড়তেই জানো কিনা! চাষার ছেলের পড়ার বালাই দিয়ে কাজটা কিসের?'

তারপর তাকে যেতে না বলে, ভালমন্দ সুখদুঃখের দুটো কথা না কয়ে, চিন্তামণি চলে যায়। তাতে আরও বিগড়ে যায় গৌরের মন।

ঠিক এমনিভাবে কেটে যায় কয়েকটা দিন, দু'দণ্ডের জন্য পরস্পরের দেখা হয়ে, ভাসাভাসা দুটো কথার বিনিময় হয়ে, আবেগ ও অন্তরঙ্গতা উহ্য থেকে। একদিকে গৌর স্বস্তি পায়, ভাবে এমনিভাবে চলতে থাকলে বিনা চেষ্টায় বিনা হাঙ্গামায় সম্পর্ক ভাঙ্গার ব্যাপারটা তাদের চুকে যাবে। অন্যদিকে ভিতরটা তার এক দুরন্ত ব্যথায় হু হু করতে থাকে। চিন্তামণিকে মনে হয় ম্লান, নির্জীব! কি যেন দুঃখ বয়ে বেড়াচ্ছে সে, কথাবার্তা চালচলন চোখমুখের ভঙ্গি সব যেন তার বদলে গেছে সেই দুঃখের চাপে। ছেলে মরবার পর মেয়েলোকের এরকম শোকাতুরা মূর্তি

হতে দেখেছে গৌর। চিন্তামণিও কি নিজে থেকে সঙ্কল্প করেছে, বুক ফেটে গেলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেবে ?

এমনিভাবে দিন যাচ্ছে, একদিন কালাচাঁদের পৈছেটা গৌর নিজেই কিনে ফেলল একটা খেয়ালের বশে। বেচবার জন্য সা'র দোকানে পৈছেটা ওজন করাতে গিয়ে তার মনে হল, চিন্তামণিকে সে কখনো কিছু দেয়নি। চিন্তামণির মনে সে যে ভয়ানক কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছে, তার কাছে এই পৈছেটা পেলে কি সে কষ্ট কি কিছু কম হবে না ?

পৈছেটা কিনে তার মনে হল, এই পৈছে দেওয়া উপলক্ষে শেষবারের মত একদিন চিন্তামণিকে একটু আদর করে তুটো মিষ্টি কথা বলা তার উচিত। পরদিন সে তাই নিজে থেকে সেধে চিন্তামণিকে বলল, 'আজ রাতে যাব ?'

'যাবে ? যেও।'

বৈন চিন্তামণি,

কতকাল তোমারে পত্র লিখি নাই ইহাতে মনে কষ্ট করিবা না। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় পত্র দিতে গৌণ হইল। আমি কাজ করিতেছি জানিবা। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কী তুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকাইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদেষ্টে ছিল। কিরূপ হৈ চৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কত বাড়ী উঠিয়াছে অবাক কাণ্ড দেখিয়া তুমি চোখের পলক ফেলিতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় গাদায় মাতাল গুণ্ডা গিজ গিজ করিতেছে। আমার মত শতাবধি পোড়া-কপালী ঝি কাজ করিতে আসিয়াছে কাহারো ধর্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে কোনমতে ধর্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি। তুই স্থানে বাসন মাজিয়া তের টাকা করিয়া ছাব্বিশ টাকা পাই। যেরূপ কাণ্ড তোমারে আসিতে বলিতে ভরসা পাই না।

ইতি—তোমার দিদি

ছয়

গৌরের ঘরে আজ আবার চাল নেই।

মা বলে, 'ওবেলা হাঁড়ি চড়বে না গৌর। চাল বাড়ন্ত।'

আরও কয়েক দিন চলত, পুঁটুকে না খাওয়াতে হলে। কি ভাতটাই খায় এতটুকু মেয়ে! কম দিয়ে এড়িয়ে যাবায় যো নেই, যতক্ষণ না পেট ভরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদে চলবে ভাতের জন্য। পেট মোটা ক্যাংটা পুঁটুর দিকে চেয়ে গৌরের মনে আজ আপসোস জাগে যে চাঁদকাকা তার না খেয়ে মরে গেছে। বেঁচে থেকে আরও কিছুকাল তিলে তিলে তার মরা উচিত ছিল। বৌ আর ছেলে শুধু নয়, এই মেয়েটা চোখের সামনে মরবার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা উচিত ছিল চাঁদকাকার। নিজের আত্মীয় এত বড় শত্রু হয় মানুষের? বেঁচে থাকতে আজীবন শত্রুতা করে গেছে, মরেও শত্রুতা করে গেল।

কতকাল না খেয়ে না খেয়ে পেট চিমসে হয়ে গিয়েছিল পুটুর, হঠাৎ দু'বেলা বেশী ভাত গিলে মরতেও সে পারত। উচিত ছিল তাই। অথচ কাণ্ড ছাখো অদ্ভুত, ক'দিনে চেহারা যেন ফিরতে স্থরু করে দিয়েছে মেয়েটার। মুখের বীভৎস শীর্ণতা থেকে মৃত্যুর ছাপ মুছে যেতে আরম্ভ করেছে।

পাতে ভাত কম ছিল, রোজ যা খায় তার অর্দ্ধেক। শেষ করে ভাত চাইতে মা একটু ইতস্ততঃ করে, কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায়। তারপর আরও ভাত এনে ঢেলে দিতে যায় গৌরের পাতে।

মা'র রকম দেখে খটকা লেগেছিল গৌরের মনে, দু'হাতে পাত ঢেকে সে বলে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আর আছে তো ভাত?'

'তুই খা না।'

কিন্তু তা কি হয়? মাকে উপোসী রেখে পেট ভরাতে পারার মত খিদের স্বাদ এখনো গৌর পায়নি। লোভে পড়ে শেষ পর্যন্ত কিছু ধান রঘু আর সে বেচে দিয়েছিল কিন্তু সে খুব বেশী নয়। তাদের দু'জনের বাড়ীতে তাই এখন পর্যন্ত দুবেলা হাঁড়ি চড়ছে। গৌরের মন মুচড়ে গেছে আতঙ্কে, গরু ছাগলের মত চারিদিকে জানাশোনা মানুষগুলিকে মরতে দেখে, দিশেহারা হয়ে পালাতে

দেখে দুদিন পরে তার কি অবস্থা হবে এই চিন্তায়। মোটামুটি পেট ভরে খেতে না পেলে হয়তো আতঙ্কে এতটা কাবু হয়ে পড়ত না গৌর। পেটের খিদে তার চিন্তা আর অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিত, বিরামহীন কল্পনার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এমন পাহাড় হয়ে চেপে বসত না তার মনে।

ধীরে ধীরে গৌর রঘুর বাড়ীর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। পা তার চলতে চায় না। পর হয়েও এ জগতে রঘুই তার সব চেয়ে আপনার, পরমাত্মীয়ের চেয়ে ঘনিষ্ঠ। তবু আবার রঘুর কাছে ধান বা চাল ধার চাওয়ার কথা ভাবতেও তার কেমন বিশ্রী সঙ্কোচ হচ্ছে। রঘু দু'বার তাকে ধার দিয়েছে। মুখ ফুটে দেবনা বলেনি কিন্তু শেষ বার কেমন যেন বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট মনে হয়েছিল রঘুকে, ধান মেপে দেবার পর ভাল করে কথা কয়নি। মুখ হাঁড়ি হয়ে গিয়েছিল বিরজার। বাড়ীর অন্য সকলের কথায় ব্যবহারেও একটা চাপা শত্রুতার ভার গৌর অনুভব করেছিল।

কিন্তু উপায় কি। পয়সা কড়ি কিছুই নেই গৌরের হাতে। চিন্তামণিকে পৈছে কিনে দিবার সখ না জাগলে হয়তো গোটা কয়েক টাকা থাকত তার হাতে, আজ আবার গিয়ে হাত পাততে হত না রঘুর কাছে।

রঘু তামাক টানছিল দাওয়ায় বসে, চিন্তিত গম্ভীর মুখে। উঠনের এক কোণে মাঝারি পাত্রটায় ধান সেদ্ধ হচ্ছে। সুমিষ্ট চেনা গন্ধে গৌরের পেটের অল্প দুটি ভাত যেন চোখের পলকে হজম হয়ে গিয়ে দুর্দান্ত খিদে পাক দিয়ে ওঠে। তাকে দেখে রঘু বিশেষ খুশী হয়েছে মনে হয় না গৌরের। হুঁকোটা দিয়ে অভ্যর্থনা করতেও সে যেন ভুলে গেছে। গৌরের মনে পড়ে, গতবার ধান দেবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি বারের জন্যও রঘু খবর নিতে যায়নি সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে।

গলা শুকিয়ে যায় গৌরের। আরও একটা নতুন আতঙ্ক তাকে প্রায় দিশেহারা করে দেয়। রঘুও কি সত্যই তাকে ত্যাগ করবে তার বিপদের দিনে? নিজেকে কি যে অসহায় মনে হয় গৌরের। আজ সে ভাল করে টের পায়, চিরকাল সে কতখানি নির্ভর করে এসেছে রঘুর ওপর, এখনো সে কতটা ভরসা রাখে ওর কাছে। ধান আজ চাইবে কি চাইবে না ভেবে পায় না গৌর। ধান চাইলে যদি ভেঙ্গে যায় তাদের বন্ধুত্ব, সম্পর্ক চুকে যায় আজ থেকে? যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সত্যটা যে সাহায্য দূরে থাক, রঘুর কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার আশাও তার নেই? অথচ কথাটা আজ স্পষ্ট করে না নিলেই বা লাভ কি! রঘু যদি তাকে

বরবাদ করেই থাকে, সেটা জানলে তার কি আর বেশী ক্ষতি হবে ?

এলোমেলো ছাড়া ছাড়া কথা হয় দু'জনে। নিজেই হাত বাড়িয়ে গৌর হুঁকোটা নেয়।

বলে, 'কদিন চলবে আর এরকম ?'

রঘু বলে, 'ভগবান জানে। নিতায়ের মেয়েটা নাকি কোথায় ভেগেছে কাল।'

'মাইরি বলছিস্ ? কার সাথে গেল ?'

'ভগবান জানে। পটল নাকি পেছনে ছিল শুনলাম—সহরে সরিয়েছে।'

বিরজা এসে ঘুরে যায়। ধান কেমন সেদ্ধ হচ্ছে দেখতে। খানিক পরে আবার আসে। মনে কথাটা ধৈর্য্য ধরে আর সে চেপে রাখতে পারে না।

'কি সলা হচ্ছে শুনি তোমাদের ? ধান যদি চাইতে এসে থাকো গৌর ঠাকুরপো—'

গৌর সজোরে মাথা নাড়ে।—'না ধান চাইতে আসি নি।' তারপর অন্তরঙ্গের মত হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'চাই যদি, দেবে না ? বল কি গো ! আমি চাইলে দেবে না ?'

এ যেন তামাসার ব্যাপার !

বিরজা বলে, 'থাকলে কি দিতে অসাধ ? কোথায় পাব যে তোমায় দেব ! আধপেটা খাচ্ছি সব—মুঠি মেপে চাল নিচ্ছি।'

তবু গৌর কথাটাকে গায়ের জোরে তামাসার পর্যায়ে রাখতে চেষ্টা করে, হাল্কা হাসির ভান করে বলে, 'আমার জন্যেও নিও বৌঠান আজ থেকে। বিশ মুঠো নিও, তাতেই হবে, বেশী চাই না।'

রঘু বলে, 'ধান যদি কিছু যোগাড় করতে পারিস গৌর—'

'যোগার কিসের ? গোলা ভর্তি ধান রয়েছে।'

'তামাসা নয় ! ধান পেলে কিছু কিছু শোধ দিস তোর কাছে যা পাব।'

বিরজা যোগ দেয়, 'একটা পেট তোমার—মা বুড়ী আর কতই বা খায় ? তোমার ভাবনা কি বলো। এত লোকের সংসার হলে টের পেতে।

গৌর তবু হাসে।—'বড়লোকের বড় সংসার। আমার মত বড়লোক যদি হতে—'

মন এদিকে তার পুড়ে যেতে থাকে। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সে একরকম পালিয়ে আসে রাস্তায়।

দুপুরের রোদে যেন উজ্জলতা নেই. শুধ ঝাঁঝ। দু'চারটি জীবন্ত কঙ্কাল শুধু

চোখে পড়ে—মানুষ ও গরু ছাগল, ঘোষেদের কেলো কুকুরটা মরে পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ের ধারে। চাঁদকাকা আর কালাচাঁদের শূন্য ভিটে খাঁ খাঁ করছে। চারিদিকের প্রাণহীন স্তব্ধতায় নিজেকে গৌরের আরও বেশী একা, আরও বেশী অসহায় মনে হয়।

মনে হয় চিন্তামণির সঙ্গে যদি ভাব রাখত! প্রাণ খুলে মনের দুটো কথা কয়ে নিজেকে হাল্কা করা যেত একটু। আজ তিন চার মাস চিন্তামণির সঙ্গে সে দেখা করেনি, কথা কয়নি। রঘু আজ যে ভাবে বর্জন করেছে তাকে, একরকম এমনি ভাবেই সেও সম্পর্ক তুলে দিয়েছিল চিন্তামণির সঙ্গে। অবশ্য পৈছেটা সে দিয়েছিল চিন্তামণিকে—দামী ভারী একটা পৈছে! সে চাওয়ার আগেই রঘু তাকে জানিয়ে দিয়েছে ধান সে তাকে দিতে পারবে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মত সেই সঙ্গে ধার দেওয়া ধান শোধ চাইতেও তার বাধে নি।

আচ্ছা, চিন্তামণির কাছে যদি পৈছেটা ফেরত চায়? যদি বলে যে এখনকার মত ওটা ফেরত দাও, সুদিন ফিরে এলে আবার তোমায় নতুন পৈছে গড়িয়ে দেব?

বিয়ে করে ঘর সংসার করার সাধ মেটাবে বলে যাকে সে ত্যাগ করেছে, এতকাল একটা খবরও নেয়নি যে বাঁচল না মরল, তার কাছে পৈছে ফেরত চাওয়ার কথা ভাবতে গৌরের লজ্জা বোধ হয় না। বরং রঘুর কাছে ধান চাইতে যাওয়ার চেয়ে একাজটা বরং ঢের বেশী সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এমন কি, পৈছে দিতে চিন্তামণি যে অস্বীকার করতে পারে এটা তার খেয়ালও হয় না একবারের জন্য। তার যেন দাবী আছে পৈছেটাতে এবং চাইলেই যেন চিন্তামণি বিনা দ্বিধায় সেটা তাকে ফিরিয়ে দেবে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই এতটুকু। অসঙ্গতিও নেই।

চিন্তামণির সঙ্গে ভাব হবার পর আজ প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে গৌর তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। এমন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে যে বাবুদের বাড়ীর খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বাবুর মেয়েটাকেই অনুরোধ জানায় চিন্তামণিকে ডেকে দিতে।

চিন্তামণি আসে অনেক দেরী করে। একটু রোগা হয়ে গেছে চিন্তামণি। রোগা হওয়ায় আরও যেন সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, কম মনে হচ্ছে বয়স।

চিন্তামণি এসে গৌর মুখ খুলবার আগেই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'বেশ করেছ এসেছ। তোমায় খুঁজছিলাম ক'দিন থেকে। তোমার গয়না ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

চিন্তামণি পৈছেটা গৌরের হাতে তুলে দেয়।

'ফিরিয়ে দিচ্ছ? কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ?'

'যে ব্যাভারটা করলে তুমি, তারপর তোমার জিনিস নেব? চিন্তামণির গলা ধরে আসে, 'মাস কাবারে দেশে ফিরে যাব। তোমার জিনিস তোমার থাক, আমার কাজ নেই ওতে।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে গৌর চিন্তামণির হাত চেপে ধরে, মিনতি করে বলে যে চিন্তামণি যদি তাকে ছেড়ে দেশে চলে যায় সেও তাহলে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে ঘর ছেড়ে নয়তো আত্মঘাতী হবে। আর সে এমন ব্যবহার করবে না চিন্তামণির সঙ্গে। চিন্তামণি মাপ করুক তাকে।

দুপুরবেলা খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে গৌরের কথা শুনতে শুনতে চিন্তামণির মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন মনে হলেও রোমাঞ্চ হয় চিন্তামণির।

পৈছের টাকায় কিছুদিন গেল। তারপর গেল জমিজমা ঘরদুয়ার বাসনপত্র। তারপর গেল পুঁটু ও গৌরের মা।

চিন্তামণি বলল, 'এখানে থেকে কেন শুকিয়ে মরবে? তার চাইতে চল বড়নিছিপুরে দিদির কাছে যাই। মস্ত কারখানা হয়েছে, তুমি কাজ করবে আমি কাজ করব, একরকম করে চালিয়ে নেব দুজনে মিলে। সেথায় তো জানা চেনা কেউ নেই তোমার, এক সাথে থাকতে ভয় পাবে না তুমি।'

গৌর বলল, 'ভয়? কিসের ভয়? এখানেই একসাথে থাকছি এসো না আজ থেকে।'

আজ গৌরের আত্মীয় নেই, ঘরবাড়ী নেই, জমিজমা নেই, পেটের ভাত নেই —কাকে তার ভয়, কিসের তার লজ্জা।

বড়নিছিপুর

বৈন চিন্তামণি,

তুমি আসিতেছ জানিয়া কিরূপ সুখী হইয়াছি তাহা কিরূপে বলিব। মনে খালি ডর পাই যে তোমার কাঁচা বয়স, পুরুষ রক্ষক না থাকিলে না জানি কি বিপদে পড়িবা।………

চিহ্ন

প্রাণ ধুক্‌পুক্‌ করে না গণেশের।

বিস্ময় আর উত্তেজনা অভিভূত করে রাখে তাকে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়তে বুঝি খেয়ালও হয় না তার। বিশ-বাইশ বছর বয়সের জীবনে এমন কাণ্ড সে চোখে দেখেনি, মনেও ভাবেনি। এত বিরাট, এমন মারাত্মক ঘটনা, এত মানুষকে নিয়ে। এ তার ধারণায় আসে না, বোধগম্য হয় না। তবু সবাই যেন সে বুঝতে পারছে, অনুভব করছে, এমনি ভাবে চেতনাকে তার গ্রাস করে ফেলেছে রাজপথের জনতা আর পুলিসের কাণ্ড। সেই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে। ভিড়ে সে আটকা পড়েনি, বন্ধ দোকানটার কোণে যেখানে সে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে পাশের সরু গলিটার মধ্যে সহজেই ঢুকে পড়তে পারে যখন ইচ্ছা হবে তার এখান থেকে সরে যেতে। কিন্তু যাবে কি, সে বাঁধা পড়ে গেছে আপনিই। জনতার গর্জনে গুলির আওয়াজে, বুকে আলোড়ন উঠছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে শিরার রক্ত। ভয় ভাবনা চাপা পড়ে গেছে আড়ালে। ভয়ে নয়, নিজেকে বাঁচাবার হিসাব কষে নয়, হাঙ্গামা থেকে তফাতে সরে যেতে হয় এই অভ্যস্ত ধারণাটি শুধু একটু তাগিদ দিচ্ছে পালিয়ে যাবার। কিন্তু সে জলো তাগিদ। হাঙ্গামা যে এমন অনড় অটল ধীর স্থির হয়, বন্দুকধারিদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক ওদিক এলোমেলো ছুটোছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না। এ কেমন গণ্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না। তাই, চলে যাবার কথা মনে হয়, তার পা কিন্তু অচল। কেউ না পালালে সে পালাবে কেমন করে।

তা ছাড়া, মনে তার তীব্র অসন্তোষ, গভীর কৌতূহল। এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গাঁয়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার? দেড় ক্রোশ তফাতের সমুদ্র থেকে উন্মত্ত কোলাহলে ছুটে আসছে যে মানুষ-সমান উঁচু জলের তোড়, তা তো থামে না, কিছু তো ঠেকাতে পারে না তাকে। কত পূর্ণিমা তিথিতে অনেক রাতে সে চুপি-চুপি ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে মা-বাবাকে না জাগিয়ে, দাঁড়িয়ে থেকেছে ভাঁটার মরা নদীর ধারে কোটালের জোয়ারের রোমাঞ্চকর আবির্ভাবের জন্য।

দিনে ভাঁটার নদীর কাদায় শুয়ে কত কুমীর রোদ পোহায়। দেখে মনে হয়, কত যেন নিরীহ ভাল মানুষ জীব। অল্প জলে হঠাৎ তীরের মতো কি যে তীব্র বেগে জলকে লম্বা রেখায় কেটে হাঙর গিয়ে শিকার ধরে। কাদা-জলে লাফায় কত অদ্ভুত রকমের মাছ। কেমন তখন বিষণ্ণ হয়ে যায় গণেশের মন। আহা, দুঃখী নদী গো, হাঙর কুমীর মাছ মিলে কত জীব, তবু যেন জীবনের স্পন্দন নেই, ডাইনে

বাঁয়ে যত দূর তাকাও তত দূর তক। এই নদীতে প্রাণ আসবে, স্বয়ং পাগলা শিবঠাকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে, তেমনি ভাবে আসবে প্রাণের জোয়ার। গনেশের প্রাণেও আনন্দ এত, যা মাপা যায় না।

সেই অভ্যস্ত, পরিচিত, অতি ভয়ানক, অতি উন্মাদনা য় কোটালের জোয়ার যদি বা মনে ধেয়ে এল গর্জন করে গাঁ ছেড়ে আসবার এতদিন পরে শহরের পথে সে জোয়ার থেমে গেল, বসে পড়ল ফুটপাথে পিচের পথে। এ কেমন গতিহীন গর্জন, সাদা ফেনার বদলে এ কেমন কালো চুলের ঢেউ।

গুলি লেগেছে না কি ? না লাঠি ?

ওসমান জিজ্ঞেস করে গণেশকে দ্বিধা-সংশয়ের সুরে, গভীর সমবেদনায়। দোকানের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, ঠিক কোথা থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে লাল করে দিচ্ছে গায়ের ময়লা ছেঁড়া ফতুয়াটা ঠিক বোঝা যায় না। গুলি যদি লেগেই থাকে, যেখানেই লেগে থাক, দাঁড়িয়ে আছে কি করে ছেলেটা, ফতুয়ার বুকের দিকটা যখন চুপসে যাচ্ছে রক্তে ? চোখের চাউনিটা অদ্ভুত। মরা মানুষ যেন বেঁচে উঠে তাকিয়ে আছে বিহ্বলের মতো। কুলি-মজুরিই সম্ভবত করে। মোটটা নামিয়ে রেখেছে।

'আ ? কি জানি বাবু।' অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শোনায় গণেশের গলা, 'এরা এগোবে না বাবু ?'

বাবু! খচ করে একটু আঁচড় লাগে ওসমানের বুকে। কালিঝুলি মাখা এই হাফশার্ট পরনে, রংচটা সুতোওঠা নীল প্যাণ্ট, পায়ে জুতো নেই, দাড়ি কামায়নি সাত দিন। তবু তাকে বাবু বলে ছেলেটা। ঘৃণ্য বাবু বলে গাল দেয়! ট্রামের কাজ ছেড়ে দেবার চলতি আপসোসটা আরেকবার নাড়া খায় ওসমানের। এ আপসোস তেজী হয়েছে ওসমানের গত ধর্মঘটের সাফল্যের পর। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসেও কেউ কোন দিন তাকে বাবু বলে অপমান করেনি।

তবে হ্যাঁ, এ ছেলেটা মুটে-মজুরি করে। গাঁ থেকে এসেছে বোধ হয় নেহাত পেটের খিদের তাড়নায়। ভিখারী আর মুটে-মজুর ছাড়া সবাইকে বাবু বলা অভ্যাস হয়ে গেছে।

'এরা বসে দাঁড়িয়ে থাকবে বাবু এগোবে না ?'

এবার ক্ষীণ শোনায় গণেশের গলা শ্লেষ্মায় আটকানো কাশির রুগীর গলার মতো, রক্তে আটকানো যক্ষ্মা রুগীর গলারও মতো।

'এগোবে না তো কি ?' ওসমান মৃদু হেসে বলে, নিঃসংশয়ে। পিছু হটে ছত্রখান হয়ে পালিয়ে যখন যায়নি সবাই, লাইন ক্লিয়ার না পাওয়া ইঞ্জিনের মতো শুধু নিয়ম আর ভদ্রতার খাতিরে থেমে থেমে ফুঁসছে এগিয়ে যাবার অধীরতায়, তখন এগোবে না তো কি। এগোবার কল টিপলেই এগোবে।

'তবে কি না—' গণেশ জোরে বলবার চেষ্টা করে জড়িয়ে জড়িয়ে। দোকানের বিজ্ঞাপন আঁটা দেয়ালের গায়ে পিঠ ঘষড়ে সে নেমে যায় খানিকটা হাঁটু বেঁকে। পিঠ কুঁজো হয়ে মাথটা ঝুলে পড়ে। যে বাড়ির কোণে ছোট একখানি ঘর তার পিছনে হেলান দেবার দোকান, সেই বাড়িরই উঁচু ভিতরে বাঁকানো একটু খাঁজে না আটকালে সে হয়তো তখনি ফুটপাথে আশ্রয় নিত, আরও যে মিনিটখানেক পড়ে না গিয়ে আধ-থাড়া রইল তা আর ঘটত না।

'কি বলছ?'

ওসমান ঝুঁকে গণেশের মুখের যত কাছে সম্ভব মুখ নিয়ে যায়। শুনতে পায় শুধু গলার ঘর্ঘর ধ্বনি। সামনের লোকেরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, জমাট বাঁধা জনতাকেও চাপ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে হাতখানেক, জায়গা দিয়েছে গণেশকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার।

রক্তমাথা জামাটা দু'হাতে একেবারেই ছিঁড়ে ফেলে ওসমান। বুকে কোথাও ক্ষতের চিহ্ন নেই, একটাও ফুটো নেই। এক ফোঁটা রক্ত বেরোয়নি বুক থেকে ছেলেটার। জামাটা তবে ভিজল কি করে রক্তে?

না, বাঁ গালটাতেও রক্তের চাপড়া পড়েছে বটে ছেলেটার। ঝাঁকড়া চুলের ভেতর থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে। এক রাশি ঘন রুক্ষ চুলের আড়ালে আঘাতটা লুকিয়ে আছে।

একে বাঁচানো উচিত, ওসমান ভাবে।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো বাঁচতে পারে। হয়তো। ওসমান কি করে জানবে কি রকম আঘাত ওর লেগেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচবে কিনা শেষ পর্যন্ত ঠিক জানে না বটে ওসমান, কিন্তু এটা সে ভাল করেই জানে, হাসপাতালে পৌঁছতে দেরি হলে নিশ্চয় বাঁচবে না।

বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে ওকে। তাকেই করতে হবে। খুন যখন বেরিয়ে আসছে গলগল করে, তাকেই ছোক্‌রা বার বার জিজ্ঞেস করেছে, এরা এগোবে না বাবু? শহীদ হবার আগে এই একটা জবাব শুধু চেয়েছে ছেলেটা তার কাছে। ওকে বাঁচাবার চেষ্টা না করলে চলে?

এম্বুলেন্স? মোড়ের মাথায় এম্বুলেন্স আছে, কজনে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি ওকে নিয়েও যাওয়া যায় ওখানে, জমাট বাঁধা ভিড় ফাঁক হয়ে গিয়ে তাদের পথ দেবে, ওসমান জানে। কিন্তু ওই এম্বুলেন্সের ব্যাপারও সে জানে। বিশেষত এ ছোক্‌রা কুলির ছেলে। এম্বুলেন্সের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করতে করতে এ খতম হয়ে যাবে। না, ও এম্বুলেন্সের ভরসা নেই ওসমানের।

রাস্তার ধারে দাঁড় করানো পুরানো খোলা লরীটা আট্‌কা পড়ে গিয়েছিল শোভাযাত্রায়। ওসমান উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকে, 'লরী কার?'

জিওনলাল বলে, 'আমার আছে।'

'ইস্‌কো জানের দায়িক তুমি, খোদা কসম। জোরসে লে চলো হাসপাতাল।'

এক মুহূর্তই ইতস্তত করে জিওনলাল বলে, 'লে আও।'

ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ষ্টিয়ারিং ধরে বসে ততক্ষণে কয়েকজনের সাহায্যে ওসমান লরীতে উঠে গণেশকে কোলে নিয়ে বসেছে।

মানুষের মধ্যে আট্‌কা পড়েছিল লরীটা, দেখতে দেখতে এবার পথ সৃষ্টি হয়ে যায় তার জন্য, হুস করে লরী ঢুকে যায় পাশের গলিতে।

সভায় যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আমি চাইনি। এটা তবে কি রকম ব্যাপার হল? হেমন্ত ভাবে।

নিজের ব্যবহার বড় আশ্চর্য মনে হয় হেমন্তের নিজেরই কাছে, বিশেষত নিজের মনের চাল-চলন। সভায় গিয়ে দাঁড়াবার খানিক পরেই মন যেন বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে কোন বিচার বিবেচনা হিসাব নিকাশ না করেই বাতিল করে দিলে এত দিনকার কঠোর ভাবে মেনে চলা রীতিনীতি। এত দিন ধরে যা সে যে-ভাবে ভেবেছে আজ যেন ও-ভাবে ও-সব ভাববার দরকারটাই শেষ হয়ে গেছে একবারে। একান্ত পালনীয় বলে যা সে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে এত দিন, আজ তার বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে বিচলিত হবার কিছু নেই, ক্ষোভের কারণ নেই।

এত সহজে কি করে মত বদলায় মানুষের, তার? এমন আচমকা কি করে নতুন মত মেনে চলা এমন স্বাভাবিক মনে হয় মানুষের, তার? অথবা আজকের এ ব্যাপারে মতামতের প্রশ্ন নেই, প্রতিদিনকার সাধারণ জীবনে যে মতামত নিয়ম-কানুন খাড়া করে চলা যায়, এই বিশেষ অবস্থায় সে সব বর্জন করে চলাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়? ধাঁধা লেগে যায় হেমন্তের এ সব চিন্তায়।

না, রাজনীতি বাজে নয়, তুচ্ছ নয় হেমন্তের কাছে। অত অন্ধকার নয় তার মন। বিশেষত এদেশের রাজনীতি স্বাধীনতার সংগ্রাম, বংশানুক্রমিক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। কিন্তু সবকিছুরই যেমন সময় আছে, বয়স আছে মানুষের জীবনে, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় আছে, বয়স আছে। অতি ভাল কাজও অসময়ে করতে চাইলে অকাজ হয়ে দাঁড়ায়, ফল হয় খারাপ। নিজের যা কর্তব্য সেটুকু ভালভাবে পালন করতে পারাই সার্থকতার রীতিনীতি, নিয়ম।

সভার একপাশে জায়গা নিয়ে দাঁড়াবার সময়ও বিশ্বাস তার দৃঢ় ছিল, —রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়া কোন ছাত্রের উচিত নয়। ছাত্র-জীবনে রাজনীতির স্থান নেই। লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার সময় হাতে-কলমে রাজনীতি চর্চা করা তাস পিটে আড্ডা দিয়ে হৈচৈ করে সময় আর এনার্জি নষ্ট করার মতোই অন্যায়। ছাত্রের কাছে রাজনীতি শুধু অধ্যয়নের বিষয়, কোলাহল মত্ততা দলাদলি সংঘাত থেকে দূরে থেকে শান্ত সমাহিত চিত্তে তাপসের সংযত শোভন

জীবন যাপন করবে ছাত্র।

সভায় তবে সে কেন থাকে, কি করে থাকে? শোভাযাত্রায় যোগ দেয়, ফুটপাথে বসে পড়ে যতক্ষণ দরকার বসে থাকার সঙ্কল্প নিয়ে? মত তার বদলায়নি, বিশ্বাস শিথিল হয়নি। জোরের সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে শুধু মনে হয়েছে আজ এই বিশেষ অবস্থায় তার মত বা বিশ্বাসের কোন প্রশ্ন আসে না, ও-সব বিষয় বিবেচনা করার সময় এটা নয়। অন্য সময় যত খুসী নিষ্ঠার সঙ্গে ও সবের মর্যাদা রেখে চললেই হবে, এখন নয়। এখন যা করা উচিত, তার মতো হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মিলে যা করছে, তাকেও তাই করতে হবে তাতে সংশয়ের কিছু নেই, তর্ক নেই।

একটু কৌতূহলের বশে হেমন্ত সভায় দাঁড়িয়েছিল। এত সীমাহীন দলাদলি, এমন কুৎসিৎ আত্মকলহ যাদের মধ্যে, তারা কি করে একসাথে মিশে সভা করে একটু দেখবে। ছেলেদের বড় একটা অংশ গোল্লায় গেছে। শুধু হৈচৈ, গুণ্ডামি, সিগারেট-টানা, মেয়েদের পেছনে লাগা, শেষে পরীক্ষার হলে চুরি-চামারি, গার্ডের সঙ্গে মারা-মারি, গার্ডকে খুন করা। এ অধঃপতনের কারণ সে জানে। রাজনৈতিক মত্ততা এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী। তার মতকেই সমর্থন করে ছেলেদের মধ্যে এই মারাত্মক দুর্নীতির প্রসার — নিজের কাজকে অবহেলা করে অকাজ নিয়ে মেতে থাকলে এরকম শৈথিল্য আসতে বাধ্য, ছাত্রই হোক আর যাই হোক তাদের মধ্যে। নিয়মানুবর্তিতাকে চুলোয় পাঠিয়ে, লেখাপড়া তাকে তুলে হৈচৈ হাঙ্গামা নিয়ে মেতে থাকার জন্য রাজনীতি চর্চার চেয়ে ভাল ছুতো আর কি হতে পারে?

উচ্ছৃঙ্খলায় কি মিল হয়? কি মানে সে মিলের?

শীতের তাজা রোদে উজ্জল দিন। কি তাজা দেখাচ্ছে এদের মুখগুলি, কত উজ্জল সকলের দৃষ্টি। দুঃখ বোধ করেছিল হেমন্ত? অপচয়ে ক্ষয়ের ছাপ পড়ে না, ভ্রান্ত আদর্শ কাবু করে না, এমন যে অফুরন্ত তরুণ প্রাণশক্তি আর বিশ্বাস, তার কি শোচনীয় অপব্যবহার! একবার ভেবেছিল হেমন্ত, চলে যায়। কি হবে এদের গরম গরম চীৎকার শুনে? আর যদি মতভেদ ঘটে, বাদানুবাদ হয়, হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়, আরও তখন বেশী খারাপ হয়ে যাবে মনটা নিজের চোখে সব দেখে। তার চেয়ে কাল খবরের কাগজে পড়লেই হবে কি হল না হল সভায়।

কিন্তু চলে যেতে সে পারেনি।

প্রদীপ্ত মুখগুলি, নির্ভীক চোখগুলি, আশে পাশের ছাড়া-ছাড়া কথা ও আলোচনার টুকরোগুলো, সমস্বরে শ্লোগান উচ্চারণের ধ্বনিগুলি এক অনুভূতির এক অদ্ভুত দুরন্তপণা তাকে আটকে রেখেছে।

বক্তৃতা যারা দিয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন হেমন্তের চেনা। বুকের মধ্যে তোলপাড় করেছে তার, খানিক বক্তৃতা শুনে বাকিটা এই তিনজন চেনা ছাত্রের নতুন পরিচয় আবিষ্কার করার বিস্ময় ও উত্তেজনায়। চোখে দেখে কানে শুনেও অবিশ্বাস্য, অসম্ভব মনে হয় এখানে ওদের উপস্থিতি, আন্দোলনে অংশ গ্রহণ!

বিশেষ ভাবে হেমন্তের – যার সঙ্গে পাল্লা দিতে হওয়ায় গত পরীক্ষায় সে অনার্সে প্রথম স্থানটি পায়নি বলে আজও তার বুকে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে। আনোয়ার ও শিবনাথের পরীক্ষার ফলও তো কত ভাল ছেলের বুকে ঈর্ষার আগুন জেলে দিয়েছে। ওরা রাজনীতিও করে আবার শান্তশিষ্ট ভদ্র হয়ে থাকে, ছাত্রজীবনের সাংস্কৃতিক সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে, পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করে কি করে?

মাকে মনে পড়ে হেমন্তের। সীতাকেও। এইখানে এভাবে তাকে পুলিসের লাঠি ও গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে বসে থাকতে দেখলে মার মুখের ভাব কি রকম হত ভাবতে গিয়ে কল্পনায় যেন কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায় না মার মুখখানা, বড় বড় চোখের আতঙ্ক-বিহ্বলতার আড়ালে মুখের বাকী অংশ ঝাপসা হয়ে থাকে। আজ এত দিন পরে মার কাছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল—একেবারে চরমভাবে। রাজনীতি মাথায় ঢুকলে পড়াশোনায় তার অবহেলা আসবে, সে মানুষ হবে না, হয়তো জেলেও যেতে হবে তাকে ছ'মাস এক বছরের জন্য, এই হল মার ভয়, দুর্ভাবনার সীমা। মরণের সামনে সে যে মুখোমুখি দাঁড়াবে কোন দিন আজকের মতো, একথা মা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কোন কালে। রাজনৈতিক সভায় পর্যন্ত কখনো যাবে না বলে যে ছেলে কথা দিয়েছে আর সে কথা পালন করে এসেছে এত দিন অক্ষরে অক্ষরে, তার হঠাৎ এমন মতিভ্রম হবে যে সভা থেকে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েও যথেষ্ট হয়েছে মনে না করে হাঙ্গামার মধ্যে খুন হবার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, এ কথা জানলে রক্ত বোধ হয় হিম হয়ে যাবে মার।

সে সিগারেট খেতে আরম্ভ করবে এই ভয়ে মার বুক কাঁপে!

কাল জোর করে তার হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়েছিল পঙ্কজ, বলেছিল, ওগো ভাল ছেলে, একটু ধোঁয়া দাও বুদ্ধির গোড়ায়, বুদ্ধি সাফ হবে। সীতা তাকে ভাল ছেলে বলে ডাকে, বন্ধুরা ডাকটা লুফে নিয়েছে। সিগারেট হেমন্ত খায় না, পান-সুপারীর নেশাটুকু পর্যন্ত তার নেই। সিগারেটটা সে পকেটে রেখে দিয়েছিল। ভাত খেয়ে জামা পরে বেরোবার সময় পকেটে সিগারেটটা হাতে লাগায় কেন কি খেয়াল জেগেছিল তার সে নিজেই জানে না, দেশলাই খুঁজে এনে সিগারেটটা ধরিয়েছিল কাঠের চেয়ারে আরাম করে বসে। পঙ্কজের অনুকরণে টান দিয়েই কাশতে কাশতে সিগারেটটা সে ছুঁড়ে দিয়েছিল ঘরের কোনায়, সেখানে সেটা পুড়ছিল। মাথা ঘুরে ওঠায় একটু সামলে নেবার জন্য চেয়ারেই বসেছিল হেমন্ত।

ঘরে ঢুকে সিগারেটের গন্ধ নাকে যেতেই মা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। শূন্য ঘর দেখেও তিনি যে ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ খুঁজেছেলেন, হেমন্ত টের পেয়েছিল। অন্য যে কোন একজন লোক ঘরে থাকলে মা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি পেতেন নিশ্চিন্ত হতেন।

'বেরোসনি?'

কত চেষ্টায় মা গলা কাঁপতে দেননি,' সহজভাবে কথা বলেছেন, বুঝতে পেরেছিল হেমন্ত।

'এই বেরোব এবার। জল দাও তো একটু।'

হেমন্ত জল খেয়ে গেলাস নামিয়ে রাখার পরেও মা সোজা-সুজি সিগারেটের কথা তুলতে পারেনি। জিজ্ঞেস করার অদম্য ইচ্ছা জোর করে চেপে রেখেছিলেন হেমন্ত কি জবাব দেবে এই ভয়ে। যদি সে বলে বসে, হ্যাঁ, সিগারেট সে ধরেছে! যদি সে রাগ করে সামান্য সিগারেট খাওয়া নিয়ে পর্যন্ত তাঁর খেঁচখেঁচানিতে,—তার বয়সের কোন্ ছেলেটা না সিগারেট খায়? মার ভীরু করুণ দৃষ্টি শুধু বার বার গিয়ে পড়ছিল ঘরের কোনায় জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে, হেমন্তের মুখে বুলিয়ে নিয়েই চোখ নত করছিলেন।

তারপর হঠাৎ সেই চোখ ভরে গিয়েছিল জলে। হেমন্ত তখন ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে মা? সিগারেট আমি খাই না, তোমার ভাবনা নেই। পঙ্কজ একটা সিগারেট দিয়েছিল, হঠাৎ কি সখ হল, ধরিয়েছিলাম। খেতে পারিনি, তাই ফেলে দিয়েছি।'

'ওঃ!' বলে মা নিশ্চিন্ত হয়ে মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'কেন কেঁদেছি শুনবি হেমা? তুই সিগারেট খাস ভেবে নয়, আমায় লুকিয়ে খাস ভেবে, খাওয়া অন্যায় জেনে খাস ভেবে। আমি মনে করলাম, আমায় আসতে দেখে তুই তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ফেলে দিয়েছিস। নইলে সিগারেট খাওয়া দোষের নয় বুঝে তুই যদি খাস হেমা, খেতে ইচ্ছা হলে—'

আঁচল দিয়ে চোখের জলের সঙ্গে মুখের হাসিটুকুও যেন মা মুছে নিয়েছিলেন।

'এখন আর ভাবনার কিছু নেই তো?'

'এমনি করেই কিন্তু হ্যাবিট জন্মায় হেমা, ইচ্ছা না থাকলেও।'

মার কথা ভেবে মায়া বোধ করে হেমন্ত, কিন্তু কেমন এক বৈরাগ্য মিশে সে মায়াবোধের ব্যাকুলতা আর উদ্বেগকে নিরস্ত করেছে এখন। মাকে মনে হচ্ছে দূরে, বহু দূরে। এখান থেকে ট্রামে বাড়ি যেতে সময় লাগে মোটে মিনিট পনের, সেখানে মা হয় তো আকুল হয়ে আছেন তার জন্য, কিন্তু বিরাট এক বাস্তব সত্য যেন দুস্তর ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে রাজপথের এই শক্ত ফুটপাথ আর মায়ের অগাধ স্নেহ, অসীম শুভ কামনা অনন্ত দুর্ভাবনা ভরা সেই নীড়ের মাঝখানে, শান্তি আর যুদ্ধের সময়কার জগতের মতো অতি ঘনিষ্ঠ অথচ অসীম দূরত্ব ও পার্থক্যের ব্যবধান।

এখন কি যেতে পারে না সে বাড়ি ফিরে? একেবারে প্রথম দিনের পক্ষে এই কি যথেষ্ট হয়নি, আজ আর নাই বা এগোল? নিজের মনেই মাথা নাড়ে হেমন্ত।

একা উঠে চলে যাওয়া যায় না একার প্রয়োজনে। না এলে ভিন্ন কথা ছিল, এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না। তার না হয় মার জন্য অবিলম্বে বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার, একা হলে হারও না হয় সে মেনে নিত সেজন্য নিজের কাছে অপমানে নিজে কালো হয়ে গিয়ে, কিন্তু এদের সকলকে হার মানাবার অধিকার তো তার নেই। সে উঠে গেলে আর একজন দু'জনও যদি তার অনুসরণ করে?

সীতাকেও মনে পড়ে হেমন্তের।

মার মতোই তাকেও মনে হয় বহু দূর, কুয়াশাচ্ছন্ন। মার মতো বড় বড় চোখ নেই সীতার, তাই বোধ হয় চোখ দুটি পর্যন্ত তার কল্পনার সীমান্তে সরে গেছে ধারণা হয়। সীতার মৃদু ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, আচমকা ঘনিয়ে আসা গাম্ভীর্য, তিক্ত বিষাদ আর কটু অনুকম্পা ভরা কথা এবং কদাচিৎ হেমন্ত যে কোন্ শ্রেণীর জীব ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না এমনি বিব্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, এসব যেন প্রায় ভুলে যাওয়া অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়ে গেছে, এসবের জন্য যে প্রতিক্রিয়া জাগত নিজের মধ্যে তাই যেন হেমন্তের অবলম্বন।

অথচ, আজকেই দেখা হয়েছিল সীতার সঙ্গে।

'এসো ভালো ছেলে' বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সীতা। বলেছিল, 'ক্লাস হল না বলে কষ্ট হচ্ছে? মন খারাপ? কি করব বল! সবাই তো বিদ্যালাভ করেই খুসী থাকতে পারে না, অন্যায়-টন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাতে চায়।'

আজ যেন রীতিমতো ঝাঁজ ছিল সীতার কথায়, শুধু ব্যঙ্গাত্মক খোঁচা নয়। হেমন্তের মনে হয়েছিল, সে যেন শেষ পর্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠেছে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে। তার সঙ্গে মতে না মিলুক, তার নিরুত্তাপ রক্ষণশীল মতিগতিকে অবজ্ঞা করুক, তার একাগ্র নিষ্ঠা, নিরুপদ্রব সহনশীলতা, দুঃখী মায়ের জন্য তার ভালবাসা, এসবের জন্য খানিকটা শ্রদ্ধা তাকে সীতা বরাবর দিয়ে এসেছে। আজ যেন সে শ্রদ্ধাও সে রাখতে পারছে না মনে হয়েছিল হেমন্তের, তাকে যেন সহ্য করতে পারছে না সীতা।

'অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত বৈ কি।'

'তবে?'

'বিদ্যালাভে অবহেলা করাও অন্যায়, অন্যায় সহ্য করাও অন্যায়।'

'তবে?'

তখন হেমন্ত বুঝেছিল সীতার জ্বালার মর্ম। কিছু না বলেও সীতা তাকে প্রশ্ন করেছে, আজও তুমি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে তোমার আদর্শবাদী স্থবিধাবাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অজুহাতে? আজও তুমি এটুকু স্বীকার করবে না যে শিক্ষার্থীকেও আজ অন্তত ভাষায় ঘোষণা করতে হবে এ অন্যায়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদকে সে সমর্থন করে, সেটা রাজনীতি চর্চা হোক বা না হোক?

জবাব দিতেই হবে সীতার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের। গভীর বিষাদ অনুভব করেছিল হেমন্ত। সীতা কি বুঝবে তার কথা?

'আমার কি মুশকিল জান সীতা?' হেমন্ত ভূমিকা করেছিল, 'আমি সিরিয়াসলি কথা বললেও তুমি সিরিয়াসলি নিতে পার না!'

'কথা! তোমার শুধু কথা!'

'তা ছাড়া কি করার আছে? প্রতিবাদ যে জানানো হবে, তাও তো কথাতেই?'

তখন কি হেমন্ত জানত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা কথা কত সহজে কি অনিবার্য-ভাবে কাজে রূপান্তরিত হতে পারে: কণ্ঠের প্রতিবাদ পরিণত হতে পারে জীবন-পণ ক্রিয়ায়!

সীতা চুপ করে থাকায় আবার সে বলেছিল, 'কথাকে অত তুচ্ছ করো না সীতা। মানুষ বোবা হলে পৃথিবীটা অন্য রকম হত। ও-সব বড় দার্শনিক কথায় যাব না। আমার কথাটা মন দিয়ে শুনবে কি শান্ত হয়ে? তুমি তো জানো, আমি যা বলি তাই করি। কথার প্যাঁচও কষি না, ফাঁকিবাজী কথাও বলি না।'

'শুনি তোমার কথা।'

'তুমি কি বুঝবে আমার কথা?'

'পারবে বুঝিয়ে দিতে?'

অতি বিশ্রী, অতি নীরস নীরবতা এসেছিল কিছুক্ষণের।

সাহস সঞ্চয় করে হেমন্ত বলেছিল তারপর, 'অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু তারও তো নিয়ম আছে, যুক্তি আছে? ধরো তুমি আমার সঙ্গে আছ, কেউ তোমায় অপমান করল। তখন সোজাসুজি ঘুষি মেরেই আমি সে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাব।'

সে এক পুরানো ঘটনা। আজকের বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার জন্য তার সেই

বীরত্বের ইঙ্গিত সে কেন করেছিল হেমন্ত জানে না। এই উদাহরণ দিয়ে তার বক্তব্য খুব সহজে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বলা যেত বটে কিন্তু সেটা অন্য ভাবেও বলা যেত।

'আমি ভুলিনি ভালো ছেলে। কৃতজ্ঞ আছি।'

'সেজন্য তুলিনি কথাটা' হেমন্তকে বলতে হয়েছিল চাবুকের জ্বালা হজম করে, 'আমার কথা শুনলেই বুঝতে পারবে। ও-ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিল, করেছিলাম। পরাধীন দেশে হাজার হাজার অন্যায় চলে, তার প্রতিবাদ করতে গেলে আমি দাঁড়াই কোথায়? দেশে চল্লিশ কোটি লোক, তার মধ্যে আমরা ক'জন লেখাপড়া শিখছি তুমি জানো। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভাল করে লেখাপড়া শেখাটাই কার্যকরী প্রতিবাদ, লড়াই করা। শিক্ষিত লোকের কত দরকার দেশে, আমরা সামান্য যে ক'জন সুযোগ পেয়েছি, তারা নাই বা গেলাম হৈ-চৈয়ের মধ্যে?'

সীতার চাউনিতে বোধ হয় ঘৃণাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

'সব কিছু থেকে ও-ভাবে গা বাঁচিয়ে কারা লেখাপড়া শেখে জানো ভালো ছেলে? দেশের প্রয়োজন, দেশের কথা যারা ভাবে তারা নয়, পাস করে পেশা নিয়ে নিজে আরামে থাকার কথা যারা ভাবে তারা। স্বদেশী মার্কা মালিকের পাপের ছুতো যেমন এই যুক্তি যে ইণ্ডাষ্ট্রীতেই দেশের উন্নতি, তোমাদের যুক্তিটাও তাই। ছাত্র-আন্দোলোন যারা করে তোমার চেয়ে তারা ভাল করে লেখাপড়ার দরকার বোঝে। তারাই জোর করে বলে ছাত্রদের, ডিসিপ্লিন বজায় রাখা প্রথম কর্তব্য ছাত্রের, শিক্ষার যতটুকু সুযোগ আছে প্রাণপণে তা গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেক ছাত্রকে, পরীক্ষায় পাস করাটা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। তাই বলে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোন যোগ থাকবে না? তারা প্রকাশ করবে না তাদের রাজনৈতিক মতামত, সঙ্ঘবদ্ধ হবে না তাদের দাবি, তাদের ক্ষোভ, তাদের দেশপ্রেমের প্রকাশকে জোরালো করে তুলতে?

'তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছি ছাত্র-জীবনে।'

'তার ফল? ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি বেড়েছে, দুর্মতি বেড়েছে? সেটা কিসের ফল হেমন্ত? দেশকে ভালবাসার, স্বাধীনতা দাবি করার; ছাত্রদের এক করার আন্দোলন চালানো, এ সবের ফল? তলিয়ে যা বোঝবার চেষ্টা পর্যন্ত কর না, কেন তা নিয়ে তর্ক কর? খারাপটাই দেখছো, অথচ তার কারণ কি বুঝতে চাও না, মন-গড়া কারণ, মন-গড়া দায়িক খাড়া করে তৃপ্তি পাও—আমার কথাই

ঠিক ! ভাল লক্ষণগুলি তো চোখেই পড়ে না ।'

'সে আমার দোষ নয় সীতা। খারাপ লক্ষণগুলিই চোখে পড়ে, ভালগুলি পড়ে না, তার সোজা মানে এই যে ভাল লক্ষণ বিশেষ নেই চোখে পড়বার মতো।'

'তুমি আজ এসো হেমন্ত।'

রাগে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল হেমন্তের চিন্তা, জ্বালা ধরে গিয়েছিল বুকে। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। সীতা তাকে শুধু সহ্যই করে এসেছে চিরকাল, আজ তার সেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হেমন্তের পক্ষে। সীতা চায়ও না চোখ-কান বুজে সে তার মতে সায় দিক, তার কথা মেনে নিক। মতের বিরোধ তাদের আজকের নয়, অনেকবার তাদের কথাকাটাকাটিতে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনায় আজকের তর্ক তাদের খুব ঠাণ্ডাই হয়েছে বলতে হবে। কেন তবে সে অসহ্য হয়ে উঠল আজ সীতার কাছে? এমন কোন সিদ্ধান্তে কি সীতা এসে পৌঁছেছে তার সম্বন্ধে যার পর তার সঙ্গে ধৈর্য ধরে কথা বলা আর সম্ভব হয় না? বুদ্ধি দিয়ে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করেছিল হেমন্ত, কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিল, অত জটিলতার মধ্যে যাবার তার দরকার কি? মনটা হয়তো ভাল ছিল না সীতার কোন কারণে। মেজাজটা হয়তো বিগড়েই ছিল আগে থেকে। মন কি ঠিক থাকে মানুষের সব সময়!

সীতার তীব্র বিরাগের রহস্য যেন একটু স্বচ্ছ হয়েছে এখন। দু'টো-একটা ইঙ্গিত জুটেছে রহস্যটা আয়ত্ত করার। কতকগুলি বিষয়ে বড় বেশী সে গোঁড়া হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই। পৃথিবীটা সত্যই অনেক বদলে গেছে। কল্পনাতীত ঘটনা সত্য সত্যই আজ ঘটছে তারই চোখের সামনে; দেশের মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, ছেলেদের মধ্যেও। নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দীপনা এসেছে—নতুন চেতনার লক্ষণ মোটেই আর অস্পষ্ট নয়। তারই শুধু এ সব চোখে পড়েনি। নিজের পুরানো ধারণা, পুরানো বিশ্বাসের স্তরেই সে ধরে রেখেছিল দেশকে চোখ-কান বুজে, ভেবেছিল তার মন এগোয়নি বলে দেশটাও পিছনে পড়ে আছে তারই খাতিরে!

এই গোঁড়ামি সহ্য হয়নি সীতার। মতের অমিলকে সীতা গ্রহণ করতে পারে সহজ উদারতায়, অন্ধ গোঁড়ামি তার ধৈর্যে আঘাত করে।

ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবার চেষ্টার পর ঘোড়সওয়ারেরা তখন ফিরে গেছে।

পাশের ছেলেটি বলছিল: 'কি সুন্দর ঘোড়াগুলি! তালে তালে পা ফেলছে আর মাসেলগুলিতে যেন ঢেউ খেলছে নেচে নেচে।'

বয়স তার পনের-ষোল বছরের বেশী হবে না। রোগা চেহারা, ফর্সা রঙ, খুব ঢ্যাঙা। আলোয়ানটা এমন করে গায়ে জড়িয়েছে আরাম করার ভঙ্গিতে যেন আসরে বসেছে গান-বাজনা শুনে বা সিনেমা-থিয়েটার দেখে উপভোগ করতে।

'কত তোয়াজে থাকে।' বলেছিল চশমা-পরা যুবকটি গম্ভীর ভাবে। তার উৎসুক দৃষ্টি ক্রমাগত সঞ্চালিত হচ্ছিল এদিক্ হতে ওদিকে, মনে মনে সে যেন মাপছে ওজন করছে হিসাব কষছে যাচাই করছে ছোট-বড় ঘটনা ও পরিস্থিতির বিশেষ এক মূল্য।

'এমন ইচ্ছে করছিল ঘোড়ার গা চাপড়ে দিতে!' ঢ্যাঙা ছেলেটি বলেছিল নির্বিকার ভাবে, 'মাথাটা বোধ হয় ফাটিয়ে দিত তা হলে।'

দিত কি? একটা কেমন খটকা লেগেছিল নারায়ণের মনে। তাদের কাছ দিয়ে যে ঘোড়াটি ঘুরে গেছে, ওর ছেলেমানুষী চোখ দেখেছে তার মসৃণ চামড়ার নীচে পরিপুষ্ট মাসেলের নাচ, নারায়ণের চোখ দেখেছে পাগড়ী-আঁটা বিশাল গোঁফওলা অতি জবরদস্ত চেহারার ভারতীয় সওয়ারটির ঘোড়া চালাবার কায়দার মধ্যে অনিচ্ছার সংকেত, দ্বিধা, গোপন সতর্কতা। খেলার মাঠে এদের বেপরোয়া ঘোড়া চালানো দেখেছে নারায়ণ অনেকবার। আজকের চালানোটাই যেন অন্য রকম।

সত্যই কি দেখেছে, না সবটাই তার কল্পনা? অথবা এই রকমই ওদের রাজপথের জনতা ছত্রভঙ্গ করার রীতি?

রীতি যাই হোক্, জখম হয়েছে অনেক।

'ইস্!'

হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে ঢ্যাঙা ছেলেটি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। নারায়ণও চেয়ে থাকে। রাস্তায় শুয়ে পড়ে মোচড়া-মুচড়ি দিচ্ছে একটি আহত ছেলে।

আগুনের হল্কা যেন বেরোয় নারায়ণের দু'চোখ দিয়ে, অসহ্য জ্বালা যেন কথার রূপ নেয়, 'ওই টুপিওলাটার কাজ, টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে তবে ঠিক হয়। বসে আছে সব হাত গুটিয়ে। সবাই মিলে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে—'

গলা বুজে যায় নারায়ণের।

'কি যে বলেন!' ছেলেটি ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে বড় বড় টানা চোখে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য সুন্দর ওর চোখ দুটি।

'তোমার ইচ্ছে করে না খোকা—'

'আমার নাম রজত।'

'রজত? রজত নাম তোমার? তোমার ইচ্ছে করে না রজত, ওটাকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলতে?'

'করে তো, সবারই ইচ্ছে করে। কিন্তু শুধু ইচ্ছে করলেই তো হয় না? যা ইচ্ছে তাই করলে চলে নাকি!'

এতটুকু ছেলের মুখে বুড়োর মতো কথা শুনে নারায়ণ একটু থতমত খেয়ে যায়। বুঝতে সে পারে যে যাই সে বলুক এরকম বুড়োর মতোই জবাব দেবে ছেলেটা, তবু সে বলে, 'সবাই মিলে তেড়ে গিয়ে ওদের কটাকে পিষে থেঁতলে দিলে এরকম করতে সাহস পায় ওরা?'

'পায় না? কিছু বোঝেন না আপনি।' গভীর দুঃখের সঙ্গে রজত বলে, তার সেই গুরুমশায়ী আপসোসের সঙ্গে কথা বলা এমন অদ্ভুত ঠেকে নারায়ণের কানে!—'আমরা মারামারি করতে গেলেই তো ওদের মজা। তাই তো ওরা চায়। আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক। ওরা জানে, বাড়াবাড়ি করলে চাদ্দিকে কি কাণ্ড বাধবে। দেখছেন না রাগ চেপে শুধু খুচ্‌খুচ্‌ ঘা মারছে? আমরা যাতে ক্ষেপে যাই? ইচ্ছে করলে তো দু' মিনিটে আমাদের তুলো ধুনো করে দিতে পারে, দিচ্ছে না কেন? আমরা যেই মারামারি করতে যাব, বাস্, আমরা আর দেশের সবাই থাকব না, শুধু আমরা হয়ে যাব। লোকে বলবে আমরা দাঙ্গা করে মরেছি।' ঠোঁট গোল করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে রজত, 'আপনাদের মতো রগচটা লোক নিয়ে হয়েছে মুশকিল। কিছু বোঝেন না, তিড়িং তিড়িং শুধু লাফাতে জানেন।'

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে নারায়ণের! কিশোর ঠিক নয়, বালকত্ব ছাড়িয়ে সবে বুঝি কৈশোরে পা দিয়েছে। সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে নবযুগের বেদবেদান্ত উপনিষদ সেকালের ঋষিবালকদের মতো, পুরাণেই যাদের নাম মেলে। এইটুকু ছেলে যদি এমন করে বলতে পারে এসব কথা, শক্তিপুত্র পরাশর যে মায়ের গর্ভে থেকেই বেদধ্বনি করে পিতামহ বশিষ্ঠের আত্মহত্যা নিবারণ করবে সে আর এমন কি আশ্চর্য কাহিনী!

'তুমি কোন ক্লাসে পড় রজত ?'

'যে ক্লাসেই পড়ি না।'

'রাগ করলে ?' নারায়ণ অনুনয় করে বলে, যে ক্লাসেই পড়, সে কথা বলিনি। আমি অন্য কথা বলছিলাম।'

'কি বলছিলেন ?'

'বলছিলাম কি, স্কুলে তো এসব শেখায় না, তুমি যে এসব কথা এমন আশ্চর্য রকম বোঝ, এসব তোমায় শেখাল কে ?'

রজত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'আমিই শিখেছি, খানিকটা দিদি শিখিয়েছে।' মুখ কাছে এনে অতিবড় গোপন কথা বলার মতো নীচু গলায় রজত বলে, 'ওইখানে দিদি বসে আছে—তাকাবেন না। আমি এখানে আছি টের পায়নি।'

নারায়ণ গম্ভীর হয়ে বলে, 'উনি কিন্তু টের পেয়েছেন রজত।'

শুনে রজত ভড়কে যাবে ভেবেছিল নারায়ণ, কিন্তু রজত জিভে ঠোঁটে তার সেই অদ্ভুত আওয়াজটাই শুধু করে একবার।—'টের পেয়েছে ? আপনি কি করে জানলেন ?'

'দু তিনবার তোমায় ডাকলেন নাম ধরে। শুনতে পাওনি ?'

কোন বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করা যেন স্বভাব নয় রজতের। ঘাড় উঁচু করে দিদির দিকে মুখ করে সে চেঁচিয়ে ডাকে, 'দিদি ! ডাকছিলেন নাকি আমায় ?'

শান্তি বলে, 'এদিকে আয়। কথা শুনে যা।'

'কি করে যাব ?' রজত প্রতিবাদ জানায়, 'জায়গা বেদখল হয়ে যাবে আমার।' আরও গলা চড়িয়ে বলে, 'যা বলবার বাড়িতে গিয়ে বোলো, কেমন ?'

অনেক দিন পরে নারায়ণ কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে, নিদারুণ হতাশার জ্বালা যেন তার নেই আর। আশ্চর্য রকম শক্ত আর সমর্থ মনে হয় নিজেকে। তারই দুঃসহ আক্রোশের যে চাপ তাকেই ভেঙে চুরমার করে দেবে, সেটা যেন কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সে অনুভব করে। পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চিত যে ঘৃণা, জীবন্ত মর্মান্তিক ঘৃণা, অস্থির চঞ্চল করে রাখে তাকে সব সময়, নতুন করে নাড়া লাগলে যেন উন্মাদ করে তোলে, নিজে বয়লারের মতো শক্ত হয়ে সেই প্রচণ্ড ঘৃণার বাষ্পকে সে যেন আয়ত্ত করেছে এখন, চাকা ঘুরবে এগিয়ে যাবার। তারই মতো এদের সবার বুকে ঘৃণা, এতটুকু ছেলেটার পর্যন্ত। কিন্তু সে আর পরাজিতের, পদদলিতের নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরার ঘৃণা নেই, তা এখন জয়লাভের প্রেরণার উৎস।

রাস্তায় শুয়ে পড়ে যে ছেলেটি মোচড়ামুচড়ি দিচ্ছিল তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরেও সেই স্থানটির দিকে কেমন এক জিজ্ঞাস্থ চোখে চেয়ে থেকে কি যেন ভাবে রজত। এতক্ষণ পাশে বসে আছে, এমন চিন্তিত তাকে নারায়ণ ছাখেনি।

'দিদি বকবে নাকি বাড়ি গেলে ?'

'কেন ? বকবে কেন ?'

'কি তবে ভাবছ এত একমনে ?'

'কি ভাবছি ?' বেশ একটু বিনয়ী, লাজুক ছেলের মতো কথা কয় রজত, 'ভাবছি কি, ওকে নিয়ে কবিতা লিখতে চাইলে কি করে লেখা যায়।'

'কাকে নিয়ে ?'

'ওই যে মোচড়ামোচড়ি দিচ্ছিল ছেলেটা।'

'তুমি কবিতা লেখো ?'

'লিখি। ছাপতে দিই না, পরে দেব। দিদি বলে, লিখে লিখে হাত না পাকলে ছাপতে দিতে নেই। আচ্ছা, এরকম করে যদি আরম্ভ করা যায় ? সাদা সওয়ারের প্রকাণ্ড ঘোড়া নাচে, বুক পেতে দেয় ছেলেরা খুরের নীচে। নাঃ, এ হল না। বুক পেতে দেবে কেন ? অত সখে কাজ নেই। কিন্তু—'

রজত ভাবতে থাকে।

আয়োজন দেখে রসুল ভাবে, এবার লাঠি চার্জ হবে।

কপালের ডান দিকে পুরানো ক্ষতের চিহ্নটা চিনচিন করে ওঠে তার। ক্ষতের এ দাগ মিলোবে না কোন দিন, স্মৃতিও নয়। স্মৃতি মিলিয়ে যাবে হয়তো চোখ বোজবার আগেই, ক্ষতের দাগ মিলোবে না যত দিন পর্যন্ত কবরে সে মাটিতে পরিণত হয়ে না যায়।

'এবার লাঠি চার্জ হবে মালুম হচ্ছে আবদুল।'

'হবে না কি ? একটা সিগারেট দে তবে টেনে নি।'

ক্ষতটা লাঠির, প্রশস্ত কপালের ডান পাশে চুলের ভেতর থেকে ডান চোখের ভুরু পর্যন্ত চিরস্থায়ী ক্ষতের যে দাগটা আছে। মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যে এই পুরস্কার জোটে মানুষের, আজও বিশ্বাস করতে পারে না রসুল। দুর্ভিক্ষের সময় পড়া ছেড়ে দিয়ে সে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল, কয়েকজনকেও যদি বাঁচাতে পারে। গাঁয়ের নাম চিরবাগী, জমিদার শ্রীচপলাকান্ত বসু। গাঁয়ে পৌঁছবার তিন দিন

পরে দাফন কাফন সারতে হয়েছিল তার নিজের মায়ের। না খেয়ে মা তার মরেন নি, অসুখে মারা যান। আকস্মিক এ আঘাতেও সে কাবু হয়নি, কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লেগেছিল গাঁয়ে একটা রিলিফ সেণ্টার খুলতে। হঠাৎ এক দিন তার কাছে হাজির হয়েছিল জিয়াউদ্দীন, শ্রীচপলাকান্তের নায়েবজাতীয় স্থানীয় কর্মচারী। গাঁয়ের শতকরা আশি জন প্রজা মুসলমান। আসল নায়েব নকুড় ভট্টাচার্য, শাসন চালায় জিয়াউদ্দীন—শত অত্যাচার চালালেও কেউ যাতে না বলতে পারে যে হিন্দু অত্যাচার করেছে মুসলমানের ওপর।

'এ গাঁয়ে রিলিফ সেণ্টার কেন? অন্য কোথাও কর গিয়ে। কর্ত্তা বলেছেন, ও-সব হাঙ্গামা এখানে চলবে না।'

খেতে না পেয়ে গাদা গাদা লোক মরছে, তাদের কয়েকজনকে কোন মতে জীয়ন্ত রাখার চেষ্টার নাম হাঙ্গামা! আসল কথা ছিল ভিন্ন। গাঁয়ে রিলিফ সেণ্টার হলে, মানুষ বাঁচানো আন্দোলন চললে, বাইরের নজর এসে পড়তে পারে চিরবাগীর ওপর। জমিদারীর আয়ে চলে না, তাই শ্রীচপলাকান্ত কারবার করছিল। অন্যায় অনাচার নোংরামি মজুতদারী চোরা কারবার এ সমস্তের কি কার কাছে ধরা পড়ে কে জানে; ঘুষ খায় না এমন অফিসার এক জনও যে নেই তাই বা কে বলতে পারে।

তবু রসুল থামেনি। চালা তুলেছিল, খাদ্য যুগিয়েছিল, ভলাণ্টিয়ার গড়েছিল, —নিজে পেছনে থেকে। খিচুড়ি বিতরণ আরম্ভ করার আগের দিন বিকালে লালদীঘির ধারের মাঠে সভার আয়োজন করেছিল—নিজে পেছনে থেকে। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ডাকা সেই সভায় কি করে দাঙ্গা বেধেছিল রসুল জানে না, সভার এক কোণে দাঙ্গা বাধার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে লাল পাগড়ীর আবির্ভাব হয়েছিল তাও সে বুঝতে পারেনি। লাঠির ঘায়ে কপাল ফাঁক হয়ে হাজার ফুলকি দেখে ঘুরে পড়বার ঠিক আগে এক লহমার জন্য লাল পাগড়ীর নীচেকার মুখটি সে দেখেছিল আজও সেই পৈশাচিক আক্রোশে বিকৃত মুখের ছাপ তার মনে আঁকা হয়ে আছে।

কেন এ আক্রোশ? কেন এ বীভৎস হিংসা? জগতের কোন অন্যায়, কোন অনিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না, এ যেন অন্যায়ের, অনিয়মেরও ব্যভিচার! মাথা ফাটাবার হুকুম পেয়েছিল, মাথা ফাটাক। ক্ষমতার দম্ভে প্রচণ্ড উল্লাস জাগুক মাথা ফাটাতে, তার মাথা তুলবার স্পর্ধায় রাগে ফেটে যাক কলিজা, সব সে মেনে নিতে রাজী আছে মানানসই বলে। কিন্তু সে-ই যেন যুগ যুগ ধরে অকথ্য অত্যাচারে

জর্জরিত করেছে, অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে উন্মাদ করে দিয়েছে, এমন অন্ধ উৎকট প্রতিহিংসার বিকার কেন ?

রস্থল জানে না। মনের পর্দায় প্রশ্নটা তার স্থায়ীভাবে লেখা হয়ে আছে ক্ষোভের হরফে।

প্রথম দিকে কোলাহল প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল সমবেত মানুষগুলির বিক্ষুব্ধ গর্জনে, এখন শান্ত হয়ে কলরবে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের শৃংখলা ও শান্ত সংযত চালচলনের প্রভাব জনতার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, সংযম হারিয়ে তাদের ক্ষেপে ওঠবার সম্ভাবনা আর নেই। উত্তেজনা ও শৃঙ্খলার অভাবটা অদ্ভুত লাগে রস্থলের, সে গভীর উল্লাস বোধ করে। ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় ভরে গেছে নিশ্চয় বুকগুলি, কিন্তু মাথাগুলি ঠাণ্ডা আছে। রস্থলের মনে হয়, সে যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরে এমনি গরম হৃদয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সমন্বয় প্রার্থনা করে আসছিল তার দেশের মানুষের কাছে, আজ এখানে দেখতে পাচ্ছে তার কামনা পূর্ণ হবার সূচনা।

নিখুঁত ছাঁটের দামী স্থন্দর পোষাক পরা সার্জেণ্টরা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে, ওদের হৃদয়ে কি ভাব ও মনে কি চিন্তা ঢাকা পড়ে আছে বাইরের রাজকীয় নিশ্চিন্ততা ও অগ্রাহের সর্বাঙ্গীন উদ্ধত ভঙ্গিতে ? ওদেরই জন্য স্থষ্টি করা চাকরির গৌরব ও গর্বই বেচারীদের সম্বল, তারই মধ্যে ওরা সাত হাজার মাইল দূরের দ্বীপটির মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে জন্মভূমির মাটিতে হাঁটবার সময়। চিরবাগী গাঁয়ের নুরুলের রাজহাঁস দু'টির কথা মনে পড়ে যায় রস্থলের।

পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে দেশী পুলিসেরা, নির্বাক্ নিশ্চল। হুকুমজারি হয়নি এখনো চার্জ করবার। পাশের রাস্তার ভিড়ের শেষ প্রান্ত যতদূর সম্ভব ভেদ করে গাড়ি এগিয়ে এনে, গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ঠেলে পুলিসের এলাকায় এসেছেন ব্যস্ত-সমস্ত এক ভদ্রলোক, অত্যন্ত উত্তেজিত বিব্রত আর অসহায় মনে হয় তাঁকে। এই শীতে গায়ে তাঁর আদ্দির পাঞ্জাবি, ফিকে মহুয়া রঙের দামী শাল অবশ্য আছে কাঁধে জড়ানো। ওঁর আবির্ভাবের জন্যই হয়তো স্থগিত রাখা হয়েছে লাঠি চার্জের হুকুম।

হাত নেড়ে নেড়ে ভদ্রলোক কি বললেন সার্জেণ্টদের দলপতিকে বোঝা গেল না, তারপর অতি কষ্টে তিনি উঠে দাঁড়ালেন একটি পুলিসবাহী লরীর উপর। কোন নেতা নিশ্চয়, রস্থল চেনে না।

'উনি কে রে আবদুল ?'

'জানি না। চেনা চেনা লাগছে—'

লরীর ওপর দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক প্রাণপণে চীৎকার করে ঘোষণা করলেন, স্বয়ং বসন্ত রায় নির্দেশ পাঠিয়েছেন হাঙ্গামা না করে সবাই ঘরে ফিরে যাক্।

হাজার কণ্ঠের গর্জনে তার জবাব এল, কোথায় বসন্ত রায়? উপদেশ চাই না! হাঙ্গামা নেই, চুপ করে বসে আছি। বসে থাকব যত দিন দরকার। উপদেশ চাই না।

অতি কষ্টে লরী থেকে নেমে ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে কিছুক্ষণ কথা কইলেন সার্জেন্টদের দলপতির সঙ্গে, তারপর ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন তাঁর গাড়ির দিকে পাশের রাস্তায়।

আবার শান্ত হয়ে গেল চারিদিক।

আবদুল বলে, 'এবার চিনেছি,—অমৃতবাবু। বসন্ত রায়ের একজন কেউ। সব মিটিং-এ হাজির থাকে, বক্তৃতা দেবার খুব সখ। কিন্তু বিশেষ বলতে পায়ও না, বলতে পারেও না ভালো।'

'এমন লোককে পাঠানোর মানে?' রসুল বলে বিরক্তির সুরে।

'পাঠিয়ে দিলো যাকে পেলো হাতের কাছে।'

'এভাবে চলে যাবার হুকুম পাঠানো উচিত হয়নি। নিজে এসে সব জেনে বুঝে—'

হৈচৈ হুল্লোড় নেই, হাঙ্গামা নেই, কিন্তু চারিদিকের থমথমে ভাবটাই কেমন উগ্র মনে হয় রসুলের। ধৈর্যের পরীক্ষা যেন চরমে উঠেছে।

'লাঠি চার্জ হবে না বোধ হয়,' আবদুল বলে।

'কি জানি।'

'ব্যাপার কোথায় গড়াবে ভাবছি। দু'পক্ষই চুপচাপ থাকবে এমনিভাবে?'

'তাই কখনো থাকে? এক পক্ষ ভাঙবেই, ধৈর্য হারাবে।'

'আমরা চুপচাপ আছি। ওরা তো মিছেমিছি হাঙ্গামা বাধাবে না। তবে?'

'দেখা যাক্। ডর লাগছে?

'কিসের ডর? আমি তো একা নই।'

কথাটা বড় ভাল লাগে রসুলের। এমন কিছু নতুন নয় কথাটা চমকে দেবার মতো, কিন্তু তারও অনুভূতির সঙ্গে মিলে যাওয়ায় মনের কথার প্রতিধ্বনির মতো মিষ্টি মনে হয়। জখমের, রক্তপাতের, হয়তো বা মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন্

মহাপুরুষের কিছুমাত্র ভয় হয় না জানা নেই রসুলের। তার বেশ ভয় করে, বেশ জোর করেই ভয়টা বশে রাখতে হয় তাকে। ভয় তাকে কাবু করতে পারেনি কোন দিন কোন অবস্থাতে এইটুকু সে সত্য বলে জানে, ভয় তার একেবারে হয় না এ মিথ্যাকে স্বীকার করতে লজ্জা তার হয়। নিজের কাছে বা পরের কাছে এর বেশী বাহাদুরী দেখাবার সাধ তার নেই, এইটুকুতেই সে সন্তুষ্ট। আজ ভয় ভাবনা বেশী রকম ক্ষীণ লাগছিল তার কাছে, বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে নতুন একটা বিশ্বাসের নির্ভয়ের ভাব অনুভব করছিল। আবদুলের কথায় তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে আবদুল ও তার সম অনুভূতিঃ সে একা নয়। আঘাতের বেদনা বা মৃত্যুর সমাপ্তি অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে।

লাঠি চার্জ শুরু হয় খানিক পরে।

এ পরিচিত ঘটনা রসুলের। বিশৃংখলা কোলাহল, মানুষের দিশেহারা ছুটোছুটির মধ্যেও সে অনুভব করে লাঠি চার্জের উদ্দেশ্য সফল হবে না নিরস্ত্র কতগুলি যুবক ও বালক জখম হওয়া ছাড়া। যারা নড়বে না ঠিক করেছে তাদের হঠানো যাবে না? দু'জন পুলিস এগিয়ে এসেছে কাছাকাছি। বেছে নেবার সময় ওদের নেই, এ ক্ষেত্রে সবাই সমানও বটে। রসুল পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে ডান দিকের পুলিসটির দিকে। ওদের সকলের মুখ তার চেনা মনে হয়, সবগুলি মুখ যেন এক ছাঁচে গড়া।

মাথা বাঁচাবার জন্য হাত দু'টি সে উঁচু করে ধরে। লাঠি এসে পড়ে কাঁধের কাছে, বাহুমূলে—লাঠির গোড়ার দিক্‌টা। লাঠি ধরে ছিল যে হাত, সে-হাত ইচ্ছে করে লাঠি তাকে মারে আগা দিয়ে নয়, মাঝখান দিয়ে নয়, গোড়ার দিক্ দিয়ে। ব্যথা একটু লাগে, কিন্তু রসুল তা অনুভবও করতে পারে না তার চোখ ছিল লাল-পাগড়ীর নীচেকার মুখটিতে আঁটা। সে স্পষ্ট দেখতে পায় লাঠি মারার সঙ্গে মুখটি তার দিকে চোখ ঠেরে চলে গেল।

'আবদুল! দেখেছিস্?'

'হুঁ। লেগেছে খুব? হাড় ভাঙেনি তো?'

'লাগেনি। একটুও লাগেনি! দেখিস্‌নি তুই?

'কি? কি দেখিনি?'

চোখের পলকের ঘটনা, কি দেখতে কি দেখেছে কে জানে! লাঠির গোড়ার দিক্‌টা হয়তো এসে লেগেছে ঘটনাচক্রে। তবু রাজপথে বসে মনে মনে আকাশ-পাতাল আউড়ে যায় রসুল সে যেন মুক্তি পেয়েছে, স্বাধীন হয়ে গেছে দেশের

আকাশে মাটিতে খনিগহ্বরে সমুদ্রে। নিশ্বাসে সে স্বাদ পায় বাতাসের। পথের স্পর্শ তার লাগে অন্য রকম। গাঁয়ের সেই সভায় যেন থেমে গিয়ে ছিল তার মনের গতি, তারপর থেকে এত দিন যেন সে বাস করছিল সেই সভার দিনটি পর্যন্ত সীমা টেনে দেওয়া পুরানো পরিবর্তনহীন জীবনে, পীড়ন পেষণ মৃত্যু দুর্নীতি হতাশার অভিশাপের মধ্যে। কিন্তু বদলে গেছে,—সব বদলে গেছে। ভোঁতা অন্ধকার হৃদয়ে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে নতুন চেতনাস্পন্দন। জোয়ার ঢুকেছে এঁদো ডোবায়।

ক্ষতচিহ্নটা কি মিলিয়ে গেছে। চিন্‌চিন্‌ করছে না যেন আর। মনে দাগ কেটে কেটে লেখা প্রশ্নটা হয়ে গেছে ঝাপ্‌সা, অকারণ। কেন যে এত ক্ষোভ, এত অসন্তোষ জাগিয়ে রেখেছিল সে একদিন একজনের অন্যায় করার নিয়মেরও ব্যভিচারে! ওরকম হয়। ওটা সৃষ্টিছাড়া কিছু ছিল না, সে যেমন ভাবত। জগতে যে একা করে দেখে নিজেকে, জীবনে কোন অন্যায় না করেও সেই পারে আত্ম-হত্যা করতে, অন্যায়ের আত্মগ্লানিতে সেই হতে পারে হিংস্র ক্ষ্যাপা পশু। পিছন থেকে অনায়াসে মানুষকে ছুরি মারে যে গুণ্ডা সে শুধু গুণ্ডাই থাকে যতদিন না পর হয়ে যায় তার অন্য সব গুণ্ডারা, একেবারে একা না হয়ে যায়,—তখন সে হয় বিকারেরও ব্যভিচার, শয়তান মানুষ থেকে আসল শয়তান!

'আবদুল, এবার কিছু ঘটবে।'

'কি ঘটবে?'

'জবর কিছু। দেখছিস্‌ না ছটফট করছে?'

গুলির আওয়াজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রসুলের ডান হাতটা যেন খেয়াল খুসীতেই আচমকা ছিটকে লাফিয়ে উঠে অসাড় হয়ে পড়ে যায়।

আবদুল বলে, 'কোথায় লাগল দেখি?'

'ফাটা কপাল কি না, ডান হাতটাতেই লেগেছে।'

দু'জনেরই পরনে পাজামা। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় খুলে খানিকটা ছিঁড়ে নেয়, পকেটের রুমালটা দলা পাকিয়ে ক্ষতমুখে চেপে বসিয়ে জোরে কাপড় জড়িয়ে বাঁধতে থাকে।

রসুল বলে চলে, 'বাঁ হাতে সব হয়তো আবার অভ্যাস করতে হবে। সাইকেল চালিয়ে কলেজে যেতে অসুবিধে হবে না এক হাতে কিন্তু—'

আজকেই শেষ, অক্ষয় ভাবে, আজ একটু খেয়ে শেষ করে দেবে। জীবনে

আর কোন দিন ছোঁবে না এ জিনিস। আজ থেকেই আর খাবে না ঠিক করেছিল সত্য, দু' পেগের বেশী এক ফোঁটাও খাবে না ভেবে রেখেও জীবনে শেষ দিনের খাওয়া বলেই অনেক বেশী হয়ে গিয়েছিল কালকের পরিমাণ, তাও সত্য। কিন্তু কাল তো সে জানত না 'আজ' এমন অভিজ্ঞতা তার জুটবে, এমন অদ্ভুত অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে দেখবে সে চোখের সামনে। গুলির আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক আর বাতাস, আহত হয়ে পড়ে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে আশে-পাশের মানুষ, মানুষ তবু নড়ে না, মৃত্যুপণ করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে! নিজের চোখে দেখেছে ঘটনা এখনো শেষ হয়নি রাজপথের রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত নাটকের রোমাঞ্চকর মর্মান্তিক অভিনয়, তবু যেন সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না এ ব্যাপার সত্যই ঘটেছে, এখনো রাস্তা জুড়ে জেদী মানুষগুলি প্রতীক্ষা করছে, এরপর কি ঘটে দেখা যাক! উত্তেজনায় দেহ-মন তার কেমন হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে কেমন করছে। সে নয় গেল। আজ এই বিশেষ দিনে এই বিশেস ঘটনা উপলক্ষে একটু যদি সে খায়, একটা কি দুটো মাত্র পেগ, এমন কি দোষের হবে সেটা?

সাড়ে আটটা বাজে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বার বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর হোটেল আছে, কিন্তু সেখানে পেগের দামও বড় বেশী। তাড়াতাড়ি করে গিয়ে একটা কি দুটো গরম পেগ খেয়ে নিয়ে একটু তফাত থেকে এখানকার ব্যাপারের কি পরিণতি হয় কিছুক্ষণ দেখে বাড়ি ফিরে গেলে কি এমন ক্ষতি হবে কার? কি এমন অপরাধ হবে তার?

অলকাকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে তার শরীর-মনের অবস্থা বর্ণনা করে সে যদি সব কথা বুঝিয়ে বলে, সে কি বুঝবে না? বিশ্বাস করবে না যে শুধু এই জন্যই আজ সে একটু খেয়েছে, নইলে সত্যই ছুঁতো না, নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালন করত? তবে, হয়তো কিছু বলারও দরকার হবে না অলকাকে। দু'-একটা পেগ খেয়ে গেলে অলকা হয়তো টেরও পাবে না। অতটুকুতে কিছুই হয় না তার। বেশ একটু মৌজের অবস্থাতেই তাকে দেখতে অলকা অভ্যস্ত, সে অবস্থা না দেখলেই সে খুসী হবে।

কিন্তু যদি গন্ধ পায়? ছিটকে সরে গিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে মুখে বেদনা ও হতাশার সেই অসহ্য ভঙ্গি এনে থর থর কাঁপতে থাকে আবেগ উত্তেজনার চাপে? বুঝিয়ে বলার পরেও যদি সে শান্ত না হয়, সুস্থ না হয়?

কোথায় গড়ানো জীবন নিয়ে আজ সে দাঁড়িয়েছে জীবনের এই অবিস্মরণীয় পরিবেশে। ধিক্ তাকে। শত ধিক্!

কিন্তু কি হয় একটু খেলে? আজকের মতো পেগ খাবার এমন দরকার তো তার কোন দিন আসেনি। শুধু সখ করে নেশার জন্যই খেয়েছে এতদিন। আজ একটু খেয়ে মাথাটা ঠিক করে নেওয়া তার বিশেষ প্রয়োজন, মনের একটু জোর না বাড়ালে তার চলবে না। দরকারের সময় ওষুধ হিসাবেও তো মদ খায় মানুষ?

কি এক দারুণ অস্বস্তিতে টান টান হয়ে গেছে শিরাগুলি অক্ষয়ের। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মতো মনটা পাক দিচ্ছে উপরে উঠে নীচে নেমে ঘুরে ঘুরে। আর কখনো কি সে একসঙ্গে অনুভব করেছে মদ খাবার এমন দুরন্ত তৃষ্ণা আর প্রবল বাধা নিজের মধ্যে? সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট ব্যালকনীতে। আলস্যের ভর দিয়ে ব্যথা করে গিয়েছে হাতে-পায়ে, শরীর আড়ষ্ট হয়ে এসেছে খানিকটা। ওরা তার চেয়ে অনেক আরামে বসে আছে পথে। তার মতো নিরাপদ ওরা নয় কিন্তু সেটা কি খেয়াল আছে ওদের কারো, বিপদ বা নিরাপত্তার কথা? দোকানের আলোগুলি আজ রাস্তায় পড়েনি। ওপর থেকে স্তিমিত নিস্তেজ আলোয় পথের অবিস্মরণীয় নাটকের এখনকার শান্ত, সম্ভাবনাপূর্ণ দৃশ্যটির অভিনয় ও অভিনেতাদের দিকে চেয়ে ভিতরে তোলপাড় চলতে থাকে অক্ষয়ের। অগাধ বিষাদের সমুদ্রে সাইক্লোনিক মন্থনের মতো। এত ক্লান্তি আর এত শূন্যতা কি আছে আর কারো জীবনে? এতখানি অসুস্থতা, আত্মবিশ্বাস? চিন্তা আর অনুভূতির গভীর বিপর্যয়ের মধ্যেও কে যেন তারই মনের মধ্যে বসে মৃদু ব্যঙ্গের স্বরে বলছে, নিজের সঙ্গে খেলা এ সব মাতালের, এক পেগ টানো সব ঠিক হয়ে যাবে, বাজে চিন্তা উড়ে যাবে কুয়াশার মতো, জীবন ভরে উঠে থইথই করবে আনন্দে কয়েকটা পেগ চালাবার পরেই।

নিজেই কি সে জানে তার কথারও কোন মূল্য নেই, ভাবনা চিন্তা অনুভূতিরও কোন অর্থ হয় না? এলকোহলের বাষ্প মাত্র সব?

নিজেকেই সে বিশ্বাস করে না!

অথচ মরণের মুখোমুখী দাড়িয়েও তো মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে। মরে যদি মরণটাও তার কাজে লাগবে, এ বিশ্বাস নিয়ে মরতে তো পারে মানুষ।

এ রকম বিশ্বাস ছাড়া বুঝি স্বাদ থাকে না জীবনের, যেমন তার গেছে। জীবনে স্বাদ না থাকলে বুঝি বিশ্বাসও থাকে না কোন কিছুতে, তার যেমন নেই।

বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হৈচৈ করে কত রাত কেটে যায়, কিন্তু সেই চরম

আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও সে থেকেছে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, একা। সে শুধু আদায় করেছে নিজের সুখ, কামনা করেছে নিজের উপভোগ, হাজার খুঁটিনাটি হিসাব ধরে মনে মনে বিচার করেছে কতটুকু সে পেল, ওরা তাকে ঠকালো কতখানি। রাজপথের ওদের সঙ্গেও সে একতা বোধ করতে পারছে না, ওদের জন্যই যত চিন্তা জেগেছে তার মনে সব সে পাক খাওয়াচ্ছে নিজকে কেন্দ্র করে।

কীর্তি ওদের, তাকে ছুতো করে সে একটু মদ খেতে চায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। ওদের মৃত্যুঞ্জয়ী গৌরবকে আত্মসাৎ করে সে মেটাতে চায় তার উৎসবের বুভুক্ষা। ওরা তার কেউ নয়, তার কাছে ওদের মূল্য আর সার্থকতা শুধু এইটুকু যে ওরা তাকে দার্শনিক করে তুলেছে।

'এখন যাবেন কি বাবু? গেলে পারতেন।'

মাখন দিনে আপিসের বেয়ারা, রাতে আপিসের পাহারাদার! বড় ছোট সাহেব আর বাবুরা কোন্‌কালে বেরিয়ে গেছেন আপিস থেকে ভালয় ভালয়, দু'শো টাকার এই বাবুটি টিকে আছেন এখন পর্যন্ত। এত কি ভয়, এত কি প্রাণের মায়া? সবাই বাড়ি যেতে পারল, ছেলেমানুষ সরলবাবু পর্যন্ত, ইনি ভয়ের চোটে তেতলা থেকে নীচেই নামলেন না মোটেই। রাতটা হয়তো এখানেই কাটাবার মতলব। জ্বালাতন করে মারবেন মাখনকে।

আবার বলে মাখন, 'ভয় নেই বাবু। আমি দু'বার বাইরে থেকে ঘুরে এসেছি। ওদিকে যাবেন না, পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বাড়ি চলে যান, কোন ভয় নেই। একটু হাঁটতে হবে।'

'মাখন—' অক্ষয় বলে, 'আমি মরতে ভয় পাই না।'

'আজ্ঞে না বাবু'—মাখন বলে সবিনয়ে। সে ভেবে পায় না বাইরে না বেরিয়েও অক্ষয়বাবু মাল টানলেন কি করে। সঙ্গেই থাকে হয়তো শিশিতে!

'আমি একটু ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছি মাখন। আমি ঘুরে এলে তুমি ঘুমোবে।'

'ঘুরে আসবেন?'

'ঘুরে আসব। বেশী দেরি হবে না, আধ ঘণ্টার মধ্যে।' সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় অক্ষয়। দরোয়ান সদরের গেটে একেবারে তালা এঁটে দিয়েছে। অক্ষয়কে দেখে সে অবাকও হয়, কথা শুনে রাগও করে।

'ঘুমকে আয়েগা ফিন?'

'জরুর আয়গা।'

গেটে তালা বন্ধ থাকবে, গেট খোলা রাখতে পারবে না রাম সিং। এতক্ষণ এ বাবু ভয়ে লুকিয়ে ছিল আপিসের ভিতরে, বাড়ি যেতে সাহস পায়নি। অবজ্ঞায় মুখ বাঁকা হয়ে যায় রাম সিংএর। কেন বাইরে যাচ্ছে বাবু সে বুঝে উঠতে পারে না। খাবার বা বিড়ি-সিগারেটের দোকান খোলা নেই কাছাকাছি, তাছাড়া ওদের জন্য তো বাবুদের নিজের বাইরে যাওয়া রীতি নয়, তাকেই হুকুম করত এনে দেবার। বাইরেই যখন যাচ্ছে বাবু, বাড়ি না গিয়ে ঘুরে আসবে কেন ?

বাবুদের চাল-চলন বোঝা দায়, রাম সিং ভাবে তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতার জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে।

গেট পাশের রাস্তার ভিতরে। ঘটনা-স্থলের বিপরীত দিকে এগোতে আরম্ভ করে অক্ষয়, একটু ঘুরে বারে যেতে হবে। ইতিমধ্যে বার যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে ? ন'টা প্রায় বাজে। বন্ধ না হলেও পেগ নিয়ে তাড়াতাড়ি গিলতে হবে। তার চেয়ে হোটেলেই কি চলে যাবে একেবারে ? সঙ্গে আবার টাকা আছে কম। আজ ইচ্ছে করে বেশী টাকা নিয়ে বার হয়নি। বারের মালিক তাকে চেনে, সেখানে দু'এক পেগ ধারে খাওয়া যেতে পারে। হোটেলে সঙ্গের পয়সায় দেড় পেগের বেশী হবে না।

বেশী খাবার মতলব তার আছে না কি ?

মন যেন কথা কয়ে ওঠে জবাবে : আগে বারে চলো, ধারে চট-পট দু'তিন পেগ খেয়ে নিয়ে নগদ যা আছে তা দিয়ে হোটেলে বসে যতটা জোটে মৌজ করতে করতে খাওয়া যাবে !

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। চাদরটা অক্ষয় ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয়! এই ঠাণ্ডায় ওরা কি সারা রাত রাস্তায় বসে থাকবে ? শীতে জমে যাবে না ? একটা জোরালো স্নায়বিক শিহরণ বয়ে যায় অক্ষয়ের সর্বাঙ্গে, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তেরাস্তার মস্ত মোড়ে, আলো সেখানে ঝলমল করছে বিশেষ ব্যবস্থায়। মাথাটায় কয়েক বার ঝাঁকি দিয়ে নেয়। তিন-চার বছর আগে হলেও সেও বোধ হয় পারত গুলির মুখে নির্বিবাদে রাস্তায় বসে থাকতে, সারা রাত ধরে শীতে জমতে। চাকরি নিয়েও বেশ ছিল কিছু কাল, যুদ্ধের বাজারে উপরি আয়ের উপায়টা খুঁজে পাওয়ার পর থেকে এই দশা হয়েছে তার।

পূব দিক্ থেকে ফুটপাথ ধরে তাদের আপিসের মনমোহন হন-হন করে এগিয়ে আসছে, দূর থেকেই অক্ষয় চিনতে পারে। মোড়ে এসে মনমোহন তাদের আপিসের পথে বাঁক নেবে, অক্ষয় তাকে ডাকল।

অক্ষয় এখন এ অঞ্চলে কি করছে মনমোহন ভাল ভাবেই জানে। দু'জনে কাছাকাছি হওয়া মাত্র সে বলে, 'আমি বড় ব্যস্ত ভাই।'

'হাঙ্গামার ওখানে যাবি না কি?'

'হ্যাঁ ওখানেই যাচ্ছি।'

'তুমি কখন খবর পেলে? আপিস থেকে বেরোতে দেখিনি তোমায়।'

'আমি সঙ্গেই ছিলাম। টিফিনের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

মনমোহন একটু আশ্চর্য হয়ে অক্ষয়ের মুখের দিকে তাকায়। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বলছে অক্ষয়, মদ যে খেয়েছে বোঝা যায় না।

'এখন তবে—?' অক্ষয় প্রশ্ন করে, 'বাড়ি থেকে ঘুরে এলে বুঝি?'

কথা বলার সময় মনমোহন বোতাম খোলা কোটের দু'টি প্রান্ত বুকের কাছে দু'হাতে ধরে থাকে। খুব শীতের সময়েও অক্ষয় তাকে কোন দিন কোটের বোতামও লাগাতে দেখেনি, এই অভ্যাসের ব্যতিক্রমও দেখেনি।

'বাড়ি যাওয়া হয়নি। একজন নেতার কাছে গিয়েছিলাম। আচ্ছা আসি ভাই আমি।'

'মদ খাইনি মোহন। বুঝলে? মদ আমি খাইনি। আমার সঙ্গে দু'টো কথা কইলে জাত যাবে না।'

তার আহত উগ্র কথার মধ্যে চাপা আর্তনাদের সুরটাই বেশী স্পষ্ট হয়ে বাজে মনমোহনের কানে। মমতা সে একটু বোধ করে অক্ষয়ের জন্য, তার চেয়ে বেশী হয় তার আপসোস। কোন স্তরে মানুষকে টেনে নিয়ে যায় মদ! এই সেদিনও সুস্থ সুখী, স্বাভাবিক ছিল এই মানুষটা। ব্যাঙ্কের কাজের অবসরে, ছুটির পরে, কত আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, চাষী-মজুরের ভবিষ্যৎ এসব বিষয়ে আলোচনা করেছে, স্থায়ী সমস্যা আর সাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে মত ও পথের কথায় ধরা পড়েছে তার ভিতরের একটা জিজ্ঞাসু, উৎসুক, তেজস্বী দিক। কিছু দিনের মধ্যে কি ভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে তার কথাবার্তা, সব বিষয়ে আগ্রহ আর উৎসাহ গেছে ঝিমিয়ে। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে পর্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে একজন তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইলে আজ তার বিকারগ্রস্ত মন অপমান বোধ করে, অবজ্ঞা খুঁজে নিয়ে উথলে ওঠে ছেলেমানুষী অভিমান। এ ভাবটা যে চেপে রাখবে, একটু সংযম পর্যন্ত নেই।

শান্ত কণ্ঠে মনমোহন বলে, 'ছেড়ে দিয়েছেন?'

'ভাবছি ছেড়ে দেব।'

উপদেশের কথা কিছু বলা নিরর্থকও বটে, তাতে বিপদের ভয়ও আছে। মনমোহন তাই সহজ স্বরে বলে, সামান্য মাইনেতে তুমি ও সব খাও কি করে তাই আশ্চর্য লাগে। ধার করোনি তো ?'

'না অত বোকা নই। কিছু টাকা ছিল।'

'একটা দরকারী খবর নিয়ে যাচ্ছি, দাঁড়াবার সময় নেই। রাগ করো না-ভাই।' —বলে আর দেরি না করে মনমোহন জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যায়।

মনমোহনও আরেকটা জ্বালা হয়ে আছে অক্ষয়ের মনে। ব্যাঙ্কে চাকরিটা নেবার অল্প দিনের মধ্যে অতি সুন্দর একটা পরিচয় গড়ে উঠেছিল তার ওর সঙ্গে, সহজ সংযত তৃপ্তিকর। হাসি-খুসী মিষ্টি স্বভাব মনমোহনের। কথাবার্তা চালচলনে সাধারণ চলতি আত্মাভিমানেরও অভাবের জন্য প্রথমে তাকে খুব মৃদু ও নিরীহ মনে হয়েছিল। ধীরে ধীরে অক্ষয় টের পেয়েছে তার ভেতরটা বেশ শক্ত, মোটেই তলতলে নয়, গোবেচারিত্বের লক্ষণ নয় তার আচরণের মৃদুতা। মনমোহনের যে অনেক পড়াশোনা আর গভীর চিন্তাশক্তি আছে তা জানতেও সময় লেগেছিল। নিজের কথা বলতে যেমন, বহু কথা বলতেও মনমোহন তেমনি অনিচ্ছুক।

মনমোহন তাকে অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে। নিশ্চয় করে। অন্যের অশ্রদ্ধা স্পষ্ট বোঝা যায় মুখে কিছু না বললেও, মনমোহন শুধু সেটা গোপন করে রাখে অন্যের সঙ্গে তার অশ্রদ্ধা করার তফাত কেবল এইটুকু। কেন এ দয়া দেখাবে মনমোহন তাকে, কে চেয়েছে তার উদারতা ?

মনমোহনের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আজকাল কেমন একটা গ্লানিকর অস্বস্তি বোধ করে অক্ষয়। পরে এর নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বারে গিয়ে বোধ হয় আর লাভ নেই এখন। মনমোহনের কাছে কয়েকটা টাকা ধার চেয়ে নিলে কেমন হত ? জীবনে ও উজ্জ্বলতর করে তুলেছে আলোক, ওর কাছে থেকেই টাকা নিয়ে সে তার জীবনের অন্ধকার বাড়াত ! কি চমৎকার ব্যঙ্গ করা হত নিজের সঙ্গে।

ধিক্। তাকে শত ধিক্।

অনিচ্ছুক মন্থর পদে সে রাস্তা পার হয়। মিলিটারী পুলিসের একটা গাড়ি বেরিয়ে যায় তার গা ঘেঁষে, চাপা পড়ে মরলে অবশ্য অন্যায় হত তারই, এভাবে যে রাস্তা পার হয় তার জীবনের দায়িক সে নিজে ছাড়া আর কেউ নয়। সেও এক চমৎকার ব্যঙ্গ করা হত নিজের সঙ্গে, মনমোহনের কাছে টাকা ধার নিয়ে আজ মদ খাওয়ার মতো। ওখানে ওরা গুলি খেয়ে মরেছে স্বেচ্ছায়, তাই প্রত্যক্ষ

করে মনে ভাব জাগায় অসাবধানে রাস্তা পার হতে গিয়ে সে মরত গাড়ি চাপা পড়ে।

বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অক্ষয়। সময় অল্পই আছে, দু'চারজন করে বেরিয়ে আসছে লোক। বাড়ি ফেরার অসুবিধার জন্য লোক আজ কম হয়েছে বোঝা যায়। অন্যদিন এ সময় আরও ভিড় করে লোক বেরিয়ে আসে।

যাবে ভেতরে? করে ফেলবে এদিক বা ওদিক একটা নিষ্পত্তি? এ উত্তেজনা সত্যি আর সওয়া যায় না। বুকের মধ্যে শিরায় টান পড়ে পড়ে ব্যথা করছে বুকটা।

অথবা এমন হঠাৎ একটা কিছু করে না ফেলে আরও কিছুক্ষণ সময় নেবে মন স্থির করতে? হোটেল তো আছে। কম হলেও পাবে তো সেখানে মদ। এমন হুট্ করে নাই বা করে বসল একটা কাজ পরে হাজার আপসোস করলেও যার প্রতিকার হবে না?

এই চরম মুহূর্তে বড় বড় কথা আর ভাবে না অক্ষয়। দ্বিধার উত্তেজনা চরমে উঠে মনকে তার ভাব-কল্পনার রাজ্য থেকে স্থানচ্যুত করে বাস্তবে নামিয়ে দিয়েছে। সে ভাবে, আজ ভেতরে গিয়ে মদ খেলে শুধু সুধার কাছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে না, অত্যন্ত অন্যায়ও করা হবে সুধার ওপর।

অন্য দিনের চেয়ে শতগুণে বেশী আঘাত লাগবে আজ সুধার মনে। অন্যদিন জানাই থাকত সুধার যে বাড়ি সে ফিরবে মদ খেয়েই, নতুন করে হতাশ হবার আশা করবার কিছু তার থাকত না। আজ সে আপিসে বার হবার সময়েও প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছে সুধাকে বুকে নিয়ে আদর করতে করতে। সুধার কথা ভেবে মনটা কেমন করতে থাকে অক্ষয়ের। সেই সঙ্গে সে অনুভব করে, ভেতরে গিয়ে এখন মদের গ্লাস হাতে নিলে তার সবটুকু শুচিতা, সবটুকু পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। সারাদিন রাজপথের ও দৃশ্য দেখার পর মদ খেলে বড়ই নোংরামি করা হবে সেটা।

তখন রাখাল বেরিয়ে আসে টলতে টলতে।

'আহা, বেশ বেশ', রাখাল বলে অক্ষয়ের কাঁধে হাত রেখে গলা জড়িয়ে ধরে, 'কোথা ছিলে চাঁদ এতক্ষণ?'

'আঃ, রাস্তায় কি এসব?'—অক্ষয় হাতটা তার ছাড়িয়ে দেয়।

'বটে? চোখ বুঝি সাদা? বেশ বেশ। আমার বাবা চলছে সেই তিনটে থেকে', চোখ বুজে নিশ্বাস ফেলে রাখাল আবার চোখ মেলে তাকায়, 'হাঁ, কথা

আছে তোমার সঙ্গে। ভারি দরকারি কথা। সেই থেকে হাপিত্যেশ করে বসে আছি কখন আসে আমাদের অক্ষয়বাবু। চীনা ওটাতেই যাবে তো? চলো যাই। বসে বলব।'

'আমার টাকা নেই।'

'টাকা? টাকার জন্য ভাবছ? কত টাকা চাও?'

রাখাল সত্য-সত্যই পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে গুণতে আরম্ভ করে। দু'তিন বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সমস্ত তাড়াটাই অক্ষয়ের হাতে তুলে দেয়।

'নাও বাবা, তুমিই গোণ। তোমার ভাগ তুমি নাও, আমার ভাগ আমায় দাও। ঠকিও না কিন্তু বাবা বলে রাখছি।'

'কিসের টাকা?'

'অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, বলিনি বটে। বললাম না যে তোমার সঙ্গে কথা আছে? চৌধুরী কমিশনের টাকা দিয়েছে···গিয়ে চাইতেই একদম ক্যাশ। বড় ভাল লোক। টাকার জন্য ভাবছিলে? নাও টাকা। দাঁড়িয়ে কেন বাবা? চলো না এগোই। ওখানে গিয়ে ভাগ হবে'খন।'

সাদা চোখে কোনদিন রঙীন অবস্থায় রাখালকে দেখেনি অক্ষয়। দুজনে হয়তো মিলেছে সাদা চোখেই, তার পর যত চাপিয়ে গেছে সমান তালে। মদ খেলে রাখাল যে এরকম হয়ে যায়, একসঙ্গে এতদিন মদ খেয়েও অক্ষয়ের তা জানা ছিল না। এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় কত দিন রাখালকে সে ধরে সামলে ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে বটে, কিন্তু তখন সে নিজেও হয়ে যেত অন্য মানুষ। এই রকম হত কি সে? এখনকার এই রাখালের মতো?

'কাল আমার ভাগ দিও।'

নোটের তাড়াটা নিয়ে পাঞ্জাবি উঁচু করে ভেতরের উলের জামাটার পকেটে রেখে রাখাল হাসে, 'কাহিল অবস্থা বুঝি? কোথায় টানলে আমায় ফাঁকি দিয়ে, এ্যাদ্দিনের পেয়ার আমি?'

আর এক মুহূর্ত এ লোকটার সঙ্গে থাকলে সে সোজাসুজি হার্ট ফেল করে মরে যাবে, এই রকম একটা যন্ত্রণা হওয়ায় অক্ষয় মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে জোরে জোরে। তেরাস্তার মোড়টা পেরিয়ে আপিসের পথ ধরে চলতে চলতে তালা লাগানো গেটটার সামনে থামে। ওরা কি করছে একবার দেখতে হবে।

দেখতে যদি হয়, তেতালার ব্যালকনীতে উঠে একটা অংশকে মাত্র দেখবে

দূর থেকে? রাস্তা ধরে ওদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ওরা কি করছে দেখতে বাধা কি? মনমোহনের সঙ্গেও হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে।

অথবা বাড়ি যাবে?

এখন শান্ত হয়ে গেছে হৃদয় মন। প্রতিটি ছোট বড় কাজে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় চিন্তার উদ্‌ভ্রান্ত জটিলতায় পাক খেতে খেতে প্রাণান্ত হওয়ার বদলে এমন সহজ হয়ে গেছে সাধারণ স্বাভাবিক বাস্তব সিদ্ধান্তে আসা। ওখানে গিয়ে ওদের মাঝখানে বসবে না বাড়ি যাবে—প্রশ্ন এই। এর জবাবটাও সহজ। এখন ওখনে গিয়ে হাঙ্গামা বাড়াবার কোন দরকার নেই তার, তাতে কারো উপকার হবে না, তার নিজের খেয়াল তৃপ্ত করা ছাড়া। বাড়ি যাওয়াও তার বিশেষ দরকার। সুতরাং বাড়িই সে যাবে।

তবে ওরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে, একবার না দেখে গেলে তার চলবে না। গায়ের আলোয়ানটাও দিয়ে যেতে হবে। বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত শীতে একটু কষ্ট হবে তার, কিন্তু বাড়িতে বাকী রাত তার কাটবে লেপের নীচে। ওরা খোলা আকাশের নীচে পথে কাটিয়ে দেবে রাতটা। আলোয়ানটাতে যদি এক জনেরও শীতের একটু লাঘব হয়।

অমৃত মজুমদার তার বালীগঞ্জের বাড়ীতে ফিরে আসে রাত প্রায় দশটার সময়। বিষণ্ণ, হতাশ, গম্ভীর, পরিশ্রান্ত এবং দিশেহারা অমৃত মজুমদার। ছাত্রদের বসন্ত রায়ের বাণী শোনাবার জন্য পুলিস-লরীতে ওঠবার সময় তার রীতি-মতো কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নামবার সময় কি করে যেন ব্যথা লেগেছিল বাঁ দিকের কুঁচকিতে। বিশেষ কিছু নয়, তবু ব্যথা তো। বাঁ হাঁটুর বাতের ব্যাথাটাও আছে খানিক খানিক। এসব জিমন্যাষ্টিক কি পোষায় তার? কি যেন হয়েছে দেশে। এতকাল রাজনীতি করে এসেও আজ যেন তার ধাঁধা লেগে যাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝেই উঠতে পারছে না হঠাৎ কোন্ দিকে গতি নিচ্ছে রাজনীতি। কোন হলে বা পার্কে মিটিং কর, বক্তৃতা করবে। সংগ্রামের আহ্বান এলে তখন সংগ্রাম করবে। মোটরে গিয়ে মঞ্চে উঠে যা করার করা যায় সে অবস্থায়। তা নয়, রাস্তায় ওরা এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে যে, লরীতে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়।

সে কথা শোনে না পর্যন্ত কেউ।

কি হল? সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে মিসেস অরুণা মজুমদার, বলবার সুযোগ দিয়েছিল তো তোমাকে?

সব বৃত্তান্ত শুনে অরুণা তার রোগা কয়া মোটা দেহটি সোফায় এলিয়ে দিয়ে গভীর হতাশার সঙ্গে বলে, 'তুমি একটা পাগল, তুমি একটা ছাগল। তুমি কোনদিন কিছু করতে পারবে না।'

'আমি কি করব? বসন্তবাবু গেলেন না—'

অরুণা ফোঁস করে ওঠে মনের জ্বালায়, 'বসন্তবাবু যে গেলেন না, সেটা যে তোমার কত বড় সুযোগ একবার খেয়ালও হল না তোমার? একবার মনেও হল না এই সুযোগে একটু চেষ্টা করলে এক রাত্রে তুমি নেতা হয়ে যেতে পার? একেবারে ফাঁকা ফিল্ম পেলে, কেই তোমার কম্পিটিটর নেই, আর তুমি কিছু না করেই চলে এলে? তুমি সত্যি পাগল। সত্যি তুমি ছাগল। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না, কোনদিন কিছু হবে না।'

'আমার কি করার ছিল?'

'আমি বলে দেব তোমার কি করার ছিল?' ফুঁসতে থাকে অরুণা ক্ষোভে দুঃখে, 'তুমি না দশ বছর পলিটিক্স করছ? তুমি না সব জানো সব বোঝ, অন্যে তোমার বুদ্ধি ভাঙ্গিয়ে খায়? একবার উঠতে পারলে সারা দেশটাকে মুখের কথায় ওঠাতে বসাতে পার? আমার কাছে যত তোমার লম্বা-চওড়া কথা, বন গাঁয়ে শ্যাল রাজা। সবাই ওঁকে দাবিয়ে রাখে তাই উনি উঠতে পারলেন না, নামকরাদের তাঁবেদার হয়ে রইলেন। নিজের বুদ্ধি নেই, ক্ষমতা নেই, অন্যের দোষ।'

অমৃতের ফাঁপর ফাঁপর লাগে, দশ বছরের বিফলতা বাতাসকে যেন ভারি করে দিয়েছে মনে হয়। কতভাবে কত চেষ্টা করল, কত চাল কত কৌশল খাটাল, মরিয়া হয়ে কত আশায় জেলে গেল, কিন্তু না হল নাম, না জুটল প্রভাব প্রতিপত্তি, বড় নেতা হওয়ার সৌভাগ্যও হল না এতদিনে। পাণ্ডাদের সঙ্গে মিলতে মিশতে পায়, সাধারণ বৈঠকে যোগ দিয়ে কথা বলতে পায়, সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে দু'চার মিনিট বলতেও পায়—তেমন সভা হলে বেশী ক্ষণ। পরদিন খবরের কাগজ কেনে অনেকগুলি, সাগ্রহে সভার বিবরণ পাঠ করে নিজের নাম খুজে পায় না কোথাও। যদি বা পায়, সে শুধু আরও নামের সঙ্গে উল্লেখ মাত্র।

অরুণার সঙ্গে তর্ক বৃথা। কিন্তু কিছু তাকে বলতেই হবে, না বলে উপায় নেই।

'কথাটা তুমি বুঝছো না, অমৃত বলে কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে, পাণ্ডারা যা ঠিক করলেন তার বিরুদ্ধে কি যাওয়া যায়? আমার নিজের করতে যাওয়া মানেই ওঁদের বিরোধিতা করা। ওঁরা চটে যাবেন না তাতে? আমাকেই

যে পাঠালেন বাণী দিয়ে, সেও তো একটা বড় সম্মান ? কত বিশ্বাস করেন বলতো আমাকে। এতবড় একটা দায়িত্ব—'

'এরকম দায়িত্ব পালনের অনুগত ভক্ত না থাকলে কি পাণ্ডাগিরি চলে ?'

বীণার এই ঘরে ঢোকার মন্তব্য আরও কাহিল করে দেয় অমৃতকে। মায়ের মতোই হয়ে উঠেছে মেয়েটা। স্বামী পায় নি এখনো, বাপের উপরেই কথার ঝাল ঝাড়ে।

'চুপ কর বীণা। যা এ ঘর থেকে।' অরুণা ধমক দেয়। বীণা অবশ্য যায় না। সে বুঝতে পারে, মার সঙ্গে বাবার খাঁটি বিবাদ বাধে নি, বাবাকে দিয়ে মা কিছু করিয়ে নিতে চান। লাগাম চাবুক সব তাই মা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখতে চান, অন্য কারো এতটুকু হস্তক্ষেপ তাঁর পছন্দ নয়। বীণা তাই একটু তফাতে চুপ চাপ বসে পড়ে।

এবার কথার ঝাঁঝ বাদ দিয়ে গম্ভীরভাবে অরুণা বলে স্বামীকে, ওটা কর্মীর দায়িত্ব। তুমি তবে দুঃখ কর কেন ? বিশ্বাসী দায়িত্ববান্ কর্মীর সম্মান তো পাচ্ছ। নেতা হবার সখ কেন তবে ?'

'কি জানি।'

'যাক গে। এবার পলিটিক্স ছেড়ে দাও। কাজ নেই আর তোমার পলিটিক্স করে। ওসব তোমার কাজ নয়। মুখ হাত ধুয়ে এসো।'

'কি বলতে চাও তুমি ?' স্ত্রীকে নরম দেখে অমৃত এবার ক্রুদ্ধ হয়ে, 'তোমরা ভাবো আমি বোকা হাবা গোবেচারী ভাল মানুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না ! এ বাড়ি করেছে কে ? ঠাকুর, চাকর, দরোয়ান নিয়ে, শাড়ি গয়না পরে এত যে আরামে আছো তোমরা—'

'বীণা ?' অরুণা দৃঢ়স্বরে, 'তোর এত রাত হল কেন বাড়ি ফিরতে ? কোথা গিয়েছিলি ?'

বীণা জবাব দেয় না। সে জানে এটা আসলে তার বাবার কথায় জবাব, বাবাকে ধমক দিয়ে চুপ করানো। নইলে বাড়ি ফিরতে এমন কিছু রাত তার হয়নি যে কারণ জানবার জন্য মা মাথা ঘামাবে। অমৃত একটা চুরুট বার করে ধরায়। অরুণা কি হাল ছাড়ল ? বাইরের জগৎ থেকে জীবনকে এবার সে ঘরের সীমায় এনে রাখবে ঠিক করেছে ? অথবা আরও কিছু বলার আছে তার ?

ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বলে অমৃত আবার পুরানো কথাটাই জিজ্ঞেস করে, 'আমার কি করার ছিল ?'

'তোমার ? তোমার বোঝা উচিত ছিল দশ বছর যে, সুযোগ খুঁজছ এ্যাদ্দিনে তা এসেছে। বড়রা কেউ হাজির নেই গুলিগোলার ভয়ে, তুমি যা বলবে তুমি যা করবে কেউ তা ভেস্তে দিতে পারবে না। বাণী যখন ওরা মানল না, তোমার উচিত ছিল ঘোষণা করা যে তুমি ওদেরি পক্ষে। জোর গলায় বলা উচিত ছিল, দশ বছর পনের বছর দেশের সেবা করছ, জেল খাটছ, কিন্তু আদর্শের চেয়ে বড় কিছু নেই তোমার। তাই, তুমি দায়িত্ব নিচ্ছ মিটমাটের, ব্যবস্থা করার, এজন্য যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তোমাকে—'

'কিসের মিটমাট ?' অমৃত বলে আশ্চর্য হয়ে।

'তা দিয়ে তোমার কি দরকার ? তুমি দায়িত্ব নিতে মিটমাটের—মিটমাট হোক বা না হোক তোমার কি এসে যায় ? এদের সঙ্গে কথা বলতে, অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে, এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি করতে, বাস্, তোমার কাজ হয়ে গেল। দুদিন পরে দেশের লোকের মনের গতি বুঝে অবস্থা বিবেচনা করে তুমি জোর গলায় বলতে, তুমিই বিপদ ঠেকিয়েছ, তুমিই আন্দোলনটা সফল করেছ, তুমিই চেষ্টা করেছ দাবি আদায়ের।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে অমৃত। আগেও অনেকবার তার মনে হয়েছে, আজও মনে হয়, অরুণাকে সামনা-সামনি পলিটিক্সে নামিয়ে সে যদি পিছনে থাকত, এতদিনে হয় তো প্রবল প্রতিপত্তি আয়ত্ত করা যেত রাজনীতির ক্ষেত্রে। নিজে দেশনেতা না হতে পারলেও অন্তত দেশনেত্রীর স্বামী হওয়া যেত।

'এখনো সময় আছে।'

অরুণার মৃদু, সংক্ষিপ্ত, সুদৃঢ় ঘোষণায় হৃৎকম্প হয় অমৃতের !

'এখুনি তুমি যাও আবার,' অরুণা বলে উৎসাহের সঙ্গে, 'পাণ্ডারা শুয়ে শুয়ে ঘুমোক। গিয়ে পুলিসকে বলবে তুমি মিটমাট করতে এসেছ, সবাইকে বাড়ী ফিরে যাবার আবেদন জানাবে। তাহলে বলবার সুযোগ পাবে। কিন্তু খবর্দার, বলতে উঠে যেন ওদের শান্ত ভাবে বাড়ি ফিরে যেতে বলো না। ওদের বীরত্বের প্রশংসা করে, ওরাই যে দেশের ভবিষ্যৎ, এ সব কথা বলে আরম্ভ করবে। তারপর খুব ফলাও করে বলবে ওদের দাবি যাতে মেনে নেওয়া হয় সেজন্য তুমি কত ছুটোছুটি করেছ। বলবে, ভাই সব, তোমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দেবার গৌরব আমার জুটল না, কারণ বিদেশী সরকারের গুলি যাতে আমার দেশের ভাইদের বুকে না লাগতে পারে, সেই চেষ্টা করাই বড় মনে হয়েছিল আমার। তোমাদেরি বাঁচাতে চেয়েছিলাম আমি। গুলি যখন চলেছে, তোমাদের

যখন বাঁচাতে পারি নি, তখন আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবনপণ ব্রত হল দেশকে স্বাধীন করা। তোমরা অনেক বক্তৃতা শুনেছ, আমি ভাল বক্তৃতা দিতে পারি না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ভাই সব, বক্তৃতার দিন আর নেই, এখন আমরা সবাই মিলে—'

অরুণা অসহায়ের মতো হঠাৎ থেমে যায়। চল্লিশ কোটি কালো নরনারী তার বক্তৃতা শুনছিল। হঠাৎ সামান্য একটা কারণে, নিজের মুখ থেকে বার করা "সবাই মিলে" কথাটার প্রতিক্রিয়াগত সাংঘাতিক আঘাতে সে মরণাপন্নের মতো কাবু হয়ে যায়। স্বামীর জীবনকে সার্থক করা গেল না। বসে বসে তাকে যদি বক্তৃতা শেখাতে হয় স্বামীকে, এতক্ষণ শেখাবার পর এখন যদি আবার বলে দিতে হয় নিজের কথা সংশোধন করে যে, না, সবাই মিলে এ কথাটা বলো না, তবে সে কি করতে পারে, সামান্য সে মেয়ে মানুষ!

এতক্ষণ পরে বীণা কথা বলে, 'কি হল মা? তোমার সেই হার্টের ব্যথাটা হয় নি তো?'

ডাক্তার বছর দেড়েক আগে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গিয়েছিলেন অরুণার হার্টের ব্যথাটা আবার যদি জাগে জীবনের সহজ নিয়ম রীতিনীতি পালন না করার জন্য, তবে জগতের কোন ডাক্তার এ দায়িত্ব নিতে পারবেন না যে, হার্টফেল করে মিসেস অরুণা মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যু ঘটবে না!

'আমি ঠিক আছি', অরুণা বলে, 'যাবে তুমি? যাবে? পারবে এ সুযোগ নিতে? দশ বছর কাঙালের মতো যা চেয়েছ, আজ তা আদায় করে নিতে পারবে? যাবে কি না বলো।'

'যাচ্ছি যাচ্ছি', অমৃত বলে, 'এখুনি যাচ্ছি।'

'বীণা হালিমকে বল গাড়ি বার করুক—এই দণ্ডে। খেতে বসে থাকলে বলবি পৌঁছে দিয়ে এসে খাবে। যদি না ওঠে, কাল থেকে বরখাস্ত। যাও না তুমি? দশ বছরে মুটিয়েছ বেলুনের মতো, একটা দিন একটু খাটো?'

'যাচ্ছি, যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি', বলে অমৃত।

হালিম খেতে বসেনি। তার যৌবনান্তের দিনগুলিতেও অনেক সমস্যা। আজ সে অনেক ঘুরেছে গাড়ি নিয়ে—এত পেট্রোল বাবু কোথা থেকে যোগাড় করেন তার মাথায় ঢোকে না। বড় বড় লোকের সঙ্গে কারবার বাবুর, বাবুর কথাই বোধ হয় আলাদা। অন্যদিন হয়তো রাগ করত হালিম এত খাটুনির পর আবার এখন গাড়ি বার করবার হুকুম শুনলে, আজ সে কথা কয় না, অমৃতকে

নিয়ে অসম্ভব স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দেয়।

বাড়িতে বীণা তখন বলছে ব্যাকুলভাবে, 'মাগো, ওমা, কি হল তোমার? কেন এমন করছ? ওমা, মা—'

ডাক্তার বার বার বলেছিল, সাবধান, সাবধান। এ কোন মরীচিকার লোভে মা সে কথা ভুলে গেল। নিজের মরণ ডেকে আনবার মায়ের অদ্ভুত পাগলামীর কথাই বীণা ভাবে ভাই বোনের সঙ্গে মায়ের মৃতদেহ আগলে বাপের প্রতীক্ষায় বসে থেকে। খাওয়া দাওয়ার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন নিখুঁত সতর্কতা, মনে এত উদ্বেগ আশান্তি ক্ষোভ জমা করবার কি দরকার ছিল? এত পেয়েও সাধ মিটল না, যশ মান প্রতিপত্তির উগ্র কামনায় পুড়তে পুড়তে মরতে হল শেষে? ক্রমে ক্রমে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল মা তার বাবাকে বড় একজন নেতা করার জন্য। এতই কি প্রচণ্ড নেতৃত্বের মোহ মানুষের যে বাবার জীবনটা তার ভরে ওঠে আত্মগ্লানি আর হতাশায় তবু তিনি থামতে পারেন না, মাকে তার জীবনটা দিতে হয়! মা যেন তার আত্মহত্যা করেছে মনে হয় বীণার। নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে বীণার গাল বেয়ে, ভাই বোনদের মতো সে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না।

এদিকে গাড়ির গতির মতোই দ্রুত হয়ে ওঠে অমৃতের চিন্তার গতি। তাড়াতাড়ি মনে মনে সে আউড়ে নিতে থাকে ওখানে গিয়ে কি বলবে আর কি করবে, কোন্ কৌশলে কাজ হবে বেশী। অনেক দিন পরে হঠাৎ আজ যেন তার আত্মবিশ্বাস সজীব হয়ে উঠেছে মনে হয়, বেশ খানিকটা উত্তেজনা বোধ করে। অরুণা ঠিক কথাই বলেছে, এসব সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মানুষ জনসাধারণের মনে আসন পাতে, নেতা হয়। নানা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যেতে থাকে অমৃতের মনে। একটা চিন্তা তাকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে তোলে, লোভ ও ভয়ের আলোড়ন তুলে দেয়। একটা কাজ সে করতে পারে, অতি চমকপ্রদ নাটকীয় একটা কাজ, সাধারণের মনকে যে ধরনের ব্যাপার প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আজকের ঘটনা নিয়ে সে আন্দোলন করবে, একথা সে জানাবে। কিন্তু আরও সে এগিয়ে যেতে পারে। সে ঘোষণা করতে পারে যে গুলিচালনার প্রতিবাদে এবং ওদের দাবির সমর্থনে এখন এই মুহূর্তে সে ওদের সঙ্গে যোগ দিল—তারপর ওদের মধ্যে গিয়ে পথে বসে পড়তে পারে। পুলিস গ্রেপ্তার করতে পারে তাকে। তাহলে তো আরও ভাল হয়।

চারিদিকে সাড়া পড়ে যাবে তাকে নিয়ে। কাগজে বড় বড় হরপে তার নাম বেরোবে…

বেরোবে কি? এই বিষয়েই মস্ত খটকা আছে অমৃতের মনে। নিজে নিজে সে এতখানি এগিয়ে গেলে বড়রা চটবেন সন্দেহ নেই। সে আন্দোলন করবে, ওদের হয়ে লড়বে, এইটুকু ঘোষণা করার জন্যই চটবে। ওরা চটলে কোন বড় কাগজে তার নাম বেরোবে না। সে নিজে কোন বিবৃতি দিলে তাও ছাপা হবে না। তারপর, সে যদি একেবারে রাজপথে গিয়ে বসে ওদের মধ্যে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, রাগে হয়তো চোখে অন্ধকার দেখবেন চাঁইরা। আজকের ঘটনাকে তাঁরা কি ভাবে নেবেন, কি ভাবে নিতে বাধ্য হবেন, এখন সঠিক অনুমান করে বলা যায় না। কিন্তু বড়দের মনোভাবের খানিকটা ইঙ্গিত আজকেই অমৃত পেয়েছে। ওঁরা যতটা সম্ভব উদাসীন থাকতে চান, ঘটনাকে বেশী গুরুত্ব দিতে চান না। এই দলাদলির দিনে কোন একটি বিশেষ-দলের বাহাদুরী নেবার চেষ্টা বলে হয় তো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবেন। তাহলেই বিপদ অমৃতের। হয়তো তাকে দল থেকে রিজাইন দিতে হবে। নয় তো আজকের প্রকাশ্য ঘোষণা হজম করে ফেলে সরে দাঁড়িয়ে তলিয়ে যেতে হবে তলে।

কিন্তু কথাটা হল কি—অমৃত হিসাব করে যায় প্রাণপণে মাথা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে—যে বিপদ নয় ঘটল, নেতারা নয় বর্জন করলেন তাকে, অন্যদিকে লাভ হবে না কি কিছুই? হৈচৈ কি হবে না তাকে নিয়ে? অন্য দলে গিয়ে কি করতে পারবে না কিছু? এতকাল নেতাদের মুখ চেয়ে থেকে তো কিছু হল না, সরে গিয়ে অন্য চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? কিন্তু সে সুযোগ যদি না পায়? যদি ফসকে যায় তার আজকের রাজনৈতিক ষ্ট্র্যাটেজি? তখন এদিকও যাবে, ওদিকও যাবে।

নরম ঘোষণাটা জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেলে পরিস্থিতি যাই দাঁড়াক সে সামলে নিতে পারবে। কিন্তু গরম ঘোষণা আর চরম কাজটার মতো ফল তাতে হবে না—ওতে একরাত্রেই হয়তো সে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়ে যেতে পারে। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না অমৃত। অরুণা কাছে নেই বলে বড় তার আপসোস হয়। অরুণার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পেলে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা যেত।

পাশের রাস্তা দিয়ে মোড়ের কাছাকাছি এসে অমৃতের গাড়ি থামে। ভিড় এখন বিশেষ নেই। অমৃত গাড়ি থেকে নেমে চলতে আরম্ভ করেছে, বোতাম খোলা কোট গায়ে লম্বা একটি যুবক এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়।

'অমৃতবাবু, একটা কথা আছে।

'আপনাকে তো—?'

'আমায় চিনবেন না। আপনার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনি এখুনি

বাড়ি ফিরে যান। আপনার বাড়ি থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে স্বব্রত এসেছিল—আপনার মেয়ে টেলিফোন করেছিলেন। আপনাকে জানাতে বলে স্বব্রত আপনাদের বাড়ি চলে গেছে।'

'অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কি হয়েছে? কিন্তু আমি যে এদিকে—'

অমৃতের অনিচ্ছুক, ইতস্তত ভাব অদ্ভুত লাগে মনমোহনের। তারপর সে ভাবে, তার কথা থেকে অমৃত হয়তো খবরটার গুরুত্ব ধরতে পারেনি। সে বলে, 'হঠাৎ হার্টের এ্যাটাক হয়েছে শুনলাম। অবস্থা ভাল নয়। আপনি এক্ষুনি চলে যান।'

হার্টের এ্যাটাক অরুণার পক্ষে মারাত্মক হওয়া আশ্চর্য নয়। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তাকে সুস্থ দেখিছি বটে, কিন্তু হার্টের ব্যাপার হলে দু'-চার মিনিটে অবস্থা খারাপ দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু এদিকের ব্যবস্থা তবে কি করা যায়? চরম সিদ্ধান্তটা আজ তবে বাদ দিতেই হল। তাড়াতাড়ি তার কথাগুলি বলে নিয়ে বাড়িই তাকে ফিরে যেতে হবে। অরুণার অসুখের কথাটাও উল্লেখ করে বলতে পারবে যে, ওদের এ অবস্থায় রেখে ফিরে যেতে তার প্রাণ চাইছে না, কিন্তু স্ত্রীর কঠিন অসুখের জন্য একান্ত নিরুপায় হয়েই—

'আমি কিছু বলতে এসেছি আপনাদের। মিনিট দশেক বলেই শেষ করে বাড়ি যাব।'

'আপনাদের কোন অ্যানাউন্সমেণ্ট?'

'ঠিক তা নয়, আমি নিজেই কিছু বলব। দেশজোড়া একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এ ব্যাপার নিয়ে, আমি বলে দিতে চাই যে, সে আন্দোলন গড়ে তুলতে আমার যতখানি ক্ষমতা আছে সব আমি কাজে লাগাব।'

নিজেকে হঠাৎ বড় শ্রান্ত মনে হয় মনমোহনের। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ভাষা ও গলার গুরুত্বপূর্ণতা বজায় রেখে সে বলে, 'এখন বলা কি ঠিক হবে? কেউ বক্তৃতা শোনার মতো অবস্থায় নেই। কাল মিটিং হবে, সেখানে বলাই ভাল হবে।'

'আমায় বলতে দেবেন না তা হলে?'

'বলতে চাইলে বাধা দেব কেন? বলা উচিত কি না আপনিই বুঝে দেখুন। আমাদের মরাল ঠিক আছে, আপনার বক্তৃতার ফলে বড় জোর কয়েকজনের উত্তেজনা বাড়বে। তার চেয়ে আপনি যদি কাল পাবলিকের কাছে বলেন আপনার কথা, তাতে বেশী কাজ হবে।'

বাড়িতে ও গাড়িতে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা বেড়ে উঠেছিল, এখন তা

অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অমৃতের কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, একটু ভয়ও করে। সশস্ত্র আক্রমণ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে তারি আলোয় এখানকার শান্ত পরিস্থিতিকেও অমৃতের অপরিচিত, ধারণাতীত মনে হয়। সে অনুভব করে, তার এতদিনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না আজকের অবস্থা, তার জানাশোনা ধরা বাঁধা পুরানো নিয়মে আজকের ঘটনা ঘটেনি। তার পক্ষে এই অবস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন—হয়তো অসম্ভব।

ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে নিজেকে অমৃতের মৃত মনে হয়।

'হালিম, জোরে চালাও।'

মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে অমৃতের, চোখের সামনে কতগুলি তারা ঝিকমিক করে ওঠে।

একটু দূরে দূরেই থাকে অজয়, তফাত থেকে উদাসীনের মতো ছ্যাখে। মনে তার নালিশ নেই, ক্ষোভ জমা হয়ে আছে প্রচুর। তার উনিশ বছরের মনটা অভিমানে জর্জর।

ওরা শোভাযাত্রা করে এসে বাধা পেয়ে এখানে বসেছে রাস্তায়, এই নতুন উত্তেজনায় আরও মজাদার হয়েছে ওদের দল বেঁধে রাস্তায় নেমে মজা করা। বেশ খানিকটা হৈচে হবে চারিদিকে এই ব্যাপার নিয়ে। বড় বড় লোকেরা ছুটোছুটি করবে বড় কর্তাদের কাছে, আলাপ-আলোচনা চলবে কিছুক্ষণ তারপর মিটমাট হবে আপোস মীমাংসায়। গর্বে বুক ফুলিয়ে বাড়ি ফিরবে সবাই, আত্মীয়বন্ধু পাড়াপড়শীর কাছে, মেসে হোটেলে চায়ের দোকানে, সচকিতা মেয়েটির কাছে, বলে বেড়াবে ওরা কিভাবে সংগ্রাম করেছে,—সংগ্রাম! আটমাস আগে হলে সেও যেমন হয়তো থাকত ওদের মাঝে, বাড়ি গিয়ে মাধুকে শোনাত সংগ্রামের কাহিনী, চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে থাকত মাধু!

আজ সে ওদের মধ্যে নেই। সে আর কলেজের ছেলে নয়। হাজার দুঃখদুর্দশার মধ্যেও হাথিখুসী আশা স্বপ্নের ওই নিশ্চিন্ত সুখের জীবন তার ফুরিয়ে গেছে, শোভাযাত্রা করে এসে লাঠি বন্দুকের বাধা মানবো না বলে রাস্তায় বসে পড়ার মজা আর তার জন্যে নয়। সে এখন চাকুরে, কেরানী! মাস-কাবারী চল্লিশ টাকা বেতনটাই এখন তার আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ—হাওড়ার ওই বস্তি-ঘেঁষা নোংরা পুরানো ভদ্রপল্লীর ওই টিনের চাল মাটির দেয়াল আর লাল সিমেন্টের মেঝেওয়ালা বাড়িটার অংশটুকুতেই আটকে গেছে জীবন তার চিরদিনের জন্য,

এই ঘরে-কাচা আধময়লা জামা কাপড় আর সস্তা ছেঁড়া রঙচটা আলোয়ানটি তার শুধু বেশভূষা নয়, আগামী পরিচয়ও বটে।

এমনি লোকও বহু জুটেছে ওদের সঙ্গে, পথের রাজপথের সাধারণ পথিক। তার চেনা ওই ছোকরা পর্যন্ত দলে ভিড়েছে, আপিসের সামনে বিড়ির দোকানে যাকে সে বিড়ি বানাতে দেখে আসছে গত কয়েক মাস। তবু অভিমান নরম হয় না অজয়ের। পথিকেরা ভিড় করেছে মজা দেখতে, কৌতূহলের বশে। ওদের মধ্যে গিয়ে ভিড়লে তাকেও ওরা ভাববে দলের বাইরের ওই রকম কৌতূহলী পথিক, ওদেরি মতো সেও যে ছিল কলেজের ছাত্র মাত্র কয়েক মাস আগে, এ পরিচয় ঘোষণা করলেও ওরা তাকে আপন ভাবতে পারবে না। সে আর ছাত্র নেই, সে পর হয়ে গেছে। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার দাবি তার নেই।

একটা বিড়ি টানতে ইচ্ছা করে। সঙ্গে নেই, কিনতে হবে।

বন্ধুদের কাছে সিগারেট মিলত, তার সঙ্গে নিজে দু'একটা কিনে চালিয়ে দেওয়া যেত একরকম। একটা সিগারেট তিনবারও ধরানো যায় নিভেয়ে রেখে রেখে। চাকরি নিয়ে পাঁচটা করে সিগারেট কিনছিল রোজ নিজের রোজগারের পয়সায়, কম দামী সিগারেট, পাঁচটা মোটে দু' আনা—এক বাণ্ডিল বিড়ির দাম। ছেড়ে দিতে হয়েছে। ট্রাম বাসের ক'টা পয়সা বাঁচাতে ব্রিজ থেকে যাকে হাঁটতে হয় আপিস পর্যন্ত, সে খাবে সিগারেট! বিড়ি ধরেছিল, ঘেন্নায় তাও ছেড়ে দিয়েছে। সিগারেট টানবার সাধ নিয়ে ক্ষমতার অভাবে টানতে হবে বিড়ি! ধোঁয়া খাওয়াই বন্ধ থাক তার চেয়ে!

মাধু বলেছিল শুনে, 'লাটসায়েবের মতো একটা বাড়িতে থাকতে সাধ যায় না?'

'না।'

'মিথ্যে বোলো না!'

সাধ আর স্বপ্নের তফাতটা মাধু এখনো বোঝে না, এটাই আশ্চর্য! পেট ভরে ভাত খাওয়াও যেন সাধ, পোলাও খাওয়াও তাই। অথচ ওর বোঝা উচিত। দুটো পয়সা রোজগারের উপায় খুঁজে ছটফট করছে।

আঙুলে ধরা সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে, টানতেও যেন আলস্য লোকটার। দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও আলসেমিতে ঢিল। কি হয় দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছে কিন্তু আগ্রহের অভাবটা এমন স্পষ্ট! পাতলা পাঞ্জাবির পকেটে সিগরেটের রঙীন টিনটা দেখা যায়।

বিড়ি এক পয়সার কিনে একটা খেলে দোষ নেই। সাধ মিটিয়ে সিগারেট খাবার ক্ষমতা না হলে সিগারেট ছোঁবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, বিড়ি কখনো খাবে না তা বলেনি নিজেকে। এমন বিশ্রী লাগছে ওদের দূরে থেকে দলভ্রষ্ট জাত নষ্ট পতিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে! একটা বিড়ি টানলে হয়তো একটু ভাল লাগত!

আজ নিয়ে পাঁচ দিন হল বিড়ি খায় না। বেশ কষ্ট হয়েছে না খেয়ে থাকতে, এখনো কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। খাবার ইচ্ছাটাও যে বেশ জোরালো আছে এখনো, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। একটা বিড়ি খেয়ে পাঁচ দিনের লড়াইটা বাতিল করে দেবে! যাক্‌গে। কি হয় বিড়ি না খেলে!

'বাবু? বাবু, শুনছেন? শিয়ালদহ' যামু ক্যামনে?'

এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, অজয় ভাবে। গাঁ থেকে যত গেঁয়ো মানুষ নতুন শহরে এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, সবাই যেন তারা হাঁ করে থাকে কখন অজয়বাবুর দেখা মিলবে, তাকে জিজ্ঞেস করে হদিস্ মিলবে পথঘাটের, মুশকিলের আসান হবে। কিছু জানবার থাকলে ভদ্রলোক তাকে এড়িয়ে জিজ্ঞেস করে অন্য লোককে, এরা সকলকে এড়িয়ে জিজ্ঞেস করে তাকে! এমন গেঁয়ো অজ্ঞ চাষাভুষোর মতোই কি দেখায় তাকে যে দেশ গাঁয়ের আপন লোক ভেবে ওরা ভরসা পায়? ঘোমটা টানা ছোট্ট একটি কলাবৌ আর মাঝবয়সী একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাশের রাস্তার খানিকটা ভেতরের দিকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লোকটি খানিকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক এর ওর মুখের দিকে চাইছিল, এবার এত লোককে ডিঙিয়ে তার কাছে এসেছে।

'একটু ঘুরে যেতে হবে বাপু।'

পথ আর উপায় বাতলে দেয় অজয়, লোকটি মাথা চুলকোয়।

'এসো আমার সঙ্গে।'

পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে ওদিকের মোড়ে রিক্‌শা ডেকে ওদের তুলে দিয়ে অজয় নিজেও একটু ইতস্তত করে পথ-সংশয়ী পথিকের মতো। বাড়ি ফিরবে না ওখানে ফিরবে? সে ওদের নয়, তার পথ নয় ওদের পথ।

ইচ্ছে কিন্তু করছে ফিরে যেতে, ওরা কি করে দেখতে, শেষ পর্যন্ত কি হয় সঙ্গে থেকে জানতে। পরের মতোই না হয় সে দেখবে ওদের কার্যকলাপ, সে তো আর দাবি করছে না যে, মোটে আট মাস আমি ছাপ হারিয়েছি, আমার তোমাদের মধ্যে ঠাঁই দাও।

গুলির আওয়াজটা তখন সে শুনতে পায়, কানে আসে তুমুল কলরব। সব ভুলে সে ছুটতে আরম্ভ করে, তার সমস্ত ক্ষোভ অভিমান পরিণত হয় একটিমাত্র

ব্যাকুল প্রশ্নে, কি হল, কি হল? ভয়াতুর মানুষ ছুটে যায় তার পাশ কাটিয়ে বিপরীত দিকে, সে চেয়েও দেখে না। বরং তার একটা অদ্ভুত আনন্দ হয় যে এদের সংখ্যা বেশী নয়। দু'দশজন পালাক, সকলে কি করছে দেখতে হবে।

তফাতে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে সে ভুলে যায়, সোজা চলে যায় ওদের কাছে, ওদের মধ্যে।

মধুখালিতে তখন মাঝ-রাত্রি পার হয়ে গেছে। গাঁয়ের পূর্ব প্রান্তের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার আগুনের শিখায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। অল্প দূরে নদীর জলও লাল হয়ে গেছে উদয় রশ্মির ছোঁয়াচ লাগার মতো। সমুদ্রের দিকে প্রায় এক মাইল নামায় নদীর ধারে কেশব বস্তির ঘর, সেখান থেকে মধুখালির আগুন দেখা যায়।

গোঙাতে গোঙাতে যাদব বলে, 'গণশার মা, শুলে পারতে না একটু? রাণী তুই শো না একটু বাছা? কত কষ্ট কত হাঙ্গামা আছে অদেষ্টে এখনো ঠিক কি তার?'

'শুয়ে কি হবে? শুলেই ডাকবে, বলবে, চলো এবার। কপালে দুঃখ্যু আছে তো আছে!' গণেশের মা জবাব দিয়ে মস্ত হাই তোলেন, হাঁ বুজবার আগেই কাঁথাটা ঠিক করে দেন ছোট ছেলে দুটোর গায়ে। তারা অঘোরে ঘুমোতে আরম্ভ করেছে শোয়ার সুযোগ পাওয়া মাত্র।

রাণী উত্তরের বেড়ার জানালার ঝাঁপ উঁচু করে তাকিয়ে থাকে দূরের রক্ত-চিহ্নের দিকে। শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য যাদবের আবেদন তার কানে পৌঁছেছে মনে হয় না। তার শরীরের শিরা-মাংস মাটিতে আছড়ে পড়ে বিশ্রাম খোঁজার মতো অবসন্ন, হঠাৎ হাঁটু ভেঙে হয়তো সত্যি সত্যি পড়ে যাবে, কে জানে। কিন্তু দূরের ওই আগুনের রক্তিম সংকেত থেকে চোখ সরিয়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই। সাদা চুনকাম করা মাটির দেয়ালের ওপরে সুন্দর করে ছাওয়া কয়েকটা চালা শুধু পুড়ছে না ওখানে, সীতা দেবীর অগ্নিপরীক্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন দেবতারা তার সতীত্ব রক্ষার জন্য, একেবারে শেষ মুহূর্তে। হৈহৈ রৈরৈ আওয়াজ এসেছিল কানে, মনে হয়েছিল দু'কানে এতক্ষণের ঝিমঝিম আওয়াজ এবার বদলে গেল কানের পর্দা ফেটে মাথার ঘিলু বেরিয়ে আসছে বলে, এবার সে মরবে। যাক্ বাঁচা গেল, সে ভেবেছিল, মরার পর যা খুসী করুক তাকে নিয়ে বেঁটে মোটা লোকটা, সে তো আর জানবে না বুঝবে না। গাঁ সুদ্ধ লোক যে হৈহৈ করে তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে রাবণের হাত থেকে তা কি সে জানত! বিশ্বাস করতে পারে নি, মনে হয়েছিল কোটালের জোয়ার বুঝি আসছে নদীতে, ও তারই গর্জন।

সে লোকটা কি পুড়ছে ওই আগুনে ? ধীরে সুস্থে পোষাক ছেড়ে, তাকে বার বার ভয় নেই ভয় নেই বলতে বলতে, পা পর্যন্ত ঝোলা যে জামাটা গায়ে দিয়েছিল সেই জামা সুদ্ধ ? রাণী জোরে নিশ্বাস টানে—ওখান থেকে এত দূরে ভেসে এসে যেন পোড়া মাংসের গন্ধ তার নাকে লাগা সম্ভব। সে যখন বেরিয়ে আসে পাগলের মতো, কয়েকজন মিলে সেটাকে মারছিল তার মনে পড়ে। খুন করে কি রেখে এসেছে সেটাকে ওরা চিতায় পুড়বার জন্য ? বেঁধে কি রেখে এসেছে নেওয়ারের খাটটার সঙ্গে জ্যান্ত অবস্থায় ? ইস্, একটু ধৈর্য ধরে সবাইকে বাইরে ডেকে সে নিজেই যদি বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে সজ্ঞানে জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে মারবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসত !

ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া মুখে লাগছে। রাণীর শীতবোধ নেই। দূরে ওই অত্যাচারীর চিতার আগুনের তাপটাই সে অনুভব করছে, দেহমনের আর সব অনুভূতি মরে গেছে তার।

নিজে শীতে না কেঁপে, গণেশের মা বলেন যাদবকে, 'মোদের শোবার লেগে দশগণ্ডা হুকুম না ঝেড়ে, নিজে এসে কাত হও না একটু এদের পাশে কাঁথাটা গায়ে দিয়ে ?'

'শোবার সময় এটা মোর আঁ ?'

'বসে থেকে কি রাজ্য উদ্ধার করবে ?'—হাই চাপতে গণেশের মা রোগা হাতের মুঠিটাই ঘষতে থাকে হাঁ্যাএ, 'ভেবে কি হবে ? ছেলে তো আছে শহরে, গিয়ে একবার পড়তে পারলে ভয়টা কি ? নে যাবার সব তো করেছে এরাই।'

যাদব কথা কয় না।

'একা তো নও আর ? খুব তো সামলেছিলে মেয়াকে, বড়াই কত ! সবার ঘরে মেয়ে বৌ, সবাই টের পেলে এমনি ব্যাপার চলতে দিলে আর বাঁচোয়া নেই, তাই না গেল সব মরিয়া হয়ে ছুটে। ধান-তোলা নিয়ে না লাগলে এমন ক্ষেপত না লোক—ভগ্‌বানের আশীর্বাদ। মেয়াকে তোমার ছিনিয়ে আনলে, আগুন দিলে ঘাঁটিতে, হেথা সরিয়ে আনলে মোদের রাতারাতি, শহরতক পৌছে আর দিতে পারবে না ? তুমি কোথা লাগবে উঠে পড়ে, তা নয়, ভয়ে ভাবনায় হাতপা সেঁধিয়ে বসে আছ পেটের মধ্যে !'

ডিবরির শিখাটা অবিরত কাঁপছে উত্তরের হাওয়ায়। গণেশের মার রোগ জীর্ণ শীর্ণ দেহটা দেখতে দেখতে বাতাসে সরু গেঁটে বাঁশের দোলন মনে পড়ে যাদবের। যে ঝড়ে ঘরের চালা উড়ে যায়, বড় বড় গাছ মট-মট ভেঙে পড়ে, সেই ঝড়েও

গেঁটে বাঁশ শুধু দোল খায় নিশ্চিন্ত মনে। জীবনের ঝড়-ঝাপটা তাকে কাবু করে দিয়েছে, গণেশের মা ঠিক আছে তার নিজের মতিগতি বজায় রেখে। নইলে এত সব ভয়ানক বিপর্যয় কাণ্ডের পর, ঘর-বাড়ি ছেড়ে পরের আশ্রয়ে এসে রাতারাতি শহরের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট যাত্রায় প্রতীক্ষা করার সময়, তাকে কাঁথার নীচে ঢুকিয়ে একটু আরাম আর বিশ্রাম দেওয়াবার জন্য এত চালের কথা কইতে পারত গণেশের মা। সব ব্যাপারের মোটামুটি মানেটা বুঝেই গণেশের মা নিশ্চিন্ত। মেয়েকে তার জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ব্যারাকে, গাঁয়ের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গিয়ে মেয়েকে তার উদ্ধার করে এনেছে, ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, রাতারাতি তাদের সরিয়ে এনে ফেলেছে এখানে শহরে গণেশের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য, এই পর্যন্ত জেনে গণেশের মা কাঁদাকাটা হা-হুতাশ বাতিল করেছে। কত যে আরও ফ্যাকড়া আছে ও ব্যাপারে, সেটা তার খেয়াল নেই। এ ব্যাপারের জের যে কোথায় গড়াবে, কেন যে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাতারাতি, কত হাঙ্গামা কত দুর্দশা যে জমা হয়ে আছে তাদের জন্য সামনের দিনগুলিতে, যে সব কথা মাথায় আসে না ওর। শহরে গিয়ে ছেলের কাছে গিয়ে থাকবে ভেবেই সে খুশী, তার রোজগেরে ছেলে! মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছে ছেলে, সে থাকতে ভাবনা কি তাদের ?

'এখনো জ্বলছে বাবা আগুন। দাউদাউ করে জ্বলছে।' রাণী হঠাৎ বলে মুখ না ফিরিয়েই।

'তুই তো একটু শুলে পারতিস রাণী ?' গণেশের মা বলে আবেগহীন গলায়। এই মেয়েই যে যত ঝঞ্ঝাট যত বিপাকের মূল এ কথা ভেবে তার কোন জ্বালা নেই। সংসারের আর দশটা ঝঞ্ঝাটে নয় মেয়ে বলে ওকে গঞ্জনা দেওয়া চলে, এই সৃষ্টিছাড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপারে ওকে দায়িক ভাবা কি যায় ? গণেশের মার অন্য দুশ্চিন্তা। মেয়ে তার খাঁটিই আছে, কিন্তু লোকে কি তা জানবে না মানবে! কেউ কিছু না বলুক, সবাই দরদ দেখাক, তবু মেয়ে তার ধর্ম নাশের ছাপ মারা হয়ে রইল সকলের কাছে। সুধীর হয় তো মেয়েকে তার নেবে না এই অজুহাতে। এ সব রাণী কি করে সইবে, অসহ্য হলে ঝোঁকের মাথায় কি করে বসবে, তাই ভাবে গণেশের মা। সেবার পদীর কচি মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সাঁতরার ক্যাম্পে, সারারাত পদী মেয়ের কান্না শুনেছিল আর পাগলের মতো পাক দিয়েছিল ক্যাম্পের চারিদিকে। সকালে আধমরা মেয়ে নিয়ে পদী গাঁয়ে ফিরলে কি হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে, কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল চারদিকের হিন্দু-মুসলমান

চাষাভুষো সব একজোট হয়ে, বড় হাকিম নিজে এসে ব্যবস্থা করার কথা না দিলে কাণ্ডই হয়ে যেত একটা। কাণ্ড হল শেষতক, তার মেয়েকে নিয়ে। পদীর মেয়ের দিকে ছিল সবাই, প্রাণ দিয়ে মায়া করেছে তাকে সবাই, সে নিজেও কি একদিন কেঁদে ফেলেনি তাকে বুকে জড়িয়ে দুটো কথা কইতে গিয়ে? তবু তো পুকুরে ডুবে মরল পদীর মেয়েটা। গাঁয়ে থাকতে হলে রাণীই বা কি করে বসত কে জানে! তার চেয়ে এ ভাল হয়েছে। ভাঙা ঘর আর ভিটেটুকু বাঁধা পড়ে আছে, ঋণের বোঝা জমে আছে পাহাড় হয়ে। কি হবে এ ভিটের মায়া করে? তার চেয়ে শহরে অচেনা লোকের মধ্যে রাণীও বাঁচবে শান্ত মনে, তারাও থাকবে সুখে শান্তিতে।

গণেশের মার সুখশান্তির স্বপ্নও খোলা আর খোসা দিয়ে গড়া। তার বেশী চাইতে ভুলেও গেছে, সাহসও হয় না। না খেতে পেয়ে একেবারে না মরলে, রোগে বিপাকে মরণাপন্ন না হলে, মাথা গুঁজবার ঠাঁইএর অভাব না ঘটলে তার কত শান্তি কত সুখ লাভ হত।

কেশব একটি পুরানো কম্বল হাতে করে ঘরে আসে, ঘরে তৈরী বালাপোশ গায়ে জড়িয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে, শীর্ণ মুখে খোঁচা গোঁপদাড়ি। সহজ শান্ত ভাব, একটু গাম্ভীর্যপূর্ণ। মাঝরাত্রে হঠাৎ এই খাপছাড়া অতিথি পরিবারটির আবির্ভাবে তাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত বা বিপন্ন মনে হয় না।

খিচুড়িটা নামবে এবার, কম্বলটা যাদবের কাছে নামিয়ে রেখে সে ঘরোয়া সুরে বলে, খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করেই রওনা দিতে হবে। নৌকোয় ঘুমানো চলবে। নৌকো খুঁজতে গেছে।

'মোর তরে সবার বিপদ হল, পালাতে কেমন লাগছে বদ্যি মশায়।'

কেশব মাথা নেড়ে যেন তার এই অনুভূতির সঙ্গতিতেই সায় দেয়, বলে, 'পালাচ্ছো না তো, পালাবে কেন। ওরা তো ছেড়ে কথা কইবে না, কদিন তাণ্ডব চলবে চাদ্দিকে। তোমাদের ওপর ঝাল বেশী, প্রথম ধাক্কাটা পড়বে তোমাদের ওপরে। তোমরা তাই কটা দিন নিরাপদ জাগায় গিয়ে থাকবে। অবস্থা ভাল হলে, দেশের লোক প্রতিবাদ শুরু করলে অতটা যা তা করা চলবে না, যখন আইনসঙ্গত এনকোয়ারী শুরু হবে,' কেশবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্য, 'তখন তোমরা ফিরে আসবে সাক্ষী দিতে। তোমার মেয়ে আমাদের তরফের বড় সাক্ষী।'

'সাক্ষী দিতে হবে? দেব। আমি সাক্ষী দেব।' রাণী এতক্ষণে জানালা ছেড়ে সরে আসে।

কেশব নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

'কাছাকাছি থাকতে পারি না কোথাও গা ঢাকা দিয়ে?' যাদব শুধোয় সংশয়ের সঙ্গে।

'ছেলের কাছে যাবে বলছিলে না? তাই ভাল। কলকাতাতেই যাও।' কেশব বলে চিন্তিত ভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, 'সাক্ষী দেয়ার দরকার হবে কি না শেষ পর্যন্ত তাই বা কে বলতে পারে। দুঁদে প্রজাগুলোকে জব্দ করার এ সুযোগ জগৎবাবু ছাড়বে না। ও আবার কি পরামর্শ দেয়, কি দাঁড় করায়। নাঃ, ছেলের কাছেই যাও তুমি।'

কেশবের স্ত্রী মেনকা এসে বিনা ভূমিকায় বলে, 'এসো দিকি তোমরা খেয়ে নেবে দুটি। ডিবরিটা আনিস তো বাছা তুই, কি নাম যেন তোর মা, রাণী? ওমা, ডিবরি যে নিভলো বলে।'

'তেল তো নেই আর।' কেশব বলে।

'রসুইঘরের ডিবরি থেকে দিচ্ছি একটু।'

সবাইকে একসাথে বসিয়ে দেয় মেনকা, রাণী আর গণেশের মাকে পর্যন্ত।

খিচুড়ি খেতে বসে যাদবের চোখে হঠাৎ জল আসার উপক্রম হয়। তার মতো গরীব হাঘরে তুচ্ছ মানুষের জীবনেরও যে দাম আছে দশজনের কাছে, তার মতো লোকের মেয়ের সম্মান যে নিজের মেয়ের সম্মানের মতো হতে পারে দশজনের কাছে, এ জ্ঞান এ অভিজ্ঞতা তাকে প্রায় অভিভূত করে রেখেছে প্রথমাবধি। চিরকাল নিজেকে সে জেনে এসেছে একান্ত অসহায়, দুর্ভিক্ষে হাড়ে মাসে টের পেয়েছে সে বা তার পরিবারের বাঁচন মরণে কিছু এসে যায় না জগতের কারো। আজ সে জেনেছে তা সত্যি নয়। ডান হাতে চোট লেগেছে, মুখে খাবার তুলতে কষ্ট হয়। কিন্তু সে বেদনা যেন গায়ে লাগে না যাদবের, ব্যাণ্ডেজের নীচে মাথার ক্ষতটা যে দপদপ করছে সে যন্ত্রণাও বাতিল হয়ে গেছে তার কাছে। ভিতরে একটা ক্ষোভ আর আক্রোশকেই যেন জাগিয়ে বাড়িয়ে চলছে শরীরের আঘাতগুলির যন্ত্রণা। সে ফিরে আসবে, বৌ-ছেলে-মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সাথে যোগ দিতে।

ভাগচাষের বাটোয়ারা আর বেগার খাটা নিয়ে যে লড়াই বাড়ছিল দিন দিন, যে হাঙ্গামার সুযোগে সাঁজ সন্ধ্যায় মেয়েকে তার টেনে নিয়ে যাবার সাহস ওদের হয়েছে, তাতে ভাল করে যোগ দেয়নি বলে আপসোস হয় যাদবের। তাকে যারা আপন ভাবে, তার জন্য বাঁচন মরণ তুচ্ছ করে, তাদের ব্যাপারে সে উদাসীন ছিল কেমন করে?

তাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই নৌকার খোঁজে যে দু'জন গিয়েছিল তারা ফিরে আসে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাদের নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়। কারো বারণ না শুনে রাণী ছইএর বাইরে বসে চেয়ে থাকে, আগুনের রক্তিম আভার দিকে। মধুখালি অতিক্রম করেই নৌকা যাবে।

মরেই যে গেছে, বিশেষ করে যাকে স্পষ্টই চেনা যায় কুলি বা চাকর বলে, তার জন্য হাসপাতালের লোক বেশী আর মাথা ঘামাতে চায় না। মরণের খবর জানবার প্রয়োজন যেন কিছু কম তার আপনজনের, প্রাণহীন শরীরটা যেন কিছু কম মূল্যবান তাদের কাছে। বাঁচাবার চেষ্টা সাঙ্গ হবার সঙ্গে অবশ্য প্রধান কর্তব্য শেষ হয়ে যায় হাসপাতালে। জীবিতের দাবিই তখন বড়। ওসমান তা জানে। আচমকা বহু সংখ্যক আহত ও মরণাপন্নদের আবির্ভাবে সকলে খুব ব্যতিব্যস্তও বটে। তবু, চটমোড়া মালটা খুলে মৃত লোকটির নাম ঠিকানা জানবার কোন উপায় মেলে কিনা এটুকু চেষ্টা করে দেখবার অবসর কি কারো নেই? কোন একটা হদিস পেলে আজ রাত্রেই খোঁজ নিতে যাবার জন্য সে তো রাজী ছিল, যত রাস্তা হাঁটতে হয় হাঁটবে। কিন্তু কালকের জন্য ও কাজটা স্থগিত রাখা হয়েছে। মিছামিছি হাঙ্গামা করে লাভ নেই আজ। সকলে বড় ব্যস্ত।

গণেশের কুর্তার পকেটে এক টুক্‌রো কাগজে পেন্সিল দিয়ে ইংরেজীতে লেখা একটা ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল। জেম্‌স স্ট্রীটের একজন এল, ক্যামারণের ঠিকানা। অনেক বলে বলে ওখানে ওসমান একটা টেলিফোন করাতে পেরেছিল। ক্যামারণ কিছুই জানে না। বর্ণিত মৃতদেহ তার কোন জানা লোকের নয়। না, মালের সে অর্ডার দেয় নি, কোন মাল তার কাছে পৌঁছবার কথা ছিল না।

আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল একবার এসে খবর নিয়ে যাবে। এক আত্মীয়কে মৃত দেখে, অজানা রেখে যেতে হচ্ছে মনে হয় ওসমানের। হাসপাতালে আসবার সময়ও ভেতরে ক্ষীণ একটু প্রাণ ছিল ছেলেটার, বাইরে যার কোন লক্ষণ ছিল না। খানিক পরেই জীবন শেষ হয়ে যায়, নিঃশব্দে, চুপি-চুপি। ওর আসল আশ্চর্য মরণ ঘটেছিল রাস্তায় তার কাছে, মাথায় গুলি লাগার পরেও দাঁড়িয়ে থেকে, কথা বলে, হঠাৎ দ্রুত গতিতে নির্জীব নিঝুম হয়ে ঢলে পড়ে। একটি কাতরানির শব্দ বার হয়নি মুখ দিয়ে। একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়নি মারাত্মক আঘাত লাগার, অসহিষ্ণু উদ্বেগের

সঙ্গে শেষ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছিল, ওরা এগোবে না? তখনো তো ওসমান জানত না। জীবন ওর শেষ-হয়ে এসেছে এ জগতে আর কোন কথাই সে জিজ্ঞাসা করবে না কাউকে, এগোতে গিয়ে বাধা পেয়ে যারা থেমেছে তারা এগোবে কিনা জানতে চাইবে না। মাথায় গুলি লাগার জন্য হয়তো এ রকম হয়েছে, মস্তিষ্কের একটা অংশ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছোকরা ডাক্তারটি তার বর্ণনা শুনে যা বললেন, হয়তো তাই হবে, ওসমানের জানবার কৌতূহল নেই। তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই মরণ। নিকট-আত্মীয়কে হয়তো সে ভুলে যাবে, অদ্ভুত মরণের স্মৃতির মধ্যে ছেলেটি চিরদিন বাস করবে তার মনে। নিজের মরণের দিন পর্যন্ত সে ভুলতে পারবে না ছেলেটির ব্যাকুল প্রশ্নঃ 'ওরা এগোবে না?'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার দেখা হয় রসুল আর শিবনাথের সঙ্গে। রসুলের ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ, রক্তক্ষরণের ফলে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বসে বসে বোকার মতো, গোঁয়ারের মতো রক্ত নষ্ট করার জন্য শিবনাথ এখনো তাকে অনুযোগ দিচ্ছিল।

ওসমান ওদের চিনতে পারে দেখা মাত্র, কিন্তু নিজে যেচে কথা বলতে তার বাধ' বাধ' ঠেকে। ওরা তার ছেলের বন্ধু ছিল, হাবিবের বাপ বলে তাকেও চিনত, এই পর্যন্ত। ট্রামের কণ্ডাক্টর বলে চিনত। ছেলে আজ নেই, তারও কারখানার মজুরের পোষাক। কথা বলতে গেলে হয়তো দুটো এলোমেলো খাপ-ছাড়া কথাই হবে, অর্থহীন অস্বস্তিকর সে আলাপে কাজ কি! ওসমানের নিজের কিছু আসে যায় না তাতে, কিন্তু ওদের অস্বস্তি সৃষ্টি করে লাভ নেই।

শিবনাথ চিনতে পেরে প্রথমে বলে, 'আপনি এখানে? রসুল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, এখন হাসপাতালে কি করছেন সাব? আপনার কেউ কি—?'

'একটি ছেলের সঙ্গে এসেছিলাম। মাথায় গুলি লেগেছিল, মারা গেছে।' ওসমান একটু ইতস্তত করে যোগ দেয়, 'আমার কেউ নয়। পাশে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ—'

'বাড়ি যেতে মুশকিল হবে।'

'পা আছে।'

'তা আছে বটে।'

রসুলের হাতে কি হয়েছে সব যেন জানে ওসমান এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করে, 'হাতটা বাঁচবে তো?'

'কি জানি। সন্দেহ আছে।'

'ইস্! ডান হাত।'

কথা বলতে বলতে তিনজনে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। কত রোগ আঘাত যাতনা মৃত্যু শোক দুঃখ হতাশা ভরা হাসপাতালের এলাকা, হৃদয় ভারি তিন জনেরই। তবু তারা সহজ ভাবেই কথা কয়, জীবন্ত মানুষের যেন জীবনের অকারণ অর্থহীন অভিশাপগুলির জন্য বিচলিত হতে নেই, ব্যাথাও পেতে নেই!

রসুল এক রকম কথাই বলছিল না, হঠাৎ থেমে গিয়ে সে শিবনাথকে বলে, 'সরমের কথা ভাই, কিন্তু আর পারছি না। অজ্ঞান হয়ে পড়ার আগেই—'

ওসমান ও শিবনাথ দু'পাশ থেকে ধরে তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে বসিয়ে দেয়, নিজে বসে ওসমান তার মাথাটা বুকে টেনে এনে নিজের গায়ে তাকে হেলান দেওয়ায়।

'তুই এক নম্বর আহম্মক রসুল।'—শিবনাথ বলে গায়ের চাদরটা তার গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে।

ওসমান বলে, 'এরকম আহম্মক কম মেলে। ভেবেছিল কারো হাঙ্গামা না বাড়িয়ে কোনমতে বাড়ি পৌঁছে যাবে। হাবিব বলত, নিজের অসুখ হলে রসুল লজ্জা পায়।'

'তাই তো ছোঁকড়াকে সবাই এত ভালবাসে।'

রসুল আপসোস করে বলে, 'এত রক্ত বেরিয়ে গেছে টের পাইনি। তাহলে কি এক লহমা দেরি করি হাসপাতালে আসতে, নিজেই আসতাম।'

রসুল হাসপাতালেই থেকে যায়। ওসমান ও শিবনাথ যখন রাস্তায় নামে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে, জনহীন স্তব্ধতায় রাত্রিকে যেন ধরা ছোঁয়া যেতে পারছে।

শিবনাথ চিরকাল বাইরে ধীর শান্ত ছেলে, সহজ ও সাধারণ। কখনো কোন বিষয়ে কেউ তাকে আত্মহারা হতে ছাখে নি, যা কিছু ঘটেছে বর্তমানে চোখের পলকে তার ভবিষ্যৎ অনুমান করে নিয়ে সে যেন তদনুসারেই যা করা উচিত তাই করে যায়—সব রকম সহজ বা কঠিন সামান্য বা গুরুতর কাজ। কোন কাজেই তার পরোয়া নেই, সভায় বক্তৃতা করা থেকে চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসার কাজ পর্যন্ত—আহত রসুলকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার কাজও। যে কাজ দেওয়া হোক সে করবে প্রাণ দিয়ে, কিন্তু এক রকমের এক ধরনের কাজে তার মন ওঠে না। ওখানে ওই গুরুতর পরিস্থিতিতে সে অনায়াসে নেতৃত্বের দায়িত্ব

পালন করেছে, তারপর আর দরকার না থাকায় কাজ পালটে দায়িত্ব নিয়েছে রসুলকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার। ফিরে গিয়ে হয়তো চা এনে দেবার ব্যবস্থা করবে শীতে যারা রাস্তা কামড়ে বসে আছে খোলা আকাশের নীচে তাদের জন্য।

না, চায়ের ব্যবস্থা করবে না, ওসমান ভাবে লজ্জিত হয়ে। ওরকম উদ্ভট কাজ শিবনাথ করে না। সহজ স্বাভাবিক কাজই সে করে। ফিরে গিয়ে সে কি করবে ওসমান জানে না।

শিবনাথের কথা সে শুনেছে রসুলের কাছে। সব জায়গায় সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার ওর নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা, কেবল বাইরে নয়, বাড়িতে পর্যন্ত। বাইরের এসব কাজ ওর বাপদাদা পছন্দ করে না, কিন্তু সংসারে সব বিষয়ে ওর পরামর্শ নিয়েই নাকি চলে তারা, বিয়ের ব্যাপার থেকে অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে পর্যন্ত।

শিবনাথের কথা শুনে ওসমানের মনে হয়, ঠিক কথা, ছেলেটা ওই রকমি সন্দেহ নেই। ঘটন অঘটনে ভরপুর গভীর রাত, স্তব্ধ বিষণ্ণ পথে চুপচাপ পথ চলাই ছিল খাপসুরৎ। ছেঁড়া কিছু জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুঁটলীর মতো ফুটপাথে শুয়ে আছে মানুষ, মাংসের বন্ধ দোকানটার সামনে তেমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে ঘেয়ো কুকুর। কোন কি দরকার ছিল শিবনাথের কথা বলার। কিন্তু কথা যখন সে বলল, ওসমানের মনে হল, এরকম কথা না বলে মুখ বুজে তার সঙ্গে পথ চললে ভারি অন্যায় হত শিবনাথের।

রসুলের মতো ছেলে পাওয়া ভার। ডান হাতটা গেল, আপসোস নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করেছে ডান হাতটা গেলেও বাঁ হাত দিয়ে কি করে সব কাজ চালিয়ে নেওয়া চলবে। রসুল আমার ভায়ের মতো।

কি লাগসই কথাটাই বলল শিবনাথ তার মনের কথার সঙ্গে মানিয়ে। এই রকম কথা বলার জন্যই যে উন্মুখ হয়ে ছিল ওসমান, তাকি জেনেছে শিবনাথ ?

ওসমান বলে, 'রসুল আমার ছেলের মতো।'

ওসমানের কথার গতি ধরতে না পেরে শিবনাথ চুপ করে থাকে।

ওসমান বলে, 'সাচ্চা ছেলে, তবে দোষ ছিল একটা। ভাবত কি, রাজা বাদশা খানসা'বরা গরীবের দুঃখ ঘোচাবে, বাবুরা বেহেস্ত বানিয়ে দেবে ওদের জন্য। রোজ বাধত হাবিবের সাথে, ঘরে থাকলে আমি শুনতাম চুপচাপ। একদিন হাবিবকে বলেছিলাম, যে শুনবে না বুঝবে না তার সাথে অত কথায় কাজ কি ?

হাবিব বলেছিল, ভেতরটা সাচ্চা আছে, ও ঠিক বুঝবে একদিন, এসব ছেলে যদি না বোঝে না বদলায় তবে কে বুঝবে, কে বদলাবে?'

নীরবে কয়েক কদম হাঁটে ওসমান, রসুল বদলে গেছে। হাবিবের কাজ এটা। হাবিব থাকলে খুসী হত। ওর মধ্যে হাবিব বেঁচে আছে মালুম হল। ছেলের মতো মনে হল ওকে।

সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এতটুকু আনমনা মনে হয় অনুরূপাকে, তার কোমল ভীরু হাসিটি বার বার দেখা দেয় মুখে, কিন্তু ক্ষীণ অস্বস্তি তিনি অনুভব করেন। এখনো ফিরল না কেন হেমন্ত? দুটো বাজল বড় ঘড়িটায়। কলেজ থেকে সে সোজা বাড়ি চলে আসে; কোন কারণে ফিরতে দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলে যাবার সময়েই বলে যায়, নয়তো বাড়ি ফিরে এসে আবার বার হয়। আজ তো কলেজও নাকি হয় নি। সরকারী কলেজ হেমন্তের, সেখানে ক্লাস যদি বা হয়েই থাকে পুরোপুরি, অনেক আগেই হেমন্তের ফিরে আসা উচিত ছিল আজ।

আধঘণ্টার মধ্যে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে গান শেখাতে। তার আগে কি ফিরবে না হেমন্ত?

দোকান থেকে চা আনিয়ে দেন অভ্যাগতাদের, অপরাধীর মতো বলেন, 'দোকানের চাই খেতে হবে, ঘরে চিনি নেই।'

'তাতে কি হয়েছে।'

'সবারি এক অবস্থা, বাড়িতে কেউ এলে আমিও দোকান থেকে চা আনিয়ে দি, কি করব, নিজেদেরি কুলোয় না।'

'আমি কিন্তু বাড়তি চিনি পাই। একটাকা সের নেয়, কিন্তু কি করব তাই কিনি, চিনি নইলে তো চলে না। একটা দোকান আছে, তেল আর চিনি দুই-ই পাওয়া যায়। সকলকে দেয় না, দোকানীরও তো ভয় আছে। জানা লোক গেলে দেয়।'

'আমিও পাই চিনি, মাসের গোড়ায় দু'-তিন বার আধসের করে এনে জমিয়ে রাখি, একবারে বেশী দেয় না। একটাকা সের পান আপনি? আমার কাছে পাঁচসিকে নেয়।'

'ওরকম তো পাওয়াই যায়', অনুরূপা বলেন, 'আমি আনাই না। কেমন খারাপ লাগে। ব্ল্যাকমার্কেটকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো ওতে। তাছাড়া বড় ছেলে যদি টের পায়—'

অনুরূপা ভাবে, ত্যাখো, ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে কি খাপছাড়া কথা বলে ফেললেন। দুটি মুখ ভার হয়ে গেল তার কথায়। খোঁচা দিয়ে ফেলার জন্য মৃদু আপসোসের সঙ্গে আরেকটা খুসীর চিন্তাও মনে আসে অনুরূপার। বলেই যখন ফেলেছেন তখন আর উপায় কি, হেমন্ত শুনে মজা পাবে, খুসী হবে। হেমন্ত খেতে বসলে বেশ করে সাজিয়ে বলতে হবে গল্পটা তাকে।

'কবে যে অবস্থা একটু ভাল হবে।'

সত্যি, যুদ্ধ থামল কবে, ভাবলাম যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। অবস্থার উন্নতি হল ছাই, দিন দিন আরও যেন খারাপ হচ্ছে। ত্যাওরের চাকরিটা যাবে সামনের মাসে। আবার এসে ঘাড়ে চাপবে সবাইকে নিয়ে। তিন বছর ছিল না, অন্য সময় হলে কিছু পয়সা জমত হাতে, যুদ্ধের বাজারে তাও পারলাম না। উনি গুঁইগাঁই করছিলেন, আমি স্পষ্ট কথা লিখিয়ে দিয়েছি, যে দিনকাল, আমরা আর পারব না। পারা কি যায়, আপনারাই বলুন?'

আমার তো মেজ সেজ দুটি ছেলে নোটিশ পেয়েছে। মাথা ঘুরে গেছে ভাই! বড় জন তো একরকম ভিন্নই, দিল্লীতে থাকে, দশখানা চিঠি দিলে একখানারও জবাব দেয় কি দেয় না।'

ভয় ও হতাশা উদ্যত হয়েই ছিল দাঁড়ানো কুয়াশার মতো, অতি মন্দ বাতাসের মতো অতি মৃদু এই আলোচনাকে আশ্রয় করে গড়িয়ে আসে ঘরে। অনুরূপা ঢোঁক গেলেন। গলাটা শুকনো মনে হয়, খুসখুস করে। গলায় যদি কিছু হয় তার, গাইবার ক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায় কোন কারণে—হেমন্ত লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ওঠবার আগে! কত গায়ক-গায়িকার অমন গিয়েছে। গান শেখানোও ঝকমারির কাজ। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এমন অত্যাচার চলে গলার ওপর। গান শেখানোর কাজ ছেড়ে দেবেন একটা দুটো বাড়ির? কিন্তু তাহালে কি চলবে তাঁর সংসার, হেমন্তের পড়ার খরচ?

'গান শোনাবেন একখানা?'

'গান?' অনুরূপা তাঁর ক্ষীণ কোমল হাসি হাসেন, 'গান গেয়ে শোনাবার গলা কি আর আছে? গান শিখিয়ে শিখিয়েই গলা গেছে গাইতে পারি না আর।'

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে তারা বিদায় নেয়। অনুরূপা জানেন ওদের মনের ভাব: একটু গাইতে জানলে, একটু নাম হলে, এমনি অহঙ্কারই হয় মানুষের। গলাকে বাড়তি এতটুকু পরিশ্রম করাতে তার যে কত কষ্ট, কত ভয়, ওরা তার কি বুঝবে!

জয়ন্ত বলে, 'এবার যাব মা খেলতে?'

'এতক্ষণ যাওনি কেন ?'

জিজ্ঞাসা করা বৃথা, অনুরূপা জানেন। বাড়িতে লোক এলে এ ছেলে ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না, বসে বসে বুড়িদের আলাপ শুনতে পর্যন্ত কি যে ভাল লাগে তের বছরের ছেলের !

'যাও। দূরে যেওনা কিন্তু। শীগ্‌গীর ফিরবে।'

রমাও বাড়ী নেই, শান্তাদের ওখানে গেছে। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে নতুন গানটি সেধে রাখবে, বলেছে। অন্যের মেয়েকে নটা পর্যন্ত গান শিখিয়ে বাড়ি ফিরে তখন অনুরূপা নিজের মেয়ের গান কেমন তৈরী হল শুনতে পাবেন। তবে, গানের পেছনে বেশী সময় রমার না দিলেও চলে। মোটামুটি ও যা শিখবে তাই যথেষ্ট। ওকে খুব ভাল করে শেখালেও গানে ও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবে না, গানের ধাত নয় ও মেয়ের। অনুরূপা একটা নিশ্বাস ফেলেন। খালি বাড়িতে নিজেকে কেমন শ্রান্ত, অবসন্ন মনে হয়। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে কিন্তু গভীর আলস্যে উঠতে ইচ্ছা করছে না আজ। হেমন্ত ফিরে এলে হয়তো আলস্যটা কেটে যেত, জোর মিলত উঠে গিয়ে ছড়া বলার গলা বা স্বরজ্ঞান পর্যন্ত নেই যে মেয়ের, নিজের গলার আওয়াজ শুনেই ভাব লেগে যে মেয়ের খেয়াল থাকে না স্বর কোথা গেল, তাদের গান শিখিয়ে আসতে !

এই রকম সময়ে, ছেলে বা মেয়ে যখন কাছে থাকে না কেউ, কেমন আর কিসের অজানা সব শঙ্কার ছায়াপাতে হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে অনুরূপার। নিরাপত্তার জন্য নিজেকে একরকম ছেঁটে ফেলেছেন, সহজ ও সীমাবদ্ধ করে এনেছেন জীবন ও জীবনের পরিধি, যেমন চেয়েছেন তেমনি দিন চলেছে শান্তিতে, ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে উঠছে মনের মতো। কোথা থেকে তবে এত সংকেত আসে বিপর্যয়ের, বিভ্রাটের, বিপদের ? কেন কেঁপে কেঁপে ওঠে অনুরূপার ভীরু বুক ? পৃথিবী জোড়া যুদ্ধ তাকে বিচলিত করেনি। সে যুদ্ধের যত ধাক্কা এসে লাগুক তার ঘরে, সে অসুবিধা, শুধু টানাটানি, কষ্ট করার ব্যাপার—বোমার ভয়ের দিনগুলিও তাকে এমন সচকিত করে তুলতে পারেনি। মনে হয়েছে ওসব দূরের বিপদ—বহু দূরের। তাদের চারটি প্রাণীর ছোট নীড়টিতে ও বিপদের ছোঁয়াচ লাগবে না। কিন্তু এ বিপদ যেন বাতাসের গুমোটের মতো, মাথার উপরের আকাশে ঘন কালোমেঘের মতো ঘনিয়ে আসছে অনুভব করা যায়। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে মনে হয়, সব খবরের আড়ালে যেন দুরন্ত ক্ষোভ গুমরাচ্ছে মানুষের, পথে ঘাটে লোকের কথা শুনলে মনে হয় সব চিন্তা একদিকে গতি পেয়েছে মানুষের,

চারিদিকে সভা আর শোভাযাত্রায় সেই চিন্তা ফেটে পড়েছে হাজার কণ্ঠের গর্জনে। প্রতি মুহূর্তে ঘরে বাইরে চেতনায় যা ঘা দিচ্ছেন জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর সঙ্গে যা জড়িয়ে গেছে, তা কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে ঘরের নিরাপদ সুখশান্তি অব্যাহত রাখতে চেয়ে?

রমা ফিরে আসে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে।

'বেরোও নি তো? বেশ করেছ। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। জানো মা, ট্রাম চলছে না। ওদিকে খুব হাঙ্গামা চলছে, পুলিস নাকি গুলি চালিয়েছে—কি ভাবছো মা?'

'কিছু না। হেমা ফেরেনি এখনো।'

'ও! দাদার জন্য ভাবছো?' রমা হাল্‌কা সুরে বলে, 'দাদা কস্মিনকালে ওসবের মধ্যে যায় না, যাবেও না। কোথায় গেছে, এখুনি এসে পড়বে। দাদার জন্য ভেবো না।'

রমার কথা আর কথার সুর আঁচড় কাটে অনুরূপার কানের পর্দায়। রমার গলায় তার দাদার সম্বন্ধে অবজ্ঞার সুর শোনা যাবে, এই বিপদের আশঙ্কাও বুঝি তার ছিল!

'না, ভাবনার কি আছে! গানটা ভাল করে শিখবি রমা? কাপড় ছেড়ে আয়।'

রমাকে বিপন্ন দেখায়। তার মুখে দারুণ অনিচ্ছা।

'আজ থাক গে। গানটান শিখতে আজ ইচ্ছে করছে না মা।'

'তবে থাক।'

জয়ন্ত ফিরে আসে আরও বেশী উত্তেজনা নিয়ে। যত কিছু সে শুনে এসেছে বাইরে থেকে সব অনুরূপাকে শোনায়। তারপর এক মারাত্মক প্রস্তাব করে।

'একটু দেখে আসব মা? একটুখানি? দূর থেকে একটু দেখেই চলে আসব।'

'না।'

'কি হয় গেলে? এসে পড়তে বসব।'

'আজ পড়তে হবে না। আজ তোর ছুটি। মুখহাত ধুয়ে আয়, গল্প বলব একটা।'

'বানানো গল্প ভাল গাগে না মা।'

বানানো গল্প ভাল লাগে না! এতটুকু ছেলে তার আজ সে রকম গল্প চাই, যা ধরাছোঁয়া দেখাশোনা যায়।

রাত বাড়ে, হেমন্ত আসে না। অনুরূপা উৎকর্ণ হয়ে থাকেন সদরের কড়া নাড়ার শব্দের জন্য। অস্বস্তি তাঁর উদ্বেগে দাঁড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রমার মনেও ভাবনা ঢুকেছে।

জয়ন্ত ঘুমিয়ে পড়লে অনুরূপা বলেন, 'আমি একটু খোঁজ করে আসি রমা।'

'কোথায় খোঁজ করবে এত রাত্রে?'

'সীতার কাছে যাই একবার। ওদের বাড়ি টেলিফোনও আছে।'

সীতা সবে বাড়ি ফিরেছিল। হেমন্তকে বিদায় দিয়ে নেয়ে খেয়ে নিয়ে সেও বেরিয়ে গিয়েছিল। মনটা নাড়া খেলেও খাওয়ায় অরুচি জন্মানোর সখ তার নেই। তার বেশ খিদে পায় এবং সে খায়। তারপর আর কিছু খাওয়ার অবসর পায়নি এ পর্যন্ত। খাওয়ার ইচ্ছাটা মরে গেছে আজকের মতো। চেনা অচেনা প্রিয়জনের আঘাত ও মরণ নাড়া দিয়েছে মনটাকে, সে তো আর ব্যক্তিগত দুঃখের কাব্য নয়। ক্ষোভ ছাড়া কোন অনুভূতিই তার নেই, যার আগুনে আরও শক্ত ও দৃঢ় হয়ে গেছে তার মন ও প্রতিজ্ঞা।

'হেমন্ত? বাড়ি ফেরেনি?'

সভায় একবার চোখে পড়েছিল হেমন্তকে। সেখানে তার উপস্থিতিকে বিশেষ মূল্য সে দিতে পারেনি। তার সঙ্গে তর্ক করার উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই হয়তো সে সভায় এসে দাঁড়িয়েছে মনে হয়েছিল সীতার। তারপর হেমন্তের কথা আর তার মনে পড়েনি। আর অবসর হয় নি তার কথা মনে পড়ার, ভালও লাগেনি তার কথা ভাবতে। হেমন্তের সম্বন্ধে আশা-ভরসা কিছু আর রাখা চলে না এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া তার পক্ষে কষ্টকর। অন্য দিন জীবনের সাধারণ কাজ ও ঘটনার মধ্যে ভুলতে পারত না, দুঃখ ও ক্ষোভটা নেড়ে-চেড়ে খাপ খাইয়ে নিতে হত সচেতন প্রচেষ্টায়, আজ নিজের সুখ-দুঃখের কথা মনের কোনায় উঁকি দেবারও অবসর পায়নি। দুঃখবেদনা হতাশার ওই স্তরটাই যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে।

অনুরূপার জন্য সে মমতা বোধ করে না। তার মনে হয়, মাতৃস্নেহের এই বিকৃত অভিব্যক্তির সঙ্গে সহানুভূতি দেখালে অন্যায় করা হবে। অনুরূপার মুখে উদ্বেগের ছাপটা স্পষ্ট দেখতে না পেয়ে সে একটু আশ্চর্য হয়। কিন্তু অতবড় ছেলে সন্ধ্যা রাতে বাড়ি ফেরেনি বলে পাগল হয়ে খোঁজ করতে বার হবার মধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট, মুখের ভাব যতই শান্ত থাক। গুলির মুখে ছেলে পাঠিয়ে কত মা বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছে ধৈর্য ধরে, ছেলের বেড়িয়ে ফিরতে দেরি হলে

এঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এর জন্যই হয়তো এত বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে হেমন্ত, অতি আহ্লাদী ছেলেরা যা হয়।

'কোথায় গেছে, আসবে।' সীতা উদাস ভাবে বলে।

'তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'ও-বেলা একবার এসেছিল বারটা-একটার সময়।'

তার কাছে অনুরূপা খোঁজ নিতে এসেছেন হারানো ছেলের! পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তার কাছে! কথাটা এতক্ষণে খেয়াল হয় সীতার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভরা আগামী দিনের জীবনের পরিকল্পনায় তাকেও তবে ওরা মায়ে-ব্যাটায় হিসাবের মধ্যে ধরে রেখেছে? এমন হাসি পায় সীতার কথাটা মনে করে। অনুরূপা জানেন, মনে মনে অন্তত এই ধারণা পোষণ করেন যে সীতা দু'দিন পরে তার ছেলের বৌ হয়ে তার বাড়ি যাবে। ছেলের ভাব দেখে তিনি অনুমান করে নিতে পেরেছেন এই মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছে, তাই থেকে একেবারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি। তার এত ভাল ছেলে, এমন উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ, সীতার পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঠাঁইও পায়নি তার।

এবার সীতা বুঝতে পারে অনুরূপার মুখে উদ্বেগের, দুর্ভাবনার চিহ্ন জোরালো হয়ে ফোটেনি কেন। ভাবী বৌয়ের সঙ্গে তিনি ভাবী শাশুড়ীর মতো আচরণ করেছেন। ভয়ে-ভাবনায় সীতা কাতর হয়ে পড়বে, তাকে ভড়কে দেওয়া তার উচিত নয়। সীতাকে ভরসা দেবার, তার মনে সাহস জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব তারই!

সীতার নির্লিপ্ত ভাব তাকে রীতিমতো ক্ষুণ্ণ করেছে, আঘাতও করেছেন। গম্ভীরমুখে রীতিমতো অনুযোগের সুরে অনুরূপা বলেন,—

'না জানিয়ে কোন দিন বাড়ি ফিরতে দেরি করে না সীতা। বুঝে উঠতে পারছি না কি হল।'

সীতার হাসি পাচ্ছিল কিন্তু হাসির রেখাও তার মুখে ফুটল না। সে নিজেও জানত না মনের এ ভাবটা এত ক্ষণস্থায়ী হবে। ক্ষণিকের একটু আমোদ বোধ করে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়, নাড়া খায় গভীর ভাবে। হেমন্তের অনেক অন্ধতা, অনেক কুসংস্কার, অনেক দুর্বলতার মানে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হেমন্তের দোষ নেই। এমন যার মা, আঁতুড় থেকে আজ এত বয়স পর্যন্ত যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই মা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, তার হৃদয়-মনের গঠনের ত্রুটির জন্য সে নিজে কতটুকু দায়ী। এটুকু সীতা জানে যে শৈশবে মনের যে গঠন হয়

জীবনে তার আর পরিবর্তন হয় না। সজ্ঞান সাধনায় পরবর্তী জীবনে চিন্তা ও অনুভূতির জগতে নূতন ধারা আনা যায় আপোসহীন অবিশ্রাম কঠোর সংগ্রামের দ্বারা। নিজের সঙ্গে লড়াই করার মতো কষ্টকর, কঠিন ব্যাপার আর কি আছে জীবনে। বুদ্ধি দিয়ে যদি বা আদর্শ বেছে নেওয়া গেল, কর্তব্য ঠিক করা গেল, সে আদর্শ অনুসরণ করা, সে কর্তব্য পালন করা যেন ঝকমারি হয়ে দাঁড়ায় যদি তা বিরুদ্ধে যায় প্রকৃতির। ইণ্টেলেকচুয়ালিজমের ব্যর্থতার কারণও, তাই। বুদ্ধির আবিষ্কার, বুদ্ধির সিদ্ধান্ত কাজে লাগানোর চেয়ে অন্ধ অকেজো ভাল-লাগা ও পছন্দকে মেনে চলা অনেক সহজ, অনেক মনোরম। বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে তাই অধঃপতন এত বেশী। এত বেশী হতাশা। কথার এত মার-প্যাচ। এত ফাঁকিবাজী। বিশ্বাসের এমন নিদারুণ অভাব!

সীতা বলে, 'মাসীমা ছেলে আপনার কচি খোকা নেই।'

'আমার কথাটা তুমি বুঝলে না সীতা। আমার ভয় হচ্ছে, ও তো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েনি? কিছু হয়নি তো ওর?'

সীতা এবার না হেসে পারে না, যদিও সে হাসিতে দুঃখ ও জ্বালাই প্রকাশ পায় বেশী: 'হেমন্ত কোন হাঙ্গামার ধারে কাছে যাবে!'

'এটা তুমি কি কথা বললে?' অনুরূপা বলেন আহত মাতৃগর্বের অভিমানে, 'ছ'মাস এক বছর আগে বললে নয় কোন মানে হত। হেমা যে কি ভাবে বদলে যাচ্ছে তুমিও তা লক্ষ্য করনি বলতে চাও মা? আমার তো বিশ্বাস হয় না ও-কথা! ওর মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা এসেছে কিছু দিন থেকে। আমি জানি সেটা কিসের অস্থিরতা, ওর কি হয়েছে। তুমিও দায়ী এর জন্য।'

'আমি?'

'তুমি। তুমি দায়ী। তুমি কি বলতে চাও, তুমি টেরও পাওনি হেমা কি ভাবে ছটফট করছে, বদলে যাচ্ছে?'

অনুরূপার অনুযোগে সত্যই খটকা লাগে সীতার মনে, মনে পড়ে আজ সে হেমন্তকে সভায় দেখেছিল। হয়তো নিছক খেয়ালের বশে সভায় যায়নি হেমন্ত। হয়তো নতুন চেতনা, নতুন অনুভূতির তাগিদেই সভায় যেতে হয়েছিল তাকে, নবজাগ্রত প্রশ্ন ও সংশয়গুলির নির্ভুল বাস্তব জবাব খুঁজে পাবার কামনায়। আত্মপ্রীতির জেলখানার প্রাচীরে হয়তো সত্যই চিড় খেয়েছে হেমন্তের। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকেই সে যে চলে গিয়েছিল সভা ছেড়ে বিরক্ত হয়ে তাও তো জানা নেই সীতার। শেষ পর্যন্ত চলে হয়তো যেতে পারেনি, শোভাযাত্রায়ও হয়তো যোগ

দিয়েছিল। প্রাণ তুচ্ছ করা অভিযানে সে যে অংশ গ্রহণ করেনি তাই বা কে জানে !

ভাবতেও এমন অদ্ভুত লাগে সীতার। নিজের মত সমর্থনের জন্য আজই হেমন্ত আরও বেশী রকম ভোঁতা, বেশী রকম সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা তবে তার কাছে দুর্বলতা আড়াল করবার চেষ্টা। ভেতরে লড়াই চলছে বলে, পুরানো বিশ্বাস ভেঙে পড়ছে বলে, বাইরে এমন অন্ধ একগুঁয়েমির সঙ্গে হার মানার অপমান এড়িয়ে চলতে হবে। তার কাছে কি কোন দিন নিজের ভুল স্বীকার করবে হেমন্ত? পারবে স্বীকার করতে ? নিজের জন্য জয়ের লোভ নেই সীতার। তার কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানল এ সুখ সে চায় না। ভুল বুঝতে পেরে সেটা মেনে নেবার সাহস তার আছে, নতুন সত্যকে চিনতে পারলে সেটাকে গ্রহণ করার ছেলেমানুষী লজ্জা তার নেই, এটুকু জানলেই সে খুসী হবে।

অনুরূপাকে বসিয়ে সীতা নিজেই কয়েক জায়গায় টেলিফোন করে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর সে হাসপাতালে সাড়া পায় শিবনাথের। শিবনাথ আহতদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করছিল।

'কার কথা বলছ ? হেমন্ত ? শিবনাথ বলে, হ্যাঁ হেমন্ত এখানে আছে।'

সীতা মনে মনে বলে, সর্বনাশ !

'ওর খবর কি ?'

'সামান্য লেগেছে, বিশেষ কিছু নয়। ড্রেস করে দিলেই বাড়ি যেতে পারবে।'

'হেমন্ত শোভাযাত্রায় ছিল ?

'ছিল।'

'গুলি চলবার সময় ছিল ?'

'আগাগোড়া ছিল।'

'আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে।'

'কেন ? আশ্চর্য হবার কি আছে ? ওর রক্ত কি গরম নয় ?'

'তর্ক দিয়ে ছাড়া রক্ত গরম করার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিল। ওকে বলবে, তাড়াতাড়ি যেন বাড়ি চলে যায়। ওর মা খুব উতলা হয়ে আছেন।'

অনুরূপা প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'না না, ওকথা বলতে বোলো না সীতা ! বারণ করে দাও ! আমার কথা কিছু বলতে হবে না।'

'শিবনাথ, ছেড়ে দাওনি তো ? শোন, হেমন্তকে ওর মার কথা কিছু বোলো না। শুধু বোলো আমি টেলিফোন করেছিলাম, তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলেছি।'

হেমন্ত জানুক, সীতা সব জেনেছে, বুঝতে পেয়েছে। ওবেলার তর্কটা তাদের বাতিল হয়ে গেছে একেবারে।

অনুরূপা মোহগ্রস্তার মতো বসে থাকেন। ছেলে নিরাপদ আছে জানার পর এতক্ষণে তাঁর মুখ থেকে রক্ত সরে যাবার কারণ খানিকটা অনুমান করতে পারে সীতা। দ্বিধা-সংশয়ের দিন পার হয়ে গেছে হেমন্তের। সব রকম হাঙ্গামা থেকে নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে বেঁচে থাকার স্বার্থদুষ্ট হীনতাকে আর সে প্রশ্রয় দিতে পারবে না। সে শুধু মনে মনে এটা করেনি স্থির, একেবারে হাতে নাতে বিদ্রোহ করেছে। সুখের রঙীন স্বপ্ন মুছে যাবার সম্ভাবনায় মুখের চেহারাও তাই বিবর্ণ হয়ে গেছে অনুরূপার।

'আপনি অত ভাবছেন কেন মাসীমা ?'

'ভাবব না ? তোমার নয় খুসীর সীমা নেই, হেমন্ত এবার থেকে লেখাপড়া চুলোয় দিয়ে মিটিং করে বেড়াবে, জেলে যাবে, দেশোদ্ধার করবে। আমার অবস্থাটা বুঝে দেখেছ একবার ? আমার কত আশা-ভরসা হেমন্তের ওপর। তুমি যে আমার কি ক্ষতি করলে শুধু ভগবান জানেন।'

'আমায় শেষে দায়ী করলেন মাসীমা ?' সীতা বলে আশ্চর্য ও আহত হয়ে, 'ছেলেমানুষী ভুল করলেন একটা। আমার সঙ্গে মেশার জন্য আপনার ছেলে বদলায়নি। অত-বড় গৌরব দাবি করবার অধিকার আমার নেই। হেমন্ত নিজেই বদলেছে, স্বাভাবিক নিয়মে। দেশের এই অবস্থা, এটা বুঝতে পারেন না যে সব কিছুর মধ্যে এদেশে রাজনীতি জড়িয়ে আছে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে হলে তাকে তালা বন্ধ করে রাখা দরকার ? শত শত আঘাত এসে ওকে সচেতন করে তুলবে, সামলাবেন কি করে ? স্বাধীনতার প্রেরণাই ওকে জাগিয়েছে, দেশপ্রেমের আলোই ওকে পথ দেখিয়েছে। আপনার কথা সত্যি, আমি পেরে থাকলে আমিই নিজেকে কৃতার্থ ভাবতাম মাসীমা। কিন্তু তা হয়নি। আমি তো তুচ্ছ, নেতাও কি মানুষকে জাগাতে পারেন ? মানুষের মধ্যেই জাগরণ আসে, নেতা শুধু তার প্রতিনিধিত্ব করেন।'

সীতা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, 'আপনার আপসোসের কারণটাও মাথায় ঢুকছে না আমার। দেশের জন্য দশের জন্য ছেলে দুঃখ পেলে মার কষ্ট হয়, কিন্তু গৌরবও কি হয় না ?'

'তুমি বুঝবে না সীতা,' অনুরূপা জ্বালার সঙ্গে বলেন, 'আমার মতো কষ্ট করে ছেলেকে যদি পড়িয়ে মানুষ করতে হত, তবে বুঝতে লেখাপড়ার ক্ষতি করে ছেলে

ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে বসলে কেমন লাগে।'

'আপনি হেমন্তের ওপর অবিচার করছেন মাসীমা। ভুল করছেন।'

'কেন ?'

'হেমন্ত লেখাপড়ার ক্ষতি করবেই, ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেই, এটা আপনি ধরে নিলেন কেন ? লেখাপড়ায় ভাল করা ওর কর্তব্য, তাতেই যদি অবহেলা করে, তবে তো ধরে নিতে হবে ওর অধঃপতন হল। দেশের কথা ভাবলে কি লেখাপড়া বাদ দিতে হয় মাসীমা ? কোথাও কিছু নেই, জেলেই বা হেমন্ত যাবে কেন সখ করে ? জেলে গেলেই কি কাজ হয় দেশের, দরকার থাক বা না থাক ? হেমন্তেরও ঠিক এই রকম ধারণা ছিল, পড়লে শুধু পড়তেই হবে চোখকান বুজে, আর নয় তো সব ছেড়ে দিয়ে নামতে হবে রাজনীতিতে। মুক্তি-সংগ্রামে ছাত্রদেরও যে একটা অংশ আছে, সাধারণ অবস্থায় সে অংশ গ্রহণ করা যে পড়াশোনার এতটুকু বিরুদ্ধে যায় না, বরং চরিত্র গঠনে আর মানসিক শক্তির বিকাশে সাহায্যই করে, এই সহজ কথাটা মাথায় আসে না কেন আপনাদের মাসীমা ?'

'তোমাদের মতো মাথা নেই বলে বোধ হয়।'

'মন শান্ত হলে আপনার রাগ কমে যাবে।'

'আমি না লড়েই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব ভেবেছ বুঝি ?'

অনুরূপার কথার উগ্রতায় সীতা একটু আশ্চর্য হয়ে যায়, গভীর তীব্র বিদ্বেষে মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে অনুরূপার। নিরুপায়ের অন্ধ আক্রোশে তিনি যেন কাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন। হেমন্তকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাকে সুমতি দেবার জন্য তিনি কি লড়াই করবেন ? ছেলেকে ভাল ছেলে করে রাখতে এতদিন যে লড়াই করে এসেছেন, তার চেয়েও জোরালো লড়াই ? কিন্তু সে কথাটা বলতে গিয়েও এত বিদ্বেষ, এত আক্রোশ ফুটে উঠবে কেন তার কথায়, মুখের ভঙ্গিতে ?

সংশয়ের সঙ্গে সীতা জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না মাসীমা। কিসের লড়াই ? কি নিয়ে লড়বেন ? কার সঙ্গে ?'

'খুকী বুঝিও না সীতা আমায়। তের বছর হল স্বামীর আশ্রয় হারিয়েছি, সেই থেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার চালিয়ে এসেছি, ছেলে-মেয়ে মানুষ করছি। তুমি আমাকে যত বোকা ভাবো অত বোকা আমি নই।'

এবার সীতা বুঝতে পারে। জোরে এমন নাড়া খায় তার মনটা। খানিকক্ষণ সে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে অনুরূপার মুখের দিকে। অনুরূপাকে তুচ্ছ না ভাবা সত্যই অসম্ভব মনে হয় তার।

'বোকা আপনাকে কখনো ভাবিনি মাসীমা, আজ বোকা মনে হচ্ছে। আমার সঙ্গে লড়বেন বলছেন না কি? আপনার বুদ্ধি সত্যি লোপ পেয়েছে। আমায় অপমান করুন তার মানে হয়, ও-কথা বলে নিজের ছেলেকে কত বড় অপমান করছেন বুঝতে পারছেন না? ছেলের আপনার নীতি নেই আদর্শ নেই জীবনে, একটা মেয়ের খাতিরে নিজেকে সে চালাচ্ছে? আমায় খুসী করার জন্য আপনার বিরোধিতা করতে যাচ্ছে, তার ব্যবহারের আর কোন মানে নেই? নিজের ছেলেকে এমন অপদার্থ কি করে ভাবলেন? তাও যদি এতটুকু সত্যি হত কথাটা। আপনার মনের কথা আন্দাজ করলে হেমন্তেরই ঘেন্না ধরে যাবে জীবনে। একটা ভুল ধারণার বশে আমাকে হিংসা করে অশান্তি সৃষ্টি করবেন না মাসীমা। নিজেই জ্বলে-পুড়ে মরবেন।'

স্পষ্ট রূঢ়তার সঙ্গেই সীতা কথাগুলি বলে যায়, অনুরূপাকে রেয়াৎ করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। কড়া ভাষায় খোলাখুলি সোজাসুজি না বললে তার কথার মর্ম অনুরূপা গ্রহণ করতে পারবেন কি না, এ সন্দেহও তার ছিল। স্নেহের বাড়াবাড়ি মাকেও কোথায় নিয়ে যায় ভেবে বড় আক্ষেপ হচ্ছিল সীতার। এই সব মায়েরাই ছেলের বৌ-প্রীতির জ্বালায় পুড়ে মরে, সব দিক্ দিয়ে গ্রাস করে রাখতে চায় ছেলেকে চিরকাল। স্নেহ যায় চুলোয়, বড় হয়ে থাকে শুধু বিকারটা। মায়ের স্নেহও যদি এমন সর্বনেশে হয়, সে কত বড় অভিশাপ মানুষের! তাও এমন মার, অন্তঃপুরের বন্দী জীবনে অন্ধ মমতা বিলিয়ে যাওয়াই শুধু যার কাজ নয়, একা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যে বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই করে আসছে পনের বছর ধরে, বাঁচবার জন্য, ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য! এমন বাস্তব যার জীবন, মা বলেই কি তার এতটুকু বাস্তববোধ জন্মায় নি ছেলেমেয়েদের বিষয়ে? এমন জন্যই নিজেকে ছোট করে মায়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না সন্তানের। তাই কি করতে হবে হেমন্তকে? নইলে যে সমস্যা সৃষ্টি করবেন অনুরূপা, তার সমাধান করা কি সম্ভব হবে হেমন্তের পক্ষে!

কিন্তু অনুরূপা কি সত্যই ও-রকম অশান্তি সৃষ্টি করবেন? হেমন্ত পাস করে মোটা মাইনের চাকরি করবে, এ আশা তো ফুরিয়ে যায়নি একেবারে। অনিশ্চিত আশঙ্কাই শুধু পীড়ন করছে তাকে। শান্ত মনে সব কথা বিবেচনা করে দেখবার পরেও কি ছেলের দিক্‌টা খেয়াল হবে না অনুরূপার, মনে হবে না অত বড় উপযুক্ত ছেলেকে চলা-ফেরা মতামতের এতটুকু স্বাধীনতা না দেওয়া পাগলামির সামিল? স্নেহের শিকলে জোর করে হেমন্তকে হয়তো বেঁধে রাখা যাবে কিন্তু

ফলটা তার ভাল হবে না মোটেই ?

অনুরূপার নিজের মুখে লড়াই-এর উদ্ভট ঘোষণা শোনার পর এখনও যেন বিশ্বাস হতে চায় না সীতার যে, ব্যাপারটা তিনি সত্য সত্যই ও-রকম কুৎসিত করে তুলবার জন্য কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লাগতে পারবেন।

অসহায়ের মতোই চুপচাপ বসেছিলেন অনুরূপা তার ধমকানির মতো কথাগুলি শুনে। তার নীরবতা বা বসে থাকা কোনটার মানেই ধরতে না পেরে সীতা সংশয়ভরা চোখে তার দিকে তাকায়! নিজের শ্রান্তিও সে আবার অনুভব করে নতুন করে।

'তোমার কথা শুনে একটু ভড়কে গেছি মা!'

অনুরূপার ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠ আশ্চর্য করে দেয় সীতাকে।

'ভড়কে যাবেন কেন ?'

অনুরূপা একটু ইতস্তত করে তেমনি শঙ্কিত স্বরে অসহায় ভাবে বলেন, 'আমার ওপর রাগ করে হেমাকে ছেঁটে দেবার কথা ভাবছ না তো তুমি ? আমি না শেষকালে দায়ী হই।'

এ কথায় অন্য সময় হাসি পেত সীতার, এখন এ আবেদনের করুণ দিকটাই তার মনে লাগে। তাকে ছেলের ভবিষ্যৎ বৌ হিসাবে ভাবতে ভাবতে কল্পনাটা অনুরূপার জোরালো বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে, হেমন্ত আর সে পরস্পরকে ভালবাসে, সব ঠিক হয়ে আছে তাদের মধ্যে। এ বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়ের লেশটুকু নেই অনুরূপার মনে। হেমন্তকে বিগড়ে দেবার জন্যে মনে মনে তাকে স্থির নিশ্চিত ভাবে দায়ী করে ক্ষেপে উঠবার কারণ হয় তো তাই।

বিয়ে না হতেই শাশুড়ী-বৌয়ের লড়াই!

একটা ব্রতের কথা মনে পড়ে সীতার। ছেলেবেলা মামাবাড়ি গিয়ে মামাতো বোন আর পাড়ার কয়েকটি ছোট মেয়েকে এই ব্রত করতে দেখেছিল। যমপুকুরের ব্রত—যুগ যুগ ধরে শাশুড়ীরা ছেলের বৌদের যত যন্ত্রণা দিয়েছে তারই বিরুদ্ধে কচি কচি মেয়ের ব্রতের বিদ্রোহ। ব্রতের প্রচার কথাটা চমৎকার। বৌ চায় এ ব্রত করতে, শাশুড়ী বলে, না। কাজেই মরে শাশুরী নরকে যায়। নরকের কষ্ট সয় না—ছেলের বৌয়ের দয়ায় উদ্ধার পাওয়ার চেয়ে কোনমতে নরকের কষ্টও অনেক ভাল মনে করে প্রাণপণে সহ্য করতে চেয়েও সয় না। অগত্যা স্বপ্নে ছেলেকে বলে দিতে হয় যে করে হোক বৌকে দিয়ে ব্রতটা করিয়ে আমায় উদ্ধার কর। বৌ কম চালাক নয়, বলে, শাশুড়ী নেই এ ব্রত করতে যাব কেন মিছামিছি কষ্ট সয়ে

উপোষ করে : একগা গয়না দাও, দুধ ভাত খাওয়াও তবে করব ব্রত। ব্রত কথার সে কি ঝাল ঝাড়া শাশুড়ীর ওপর, আর তার মধ্যেই শাশুড়ীর বৌ-নির্যাতনের কি অকাট্য প্রমাণ। শাশুড়ী হল খুইদিয়া দাই।

আলো আলো খুইদিয়া দাই, ধানতলা দিলি না ঠাঁই।
আলো আলো খুইদিয়া দাই, মানতলা দিলি না ঠাঁই।
আলো আলো খুইদিয়া দাই, কলাতলা দিলি না ঠাঁই।

ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা পর্যন্ত হয় নি, তবু যেন অনুরূপা মরে না গিয়ে মোটা সোটা দেহটি নিয়ে জলজ্যান্ত বেঁচে থাকলেও নরক যন্ত্রণারই প্রতিকারে তাকে দিয়ে শাশুড়ী-উদ্ধারের ব্রত পালন করিয়ে নিতে চান।

একটা কথা ভেবে সীতা স্বস্তি পায়। ছেলের দিক্‌টা অনুরূপা বিবেচনা করবেন। এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ভাবেসাবে। যত অন্ধই হোক তার স্নেহ, ওই বিবেচনাটাও তার আছে ছেলেকে নিজের খুসীমতো চালাতে চেয়ে উনি যে ভাবেই লড়াই করুণ, হেমন্তকে অসুখী দেখলে, তার জীবনে অশান্তি এলে, নিজেই তিনি জিদ বিসর্জন দেবেন, সামঞ্জস্য খুঁজবেন। সে যা ভয় করছিল, অনুরূপার দিক্‌ থেকে সে ভয়ের কারণ নেই।

অথবা আছে? কি করে সুনিশ্চিত হবে সীতা, কি করে বিশ্বাস করবে এরকম মা, ছেলে-প্রাণ এ রকম মা, ছেলেকে বিব্রত দুঃখিত অসুখী দেখলে নিজের খেয়াল খুসীকে সত্য সত্যই ছাঁটাই করে ছেলের সঙ্গে আপোস করবে? বিশেষ করে, যে ছেলের জন্য এত কাল মেয়েমানুষ হয়েও টাকা রোজগার করেছেন এত কষ্টে, এত দুঃখে। একবার যদি খেয়াল হয় যে ছেলে অকৃতজ্ঞ—আর কি তখন সহজ বুদ্ধি টিকবে, অনুরূপার আপোস করার সংযম বজায় থাকবে? কে জানে! ভালটা আশা করাই ভাল।

অনুরূপার অদ্ভুত কথাই যেন পুরানো অন্তরঙ্গতা ফিরিয়ে আনে সীতার, সে হাসিমুখে শাসনের সুরে বলে, 'কি আবোল তাবোল বক্‌ছেন মাসীমা? যেমন আবোল-তাবোল ভাবছেন, কথাও বলছেন তেমনি। মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার। বাড়ি যান তো। দাঁড়ান, কাউকে সঙ্গে দি, পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'থাক্‌, থাক্‌। আমি নিজেই যেতে পারব মা।'

ভাগ্যে বৌমা বলে বসেন নি, সীতা ভাবে।

'তাকি হয় মাসীমা? নকুল গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

অনুরূপা উতলা হয়ে পড়ছেন—এ খবরটা হাসপাতালে হেমন্তকে দেবার নামেই ব্যাকুল হয়ে অনুরূপা কেন বাধা দিয়েছিলেন বুঝতে পারলে, অনুরূপা সম্বন্ধে সীতা বোধ হয় আরও নিশ্চিন্ত হতে পারত। ছেলে পাছে মনে করে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এ ভয়টা কত জোরালো অনুরূপার মনে, কত সাবধান তিনি এ বিষয়ে, সীতা সেটা টের পেত। অত বড় ছেলে সন্ধ্যা-রাত্রে বাড়ি না ফিরলে ব্যস্ত হওয়া সঙ্গত হয় না, সীতার মুখে এ কথা শুনেই তিনি ভড়কে গিয়েছিলেন। তিনি উতলা হয়ে উঠেছেন, অস্থির হয়ে ছুটে বেরিয়েছেন খোঁজ নিতে, এ কথা শুনে তাঁর বাড়াবাড়িতে যদি বিরক্ত হয় হেমন্ত! এক দিন একটু দেরি করে বাড়ি ফেরার অধিকারটুকু পর্যন্ত তার নেই ভেবে যদি ক্ষুণ্ণ হয়!

এত ভয়-ভাবনা নিয়েও কিন্তু এক বিষয়ে মনটা শক্ত করে রাখেন অনুরূপা। ছেলেমানুষী করে হেমন্ত নিজের সর্বনাশ করবে, এটা চুপচাপ বরদাস্ত করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। বাধা তিনি দেবেন, সামলাবার চেষ্টা করবেন, যতটা তাঁর সাধ্যে কুলোয়। সেজন্য যদি রাগ করে হেমন্ত, দুঃখ পায়, বিরক্ত হয়, উপায় কি!

মনের এই লড়ায়ে ভাবটা আগেও ছিল, এখনো আছে উদ্যত হয়ে, তবে সীতার শাসনটা কাজ দিয়েছে। হেমন্ত ফেরামাত্র লড়াই শুরু করে দেবার ঝোঁকটা সংহত হয়েছে। এত বড় ছেলেকে বাগাতে হলে সে যুদ্ধটা ধীর স্থির শান্ত সংযতভাবে করতে হবে সীতার মতো, এ বিষয়ে মন সতর্ক হয়ে আছে। তাই, মায়ে ব্যাটায় সংঘর্ষ বাধতে বাধতে রাত্রি গভীর হয়ে আসে। রমা ও জয়ন্ত যতক্ষণ জেগে থাকে, অনুরূপা সাধারণ ভাবে কথা বলে যান, হেমন্তের কাজে তাঁর সমর্থন আছে কি নেই, সে ইঙ্গিতও আসে না তাঁর কাছ থেকে। হেমন্ত তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, রমা ও জয়ন্ত হাঁ করে তার কথাগুলি গিলতে থাকে। অনুরূপাও নীরবে শুনে যান। মায়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করেও হেমন্ত কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলে না। মার দিক থেকে কথা ওঠা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা সে ভাল মনে করে। মার চুপ-চাপ থাকার কোন কারণ আছে নিশ্চয়। আলোচনা শুরু হবার আগে নিজের মনটাকেই হয়তো গুছিয়ে নিচ্ছেন মা, হৃদয়কে শান্ত ও আয়ত্তাধীনে রাখবার আয়োজন করছেন। তাড়াহুড়ো করে কথা পেড়ে কোন লাভ হবে না।

জয়ন্ত ঘুমিয়ে পড়ে আগে। পরে রমাও কয়েকবার হাই তুলে বিছানায়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। খাওয়ার পাট চুকেছিল হেমন্ত বাড়ি ফেরার কিছু পরেই। তখন অনুরূপা কথা পাড়েন।

'ঘুম পেয়েছে হেমা ?'

'না মা। কি বলবে বলো।'

'আমাকে বলতে হবে ?'

'হবে না ? নইলে তোমার মনের কথা বুঝবো কি করে ?'

'নতুন কথা শোনালি আজ। আমার মনের কথা বুঝিস না তুই ? কপাল আমার !'

শুনে হেমন্ত ভয় পেয়ে যায়। বুঝতে পারে, অনুরূপার কাছে আজ সে সহজে রেহাই পাবে না। নইলে তিনি এ স্বরে কথা শুরু করতেন না। রাগ দুঃখ অভিমান অনুযোগ অভিযোগ কাঁদা-কাটা সব কিছু অস্ত্র সাজিয়ে মা প্রস্তুত হয়ে আছেন। আলোচনা গড়ে তুলে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার মার হাতে ছেড়ে দিলে আর রক্ষা থাকবে না, একেবারে মর্মান্তিক কাণ্ড করে ছাড়বেন তিনি। ভেবে-চিন্তে হেমন্ত নিজেই কথা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অনুরূপা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হেমন্ত বলে, 'শোন, শোন। তুমি রাগ করেছ, মনে কষ্ট পেয়েছে, তোমার ভয় হয়েছে, সব আমি জানি মা। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। তর্কও করব না, তোমার কথার অবাধ্যও হব না। তুমি যদি বারণ কর কোন কাজ করতে, তোমার কথা আমি মেনে চলব। গোড়াতে এ কথাটা স্পষ্ট করে বলে রাখলাম। এবার আসল কথা বলে তোমার মত চাইব। তুমি হাঁ কি না বলে দিও, বাস্, সেইখানে সব খতম হয়ে যাবে। আমরা আর ও নিয়ে মাথা ঘামাব না।'

অনুরূপার একটু বিব্রত বোধ করেন। এ ভাবে কথা চালাবার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবতেও পারেননি হেমন্ত এতটুকু লড়াই করবে না, তাকে বুঝিয়ে দলে টানবার চেষ্টা পর্যন্ত বাতিল করে দেবে গোড়াতেই, সোজাসুজি তাঁরই ওপর সব সিদ্ধান্তের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবে। পছন্দ হোক অপছন্দ হোক, চোখ-কান বুজে তাঁর কথা মেনে চলতে সে প্রস্তুত, হেমন্তর এ ঘোষণায় এক দিকে হৃদয় যেমন তার উল্লাসে ভেসে যাবার উপক্রম হয়, অন্য দিকে তেমনি মতামত দেবার দায়িত্বটা যে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অনুভব করে দুর্ভাবনারও তার সীমা থাকে না শুধু মা হিসাবে অন্যায় আবদার করা চলত, যুক্তি-তর্ক শূন্যে উড়িয়ে দিলেও দোষ হত না। হেমন্ত যেন সে পথটা তার বন্ধ করেছে। মা বলে তাকে আকাশে তুলেছে বটে, আছাড় খেয়ে পড়বার সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে দিয়েছে সেই সঙ্গে।

হেমন্ত শান্ত কণ্ঠে বলে, 'ঘটনা সব জানো। কাল একটা প্রোটেস্ট মিটিং হবে, আমি তাতে যোগ দিতে চাই। মিটিং-এর পর আর একটা প্রোসেসনও হয়তো বার হবে, তাতেও আমি থাকেত চাই। এখন তুমি যা বল।'

'তুই কি লেখা পড়া করতে চাস না?'

'কেন? তার মানে কি?'

'এ সব করে বেড়ালে লেখাপড়া হবে কি করে?'

'ও! এই কথা। হেমন্ত এবার হাসে, রোজ এ সব করে বেড়াব না কি? এ সব করা মানে তো শুধু এই যে, একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ওটুকু না করলে কি মনুষ্যত্ব থাকে? লেখাপড়ার অজুহাতে মনুষ্যত্ব ছেঁটে ফেলতে পারি না মা, তুমি যাই বলো। হাঙ্গামা যে হচ্ছে, সে দোষ আমাদের নয়।'

'কিন্তু হচ্ছে তো। আজ সামান্য চোট লেগেছে, কাল তো মারা যেতে পারিস।'—সোজাসুজি মৃত্যুর কথাটা বলে যান অনুরূপা, গলায় আটকায় না, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে হেমন্ত বুঝতে পারে যে, কথাটা বলতে কি উগ্র আতঙ্কে মড় মড় করে উঠেছে তাঁর দেহ-মন।

হেমন্ত মৃদু স্বরে বলে, 'হয়তো—সম্ভব! তোমায় মিথ্যে ভরসা দেব না।'

'তবে?'

'শোন তবে বলি তোমায়,' হেমন্ত যেন দম বন্ধ করে কথা বলে, 'এই ভাবের ভয়ভাবনার জবাবটা আজ পেয়েছি মা, এতদিন পরে! লেখাপড়ার জন্য কি সব ছাড়া যায়? তোমাকে কিংবা রমাকে যদি একটা গুণ্ডা আক্রমণ করে, আমি যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের বাঁচাতে গেলে লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে যাবে, ব্রেনটা খারাপ হয়ে যাবে, জীবনে লেখাপড়া কিছু আর হবে না আমার—তাই ভেবে কি তখন চুপ করে থাকব? কি হবে সে লেখাপড়া দিয়ে আমার। তবে এটাও ঠিক যে, ও হল বিশেষ অবস্থা! অবস্থাবিশেষে লেখাপড়ার কথা ভাবারও মানে হয় না লেখাপড়া করাই যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বলে সাধারণ অবস্থায় লেখাপড়া করব না কেন? তাই তো কাজ আমার।'

অনুরূপা গুম খেয়ে থাকেন।

'যাক্‌গে,' হেমন্ত স্বাভাবিক গলায় বলে, 'বলেছি তো তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। তুমি যা বল—হাঁ কিংবা না!'

'মরতে পারিস জেনেও হাঁ বলতে পারি আমি? অনুরূপা আর্ত কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে ওঠেন।

'সেটা কঠিন বটে তোমার পক্ষে বলা,' হেমন্ত স্বীকার করে নেয়, এক কাজ কর তবে। হাঁ না কিছুই তুমি বোলো না। আমার ওপরে সব ছেড়ে দাও, আমি যা ভাল বুঝব করব। তাই কর মা।'

অনুরূপা নিশ্বাস ফেলেন।—'এ আমি আগেই জানতাম হেমা, তোর সঙ্গে পারব না।'

এই ভাবে একটা বোঝা-পড়ার মধ্যে মা ও ছেলের সংঘর্ষটা বেঁচে রইল। মার অনুমতি মানেই আশীর্বাদ। সেটা জুটলো না হেমন্তের। তবে নিষেধের অভিশাপ যে এল না, অনুরূপার মতো ভদ্র স্নেহাতুরা মায়ের এ পরিবর্তন কে অস্বীকার করবে? কে বুঝতে পারবে না যে, অনুরূপার পক্ষেই সম্প্রতি সন্তানকে আশীর্বাদ দেওয়া সম্ভব হবে, আচ্ছা মরবে যাও, এর চেয়ে মহান্ মৃত্যু মা হয়ে কি করে কমানা করি তোমার জন্য।

'হাতটা গেছে? জীবনে আর সারবে না?' আমিনার আর্তনাদ যেন চিরে দেয় ঠাণ্ডা মাঝরাত্রি।

'একটা হাত তো আছে।' রসুল বলে জোর দিয়ে।

'তা আছে।'

আমিনা আত্মসংবরণ করেন আর্ত-চীৎকারে ফেটে পড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মাঝরাত্রে এভাবে হঠাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা গলায় ঝুলানো নষ্ট হাত নিয়ে রক্তমাখা জামা-কাপড় পরা ছেলে হাজির হলে কোন্ মা আত্মহারা না হয়ে পারে? তবে নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা আমিনার অদ্ভুত। ছেলেটা আজাদির জন্য অনায়াসে মরতে পারে, মরবার জন্য তৈরী হয়ে আছে, টের পাবার পর থেকে আমিনার মনের এই জোরটা হু-হু করে বেড়ে গেছে।

'আদর খেতে এলাম, আমায় মোটে আদর করছ না মা!'

'তোর মা হওয়া যা ঝকমারি, আদর করতে মোটে ইচ্ছে যায় না রসুল।'

রসুলের মাথাটা আরও জোরে বুকে চেপে ধরে আমিনা বলেন, 'হাসপাতালে গেছিস জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। জানি তো এমনি ভাবে যাবি একদিন, দু'দিন আগে আর পরে। আগে গেলেই বরং চুকে-বুকে যায় সব। তোকে পুড়তে হয় না চব্বিশ ঘণ্টা মনে মনে, আমাকেও পুড়তে হয় না চব্বিশ ঘণ্টা তোর কথা ভেবে ভেবে—'

'মা, জানো?' ফিস ফিস করে রসুল বলে।

তেমনি ফিসফিস করে আমিনা বলেন, 'কি?'

'আমায় আটকে দিয়েছিল হাসপাতালে। তোমায় দেখতে কেমন করতে লাগল মনটা। চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি।'

'অাঁ ? ডাক্তার বলেছিল শুয়ে থাকতে, চুপি চুপি তুই পালিয়ে এসেছিস এই রাতে এক মাইল পথ হেঁটে ?'

'তোমার একটু আদর না পেলে কি এ যন্ত্রণা সয় ?'.

রসুল বুঝতে পারে, মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। বেশী রক্ত বেরিয়ে যাবার ফলে একদিকে যেমন দুর্বল অশক্ত মনে হচ্ছে শরীরটা, তেমনি আবার কেমন অদ্ভুত রকমের ভোঁতা অবসন্নটা এসেছে অনুভূতিতে। আমিনার কান্না যে অগাধ ও অসহনীয় বিষাদে হৃদয় ভরে দেয়, রসুল জানে সেটা সাময়িক ও কৃত্রিম। রক্তক্ষরণের ফলের শুধু এই প্রতিক্রিয়া এসেছে। নইলে এত রাত্রে এসে মাকে কাঁদাতে তার মোটে ভাল লাগত না, এলেও কাঁদাবার বদলে নিজেই সে হৈ-চৈ হাঙ্গামায় অস্থির করে ভুলিয়ে রাখত মাকে। কিন্তু আজ এমন দুর্বল হয়ে গেছে মনটা যে মাকে আরও বেশী কাঁদিয়ে দুঃখটা উপভোগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ডাক্তার সত্যি বলেছিল যে, রক্তক্ষয়ের কতগুলি অদ্ভুত খাপছাড়া প্রতিক্রিয়া আছে —নিজেকে হঠাৎ অতিরিক্ত সবল মনে করে সে যেন বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা না করে। তাই সে করেছে শেষ পর্যন্ত ! বেড ছেড়ে উঠে এক মাইল রাস্তা হেঁটে মাকে কাঁদাতে এসেছে !

দাঁতে দাঁত ঘষে রসুল মনে মনে বলে, 'না, বিকারের ঝোঁকে মাকে সে কাঁদাতে আসেনি, ভেবে-চিন্তে যা করেছে সে কাজকে ওই সস্তা দুর্বলতায় পরিণত হতে সে দেবে না, রক্ত ক্ষয় হবার জন্য তো নয় শুধু, গ্রেপ্তার হওয়ার জন্যও বটে। হাসপাতালে গ্রেপ্তার না হলে কি তার মাকে এ ভাবে দেখতে আসবার ঝোঁক চাপত ! আবার কবে দেখা হয়, যার মনে একটু শান্তি ও শক্তি দেবার চেষ্টা করা তার উচিত, এসব হিসাব করেই সে এসেছে মাকে দেখতে। মাকে কাঁদিয়ে খুসী হয়ে যেতে নয়।

'তবে তুমি কাঁদো, আমি যাই।'

'কাঁদছি কই !'

'এবার যে কথা বলব শুনে কিন্তু ভেউ-ভেউ করে কাঁদবে।'

'ইস্ !'

'না সত্যি। হাঙ্গামার কথা। সেই জন্য তো রাত দুপুর পালিয়ে এলাম তোমায় দেখতে।'

সুতরাং তখন মনটা শক্ত করতে হল আমিনার। চোখের জল চলে গেল আড়ালে, অন্য সময়ের জন্য। ছেলে যদি মুশকিলে পড়েই থাকে, তাকে এখন সাহস যোগানো দরকার, নিজের দুর্বলতা দিয়ে তাকে কাবু করে আনা সঙ্গত হবে না। রসুলও জানত, তার বিপদের খবর শুনে মার পক্ষে আত্মসংবরণ করা সহজ হবে। হাতে গুলি লেগেই সব শেষ হয়নি, এখনো হাঙ্গামা সঞ্চিত আছে তার জন্য, একথা শুনলেই মার কান্না স্থগিত হয়ে যাবে।

'আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।'

'গ্রেপ্তার ? কেন ?'

'হাঙ্গামায় ছিলাম বলে।'

'তোর হাতে গুলি লাগল, তোকেই গ্রেপ্তার করল কি রকম ?'

'ওই তো খাঁটি প্রমাণ যে আমি হাঙ্গামায় ছিলাম। নইলে আহত হব কেন ?'

'বাঃ, বেশ !'

খানিক্ষণ চুপ করে থাকে রসুল। শরীরটা সত্যই বড় দুর্বল লাগছে। মনে কোন কষ্ট নেই কিন্তু শান্ত গম্ভীর সেই করুণ বিষাদের ভাবটা কাটছে না।

আনমনা ছেলের চুলের ভেতরে আঙুল দিয়ে আমিনা তার মাথাটা তোকিয়ে দেন ধীরে ধীরে। মনে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র জিজ্ঞাসা করা যায়, বাকীগুলি চিরকাল অবোধ আকুল মনের প্রশ্ন হয়েই থাকবে।

'গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল ?'

'না, হাসপাতালে গ্রেপ্তার করেছে।'

'জামিন দিল ?'

'না, জামিন দেয়নি।'

'তবে ?'

'পালিয়ে এসেছি, তোমার জন্যে। ভোরে আবার ফিরে যেতে হবে।'

'কেন ? ফিরে যাবি কেন ?'

'যাব না ? আরও তো কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে, তারা কেউ পালায়নি। ফিরে না গেলে লোকে বলবে না তোমার ছেলে গ্রেপ্তার হয়ে একা পালিয়েছে ?'

'তবে এখন ঘুমো, আর কথা নয়।'

আমিনাও কিছু কিছু বুঝতে পারেন যে আঘাতের ও রক্তপাতের ফলে এমন কোন একটা প্রক্রিয়া ঘটে গেছে রসুলের মধ্যে যার ফলে হঠাৎ মাকে কাছে পাবার ঝোঁক জাগায় নিজেকে সামলে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু পেরে ওঠেনি।

শিশুর মতো কেন রসুল এমন পাগল হয়ে উঠল মায়ের জন্য ? আর দশটি শান্ত-শিষ্ট ভাল ছেলের মতো হয়ে না থেকে এই সব বিপজ্জনক আজাদির ব্যাপারে যোগ দিয়ে দুঃখিনী মাকে আরও দুঃখ দিচ্ছে, এ রকম কোন কাঁটা কি আছে ওর মনে তিনি তো কোন দিন সমালোচনা করেন নি, আপসোস জানান নি। ও-রকম নিরীহ গোবেচারা ছেলেই বা ক'জন আছে দেশে যে, তাদের সঙ্গে তুলনায় দেশের ও দশের জন্য নিজের মাকে কষ্ট দেবার চেতনা ওর লেগেছে। আমিনার তো মনে হয় দেশের সব ছেলেই তার রসুলের মতো—অন্য কোন পথ তাদের নেই। আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো রসুল ঘুমিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট কাতর শব্দ বার হয়। আমিনা জেগে বসে চুপ করে চেয়ে থাকেন তার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে। তার অশ্রুহীন দুটি আরক্তিম চোখে শুধু ইঙ্গিত ফুটে থাকে হৃদয় তার কি ভাবে রক্তাক্ত হয়ে আছে।

শেষ রাত্রে আবদুল ঘরে ঢোকে।

'এবার যেতে হবে রসুল।

'হেঁটে ফিরতে পারবে ?' আমিনা বলেন।

'না, হাঁটতে হবে না। গাড়ির ব্যবস্থা করেছি।'

আবদুলেরও ঘুম হয়নি, তার চোখ দুটিও টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমন্ত শহরের শেষ রাত্রির স্তব্ধতা যেন প্রশ্ন হয়ে ওঠে আমিনার কাছে : তোর কি শুধু একটি ছেলে ?

কে নিজের ছেলে কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই তার লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে। আর এমন এক বন্ধুকে সঙ্গে এনেছে রসুল, দু'দণ্ড যার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে, রসুলের মতোই সে তার চেনা-জানা, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ-করা সন্তান।

সুধাই বাইরের দরজা খুলে দেয় প্রতি রাতের মতো। মুখ খুলে ব্যথিত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আজ আর তাকায় না অন্য দিনের মতো, পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে থাকে।

অক্ষয় উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই ?'

'কি জানি। চেঁচামেচি জুড়ো না।'

'তোমার হল কি ?'

সুধা জবাব দেয় না। মাথাও সে হেঁট করেই রাখে। অক্ষয় চৌকাট পার হয়ে ভেতরে এলে নিঃশব্দে সদর দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়। অক্ষয়ের অনুভূতি হয় দু'রকম। তার নেশা করার জন্য সুধা কষ্ট পায় সে জানত, কিন্তু কত তীব্র, কি অসহ্য যে হত সে কষ্ট তা সে শুধু আজকে, এখন, সুধাকে চোখে দেখবার পর প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে। আজ অবশ্য সুধার মনে আঘাত লেগেছে চরম, আজকের লজ্জা দুঃখ হতাশার তার সীমা নেই, মনে মনে আজ সে মরে গেছে। আজ অক্ষয় শুধু মদ খেয়ে আসেনি, আর কোনদিন ও-জিনিস স্পর্শ করবে না এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে খেয়ে এসেছে। আজ তার বিশেষ দুঃখ, বিশেষ হতাশা, কিন্তু আগেও কি কম ছিল? অধঃপতন শুরু হয়ে গিয়েছে স্বামীর, দিন দিন বাড়ছে তার নেশা, কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা কি ভাবতে পারত সুধা? আগে এতটা অনুমান করতে পারেনি বলে, অনুমান করতে চায়ওনি বলে, অক্ষয়ের সমবেদনা ছিল জলো খেয়াল। হালকা মেঘের মতো সে সমবেদনা খুসী মতো মনে ভেসে আসত, দরকার মতো উপে যেত। পশুর মতো কি ভাবে সুধাকে সে নির্যাতন করে এসেছে, এতকাল পরে আজ প্রথম পশুর মতো জমজমাট নেশা না করে বাড়ি ফিরে হঠাৎ সেটা অনুভব করে আজ প্রথম আন্তরিক অনুতাপ দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। তবু তারি মধ্যে সে বুঝতে পারে এ অনুতাপের তীব্র মধুর জ্বালা জেগেছে শুধু এইজন্য যে আজ সে মদ খেয়ে আসে নি, আজ তাকে মদ না খেয়ে আসার নেশায় ধরেছে। কাল যদি ওজনমতো, আজ বাদ গেছে বলে খানিকটা বেশী খেয়ে আসে, সুধাকে পশুর মতোই নির্যাতন করবে। তার কালকের কাণ্ডের জন্যই সুধা আজ বেশী রকম ভয়ার্তা হয়ে আছে। কাল বাড়ি ফিরেই সে ফতোয়া দিয়েছিল: ঝুলো মাই, বুড়ী মাগী, শাড়ী শেমিজ পরে কচি বৌ সাজতে লজ্জা করে না? খোল্, খোল্, শীগগীর খোল!

সুধা তা ভুলতে পারে নি। সুধা আজও আশঙ্কা করছে ওই রকম একটা ভয়ঙ্কর মাতলামির। শুধু সেটা কিভাবে আসবে ঠাহর করে উঠতে পারছে না।

প্রায়শ্চিত্ত বাকী আছে তার, অনেক প্রায়শ্চিত্ত। নিজেকে অনেক দিন ধরে দলে পিষে ছিঁড়ে ধুনে চলতে হবে। নেশা করার দুরন্ত, অবাধ্য দৈহিক মানসিক সর্বাঙ্গীন সাধ শুধু নয়, সে যে মাতাল হওয়া বরবাদ করেছে এ বিষয়ে বহু কাল ধরে ঘরে-বাইরে সকলের অবিশ্বাসের পীড়ন। মাথাটা আজ যেন আশ্চর্য রকম সাফ মনে হয় অক্ষয়ের। জগতের যাবতীয় সমস্যার মর্ম যেন তার আজ মদ খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার এবং এ নেশা যেভাবেই হোক ত্যাগ করার

প্রতিজ্ঞার বিদ্রোহে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনে—কঠিন, কঠিন এ কাজ।

কিন্তু অন্য এক ভয়ঙ্কর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মশগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়তো সে খাবে দু'একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটা দু' একবারের বেশী আর খাবে না, কারণ, ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে—গেঁজানো রক্ত।

এমনিভাবে উদ্ভট প্রক্রিয়া চলে অক্ষয়ের মনের।…তবে পরম মুক্তির, মহান্ আত্মজয়ের, দুঃস্বপ্নের অবসানের বাস্তব, কার্যগত জীবন্ত অনুভূতিও আজ খুব প্রবল অক্ষয়ের। মিথ্যা ধারণা ভেঙে দিয়ে সুধার মৃত্যু-ম্লান মুখে জীবনের জ্যোতি, আশার আলো ফুটিয়ে তোলার কল্পনা তার হৃদয়কে উৎসুক, উৎফুল্ল করে রেখেছে—প্রথম প্রেমের প্রিয়াকে পাওয়ার সম্ভাবনা আবিষ্কার করে ফেলার মতোই রসালো সে আনন্দ। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে সুধাকে দেখতে থাকে। খাটে বসে মেঝেতে চোখ বিঁধিয়ে রেখেছে সুধা। বিছানায় উঠে কেন সে শুয়ে পড়ছে না দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, অক্ষয় তা বুঝতে পারে। রাত দুপুরে মাতাল অক্ষয়কে সামলাবার দায়িত্ব সুধা পালন করে এসেছে বরাবর, রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে সে যাতে নেশার ঝোঁকে হৈ-চৈ কেলেঙ্কারি কিছু না করে। অক্ষয় না শুয়ে পড়লে সে শোয় না, অক্ষয় না ঘুমোলে সে ঘুমোয় না। আজ সে মরে গেছে অক্ষয়ের কাণ্ডে, তবু আজও-তার সে দায়িত্ব পরিহার করতে সে পারছে না। হৃদয়-মনে কোটি বসন্ত আসে অক্ষয়ের। তার মনে হয়, আজ সে নেশা করায় অপরাধ করেনি জানিয়ে কয়েক বছরের পুরানো বৌকে সে খুসী করবে না, আমি তোমায় ভালবাসি বলে এই আশাহীনা লজ্জিতা অপমানিতা মেয়েটিকে সে আজ পুলকিতা রোমাঞ্চিতা করে তুলবে। আজ তাদের আবার বিয়ে হবে নতুন করে।

'মা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন সুধা?'

'কি জানি।'

'বোসো। এখুনি আসছি।'

'কোথা যাবে?' সুধা আর্তনাদ চেপে বলে।

'মাকে প্রণাম করে আসি।'

বলে অক্ষয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বারান্দার কোণ ঘুরলেই মার শোবার ঘরের দরজা—মা আর অক্ষয়ের বোন ললিতা শোয় ও-ঘরে। বারান্দার কোণটা

ঘুরবার সময় সুধার দেহটা একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়ায় অক্ষয়কে থামতে হয়।

'পায়ে পড়ি তোমার, রাত দুপুরে কেলেঙ্কারি কোরো না। মা ঘুমুচ্ছেন।'

অক্ষয় বলে, 'আরে! কি করছ তুমি! এত রাতে ফিরে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি কেন বুঝতে পারছ না? আজ খেয়ে আসিনি। মা খুসি হবেন শুনে।'

'ঘুম ভাঙালে মার শরীর খারাপ হয়। কাল সকালে মাকে প্রণাম করো।'

অক্ষয় আহত হয়, সুধা বিশ্বাস করেনি!

'সত্যি খাইনি সুধা।'

'জানি। কিন্তু মাকে ঘুমোতে দাও। ঘরে চল।'

'চল। আগে তোমাকে বোঝাতে হবে দেখছি।'

ঘরে গিয়ে সুধা বলে, 'এক কাজ কর, কেমন! শুয়ে পড়ি এসো। আমারো ঘুম পেয়েছে, দুজনে শুয়ে পড়ি।'

'খাব না?'

'খেয়ে আসোনি? অন্য দিন তো…। এসো তবে, বোসো।'

সুধা তাড়াতাড়ি আসন এনে পেতে দেয়…ঘরের কোণে অন্ন-ব্যঞ্জন ঢাকা ছিল, আসন ভাঁজ করা ছিল আলনায়। বাড়ি ফিরে অক্ষয় কদাচিৎ খায়, কিন্তু আহার্য তার প্রস্তুত হয়ে থাকে প্রতিদিন। খাক বা না থাক!

অক্ষয় ধীরে ধীরে আসনে বসে। সাজিয়ে-গুছিয়ে সব ঠিক করে সামনে দেবার পরও সে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। সুধার গৃহিণীপনা দেখতে দেখতে চোখে তার পলক পড়ে না। সে আজ সত্যই গন্ধও শোঁকেনি মদের। কিন্তু সুধা জানে সে মাতাল হয়ে এসেছে। জেনেও সুধা হাল ছাড়েনি, বিশ্বাস হারায়নি, আশা বাদ দেয়নি! মরে তো সুধা তবে যায়নি, আজ সে মদ খেয়ে এসেছে জেনেও, যা সে ভাবছিল এতক্ষণ। তার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের আঘাত পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সে আঘাত সামলে নিয়ে সুধা তো আবার আশা করেছে! আজ পারেনি, কাল হয়তো পারবে, কিংবা দু'দিন দশ দিন না পেরে ক্রমে ক্রমে এক দিন হয়তো পারবে, ইতিমধ্যেই এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে সুধা জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনা করছে বাঁচবার অপরাজেয় প্রেরণায়!

মরা সোজা, তাই সে ভেবেছিল আজ যদি সে মদ খায়, সুধা সোজাসুজি মরবে। সে কি জানত জীবনকে এত বেশী শ্রদ্ধা করে সুধা যে, মরা সহজ মনে হলেও বাঁচবার জন্য সে এমন ভাবে লড়বে চরম হতাশায় আশা না ছেড়ে, ব্যর্থতার

পরম প্রমাণকে শেষ বলে ধরে না নিয়ে? সাধারণ পতিপ্রাণা বৌ বলে সুধাকে জানত অক্ষয়। তাকে অসাধারণ সে ভাবতে পারে না এখনো। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম জীবন-যুদ্ধে সাধারণ একটি নারীর স্বাভাবিক সংগ্রাম-শক্তির স্বরূপ আঁচ করে সে স্তম্ভিত, অভিভূত হয়ে যায়।

'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি তোমার?'

'হচ্ছে বৈ কি, বাঃ! খাও।'

'সত্যি বলছি, খাইনি আজ। তোমার কাছে কিছু গোপন করব না। খাইনি বটে, কিন্তু তাতে আমার বাহাদুরী নেই। খাব না বলেছিলাম বলে খাইনি, তা সত্যি নয়। খাবার জন্য হোটেলের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। অন্য দিনের চেয়ে বেশীই হয়তো আজ খেতাম সুধা। কিন্তু এমন ব্যাপার আজ দেখলাম, যাদের মেয়ে-শোকা ভাবপ্রবণ ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু তখনো ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরী, ওটা কিসের নেশা? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ও-রকম নেশা হ'তে পারে, আমি তবে কেন বোকার মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি! ওই ছেলেগুলোর জন্য আজ খেতে পারলাম না। আমার মনের জোরের জন্য নয়।

'বেশ তো, বেশ তো,' সুধা বলে শ্রান্ত-ক্লান্ত ব্যাহত গলায়, 'শুনব'খন সব কথা কাল। খেয়ে নাও।'

অক্ষয় স্তম্ভিত হয়ে থাকে। সুধা এখনও বিশ্বাস করেনি। তার কথা আবোল-তাবোল ঠেকছে সুধার কাছে। তার কথা শুনে সুধার বিশ্বাস শুধু আরও দৃঢ় হয়েছে যে আজ সে অন্য দিনের চেয়ে বেশী মদ খেয়েছে, হৈ-চৈ করার স্তর পার হয়ে উঠে গিয়েছে দার্শনিকতার স্তরে!

'মদ খেলে মুখে গন্ধ থাকবেই সুধা।'

'কেন ভাবছ। গন্ধ কেউ পাবে না। কাল সকালে সেই গার্গল আর—'

'গন্ধ পাচ্ছ?'—অক্ষয় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুধাকে নিশ্বাসের গন্ধ শোঁকায়! আগেই এ প্রমাণ তার দেওয়া উচিত ছিল সুধাকে। ভাবপ্রবণ, অভিমানী, বিকারগ্রস্ত মন তার, তাই না সে চেয়েছে বড় বড় কথার প্যাঁচে সুধাকে বিশ্বাস করাতে—রাত দুপুরে যে ধরনের কথা বললে অজানা লোকেরও সন্দেহ হবে লোকটা মাতাল!

'সত্যি খাওনি তো তুমি !'

'সত্যি খাইনি।'

মুখের চেহারা বদলিয়ে সুধা তার দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে বিশ্বাস করেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তার এত বড় সৌভাগ্য কি করে সম্ভব!

'একদিন না খেলে কি হয় ?'

'তা ঠিক।'

সহজ ভাবেই সায় দেয় অক্ষয়। তার অভিমানও হয় না, রাগও হয় না। একদিন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে সুধা সেটা সহ্য করে এই জন্য যে, একদিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা চরম নয়, শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাটা রাখাই আসল কথা। এটা অক্ষয় আজ জেনেছিল খানিক আগে। তাই একদিন আজ সে মদ খায়নি এটা যে অসাধারণ ব্যাপার কিছু নয়, কাল পরশু তরশু যদি না খেয়ে থাকতে পারে তবেই জানা যাবে সে সত্য সত্যই জয়ী হয়েছে, সুধার এই ইঙ্গিত তাকে ক্ষুন্ন করে না। সুধা ঠিক কথাই বলেছে। কেউ ঠিক কথা বললে খুসী না হওয়া বোকামি।

বোকামিকে প্রশ্রয় দিতে আজ রাত্রে অন্তত অক্ষয় একেবারেই রাজী নয়।

মাকে প্রণাম করার ঝোঁকটাও তার কেটে গেছে। এমন এক জায়গায় উঠে গিয়েছিল তার মনটা সেখানে কোন মনেরই বাস্তব আশ্রয় নেই, সুধার কল্যাণে সেখান থেকে নেমে এসে সে এখন বুঝতে পারছে সে মদ খেয়ে আসে নি বলে রাত দুপুরে মাকে ঘুম থেকে তুলে প্রণাম করতে গেলে সে পাগলামিকে লোকে চেনা মাতালের মাতলামিই মনে করবে।

অনেক দিন পরে এমন সাদাসিদে সহজ কথা সাদাসিদে সহজ ভাবে ভাবতে বড ভাল লাগে তার। যদিও রোগের অস্বস্তি, সব কিছু থেকে বঞ্চিত হবার সব কিছু ফুরিয়ে যাবার উৎকট অনুভূতি, মনকে খিঁচে রাখা পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধ আতঙ্ক সে মাথা কপাল খুঁড়লেও আজ রাত্রে এক চুমুক পাওয়া যাবে না, এসব পুরো মাত্রায় বজায় আছে।

গাঢ় নীল বৈদ্যুতিক আলোয় লেখা 'বিদ্যুৎ লিমিটেড' সাইনটা বহু দূর থেকে চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড চওড়া নতুন রাজপথ, দু'দিকে বিরাট অট্টালিকা, মোড় থেকে যত দূর চোখ যায় সিধা চলে গেছে। শহরের উন্নতির আধুনিক চিহ্ন। আঁকা-বাঁকা নোংরা গলি আর বস্তিগুলিকে অট্টালিকার পিছনে আড়াল করে রেখে শহরে যে বড়লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে তার এই সব প্রমাণ-সৃষ্টির পরিকল্পনা যুদ্ধের

কিছু আগে কার্যকরী হচ্ছিল। যুদ্ধ বাধলে অবশ্য সব স্থগিত হয়ে যায়। বিরাট বিরাট লোহার কঙ্কালগুলি আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে কত অকস্মাৎ গঠনের প্রচেষ্টা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় এ সব রাস্তাও ছিল অন্ধকার। যুদ্ধের পর এখন আবার অমাবস্যার রাতেও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিতরণ করতে আরম্ভ করেছে অসংখ্য চোখ ঝলসানো আলো।

'বিদ্যুৎ লিমিটেড' তিনতলা বাড়িটির নীচের তলার রাস্তার দিকে পাঁচটি বড় বড় দোকানের একটি। এন. দাশগুপ্তের প্রকাশ্য ব্যবসা-কেন্দ্র এই বিদ্যুৎ লিমিটেড। তার আরও অনেক অপ্রকাশ্য ব্যবসা যুদ্ধের সময় ছিল, এখনো আছে —কারণ, একথা সবাই জানে যে যুদ্ধ থামলেও অনেক চোরাগোপ্তা কারবারের সুদিনের জের মহাসমারোহে চলেছেই বেশ কিছুকাল চলবার ভরসা রেখে। উপরে উত্তরের দিকে দোতলার ফ্ল্যাটে সে বাস করে। ঠিক উপরের তেতলার ফ্ল্যাটটাও অন্য নামে সে ভাড়া করে রেখেছে। অনেকের উপকারের জন্য ওখানে বেনামী ঘরোয়া হোটেল, নাইট ক্লাব ও বার চালু আছে। অনেক পদস্থ লোক সন্ধ্যার পর সঙ্গিনী নিয়ে আসে, কেউ থাকে, কেউ চলে যায়। অনেক পদস্থ লোক মাঝ রাত্রে সঙ্গিনীকে নিয়ে কোথায় যাবে ভেবে না পেলে, অন্য পদস্থ লোকের কাছে আগে থেকে নির্দেশ পাওয়া থাকলে, নির্ভয়ে এখানে এসে জোটে, খাদ্য পানীয় ঘর শয্যা সব কিছু তার জোটে। কোন কিছুর অভাব ঘটে না।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বহুক্ষণ দাশগুপ্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করে শূন্যে তাকিয়ে থাকে। এ সব ব্যবসায়ে এইগুলি হল আসল হাঙ্গামা—সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারের অভাবনীয় পরিণতি! দশ-বিশ-পনের হাজার টাকার কত বড় বড় ডিল কত সহজে আপনা থেকে হয়ে যায়, ভীষণ রিস্ক নিয়েও এক মুহূর্তের দুর্ভাবনা দরকার হয় না। আর সামান্য কয়েক শ' টাকার ব্যাপারে এই রকম ফ্যাকড়া বাধে। গণেশ আগেও কতবার মাল পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওই সায়েবের বাড়িতে। স্বপ্নেও কখনো সে ভাবতে পারেনি গণেশ রাস্তার হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে তাকে এ ভাবে হাঙ্গামায় ফেলবে!

ভাবলেও গা জ্বালা করে দাশগুপ্তের। যে দিক্ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা করেনি, ঠিক সেই দিক্ থেকে এই বিপদ এল! দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যায় একে। জ্বালা বেড়ে গেল এই যে, গেঁয়ো ছেলেটা বোধ হয় নিছক কৌতূহলের বশেই রাস্তার হাঙ্গামা হৈ-চৈ দেখতে দাঁড়িয়েছিল, গুলি লেগে যে বজ্জাত ছোকরাগুলো নিছক বজ্জাতি করার ঝোঁকে গুলির সামনে বাহাদুরি করছে তাদের বদলে সেই

গেল মরে ! ওর নাম-ঠিকানা-পরিচয় আবিষ্কার করতে গিয়ে এখন বেরিয়ে পড়বে তারা চোরা মাল চালান ! হাসপাতালে কে তাকে খাতির করে ? কে অনুভব করবে যে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া দরকার ? হয়তো হৈ-চৈ পড়ে যাবে। হয়তো কোন উপায় থাকবে না তাকে টানাটানি না করে। নিজেদের বাঁচাবার জন্য বাধ্য হয়ে হয়তো তাকেই বলি দেবে বড় কর্তারা, যাদের হাতে নোট পাবার হাত চুলকানি শান্ত করতে তার প্রাণান্ত।

কিছুই হয়তো হবে না তার শেষ পর্যন্ত, সামলে নিতে পারবে। কিন্তু দাশগুপ্তের বিদ্যুৎ লিমিটেড থেকে রেডিওর বাক্সে চোরাই বিলেতী মদ চালান যায় এটা প্রকাশ পেলে অপদস্থ হতে হবে তো তাকে ! কিছু কি করা যায় না ? সামলানো যায় না আগেই ? এত গণ্য-মান্য ক্ষমতাবান লোকের সঙ্গে তার খাতির, আগে থেকে চাপা দিয়ে দেওয়া যায় না ব্যাপারটা ?

দাশগুপ্ত ডাকে, 'চন্দর !'

'চন্দ্র ওপরে বাবু।'

'ডেকে দে। শীগ্‌গির।'

দাশগুপ্তের পরম বিশ্বাসী ধূর্তশ্রেষ্ঠ চন্দ্র এসে দাঁড়ায়। মাঝবয়সী ঈষৎ স্থূলকায় মানুষটা মুখখানা গোলাকার। আই-এ পর্যন্ত পড়েছিল, বুদ্ধিটা তাতে শাণিত হয়েছে। তিনতলা এক রকম সেই চালায়, বড়লোক, মাঝারিলোক সবাইকে খুসী রাখে এবং যার কাছে যত বেশী সম্ভব খসিয়ে নেয়। হিসাব রাখে, অন্য চাকরদের হুকুম দেয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের যে মেয়েরা শিকার খুঁজতে আসে, তাদের প্রয়োজন মতো সবিনয়ে ও সসম্মানে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ দেয়, আবার দরকার হলে প্যাট্রনের সোডার বোতল নিজ হাতে খুলে দেওয়া থেকে পা-ও চাটে।

দাশগুপ্ত কিছু বলার আগেই সে শুরু করে নিরুত্তেজ কণ্ঠে, 'গণেশ ফেরেনি বাবু ? ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। মাল শুধু পৌঁছে দেবে, ওর হাতে টাকা দেবার তো কথা নয় ! টাকা হাতে পেয়ে লোভের বসে পালাতো সে বরং সম্ভব ছিল, মাল নিয়ে পালাবার ছোকরা তো ও নয় !'

চন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করবে ? মনে মনে কথাটা নাড়াচাড়া করে দাশগুপ্ত। চন্দ্র তার মস্ত সহায়, মানুষ চিনতে ও ওস্তাদ, এমন কি গণেশের মতো তুচ্ছ লোককে যে শুধু একতলায় দোকানের কাজে রাখতে হবে, তেতলার ব্যাপার টের পেতে দেওয়া চলবে না, এ পরামর্শও সেই দিয়েছিল। সে নিজে অতটা গ্রাহ্য করেনি, বরং ভেবেছিল এ ধরনের গেঁয়ো বোকা ছোকরাকেই তেতলার কাজে লাগানো

নিরাপদ। দরকারের সময় তেতলার খুঁটিনাটি কাজ সে গণেশকে দিয়ে করিয়েও নিয়েছে কয়েক বার। ম্যাকারণ টেলিফোনে যা বলেছে তাতে বোঝা যায় মরবার আগে গণেশ কিছু বলে যেতে পারেনি,- তা হলে তার নাম-ঠিকানা-পরিচয় জানবার জন্য ম্যাকারণের কাছে খোঁজ নেওয়া হত না। কিন্তু গুলি লেগে যদি এ ভাবে মরে না যেত গণেশ, সজ্ঞানে যদি সব কথা বলে যেতে পারত, হয়তো তেতলার ব্যাপারও তা হলে ফাঁস করে দিয়ে যেত। ভাবলেও শিউরে ওঠে দাশগুপ্ত !

'গণেশের খবর পেয়েছি চন্দর। একটা মুশকিল হয়েছে। কে কে এসেছে আজ ?'

'অনেকে আসেনি। হাঙ্গামাটা হল। দত্ত সায়েব, বিনয়বাবু, পিটার সায়েব, রায়বাবু, ঘোষ সায়েব—'

'ঘোষ সায়েব এসেছেন ?'

'হ্যাঁ। ছোট একটা মেয়েকে এনেছেন, পনের হবে কি না। এক চুমুক খেয়ে বমি করে দিল।' চন্দ্রর মুখে অদ্ভুত একপেশে হাসি ফোটে, 'গণেশের ব্যাপারটা কি বাবু ?'

'বোকা পাঁঠা তো, হাঙ্গামার মধ্যে গিয়েছিল। গুলি খেয়ে মরেছে। এখন মালটা সুদ্ধ হাসপাতালে আছে। নাম-ঠিকানা খুঁজছে, ম্যাকারণকে ফোন করেছিল। গণেশ দু'বার গেছে ম্যাকারণের বাড়ি, স্লিপে ঠিকানা লিখে দেবার কি দরকার ছিল ? সুধীর একটা গাধা।'

চন্দ্র প্রায় নির্বিকারভাবেই সব জেনে নেয় এবং মেনে নেয়।

'কি করবেন ঠিক করলেন বাবু ?'

'ঘোষকে বলব ভাবছি। ঘোষ চেষ্টা করলে মালটা সরিয়ে ফেলে সামলে নিতে পারবে।'

চন্দ্রকে চিন্তিত দেখায়।

'তা নয় পারবেন, আজও কিন্তু উনি সেবারেরটা ভাঙিয়ে চালাচ্ছেন ! এমন তুখোড় লোক আর দেখিনি। সামান্য ব্যাপার, কি আর করতে হয়েছিল ওনার ! তাই টানছেন আজ পর্যন্ত। মদের দামটা পর্যন্ত আদায় করা যায় না। ফের ওঁকে কিছু করতে বললে পেয়ে বসবেন একেবারে।'

মাথা ঝুকিয়ে ঝুঁকিয়ে সায় দেন দাশগুপ্ত, জ্বালার সঙ্গে বলে, 'কি করা যায় বলো, এ সব লোকের কত ক্ষমতা, এদের হাতে না রাখলে কি ব্যবসা চলে। ঘোষের

মতো বেহায়া আর কেউ নেই। আর সকলে কাজ করে দেয় সে জন্য টাকা নেয়, কিন্তু এখানে যা খরচা করে তা দেয়। ঘোষের সেটুকু চামড়াও নেই চোখে। ব্যাটা পেয়ে বসবে, কিন্তু বুঝতে পারছো তো, ওরা খোলবার আগে মালটা সরিয়ে আনা চাই। এমনি কোন ভাবনা ছিল না। ছোঁড়া গুলি খেয়ে মরল কিনা, মুশকিল সেখানে।'

চন্দ্রর মনটা তবু খুঁত-খুঁত করে। ঘোষ সায়েব যে শুধু তেতলার ভোগ সুখ আরাম বিরামের জন্য খরচা পর্যন্ত দেয় না তা নয়, চন্দ্রর ব্যক্তিগত পাওনাও তার কাছ থেকে জোটে যৎসামান্য, একটা সাধারণ বয়-এর বকশিশের মতো। এটা যেন তারই বাড়ি, সবাই তার মাইনে-করা চাকর, এমনি ব্যবহার করে ঘোষ সায়েব।

'এক কাজ করলে হয় না?'

'বলো কি করব!' দাশগুপ্ত খুসী হয়, 'দেখি আমাদের চন্দরের বুদ্ধির দৌড়।'

'আপনি নিজে গিয়ে যদি গণশাকে চিনে দেন আর মালটা দাবি করে নিয়ে আসেন? মালটা সরিয়ে আনার পর ওতে কি ছিল কে জানবে, আপনি যা বলবেন তাই।'

দাশগুপ্ত সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়, মনে মনে তারিফ করে চন্দ্রের বুদ্ধির। নিজেকে কূটবুদ্ধি খাটাতে হয় দিবারাত্রি, জীবনে একমাত্র অবলম্বন এই বুদ্ধি খাটিয়ে সাফল্য লাভের মাদক গর্ব, অন্যের কাছে সামান্য একটু ধূর্ততার পরিচয় পেলেই তাই আশ্চর্য মনে হয় দাশগুপ্তের।

'আমিও তা ভেবেছি চন্দর। ওই যে বললাম, খুনের ব্যাপার, মালের গায়ে কোন ছাপ নেই। দাবি করলেই কি ছাড়বে? চেনা অফিসার কেউ থাকলে বরং—'

'পিটার সায়েবের একখানা চিঠি নিয়ে যান না?'

'ওকে জানাতে চাই না। হাজার টাকা চেয়ে বসবে।'

'জানাবেন কেন। মাল আপনাকে দিয়ে দেবার জন্য চিঠি ত্মে চাইবেন না। কি দরকার? শুধু আপনি অমুক লোক, আপনাকে ও চেনে এই বলে একটা চিঠি দেবে। বাস্। বলবেন, যদি দরকার লাগে তাই দু'লাইন সার্টিফিকেটটা রাখছেন। এক বোতল স্কচ দিলেই খুসী হয়ে লিখে দেবে।'

চন্দ্রের বুদ্ধিতে এবার এত বেশী আশ্চর্য হয়ে যায় দাশগুপ্ত যে, ঈর্ষায় জ্বলে যায় তার বুকটা! সত্যই যায়। চন্দ্র তার চাকর, সে তাকে বাবু বলে, তবু। কয়েক

মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, আসলে চন্দ্রই চালাচ্ছে তার সমস্ত কারবার নিজে আড়ালে থেকে তাকে সামনে খাড়া করে রেখে, চন্দ্র তার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। আয়ের মোটা ভাগটাই তার বটে, কিন্তু সেটাও এক হিসাবে চন্দ্রের বুদ্ধিরই পরিচয়। তার যেমন আয় বেশী তেমনি সমস্ত দায়িত্ব তার ঘাড়ে, সমস্ত বিপদ তার নিজেকে সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে চন্দ্র তো কম রোজগার করছে না। যুদ্ধের আগে তার ও চন্দ্রের অবস্থা যা ছিল তার সঙ্গে তুলনা করে হিসাবে ধরলে তার চেয়ে চন্দ্রের সাফল্য আর উন্নতি কি শতগুণ বেশী হবে না? তার মতো একজনকে অবলম্বন না করে চন্দ্রের পক্ষে এত বড় স্কেলে কারবার চালানো সম্ভবও ছিল না। সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত ফ্যাশন-কায়দা-দুরস্ত মোটামুটি অবস্থাপন্ন বড় বড় লোকের সঙ্গে অন্তত পক্ষে মৌখিক পরিচয়যুক্ত তার মতো একজনকে না পেলে এত কাণ্ড করতে পারত না চন্দ্র। তার মোটা প্রতিপত্তি তার মোটা দায়িত্ব,—তাকে মোটা আয় দিয়ে নিজের স্বপ্ন সফল করতে আপত্তি হবে কেন চন্দ্রের! তার স্বপ্ন সফল হয়নি। অনেক সে পেয়েছে কিন্তু দু'হাতে দিতেও হয়েছে অনেক। চন্দ্র যে এত টাকা মারছে, তার দশহাজার উপার্জন হলে চন্দ্রের যেখানে দশ টাকা হওয়া উচিত সেখানে সে যে হাজার টাকা গাপ করছে, চোখ কান বুজে তার সেটা সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চন্দ্রকে ছাড়া তার চলবে না, চন্দ্রই যেন সব চালাচ্ছে।

এ জ্বালা আগেও দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে অনুভব করেছে, তবে এমন তীব্রভাবে নয়। জীবনের একমাত্র বাহাদুরীর ফানুস কয়েক মুহূর্তের জন্য ফেঁসে যাওয়া কয়েক মুহূর্তের আত্মহত্যার চেয়ে কম যাতনাদায়ক নয়।

তারপর অবশ্য সামলে নেয় দাশগুপ্ত, পুরোপুরি। সস্তা মানুষ ফুঁ দিলেই ফাঁপে। কত আর করেছে চন্দ্র? বিশ-পঁচিশ হাজার? তাই নিয়ে তার ক্ষোভ! এ যেন নায়েব-গোমস্তা দারোগার দুটো পয়সা হয়েছে দেখে রাজার হিংসা করা।

'বাবু—'

'দাঁড়াও দাঁড়াও—।' দাশগুপ্ত বলে সেনাপতির মতো, ওসব ভেবেছি। তোমার কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল। কি জান, গণেশকে আমি আইডেন্‌টিফাই করতে চাই না, যদি না করে চলে। এখন মনে পড়ল। হাসপাতালে হট্টগোল চলছে, সুযোগ বুঝে মালটা সরিয়ে আনা চলতে পারে। যদি ফ্যাকড়া বাধে, পিটারের চিঠি দেখালেই হবে। বললেই হবে ফ্রুটস আছে, খারাপ হয়ে যাবে বলে সরিয়ে নিচ্ছি। তখন গণেশকে আইডেন্‌টিফাই করব। ফ্যাকড়া কিছু হবে না মনে

হয়। দোকানের একটা চাকর, তার জন্য কে মাথা ঘামায় ?

'আপনার কি বুদ্ধি বাবু!' চন্দ্র সবিনয়ে বলে।

শিয়ালদ'র কাছে বস্তির ঘরে ভোরে ঘুম ভাঙে ওসমানের। তার আগে অনেক কারা জেগেছে, কথা বলছে। অনেকের কথার সমগ্র আওয়াজটাই কানে লাগে প্রথম, চেতনায় সে আওয়াজ শব্দ হয়ে ওঠে গণেশের সেই কথা : ওরা এগোবে না ? শব্দিত চেতনা হয়েই যেন ছিল প্রশ্নটা তার মনেরও মধ্যে, জেগে উঠে মনে পড়ার বদলে যেন জাগরণটাই পরে এল।

শূন্য ঘরে ঘুম ভেঙে গণেশের ওই প্রশ্নটা মনের ধ্বনির মতো শোনার সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে দেশের বাড়িতে বৌ ছেলে মেয়ের ভাবনা, তারা কেমন আছে এই জিজ্ঞাসা।

কাজে আজ সে যাবে না। যাওয়া উচিত হবে না। তারও নয়, কারও নয়। এক অফুরন্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অনুভব করে ওসমান, সবাই যখন এক হয়ে গেছে এগোবার প্রতিজ্ঞায়, নির্দেশ দিতে হয়নি নেতাদের, এমন অকারণ অর্থহীন অত্যাচারের প্রতিবাদও সবাই করবে এক হয়ে, কাউকে বলে দিতে হবে না। এ সিদ্ধান্তের একটা অদ্ভুত সমর্থন অনুভব করে ওসমান, শুধু তার ভিতরের বিশ্বাসে নয়, বাইরে থেকেও যেন বহু লোকের সমর্থন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে। প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না। ঘরের বাইরে গিয়ে বস্তির বহু কণ্ঠের কলরব কানে এলে তখন সে বুঝতে পারে। রাত্রি শেষেই বস্তি প্রায় খালি করে যারা কাজে চলে যায়, তারা এখনো কেউ যায়নি। তার মানেই কাজে তারা আজ যাবে না, কাজে যেতে হলে ভোরের আলোয় বস্তিতে বসে উত্তেজিত আলোচনার বৈঠক বসানো চলে না। তার উঠতে দেরি হলে রহমান সিদ্দিক গোলামেরা কেউ বেরোবার সময় তাকে ডেকে দিয়ে যায়, আজ ভোর পর্যন্ত কেউ তাকে ডেকে তোলেনি কেন এতক্ষণে ওসমান বুঝতে পারে। নিজেরা যখন তারা কাজে যাবে না, ওসমান অবশ্যই যাবে না, এটা তারা নিজেরাই ধরে নিয়েছে। সুতরাং কাজ কি অনর্থক ঘুমন্ত মানুষটাকে ডেকে তুলে।

তার কারখানার লোকেদের একতা গড়ে উঠতে উঠতে বার বার ভেঙে যাচ্ছে নানা শয়তানী কারসাজিতে। ট্রামের কাজে ইস্তফা দিয়ে এখানে কাজ নিতে হওয়ায় মনে তার একটা অভাব বোধ জেগে ছিল। সব সময় মনের মধ্যে সে গভীর ঔৎসুক্য অনুভব করে ভেদহীন বৃহৎ এক সংগঠনের একজন হয়ে থাকতে। এই কারখানায় সে সাধ তার যেন কিছুতেই মিটছে না।

এদিকে সেদিন ট্রামকর্মীদের পরিপূর্ণ একতার পরম প্রমাণ দেখা গেল। সেই থেকে নিজেকে তার যেন বঞ্চিত মনে হয়েছে। অহরহ মনে হয়েছে ট্রামের কাজে থাকলে আজ তো সে নিজেকে ওদেরি একজন ভাবতে পারত, চব্বিশ ঘণ্টা আপনা থেকে অনুভব করত হাতে হাত মেলানো হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সে স্থান পেয়েছে। কালও এ অভাববোধ তাকে পীড়ন করেছে। কাল কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সব। আজ সকালে বস্তিতে ঘুম ভেঙে উঠে শুধু যে সে অভাববোধ মিটে গেছে তা নয়, আশা পূর্ণ হয়েও অনেক বেশীই যেন সে পেয়েছে। ঘরের কোণে শুধু তার একার মনে সঙ্কল্প জেগেছিল, আজ সে কাজে যাবে না। ঘরের বাইরে এসে সে দেখেছে শুধু তার একার নয়, সকলের মনেই আপনা থেকে সেই সঙ্কল্প দেখা দিয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তবে আর হাজার হাজার কেন, সংখ্যাহীন কত মনের সঙ্গে তার মন হাত মিলিয়েছে কে বলতে পারে!

খলিল বলে, 'দাদা, কাণ্ড হল। ট্রাম বাস স-ব বন্ধ!'

ওসমান সায় দেয়, 'তা হবে না? ও তো জানা কথা।'

রেজ্জাক উত্তেজিত হয়ে বলে, 'রেলগাড়ি আটকে দিলে হয় না? লাইনের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে? ইঞ্জিন খালি সিটি দিয়ে যাবে এক ধার থেকে এগোতে পারবে না?'

ওসমান বলে, 'না না, রেলগাড়ি আটকানো ঠিক হবে না।'

লাল ইটের লম্বা প্রাচীরের পাশে নোংরা ফাঁকা স্থানটিতে একে একে বহু লোক এসে জড়ো হয়। গায়ে মাথায় দু'ফোঁটা জল ঢেলে তার টিনের পাত্রটি ভরে একটু জল আনতে কলতলায় গিয়ে ধন্না দেবার জন্য গুটি গুটি চলতে চলতে বয়সের ভারে বাঁকা নানীও খানিক দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, খুঁটিনাটি আরও বিবরণ জানতে চায়, ঝাঁঝালো গলায় ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে। অদম্য ক্রোধ ও ক্ষোভের চাপে অপূর্ব গাম্ভীর্য ও ধৈর্যের ছাপ পড়ে মুখগুলি যেন বদলে গিয়েছে মেয়ে-পুরুষের। প্রতিটি কথা, প্রতিটি ঢোঁক গেলা, প্রতিটি নিশ্বাস, প্রতিটি দৃষ্টিপাত শুধু প্রতিবাদ। কালকের ঘটনায় আছে যুগ-যুগান্তরের অমানুষিকতা, যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ক্ষোভ তাদের করে দিয়েছে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ। এতে আশ্চর্য কি যে, শান্ত, শীতল শীতের সকালে কাপড়ের সামান্য আবরণে ঠাণ্ডায় কেঁপেও কেউ কেউ ভেতরের তাপে দাঁতে দাঁত ঘষবে।

তখন তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় হানিফ।

কথা বলে সে উত্তেজনাকর, মারাত্মক। ক্ষুব্ধ মানুষগুলিকে সে যেন ক্ষেপিয়ে দিতে চায়। বলতে বলতে নিজেও সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ভয়ানক রকম।

'চলো যাই সব। আজ হাঙ্গামা হবে ভীষণ। মোরা চুপ করে থাকব? চলো যাই সবাই মিলে। বহুত আদমি জড়ো হবে। দোকান-পাট ভেঙে সব চুরমার করে ফেলব। মোরা শুরু করে দিলে কাণ্ডটা যা বাধবে একচোট—'

হানিফের সঙ্গে ছিল বুধুলাল, সে বলে ওঠে, 'সাবাস! সাবাস!'

কয়েকটি অল্পবয়সী ছোকরা চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু অন্য সকলে আরও যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে মনে হয়। এমন কি যারা দাঁতে দাঁত ঘষছিল তাদের চোয়াল ঢিল হয়ে যায়।

'কি বলছ মিঞা? মাথা খারাপ না কি?' ওসমান বলে।

হানিফ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'কেন?'

'আমরা গিয়ে দোকানপাট ভাঙব, গুণ্ডাদের লুট-পাটের সুবিধা হবে। ও কি একটা কথা হল?' ওসমান জোর গলায় চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'দোকান-পাট ভাঙার কথা ওঠে কিসে? সভা কর, মিছিল কর, হরতাল কর। দোকান বন্ধ থাক। বাস্।'

'গুণ্ডা বলছে কাকে?' সামনে এগিয়ে রুখে ওঠে হানিফ। হানিফ বাড়াবাড়ি করলে তাকে রুখবার জন্য উপস্থিত কয়েকজন ওসমানের কাছে ঘেঁষে আসে।

'কাকে বলব? শহরে গুণ্ডা নেই? আমরা দোকানে হানা দিলে তাদের মজা, এ তো জানা কথা।'

'বড় বাড় বেড়েছে তোমার।' হানিফ শাসায়।

'হাঙ্গামা কোরো না হানিফ।'

সিদ্দিক বলে একপা আরও এগিয়ে হানিফের সামনে গিয়ে। আরও কয়েক জন ওসমানের কাছে ঘেঁষে আসে। সেদিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করে হানিফ চলে যায় সঙ্গী ক'জনকে নিয়ে। বুধুলাল দু'বার মুখ ফিরিয়ে ওসমানের দিকে তাকিয়ে যায়। সে দৃষ্টির অর্থ খুব পরিষ্কার, আচ্ছা দেখে নেব। বুধুলাল এ অঞ্চলের বিখ্যাত গুণ্ডা নেতা। হানিফের চেয়েও তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেশী।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওসমান পথে বেরিয়ে পড়ে। গণেশের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে আর একটু বেলা করেই হাসপাতালে যাবে, এত সকালে গিয়ে কোন লাভ হবে না। আগে একবার রসুলের বাড়ি যাবে। রসুলের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা

বলার জন্য মনটা ছটফট করছিল ওসমানের। রসুল তার ছেলের মতো, সাহসে তেজে বুদ্ধি-বিবেচনায় ভুল-ভ্রান্তি বোকামিতে, সব দিক দিয়ে টান একটা বরাবর ছিল রসুলের দিকে তার, কিন্তু আজকের মতো সে টানে কখনো টান পড়েনি এত জোরে, আগে শুধু ছিল এই পর্যন্ত।

কত ভাবে মনটা আজ তার নাড়া খাচ্ছে, তবু তারি মধ্যে ভেসে ভেসে আসছে পারিবারিক একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আবছা চিন্তা। পরীবানু সেয়ানা হয়ে উঠেছে অনেক দিন, এবার তার সাদির ভাবনাটা রীতিমতো গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাঁ থেকে প্রতি পত্রে তাগিদ আসছে পরীবানুর মার। এদিক্-ওদিক্ ছেলে খুঁজছে ওসমান, আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে সন্ধানও আসছে মাঝে মাঝে। কিন্তু পছন্দ যেন তার হচ্ছে না এক জনকেও। হবু জামায়ের কতগুলি রকমারি বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি যেন আগে থেকে মনের মধ্যে তৈরী হয়ে আছে, সেই মাপে খাপ খাচ্ছিল না একজনও পুরোপুরি। যে ছেলে তার নেই, জামাই খুঁজছিল সে সেই ছেলের মতো,—যত দূর সম্ভব সেই ছেলের মতো। এ ধারণা তার কাছে পরিষ্কার নয়, মনের এই খামখেয়ালী আবদার। টের পেলে নিজেকে সে সংযত করে ফেলত সঙ্গে সঙ্গেই। আজও সে বুঝতে পারেনি কিসে কি ঘটেছে মনে। রসুলের সঙ্গে পরীবানুর সাদি হলে তো মন্দ হয় না, এই কথাটা মনে পড়ছে ঘুরে-ফিরে মনের গভীর তলানো ইচ্ছার ভাসা ভাসা ইঙ্গিতের মতো।

রসুলের বাড়ি বেশী দূরে নয়। এইটুকু পথ যেতে অনেকটা সময় লাগে ওসমানের। ইতিমধ্যেই মানুষ জড়ো হতে আরম্ভ করে দিয়েছে রাস্তায়, বিক্ষোভ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে মৃদুভাবে। সমবেত কোলাহলের বিশিষ্ট সুরটাই বিক্ষোভের। উৎসব-পার্বণে আরও বড় জনতার কলরব ওসমান শুনেছে, তার সুর একেবারে অন্য রকম। কোন রকম গাড়ি-ঘোড়াই এক রকম চলছে না রাস্তায়। মোড়ে ওসমানের সামনে একটি মোটর গাড়িকে আটকে জবরদস্তি ফিরিয়ে দেওয়া হল। পরক্ষণে আর একটি গাড়িকে দাঁড় করানো হল, কিন্তু আরোহীর সঙ্গে দু'একটি কি কথা হবার পর সকলে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল, দু'জন যুবক দু'পাশে হেঁটে মোড়ের ভিড়টা পার করে এগিয়ে দিয়ে এল গাড়িটাকে।

ডাক্তারের গাড়ি। একজন বলল ওসমানের জিজ্ঞাসার জবাবে।

শহরের অন্যান্য জায়গাতেও কি এই রকম শুরু হয়ে গেছে?—ওসমান ভাবে। রাইফেলধারী পুলিশ-বোঝাই গাড়ি চলে যায়। ধ্বনি উঠে 'জয় হিন্দ!' 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! ওসমান আবার ভাবে, কর্তারা যদি ফের

বোকামি করে, লাঠি আর বন্দুক দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করে এই রাগ-দুঃখের প্রকাশ, কি হবে তা হলে ?

আমিনা নিজেই দরজা খুলে দেয়। তাঁর রাতজাগা চোখ দেখেই ওসমান শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, 'রসুল—?'

'সে তো হাসপাতালে ফিরে গেছে ? আসুন বসুন।'

ওসমানকে মোড়া দিয়ে আমিনা নিজে রসুল যে টুলে বসে কেরাসিন কাঠের টেবিলে পড়া-শোনা করে সেটাতে বসেন। মোড়ার পাড়ের সুতোয় কাজ-করা কাপড়ের ঢাকনিটি ভারি সুন্দর।

'ফিরে গেল কেন ?'

আমিনার মুখে রসুলের বাড়ি আসা ও হাসপাতালে ফিরে যাবার বিবরণ ও কারণ শুনে ওসমান খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

'অনেক খুন বেরিয়ে গেছে !'

'সেটাই ভাবনা এখন।' আমিনা ধীরে ধীরে বলেন।

ওসমান বলে, 'খুন না কি জমা থাকে বোতলে, গায়ে ঢুকিয়ে দেয় ?'

'তাই দিত ওকে, ও নিতে চায়নি শুনলাম। বোতলের খুন কম ছিল, অনেকের দরকার ছিল জরুরী, তাইতে।'

'হাঁ।'

আচমকা স্পষ্টতর প্রবলতর হয়ে রসুলকে জামাই করার সাধটা আছড়ে পড়ে ওসমানের মনে।—'হাসপাতালে যাই একবার, দেখে আসি ওকে।'

এখন ওসব কথা তোলার সময় নয়, আমিনা শুনে হয়তো কি ভাববেন, এ সব জেনেও ওসমান হৃদয়ের তাগিদটা রুখতে পারে না, বলে, 'এক আরজ আছে আপনার কাছে, জানিয়ে রাখি। মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, পরীবানু। ওকে তো দেখেছেন আপনি ?'

'কতবার দেখেছি।'

পরীবানুর কথা কোথা আসে ভেবে আমিনা আশ্চর্য হয়ে যান।

'ওর জন্য ছেলে খুঁজছি। তা আমার আরজ রইল আপনার কাছে, রসুল ফিরলে আমার মেয়েকে আপনার নিতে হবে। আমি মজুর বটে, লরী হাঁকাই, আমার মেয়ে নিলে ঠকবেন না।'

'এ তো খুসীর কথা !' আমিনা বলেন আন্তরিকতার সঙ্গে, 'তবে কি জানেন, রসুলের মত থাকা চাই।'

'তা চাই না? রসুলের মত চাই আগে।'

'আপনার সাথে হাসপাতালে যাব?' আমিনা যেন নিছক প্রশ্ন করেন তার ব্যাকুল আগ্রহ চেপে রেখে।

'যাবেন?' ওসমান চিন্তিত ভাবে বলে, 'হেঁটে যেতে হবে। রাস্তায় হাঙ্গামা চলছে। পরে নয় যাবেন। সেই ভাল। আমি দেখে আসি, ঘরে ফিরবার আগে আপনাকে জানিয়ে যাব কেমন আছে।'

'সেই ভাল তবে!'

আমিনা জানেন ওসমানের ছেলে-হারানোর ইতিহাস, তারই রসুলের মতো জোয়ান ছেলে। দেশ-সেবার পথ নিয়ে কাদেরের সঙ্গে তার মতান্তর ছিল বরাবর। বড় তেজী ছিল ছেলেটা। মানত যা, করত তাই। খান বাহাদুরের শেষ বারের নির্দেশ মানতে তার নাকি দ্বিধা হয়েছিল, ওসমান নিজেই বলেছে আমিনাকে। তারপর হাসপাতালে মরবার তিন দিন আগে বাপের কাছে সে মাপ চেয়েছিল, বলেছিল, এস. ডি. ওর গাড়িতে চেপে আমাদের ফেলে খান বাহাদুর পালালেন, গাড়ির পেছনের চাকা আমার ডান পাটা পিষে দিয়ে গেল, সে জন্য দোষ দিই না। প্রজাদের মারতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন তা কি জানতাম? আজ এসে প্রজাদের ক'জনের নাম করে বললেন কি, ওরা আমাদের মেরেছে বলতে হবে! তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। প্রজারা কেউ আমাদের মারেনি। যাদের নাম করলেন, আমি জানি তারা ভিন্ গাঁয়ে কিষাণ-সভা করছিলেন। তোমার কথাই ঠিক হল। এবার বেরিয়ে তোমার কথা, জিয়াউদ্দীন সাহেবের কথা শুনব, নিজে তলিয়ে বুঝব, তবে কিছু করব। মরবার তিন দিন আগে যে ভাষায় যে ভাবে কথাগুলি সে বলেছিল, ওসমানের মুখে শুনে, হয়তো ছেলেহারা ওসমানের মুখে শোনার জন্যই, মনে আমিনার গাঁথা হয়ে আছে মুখস্থ করা ইস্তাহারের মতো। ছেলে বাঁচবে এটাই জানা ছিল ওসমানের। ছেলে মরবে, তিন দিনের মধ্যে মরবে, জানা ছিল না তার। সমবেদনায় বুক ভরে গিয়ে আমিনার চোখের জল উপচে পড়তে চায়।

তারা কথা বলছে, ওসমান উঠি উঠি করছে, রসুলের খবর জানাতে সীতা আসে। সমস্ত রাস্তা সীতা ভাবতে ভাবতে এসেছে ঠিক কি ভাবে মার কাছে হাসপাতালে ছেলের অবস্থার কথা বলে মার মনে ছেলের সম্বন্ধে কতখানি আশা আর কতটুকু ভয় জাগানো চলে, যা সঠিক। রসুল মোটামুটি ভাল আছে, এবং ভাল সে দু'চার দিনের মধ্যে হয়ে উঠবে, এটাই হল প্রধান কথা। কিন্তু ভয়েরও

কারণ একটু আছে সামান্য, কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার মতো নয়। আমিনাকে তা জানানো দরকার। তার কাছে অনায়াসে গোপন করে যাওয়ার মতো তুচ্ছ নয় আশঙ্কাটা। আমিনাকে আজ ভয়ের কিছুই নেই জানিয়ে যাবার পর আবার কাল যদি চরম দুঃসংবাদটা তাকে জানাতে হয়, সেটা তার সঙ্গে বীভৎস শত্রুতাই করা হবে শুধু।

পথে মনে মনে কথা সাজিয়েছিল সীতা, এখানে এসেই সেগুলি সে ছেঁটে ফেলে। সহজ সরলভাবে কথা বলাই সে মনে করে উচিত।

'রসুলের খবরটা জানাতে এলাম। রসুল ভাল আছে, ঘুমোচ্ছে।'

'তবে—?'

'ভয় পাবেন না। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে, তার ওপর রাত্রে আবার বাড়ি এসে ফিরে যাবার হাঙ্গামা করায় খুব দুর্বল হয়েপ ড়েছে। ওকে রক্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতক্ষণে বোধ হয় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অল্প সময়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে জানেন তো, খুব দুর্বল অবস্থায় একটু ভয় থাকেই।'

'ও!' দু'জনে একসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সীতাকে চমকে দিয়ে বলে, 'ভয় তো আছেই।'

সীতা নিজেও স্বস্তি বোধ করে বলে, 'তাই বলছিলাম। শুধু দুর্বল তো রক্তক্ষয়ের জন্য, রক্ত দিলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। শক্-এর ভয়টুকু আছে। সেটা সব ক্ষেত্রেই থাকে, সাধারণ অপারেশন, ডেলিভারি—'

সীতা যেন লজ্জা পেয়েই থমকে থেমে যায় আমিনার দিকে চেয়ে।

আমিনা সায় দিয়ে বলেন, 'তা ঠিক। ধরো ন'বছর পরের এ জঞ্জালটা দু'তিন মাস পরে বিয়োতে হবে, মরেই যাব হয়তো! দুমাস আগে জেলে গেলেন, তিনখানা চিঠি পেয়েছি আজতক তার। প্রতি চিঠিতে শুধু জিজ্ঞেস করছেন, আমার কি হল, আমি কেমন আছি, কি হল যেন চটপট জানাই, কারণ এই ভয়ে উনি মরছেন। জানো মেয়ে, ছেলের চেয়ে আমার জন্য তার ভয় বেশী। ছেলের যা মতামত জানতেন, তাতে কেউ খুন না করলে ছেলের কিছু হবে না ধরাই ছিল। তাছাড়া, উনি ভাবতেন, ছেলের বয়স হয়েছে, ছেলে মরদ। মরদ যদি মরদের মতো মরে—'

এর ওর কাছে রসুলের মার কথা সীতা শুনেছিল, এমনটি ভাবতে পারেনি। রসুলকে বাদ দিলে এই অবস্থায় এখন তাঁর দশ বছরের একটি ছেলে মাত্র সম্বল! রসুলের জেল হলে কি করবেন সে কথাটা কি ভাবছেন না উনি? ভাবছেন

নিশ্চয়। ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন এ আত্মবিশ্বাস আছে। যা হবার হবে ভেবে হাল ছেড়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার মানুষ তো ওকে মনে হয় না।

সীতা একটা খাপছাড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে হঠাৎ—

'আগে আপনার পর্দা ছিল?'

'ছিল না?' আমিনা বলেন জোর দিয়ে, 'বাঙালী মেয়ের পর্দা আজও ঘোচে নি—তার আর আগে ছিল কি বলো?'

ওসমান সায় দেয়, 'তা ঠিক।'

হাসপাতালে বিশেষ করে ওসমানের জন্যই যেন চমকপ্রদ এক ধাঁধা তৈরি হয়েছিল।

'মাল? মাল ছিল নাকি ওর সঙ্গে?'

'ছিল না? ওর সঙ্গে যে এল প্যাক করা মালটা?'

'দাঁড়াও, দেখি খোঁজ করে।'

আধ ঘণ্টা পরে—!

'কই, মাল তো নেই। কিসের মাল? কী ছিল?'

তখনো ধাঁধা লাগে না ওসমানের। জিনিসটা অবশ্যই সরিয়ে রাখা হয়েছে নিরাপদ জায়গায়, যেখানে সেখানে তো ফেলে রাখা যায় না!

কি ছিল কে জানে, প্যাক করা বাক্সের মতো। কাল টেলিফোন করা হল যদি খোঁজ মেলে কার কাছে মালটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কাল রাতে কিছু জানা যায়নি। কথা ছিল, আজ মালটা খুলে দেখা হবে ভেতরে নাম-ঠিকানার কোন হদিস মেলে কি না। কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছে হয়তো—

'না, না। ওর সঙ্গে মাল ছিল না। সকালে লিস্ট করা হয়েছে। এই তো নাম—গণেশ। বয়সে একুশ বাইশ—'

'নাম-পরিচয় জানা গেছে?' ওসমান সাগ্রহে জিজ্ঞাস করে।

'শুধু নামটা—গণেশ। হাতে উল্কি দিয়ে লেখা ছিল। মালের কথা কিছু নেই।'

'কি হল মালটা?'

'ছিলই না মাল, কি হল মালটা! মানে? তোমার নাম কি? ওসমান? ওর নাম তো গণেশ। তোমার এত মাথা ঘামানো কেন ওর জন্য?'

ওসমান একটু চুপ করে থাকে।

'কি জানি, মাথাটা নিজে থেকে ঘামে।'

ভদ্রলোকের মনে অপমানিত বোধ করার ভ্রূকুটি ফুটে উঠতে দেখে ওসমান যেন খুসীই হয় একটু।

সকালে হেমন্ত জামা গায়ে দিচ্ছে বেরোবার জন্য, অনুরূপা সামনে এলেন মুখ ভার করে।

'এত সকাল বেরোচ্ছিস যে?'

'সীতার কাছে যাব একবার।'

অনুরূপার মুখ আর একটু লম্বা হয়ে যায়।

'চা খাবি না?'

'সীতার ওখানে খাব।'

'এসব তোরা কি আরম্ভ করেছিস্ হেমা?' অনুরূপা বলেন দুরন্ত দুঃখের ভাসায়, 'খোকা কখন্ কোথায় চলে গেছে আমাকে কিছু না বলে। তুইও বেরিয়ে যাচ্ছিস। বলে কি যেতে নেই একবার আমাকে? এতই তুচ্ছ হয়ে গেছি আমি?'

'বেরিয়ে তো যাইনি মা এখনো? বলেই যেতাম তোমাকে।'

ভুল-ঘরে লাগানো জামার বোতামটা খুলতে খুলতে হেমন্ত বলে অনুযোগের সুরে। সকালে আবার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল মার মনে কে জানে। এত সকালেই সংযম হারিয়ে অনুরূপা মান-অভিমানের পালা গাইতে শুরু করবেন হেমন্তের বিশ্বাস হতে চায় না। এমন সোজাসুজি জ্বালা বা দুর্বলতা প্রকাশ করাও তো মার স্বভাব নয়!

আবার বলে হেমন্ত সহজ সুরে, 'সকালে বেরোব, তোমায় তো বলাই আছে। একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, সীতা হয়তো বেরিয়ে যাবে। তাই ভাবলাম, ওখানেই চা খেয়ে নেবো। চায়ের জল চাপিয়েছ না কি? তাহলে খেয়েই যাই।'

'একা আমি কত দিক্ সামলাবো হেমা? কতকাল সামলাবো? হেমন্তের কথা যেন কানেও যায়নি এমনিভাবে অনুরূপা বলেন, 'রোজগার করে সংসারও চালাব, তোমাদের কার মাথায় হরদম কি পাগলামি চাপবে তাও খেয়াল রাখবো, অত আমি পারব না হেমা। এই তোমাকে আমি বলে রাখলাম। বড় হয়েছো, ভাইটার দিকে একটু তাকাতে পারো না? না বলে কোন ফাঁকে খোকা কোথায় চলে গেছে। কিছু খায়নি পর্যন্ত। খুঁজে ডেকে এনে শাসন করতে পার না একটু ওকে?'

'কোথায় গেছে, এখুনি আসবে। এতে আবার শাসন কিসের ?'

'তুই কিছু বুঝিস না হেমা। এমনি না বলে একটু এদিক ওদিক যায়, সে আলাদা কথা। ছোট ছেলে অমন করেই। কাল হৈচৈ করতে যেতে চাইছিল, আমি যেতে দিইনি। সকাল হতে না হতে তাই ইচ্ছে করে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি পালিয়েছে।'

'বেশী আটকালে এ রকম হয়। পাড়ার সব ছেলে রাস্তায় বেরিয়েছে, খোকা বন্দী হয়ে থাকবে ?'

'বলে যেতে পারত।'

'কেন বলেনি জানো ? যদি মানা কর এই ভয়ে। তা হলে তো তুমি আরও বেশী রাগ করতে, মানা করলাম, তবু চলে গেল ! তোমার মনে কষ্ট দিতে চায়নি খোকা, বুঝতে পারছ না ? আমারও তো ভয় হচ্ছিল কাল, তুমি যদি বারণ কর, কি করে তোমার মনে কষ্ট দেব।'

'বুঝেছি। কোন কথা শুনবে না ঠিক করাই থাকে তোমাদের, আমার সঙ্গে শুধু একটু ভদ্রতা কর।'

'মার সঙ্গে অভদ্রতা করতে হয় না কি ?'

হেমন্ত হাসে। অনুরূপাও এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন মনে হয়।

'যাকগে, যা খুসী কর। আমি তো এবার পেন্সন নেব সংসার থেকে। তোমাদের ঘাড়েই চাপবে ভাই-বোনের ভার।

'তোমাদের ? তোমাদের কে কে মা ? ও। আমি আর তোমার ছেলের বৌ। তুমি এত হিসেব জানো মা ?'

কত দিন এ ভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলবে, ঠেকিয়ে রাখা যাবে ? হেমন্ত ভাবে পথে নেমে। এই তো সবে সূচনা, শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে এই মায়ার লড়াই কে জানে! অথবা ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে সব, সময় পেলে সম্ভব হবে মানিয়ে নেওয়া, শান্তি পাওয়া মার পক্ষে—তার পক্ষেও ? বুঝে উঠতে পারে না হেমন্ত। পরিবেশ গড়ে মানুষকে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলাই সহজ মানুষের পক্ষে, অতি দরকারী লড়াইও এড়িয়ে চলতে মানুষ তাই এত ব্যাকুল, পলাতক মনোভাব তাই এত প্রবল। পালিয়ে পালিয়ে এড়িয়ে চলার দিন তার পক্ষে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কি করতে হবে তাকে আগামী দিনগুলিতে, ঠিকমতো তার জানা নেই। বিশেষ অবস্থায় আজকের দু'চার দশ দিনের বিশেষ কর্তব্য হয়তো তার জানা আছে, কিন্তু তারপর যখন দৈনন্দিন জীবনকে গড়তে হবে নতুন করে

তার নিজের, মার, রমা ও খোকনের, চেনা ও অচেনা সব মানুষের জীবন গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, খাপ খাইয়ে, সম্মুখের দিকে গতি বজায় রেখে, শত শত গ্রহণ বর্জন নিয়ন্ত্রণ পরিমার্জনের মধ্যে ভীরুতা ও দুর্বলতা, হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ মান-অভিমানের খেলা ও লড়াই-এ, বাঁচা ও বাঁচানোর সংগ্রামে, তখন কি ভাবে কি করবে ভেবেও পাচ্ছে না সে। আজ অবশ্য ভাবার সময় নয় ও সব—

'কেন নয় ?' সীতা আশ্চর্য হয়ে যায় তার কথা শুনে, 'ভাববার যা আজ থেকে তা ভাবতে শুরু করলে দোষটা কি ? ওই ভাবনায় মশগুল হয়ে তুমি তো আর সব ভুলে যাচ্ছ না ? একদিন সব ভাবনা শেষ করে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠছ না ? সেটা তাহলে ভাবা হবে না, কাব্য হবে। একদিনে মানুষ বদলায় না। হঠাৎ বিবাগী হয়ে যে ঘর ছাড়ে, তারও ওই ঘর ছাড়াটাই ঘটে হঠাৎ, বৈরাগ্যটা নয়। আর তুমি তো সংসারে থেকে কাজ করবে। ভাবো, মাথা গুলিয়ে ফেলো না। এক দিনে সব ভাবনা মিটিয়ে দিতে চেয়ো না। রোজকার ভাবনা রোজ ভাবলে, রোজকার কাজ রোজ করলে, দেখবে সব ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছে।'

'অর্থাৎ ধীর স্থির শান্তভাবে—'

'নিশ্চয় ! ওটা দরকার। বিশেষ করে তোমার পক্ষে। মনকে একটু বশে না আনলে কেউ ভাবতে পারে না, সে এলোমেলো ভাবনার শেষ আছে ? রাগ কোরো না, নিজেকে তুমি একা বলে জানো। তুমি ভাবতে শেখোনি সংসারে আরও দশ জন আছে, আরও দশ জনে ভাবে, আরও দশ জনে কাজ করে। নিজেকে দশ জনের এক জন বলে জানলে, দশ জনের সঙ্গে ভাবতে আর কাজ করতে শিখলে, তোমার ভাবনা চিন্তার আসল গোলমালটা কেটে যাবে। ওটা হঠাৎ হয় না। মানুষ একদিনে বদলায় না হেমন্ত।'

'কিন্তু মার কি হবে ?'

'সব ঠিক হয়ে যাবে। কেন ভাবছ ? সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট কিছু তুমি হতেও যাচ্ছ না, করতেও যাচ্ছ না। যদিও তোমার হয়তো ওই রকম কিছু মনে হচ্ছে। তোমার যেমন নাট্যবোধ, জীবন-নাট্য তেমন নয় হেমন্ত।' সীতা একটু থেমে বলে, 'উপদেশের মতো লাগছে ?'

হেমন্ত সায় দিয়ে বলে, 'তা লাগছে কিন্তু শুনতে ভাল লাগছে।'

'কথাগুলি কিন্তু আমার উপদেশ নয় হেমন্ত।' সীতা জোর দিয়ে বলে, 'তোমারও কিছুদিন আগে থেকে আমার বেলা যা ঘটতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছি। এ শুধু পরামর্শ। আস্তে আস্তে আজ কাল কি বুঝতে

পারছি জানো ? দেশ কাকে বলে তাই আমি জানতাম না দু'বছর আগে, এই ভীষণ সত্যটা। অথচ কি প্রচণ্ড অহঙ্কার ছিল দেশকে ভালবাসি বলে !'

চায়ের কাপ মুখে তুলে চুমুক দিতে গিয়ে হেমন্ত চেয়ে থাকে সীতার মুখের দিকে। নিজের ভুল আবিষ্কার করতে পারার জন্য সীতা কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ। যে বিশ্বাস মুখে এমন দীপ্তি, চোখে এমন উজ্জল স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি এনে দিতে পারে, সরল ও নম্রও বুঝি মানুষ হয় সেই বিশ্বাসের জোরেই। সীতাকে নিয়ে বহু দিনের বহু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশার অভিজ্ঞতা তো মুছে যায়নি হেমন্তের হৃদয় থেকে আজ এখানে আসবার সময়েও, এত ঘনিষ্ঠ হয়েও সীতাকে ভাল করে চিনতে না পারার জ্বালাটাই বুঝি তার ছিল বেশী—সীতাই যেন নানা কলা কৌশলে ওই দুর্বোধ্যতার ব্যবধান সৃষ্টি করে নিজেকে তার নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছিল, দূরে যে সরিয়ে রাখা হয়েছে এটুকু জানতে বুঝতে দেবার দয়াটুকুও দেখায়নি। হৃদয়ে অনেক কাঁটার অনেক ক্ষতে আজ যেন প্রলেপ পড়ে হেমন্তর। নিজেকে তার ছোট ভাবতে হয়, কিন্তু সেজন্য তার খুব বেশী দুঃখ বা ক্ষোভ হয় না। বরং তৃপ্তির সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই সে এ জ্ঞানকে মেনে নেয় যে, নিজের ছোটমি দিয়েই সে পার্থক্য রচনা করেছিল তাদের মধ্যে, সীতা তাকে ঠেকিয়ে রাখেনি। কৃত্রিম আকর্ষণও সীতা সৃষ্টি করেনি তার জন্য, কৃত্রিম রহস্যের আবরণেও নিজেকে ঘিরে রাখেনি। সেই তার ছোট মাপকাঠিতে সীতাকে মাপতে গিয়ে, তার গরীবের মূল্য বিচার দিয়ে দাম ঠিক করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, দুঃখ পেয়েছে। সীতার যে একটা সহজ স্বাভাবিক সরলতার গুণ আছে, তার পুরো দাম দিতে পর্যন্ত সে তো কোন দিন রাজী হয়নি। সীতার যা আছে সে তা মেনে নিতে পারেনি, কেটে-ছেঁটে কমিয়ে নিয়েছে নিজের প্রয়োজনে, তার নিজের অল্পতার সঙ্গে, দৈন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে। যতই হোক, সীতা তো মেয়ে !

'কি ভাবছো ? চা-টা খেয়ে নাও।' একটু ইতস্তত করে সীতা, যেচে সহজ সরল হতে গিয়ে সেটা অনর্থক হলে বড় বিশ্রী লাগে। নিজের চা সে শেষ করে। ভূমিকা যা করবে ভেবেছিল সেটা বাদ দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, 'মাসীমা কি ভাবে নিলেন ?'

'কাল রাত্রে ভাল ভাবেই নিয়েছিলেন। সকালে যেন কেমন দেখলাম। মার মনে একটা খটকা লেগেছে—খটকা কেন বলি, মার খুব হিংসা হয়েছে।'

'জানি।' সীতা চোখ তোলে, 'কাল তোমায় খুঁজতে এসেছিলেন, বলেই ফেলেছেন আমার কাছে। তোমায় নাকি পুতুল করে ফেলেছি আমি, খুসীমতো

নাচাচ্ছি। একেবারে বিশ্বাস জন্মে গেছে।'

হেমন্তের কথায় নিরুপায়ের আপসোস ফুটে ওঠে, 'আমরা কি করব! কাল রাত্রে মার সঙ্গে কথা কয়ে কত খুসী হয়ে ছিলাম। সকালে পাঁচ মিনিটে মনটা বিগড়ে দিলেন। ঠিক কথাই বলেছ তুমি, মানুষ এক দিনে বদলায় না।'

'না হেমন্ত', সীতা মাথা নাড়ে, 'আমরা কি করব বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। মাসীমাকে সময় দিতে হবে।'

'মানে?'

'মানে মাসীমাকে বুঝে উঠতে, সয়ে নিতে সময় দিতে হবে। কাল আমিও চটে গিয়েছিলাম মনে মনে, ছেলে-মেয়েদের পঙ্গু করে রাখতে চায় এ কেমন অন্ধ স্নেহ। কিন্তু চটলেও মনটা খচখচ করছিল, কি যেন ভুল হচ্ছে। ভেবে দেখলাম, মাসীমার স্নেহ অন্ধ হোক, মোহগ্রস্ত হোক, তুমি তা উড়িয়ে দিতে পার না হেমন্ত। আমিও পারি না। অবশ্য বিশেষ অবস্থায় বড় দরকারে এসব স্নেহমমতার ব্যপার নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না আমাদের। সে আলাদা কথা। সে কারণ ভিন্ন। বড় ব্যাপারে ঘরোয়া লাভক্ষতির হিসাব বাদ দিতেই হয়। কিন্তু এখানে তো কথাটা ঠিক তা নয়। তোমার আমার বন্ধুত্ব নিয়ে যত গণ্ডগোল। কাজেই, মাসীমা অন্যায় করলেও তাঁর স্নেহকে অবজ্ঞা করা যায় না, তাঁকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বিশেষ করে আমরা যখন জানি, মাসীমাকে একটু প্রশ্রয় দিলে, একটু সময় দিলে উনি সামলে উঠতে পারবেন। মাসীমা স্বার্থপর নন, তোমাদের নিয়েই ওঁর স্বার্থ। আমাকে নিয়ে ওঁর হয়েছে মুশকিল। এটা ওঁর দুর্বলতা, অন্যায়, তা বলব। কিন্তু দুর্বলতাটা জয় করার সময় আর সুযোগ ওঁকে না দিলে সেটা আমাদের অন্যায় হবে। তোমাকে তাই একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

'কিছু দিন তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা একেবারে কমিয়ে দাও।'

'কত দিন?'

'তোমায় আমি কেড়ে নিয়ে বশ করেছি এ ধারণাটা মাসীমার যদ্দিন না কাটে। শুধু মেলা-মেশা কমানো নয়, তোমার চাল-চলন থেকে মাসীমা যেন আবার ধারণা না করে বসেন, মিশতে না পেয়ে আমার জন্য তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে! এটাও তোমার খেয়াল রাখতে হবে। তাই বলে এমন ভাবও দেখিও না যেন সীতা বলে কেউ ছিল তুমি তা স্রেফ ভুলে গেছ—মাসীমা তা'হলে ভাববেন একটা খেলা করছি আমরা ওঁর সঙ্গে।'

হেমন্ত সংশয় ভরে বলে, 'ওটা কি মার সঙ্গে ছলনা করা হবে না সীতা ?'

সীতা জোর দিয়ে বলে, 'না। কারণ, আমরা স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করলেও মাসীমা সেটাকে এখন বিকৃত দৃষ্টিতে বিচার করবেন, খুঁজে খুঁজে শুধু বার করবার চেষ্টা করবেন আমার জন্য ওঁকে কিসে তুমি অবহেলা করলে, কিসে তুচ্ছ করলে। ওঁর বিকারটাই তাতে জোরালো হবে। শান্ত মনে ভাববার বুঝবার সময় পেলে উনি এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। মা অসুস্থ, কিছু দিন তুমি তাঁর চিকিৎসা করবে। এতে ছলনার কি আছে ?'

হেমন্ত চুপ করে ভাবে। তার মুখে মৃদু হতাশা ও অসহায়তার ভাব ফুটে উঠতে দেখে দুঃখের সঙ্গে সীতা ভাবে, তাকে ছেড়ে দূরে দূরে কি করে থাকবে তাই কল্পনা করতে আরম্ভ করেছে কি হেমন্ত নিজের মধ্যে গভীর বেদনা জাগাতে ? হেমন্ত কথা কইতে সে স্বস্তি পায়। অত হাল্কা নয় হেমন্ত !

'এই সময়টাতেই তোমাকে আমার বেশী দরকার ছিল।'

'না হেমন্ত', বিনা দ্বিধায় সীতা বলে, 'এটা তোমার ভুল। আমি সব সময় পেছনে লেগে না থাকলে যদি তুমি ভেস্তে যাও, তবে তাই যাওয়াই ভাল। কিন্তু তা সত্যি নয়, ভেবো না। তোমার নতুন বিশ্বাস শিথিল হবে না, মনের জোরে ঘাটতি পড়বে না। এমন অনেককে পাবে, যারা বরং ওদিক দিয়ে আমার চেয়ে বেশী কাজে লাগবে তোমার এ সময়। তা ছাড়া', সীতা স্নিগ্ধ হাসি হাসে, আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে তো বলিনি তোমায় !'

জয়ন্তের মনে শুধু এই ভয়, বাড়ি ফিরলে মা বকবে। আর সব ভয়-ডর সে ভুলে গেছে। সে আর তার দশ-বার জন সঙ্গী আজ পৃথিবী জয় করতে পারে। পাড়ার এই ছেলেদের সঙ্গে কত রকম খেলা সে খেলেছে, কত অ্যাডভেন্চার করেছে রায় বাবুদের বাড়ির সামনের লোহার গেট ও প্রাচীর-ঘেরা ছোট বাগানের ফুল চুরি করা থেকে বগলস খুলে ডিকসনের কুকুরটাকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত, বার বছর বয়সের জীবনে আজকের মতো এমন উত্তেজনা এমন উন্মাদনা আর কোন দিন সে পায়নি। এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে বলেই সে বেরিয়েছিল, শিশির, মনা, অশোকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেলা দুপুর হয়ে এল, এখনো তারা ফিরতে পারেনি। বড় মোড়ে মিলিটারী লরীটাতে আগুন ধরামাত্র ওখানে ছুটে গিয়েছিল দল বেঁধে দেখতে, তারপর চারটে লরী পোড়ানো দেখে এতক্ষণে তারা পাড়ার গলির মোড়ে ফিরে এসেছে। তার আগে

কি ফেরা যায় ? বাড়িতে নয় একটু বকবেই ! হাজার হাজার লোকে যখন রাস্তায় নেমে এসেছে, একটি গাড়ি পর্যন্ত চলতে দেবে না পণ করে, সে কি করে বাড়ি ফেরে।

শিশির জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন গাড়ি চলবে না ভাই ?'

জয়ন্ত – তের বছরের জয়ন্ত, ন' বছরের ছেলের প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, 'জানিস না ? গুলি করবে কেন ? এটা আমাদের দেশ, আমরা যা খুসী করব। ওরা গুলি করবে কেন ?'

অশোক বলেছিল, 'তাছাড়া, আমাদের স্বাধীনতা চাই তো। পরাধীন হয়ে থাকব কেন শুনি ?'

মনা সায় দিয়েছিল, বাবা বলে, 'আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি, তাই স্বাধীনতা পাই না। আমরা তাই এক হয়েছি। দেখছিস না ? এই ছাখ।'

বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য শান্তি বাহিনীর একটি গাড়ি তিন দলের পতাকা উড়িয়ে মোড়ের মাথায় থেমেছিল, লাউড স্পীকার থেকে ভেসে এসেছিল : 'সংযম হারালে, দু'চারখানা গাড়ি পোড়ালে, অন্যায়ের প্রতিকার হবে না, স্বাধীনতা আসবে না। শান্ত হয়ে সকলে বাড়ি ফিরে যান, কিংবা প্রতিবাদ সভায় যোগ দিন। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে দাবি আদায় করুন।'

জয়ন্ত বলেছিল, 'তোকে বলিনি ঢিল ছুঁড়িস না মনা ? শুনলি তো !'

তারপর তারা ফিরে এসেছে এই গলির মোড়ে। গলা শুকিয়ে গেছে তাদের 'ইনক্লাব, জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম' চেঁচিয়েছে, তারা তো তুচ্ছ নয়। খিদেয় অবসন্ন হয়ে এসেছে শরীর। তবু গলির ভেতরে ঢুকে যে যার বাড়ি চলে যাবে সে ক্ষমতা যেন পাচ্ছে না তারা। তাদের শিশু-মনের স্বপ্ন, আর রূপকথা যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে আজ তাদের সামনে শহরের রাজপথে, অফুরন্ত সুযোগ জুটেছে রাজপুত্রের মতো বীরত্ব দেখাবার।

এ মোড়ের অল্প দূরে একটা লরী পুড়ছিল। তাই দেখার জন্য তারা দাঁড়িয়ে থাকে। সৈন্য-বোঝাই একটি লরী আসছে দেখা যায়, শব্দও পৌঁছায় এখানে।

জয়ন্ত বলে দৃঢ়স্বরে, সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডারের মতো, 'এই শেষবার। এদের শুনিয়ে দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরব। আমি যা বলব, তোমরা ঠিক তাই বলবে। দু-তিন পা এগিয়ে দাঁড়াই চলো। রেডি ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ ! জয় হিন্দ ! বন্দে মাতরম ! ইনক্লাব –'

মনার গায়ে ঢলে জয়ন্ত রাস্তায় আছড়ে পড়ে। উঠবার যেন চেষ্টা করছে

এমনি করে নড়েচড়ে কয়েক বার। দু'বার কাসে রক্ত তুলে। তারপর নিস্পন্দ হয়ে যায়। তেরটি শিশু তাকে ধরাধরি করে গলির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনের প্রথম যে বারান্দা মেলে তাতে শুইয়ে দেয়।

অনুরূপা তখন ধৈর্য হারিয়ে ছেলের খোঁজে গলি দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন।

সাড়ে আটটা বাজে, অজয় এখনো স্নান করতে গেল না। বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই যে কথা আরম্ভ করেছিল, সুধীর আর নিরঞ্জনের সঙ্গে বাজার থেকে ফিরে, এখনো মশগুল হয়ে কথাই বলে চলেছে। যেন ভুলে গিয়েছে যে দশটায় ওর আপিস, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপিসে পৌঁছতে এক ঘণ্টার কম লাগে না। হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত হেঁটে না গিয়ে আজ ট্রামে বাসে যাবে যদি ভেবে থাকে, তা ও ভাবুক, কারো তাতে কিছু বলার নেই, মাঝে মাঝে দু'একদিন এইটুকু পথ হাঁটার বদলে সখ করে মিছিমিছি ট্রামে বাসে কটা পয়সা বাজে খরচ যদি করতে চায় কেউ তাতে কিছু মনে করে না। কিন্তু এখন স্নান করতে না গেলে ট্রামে বাসে পয়সা নষ্ট করেও যে আপিসে লেট হয়ে যাবে সেটা তো খেয়াল থাকা দরকার ওর।

মৃদু অস্বস্তি বোধ করে বাড়ির লোক, মাধু ছাড়া। ওদের সঙ্গে এত কথাই বা কিসের সবাই ভাবে, মাধু ছাড়া। ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল বটে, এখন তো আর নয়। ওরা কলেজে পড়ছে, অজয় চাকরি করছে। এত ভাব ওদের সঙ্গে এখন না রাখাই উচিত।

অনন্ত সইতে না পেরে মেয়েকে বলে, 'মাধু, আরেকবার ডাক।'

'এই তো ডাকলাম।'

'আবার ডাক। কটা বাজল? আটটা পঁয়ত্রিশ! ডেকে বল পৌনে নটা হয়ে গেছে।'

'বলেছি তো একবার। দাদার কি সে হিসেব নেই ভাব? অত খোঁচানো ভালো নয়। মাধু শান্ত গলাতে বলে। আশ্চর্য রকম সে শান্ত হয়ে গেছে আজকাল। সেরকম এলেমেলো মেজাজ আর নেই, একের পর একটা বিয়ের চেষ্টা ফসকে যাবার ক বছর যেমন ছিল। সে যেন ওদিকের সব আশা ভরসা মুচড়ে ফেলে হাল ছেড়ে দিয়ে সুস্থ হয়েছে।

কপালে চাপড় মেরে অনন্ত বলে, 'তুই আর আমাকে উপদেশ দিসনে মাধু, দিসনে। গলায় দড়ি জোটে না তোর?'

'দাও না জুটিয়ে ?' মাধু হেসে বলে 'দড়ি কিনতেও পয়সা লাগে বাবা। এক ঘণ্টা ধরে চুল ঘষে দিলাম, দত্তবাড়ির বৌটা পয়সা দিলে চার আনা। চার আনায় গলায় দেবার দড়ি হয় না। রোজগার বাড়ুক দড়িও জুটিয়ে নেব।'

অনন্ত কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় মেয়ের দিকে।

তার তাক লেগে যায় নিজের ছেলেমেয়েগুলির রকম দেখে।

এত যে তার দুঃখ দুর্দশার সংসার, শুধু শুধু অশান্তি আর হতাশা, ওরা কেউ যেন তার অস্তিত্ব মানবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। লড়াই থামতে না থামতে তাকে বুড়ো বয়সে খেদিয়ে দিল চাকরি থেকে, পড়া ছেড়ে চাকরি নিয়ে দুটো পয়সা আনছে ছেলেটা তাই আধপেটার হাঁড়িটা চড়ছে কোনমতে, যে কাপড় পরে আছে মাধু ওর দিকে তাকানো যায় না, অজয় যে বেশে আপিস যায় যেন কুলি চাষীর ছেলে, আজ বাদে কাল কি হবে ভেবে বুকের রক্ত তার হিম হয়ে আছে, কিন্তু ওরা যেন গ্রাহ্যই করে না কোন কিছু! আগে যখন আরও সহজে সংসার চলত, অজয়ের পড়া চালানো, মাধুর বিয়ে দেওয়া, এসব ব্যবস্থা একরকম করে করা যাবে মরে বেঁচে এ ভরসা করা চলত, তখন যেন কেমন হতাশ, মনমরা ছিল সকলে, রাগারাগি চুলোচুলি কাঁদাকাটা অশান্তি লেগেই ছিল ঘরে—এখন আরও শোচনীয় অবস্থায় এসে ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা হারিয়ে আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় জামায় দিন চালিয়ে গিয়েও সবাই যেন জীয়ন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে—ভয় নেই ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা সব ঠিক করে নেব, এই ভাব সকলের। মায়ের গঞ্জনায় মাধু একদিন মরতে গিয়েছিল ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে, অজয় গিয়ে সময়মতো না ধরলে সর্বনাশ হয়ে যেত। এখনো গলায় সে দাগ আছে মাধুর। আজকাল গালাগাল গঞ্জনা উপহাস কিছুই সে গায়ে মাখে না। রাগ তো করেই না, হেসে উড়িয়ে দেয়।

অথচ আজ ওর গায়ে আঁটা আছে এই সত্যটা যে কাপড় ও পরে আছে, ওর দিকে তাকানো যায় না।

অনন্ত ঝিমোয়। তার সাধ যায় ছেলেমেয়ের কাছে হার মেনে মাপ চেয়ে বলতে যে এই ভাল! এই ভাল!

কিন্তু সে চমকে উঠে গর্জেই বলে, 'অজয়! আপিস যেতে হবে না আজ আড্ডা দিলেই চলবে সারাদিন?'

অজয় ভেতরে এসে বলে, 'আজ আপিস যাব না বাবা। আজ সব আপিস

কারখানায় হরতাল। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে।'

অনন্ত সোজা হয়ে বসে উদ্বেগে, আতঙ্কে, উত্তেজনায়। জোর দিয়ে বলে, শীগগির যা, না খেয়ে চলে যা আপিসে। কিনে খাস কিছু খিদে পেলে। হেঁটে চলে যা, দেরি হলে কিছু হবে না। অন্য দিন কামাই করিস যায় আসে না, আজ আপিসে যেতেই হবে। গিয়ে ম্যানেজার সায়েবকে বলবি, ট্রাম বাস বন্ধ, হেঁটে আসতে হল বলে দেরি হয়েছে। বলবি, কয়েক জন জোর করে তোকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেছিল, তুই অনেক কষ্টে কারো কথা না শুনে আপিসে এসেছিস—'

অনন্ত কাসতে শুরু করে। কাসতে কাসতে বেদম হয়ে পড়ে। তবু তারই মধ্যে কোনমতে বলে, 'সায়েব খুসী হবে, মাইনে বাড়বে, উন্নতি হবে, আপিস যা।'

কাসি থামলে গুটলি-মুটলি পাকিয়ে মরার মতো পড়ে থাকে অনন্ত।

মাধু হাওয়া করে, অজয় বুকে পিঠে হাত ঘষে দেয়। গোলমাল শুনে নিরঞ্জন ভেতরে এসেছিল, মাথা হেঁট করে সে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ তোলে না। ছেঁড়া কাপড়ে অনেক যত্নে মাধু যখন নিজেকে মোটামুটি ঢেকে রাখে, তখনও তার দিকে চাওয়া যায় না। এখন সে ব্যাকুল হয়ে নিজের কথা ভুলেই গেছে।

আধ ঘণ্টা পরে একটু সুস্থ হয়ে অনন্ত ডাকে, 'অজয় ?'

'বাবা ?'

'আজ আপিস যেও না। সবাই যখন আপিস যাচ্ছে না, তোমার যাওয়া উচিত হবে না। সবাই যা করে, তাই করাই ভাল।'

'নিরুদা, যেও না। কথা আছে।' মাধু তার বাইরে বেরোবার আস্ত শাড়ীখানা পরে আসতে যায়।

'আপনার একটা ওষুধ খাওয়া দরকার কাসির জন্য।' নিরঞ্জন বলে।

'দরকার তো অনেক কিছুই বাবা। সব দরকার কি মেটে !' ক্ষোভের সঙ্গে বলে অনন্ত।

'পাল ডাক্তারকে কতবার ডাকতে চেয়েছি, আপনিই বারণ করেন।' অজয় মৃদুস্বরে বলে। অনন্তের মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিমানের নালিশ জানাতে নয়, বাপকে সান্ত্বনা দিতে। অনন্ত নিজেকে সংশোধন করে বলে, 'ডাকবার দরকার কি ? আমি যেতে পারি না।'

একখানা মাত্র সম্বল শাড়ীখানা পরে এসে মাধু বলে নিরঞ্জনকে, 'ঘোষদের

বাড়িতে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে ছিলে, আজ নিয়ে চলো। কাল থেকেই কাজ করব, চায় তো ওবেলা থেকেই। কিন্তু ভাবছি কি', 'মাধু মৃদু সংশয়ের হাসি হাসে, 'আমার রান্না কি রুচবে ওদের, এত বড়লোক মানুষ!'

অনন্ত অপলক চোখে চেয়ে থাকেন। তার মত নেই, তিনি বারণ করেছেন তবু তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করে তারই সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ে তার অনায়াসে লোকের বাড়ি রাঁধুনির কাজে ভর্তি করিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছে দাদার বন্ধুকে! লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, অপমান বোধ নেই। অজয় চোখ পেতে রাখে মেঝেতে। লাল সিমেণ্টের মেঝে দু'বেলা মুছে মুছে তেল চক্চকে করে তুলেছে মাধু। মাধু ঝি হোক রাঁধুনি হোক এতে তার লজ্জা নেই। সে থাকতে ওকে রাঁধুনি হতে হয় এমন সে নিরুপায়, এই ক্ষোভে কান দুটি তার ঝাঁ ঝাঁ করে।

'আজ তো হবে না মাধু।'

'রাঁধুনিদের কাজে যাওয়াও বারণ নাকি আজ?'

নিরঞ্জন হাসে।—'আমরা এখুনি বেরিয়ে যাব। আজ কি নিশ্বাস ফেলার সময় আছে? দশটায় এখানে একটা মিটিং আছে, তারপর বড মিটিং, তাছাড়া আরও কত কাজ।'

'তোমরা মানে? দাদাও যাচ্ছ নাকি? চলো তবে আমিও বেরোই তোমাদের সঙ্গে। একটু দেখে শুনে আসি।'

মাধুর চোখ জ্বল্জ্বল্ করে।—বাড়িতে মন টিঁকছে না আজ। খালি মনে হচ্ছে কোথায় যাই, কি করি।

হাঙ্গামার ভাসা-ভাসা এলোমেলো খবর তারা শোনে গাড়িতেই। কাল থেকে গুলি চলছে কলকাতায়, চারিদিকে লড়াই শুরু হয়েছে সারা শহরে, ভীষণ কাণ্ড। কালকের ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে আজকে ভোরের কাগজে, তাদের গাড়িতেই পাঁচ সাতজন বাংলা কাগজ কিনে পড়েছে এবং সকলকে পড়ে শুনিয়েছে। আজকের খবর সব ছড়িয়েছে মুখে মুখে। কলকাতার যত কাছে এগিয়ে এগিয়ে স্টেশনে গাড়ি থেমেছে তত ঘন আর ফলাও হয়েছে খবর।

'শহরেও হাঙ্গামা, কলকাতা শহরে?' গণেশের মা বিচলিত হয়ে বলেছে, 'গণশার যদি কিছু হয়?'

যাদব বলেছে তাকে ভরসা দিয়ে, 'গণশার কি হবে? লাখো লাখো লোক

কলকাতা শহরে, তার মধ্যে তোমার গণশারই কিছু হতে যাবে কি জন্য ?'

'চিঠিটা ঠিক আছে তো ? গণশার ঠিকানা লেখা চিঠি ?' একথা এর মধ্যে কম করে—দশ বারো বার শুধিয়েছে গণেশের মা।

'বললাম তো ঠিক আছে কত বার। হাঁ ছাখো—' যাদব ছেঁড়া কুর্তার পকেট থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা পোস্টকার্ডটি বার করে নিজেও আর একবার দেখে নেয় নিঃসন্দেহ হবার জন্য, যদিও দশ জনকে দিয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে ঠিকানাটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে, চিঠিখানা হারিয়ে গেলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই।

স্টেশন ও স্টেশনের বাইরের অবস্থা দেখে যাদব একেবারে হকচকিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। দু'চার বার সে কলকাতা এসেছে, প্রতিবার সে স্টেশনে নেমে মানুষের গমগমে ভিড আর স্টেশনের বাইরে গাড়ি ঘোড়ার অবিরাম স্রোত দেখেই হকচকিয়ে গেছে ভয়ে বিস্ময়ে, তার তুলনায় ঘুমন্ত পুরীতে যেন পা দিয়েছে মনে হয় তার আজ। স্টেশনে লোক কিছু আছে, এতটুকু ব্যস্ততা কারো নেই, সবার মুখে যেন গুমোটে মেঘ। বাইরে গাড়িঘোড়ার স্রোতটি অদৃশ্য। যাদবের মনে হয়, একদিন ঘুম ভেঙে উঠে তাদের গাঁয়ের পাশের নদীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখলেও বোধ হয় এমন তাজ্জব লাগত না তার।

'হেঁটেই যেতে হবে গণশার মা।'

'উপায় কি তবে আর ? হবে তো যেতে, না কি ?'

'পথটা শুধোও কাউকে ?' রাণী বলে।

'পুল পেরোই আগে। তারপর শুধোব।'

'তবে সাথে চলো যারা যাচ্ছে দেরি না করে, একলাটি পড়ে গেলে ভাল হবে শেষে ?'

মোট-ঘাট বিশেষ কিছু নেই, সেও রক্ষা। মেটে হাঁড়িতে দুমুঠো সিদ্ধ করার চাল জুটলে যে ভাগ্য বলে মানে তার আবার মোট-ঘাট। কাঁথা বালিশের বাণ্ডিলটা যাদব বাঁ হাতের বগলে নেয়, গাড়ির ঝাঁকানিতে ডান হাতের ব্যথা বেড়ে অবশ অবশ লাগছে। মনাকে কাঁধে নিয়ে গণেশের মা কাপড়ে বাঁধা চালের পুঁটলিটা হাতে নেয়, সের চারেক চাল আর দুটো বেগুন আছে। ক'টা গেলাস বাটি আর জামাকাপড়ের বাঁশের ঝাঁপিটা নেয় রাণী, দু'বছরের কালীর হাতটা ধরে। ঘুম-কাতুরে খিদে-কাতুরে মেয়েটা এত ঘুমিয়ে এত খেয়েও একটানা কেঁদে চলেছে।

'কোথা যাবে তোমরা ?'

রাণী মুখ বাঁকায়। সেই বাবুটা, চশমা কোট পালিশকরা জুতোর সেই বদ

মার্কা। যে শুধু তাকাচ্ছিল, তাকাচ্ছিল, তাকাচ্ছিল। চোখ দিয়ে যেন কাপড়ের নীচে তার গা চাটছে।

যাদবের মুখে ঠিকানা শুনে ভদ্রলোক যেন চমকে যায়, 'সে যে অনেক দূর, যাবে কি করে? এমনি যদি বা যেতে পারতে অন্যদিন, আজ সে রাস্তাই বন্ধ ওদিকের। পুলিস গুলি চালাচ্ছে। লোকেরা ইট ছুঁড়ছে, গাড়ি পোড়াচ্ছে, মারা পড়বে সবাই তোমরা।'

'ছেলে আছে ওই ঠিকানায়। ছেলের কাছে যাচ্ছি বাবু।'

'আজ যেতে পারবে না,' ভদ্রলোক বলে জোর দিয়ে, 'ছাখো দিকি গাঁ থেকে শহরে এসে কি বিপদে পড়লে।'

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে ভাবে, অনেক ইতস্তত করে, তারপর যেন নিরুপায়ের মতো অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, 'আজ যেতে পারবে না। এক কাজ কর বরং, আমার বাড়ি কাছে আছে, সেখানে আজ থেকে যাও। হাঙ্গামা কমলে কাল-পরশু যেও ছেলের কাছে, আমি না হয় ছেলেকে তোমার একটা খবর পাঠাবার চেষ্টা করব।'

রাণী ফুঁসে ওঠে। 'কতটা হাঁটতে হবে, দাঁড়িয়ে থেকোনি বাবা। যেতেই হবে তো দাদার কাছে আজ। চলো এগোই মোরা। চলো—।'

যাদব তাকায় ভদ্রলোকের মুখের দিকে, মুখটা সত্যি সুবিধের নয়! আর তাও বটে, নজরটা বাবুর আটকে আছে রাণীর ওপর।

'ছেলের কাছে যেতেই হবে বাবু, মরি আর বাঁচি।'

'চলো না এগোই?'—রাণী ধমকের সুরে বলে নিজে চলতে আরম্ভ করে দিয়ে, যাদবও চলতে শুরু করে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায়, সিগারেট ধরিয়ে পুলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাবু গঙ্গার শোভা দেখছেন একমনে।

পুল পেরিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে রীতিমতো খটকা লাগে যাদবের যে, বাবুটি মিছে বলে ভাঁওতা দিতে চেয়েছিল তাদের, না সত্যি যা ঘটছে তারই সুযোগ নিতে চেয়েছিল সত্যি কথা বলে। বড় একটা গাড়ি দাউদাউ করে পুড়ছে মোড়ের মাথায়, এ পাশে পুড়ে কালো হয়ে কঙ্কাল পড়ে আছে দুটো ছোট গাড়ির। ইটপাটকেলে ভরে আছে রাস্তা। এ ধারে এক পাশে কয়েক জন মিলিটারী সায়েব আর একদল গুর্খা সেপাই দাঁড়িয়ে দেখছে, ওধারে মোড়ের মাথা থেকে রাস্তার ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত লোকারণ্য, এমন আওয়াজ তুলেছে তারা যেন অনেক গণ্ডা আহত বাঘ ফুঁসছে এক সাথে।

কি করে কোথা দিয়ে তারা যাবে ?

আশে পাশের লোকদের মধ্যে ছিটের শার্টের ওপর কমদামী পুরানো আলোয়ান জড়ানো গরীব গোছের একটি ভদ্রলোকের ছেলে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকবার তার মুখটি খর নজরে দেখে যাদব গণেশের পোস্টকার্ডখানা বার করে। কিন্তু কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ছেলেটি হাঁটতে আরম্ভ করে দেয়। বাঁয়ে যে দিকের রাস্তার মোড়ে ও ভেতরে ভিড় জমেছে সে দিকে নয়, ডাইনে যে দিকে প্রায় ফাঁকা রাস্তা মিলিটারী দখল করে আছে, সে দিকে।

হাসপাতালে আহত একটি ছেলের আত্মীয়ের আসবার কথা ছিল, অজয় স্টেশনে এসেছিল তাকে ছেলেটির খবর জানিয়ে দিয়ে যাবার জন্য। ছেলেটির অবস্থা ভাল নয়। আত্মীয়টি আসেননি, অথবা এসে থাকলেও চেহারার বর্ণনা শুনে চিনে উঠতে পারেনি। ফিরবার সময় পুল পার হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত অসহনীয় দৃশ্য দেখছিল অজয়। ভিড় সরে এসে জমা হয়েছে এ পাশে, ওপাশের রাস্তা দিয়ে লোক চলছে খুব কম—জরুরী দরকার না থাকলে ওপথে প্রাণ হাতে করে অকারণে কে চলতে চাইবে। ইট পাটকেলে ভর্তি হয়ে আছে রাস্তাটা, সেই রাস্তা সাফ করছে দশবার জন ভদ্রলোক। ওদের ধরে জোর করে রস্তো সাফ করানো হচ্ছে। সাদা নীল স্ট্রাইপ কাটা শার্ট গায়ে এক ভদ্র যুবককে বেঁটে লালচে গোঁফওলা একজন অফিসার ফুটপাথ থেকে টেনে নামিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়ে দিল। ওরা কি জানে না মুখ বুজে এ জুলুম সহ্য করা পাপ ? কি বলে ওরা হুকুম পেল আর ইট পাটকেল সরাবার কাজে লেগে গেল ? অজয়ের মনে হয়, ওরা যে মুখ বুজে এ অপমান সইছে এ জন্য দায়ী সে। তারও তো এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া বিশেষ দরকার, কিন্তু হাঙ্গামার ভয়েই তো না এগিয়ে এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। লোক চলছে ও-রাস্তায়, সবাইকে ধরে রাস্তা সাফের কাজে লাগাচ্ছে না। যদি তাকে ধরে এই তো তার ভাবনা। সে তো কোন মতেই হুকুম শুনে ইটপাটকেল সাফ করার কাজে লেগে যেতে পারবে না ওই ভদ্রলোক ক'জনের মতো। তাহলেই তখন গোল বাধবে !

কিন্তু তাই বলে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায় ভীরু কাপুরুষের মতো ? সে হাঙ্গামা করতে আসেনি, কাজে এসেছে। ও-রাস্তায় লোক চলা নিষিদ্ধ হয়নি। তার হেঁটে যাবার অধিকার আছে ও-রাস্তা দিয়ে। সে যদি অন্যায় না করতে, অধিকার বজায় রাখতে ভয় পায়, ওরা ইট পাটকেল সাফ করতে লেগে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

অজয় এগিয়ে যায়।

'হই!' বলে লালচে গোঁপওলা অফিসার, কাছে এসে সোজা সহজ হুকুম জারি করে, 'সাফ করো।'

অজয় প্রশ্ন করে, 'এ রাস্তায় কি ট্রাফিক বন্ধ?'

প্রশ্ন শুনেই বোধ হয় রেগে যায় লালচে গোঁপ, আর রেগে যায় বলে ধৈর্য ধরে বলে, 'সাফ করো। সাফ করো। তুম ইঁটা ফিকা, তুম সাফ করোগে।'

'ইউ আর ম্যাড!' অজয় বলে।

তখন দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে অজয়কে সে ফেলে দেয় রাস্তায়। মাথায় সামান্য একটু চোট লাগে অজয়ের। ডান হাতের কাছে একটি ইঁট। মাটি পোড়ানো ইঁট নয়, শক্ত পাথুরে ইঁট, যা দিয়ে রাস্তা বাঁধায়। চোখে অন্ধকার দেখছে অজয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এখন উন্মাদ। হাতে তার জোর আছে। এই ইঁটটা ছুঁড়ে মেরে সে মাথার ঘিলু বার করে দিতে পারে লালচে গোঁপের। তারপর যা হয় হবে।

না। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে অজয় বলে, না। সে ভদ্রলোকের ছেলে, কে একজন তাকে অপমান করেছে, এই ব্যক্তিগত আক্রোশে অন্ধ হয়ে কিছু তার করা চলবে না। হাসপাতালের আহত ছেলেদের মুখ তার মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাস্তায় বসা একদল তরুণের মুখ। না, নরক থেকে শয়তান এসে তাকে বিগড়োবার চেষ্টা করলেও সে খাঁটি থাকবে। সে সংযত থাকবে। সে শান্ত থাকবে।

ধীরে ধীরে অজয় উঠে দাঁড়ায়। বাঁ হাতটা কি ভেঙে গেছে? গেছে যদি যাক্, এখন তা ভাববার সময় নয়, ভাঙা হাত জোড়া লাগবে।

লাল গোঁপ তাকিয়ে থাকে। সিমেণ্টের শক্ত ইঁটটা সে দেখেছে, অজয় যখন ইঁটা নামিয়ে রাখছে। তার মাথায় ছুঁড়ে মারবার জন্য ইঁটটা তুলেছিল। মারল না কেন? ও-ইঁট মাথায় লাগলে সে বাঁচত না। কিন্তু মারল না কেন? লালগোঁপ বোধ হয় বুঝে উঠতে পারে না, তাই তাকিয়ে থাকে।

উঠে দাঁড়াবার পর অজয় টের পায় একটি গেঁয়ো পরিবারের মেয়ে পুরুষ তাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। ক্রমাগত প্রশ্ন হচ্ছে, 'লাগেনি তো? বেশী লাগেনি তো বাবু?'

'না। লাগেনি।'

তখন যাদব আবার পোস্টকার্ডটি বার করে সামনে ধরে বলে, 'বাবু এ ঠিকানায় কোন্ দিকে যাব?'

'দাঁড়াও বাবু একটু', অজয় বলে তার দিকে বা ঠিকানার দিকে না তাকিয়েই। খানিক পরে নিজে চলতে আরম্ভ করে অজয় থেমে যায়। যাদবকে বলে, 'কি বলছিলে তুমি?'

ঠিকানা পড়ে বলে, 'ডালহাউসী স্কোয়ার চেনো? লালদীঘি?'

'লালদীঘি? চিনি বাবু।'

বাঃ, তবে আর ভাবনা কি? লালদীঘি চারকোনা তো, পূবে দুটো কোণ আছে। পূব-উত্তর কোণে একটা, পূব-দক্ষিণ কোণে একটা। যে কোন কোণ থেকে পূবের রাস্তা ধরে এগোবে বুঝলে?'

যাদব মাথা নাড়ে।

'কেন, বুঝলে না কেন? দু'কোণ থেকে দুটো রাস্তাই পূবে গেছে, দশটা নয়। লালবাজারের সামনে দিয়ে গেলে বৌবাজারের মোড় হয়ে ডাইনে বাঁকবে, মিশন রো হয়ে গেলে ট্রাম-রাস্তা পার হবে, তারপর একজন কাউকে জিজ্ঞেস করলেই—'

যাদব নীরবে পোস্টকার্ডটি ফিরিয়ে নেয়।

অজয় এবার গম্ভীর মুখে বলে, 'তবে আমার সঙ্গে এসো। আমিও লালদীঘি যাচ্ছি। কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যাব আমি। অন্য রাস্তা নেই। সঙ্গে এসে মেয়েছেলে নিয়ে মুশকিলে পড়তে পার। বুঝে ছাখো।'

রাণী বলে, 'চলুন যাই।'

জোরে জোরে হেঁটে সে এগিয়ে যায়। লাল গোঁপের কাছ দিয়েই হাঁটতে থাকে। এবার কিন্তু লাল গোঁপ তাকিয়েই থাকে শুধু। খানিক দূরে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় যাদবদের জন্য অজয় থেমে দাঁড়ায়। আবার এগোয়, আবার থামে। তার বিরক্তিভরা মুখ দেখে যাদব অস্বস্তি বোধ করে। তবে জাল পেতে বোকা হারা গেঁয়ো লোক ধরা শহুরে বেদে এ ছোকড়া নয়, এটা সে বিশ্বাস করে অনায়াসে।

একবার বলে যাদব কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষায়, 'মোদের তরে মিছিমিছি হাঁটতে হল বাবু আপনাকে।'

'না বাবু হাঁটতে আমাকে হতই, একটু বেশী হাঁটা হচ্ছে। কি করি বল, তোমরা তো নাছোড়বান্দা।'

জেটি শেড ডাইনে রেখে তারা সোজা এগোতে থাকে। চারি দিকে কর্মহীন স্তব্ধতা, উগ্র প্রতীক্ষার মতো। শেডের ফাঁক দিয়ে রাণী মস্ত চোঙাওলা বিদেশী জাহাজের দিকে তাকায় মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে, ভাল করে না দেখতে দেখতে আড়াল হয়ে যায় সেগুলি।

'বিদ্যুৎ লিমিটেড' খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই—এতখানি রাস্তা হেঁটে গিয়ে খুঁজে বার করার কষ্টটা ছাড়া। কিন্তু দোকান বন্ধ দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। যাদব বলে, 'কি সব্বোনাশ!'

অজয় রাগ করে বলে, 'তোমার ঠিকানা ভুল হয়েছে। যা খুসী করো তোমরা, আমি চললাম।'

সে অবশ্য যায় না। শোভাযাত্রায় যোগ দিতে মনটা যতই ছটফট করুক, এ বেচারীদের একটা হিল্লে না করে ফেলে যাওয়া যায় কেমন করে। যাদবের কাছ থেকে গণেশের চিঠিখানা চেয়ে নিয়ে আরেকবার সে ঠিকানা মিলিয়ে ভাখে। ঠিকানা ঠিক আছে। এই দোকানেই গণেশ কাজ করে। এখন দোকানের মালিকের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে। তার কাছে যদি গণেশের খোঁজ মেলে।

অত বড় আঁকাবাঁকা হরফে লেখা চিঠিখানা পড়ে অজানা গণেশকে ভাল লেগেছিল অজয়ের। চিঠির প্রতি ছত্রে অশুদ্ধ গ্রাম্য কথাগুলিতে ফুটে উঠেছে মা-বাপ-ভাই-বোনের জন্য গণেশের মমতা, ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য শহরে তার প্রাণপণ লড়ায়ের ইঙ্গিত, কত যে ভরসা দেওয়া আছে চিঠিতে আর তাতেই ধরা পড়ছে অতি কঠিন অবস্থাতেও গণেশের তেজ আর আত্মবিশ্বাস। কিন্তু গণেশের বুদ্ধি বড় কম। যে দোকানে কাজ করে সেখানকার ঠিকানাটা শুধু না দিয়ে, যেখানে সে থাকে সে ঠিকানাটা তার দেওয়া উচিত ছিল।

বাড়ির দারোয়ানকে প্রশ্ন করে তার জবাব শুনে অজয় স্বস্তি বোধ করে। গণেশের বুদ্ধির ত্রুটিটাও মাপ করে ফেলে। বিদ্যুৎ লিমিটেডের মালিক এই বাড়িরই ওপরে থাকে এবং গণেশও তার কাছেই থাকে এ খবর জেনে যাদবেরাও নিশ্চিন্ত হয়।

রাণী বলে খুসী হয়ে, 'মা গো! ভড়কে গিয়েছিলাম একেবারে বাঁচা গেল।'

অজয় বলে, 'আমি তবে যাই এবার?'

যাদব গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ বাবু, আপনি এবার আসুন। অনেক করলেন মোদের জন্য।'

সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তার কৃতজ্ঞতাকে গ্রহণ করে অজয় নীরবে বিদায় হয়ে যায়।

যাদব আবেদন জানায় দারোয়ানকে, 'গণেশকে একবার ডেকে দেবেন দারোয়ানজী।'

দারোয়ানজী উদাস ভাবে বলে, 'ও হ্যায় কি বাহার গিয়া মালুম নেই। যাও না, উপর চলা যাও না?'

গণেশের বাড়ির লোক তার খোঁজ করতে এসেছে শুনে দাশগুপ্ত বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে আসে। গণেশের কথা কি বলবে মনে মনে তার ঠিক করাই আছে। দোকানের জিনিস নিয়ে গণেশ পালিয়েছে, চোর। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে, গণেশকে একবার ধরতে পারলে জেল খাটিয়ে ছাড়বে। এ-সব বলে ভড়কে দিতে হবে ওদের, যাতে কোন রকম হাঙ্গামা করতে সাহস না পায়। দাশগুপ্তের অবশ্য ভয়-ভাবনার কিছু আর নেই, তবু সামান্য হাঙ্গামাও সে পোয়াতে চায় না। গণেশের বোকার মতো গুলি খেয়ে মরার ব্যাপার নিয়ে। এমনিতেই সর্বদা তাকে ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকতে হয়। তার ওপর আবার গণেশের সম্বন্ধে খোঁজখবর-তদন্তের জন্য দশটা মিনিট সময় দিতে হবে ভাবলেও তার বিরক্তি বোধ হয়।

ফ্ল্যাটের সদর দরজার ঠিক সামনে ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা দাঁড়িয়েছিল। ভাইকে কাঁখে নিয়ে রাণী দাঁড়িয়েছে বাঁকা ও পরিস্ফুট হয়ে। তার দিকে নজর পড়তেই দাশগুপ্তের চোখ পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকে কয়েকবার দেখে নেয়, রাণীর মুখে যে মৃদু বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে তার চোখে ধরা পড়ে। চিন্তাধারা সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে শুরু করে দাশগুপ্তের। তাই গোড়াতেই প্রেস্টিজ হারাতে না চেয়ে সে ইচ্ছে করে মস্ত হাই তুলে মুখ-চোখের ভাব বদলে নির্বিকার গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলে।

'গণেশকে খুঁজতে এসেছো?'

যাদব বলে, 'আজ্ঞা হ্যাঁ। আছে না গণেশ?'

এ প্রশ্ন এড়িয়ে দিয়ে দাশগুপ্ত বলে, 'তুমি কে গণেশের?'

গণেশ চুরি করে পালিয়েছে বলে ওদের ভড়কে দিলে চলবে না, অন্য কিছু বলতে হবে। লাগসই কি বলা যায় দাশগুপ্ত ভাবতে থাকে।

'গণেশ আমার ছেলে বাবু। দেশ গাঁ থেকে আসছি আমরা।

'ও'। দাশগুপ্ত বলে উদাসভাবে, 'এখন তো গণেশ এখানে নেই।'

'কখন ফিরবে বাবু?'

'গণেশ কি জানো, ছুটি নিয়ে গেছে ক'দিনের। কোথায় যেন যাবে বলল, নামটা মনে পড়ছে না। কারা সব সঙ্গী জুটেছে, তাদের সঙ্গে গেছে। তিন-চার দিনের মধ্যেই ফিরবে।'

হাসপাতালে অথবা মর্গে যার মৃত-দেহটায় হয়তো এখন পচন ধরেছে,

অনায়াসে দাশগুপ্ত তার বাপ-মা-ভাইবোনদের জানায় সে ফিরে আসবে তিন-চার দিনের মধ্যে, এতটুকু বাধে না। তার ভাব ভঙ্গিটা শুধু রাণীর কাছে একটু কেমন কেমন লাগে।

'তবে তো মুশকিল। আমরা এখন যাই কোথা।' যাদব বলে হতাশ হয়ে।

'কোন খবর না দিয়ে কিছু ঠিক না করে এ ভাবে এলে কেন বোকার মতো?'

দাশগুপ্ত বলে রাগ আর বিরক্তি দেখিয়ে, কয়েক মুহূর্ত ভাববার ভান করে, তার পর যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, 'এইখানেই থাকো এখনকার মতো, কি আর করা যাবে।'

বলে সংযম হারিয়ে রাণীর ওপর একবার নজর না দিয়ে পারে না।

রাণী বলে, 'বাবা, বদ্যি মশায়ের ছেলে তো আছেন। তাঁর কাছে গেলে সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

যাদব ইতস্তত করে। কেশব বদ্যির ছেলে থাকে হাওড়ায়, আবার সেখানে ছুটবে এত পথ হেঁটে! গিয়ে যদি তাকেও না পাওয়া যায়, কি উপায় হবে তখন!

দাশগুপ্ত বলে, 'কোথায় যাবে আবার, এখানেই থাকো। একটা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি তোমাদের।'

রাণী বলে, 'বাব, শোন।'

যাদব কাছে এলে চুপি চুপি বলে, 'না বাবা, এখানে থাকা চলবে না। বাবু লোক ভাল না। মোর ভরসা হচ্ছে না মোটে। শেষ কালে গোলমাল হবে, চাকরিটা যাবে দাদার?'

যাদব তখন বলে দাশগুপ্তকে, 'আজ্ঞে, দেশের এক ভদ্দর লোক পত্র দিয়েছেন, আমরা তার ছেলের ওখানেই যাই। আপনার এখানে হাঙ্গামা করব না বাবু।'

'যা খুসী তোমাদের!' দাশগুপ্ত বলে।

সময়টা তার খারাপ পড়েছে সত্যি দাশগুপ্ত ভাবে।

ধীরে ধীরে আবার তারা পথে নেমে যায়। আবার দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে। স্টেশন থেকে এত দূর হেঁটে এসেছে, এবার স্টেশন পার হয়ে অনেক দূরে যেতে হবে। যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার তারা লালদীঘির দিকে চলতে আরম্ভ করে।

গণেশের মা বলে, 'ছুটি নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেল গণেশ? মোদের জানালো না কিছু চিঠিতে, কিছু বুঝি না বাবু ব্যাপার স্যাপার।'

'শহরে এসে স্যাঙাৎ জুটেছে ছেলের।' যাদব বলে ঝাঁঝের সঙ্গে।

'অমন কথা বলো না গণশার নামে। সে আমার তেমন ছেলে নয়।'

লালদীঘির দিকে বাঁক ঘুরবার মোড়ের কাছাকাছি এলে দূরাগত জনতার কলরব তাদের কানে ভেসে আসে।

লালদীঘির সামনা-সামনি পৌঁছে তাদের থামতে হয়। চারিদিক লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে এগোনো অসম্ভব। বিরাট এক শোভাযাত্রার মাথা লালদীঘির ওদিকের মোড় ঘুরছে, সামনে তিনটি তিন রকম বড় পতাকা উত্তুরে হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে। শোভাযাত্রার শেষ এখনো দেখা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনি উঠছে হাজার কণ্ঠে। এবার যাদবের মনে হয়, বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।

সামনে তারা দেখতে পায় অজয়কে।

মানুষ ঠেলে তারা অজয়ের কাছে যায়। যাদব ডাকে, 'বাবু।'

অজয় ফিরে তাকায় না। যাদব শুনতে পায় সে নিজের মনে বলছে: আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি আমরা এগিয়েছি!

ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দু'টি চোখ জলজ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে ছাখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।

আদায়ের ইতিহাস

এক

বৈশাখ মাসে ত্রিষ্টুপের জন্ম হইয়াছিল। ছাব্বিশ বছর পরে বৈশাখ মাসেই একদিন তার খেয়াল হইল, এ পর্যন্ত জীবনে সে পাওয়ার মত সে কিছুই পায় নাই।

সে দিনটা তার জন্মদিন নয়। জীবনের সর্বপ্রথম কান্না সে কোন্ মাসে কাঁদিয়েছিল, এটা তার জানাছিল বটে; কিন্তু তারিখের কোন হিসাব ছিল না। হিসাব থাকিলে জন্মদিনে মানুষ জন্মমৃত্যুর দুর্বোধ্য রহস্যের কথা হয়তো একটু ভাবে, মনের এলোমেলো খাপ্‌ছাড়া দার্শনিকতার কষ্টিপাথরে জীবনের দাম কষিবার সাময়িক ইচ্ছাও হয়তো একটু জাগে। ওসব সমস্যা নিয়া ত্রিষ্টুপ আজ মাথা ঘামাইতে বসে নাই। সাধারণ হিসাবে এমন কিছু ঘটেও নাই যে, মনটা তার খারাপ হইয়া যাইবে এবং মনে হইবে এ জগতে সবই ফাঁকি আর জীবনটা তার একদম ফাঁকা। আসলে সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া তখন সে সবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে।

তবে রাত্রে সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বড়ই খাপ্‌ছাড়া অদ্ভুত স্বপ্ন। তার ছেলেটি যেন মরিয়া গিয়াছে। ছেলের শোকে সে যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব টিটকারী দিয়া তাকে বলিতেছে, তার মত মানুষের কি ছেলের জন্য শোক করা উচিত। স্বপ্নে সে অবশ্য সকলের মনের ভাবটা চমৎকার বুঝিতে পারিয়াছিল। ছেলের শোকে পাছে সে পাগল হইয়া যায় অথবা সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় সকলে তার শোককে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতেছিল।

উদ্দেশ্য খুব ভালো সন্দেহ নাই। স্বপ্নে সে কারও উপর রাগ করে নাই, শুধু একটু সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া শোকের প্রকাশটা আরও জোরালো করিয়া তুলিয়াছিল। কেমন করিয়া সকলকে সে বুঝাইয়া দিবে যে, তারা

ভুল করিতেছে, এভাবে তার শোক শান্ত করা যাইবে না ; সকলে তার সঙ্গে একটু কাঁদিলেই বরং তার ব্যথা জুড়াইয়া যাইবে, ভাবিয়া স্বপ্নে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিবার পর সকলের উপর সে একটা তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিতেছে। স্বপ্ন মিলাইয়া গিয়াছে স্বপ্নে, এখন শুধু আছে একটা বেদনামাখা বিস্ময়কর ভার-বোধ এবং সকলের নির্মমতার বিরুদ্ধে অভিমান-ভরা নালিশ।

ছেলে তার নাই। এ পর্যন্ত বিবাহ সে করে নাই। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তার হাসি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নের কথা সে ভাবিতেছে না, স্বপ্নের প্রভাবটা শুধু তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

তার কেউ নাই। সকলে তার পর। তার কিছু নাই। কেউ তাকে কিছু দেয় নাই।

সংসার কলরব কানে আসিতেছিল। তাকে বাদ দিয়াই সকলে কলরব করিতেছে। স্বপ্নের মত সে যদি এখন শূন্যে মিলাইয়া যায়, কারও কিছু আসিয়া যাইবে না, এমনি ভাবে কলরব করিয়া চলিবে দিনের পর দিন। এ যে ছেলেমানুষী চিন্তা, ত্রিষ্টুপ তা বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু উপায় কি! চিন্তাগুলি আজ যেন স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, এতদিনের ধরা-বাঁধা পথে শিক্ষিত সৈন্যের মত সংস্কারগত নির্দেশের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে রাজী নয়। এ ধরনের আরও কত চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া তার মনে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সংযত করিবার কোন চেষ্টাই কাজে আসিল না।

সাত বছরের একটি মেয়ে দরজার ফাঁকে ডাক দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'বারোটা পর্যন্ত ঘুমাবে নাকি মামা, বিছানা ছেড়ে উঠবে না ?'

'এদিকে শোন, রাণু।'

রাণু নির্ভয়ে কাছে আসিল। মামা তাকে বড় ভালবাসে। হয় তো কাল রাত্রে বাড়ী ফেরার সময়ে তার জন্যে কিছু কিনিয়া আনিয়াছে, নয় তো তাকে একটু আদর করিবার শখ জাগিয়াছে মামার। মুখে প্রত্যাশার হাসি ফুটাইয়া রাণু কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র ত্রিষ্টুপ সজোরে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল!

'ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে, না ?'

এ তো আদর নয়, রাগের ভানে খেলার ছলে শাসন করা নয়। চমক ভাঙ্গিয়া আঘাতের বেদনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে রাণুর একটু সময় লাগিল। ততক্ষণে বিছানা হইতে নামিয়া ত্রিষ্টুপ গট্ গট্ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

একটি ছোট দোতলা বাড়ীর একতলায় তাহাদের অধিকার। ত্রিষ্টুপ ঘুমায়

বৈঠকখানায়। দিনের বেলা তার বিছানা ভিতরে টানিয়া আনা হয়, রাত্রে আবার বৈঠকখানায় চৌকিতে বিছানাটি পাতিয়া দেওয়া হয়। ঘরটিতে দোতলার ভাড়াটেদের ভাগ আছে ; দিনের বেলা ত্রিষ্টুপ একা ঘরটি দখল করিয়া থাকিলে তারা আপত্তি করে। সারাদিন একটি লোকও তাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসে কিনা সন্দেহ, তবু তারা সব সময়ে কোন এক অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করে এবং কেউ আসিয়া পাছে কিছু মনে করে, এই ভয়ে দিনের বেলা ত্রিষ্টুপের বিছানাটি চৌকীর উপর গুটাইয়া রাখিতেও দেয় না।

উঠানের এক কোণে তার দিদি প্রভা টিউবওয়েলে জল তুলিয়া বড় একটা বালতি ভরিতেছিল, ত্রিষ্টুপকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'রাণু কাঁদছে কেন রে ?'

ত্রিষ্টুপ গম্ভীর মুখে বলিল, 'মেরেছি।'

'কেন, কি করেছিল মেয়েটা ?' কৌতুহলের বশেই প্রভার কথাটা জিজ্ঞাসা করিল, অনুযোগের জন্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া ত্রিষ্টুপ যেন ক্ষেপিয়া গেল।

'অত কৈফিয়তে তোমার দরকার ? খুসী হয়েছে—মেরেছি।'

প্রভা খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া ভায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া রান্না ঘরে গিয়াই দাবী জানাইল, 'আমার চা কই ?'

মা খুন্তি দিয়া তরকারী নাড়িতেছিলেন, বলিলেন, 'এই যে করে দি। এত বেলা করে উঠলি, চা-ই বা খাবি কখন, চান করে খেতেই বা বসবি কখন। ওঁর সঙ্গে তো যেতে হবে তোকে ?'

'না।'

'তোর বুঝি দেরীতে অফিস ? তা হোক, ওঁর সঙ্গেই তুই যা বাবা, প্রথম দিনটা। তিনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারেন।'

'আমি চাকরী করব না।'

কথা শুনিয়া মা হাতের খুন্তি উঁচু করিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর পঁচাত্তর টাকা বেতনের এই চাকরীটি জুটিয়েছে, আজ তার ছেলে প্রথম চাকরীতে যোগ দিবার কথা, এখন সে বলিতেছে চাকরী করিবে না। প্রথমটা মা একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর মনে করিলেন তাই কি কখনও হয় ? ছেলে তার সঙ্গে দুষ্টামি করিতেছে।

'নে, খুব হয়েছে, আর ফাজলামি করে না! প্রভাকে ডাকতো, তোকে খেতে দিয়ে চা'টা করুক।'

গামছা কাঁধে ত্রিষ্টুপের বাবা অবিনাশ তেলের খোঁজে রান্নাঘরে আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, এখন আর চা খেতে হবে না, চান করে ফ্যাল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে, ন'টা পঁচিশের গাড়ীটা ধরতেই হবে। আজ ফিরিবার সময় মান্থলিটা করে ফেলিস কিন্তু, ভুলিস্ না।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'আমি যাব না বাবা।'

'যাবি না? যাবি না মানে?'

'চাকরী করা আমার পোষাবে না।'

অবিনাশ তেলের বাটি হইতে হাতের তালুতে তেল ঢালিতেছিলেন, খানিকটা তেল মাটিতে পড়িয়া গেল। মার হাতের খুন্তি আবার কড়াই-এর অনেকখানি উঁচুতে নিশ্চল হইয়া রহিল।

প্রথম কথা কহিলেন অবিনাশ।—'কি বলছিস্ তুই পাগলের মত?'

এমন সময় রাণুর হাত ধরিয়া প্রভা সেখানে আসিল। রাণুর গালে ত্রিষ্টুপের আঙুলের দাগ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, ঠিক স্বপ্নে ত্রিষ্টুপের ছেলের শোকে কাঁদার মত। প্রভার মুখ মেঘে ঢাকা আকাশের মত অন্ধকার। মেয়ের গালটি সকলের সামনে ধরিয়া সে বলিল, 'ত্থাখো বাবা, কেমন করে মেরেছে মেয়েটাকে। বেলা হয়ে গেছে, আজ আবার আপিস যাবে, আমি তাই মেয়েটাকে বলেছিলাম তোর মামাকে ডেকে দে তো রাণু। ও গিয়ে যেই ডেকেছে, অমনি মেরে একেবারে খুন করে দিয়েছে। ওর কি দোষটা? তোমরাই বল ওর দোষটা কি? বিশেষ দু'টি খেতে পরতে দিচ্ছ বলে—' প্রভা নিজেও ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রভার নালিশ ও কান্না সকলের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ বিচলিত কেউ হয় না। সারাদিনে অন্ততঃ একবার প্রভার নালিশ ও কান্না না শুনিলেই বরং সকলে একটু আশ্চর্য হইয়া ভাবে, কি হইয়াছে প্রভার আজ? তবে এক হিসাবে প্রভার মন খুব উদার, একটি ধমকেই সে সন্তুষ্ট হয়, কান্না থামিয়া যায়, ঘ্যান-ঘ্যান প্যান-প্যান করে না। কেবল ধমকটা দিতে হয় কতকটা এই ভাবে: চুপ কর প্রভা, কি বকছিস তুই পাগলের মত? তুই কি পর এসেছিস্ এ বাড়ীতে, কুটুম এসেছিস্?

আজ কেউ ধমক দিল না, কিছুই বলিল না। প্রভা আশ্চর্য হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তার মেয়ের গালে চড় মারার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে বুঝিতে পারা মাত্র কৌতূহলের বন্যায় অভিমান ভাসিয়া গেল।

'কি হয়েছে মা ?'

'হয়েছে আমার অদৃষ্ট আমার পোড়াকপাল !'

কি হইয়াছে বুঝা গেল না বটে, কিন্তু ভয়ানক কিছু যে সত্যই হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না প্রভার। ধৈর্য ধরিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ! জলভরা চোখের সে দৃষ্টি কামিনী বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, 'তিষ্টু চাকরী করবে না বলছে।'

'ও, এই ! তিষ্টু ফাজলামি করছে।'

প্রভার স্বামী রমেশের আজ চাকরী নাই তিন বছর, প্রভা ভাবিতেও পারে না মানুষ চাকরী পাইয়াও বলিতে পারে, সে চাকরী করিবে না।

বাপের সঙ্গে এ ধরনের ফাজলামি করা ত্রিষ্টুপের স্বভাব নয়, তবু অথই জলে পড়িলে মানুষ যেমন হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়াইয়া ধরে, অবিনাশ ও কামিনীও তেমনি প্রভার কথা শুনিয়া উৎসুকদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন আশ্চর্য কি, সকলকে একটু চমক দেওয়ার জন্য ত্রিষ্টুপ হয় তো ফাজলামিই করিতেছে। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল না, সে তখন অবাক্ হইয়া খোলা দরজা দিয়া ওদিকের রোয়াকে একটা তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিল। রোয়াকে একটি আধপোড়া বিড়ি পড়িয়াছিল, কোথা হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া রমেশ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিড়িটা কুড়াইয়া নিয়াছে। বিড়ি নিয়া রমেশ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, সেখান হইতে ডাক আসিল রাণুর। ঘরে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাণু ফিরিয়া আসিল।

'দেশলাইটা দাও না দিদিমা, বাবা চাচ্ছে।'

আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া খায়, তিন বছরে রমেশের এমন অবস্থা হইয়াছে ? প্রভার জন্য ত্রিষ্টুপ হঠাৎ গভীর মমতা বোধ করে। রমেশকে আজ আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া বেড়াইতে হয় বলিয়াই তো প্রভা সারাদিন নালিশ করিয়া কাঁদিবার অজুহাত খোঁজে। আর কয়েক বছর পরে দু'জনের অবস্থা কি দাঁড়াইবে কে জানে !

অবিনাশ আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, একবার একটু কাসিয়া বলিলেন, 'তা'হলে চান-টান ক'রে—'

'দাঁড়াও, আসছি।'

ত্রিষ্টুপ একেবারে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল, গলির মোড়ে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি করা উচিত তার একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে এখানে পলাইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ভাবিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না। দ্বিধা ও

সন্দেহে সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। মা ও বাবার জন্য, প্রভা রমেশের জন্য কিছুদিন চাকরী সে করিতে পারে, কিন্তু কেন করিবে? নিজের বিশ্বাস, আদর্শ আর নবলব্ধ প্রেরণা বলি দিয়া লাভ কি হইবে। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম বাধার কাছেই যদি সে হার মানে, অত বড় প্রতিজ্ঞা করার দরকার কি ছিল? মন যার এমন দুর্বল, তার অত বাহাদুরী করা কেন নিজের কাছে? খানিক আগে যে স্থির করিয়াছে সে চাকরী করিবে না, পৃথিবী রসাতলে গেলেও করিবে না, এত শীগ্‌গির তাকে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছে—চাকরী করিবে কি না, আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য! সে যে সত্যই অপদার্থ, এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কি আছে?

কিছুদিনের জন্য—? নিজের মনেই ত্রিষ্টুপ সংশয়ভরে মাথা নাড়ে। কিছুদিন পরে তো আর অবস্থা বদলাইবে না, বরং সে আরও জড়াইয়া পড়িবে। আজ চাকরী আরম্ভ না করা যত কঠিন মনে হইতেছে, কিছুদিন পরে চাকরী ছাড়া তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

তবে আর একটা কথা আছে। চাকরী না করিলেই বা এখন সে কি করিবে? বড় একটা আদর্শ সামনে খাড়া রাখিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া দিন কাটাইলে তো আর চলিবে না। নিজের জীবনকে সব দিক দিয়া সার্থক করিবার প্রতিজ্ঞা সে গ্রহণ করিয়াছে, মানুষ হিসাবে তার যা প্রাপ্য সব সে আদায় করিয়া ছাড়িবে, জগৎকে বুঝাইয়া দিবে তার কাছে আর ফাঁকি চলিবে না; কিন্তু সে সম্ভব করিবার জন্য সকলের আগে একটা উপায় তো তার খুঁজিয়া বাহির করা চাই? ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় স্থির করার সময় অবশ্য সে পায় নাই, কিন্তু সময় পাওয়ার পরেও যদি সে স্থির করিতে না পারে? যে পথে চলিলে নিচে নামিতে হইবে না, পিছনে হটিতে হইবে না আগাইতে আগাইতে সার্থকতায় পৌছিতে পারিবে, সে পথ যদি খুঁজিয়া না পায়? পথ খুঁজিয়া পাইলেও পথ ধরিয়া চলিবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে?

গভীর বিষাদ অনুভব করিতে করিতে নিজেকে তার বড় একা আর অসহায় মনে হয়। আর নিজের মত জগতের প্রত্যেক মানুষকে একা মনে হয় বলিয়া নিজেও অখণ্ড ও অবর্জনীয় একাকীত্বের বোঝা যেন দুঃসহ হইয়া উঠে। কত লোক চলিতেছে পথ দিয়া, কত চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে প্রত্যেকের মনে, কিন্তু কেউ কারও চিন্তার খবর রাখে না। কত কাছাকাছি সকলের দেহগুলি, তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া একটি দেহের সঙ্গে আর একটি দেহের কতবার ঠোকাঠুকি হইতেছে,

কিন্তু একজনের জগৎ কি এতটুকু কাছে আসিতেছে আর একজনের জগতের? এমন একটি মানুষও যদি থাকিত—যে তার আপন, যার সঙ্গে তার প্রকৃত যোগাযোগ আছে, হাসি-কান্না ছাড়াই যে বুঝিতে পারে সে সুখী কি দুঃখী, এখন তাকে সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত তার কি করা উচিত।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে ত্রিষ্টুপের মনে পড়িয়া গেল, সকালে সে চা খায় নাই, রীতিমত অস্বস্তিবোধ হইতেছে ; ডাইনে বিধুর চায়ের দোকান,—'স্বাধীন ভারত রেস্টুরেণ্ট'। এক কাপ চা খাইতে খাইতে আর একবার চাকরীর কথাটা ভাবিয়া দেখা যাক। তক্তার মত চ্যাপ্টা বিধুর করাতের মত দাঁতাল অমায়িক হাসির জবাবে একটু হাসিয়া, দেওয়ালে জরিপাড় শাড়ী পরা জগদ্ধাত্রীর ছবির পাশে পাকা ফলের মত টস্‌টসে ও গোলাকার উলঙ্গ জাপানী মেয়ের ছবির দিকে আনমনে চাহিয়া চুমুক দিতে দিতে চায়ের কাপ খালি হইয়া গেল, এলোমেলো ভাবনাগুলিকে কোনমতেই আয়ত্ত করা গেল না।

'কলেজ স্কোয়ারে সস্তায় পাওয়া যায়, তিষ্টু।'

মণীশ কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আলগোছে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়া আড়চোখে চাহিয়া আছে। জুতা আর চুলে চকচকে পালিশ, পাঞ্জাবির হাতা গিলাকরা, তলায় গেঞ্জি দেখা যায়, সোনার বোতামগুলি সাদা শূন্যতার মধ্যে টুকরো টুকরো সোনালী অলঙ্কারের মত।

'কি পাওয়া যায়?'

'চীন জাপানের মেয়ে—এদেশীও পাওয়া যায়। কষ্ট করে এখানে না এসে কয়েকটা কিনে এনে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখিস্‌, সারাদিন যত খুসী দেখতে পারবি।'

মনে মনে বিরক্ত হইলেও, ত্রিষ্টুপ একটু হাসিল।

তবে একটা বিয়ে করলে, অবশ্য সব হাঙ্গামা চুকে যায়। তাই কর না?'

এই ধরনের পরিহাস করিতে মণীশ খুব পটু। বোধ হয় সেই জন্যই মণীশকে সে পছন্দ করে না। মানুষটা মণীশ খারাপ নয় ; সাজসজ্জার দিকে তার অতিরিক্ত ঝোঁকটা ভাল না লাগিলেও, সেটা ত্রিষ্টুপ অপরাধ মনে করে না। মণীশের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, পড়াশোনাও সে অনেক করিয়াছে, ত্রিষ্টুপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না সব সময়ে সে কেন এমন বাবু সাজিয়া থাকিতে ভালবাসে। ত্রিষ্টুপের সবচেয়ে খারাপ লাগে মণীশের অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় আর সবজান্তার ভাব। কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না, সমস্তই তার কাছে যেন তুচ্ছ। রাজপুত্রের বেশে এই নোংরা চায়ের দোকানে চা খাইতে আসিয়া এখানকার সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে সমানভাবে হাসিগল্প করা

আর ছেঁড়া জামা গায়ে চৌরঙ্গীর বড়-সাহেবী হোটেলে খানা খাইতে গিয়া বড় বড় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যেন তার কাছে সমান। মাঝে মাঝে সে এখানে আসে, বিনা চেষ্টাতে সকলের সঙ্গে মিশ খাইয়া যায়, তবু যেন একটা দূরত্ব ও ব্যবধান কোন সময়েই ঘোচে না। ঠিক অহঙ্কার নয়, মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করা নয়, এমন একটা নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ করিয়া চলা···প্রতিবেশীর নিন্দায়, গুজবের সৃষ্টিতে, ঘরের ব্যাপারে সঙ্গে মিশাইয়া পৃথিবীর রাজনীতির আলোচনায়, তর্কে আর কলহ-বিবাদে সকলে যখন মসগুল হইয়া যায় মণীশ তাহাতে যোগ দিতে কসুর না করিলেও, ত্রিষ্টুপের মনে হয় সকলের ছেলেমানুষীতে সে তলে তলে নিছক আমোদ উপভোগ করিতেছে।

দু'দিন আগে বিকেলবেলা পরিতোষ আসিয়াছিল, শোকে মুহ্যমান পরিতোষ। একটি চেয়ারও খালি ছিল না, সকলের আগে নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মণীশ তাহাকে বসিতে দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তার মুখে এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। মুখ দেখিয়া বরং মনে হইয়াছিল, সে বুঝি ভাবিতেছে অনেক দূরে নৌকাডুবিতে এক পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে, এখানে একটা মানুষ আধ-মরা হইয়া যায় কেন!

ভালো লাগে না, কিন্তু মণীশকে তুচ্ছও সে করিতে পারে না। সময়ে সময়ে ত্রিষ্টুপের মনে হয়, আসলে এটা তার ভাল না-লাগা মোটেই নয়, আর দশজনের মত মানুষের সুখ দুঃখ মানুষটাকে বিচলিত করে না বলিয়া তার অভিমান হইয়াছে, তার প্রতিকারহীন অভিমানের জ্বালাকে মনে হইতেছে বিরাগ।

'মনটা ভাল নেই, মণীশদা।'

'মন ভাল নেই? সে কি কথা? মন খারাপ করেছ কেন?'

'আমি করিনি। ব্যাপারটা শুনুন—'

মণীশ শুনিয়া যায় আর শুনিতে শুনিতে তার মুখ গম্ভীর হওয়ার বদলে যেমন ছিল তেমনি থাকে, হাসি হাসি ভাবটুকু পর্যন্ত মিলাইয়া যায় না। দেখিয়া ত্রিষ্টুপের ভাল-না-লাগা অথবা অভিমান উথলিয়া উঠিতে থাকে।

কথা শেষ করিয়া ঝাঁঝালো স্বরে সে তাই জিজ্ঞাসা করিল 'হাসবার কি হ'ল?'

মণীশ বলিল, 'হাসি নি। চাকরী করতে চাওনা বলছ, বড় কিছু করতে চাও। কি করবে সেটা এখনো ঠিক করো নি। তা যতদিন সেটা ঠিক করতে পারছ না ততদিন চাকরীটা করলে হত না? কিছু পয়সা জমাতে পারলে বড় কিছু আরম্ভ করতে একটু সুবিধা হবে।'

'কিছুদিন চাকরী করলে যদি—'

'ও ভাবে যদির কথা ভাবলে কিছু হয় না ত্রিষ্টু। প্ল্যান করবার সময়ে সমস্ত যদির হিসাব করতে হয়—যদি এরকম হয়, তবে এই ব্যবস্থা করতে হবে, যদি ওরকম হয়, তবে ওরকম ব্যবস্থা করতে হবে; ব্যাস, সেইখানে যদির শেষ। যদি এ রকম না হয়ে ও রকম হয়, ভেবে প্রথমেই ভড়কালে তো চলে না! তা'ছাড়া, কিছুদিন চাকরী করে, সময়মত চাকরীটা ছাড়বার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে—বড় কিছু করবার ক্ষমতা তোমার নেই। চাকরী করে যাওয়াটাই তখন সব চেয়ে ভাল হবে তোমার পক্ষে।

'কিন্তু চাকরী করলেই জড়িয়ে পড়ব যে। বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে চাকরী নেওয়ার মানেই দাঁড়াবে—'

'বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে চাকরী নেবে কেন? নিজের জন্য চাকরী নেবে, বড় কিছু করবার অঙ্গ হিসাবে চাকরী নেবে। কি করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি, চাকরী করে যা পারি উপার্জন করা যাক—এই ভেবে চাকরী নেবে। বাড়ীর লোকের মুখ চেয়ে বড় কিছু করা যায় না, ত্রিষ্টু। সাক্‌সেসের জন্য স্বার্থপর না হলে চলে না। অবশ্য বাড়ীর লোকের মুখ কেন, পৃথিবীর লোকের মুখ চাইতে কোন বারণ নেই, সকলকে বঞ্চিত করে নিজের সুখ খোঁজার স্বার্থপরতার কথা বলছি না —সাক্‌সেসের পথে বিঘ্ন হিসাবে যা কিছু দাঁড়াবে, সে সমস্ত বিসর্জন দেওয়ার কথা বলছি। যেমন ধর—তুমি যেদিন চাকরীটা ছেড়ে দেবে, বাড়ীর লোক সেদিন কেঁদে-কেটে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে, তুমিও তাদের সঙ্গে কাঁদবে, অন্ততঃ মনে মনে কাঁদবে। কিন্তু ভাববে, কাঁদুক, উপায় কি!'

সাড়ে দশটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বাড়ী ফিরিল। অবিনাশ রান্নাঘরের দরজার কাছে মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন; তখন পর্যন্ত তিনি স্নান করেন নাই।

'আপিস যাওনি যে?'

'লজ্জা করে না তোর? যোয়ানমদ্দ তুই ঘরে বসে থাকবি, বুড়ো বয়সে আমি খেটে মরব? তুই যদি না যাস, আমিও আর যাব না।'

'চল, চল আমি যাচ্ছি।'—এক থাব্‌লা তেল নিয়ে মাথায় ঘষিতে ঘষিতে ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল।

বড়বাবু পদ্মলোচন অভিমান করিয়া বলিলেন, 'প্রথম দিনটাতেই দেরী হ'ল!'

অবিনাশ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, 'মন্দিরে একবার পুজো দিতে গিয়ে—'

পদ্মলোচন তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, 'তা বেশ, তা বেশ।'

ত্রিষ্টুপ অবাক্ হইয়া দু'জনকে দেখিতে থাকে। একজন অনায়াসে মিথ্যা-কথাটা বলিয়া ফেলিল; পূজো দিতে গিয়া আপিস পৌঁছতে দেরি করার জন্য বিরক্ত হইলে পাছে অপরাধ হয়, এই ভয়ে আর একজনের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে উপিয়া গেল। দু'জন সমবয়সী নিরীহ গোবেচারী মানুষ, জীবনটাও হয়তো দু'জনের একই ছাঁচে ঢালা—পরীক্ষা পাস, চাকরী ও সংসার—কিন্তু একজন মন্দিরের নামে মিথ্যা বলিতে ভয় পায় না, আর একজন মন্দিরের নাম শুনিলেই ভড়কাইয়া যায়।

আপিস ত্রিষ্টুপের অপরিচিত নয়, আগে মাঝে মাঝে দরকার পড়িলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; চাকরী হওয়ার সময়ে বিনা দরকারেই ঘনঘন অনেকবার আসিয়াছে। অনেকের সঙ্গেই তার চেনা ছিল, অবিনাশ আরও কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন—প্রত্যেকের ভদ্রতা ও শুভ কামনার জবাবে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, 'আপনার দয়া।'

বাড়ী ফিরিবার সময়ে ট্রামে ও ট্রেনে অবিনাশ ছেলেকে অনেক রকম উপদেশ দিলেন, আপিসে কোন্ লোকটা ভাল আর কোন্ লোকটা বজ্জাত মুখে মুখেই তার লম্বা তালিকা শুনাইয়া দিলেন; কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হইবে তাও বুঝাইয়া দিলেন।

'—আস্তে আস্তে ডিপ্লোমেসী শিখতে হবে, নইলে উন্নতির কোন আশা নেই বাপু! দেরী করার জন্য পদ্মলোচন চটে ছিল, দেখলি তো কেমন সামলে নিলাম?' —অবিনাশ সগর্বে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন—'অন্য কেউ হলে কেঁউ কেঁউ করত, ব্যাটা আরও চটে যেত, আমি তো জানি কত ধানে কত চাল, এমন কৈফিয়ৎ দিলাম যে আর টুঁ-শব্দটি করতে পারল না!—একটু থামিয়া উপসংহার করিলেন, তবে লোকটা সত্যি ধার্মিক। মন্দির দেখলেই আধঘণ্টা ধরে প্রণাম করে।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'আর প্রার্থনা করে, আমার মাইনে বাড়ুক?'

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'সে তো সবাই করে!'

বিধুর চায়ের দোকানে মণীশ বসিয়াছিল। সূর্য চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এত আগে মণীশ কখনও বিধুর চায়ের দোকানে আসে না।

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'তুমি এগোও বাবা, আমি আসছি।'

চায়ের দোকানে ঢুকিতে যাইতেছে দেখিয়া অবিনাশ শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'খালি পেটে চা খেও না ত্রিষ্টু।'

ত্রিষ্টুপ মাথা নাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণীশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল তিষ্টু?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'কেমন যেন লাগল মনিদা।'

'কেমন লাগল বুঝতে পারছ না? তার মানে ভালও লাগেনি, খারাপও লাগেনি।'

'সব যেন কেমন খাপছাড়া মনে হল।'

মণীশ মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, 'বোস, চা খাও।'

ত্রিষ্টুপ দ্বিধাভরে বলিল, 'খালি পেটে—'

মণীশ হাসিল, 'পেট খালি থাকবে কেন? চপ খাও কাটলেট খাও, টোস্ট খাও,—বাড়ীর খাবার না হলে কি তোমার পেট ভরে না?'

মণীশের কাছে চিরদিন নিজেকে ত্রিষ্টুপের ছেলেমানুষ মনে হয়, আজ আরও বেশী মনে হইতে লাগিল। একটু শ্রান্তিও সে বোধ করিতেছিল, শারিরীক নয়, মানসিক শ্রান্তি।

সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তবু সকালবেলায় লড়াই-এর জের যেন এখনও মেটে নাই, কেবলি মনে হইতেছে, সে যেন সন্ধি করিয়াছে হার মানার ভয়ে। কেমন একটা অনির্দিষ্ট ভাবে নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছে।

'থাক্, দোকানের খাবার খেতে হবে না তিষ্টু। আমার বাড়ীতে কিছু খাবে চল।'

'আপনার বাড়ীতে মণীশদা? খাবার-টাবার করার হাঙ্গামা—'

'হাঙ্গামা আর কিসের? খাবার তৈরী হয়েই আছে, চা'টা শুধু করতে হবে।'

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।—'এস।'

মণীশের বাড়ী বেশ দূরে নয়, দু'চার বার ত্রিষ্টুপ তার বাড়ীতে গিয়াছে। আগে কোনদিন মণীশ তাকে ভিতরে ডাকে নাই, আজ একেবারে দোতলায় তার নিজের ঘরে নিয়া গেল।

'বস তিষ্টু।'

একটা রঙ্চটা কাঠের চেয়ারে বসিয়া ত্রিষ্টুপ বিস্ময়ের সঙ্গে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এ ঘর যে মণীশের, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। যার মাথার একটি চুল সে কোনদিন স্থানভ্রষ্ট দেখে নাই, তার ঘরে এমন বিশৃঙ্খলা এমন দারিদ্র্যের ছাপ। টেবিলে আর টেবিলের নিচে বই গাদা করা, এক কোণায় জমা করা কতকগুলি ইংরাজী বাংলা সাময়িক পত্রে ধুলা জমিয়া আছে, ট্রাঙ্কও স্যুটকেশটির রঙ বিবর্ণ,

অনেক দিনের পুরানো খাটের বিছানার চাদরটা ময়লা। নূতন সোফা-টেবিলে জমকালো বাহিরের ঘর পার হইয়া বাড়ীর ভিতরের গরীবানা অপরিচ্ছন্ন চেহারা দেখিয়াই ত্রিষ্টুপ একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, মণীশের নিজের ঘর দেখিয়া সে একেবারে থ বনিয়া গেল।

তাকে বসিতে বলিয়াই মণীশ বাহির হইয়া গিয়াছিল একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিল। আরও খানিকক্ষণ পরে দু'হাতে দুটি থালায় লুচি আর তরকারি নিয়া একটি মেয়ে ঘরে আসিল।

মেয়েটিকে ত্রিষ্টুপ কলকতায় বাসন মাজিতে দেখিয়াছিল।

দুই

মণীশের বোনের নাম কুন্তলা। বিবাহ-দেওয়া-দরকার বয়স হইয়াছে—দু-এক বছর বেশীই হইয়াছে। এই বয়সে সময় হিসাবে দু-এক বছর যে কত দীর্ঘ আর অ-তুচ্ছ কে তা না জানে? দাদা যে ত্রিষ্টুপকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়াছে কেন সেটুকু বুঝিবার মত আর বুঝিয়া যে জোরালো লজ্জা সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া দিতে চায়, সেটা জোর করিয়া লুকাইয়া রাখার চেষ্টা করার মত জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কুন্তলার জন্মিয়াছে।

প্রথমটা তাই ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, মেয়েটা বুঝি একটু পাকা। তারপর দু-চার দিনেই এ ভুলধারণা তার ঘুচিয়া গিয়াছে। কুন্তলার চাল-চলন কথা-বার্তায় যেটুকু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়িয়াছিল, এখনও কিছু কিছু ধরা পড়ে, সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এই বয়সের দেয়াল-চাপা ভীরু মেয়ের পক্ষে ওটুকু অস্বাভিকতাই স্বাভাবিক। তৃতীয়বার কুন্তলা যখন খাবারের থালা হাতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন ত্রিষ্টুপের খেয়াল হইয়াছিল যে বেচারী জানে, তাকে পছন্দ করাইতে পারিলে সে তাকে বিবাহ করিলেও করিতে পারে! পঞ্চম বার মণীশের বাড়ীতে গেলে কুন্তলা যখন চলনসই কাঁপা গলায় রবিবাবুর একটি গান শুনাইয়াছিল তখন ত্রিষ্টুপের অরেকটা বিষয় খেয়াল হইয়াছিল; তার মন ভুলানোর চেষ্টার মত কিছু পাছে বলিয়া বা করিয়া বসে এই ভয়ে কুন্তলা বড়ই কাবু হইয়া গিয়াছে।

ত্রিষ্টুপ মমতা বোধ করে। ভাবে যে মণীশের বাড়ীতে আর আসিবে না। এভাবে মেয়েটাকে পীড়ন করা, তার মনে মিথ্যা আশা জাগিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। কেবল কুন্তলা নয়, মণীশও তো অনেক কিছু আশা করিতেছে। তাকেও এ আশা পোষণ করিয়া চলিতে দেওয়া অন্যায় হইবে বৈকি।

আগে হইতে যদি মণীশের বাড়ীতে তার যাতায়াত থাকিত, তবে কোন কথা ছিল না। চাকরী হওয়ার পর তার কাছে বোনকে গছানোর ইচ্ছা মণীশের জাগিয়াছে টের পাইয়াও ওদের বাড়ী যাওয়া আসা বজায় রাখা দোষের হইত না। কিন্তু চাকরী আরম্ভ করার দিন তাকে বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়া গিয়া কুন্তলার সঙ্গে চয় করাইয়া দেওয়ার মধ্যে মণীশ তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট রাখে নাই। জানিয়া নিয়া এখন ঘন ঘন মণীশের বাড়ী যাওয়া চলে না।

কিন্তু দু'দিন যাওয়া বন্ধ রাখিয়াই ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, কাজটা সহজ নয়। সন্ধ্যার পর মণীশের ছোট ভাই ক্ষিতীশ আসিল। কুন্তলা নয়, মণীশের মা নিজে পিঠা তৈরী করিয়াছেন, এখনও ত্রিষ্টুপ যায় নাই কেন? অবিলম্বে ক্ষিতীশের সঙ্গেই সে যেন গিয়া হাজির হয়।

'ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে, চলুন শীগগির।'

ত্রিষ্টুপের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

– 'ক্ষিতু, তোমাকে কে বলল ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে?'

ক্ষিতীশ একটু ভড়কাইয়া গেল, বড় বড় চোখ মেলিয়া ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'আমি দেখে এলাম যে?'

'ও তুমি দেখে আসছ। দাদা বলতে বলে নি, না?'

ক্ষিতীশ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'দাদা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।'

'কেন?'

ক্ষিতীশের মুখে এবার একটু হাসি দেখা দিল। বড়রা কি বোকার মত কথা বলে!

'পিঠে খাবার জন্য।' ছোড়দি কি বলে জানেন? আপনি শুধু পিঠে খেতে পারেন, আর আমি পারি। দু'টো তিনটের বেশী খেলেই দাদার অসুখ করে।'

এতক্ষণে ত্রিষ্টুপের গাম্ভীর্য কাটিয়া গেল। মনে মনে সে রীতিমত লজ্জাই বোধ করিতে লাগিল। পছন্দ হইলে কুন্তলাকে সে বিবাহ করিতে পারে ভাবিয়া বোনের সঙ্গে তার মেলামেশার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও তাকে গাঁথিবার জন্য চালবাজী

আরম্ভ করিয়া ব্যাপারটাকে কুৎসিৎ করিয়া তুলিবার মানুষ মণীশ নয়। তার নিজের মনটাই বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তাকে পিঠা খাওয়ানোর জন্য কুন্তলা তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে; হয়তো পরণে ছেঁড়া ময়লা শাড়িখানি বদলাইয়া একখানা ফর্সা শাড়ী পরিয়াছে—সস্তা সাধারণ শাড়ী, পাছে সে মনে করে যে তার জন্যই সাজগোজ। একবার ত্রিষ্টুপের মনে হইল, পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণটা রাখিয়া আসে। একেবারে যাওয়া বন্ধ না করিয়া ধীরে ধীরে কমাইয়া আনাই কি ভাল নয়? দু'দিন যায় নাই, আজ যখন ক্ষিতীশ ডাকিতে আসিয়াছে, আজ একবার গেলে কি আসিয়া যাইবে? আবার চার পাঁচ দিন একেবারে না গেলেই চলিবে। তারপর ত্রিষ্টুপ ভাবিল, না, আজ না যাওয়াই ভালো। যাওয়ার ইচ্ছাটা তার নিজেরই আজ বড় বেশী জোরালো হইয়া উঠিয়াছে, যাওয়ামাত্র সকলে তার আগ্রহ টের পাইয়া যাইবে। কাল পরশু বরং দশ মিনিটের জন্য গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, কতকটা ভদ্রতা রক্ষার জন্য দেখা করার মত। আজ নয়।

'আমার শরীর তো আজ ভালো নেই ক্ষিতু, কি করে যাব?'

'অসুখ করেছে?'

'হ্যাঁ, অসুখ করেছে।'

ক্ষিতীশ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলে ত্রিষ্টুপ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মিথ্যা অজুহাতে ক্ষিতীশকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নয়, যায় নাই বলিয়া কুন্তলা ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াও নয়, মণীশের বাড়ীর আকর্ষণ অনুভব করিয়া। এত অল্প সময়ের মধ্যেই কুন্তলা যদি তার মনকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে; নিজের সম্বন্ধে তবে আর আশা ভরসা করিবার কিছুই নাই।

আধ ঘণ্টা পরে মণীশ আসিল।

'কি হয়েছে তিষ্টু?'

'এমনি শরীরটা একটু—'

'বিশেষ কিছু নয় তো? তবে এসো—দু'টো একটা পিটে তোমায় খেতেই হবে ভাই। কাল থেকে আয়োজন করে পিঠে তৈরী হয়েছে, তুমি চেখে দেখে সার্টিফিকেট না দিলে কেউ খুসী হবে না।'

সুতরাং ত্রিষ্টুপ গেল। আগের দিন সহরের অন্য প্রান্ত হইতে স্বামী ও দুটি মেয়েকে নিয়া কুন্তলার দিদি বাপের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। পিঠার আয়োজনটা হইয়াছে ওদের জন্যই, ত্রিষ্টুপের জন্য নয়।

কুন্তলার দিদি রমলাকে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল। কুন্তলার চেয়ে সে বয়সে চার পাঁচ বছরের বড়, সাত বছর আগে তার বিবাহ হইয়াছে এবং মেয়ে হইয়াছে দু'টি; তবু প্রথমবার তার দিকে তাকাইয়া ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, কুন্তলাই বুঝি শাড়ী গয়না পরিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া বৌ সাজিয়াছে। যমজ না হইয়াও যে দুটি বোনের চেহারায় এত মিল থাকিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

কেবল বাহিরের নয়, দুজনের ভিতরের মিলটাও যে বিস্ময়কর, প্রথমে ত্রিষ্টুপের কাছে তা ধরা পড়ে নাই। কুন্তলা ভীরু লাজুক নম্র; রমলা হাসি-খুসী, মিশুক, কথা বলিতে পটু। সাত বছরের বিবাহিত জীবন অধিকাংশ মেয়েকেই ভোঁতা করিয়া দেয়, রমলার বেলা ফলটা হইয়াছে যেন ঠিক তার উল্টা। তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ হইয়াছে, জীবনীশক্তি বাড়িয়াছে, আনন্দ আহরণের ক্ষমতা বাড়িয়াছে। স্ফূর্তি আর উৎসাহের জন্য যেন বিশেষ উপলক্ষ্য দরকার হয় না, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উৎসবের প্রেরণা যেন সঞ্চিত আছে, চয়ন করিয়া নিলেই হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে দুজনের এতখানি পার্থক্য সত্ত্বেও মিলটা ত্রিষ্টুপের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, কুন্তলার সঙ্গে রমলার শুধু বিকাশের পার্থক্য—কিশোরীর সঙ্গে যুবতীর। যে কথায় কুন্তলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিতেছে, সেই কথাতেই রমলা হাসিয়া উঠিতেছে উচ্ছ্বসিত ভাবে, যে মমতায় কুন্তলা কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়া সন্তর্পণে তার গালে চুমা দিয়া বলিতেছে, কেঁদো না, সেই মমতাতেই রমলা বড মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া দলিয়া মলিয়া তাকে বুকের সঙ্গে যেন মিশাইয়া দিতে চহিয়া বলিতেছে, 'কাঁদে না যাদু, মামা বাড়ী এসে কি কাঁদতে আছে রে দুষ্টু পাজী সোনা?'

যে সুখ দুঃখের হিসাব কুন্তলা ভবিষ্যতের কল্পনায় জমা রাখিয়া ভাবিতেছে, কে জানে আমার কপালে কি আছে, সেই সুখ-দুঃখের স্বাদ নিতে নিতে রমলা ভাবিতেছে কে জানে আমার কপালে এত সুখ টিকিবে কিনা! রমলা সত্য সত্যই সুখী। কেবল নিজে সে সুখী হয় নাই, আরেক জনকেও সুখী করিয়াছে। রমলার স্বামী ধীরেনের শান্ত, পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপের হঠাৎ এক সময় মনে হয় জীবনের হিসাব নিকাশের অঙ্ক-শাস্ত্রটাই কি তবে তার ভুল? তিরাশী টাকার একজন কেরাণী এমন সুখী হইল কি করিয়া?

তিন

ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে—এটা সে পছন্দ করিতে পারিতেছে না। মানুষকে দেখিয়া কোথায় সে নিজেও সুখী হইবে, তার বদলে মন তার বিরূপ হইয়া পড়িতেছে—তিরাশী টাকার কেরাণীর জীবনে সুখ-শান্তির অস্তিত্ব মানিতে সে রাজী নয়। দেখিয়া যা মনে হইতেছে তা সত্য নয়, আসলে এদের দুজনের জীবন দুঃখময়—এ ধারণা সে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

কদিন এদের কথাই সে ভাবিয়া যায়। চিন্তাধারার প্রতিবাদের মত, অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমের মত দুজনে তাকে পীড়ন করিতে থাকে। চারিদিকে সে দেখিতে পায় মানুষের মুখে দুঃখের কালো ছায়া, দেহে ক্ষয়, জীবনে অপচয়, সঙ্কীর্ণ, নিঃস্ব আবেষ্টনীর পেষণ। এই পরিচয়েরই ছাপমারা তার বর্তমান। তাই তো সে ভবিষ্যৎ রচনা করিতে চায়। আজ কিছু নাই, কাল ঐশ্বর্য চাই। এই অবস্থায় ধীরেন ও রমলা আবার কি ধাঁধাঁ সৃষ্টি করিল।

মণীশকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'ধীরেনবাবু বেশ লোক না?'

'হ্যাঁ ও ভালো মানুষ, খাঁটি।'

মণীশের কথার মানে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল কয়েক দিন পরে। নিজেদের সংসারে ধীরেন ও রমলাকে দেখিয়া আসিবার ইচ্ছাটা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। রবিবার বিকালে সে সহরের এক প্রান্তে তাদের ছোট একতলা বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল।

আগের দিন প্রথম রাত্রে অসময়ের ঝড় উঠিয়াছিল। ঝড় উঠিলে, ত্রিষ্টুপ গভীর উল্লাস বোধ করে। ঝড়ের বেগে বাড়ীর কাছে সিধা তরুণ আমলা গাছটি যত বাঁকা হইয়া যায়, তার বাঁকা মন যেন অনির্বচনীয় পুলকে ততই খাড়া হইয়া ওঠে। এই সতেজ গর্বিত আনন্দে সাপের মত মনের কোন অন্ধকার কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে, সাপুড়িয়ার বাঁশীর মত ঝড়ের সাঁ-সাঁ আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া ফণা উঁচু করে। ঝড় থামিয়া যাওয়ার পরেও এই উত্তেজনার প্রভাব মিলাইয়া যাইতে কয়েকদিন সময় লাগে, ত্রিষ্টুপের অনুভূতি রসে ভিজিয়া সজীব হইয়া থাকে।

ধীরেনের বাড়ীর অবস্থানটি ত্রিষ্টুপের ভারি ভাল লাগিল। এ সহরতলী

পুরানো, সহরের পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনের নূতন সৃষ্টি হয় নাই। পুরানো বাড়ীগুলি এলোমেলো ভাবে বসানো, রাস্তা আঁকাবাকা। আগাছাভরা বাগানের কয়েকটি টুক্‌রা এখানে ওখানে বসানো আছে। ধীরেনের বাড়ীর অদূরে পানার আস্তরণ বিছানো একটি পুকুর। কাছে ও দূরে অনেক নারিকেল গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তায় ছোট ছেলেদের মার্বেল খেলায়, বাড়ীর সামনে রোয়াকে বসিয়া বড় ছেলেদের জটলা করায়, উবু হইয়া বসিয়া এক প্রৌঢ়ের হুঁকা হাতে তামাক খাওয়ায়, ছেলে কোলে এক বাড়ীর দুয়ার হইতে বাহির হইয়া একটি আধ ময়লা শাড়ী পরা তরুণীর আরেক বাড়ীর দুয়ারে ঢুকিয়া পড়ায়, তার এখনকার শান্ত মানসিক অবস্থার সঙ্গে কেমন একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে।

বাড়ীর ভিতরে গৃহসজ্জার মধ্যেও একটি সর্বাঙ্গীন সঙ্গতি তার বড়ই তৃপ্তিকর মনে হইল। এ সব সংসারে বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশী চোখে পড়ে অসঙ্গতি। ভাঙ্গা চৌকীর পাশে মস্ত দামী ড্রেসিং টেবিল, পেরেক মারা কাঠের চেয়ারের পিঠে রঙীন সুতার কাজ করা খোল, দামী ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রের পাশে আঠা দিয়া দেয়ালে আঁটা মাসিকের ছবি, ময়লা বিছানার চাদরে ধবধবে পরিষ্কার ওয়ার-পরানো তেল-চটচটে বালিশ, পিঁড়ির সঙ্গে কার্পেটের আসন, সযত্নে সাজানো জিনিষের একটি তাকের নিচেই অযত্নে ছড়ানো জিনিষের আরেকটি তাক। এ বাড়ীর গৃহোপকরণে সেই বিসদৃশ বিরোধ নাই, চারিদিকে ছড়ানো একটি বিস্ময়কর সাম্যের ভাব দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়।

ত্রিষ্টুপের মনে হয়, এ ঘর যারা সাজাইয়াছে তাদের সত্যই বুদ্ধি আছে। অতিরিক্ত ঝকঝকে কিছু তারা চায় নাই বলিয়া একেবারে রঙচটা কিছু তাদের রাখিতে হয় নাই। তিনটি ভাঙ্গা চেয়ারের মধ্যে একটি খুব দামী চেয়ারে তাকে বসানোর গৌরব বাতিল করিয়া দিয়াছে বলিয়া চারটি সাধারণ শক্ত চেয়ারের যে কোন একটিতে তাকে নিশ্চিন্ত মনে বসিতে বলিতে পারিয়াছে।

ধীরেন ও রমলা যে আগ্রহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাইল, ত্রিষ্টুপের বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িল যে, তার সবটাই আন্তরিক। তার সঙ্গে এদের পরিচয় শুধু একদিনের রমলা একবার শুধু তাকে বলিয়াছিল, সে এ বাড়ীতে আসিলে তারা খুসী হইবে। ভদ্রতা করিয়া ও কথা কে না বলে? ওই আহ্বানেই কেউ বাড়ীতে আসিলে, ভদ্রতা করিয়া কে না খুসী হয়? কিন্তু সে আসায় সত্য এদের যেন আনন্দের সীমা নাই। তার এই অনুগ্রহে তারা যেন কৃতার্থ হইয়াছে।

রমলা বলিল, 'আপনি এক দিন আসবেন জানতাম।'

'কি করে জানতেন?'

'অনেকে বলে যায়, কিন্তু আসে না। দু'চার মাস পরে দেখা হলে বলে, সময় পাইনি, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, এবার একদিন নিশ্চয় যাব। আপনি তাদের মত নন। সেদিন কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া রমলা বসিয়াছে, বড় মেয়েটি চেয়ার ঘেঁসিয়া মার পিঠে এক হাত রাখিয়া শান্ত কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রমলার ভাব দেখিলে সত্যই মনে হয়, ত্রিষ্টুপ আজ ঠিক এইসময়ে আসিবে জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আগে হইতেই সব কাজ, সব হাঙ্গামা চুকাইয়া রাখিয়াছে। অন্য সমস্ত বিষয়ের চিন্তা সে এখনকার মত মনের একপাশে সরাইয়া দিয়াছে, তার সবটুকু মনোযোগ এখন অভ্যাগতের প্রাপ্য। সংসারের কোন কাজ, কোন দায়িত্ব যাদের নাই, বাড়ীতে কেউ আসিলে তাদেরও ত্রিষ্টুপ এমন স্থির শান্ত একাগ্রভাবে কখনও এক মিনিট আলাপ করিতে দেখে নাই, প্রতি মুহূর্তে রমলা যেন তার আত্মমর্যাদা বাড়াইয়া দিতে থাকে। একজনের প্রথম বাড়ীতে আসার অপরিহার্য অস্বস্তি ও সঙ্কোচ আপনা হইতে যেন কোথায় মিলাইয়া যায়।

আজ ত্রিষ্টুপ প্রথম বুঝিতে পারে— অন্যে তুচ্ছ করিলে নিজের কাছে মানুষ কি ভাবে তুচ্ছ হইয়া যায়, অন্যে দাম দিলে কিভাবে দাম বাড়ে। জীবনকে রমলা শ্রদ্ধা করে। ধনীকে নয়, মানীকে নয়, গুণীকে নয়, জীবনের প্রতীক মানুষকে সে সম্মানের অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে। তার কাছে থাকিলে ব্যর্থতার ক্ষোভ মানুষের তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ, কিছু না বলিয়াও সে যেন ক্রমাগত বলিতে থাকে, ব্যর্থতা ও সার্থকতার চেয়ে মানুষ অনেক বড়, যে অবস্থায় জীবন যাপন করুক, মানুষ চিরদিনই মানুষ।

রাত প্রায় আটটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বিদায় নিল। পথে এবং বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে ঘুম আসা পর্যন্ত এই নূতন অভিজ্ঞতাই সে মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তিরাশী টাকার এক কেরাণীর জীবন রমলা সুখে ও শান্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। অপূর্ণতা তাকে পীড়ন করে না, রমলা তার আত্মগ্লানি জাগিতে দেয় না। দুঃখের ছোঁয়াচ লাগিলে রমলা তাতে নিজের আনন্দে প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। এক বিষয়ে হতাশা জাগিলে অনেক বিষয়ে আশা জাগাইয়া রমলা তাকে সঞ্জীবিত করে। যা আছে, তারই সন্তোষে মন ভরিয়া রাখিয়া, বাঁচিবার প্রয়োজনে মাসে মাসে

তিরাশী টাকা দানের জন্য দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিয়া দারিদ্রের পেষণ ভুলাইয়া রাখে।

মণীশ বলিয়াছিল, ধীরেন ভালমানুষ খাঁটি। তাকে কাঁদাইলে সে কাঁদে, হাসাইলে সে হাসে। তাই কি রমলা তার মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? অন্য কোন মানুষ হইলে পারিত না?

এই একটা খট্‌কা ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া থাকে। রমলাই যে ধীরেনকে সুখী করিয়াছে তাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটা যে ধীরেনের ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য সম্ভব হইয়াছে তাও সে বিশ্বাস করিতে পারে না। ধীরেনের পরিচয়ও সে আজ ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়াছে। দুর্বল পরনির্ভরশীল হাবাগোবা মানুষ সে নয়। ত্রিষ্টুপের তাই মনে হয় শুধু ধীরেন নয়, যে কোন মানুষকে রমলা সুখী করিতে পারিত; বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মানুষ ছাড়া।

তাকেও পারিত।

বিছানায় শুইয়া এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আধা ঘুম আধাজাগরণের মধ্যে ত্রিষ্টুপের চিন্তা ও কল্পনা জড়াইয়া যাইতে থাকে। সে যেন দেখিতে পায়—তাকে সুখী করার জন্য কুন্তলা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। যে রকম একটি ছোট একতলা বাড়ীতে রমলা আর ধীরেন বাস করে, অবিকল সেই রকম একটি বাড়ীতে ঠিক রমলার মত সাজ করিয়া কুন্তলা কাঠের চেয়ারে বসিয়া আছে, তার কোলে একটি শিশু, তার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে আছে অরেকটি মেয়ে।

মণীশের বাড়ী যাওয়া সে বন্ধ করিয়া দিল। ধীরেনের বাড়ীতেও আর গেল না। রমলাকে দেখিলে মনে পড়িবে কুন্তলাও তারই মত। ধীরেনের পরিতৃপ্ত মুখ দেখিতে হইবে, মনে হইবে কুন্তলাকে নিয়া এমনি সুখের সংসার পাতিতে কোন বাধা নাই। সে সুখশান্তি চায় না। ধীরেনের মত আনন্দোজ্জ্বল হাসির বিনিময়েও সঙ্কীর্ণ খাঁচায় সে ঢুকিবে না। আর বিচার বিবেচনা নয়, বসিয়া বসিয়া লাভ লোকসানের হিসাব নিয়া মাথা ঘামানো নয়। যা' সে ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক। জগৎ চুলোয় যাক।

মণীশ খোঁজ করিতে বাড়ী আসিল না, ক্ষিতীশও আসিল না। দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, সেই চায়ের দোকান হইতে মণীশ তাকে ডাকিল।

দোকানে এখন ভিড় জমিয়াছে, একটি চেয়ারও খালি ছিল না। দোকানের

ছোকরা কোথা হইতে একটা ভাঁজ করা চেয়ার আনিয়া ছোট একটু ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

'একজন আজ একশ টাকা ঠকিয়েছে, ত্রিষ্টু।'

'কে?'

'তুমি চিনবে না। পাল চৌধুরী কোম্পানীর পালবাবু।'

'চিনি। একবার চাক্‌রীর খোঁজে দেখা করেছিলাম।'

'ওর একশ লাখ টাকা আছে। আমার একশটা টাকা কি করে আদায় করা যায় বসে বসে ভাবছিলাম।'

ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া ত্রিষ্টুপ বলিল, 'ও টাকার আশা ছেড়ে দিন। ভেবে আর কি করবেন?'

মণীশ মৃদু হাসিল।—'ভেবে আর কি করব, টাকা আদায় করব।'

টাকার জন্য মণীশকে একটু বিচলিত মনে হয় না। পালবাবু টাকাটা না দেওয়ায় সে যেন খুসী হইয়াছে—আদায়ের জন্য লড়াই করিতে পারিবে। মণীশের প্রকৃতির এই দুর্বল দিকটা ত্রিষ্টুপ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পাওনা আদায়ের জন্য লড়াই করিতে সে যদি ভালবাসে, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য একজনের সঙ্গে শুধু লড়াই না করিরা অনেক টাকার জন্য অনেকের সঙ্গে লড়াই করে না কেন? সে কি মনে করে সে যা পায়, তার বেশী আর কিছু তার পাওনা নাই? উপার্জন বাড়ানোর জন্য সে তার অসাধারণ শক্তিগুলি কাজে লাগাইতে অবহেলা করে; কিন্তু কেউ একটি পয়সা ফাঁকি দিলে নির্মম ধৈর্যের সঙ্গে সেই পয়সাটি ছিনাইয়া আনিবার জন্য প্রায় সাধনা স্থরু করিয়া দেয়।

'কদিন যাওনি কেন, তিষ্টু?'

'খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

মণীশ আর কিছুই বলিল না। তার আগ্রহের অভাবে ত্রিষ্টুপও একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে রাস্তায় নামিয়া হঠাৎ সে বলিল, 'কুন্তলার যদি বিয়ে দেন—'

ত্রিষ্টুপের দুই কান গরম হইয়া উঠিল। কথায় কথায় মণীশের কাছে কুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, বিনা ভূমিকায় এমন ভাবে কথা তুলিবার কোন ইচ্ছা তার ছিল না। মণীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

'কুন্তলার বিয়ে দেবেন না?'

'দেবো বৈকি। বিয়ে না দিলে চলবে কেন?'

'আমাদের অফিসে একটি ছেলে আছে তার সঙ্গে চেষ্টা করতে পারেন। নরেশ নাম। ছেলেটি বেশ ভাল; বাড়ীর অবস্থাও মন্দ নয়। আপনি যদি বলেন—'

মণীশ হাসিমুখে তার একটি হাত ধরিয়া বলিল, 'কুন্তলার বিয়েব জন্য ভেবো না, ভাই। যার তার হাতে ওকে দিতে পারব না। আমি ছাড়া ওর জন্য কেউ ছেলে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

'এ ছেলেটি—'

'খুব ভাল ছেলে। কিন্তু কুন্তলার সঙ্গে ওর যে বনবে তার ঠিক কি? আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি, ত্রিষ্টু। বাংলা দেশের সব চেয়ে ভাল পাত্রটির সঙ্গেও আমি কুন্তলার বিয়ে দেব না। এমন একটি ছেলে খুঁজে আনব, যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে। ছেলের অবস্থা কেমন, স্বাস্থ্য কেমন, চরিত্র কেমন, এ সব দেখার আগে আমি দেখব ছেলের প্রকৃতি কেমন, কুন্তলার সঙ্গে খাপ খাবে কিনা?'

ত্রিষ্টুপ সায় দিয়া বলিল, 'হাঁ সেটা দেখা দরকার বটে।'

তাড়াতাড়ি কুন্তলার বিবাহ মিটাইয়া দিয়া নিজেকে বাঁচানোর জন্যই সে ভাল একটি ছেলের সন্ধান দিয়াছে, অথচ একটু বিবেচনা পর্যন্ত না করিয়া মণীশ প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া তাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। মণীশের কথা শুনিতে শুনিতে যতই তার মনে হইতে লাগিল কুন্তলার উপযুক্ত ছেলে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, ততই যেন মনটা তার হাল্কা হইয়া যাইতে লাগিল।

মণীশ বলিল, 'সব চেয়ে বেশী দরকার। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। তোমাদের হিসাবে ধীরেনের চেয়ে হাজার গুণ ভাল একটি ছেলে রমলার জন্য পাওয়া গিয়েছিল—এখন সে মাসে হাজার টাকা রোজগার করে। আমিই জোর করে ধীরেনের সঙ্গে রমলার বিয়ে দিয়েছিলাম। ভালই করেছিলাম কি বল?'

'আচ্ছা মণি দা, বিয়ের আগে ওদের পরিচয় ছিল?'

মণীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

চার

ঠিক এই অবস্থাতেই ত্রিষ্টুপের দিন কাটিতে লাগিল। জীবনটা মনে হইতে লাগিল একঘেয়ে।

কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল, কোন দিক দিয়া অবস্থার অপ্রত্যাশিত কোন পরিবর্তন ঘটিল না; জিভে খারাপ লিভারের স্বাদের মত ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া রহিল ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বদ গ্লানি। নিজের আলস্য, অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা ও অক্ষমতার জন্য অনুতাপের জ্বালা হইলে তার এতটা কষ্ট হইত না। নিজে সে কিছু করিতেছে না, তা যেন নয়। কিছু করিতে পারিতেছে না, তা'ও নয়। কিছু হইতেছে না। কোন এক অজ্ঞাত অকারণে জীবনের কোন এক অনির্দিষ্ট অনিয়মে, ব্যর্থতা না ঘটিয়াও সার্থকতার অভাবটা স্থায়ী হইয়া যাইতেছে।

আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় নাই। নষ্ট হইলে বোধ হয় ভালই হইত—কিছুদিনের জন্য নষ্ট হইলে। আগুনে লোহা পোড়ানোর মত এ বিপদ ছাড়া মানুষের চলে না। ত্রিষ্টুপ যে জানে একদিন সে সাফল্য লাভ করিবেই করিবে, এই জানাটাই তাকে ঠাণ্ডা লোহার মত কঠিন করিয়া রাখিয়াছে, নূতন অবস্থার উপযোগী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সঞ্চয় করিতে দিতেছে না। আগে নিজেকে নূতন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী করিতে না পারিলে, নিজের চেষ্টায় কে নূতন জীবন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? কিছু ঘটিবে না, এ ভয় ত্রিষ্টুপের নাই। কিছু ঘটিতেছে না বলিয়া ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বিশ্রী অনুভূতিটাই শুধু সে বোধ করিতেছে, পথ খুঁজিবার তাগিদ পাইতেছে না। এ তো মনের বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। রাজকন্যা ও রাজকুমারের মিলনে রূপকথার শেষ জানিয়াও কাহিনীর মাঝখানে কুমারের বিপদের পর বিপদ ঘটার সময়ে অসহায় ক্ষোভে কাতর হওয়া চলে। নিজের মনের রূপকথায় নিজের এখনকার দুরবস্থায় ত্রিষ্টুপ অনায়াসে উদ্বিগ্ন হইতে পারিয়াছে।

বেতনের সমস্ত টাকাই ত্রিষ্টুপ বাপের হাতে তুলিয়া দেয়, অবিনাশ পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া তাকে পঁচিশ টাকা ফেরত দেন। এটা প্রায় নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ত্রিষ্টুপের মনটা খুঁতখুঁত করে। হাত-খরচের জন্য অবিনাশ তাকে পঁচিশ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া দিবেন, কিন্তু সে জানে ওই টাকাটা কাটিয়া রাখিয়া

বাকি বেতনটা সে যদি অবিনাশের হাতে দেয়, একটু তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন। টাকার পরিমাণের জন্য নয়, তার দরকার আছে জানিলে সব টাকাই তিনি অনায়াসে ফিরাইয়া দিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথমে তার টাকাগুলি তাঁর হাতে তুলিয়া দেওয়া চাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই ধরণের তুচ্ছ খুঁতগুলি চিরদিন ত্রিষ্টুপকে পীড়া দেয়।

টাকাপয়সা সম্পর্কে আর একটা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা ত্রিষ্টুপ সঞ্চয় করিয়াছে। চাকরী পাওয়ার পর রমেশ বার তিনেক তার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। সাহায্য নয়,—ঋণ, পরে শোধ করিবে। শেষবার সে যখন কুড়িটি টাকা ঋণ চাহিল, ত্রিষ্টুপের হাতে একেবারেই টাকা ছিল না।

'বাবার কাছ থেকে চেয়ে দিচ্ছি।'

'বাবার কাছ থেকে? তা'—আমার নাম ক'রো না কিন্তু ভাই।'

'বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন কি জন্য টাকা চাই?'

'বলো তোমার নিজের দরকার। নয় তো বলো কোন বন্ধু ধার চেয়েছে। আমার নাম করো না, সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে।'

রমেশের বেকার অবস্থার জন্য ত্রিষ্টুপের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। নিজে সে হাতে পাওয়া চাকরী ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবে, সে বিশ্বাস করিত না যে চেষ্টা করিলে কোন মানুষের পক্ষে দিন চলার মত সামান্য উপার্জন করা অসম্ভব। রমেশের অবস্থার জন্য রমেশকেই যে দায়ী করিয়া রাখিয়াছে। তবু প্রভার স্বামী টাকা যখন চাহিয়াছে, না দিলে চলিবে না। বিরক্তিতে মন ভরিয়া অবিনাশের কাছে টাকা চাহিতে গেল।

অবিনাশ বলিলেন, 'কুড়ি টাকা? কি করবি কুড়ি টাকা দিয়ে?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'দরকার আছে।'

মা বললেন, 'অত খরচে হসনে তিষ্টু।'

অবিনাশ বলিলেন, 'দরকার আছে জানি। কি দরকার আছে শুনি না?'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'কি দরকার না জানলে টাকা দেবে না?'

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। আহত বিস্ময়ে তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মার হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

'টাকা দেব না বলিনি তো, তিষ্টু। টাকা দিয়ে কি করবি তাই শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

ত্রিষ্টুপও তা জানে। অবিনাশের শুধু জিজ্ঞাসা, আর কিছু নয়। কুড়ি টাকার

বদলে কুঁড়ি পয়সা চাহিলেও, অবিনাশ এমনি ভাবে জানিতে চাহিতেন পয়সাটা কি কাজে লাগিবে। বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেখিলে যেমন জিজ্ঞাসা করেন সে কোথায় যাইতেছে, এও তেমনি জিজ্ঞাসা।

তার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ছোট-বড় সব খবরই ওঁরা রাখিয়াছেন ; প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না এমন কিছু তার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, এ ধারণাই ওদের নাই। ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিয়া মনটা ত্রিষ্টুপের খারাপ হইয়া গেল। টাকা সে নিক, খরচ সে করুক, সেটা ভিন্ন কথা। কিসে টাকা খরচ করিবে, একটু জানিবার অধিকার তার বাপ-মা দাবী করেন। টাকা যদি সে নষ্ট করিতে চায়, তাও সে করুক। কিছু না বলার চেয়ে সে অনেক ভাল! এ গোপনতার মানেই স্পষ্ট ভাষায় তার ঘোষণা করা যে, এতদিন যা করিয়াছ, এখন হইতে আমার সমস্ত বিষয়ে তোমরা মাথা ঘামাইতে আসিও না। শুধু অবিনাশের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করায় আজ মতের অমিল, অবাধ্যতা আর কলহের চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

হাতে দেওয়ার বদলে টাকাটা ত্রিষ্টুপ রমেশের সামনে ফেলিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়া নয়, মনে অশ্রদ্ধা থাকিলে, সময় বিশেষে আপনা হইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া যায়।

রমেশ বলিল, 'শীগ্‌গির তোমার টাকা ফিরিয়ে দেব ভাই, এক মাসের মধ্যে। কত যেন হল সব শুদ্ধ ?'

টাকাটা ওভাবে ছুঁড়িয়া দিয়া ত্রিষ্টুপ একটু অনুতাপ বোধ করিয়াছিল, রমেশের অমায়িকতা দিয়া অপমান চাপা দিবার চেষ্টায় আবার তার পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।'

তখন উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া চোখ পাকাইয়া রমেশ বলিল, 'তার মানে ? ও রকম বাঁকা করে কথা বলছ যে ?'

'বাঁকা করে কি বললাম ?'

'বুঝি, বুঝি। আমরা ও সব বুঝি। ভাবছ যে ধার বলে নিচ্ছে, তার মানেই তাই। কাজ নেই ভাই তোমার টাকা নিয়ে আমার, বরং কাবলীওয়ালাকে খত লিখে দেব।'

দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ী ফেরা মাত্র প্রভা একতাড়া নোট হাতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রিষ্টুপকে দেখাইয়া নোটের তাড়া হইতে

পঁচিশ টাকার নোট বাছিয়া সামনে ফেলিয়া দিল।

'তোমার টাকা।'

'সুদ কই?' ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিল। এদের বিকৃত অভিমানের পরিচয় তো সে জানে, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাইল না।

নোটের তাড়াগুলি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে প্রভা নিজেই বলিল, 'চিরকাল কারো সমান যায় না। দু'দিন অবস্থা একটু খারাপ হলে কি রকম যে করে সবাই! সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেন ফতুর করে দিল।' প্রভার চোখ জলে ভরিয়া যায়, 'মনে থাকবে সব, কত লাথি, ঝাঁটা অপমান জুটেছে। এতদিন চুপ করে সব সয়েছি, আর তো চুপ করে থাকব না।'

লাথি, ঝাঁটা, অপমান। চুপচাপ সব সহ্য করা। হাসিবে না কাঁদিবে, ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল না। সারাদিন প্রভা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিল। বাপ-মাকে কাঁদাইল এবং নিজেও কাঁদিল। সকলকে সে আঘাত করিতে চায় না, প্রমাণ করিতে চায় যে, এতদিন সকলের কাছে তার শুধু অনাদর আর অপমানই জুটিয়াছে। রমেশের চাকরী থাকিলে বাপের বাড়ীতে দিন কাটানোর সময়ে সকলের যে কথা ও ব্যবহার তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক ঠেকিত, রমেশের চাকরী ছিল না বলিয়াই সেই কথা ও ব্যবহারের মধ্যেই এতকাল কিছু আবিষ্কার করিয়া সে অভিমান করিয়াছে। নিজেই এই বিকারকে সে সমর্থন করিতে চায়। সেই চেষ্টায় একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া সে রমেশের সঙ্গে চলিয়া গেল।

রওনা হওয়ার আগে রমেশ অবিনাশকে বলিল, 'আপনার খুব টাকার টানাটানি চলছে শুনছিলাম?'

অবিনাশ বলিলেন, 'কই না? চলে যাচ্ছে এক রকম! তিষ্টুর চাকরীটা হয়ে।'

'আমি কিছু টাকা দিলে কি আপনার অপমান হবে? আমি তো আপনার ছেলের মত।'

অবিনাশের মনে ছিল না; কিন্তু ত্রিষ্টুপের এখন মনে পড়িয়া গেল, রমেশ টাকা ধার চাহিতে আসিলে, তিনি টাকা ধার দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'ধার দিতে পারব না, বাবা। ধার চাওটাও তোমার উচিত হয়নি। তুমি এমনি টাকা নাও। আমার কাছে টাকা নিতে তোমার অপমান কি? তুমি তো আমার ছেলের মত।' ছেলের মত বলিয়া তাকে ধার দেওয়ার বদলে একেবারে দান করিতে চাওয়ায় রমেশের রাগ হইয়াছিল। এতদিন সেই রাগ মনে পুষিয়া রাখিয়াছে, আজ সেই ঝাল মিটাইতে চায়।

পের যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। এক বিষয়ে এত তীক্ষ্ণ মান অপমান জ্ঞান, এত তেজ, অথচ সবটাই বিকার। কতকগুলি বিষয়ে মানুষটা সুস্থ ও স্বাভাবিক, আবার কতকগুলি বিষয়ে এমন খাপছাড়া বলিবার নয়। বেকার জীবন কি এমনি সব মানসিক রোগের সৃষ্টি করে?

অবিনাশ আনন্দ ও আবেগে রমেশের হাত চাপিয়া ধরিলেন।—'না বাবা, অপমান কিসের! এখন তো দরকার নেই, দরকার থাকলে তোমার কাছ থেকে নিতাম বৈকি। নিজে চেয়ে নিতাম।'

খোঁচাটা বিঁধিল না দেখিয়া রমেশ বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ন হইয়াই চলিয়া গেল।

কোথায় কি কাজ সে পাইয়াছে, এত টাকা হঠাৎ সে কোথা হইতে পাইল, এ সব স্পষ্ট করিয়া কিছুই তার কাছে জানা গেল না। প্রশ্ন করিয়া পাওয়া গেল শুধু ভাসা ভাসা জবাব। ঠিক চাকরী নয়, এজেন্সীর মত কি যেন তার একটা জুটিয়াছে।

ত্রিষ্টুপের মনে আঘাত লাগিল বৈকি! স্বামীর ধার করা পঁচিশটা টাকা তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া প্রভা তাকে যে ভাবে আঘাত করিতে চাহিয়াছিল সে ভাবে নয়। রমেশের অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনটাই তাকে যেন ঝাঁকি দিয়া গেল। রমেশ অপদার্থ, জীবনে কোনদিন তার অভাব ঘুচিবে না, এই ছিল মানুষটা সম্বন্ধে তার ধারণা। কেবল পরিবর্তন নয়, নিজের অবস্থায় খুব ভাল রকম পরিবর্তনই সেই রমেশ করিয়াছে। তার কাছে মনে হইতেছে আকস্মিক, কিন্তু এ উন্নতি হয়তো রমেশের অনেক দিনের চেষ্টার ফল।

স্বামীর সঙ্গে বিদায় হইয়া যাওয়ায় তিন চার দিন পরেই প্রভা একবার এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, যাওয়ার দিন যে কাণ্ড করিয়া গিয়াছিল সেজন্য সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে।

ক'দিনের মধ্যে গায়ে গয়না চাপানোর সুযোগ সে পায় নাই, তবে নূতন যে কাপড়খানা পরিয়া আসিয়াছে তার দাম অনেক। তাকে পৌছিয়া দিতে গেল ত্রিষ্টুপ। প্রভাই এক রকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। রমেশ একটি সুশ্রী নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকটা আসবাব কিনিয়াছে দামী দামী। এতদিনের পুরানো জিনিষ-পত্রের গায়ে আঁটা দারিদ্র্যের পরিচয়ের মধ্যে স্বচ্ছলতার আরও অনেক চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রভার কপাল ফিরিয়াছে ভাবিয়া একদিকে ত্রিষ্টুপের বুকটা যেমন হাল্কা হইয়া গেল,—অন্যদিকে রমেশের মত মানুষ যা পারিয়াছে নিজে সে তার চেষ্টা পর্যন্ত শুরু

করিতে পারিল না ভাবিয়া মন তার ভারি হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল তার দ্বারা বোধ হয় কিছু হইবে না। সে শুধু কল্পনা করিতে জানে, তার শুধু স্বপ্ন দেখা। নিজে সে অক্ষম, অপদার্থ। নিজের সম্বন্ধে ধারণাটাই শুধু তার বড়।

আত্মবিশ্বাসে আগুন লাগার তাপে পুড়িতে পুড়িতে তার দিন কাটিতেছিল; এক সপ্তাহ পরে রমেশকে পুলিশে ধরিয়া নিয়া গেল। এবং প্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল বাপের বাড়ী। ত্রিষ্টুপের মনে হইল, একটা চোখে যেন একদিন তার দৃষ্টি ছিলনা, হঠাৎ সেই পুরাতন অন্ধ চোখে নূতন দৃষ্টি আসিয়াছে।

পাঁচ

প্রথম কিছুদিন আপিসের কাজ করিতে ত্রিষ্টুপের ভালই লাগিল। জীবনে এ তার একটা নূতন অভিজ্ঞতা—অনেকের সঙ্গে কলম পিষিয়া পয়সা উপার্জন করা। নূতন সাথী, নূতন আবেষ্টনী। প্রথম কয়েক দিন সে ঘাড় গুঁজিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটানা কাজ করিয়া যাইত, মনোযোগের ছোট বিরামগুলিতে এই ভাবিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিত, সে কাজ করিতেছে, কাজ! তার ছোট ঘরখানাতে বিছানায় চিৎ হইয়া দেশবিদেশের চিন্তাবিদ্‌দের ছাপানো মতামতের চিন্তায় মগজ বোঝাই করার ছলে অমন বেকার জীবন যাপন করার বদলে, নিজের চিন্তা ও কল্পনার জাল বোনার বদলে কিছু একটা কাজ করিতেছে। গৃহের অসুস্থ মনে তার যেন আপিসে চেঞ্জ আসিয়াছে। এ যেন প্রায় মুক্তির সমান।

প্রকাণ্ড একটা টেবিল ঘিরিয়া দশ জন কর্মী বসে; তাদের মধ্যে সে স্থান পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে আরও অনেকগুলি ছোট-ছোট টেবিলে আরও অনেক সহকর্মী আছে। মাঝে-মাঝে চোখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ চারিদিকে তাকায়। ঘরের সোঁদাগন্ধী গরম বাতাসের ঘনত্ব যেন অনুভব করা যায়, দুটি ফ্যান পাক খাইতে খাইতে অবিরাম এলোমেলো আলোড়ন বজায় না রাখিলে বাতাস যেন আরও গাঢ় হইয়া জমিয়া যাইত। দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া বসানো প্রায় ছাতের সমান উঁচু কাঠের তাকগুলিতে গাদা করা কাগজপত্র—কত মানুষের কত দিনকাল কত পরিশ্রমের ফল কে জানে!

আপিসের কয়েক জনের সঙ্গে ত্রিষ্টুপের একটু একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে।

'মুগ্ধবোধ নকল করছেন নাকি মুগ্ধ হয়ে?'

ত্রিষ্টুপ মুখ তুলিয়া একটু হাসে। টেবিলের অপর দিকে তার মুখোমুখি বসে সত্যেন। বয়স ত্রিষ্টুপের চেয়ে বেশী নয়—অভিজ্ঞতা বেশী। বছর তিনেক কাজ করিতেছে। একমাথা কোঁকড়া চুলে তার সাধারণ চেহারাটিকে একটু অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ত্রিষ্টুপের মনে হয়—তার চুলগুলি হঠাৎ ওরকম অসাধারণ হইয়া গেলে লজ্জায় সে কারো কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না।

'হুঁ হুঁ বাবা, মোহমুদ্গরের গুঁতো তো লাগেনি, টের পাবেন!'

ডান পাশে বসে নিকুঞ্জ। বেঁটে, মোটা, মাঝবয়সী, ধীর স্থির মানুষ, ছোট ছোট চোখ দুটি কেবল সর্বদা পিট পিট করে। সে নাকি নূতন বিবাহ করিয়াছে, দ্বিতীয়বার। আধময়লা জামাকাপড পরিয়াই কিন্তু সে আপিসে আসে, কেবল তেলে ভেজা চুলে সযত্নে টেরি-কাটা আর কামানো মুখে স্নো পাউডার লাগানো ছাড়া তার আর কোন বাহার নাই। মাথার সুগন্ধি তেলের গন্ধটা সর্বদাই ত্রিষ্টুপের নাকে লাগে।

'অত স্পীডে কাজ করবেন না মশায়, মারা যাবেন শেষে। যত শীগ্‌গির শেষ করে দেবেন, তত কাজ ঘাড়ে চাপাবে। এক দম থই পাবেন না।'

টাইপিস্ট ধীরেন। একটি ফুলস্ক্যাপ শীটে কয়েক লাইন টাইপ করিয়া টাইপরাইটার যন্ত্রের চাবীগুলিতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে চাবিগুলিতে বিদ্যুৎবেগে তার আঙ্গুলের সঞ্চালন ত্রিষ্টুপ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু ধীরেন একটানা আঙ্গুল চালায় না, মিনিট দুই-তিন টাইপ করিয়া আট-দশ মিনিট বসিয়া থাকে, গল্প করে আর ইয়ার্কি দেয়। মাঝে মাঝে দশ বিশ মিনিট দ্রুত একটানা টাইপ করিয়া হাতের কাজ শেষ করিয়া, কাগজগুলি ঘণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখে, তারপর ধীরে সুস্থে কর্তাদের কাছে পাঠাইয়া দেয়। মন্থর গতিতে সে টাইপ করিতে পারে না, আঙ্গুল বাগ মানে না। তিন মাসের মধ্যে আপিস একঘেয়ে হইয়া উঠিল।

এমনিভাবে এক একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নূতন নূতন মানুষের পরিচয় পাইয়া অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সকরুণ অন্তহীন লড়াই দেখিয়া নিজের জীবনে বৈচিত্র্য আসার আনন্দ ও উৎসাহ ত্রিষ্টুপ অনুভব করিতে লাগিল। বড় কিছু না হোক, এ ছোট কাজই বা মন্দ কি? এ কাজেও তো মানুষ মসগুল হইয়া যাইতে পারে।

প্রথম ত্রিষ্টুপের কাছে ধরা পড়িল—কাজ সহজ, অতি সহজ। তারপর ধরা ॥ল—এই সহজ কাজ করিতে তার সময় লাগে দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত, কোন ন দিন তার চেয়েও বেশী। স্কুলের ছেলে অনায়াসে যা পারে, সেই কাজ করিতে এত সময় খরচ হয়।

বাহিরে আকাশ-ছাওয়া মেঘের বর্ষণ চলিয়াছে, দিন দুপুরে ঘরে জ্বালা য়াছে আলো। পাখা বন্ধ, হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাসে সোঁদা গন্ধটা ভিজা ভিজা মনে ঘরের সকলের মুখে মুখে ত্রিষ্টুপ চোখ বুলায়—বন্দীত্বের অনুভূতি তাকে কষ্ট দিতেছে কারোও মুখে কি তার একটু ছায়া সে দেখিতে পাইবে না? কুড়ি শ বছর বয়সের যে সাত-আট জন আছে, তাদের মুখে? মনটা হু-হু করিতে ক। সে একা, তার কেহ নাই, সকলে তাকে ত্যাগ করিয়াছে। পাওয়ার মত হুই সে পায় নাই, জীবনে কোনদিন পাইবে না।

নতুন মাসের গোড়ায় এমনি বাদলার দিনে বেতন পাওয়া গেল। ছুটির সঙ্গে সত্যেন, ধীরেন, আর নিকুঞ্জ তাকে ঘিরিয়া ধরিল।

'কদ্দিন দেনা ফেলে রাখবেন ত্রিষ্টুপবাবু? আজ আর ছাড়ছি না। বেশ লার দিনটা আছে।'

চাকরী হওয়ার জন্য এরা একদিন খাওয়া দাবী করিয়াছিল। ত্রিষ্টুপের মনে না।

নিশ্চয়। বলুন কি খাবেন?'

চার জনে সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিতেছে, অবিনাশ পিছন হইতে ডাকিলেন, প?'

ত্রিষ্টুপ কাছে গেল।

'টাকাগুলো দিয়ে যা, আমার একটু দেরী হবে যেতে।'

'দুটো টাকা রেখে বাকীটা দিয়ে যা। অতগুলো টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবি? অসাবধান তুই! আর শোন,—অবিনাশ গলা নামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া লেন, 'সংক্ষেপে সেরে দিস, অমন বন্ধু ঢের খেতে চায়। একটা চপ কি লট আর এক কাপ চা—ব্যস! এক টাকাতেই হয়ে যাবে। তবু দুটো টাকাই রাখ—'

'বাড়ী গিয়ে দেব'খন!

ত্রিষ্টুপ তর-তর করিয়া নামিয়া গেল। অবিনাশ আহত বিস্ময়ের সঙ্গে ছেলের

দিকে চাহিয়া থ' বনিয়া রহিলেন।

ত্রিষ্টুপ ছাড়া তিন জনেই আজ যেন একটু বেশী উত্তেজনাপ্রবণ। নিজেদের কথা আর হাসি তামাসার মধ্যেই তিন জনে যেন রসের অন্ত পাইতেছে না; বিশেষ করিয়া কেরাণীবাবুদের জন্য পরিচালিত এই সস্তা রেস্তোঁরার চপ-কাটলেট আর চা খাইতে খাইতে জীবনকে উপভোগ করিতে মসগুল হইয়া। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল, হাসিতেও যোগ দিল, কিন্তু তিন জন ও এক জনের দুটি দল মিশ খাইতে পারিল না কোন রকমেই। এবং ত্রিষ্টুপের দলে ফেরার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সকলের উৎফুল্ল ভাবটাও কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

রাস্তায় নামিয়া তিন জন চুপি চুপি কি যেন বলাবলি করিল নিজেদের মধ্যে, তারপর নিকুঞ্জ বলিল, 'অ, ত্রিষ্টুপবাবু, বলি বাড়ী যাবেন নাকি এখন?'

'কোথা আর যাব বলুন?'

'আমাদের সঙ্গে আসুন না, একটু ফুর্তিটুর্তি করা যাক?'

ধীরেন বলিল, 'মাইনে পাবার পর আমরা একদিন একটু জমাই, ত্রিষ্টুপবাবু।'

সত্যেন বলিল, 'কাল ছুটিও আছে।'

ত্রিষ্টুপের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। মানুষের সঙ্গে সে মিশতে পারে না, সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে! সঙ্গীহীন অসহায়ের দুর্বোধ্য ভয়টাও পীড়ন করিতেছিল। উগ্র অন্ধ হিংসায় বন্ধু তিনজনকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষার অতি অমায়িক রূপ ও ব্যবহার। ওরা ফুর্তি করতে চায়—ফুর্তি! আজ কি তা' সম্ভব? তার পক্ষেও?

নিকুঞ্জ বলিল, 'আমরা চাঁদা করে খরচ দি' যা খরচ হয়, চারজনে সমান সমান দেব। আসবেন?'

'কত লাগবে?'

'গোটা দশেক টাকা, আর কতো?'

দশ টাকা! এক সন্ধ্যার ফুর্তির জন্য দশ টাকা খরচ!

কিন্তু ওরা যদি পারে, সে কেন পারিবে না? হাজার হাজার টাকা সে একদিন উপার্জন করিবে, দশ টাকা খরচের নামে তার চমক লাগে? ধিক্!

'চলুন যাই।'

পরদিন অনেক বেলায় ত্রিষ্টুপের ঘুম ভাঙ্গিল একটা অস্থিরতার মধ্যে। রাত

প্রায় একটায় সে বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাড়ীর সকলে জাগিয়াছিল তার প্রতীক্ষায়। দরজা খোলার পর ভিতরে আলোয় আসিয়া দাঁড়াইলে তার চেহারা দেখিয়া মা চাপা স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, ত্রিষ্টুপের মনে আছে। অবিনাশ কি যেন একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দাঁড়ায় নাই, কোন মতে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর এলোমেলো টানে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে দু'হাতে চৌকীর প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ চিৎ হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। তারপর এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

জলকাদায় পিছল সরু গলিতে ঢোকার পর হইতে সুরু হইয়াছিল তার ফুর্তি—দারুণ ভয়, উদ্বেগ ও প্রত্যাশার উত্তেজনায়। তারপর এক দেয়ালচাপা বাড়ীর দোতলায় ছোট একটি ঘর—আলো আর ঠাসা আসবাবে সাজানো ঝলমল অদ্ভুত একটি ঘর। আর একটি মেয়ে—ঘরের মতই যার একটি ছোট দেহে দশটি দেহের গাদা করা সাজসজ্জা। তারপর নেশা—জীবনে প্রথম মদের নেশা। চাপা কষ্ট আর তীব্র উন্মাদনার অদ্ভুত সমাবেশ—মাটির ভয়ঙ্কর টানে অবলম্বনহীন শূন্যে অবিরাম পড়ার মত শেষের দিকে নিকুঞ্জ ধেই-ধেই নাচিয়া ফুর্তি করিয়াছিল—বেঁটে-মোটা, ধীর-শান্ত নিকুঞ্জ, অল্পদিন আগে যে বিবাহ করিয়াছে দ্বিতীয় বার। কেমন মেয়েকে সে বিবাহ করিয়াছে? কুন্তলার মত?

ঘরের সেই মেয়েটিকেও শেষের দিকে কুন্তলার মত মনে হইয়াছিল। কতবার সে যে নিজের মাথায় ঝাঁকি দিয়াছে! কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র, কি বীভৎস একটি রাত তার কাটিয়াছে কাল; একটু মদ খাওয়া ছাড়া কিছুই সে করে নাই চুপ চাপ বসিয়া শুধু চাহিয়া রহিয়াছে। তবু তার মনে হইয়াছে, মুহূর্তে মুহূর্তে সে যেন উপার্জন করিতেছে এক অক্ষয় অমর সম্পদ। অভিজ্ঞতা নয়, চেতনার জাগরণ নয়, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টতা, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

মাথা টন্‌টন্ করিতেছে, সমস্ত শরীরে জ্বর-ছাড়া বিশ্রী অবসন্নতা বোধ করিতেছে। তবু তার আপসোস নাই; সে ভুলিতে পারিতেছে না যে রহস্যময় জীবনের একটি ধর্ম সে আবিষ্কার করিয়াছে। মৃতপ্রায় মানুষও বিদ্রোহ করে, করিতে পারে। অবস্থার চাপে, শিক্ষা-দীক্ষা আবেষ্টনীর চাপে, স্বাস্থ্যহীন শুষ্ক নীরস একঘেয়ে জীবনের চাপে, মানুষ যত প্রাণহীন নিস্তেজ হোক, বিদ্রোহের প্রেরণা তার মরে না। তার সহকর্মী তিনজন তাই বেতন পাওয়ার পর মাসে একদিন ফুর্তি করে আর কোন পথ খুঁজিয়া পায় না, তাই এই ভীরু দুর্বল মানুষ তিনটি এই ভাবে বিদ্রোহ করে। একঘেয়ে, নিরুপায়, অবসন্ন জীবন যাপনের বিরুদ্ধে, দিনের পর

দিন কলের মত সুবোধ সুশীল ভাল মানুষ হইয়া থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে!

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান মাত্র মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, বইয়ের সেল্‌ফটা ধরিয়া ত্রিষ্টুপ ভাবে, তা হোক। এ দুর্বলতা কিছু নয়। মন তার সবল হইয়াছে। আর কোন দিন সে হতাশ হইবে না। হতাশা বোধ করিলেও আসিয়া যাইবে না কিছুই, সে শুধু হইয়া থাকিবে হৃদয় মনের একটা বদ অভ্যাস। যতদিন সে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তার লড়াইয়ের ক্ষমতা আর কিছুতেই নষ্ট হইবে না। নিজের সমস্ত পাওনা আদায় করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন লড়াই কোন দিন ভালও লাগিবে না।

নিচে নামিতেই সে সামনে পড়িয়া গেল অবিনাশের। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চাহিয়াই নীরবে সরিয়া গেলেন।

রাণু জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার অসুখ করেছে, মামা?'

প্রভা খোঁটা দিয়া বলিল, 'তুমিও এমনি করে গোল্লায় যাবে, তা আমি আগেই জানতাম। চাকরী বাকরী করে নিজের ভাগ্নীকে একটা জামা পর্যন্ত যে কিনে দেয় না, মদ না খেলে সে খাবে কি!'

অবিনাশ আড়াল হইতে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর প্রভা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। পাড়াশুদ্দু লোককে শুনিয়ে চিল্লাচ্ছেন মেয়ে, বোকা বজ-জাত কোথাকার!'

উনানে কেটলী চাপাইয়া মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে প্রভাকে বলিলেন, 'জামাই তো চুণকালি নিয়েছে মুখে, ভায়ের একদিনের বদখেয়ালটা চেপেই যা না বাছা?' তারপর কাঁদ-কাঁদ হইয়া ত্রিষ্টুপকে বলিলেন, 'না বাবা, তুই লজ্জা করিস নে। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে ওনার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবি যা। তোর কিছু দোষ ছিল না, পোড়ারমুখো বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে'—

অবিনাশ ইতিমধ্যে আড়াল হইতে সামনে আসিয়াছিলেন, বলিলেন, 'থাক থাক, ওসব কথা বলে আর কি হবে? টাকা যা আছে, দাও তো ত্রিষ্টু। সব উড়িয়ে দাওনি তো?'

ত্রিষ্টুপ সমস্ত টাকা আনিয়া অবিনাশের হাতে দিল। মোটে গোটা তের টাকা কম দেখিয়া অবিনাশ স্বস্তি বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পাঁচটি টাকা ত্রিষ্টুপকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দরকার হলে চেয়ে নিও।'

ত্রিষ্টুপ কিছুই বলিল না।

বেলা তিনটার পর জামা কাপড় পরিয়া সে বাহির হইয়া গেল। কুন্তলার

দিদির বাড়ীতে গিয়া সে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবে। মনটা কেমন অশান্ত হইয়া আছে, ওবাড়ীর শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনী আর দু'টি শান্ত ও সুখী মানুষের সঙ্গ হয় তো তার মনটাকেও শান্ত করিয়া দিবে।

বাহিরে যাওয়ার আগে ত্রিষ্টুপ শুনিয়া গেল মা বলিতেছেন, 'এত বড় সোমত্ত রোজগেরে ছেলে, কদ্দিন থেকে বলছি একটা বিয়ে থা দিয়ে দাও—'

আর অবিনাশ বলিতেছেন, মেয়ে তো খুঁজছি—'

মেয়ে খুঁজিতেছে মেয়ে! তার বাপ তার জন্য মেয়ে খুঁজিতেছে! এমন হাস্যকর অশ্লীল ঠেকিল কথাটা ত্রিষ্টুপের কাছে। তার হইয়াছে বয়সকালের রোগ, সেজন্য এই ঔষধ প্রয়োজন। এর বেশী আর কিছু ভাবিয়াছে অবিনাশ? তার মা? মেয়ে খুঁজিয়া আনিয়া দিলে যথানিয়মেই সে প্রিয়া, সাথী, জননী ও গৃহিণী হইবে, এটা জানা কথা। কিন্তু জানা কথাটাও কি মনে পড়িয়াছে ওদের? মেয়ে বলিতে যে মানবজাতীয়া জীব বুঝায়, তাও বোধ হয় খেয়ালে আসে নাই।

এই ভাবে কিছু ভাবিতে গেলেই আগে ত্রিষ্টুপ গভীর জ্বালা বোধ করিত, মনে হইত মানুষ বড হীন, জীবনে শুধু ক্লেদ! আজ মৃদু আপসোসের সঙ্গে সে শুধু কৌতুক অনুভব করিল। বাড়ীতে নাই বলিয়াই যে বাজারে সে মেয়ে ভাড়া করিয়াছে, একথা মনে করার জন্য বাড়ীর লোকের উপর রাগ করা চলে না। এরকম করে বৈকি মানুষ, বাড়ীতে বৌ থাকিলে পর্যন্ত করে, নয়তো ভাড়া করার জন্য এত মেয়ে সংসারে থাকিত না। তাকে মহাপুরুষ মনে করিবার কোন কারণ বাড়ীর লোকের নাই। এটা তার ব্যক্তিগত অপমান নয়। সংসারে এরকম অনুচিত বাস্তবতা থাকাটা মানুষের অপমান। একি ভয়ানক কথা যে যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে মানুষকে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়, ধরিয়া রাখিতে হয় যে, গোল্লায় যাওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক! এই ব্যাপারটাই ত্রিষ্টুপের বড় খাপছাড়া মনে হয়। এরকম অভাব মানুষ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে কেন, মানুষের স্বভাব যাতে বিগড়াইয়া যায়? চরিত্র একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়? তার জন্মের অনেক আগেই এ সব ঠিক করিয়া রাখা উচিত ছিল। এতকাল মানুষ তবে কি করিয়াছে?

একটু ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে যে এসব অভাবের ফল, মাসকাবারের পর আপিসের তিন বন্ধুর ফুর্তি করার বিকৃত সখ ওই ধরণের বিকার। কিন্তু তার কতখানি অনুগত আর কতখানি মানসিক অভাব-বোধের চাপ, ঠিক কি ধরণের সেই অভাব এবং তার কারণ কি, এসব সে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ত্রিষ্টুপ ভাবে, অবসর মত দু'চারখানা বই পড়িতে হইবে এ বিষয়ে।

মণীশ বলিল, 'এমন দিশেহারা হলে কিছু হয় না, ত্রিষ্টু।'

'দিশেহারা ?'

'তা ছাড়া কি ? আজ ভাবছ, ব্যবসা করে বড় লোক হবে, পর দিন ভাবছ জ্ঞান সঞ্চয় করা বিশেষ প্রয়োজন, আবার সখ চাপছে সমাজের দোষ ত্রুটি সংশোধন করবে, দেশকে স্বাধীন করবে। একটা মানুষ যদি ব্যবসায়ী, বিদ্বান, সংস্কারক, রাজনৈতিক সব কিছু হতে চায়, তার কিছুই হয় না।'

'ওরকম বলেছি নাকি ?'

'একদিন এক কথায় বলনি, নানান দিনের নানা কথাবার্তায় বলেছ।'

ত্রিষ্টুপ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ও কিছু নয়। এ কথা সে কথা মনে হয়েছে বলেছি। কাজের বেলায় যা ধরব তাই করব।'

'কি ধরবে ? করবে কি করবে না, পারবে কি পারবে না, সে কথা এখন বাদ দিলাম। কি ধরবে ঠিক করেছ, তাই শুনি আগে ?'

মণীশের কথায় মৃদু ব্যঙ্গের সুর ত্রিষ্টুপের কাছে ধরা পড়িল। আগেও মণীশ এই সুরে কথা বলিত, সে ভাবিত এটা তার স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গী। সে ছেলেমানুষ বলিয়া মণীশ এভাবে তার সঙ্গে কথা কয়। আজ তার মনে হইল, মণীশ এই ভাবে তার কাছ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থন প্রার্থনা করে। আপিসে তার ওপরওয়ালা নিরীহ অসহায় ও একান্ত অনুগত তাকে পিঠ চাপড়াইয়া যে ভাবে মিষ্টি সুরে কথা বলেন, তার সঙ্গে মণীশের কথা বলার বিশেষ পার্থক্য নাই।

ত্রিষ্টুপ বিচলিত হইল না। মনের যে পরিবর্তন মণীশের মৃদু তাচ্ছিল্য অনুভব করার ক্ষমতা তাকে আনিয়া দিয়াছে, সেই পরিবর্তনই অনেক কিছু তুচ্ছ করার ক্ষমতাও তাকে দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে মণীশের এটা দুর্বলতা।

'কি ধরব ? আমি যা চাই।'

'সেটা কি ?'

'আমার যা নেই, সেই সব।'

'ওতো এক কথাই হল—তোমার যা নেই, তুমি তাই চাও। কিন্তু অভাবের শেষ নেই মানুষের, চাওয়ার শেষ নেই। দুটো অভাব বেছে না নিলে, তুমি চাইবেই বা কি ? সব অভাব মেটে না মানুষের।'

মণীশ ফস্ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল।

ত্রিষ্টুপ হাত বাড়াইয়া বলিল, 'আমায় একটা দিন।'

সিগারেট দিয়া মণীশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে চাহিয়া থাকে।

ত্রিষ্টুপের শান্ত নির্বিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবটা তার কাছে এতক্ষণে ধরা পড়িয়াছে।

নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলিতেছে এমনিভাবে ত্রিষ্টুপ তারপর বলিতে থাকে, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মনিদা। কিন্তু ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না, ঠিক করেছি। ওতে কোন লাভ হয় না। ও বড় গোলমেলে ব্যাপার। ওটা আসলে ভবিষ্যতের হিসাব। কিন্তু একদিন আমি কি চাইব, এখন থেকে সেটা স্থির করে ফেলতেই চাই, ধাঁধা লেগে যায়। দশ বছর পরে কি চাইব, আজ কি আমি তা জানি? কোন একটা আদর্শ ধরতে পারলেও কথা ছিল। কিন্তু আপনি তো আমাকে জানেন, আদর্শের জন্য বেঁচে থাকার ধাত আমার নয়। আমি তাই ভেবেছি, নিজেকে বাঁধব না। আমি ঠিক করেছি, ভবিষ্যৎকে গড়ে উঠতে দেব। আজ আমার কাছে যা সব চেয়ে দামী, সব চেয়ে কাম্য, আমি সেটা পাওয়ার চেষ্টা করব। সেজন্য যদি ভবিষ্যতের মস্ত কোন পাওয়া ফস্কে যায়, যাবে। বড় ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার ভয়ে এতদিন কিছু গ্রহণ করার নামেই আমার আতঙ্ক হয়েছে, যদি বোঝা বেড়ে যায়। এখনও আমি বড় হতে চাই, যদিও ঠিক জানি না ভবিষ্যতটা কি রকম হলে আমি খুসী হব। কিন্তু সব দিক দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করার সাধ আমার নেই! এখন থেকেই আমি পাওয়া আদায় করতে করতে চলব, মনিদা!'

'সে তো ভাল কথা ত্রিষ্টুপ।'

একটু চিন্তিত ও বিষণ্ণভাবেই যেন মণীশ কথাটা বলিল। আজ প্রভাতের অভিনব উপলব্ধি এখন কথায় প্রকাশ করিবার সময়ে ত্রিষ্টুপ মণীশের কাছে সমর্থন পাওয়ার কথা ভাবে নাই, নিজের মনেই বলিয়া গিয়াছে। এখন সে উৎসুক দৃষ্টিতে মণীশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। জানালা দিয়া ঘরে একফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। মণীশ চাহিয়া দেখিতেছে তার সিগারেটের জ্বলন্ত মুখ হইতে নীলাভ ধোঁয়ার আকাবাঁকা উর্দ্ধগতি। সে যে কি ভাবিতেছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

'এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম মনিদা।'

'আমার কাছে? কি ব্যাপার ত্রিষ্টুপ?'

'আমি কুন্তলাকে বিয়ে করতে চাই।'

মণীশ এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

'তা হয় না তিষ্টু।'

এই অপ্রত্যাশিত জবাবে ত্রিষ্টুপ থতমত হইয়া গেল। অসহায়ের মত প্রশ্ন করিল, 'কেন?'

এতদিন তার জানা ছিল, সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে কি করিবে না, সমস্যা শুধু এই। তার খুসী হইলেই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে পারে, কারও আপত্তি হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই ধারণা লইয়াই সে এতদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে যে এখন বিবাহ করিয়া জড়াইয়া পড়িলে তার কোন মতেই চলিবে না, তা' কুন্তলাই হোক আর যেই হোক। আজ খানিক আগে মনস্থির করিয়া ফেলিবার সময়ে সে ভাবিতে পারে নাই, কেন মণীশ অমত করিবে।

'বোনের বিয়ে দেওয়া সম্পর্কে তুমি তো আমার মতামত জান ত্রিষ্টুপ। যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে, তার সঙ্গেই আমি ওর বিয়ে দেবো।'

ত্রিষ্টুপের মনে হইল—মণীশ যেন তাকে গাল দিয়াছে। তার সঙ্গে বিবাহ হইলে কুন্তলা সুখী হইবে না! সে যে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তাই কি মেয়েটার পরম সৌভাগ্য নয়? মণীশ কি এমনি মূর্খ যে, এই সহজ কথাটা তার কাছে এখনও ধরা পড়ে নাই, তার সঙ্গে বিবাহ না হইলেই চিরদিনের জন্য কুন্তলা অসুখী হইয়া যাইবে? তার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে সুখী হওয়ার উপায় এ জীবনে কুন্তলার আর নাই?'

'আমার সঙ্গে কুন্তলা সুখী হবে না?'

'না ভাই। তোমাদের মিল হবে না। ও তোমার যোগ্য নয়?'

মণীশ কি তামাসা করিতেছে তার সঙ্গে? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ত্রিষ্টুপ তার মুখ দেখিয়া মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলে, 'আপনি ওর মত জানেন?'

'মত জানি না; মন জানি।'

'তবে?'

মণীশকে আশ্চর্য হইয়া যাইতে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, প্রশ্নটা একটু গোঁয়ারের মতই করা হইয়াছে। এটা ঠিক প্রশ্ন হয় নাই, হইয়াছে কৈফিয়ৎ তলব। কুন্তলার মনের ভাব কি, সে বিষয়ে যেন কারো কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না; সুতরাং কুন্তলার মন জানিয়াও মণীশ অমত করিতেছে কেন? হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের বুকের একটি স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায়। কুন্তলার মনোভাব সম্পর্কে সে এত নিশ্চিত হইল কিসে? তার জন্য কুন্তলার হয়তো কোন মাথাব্যথা নাই, সবটা তার নিজেরই কল্পনা?

'কুন্তীর সঙ্গে কি তোমার কোন কথা হয়েছে, ত্রিষ্টুপ?'

'না।'

'তবে ?'

মণীশের পাল্টা প্রশ্নে ত্রিষ্টুপ একেবারে নিভিয়া গেল, মৃদুস্বরে বলিল, 'আপনাকেই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

তা' করোনি ভাই। তোমার কথা শুনে মনে হল আমার চেয়ে কুন্তীর মন তুমিই ভাল জান। এ তো ভারি মুস্কিলে ফেললে তুমি আমাকে।'

'আমার তাই মনে হয়। অবশ্য আপনি যদি বলেন—'

'আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হবে? আমি হলাম ওর দাদা গুরুজন। তুমি ভাববে, আমি কিছু জানি না, বুঝি না, কিম্বা জানলেও কর্তামি করার জন্য ছেলেমানুষী বলে, সব উড়িয়ে দিচ্ছি। তার চেয়ে এক কাজ করি, ওকে ডেকে দি'! তুমি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ।'

ত্রিষ্টুপ অভিভূত হইয়া বলিল, 'ও ছেলেমানুষ—'

'তবে ওর মনের কথা তুললে কেন?'

মণীশের কণ্ঠের রুক্ষতায় আহত হইয়া ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

'সেজন্য ছেলেমানুষ বলি নি। আমি বলছিলাম, আপনার অমত আছে জেনে ও হয়তো মনের কথা বলতে পারবে না!'

মণীশ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'জানো তিষ্টু, তোমার মনের এই জটিলতার জন্যই আমি অমত করছি সহজভাবে কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা তোমার নেই। আমার মত আছে, কি অমত আছে, কুন্তী জানবে কি করে'? আজ এসে তুমি প্রথম কথা তুললে। এ বিষয়ে আমরা কখনো আলোচনা করি নি।'

'আমি বুঝতে পারি নি, মনিদা!'

'মুস্কিল তো হয়েছে সেইখানে। সব কথাই তুমি নিজের মত করে' বুঝে নাও। যে ভাবে তুমি নিজে বুঝতে চাও সেই ভাবে।'

এ ঠিক মন্তব্য নয়, সমালোচনা। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও কঠোর সমালোচনা স্বীকার করা বা অস্বীকার করার ক্ষমতা ত্রিষ্টুপের ছিল না। নিজের সম্বন্ধে নিজেরই তার কত সংশয় আছে, কত প্রশ্ন আছে। কি করিবে স্থির করিয়া ফেলার সঙ্গে ওসব দ্বিধা সন্দেহের মীমাংসা তো আর হইয়া যায় নাই। কতদিক দিয়া কতভাবে নিজেকে তার আবিষ্কার করিতে হইবে, তাও কি এখনো সে জানে? তার সম্বন্ধে কেউ জোরের সঙ্গে কোন মত প্রকাশ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সত্য কি মিথ্যা, ঠিক করিয়া ফেলিবার মত ভাল করিয়া এখনো সে নিজেকে

চেনে না। মণীশের কথায় তার মধ্যে শুধু তীব্র একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, নিজেকে পরাজিত, অক্ষম, অপদার্থ মনে হইতে থাকে। নূতন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা শুরু করিয়া গোড়াতেই সে হার মানিল। তার প্রথম চাওয়া, প্রথম দাবী ব্যর্থ হইয়া গেল। অথচ কত সহজ সে ভাবিয়াছিল কুন্তলাকে পাওয়া!

'আমি যাই, মনিদা।'

পরিচিত ঘরখানা যেন অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহিরে যাইবে ভাবিয়া সে আগাইয়া যায় দরজার বদলে জানালার দিকে। জানালার কাছে এক মুহূর্ত বিফলের মত দাঁড়াইয়া থাকে, যেন ভুলিয়া গিয়াছে এবার সে কি করিবে। তারপর হঠাৎ সচেতন হইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

'তিষ্টু, শোন।'

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিতে পায় মণীশ চিন্তিতভাবে তার দিকে তাকাইয়া আছে।

'একটু বোসো তিষ্টু।'

ত্রিষ্টুপ নীরবে বসিয়া পড়িল।

'আমি কুন্তীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর, ও যদি রাজী থাকে আমি অমত করব না।'

'আপনিই বরং জিজ্ঞেস করুন।'

মণীশ মৃদু একটু হাসিল। সে ত্রিষ্টুপের ক্ষোভকে পরিণত করিয়া দিল ক্রোধে। খেলা করিতেছে, তার সমস্ত জীবন লইয়া মণীশ খেলা করিতেছে!

'না, তোমার জিজ্ঞেস করাই ভাল, তিষ্টু। আমি জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেবে আমি জানি। বলবে, 'আমি কিছু জানি নে দাদা, তোমার যা খুসী কর।'

ত্রিষ্টুপ ভাবিল, বটে! কুন্তলার দাদা-ভক্তি এত গভীর!

'তাছাড়া তোমার কথাটাও একটু ভাবতে হবে বৈকি। তুমি ইচ্ছে করলে আমি যা বলেছি কুন্তীকে জানিয়ে দিতে পার তিষ্টু। ও রাজী হলে আমি অমত করব না।'

মণীশ চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কুন্তলা ঘরে আসিল।

'বলুন কি ফরমাস আছে!'

'বোসো, কুন্তলা।'

কুন্তলা বসিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'মনিদাকে বলছিলাম, তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই।'

'ও!' বলিয়া কুন্তলা তার মুখ হইতে দৃষ্টিটা শুধু মেঝেতে নামাইয়া লইয়া গেল।

'তুমি তো জানো আমি তোমাকে—'

'দাদা কি বললেন?' ত্রিষ্টুপের প্রেমনিবেদনে বাধা দিয়া কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল।

'তোমার মত জানতে বললেন।'

ত্রিষ্টুপ জবাবের প্রতীক্ষা করে। কুন্তলা চুপ করিয়া থাকে।

'মনিদা বললেন, তুমি রাজী থাকলে তিনি মত দেবেন।'

'আমি কিছু জানি নে।'

'তুমি রাজী আছো তো?'

'দাদা যা বলবেন।'

ত্রিষ্টুপ কথা খুঁজিয়া পায় না। কুন্তলাকে তার খাপছাড়া, অদ্ভুত মনে হয়। চোখটি শুধু সে নত করিয়া রাখিয়াছে, কোন উত্তেজনার চিহ্নই তার মধ্যে খুঁজিয়া পায় না। কথা বলিতে গলাটি পর্যন্ত তার একটু কাঁপিয়া যাইতেছে না। অতি তুচ্ছ সাধারণ কথা যেন তারা আলোচনা করিতেছে।

'তোমার ইচ্ছেটা আমায় বলো। তারপর মনিদাকে জানাব।'

'আমার কোন ইচ্ছে নেই।'

'তোমার ইচ্ছে নেই!'

কুন্তলা চোখ তুলিয়া তার মুখে দৃষ্টি বুলাইয়া দেওয়ালের দিকে চাহিল।

'তা নয়। দাদা যা বলবেন তাই হবে। আমায় কেন জিজ্ঞেস করছেন? আমি কিছু জানি নে।'

'তুমি একি কথা বলছ কুন্তলা?'

'কেন?'

'মনিদা কি তোমার ভাল-লাগা না-লাগা ঠিক করে দেন? তোমার নিজের সখ নেই, সাধ আহ্লাদ নেই? পছন্দ নেই?'

'তা কেন থাকবে না?'

'আমাকে তুমি পছন্দ কর?'

'এ পছন্দের কথা নয়।'

'ভালবাস?'

'তা জানি না।'

খানিক আগে ঘরটা যেমন অপরিচিত ঠেকিয়াছিল, কুন্তলাকে এখন ত্রিষ্টুপের তেমনি অপরিচিত অজানা অচেনা মনে হইতে লাগিল। কুন্তলা যে কোনদিন তার কাছে এত সহজে বিনা চেষ্টায় এমন একটা ধাঁধাঁ হইয়া উঠিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

'আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি খুসী হবে?'

'জানি না?'

'তুমি তবে রাজী নও?'

'আমি রাজীও নই, অরাজীও নই। কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন আমাকে? যা বলবার দাদাকে বলুন।'

এ জবাবের পর আর কোন কথা চলে না। আর কিছু বলার সুযোগও কুন্তলা তাকে দিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ত্রিষ্টুপ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কি জানা গেল এতক্ষণ জেরা করিয়া? কিছুই নয়? তার সম্বন্ধে কুন্তলার অনুরাগ বা বিরাগ নাই, অন্ততঃ আছে কি নাই, কুন্তলা নিজে সে হিসাব রাখে না, এটা অবশ্য জানা গিয়াছে। কিন্তু ও জানা জানাই নয়। একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ত্রিষ্টুপকে পীড়া দিতে লাগিল, সে যেন কি একটা ছেলেমানুষী করিয়াছে—কুন্তলার কাছে করিয়াছে! তার নিজের স্বপ্নকে বাস্তব প্রমাণ করার জন্য শিশুর সঙ্গে তর্ক করার মত ছেলেমানুষী।

মণীশ আসিলে সে ঝাঁঝালো গলায় বলিল, 'মনিদা, এমনি করে আপনি বোনদের মানুষ করেছেন?

'কেমন করে ত্রিষ্টুপ?'

'চারিদিক থেকে মনের আঁটঘাট বেঁধে রেখে? আপনি বলে দিলে তবে কুন্তলা বুঝতে পারে ওর কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না!'

মণীশ মৃদু হাসিল।—"তুমি ভুল করছ তিষ্টু। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না। কুন্তলার মন স্বাধীন ভাবেই গড়ে উঠেছে। আমি শুধু ওর মনে রোমান্স সৃষ্টি হতে দিই নি। ওকে নিয়ে তোমার মনে যে প্রতিক্রিয়া চলছে, ও তা ধারণাও করতে পারবে না।'

ত্রিষ্টুপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

'মনিদা। আমি কুন্তলাকে বিয়ে করব।'

বলিয়া মণীশকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ত্রিষ্টুপের মনে হইল, আবার তার চিন্তাজগতে একটা ওলোট পালোট ঘটিবার

উপক্রম হইয়াছে, বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন রাত্রে হৈ-চৈ করবার পর যেমন হইয়াছিল। মনের অনেকটা আশ্রয় তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বড় একটা ভুল যে ধরা পড়ার সঙ্গে নূতন দৃষ্টির আলোয় আরও কত ছোট ছোট ভুল যে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তার সংখ্যা হয় না। অনেক ধারণা তাকে বদল করিতে হইবে, আয়ত্ত করিতে হইবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্য যাচাই করিবার জন্য শিখিতে হইবে নূতন হিসাব-শাস্ত্র।

সবচেয়ে ভয়ানক কথা এবারের ধাক্কায় তার আত্মবিশ্বাস যেন একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

মনে হইতেছে, এ আত্ম-বিশ্বাসের মূল্য কি যা নিজের ভুল ধারণাকেই শুধু প্রশ্রয় দেয়, যা অন্ধ একগুঁয়েমির সামিল?

কয়েকদিন মনের এলোমেলো গতির কোন হদিস ত্রিষ্টুপ পায় না। কখনো নিজেকে অকথ্য রকমের বিব্রত ও বিপন্ন মনে হয়, কখনো রাগে গা জ্বালা করিতে থাকে, কখনো হৃদয়ের সমস্ত চাপল্য ডুবিয়া যায় গভীর উদাস ভাবের থমথমে ব্যথিত শান্তিতে।

অথচ নিজের মধ্যে যে পরিবর্তনের জন্য সে অপেক্ষা করিয়া থাকে, সে পরিবর্তন আর আসে না। ভিতরে কেবল তোলপাড়ই চলিতে থাকে। আগের বার পরিবর্তন আসিয়াছিল স্পষ্ট ও সুনির্দ্ধারিত, কি করিবে, কোন পথে চলিবে নিঃসন্দেহে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। কি করিবে জানা থাকিলেও এবার যেন কোন মতেই খেয়াল হইতেছে না কোন পথে চলা দরকার। দিশেহারা ভাবটা কোন মতেই কাটিতেছে না।

কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে।

এটা তার করা চাই। মণীশের মত না থাক, কুন্তলা তাকে পছন্দ না করুক, কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে! এটা জিদের কথা নয়, গোয়ার্তুমি নয়, এই তার সঙ্কল্প। প্রেম চুলোয় যাক, সুখের নীড়ের স্বপ্ন আকাশে থাক। সে পুরুষ, সে কুন্তলাকে চায়। তাই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে। কুন্তলা তার কাম্য এবং প্রাপ্য —ওকে সে আদায় করিবে। যে ভাবেই হোক।

এ পর্যন্ত কোন গোলমাল নাই। প্রশ্ন শুধু এই—কি ভাবে? নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব তার জোটে না।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোর প্রক্রিয়া এখনো না জানায় ত্রিষ্টুপ বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে।

মা বলেন, 'তুই কিছু মনে করিসনে বাবা।'

ত্রিষ্টুপ চমকাইয়া ওঠে, 'কি বলছ তুমি ?'

'বলছি কি, ওঁর নানারকম বাতিক। উনি কি বলেন, কি করেন তাতে তুই রাগ করিসনে বাবা !'

'ও, এই কথা।'

ত্রিষ্টুপ স্বস্তি বোধ করে। প্রথমে তার মনে হইয়াছিল মণীশদের বাড়ী হইতে খবরটা বুঝি এ বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং মা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বলিতে আসিয়াছেন, তুই ভাবিসনে বাবা, কুন্তলার চেয়ে লক্ষগুণে সুন্দরী লেখাপড়া গানবাজনা-জানা বৌ তোর জন্য এনে দেব !

একবার এক মুহূর্তের জন্য ত্রিষ্টুপের মনে হইল, মাকে বলিলে কেমন হয় ? মার কাছে তার মনের কথা জানিয়া বাবা যদি মণীশের কাছে নূতন করিয়া বাঙ্গালী প্রথায় আবার প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন, কোন ফল হওয়ার আশা আছে কি ?

তারপর মণীশের কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। অত সহজে মণীশের মত বদলায় না। মণীশ শান্ত, কিন্তু বড় শক্ত। না ভাঙ্গিয়া ওকে মচকানো যাইবে কিনা সন্দেহ। তার চেয়ে বরং রমলার সঙ্গে পরামর্শ করিলে কাজ দিতে পারে।

বিকালে ত্রিষ্টুপ রমলাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে, পথের মোড়ে মণীশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হঠাৎ কি যে খেয়াল চাপিল ত্রিষ্টুপের !

'মনিদা ?'

'কি খবর তিষ্টু।'

কেমন একটু লজ্জা আর অস্বস্তি বোধ হইতেছে, মুখ তুলিয়া মণীশের চোখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল, তারও লজ্জা-সঙ্কোচ আছে।

'মা বলছিলেন, কুন্তলাকে একবার দেখতে চান। পাঠিয়ে দেবেন ?'

মণীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

'তুমি কি মাকে বলেছ ?'

'না।'

'তবে হঠাৎ—?'

'কুন্তলার কথা মাঝে মাঝে মাকে বলতাম—এমনি কথায় কথায়। সেইজন্য

হয়তো দেখতে ইচ্ছে হয়েছে মেয়েটি কেমন।' গায়ের জোরে মুখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ সোজা মণীশের চোখের দিকে তাকায়, 'হয়তো অন্য কথাও ভাবছেন, বলতে পারি না।'

'আচ্ছা, কুন্তলাকে বলব।'

'আমার কোন মতলব নেই মনিদা।'

'তোমার কি মতলব থাকবে।'

'আপনি যদি কিছু ভাবেন, আপনার যদি ভয় হয় তাই বলছিলাম।'

মণীশ শান্তভাবে সহানুভূতির সঙ্গে বলিল, 'এখনো তোমার মন শান্ত হয়নি তিষ্টু? এতো ভারি দুঃখের কথা হল।'

ত্রিষ্টুপ প্রাণপণ চেষ্টায় একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। 'না না, ভাববেন না। ওসব কিছু নয়।

রমলাদের বাড়ী পৌছানো পর্যন্ত সমস্ত পথ ত্রিষ্টুপ শুধু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গেল, হঠাৎ তার এই পাগলামী করার মানে কি? মণীশকে মিথ্যা বলিয়া কুন্তলাকে দু'একবার বাড়ীতে বেড়াইতে আনিয়া তার লাভ কি?

নিজের মনের কথাটা নিজের কাছেই ত্রিষ্টুপের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, আর কিছু নয়, মাঝে মাঝে বাড়ীতে আনিয়া কুন্তলাকে বশ করিবে। যেন সুযোগ পাইলেই মেয়েদের বশ করা যায়।

তারপর চিন্তাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ওরকম বশ করিয়া কি কোন লাভ হইবে মণীশের বোনকে? বশীকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও কি মণীশের বোন বলিবে না 'আমি কিছু জানি নে, দাদাকে জিজ্ঞেস করুন?' কুন্তলা যে এখন তাকে ভালবাসে না তাই বা কে বলিল! ভালবাসিয়াও হয়তো সে বলিয়াছে, দাদার কথাতেই তার মরণ-বাঁচন, তার নিজের কোন পৃথক্ ইচ্ছা নাই।

মণীশকে ত্রিষ্টুপের রূপকথার দানবের মত মনে হয়—তার রাজকন্যাকে সে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। এমন ঘুম পাড়াইয়াছে যে, রাজপুত্র আসিয়া জাগাইলেও, সে জাগে না—জাগিয়াও তন্দ্রার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু কুন্তলাকে জাগানো চাই, মণীশের মন্ত্রের প্রভাব ব্যর্থ করা চাই।

যদি চাই—তবে দোষ কি? কি দোষ এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে, যখন তাকে বিবাহ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না, তার সঙ্গে কুন্তলার বিবাহ দেওয়া ছাড়া মণীশের কোন উপায় থাকিবে না?

ভাবিলেও ত্রিষ্টুপের মাথা ঝিম-ঝিম করে, গলা শুকাইয়া যায়। দাঁতে দাঁত

কামড়াইয়া সে নির্জন ঘরে, জরাজীর্ণ ট্রামে বাসে, নিজের লড়াই করে। না, এতে কোন দোষ নাই। তার উদ্দেশ্য তো খারাপ নয়, সে তো বিবাহ করিবে কুন্তলাকে। আর কোন উপায় যখন নাই, এ উপায়টি বর্জন করা কাপুরুষতা।

শিশির নামে ত্রিষ্টুপের একজন বন্ধু ছিল, পাড়াতেই বাড়ী। বাড়ীর সকলে দেশে গিয়াছে, বাড়ীটা খালি। শিশির কেবল বাড়ীতে থাকে, খায় মেসে।

শিশিরের আপিস যাওয়ার সময়ে ত্রিষ্টুপ একদিন সদরের তালার চাবিটা চাহিয়া রাখিল।

'কেন ?'

'কাজ আছে।'

'আচ্ছা ?' শিশির হাসিতে হাসিতে আপিস চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা ত্রিষ্টুপ গেল মণীশদের বাড়ী। মণীশও বাহিরে যাইতেছিল, ত্রিষ্টুপের মুখ দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার জ্বর হয়েছে নাকি তিষ্টু ?'

ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'না—সাবান দিয়েছি, তাই চুল উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে।'

'চুল তোমার বেশ চকচক করছে, টেরি ভাঙেনি। মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে তুমি বড় অভিমানী, বড় একগুঁয়ে না ?'

'ছিলাম একটু। এখন ভাল ছেলে হয়ে গেছি। কুন্তলাকে নিয়ে যেতে এসেছি মনিদা।'

মণীশ এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে। প্রসন্ন শান্ত দৃষ্টিতেই সে ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু চোখে তার একটু সময়ের জন্য কঠিন প্রশ্ন উঁকি দিয়া যায়।

'নিয়ে যাও।'

ডাকিলেই কুন্তলা আসিল। তাকে দেখিয়াই ত্রিষ্টুপের মুখ একেবারে বিমর্ষ পাংশু হইয়া গেল, কেহ লক্ষ্য করিল কিনা, জানা গেল না।

'তিষ্টু তোমাকে ওদের বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছে কুন্তী।'

'এখন ?'

'তাই তো বলছে তিষ্টু।'

'যাব ?'

কুন্তলার এই একটি প্রশ্নে, মণীশের কাছে অনুমতি চাওয়ায়, ত্রিষ্টুপের বিবর্ণ মুখ চোখের পলকে রাঙা হইয়া গেল। কুন্তলার প্রশ্নের জবাব না দিয়া, মণীশ তার

মুখের দিকে চাহিয়া আছে খেয়াল করিয়া, জোরে সে নীচের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল।

মণীশ তখন বলিল, 'যা।'

কুন্তলা বলিল, 'চলুন যাই।'

ত্রিষ্টুপ বলিল, 'রিক্সা ডাকি?'

'রিক্সা কি হবে?'

'কাপড় বদলে এস তবে। আমি বসছি।'

'কাপড় বদলাতে হবে না। চলুন।'

মণীশ বাহিরে যাইতেছে, সে যদি তাদের সঙ্গ নেয়? মণীশ চলিয়া যাওয়ার খানিক পরে তাদের বাহির হওয়া দরকার।

'একগ্লাস জল দেবে কুন্তী?'

'দিই।' কুন্তলা জল আনিতে গেল।

'মনিদা, আমি একটু বিশ্রাম করে—'

মুখ ফিরাইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিল—মণীশ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে, সে টেরও পায় নাই।

শিশিরদের বাড়ীর সদর দরজায় ত্রিষ্টুপ তালা দিয়া যায় নাই, দরজা খোলাই ছিল। কুন্তলা ভিতরে গেলে ত্রিষ্টুপ দরজা বন্ধ করিল। কুন্তলা একথা সেকথা বলিতেছিল, তার যেন মুখ খুলিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে সায় দিতে গিয়াও ত্রিষ্টুপের গলায় আটকাইয়া যাইতেছিল। সব কেমন অবাস্তব, স্বপ্নের মত মনে হইতেছে, অথচ বাস্তবতার অনুভূতির চাপে প্রাণটা তার হাঁসফাঁস করিতেছে। নিজেকে কত বার এই পরিস্থিতিতে ধীর স্থির আত্মপ্রতিষ্ঠ বীরের মত সে কল্পনা করিয়াছে, কুন্তলার কাল্পনিক আর্তনাদে পর্যন্ত সে বিচলিত হয় নাই, সঙ্কল্পে অটল থাকিয়াছে। কুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে ঢুকিবার আগে হইতেই যে, তার হৃদয়-মন এমন অবাধ্যপণা আরম্ভ করিবে, কে জানিত!

উপরে শিশিরের দাদার শোবার ঘরে সে কুন্তলাকে লইয়া গেল। ঘরে বসিবার ব্যবস্থাও ছিল, খাটে বিছানাও পাতা ছিল। পাশাপাশি বালিশ পাতা। নবপরিণীতা স্বামীস্ত্রীর সে শয্যার দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপ যেন চমকিয়া গেল। কুন্তলার পিছু পিছু সবে সে ঘরের ভিতরে পা দিয়াছিল, হঠাৎ নিঃশব্দে বাহির হইয়া বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুন্তলা ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ত্রিষ্টুপকে ডাকিল

না, কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না।

কুন্তলার এই নীরবতাই শেষ পর্যন্ত ত্রিষ্টুপকে ভিতরে টানিয়া আনিল।

'এটা আমাদের বাড়ী নয় কুন্তী।'

'জানি।'

কুন্তলা আবার বলিল, 'আপনাদের বাড়ী আমি চিনি।'

'তবে এলে কেন?'

'দাদা আসতে বললেন।'

ত্রিষ্টুপ একটা চেয়ার টানিয়া কুন্তলার মুখোমুখি বসিল।

'এ বাড়ীতে কেউ নেই জান?'

'জানি।'

'তবে যে এলে?'

'বললাম তো দাদা আসতে বললেন।'

ত্রিষ্টুপ এবার চটিয়া গেল। 'দাদা! দাদা! দাদা! তোমার মত এমন দাদা-ভক্ত কখনও দেখিনি কুন্তী।'

কুন্তলা একটু হাসিল।

ত্রিষ্টুপ আরও চটিয়া গেল।—'তোমায় এখানে কেন এনেছি জান? বিয়ে করব বলে। দরকার হলে জোর করে' বিয়ে করব বলে। বুঝতে পারছ সেটা কি?'

কুন্তলা মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, 'দাদা বলছিল, আপনি ভয়ানক একগুঁয়ে।'

ত্রিষ্টুপ ক্লিষ্ট জ্বালাভরা হাসি হাসিল।—'একগুঁয়ে? তোমার দাদা তাই জানে। একগুঁয়ে হলে, এত করে' তোমাকে এখানে এনে মত বদলাতাম না কুন্তী। আমার এতটুকু মনের জোর নেই। তোমাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ছেড়ে না দিলে কি হত?'

'আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার কোন উপায় থাকত না। মণিদাকেও বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে হত।'

কুন্তলা মুখ নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আপনি দাদাকে জানেন না।'

ত্রিষ্টুপ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'বল কি! আজ আমাদের আসল বিয়েটা হয়ে গেলেও, তোমার দাদা সামাজিক বিয়ে দিতেন না? বেশ, বেশ! তারপর তোমার

দাদার পছন্দমত বরের সঙ্গেই বিয়ের আয়োজন হলে তুমিও বোধ হয় দাদার আজ্ঞা মাথায় ক'রে রাজী হয়ে যেতে?'

'দাদা আপনাকে চেনেন, তাই আমাকে আসতে দিয়েছেন দেখছেন তো দাদার ভুল হয় নি?'

ত্রিষ্টুপের সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া মণীশের বিরুদ্ধে একটা দুঃসহ ক্রোধে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কুন্তলার কথায় তার মাথা খারাপ হইয়া গেল।

'ভুল হয়নি? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি ভুল হয়েছে কিনা!'

কুন্তলার হাত ধরিয়া সে হিড়হিড় করিয়া বিছানার কাছে টানিয়া লইয়া গেল। নিজে বসিয়া দু'হাতে তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তখন সে অনুভব করিল, কুন্তলার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা টিপ্-টিপ্ করিতেছে। এতক্ষণ পরে কুন্তলার মুখ একটু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তার চোখে দেখা দিয়াছে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি!

'ভুল হয়নি মনিদার?'

'না!'

কুন্তলার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে ত্রিষ্টুপের হাতের বন্ধন আল্‌গা হইয়া আসিল। কুন্তলা ইচ্ছা করিলেই সরিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু ত্রিষ্টুপ সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত সে নড়িল না।

'আমি হার মানলাম কুন্তী, মনিদার ভুল হয়নি।'

'সংস্কার কি এত সহজে জয় করা যায়?'

'সংস্কার নাকি?'

'অসহায়ের ওপর দরদ আপনার রক্তে মিশে আছে।'

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া রহিল।

'চল তোমায় দিয়ে আসি কুন্তী!'

'চলুন!'

কিন্তু কেউ উঠিল না, দু'জনেই যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। ত্রিষ্টুপ সহজ সুরে বলিল, 'আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে অনেক কিছু আদায় করব বলে ছকেছিলাম তার মধ্যে প্রথম ছিলে তুমি। প্রথমটাতেই ব্যর্থ হব?—ভাবলেই মনে হচ্ছিল সমস্ত জীবনটাই তা'হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কোন উপায় ছিল না, তাই এই খাপছাড়া উপায়টা দিয়ে চরম চেষ্টা করব ভেবেছিলাম। অন্য উপায় থাকলে—'

'অন্য উপায় তো ছিল!'

'ছিল কি উপায়?'

'আদায়ের যে ছক করেছিলেন সে বদলে ফেলুন।'

'তাতে কি হত?'

'দাদা রাজী হতেন। আপনি ঠিক করেছেন বড় হবেন। টাকা-পয়সা, মানসম্রম, এসব নিয়ে যারা বড় হয়, দাদার কাছে তাদের কোন দাম নেই। আপনি একগুঁয়ে মানুষ, যা, ধরবেন তা' ছাড়বেন না। একদিন মস্ত লোক হবেন, মোটর হাঁকাবেন, দেশ জুড়ে' খ্যাতি লাভ করবেন—এই আপনার প্রতিজ্ঞা। আপনার সঙ্গে আমার কখনও বিয়ে হয়?'

'কেন?'

'আমাদের ছক আলাদা। আমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করেছি—জীবন দিয়ে কি আদায় করব।'

'কি আদায় করবে?'

'স্বাধীনতা।'

ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল 'ও!'

কুন্তলা ব্যগ্রভাবে বলিল, 'বুঝতে পারছেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে কেন অসম্ভব? আপনি যা' চান, সে সব আদায় যারা করেছে, তারা হল এক জাত; আর তাদের পায়ের নিচে যারা চ্যাপ্টা হয়ে মরছে, তারা হল আর জাত। আমরা ওই জাতের। বেজাতের হাতে দাদা কখনও বোনকে দিতে পারে?'

'কেরাণীরা তো তোমাদের স্বজাত? তোমার দিদিকে তো কেরাণীর হাতে দেওয়া হয়েছে। আমিও কেরাণী।'

কুন্তলা আঁচল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর হাসিল।—'কেরাণীর কোন জাত নেই। জামাইবাবু আমাদের জাতের লোক পেটের জন্য কেরাণীগিরি করছেন। জামাইবাবু দু'বছর পরে এই সেদিন ফিরেছেন, জানেন না?'

ত্রিষ্টুপ জানিত না। কিই বা সে জানিত? আশী টাকার কেরাণী ও রমলার ঘরে আনন্দের ছড়াছড়ি দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মণীশকে সে ভাবিয়াছিল খাপছাড়া রহস্যময় মানুষ! কুন্তলাকে সে ধরিয়া রাখিয়াছিল আত্মচেতনাহীন সৃষ্টিছাড়া পরবশ মেয়ে! জীবনাদর্শ কত সহজ ও কত স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এসবের! ত্রিষ্টুপ খাট ছাড়িয়া কুন্তলার কাছে গিয়া বসিল।

'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব কুন্তী। আমার প্রথম আদায় ফস্কে গেল,

ছকটাও ওলট-পালট হয়ে গেল। আমি যদি নতুন ছক কাটি, যদি তোমাদের জাতে উঠতে চাই। মনিদা রাজি হবেন?'

'নিশ্চয়! কিন্তু মত বদলানো বড় কঠিন।'

'সে আমি বুঝব। তুমি রাজি হবে?'

'দাদা রাজি হলে—'

ত্রিষ্টুপ অসহিষ্ণুর মত বাধা দিয়া বলিল, 'তোমার নিজের কথা বল। মনে কর তোমার আর আমার জীবনের আদর্শের একচুল তফাৎ রইল না। তখন যদি মনিদাকে বলার আগে তোমাকে বলি, মনিদাকে জিজ্ঞেস না ক'রেই তুমি তোমার মত জানাবে?'

কুন্তলা বলিতে গেল, 'ওসব যদি টদির কথা—'

ত্রিষ্টুপ প্রায় ধমক দিয়া বলিল, 'যদির কথাই বল। রাজী হবে?'

'হব।'

চতুষ্কোণ

ভূমিকা

রাজকুমারের মত অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানারকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এই 'অনেক' যারা, তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হল। রাজকুমার একটু বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

-লেখক

বেলা তিনটার সময় রাজকুমার টের পাইল, তার মাথা ধরিয়াছে। এটা নূতন অভিজ্ঞতা নয়, মাঝে মাঝে তার ধরে। কেন ধরে সে নিজেও জানে না, তার ডাক্তার বন্ধু অজিতও জানে না। তার চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, ব্লাডপ্রেসার ঠিক আছে, হজমশক্তি ঠিক আছে,—শরীরের সমস্ত কলকব্জাগুলিই মোটামুটি এতখানি ঠিক আছে যে, মাঝে মাঝে মাথাধরার জন্য তাদের কোনটিকেই দায়ী করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মাথা ধরে।

অজিত অবশ্য এক জোড়া কারণের কথা বলিয়াছে: আলসেমি আর স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতিতে অবহেলা। রাজকুমার তার এই ভাসা ভাসা আবিষ্কারে বিশ্বাস করে না। প্রথম কারণটা একেবারেই অর্থহীন, সে অলস নয়, তাকে অনেক কাজ করিতে হয়। দ্বিতীয় কারণটা যুক্তিতে টেঁকে না, স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতি না মানিলে স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে, মাথা ধরিবে কেন?

অজিত খোঁচা দিয়া বলিয়াছেন: তোর স্বাস্থ্য খুব ভালো, না?

অসুখে তো ভুগি না।

মাথা ধরাটা—

মাথা ধরা অসুখ নয়।

মাথা খারাপ হওয়াটা?

আজ গোড়াতেই মাঝে মাঝে সাধারণ মাথা ধরার সঙ্গে আজকের মাথাধরার তফাৎটা রাজকুমার টের পাইয়া গেল। দু'চার মাস অন্তর তার এরকম খাপছাড়া মাথাধরার আবির্ভাব ঘটে। নদীতে জোয়ার আসার মত মাথায় একটা ভোঁতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার সঞ্চার সে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, তারপর বাড়িতে বাড়িতে পরিপূর্ণ জোয়ারের মত যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে থমথম করিতে থাকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না। মাথাধরা কমানোর ওষুধে শুধু যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়ে, ঘুমের ওষুধে যন্ত্রণাটা যেন আরও বেশী ভোঁতা আর ভারি হইয়া দম আটকাইয়া দিতে চায়।

খাটের বিছানায় তিনটি মাথার বালিশের উপর একটি পাশবালিশ চাপাইয়া আধশোয়া অবস্থায় রাজকুমার বসিয়া ছিল। তৃষ্ণায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। মাথা ধরিলে রাজকুমারের এরকম হয়। সাধারণ জল, ডাবের জল, সরবৎ কিছুতেই তার তৃষ্ণা মেটে না। এটাও তার জীবনের একটা দুর্বোধ্য রহস্য। শুকনো মুখের অপ্রাপ্য রস গিলিবার চেষ্টার সঙ্গে চাষার গরু তাড়ানোর মত একটা আওয়াজ করিয়া সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

চারকোণা মাঝারি আকারের ঘর, আসবাব ও জিনিষপত্রে ঠাসা। এই ঘরখানাই রাজকুমারের শোয়ার ঘর, বসিবার ঘর, লাইব্রেরী, গুদাম এবং আরও অনেক কিছু। অনেক কালের পুরাণো খাটখানাই এক চতুর্থাংশ স্থান—আরও একটু নিখুঁত হিসাব ধরিলে $\frac{৪৫৭}{১৭৭৬}$ স্থান, রাজকুমার একদিন খেয়ালের বশে মাপিয়া দেখিয়াছে,—দখল করিয়া আছে। বই বোঝাই তিনটি আলমারি ও একটি টেবিল, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ওষুধের শিশি, কাচের গ্লাস, চায়ের কাপ, জুতোপালিশের কৌটা, চশমার খাপ প্রভৃতি অসংখ্য খুঁটিনাটি জিনিষে বোঝাই আরেকটি টেবিল, তিনটি চেয়ার, একটি ট্রাঙ্ক এবং দুটি বড ও একটি ছোট চামড়ার সুটকেশ, ছোট একটি আলনা, এ সমস্ত কেবল পা ফেলিবার স্থান রাখিয়া বাকী মেঝেটা আত্মসাৎ করিয়াছে।

তবে রাজকুমার কোনরকম অসুবিধা বোধ করে না। এ ঘরে থাকিতে তার বরং রীতিমত আরাম বোধ হয়। ঘরখানা যেমন জিনিষপত্রে বোঝাই, তেমনি অনেক দিনের অভ্যাস ও ঘনিষ্ঠতার স্বস্তিতেও ঠাসা।

এই ঘরে মাথাধরার যন্ত্রণা সহ্য করিবার মধ্যেও যেন মৃদু একটু শান্তি আর স্বান্তনার আমেজ আছে। জগতের কোটি কোটি ঘরের মধ্যে এই চারকোণা ঘরটিতেই কেবল নির্বিকার অবহেলার সঙ্গে গা এলাইয়া দিয়া সে মাথার যন্ত্রণায় কাবু হইতে পারে।

মাথাধরা বাড়িবার আগে এবং স্থায়ীভাবে গা এলানোর আগে কয়েকটি ব্যবস্থা করিয়া ফেলা দরকার। মনে মনে রাজকুমার ব্যবস্থাগুলির হিসাব করিতে লাগিল। রসিকবাবুর বাড়ী গিয়া গিরীন্দ্রনন্দিনীর মাকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ রাত্রে তাদের বাড়ী খাওয়া অসম্ভব। অবনীবাবুর বাড়ী গিয়া মালতীকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ সে তাকে পড়াইতে যাইতে পারিবে না। স্যার কে, এল-এর বাড়ী গিয়া রিণিকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ তার সঙ্গে কারো পার্টিতে যাওয়া বা জলতরঙ্গ বাজনা শোনানোর ক্ষমতা তার নাই। কেদারবাবুর বাড়ী গিয়া সরসীকে

বলিয়া আসিতে হইবে, সমিতির সভায় গিয়া আজ সে বক্তৃতা দিলে, সকলে শুধু 'উঃ আঃ' শব্দই শুনিতে পাইবে। রাজেনকে একটা ফোন করিয়া দিতে হইবে, কাল সকালে কাজে ফাঁকি না দিয়া তার উপায় নাই।

এই কাজগুলি শেষ করিতে বেশীক্ষণ সময় লাগিবে না, গিরি, মালতী, রিণি আর সরসী চার জনের বাড়ীই তার বাড়ীর খুব কাছে, একরকম পাশের বাড়ীই বলা যায়। পশ্চিমে বড় রাস্তার ধারে স্যর কে, এল-এর প্রকাণ্ড বাড়ীর পিছনে তার বাড়ীটা আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে, স্যর কে, এল-এর বাড়ীর পাশের গলি দিয়া দিয়া ঢুকিয়া তার বাড়ীর সদর দরজায় পৌঁছিতে হয়। উত্তরে গলির মধ্যে তার বাড়ীর আর দিকে কেদার বাবুর বাড়ী। পূবে গলির মধ্যে আর একটু আগাইয়া গেলে ডান দিকে যে আরও ছোট গলিটা আছে তার মধ্যে ঢুকিলেই বাঁ দিকে অবনীবাবুর বাড়ী। দক্ষিণে ছোট গলিটা ধরিয়া খানিক আগাইয়া ডানদিকে হঠাৎ মোর ঘুরিবার পর রসিকবাবুর বাড়ী এবং গলিটারও সেইখানে সমাপ্তি। রিণি আর সরসী দুজনের বাড়ীতেই ফোন আছে, রাজেনকে ফোন করিতেও হাঙ্গামা হইবে না।

কতকটা পাঞ্জাবী এবং কতকটা সার্টের মত দেখিতে তার আর নিজস্ব ডিজাইনের জামাটি গায়ে দিয়া রাজকুমার ঘরের বাহিরে আসিল।

বাড়ীর দোতলার অর্দ্ধেকটা দখল করিয়া আছে স্বামি-পুত্র এবং স্বামীর দু'টি ভাইবোন সহ মনোরমা নামে রাজকুমারের এক দূর সম্পর্কের দিদি। প্রথমে তারা ভাড়াটে হিসাবেই আসিয়াছিল। এবং প্রথম মাসের বাড়ী ভাড়াও দিয়াছিল ভাড়াটে হিসাবেই। কিন্তু সেই এক মাসের মধ্যে প্রায়-সম্পর্কহীন ভাইবোনের সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ানোয় মনোরমা একদিন বলিয়াছিল, ছাখো ভাই রাজু, তোমার হাতে ভাড়ার টাকা তুলে দিতে কেমন যেন লজ্জা করে।

শুনিয়া রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সেরেছে! এই জন্য সম্পর্ক আছে এমন মানুষকে ভাড়াটে দিতে অজিত বারণ করেছিল!

মনোরমা আবার বলিয়াছিল, ভাড়া নেওয়ার সম্পর্ক তো তোমার সঙ্গে আমাদের নয়।

রাজকুমার কথা বলে নাই। বলিতে পারে নাই।

—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না? একলা মানুষ তুমি, ঠাকুর চাকর রেখে হাঙ্গামা পোয়াবার তোমার দরকার? আমি থাকতে ঠাকুরের রান্নাই বা তোমাকে খেতে হবে কেন?

গজেন মন্দ রাঁধে না।

আহা, কি রান্নাই রাঁধে! কদিন খেয়েছি তো এটা ওটা চেয়ে নিয়ে। জিভের স্বাদ তোমার নষ্ট হয়ে গেছে রাজু ভাই, দু'দিন আমার রান্না খেয়ে ওর ডাল তরকারী মুখে দিতে পারবে না।

প্রস্তাবটা প্রথমে রাজকুমারের ভাল লাগে নাই। একে নিজের জন্য ঠাকুর চাকর রাখিয়া সংসার চালানোর যত হাঙ্গামাই থাক, যে ভাবে খুসী সংসার চালানো এবং যা খুসী করা, যখন খুসী আর যা খুসী খাওয়ার সুখটা আছে। কিন্তু এখন মনোরমা আর অজানা অচেনা প্রায় সম্পর্কহীনা আত্মীয়া নয়, এক মাসে সে প্রায় আসল দিদিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তার এ ধরণের প্রস্তাবে না-ই বলা যায় কেমন করিয়া?

সেই হইতে মনোরমা ভাড়ার বদলে রাজকুমারকে চার বেলা খাইতে দেয়, তার ঘরখানা গুছানো ছাড়া দরকারী অন্য সব কাজও করিয়া দেয়। রাজকুমার তার ঘর গুছাইতে দিলে যে মনোরমা নিজেই হোক বা তার ননদকে দিয়াই হোক এ কাজটা করিয়া দিত, তাতেও কোন সন্দেহ নাই।

রাজকুমার বাহিরে যাইতেছে টের পাইয়া মনোরমা ডাকিল কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজু ভাই, শুধু একটিবার?

দিনের মধ্যে রাজকুমারকে সে অন্ততঃ আট দশ বার ডাকে কিন্তু প্রত্যেকবার তার ডাক শুনিয়া মনে হয়, এই তার প্রথম এবং শেষ আহ্বান, আর কখনো ডাক দিয়া সে রাজকুমারকে বিরক্ত করিবে না। দক্ষিণের বড় লম্বাটে ঘরখানার মেঝেতে বসিয়া মনোরমা সেলাই করিতেছিল। এ ঘরে আসবার খুব কম। খাট, ড্রেসিং টেবিল আর ছোট একটি আলমারি ছাড়া আর যা আছে সে সবের জন্য বেশী জায়গা দিতে হয় নাই। পরিষ্কার লাল মেঝেতে গরমের সময় আরামে গড়াগড়ি দেওয়া চলে।

এত শীগগিরি যাচ্ছ কেন রাজু ভাই?

সেখানে যাচ্ছি না।

কোথায় যাচ্ছ তবে?

একটা ফোন করে আসব।

ও, ফোন করবে। পাঁচটার সময় ওখানে যেও, তা' হলেই হবে। কালী সেজে গুজে ঠিক্‌ঠাক হয়ে থাকবে, বলে দিয়েছি।

আজ যেতে পারব না দিদি।

মনোরমা হাসিমুখে বলিল, পারবে না? একটা কাজের ভার নিয়ে শেষকালে ফ্যাসাদ বাধানোর স্বভাব কি তোমার যাবে না, রাজুভাই? কালীকে আজ আনাব বলে রেখেছি, কত আশা করে আছে মেয়েটা, কে এখন ওকে আনতে যাবে?

আমার মাথা ধরেছে—ধরেছে।

আবার মাথা ধরেছে? কতবার বললাম একটা মাদুলি নাও—না না, ওসব কথা আর আরম্ভ ক'রো না রাজু ভাই, ওসব আমি জানি, আমি মুখ্যু গেঁয়ো মেয়ে নই। মাদুলি নিলে মাথাধরা সেরে না যাক, উপকার হবে।

ছাই হবে।

কিছু উপকার হবেই। ভূতেও তো তোমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু রাত দুপুরে একা একা শ্মশান ঘাটে গিয়ে দেখো তো একবার ভয় না করলেও দেখবে কেমন কেমন লাগবে। অবিশ্বাস করেও তুমি একটা মাদুলি নাও, আমার কথা শুনে নাও, মাথার যন্ত্রণা অন্ততঃ একটু কম হবেই।

মনোরমা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

মাথা ধরুক আর যাই হোক, কালীকে তোমার আনতে যেতে হবেই রাজুভাই। না গেলে কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

বেশ বুঝা যায়, মনোরমা রাগ করে নাই, শুধু অভিমানে মুখ ভার করিয়াছে। স্নেহের অভিমান, দাবীর অভিমান।

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা দেখি। যেতে পারলে যাব'খন।

গিরীন্দ্রনন্দিনীর মা ঘরে ঘুমাইতেছিল। গিরি নিজেই দরজা খুলিয়া দিল। রোগা লম্বা পনের ষোল বছরের মেয়ে, তের বছরের বেশী বয়স মনে হয় না। রাজকুমারের পরামর্শে রসিকবাবু মেয়েকে সম্প্রতি একটি পুষ্টিকর টনিক খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। টনিকের নামটা রাজকুমার অজিতের কাছে সংগ্রহ করিয়াছিল।

অজিত বলিয়াছিল, এমন টনিক আর হয় না রাজু। ভুল করে একবার একটা সাত বছরের মেয়েকে খেতে দিয়েছিলাম, তিন মাস পরে মেয়েটার বাবা পাগলের মত তার বিয়ের জন্ম পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করল।

গিরি মাসখানেক টনিকটা খাইতেছে কিন্তু এখনও কোন ফল হয় নাই। তবু সেমিজ ছাড়া শুধু ডুরে শাড়ীটি পরিয়া থাকার জন্ম গিরি যেন সঙ্কোচে একেবারে কাবু হইয়া গেল। যতই হোক, বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তো, পনের

ষোল বছর বয়স তো তার হইয়াছে। ডুরে শাড়ী দিয়া ক্রমাগত আরও ভালভাবে নিজেকে ঢাকিবার অনাবশ্যক ও খাপছাড়া চেষ্টার জন্য গিরির মত অল্প অল্প বোকাটে ধরণের সহজ সরল হাসিখুসী ছেলেমানুষ মেয়েটাকে পর্যন্ত মনে হইতে লাগিল বয়স্বা পাকা মেয়েমানুষ।

ছোট উঠান, অতিরিক্ত ঘষা থাকায় ঝকঝকে, তবু যেন অপরিচ্ছন্ন। কলের নীচে ছড়ানো এঁটো বাসন, একগাদা ছাই, বাসন মাজা ন্যাতা, ক্ষয় পাওয়া ঝাঁটা, নালার ঝাঁঝরার কাছে পানের পিকের দাগ, সিঁড়ির নীচে কয়লা আর ঘুঁটের স্তূপ, শুধু এই কয়েকটি সঙ্কেতেই যেন সযত্নে সাফ করা উঠানটি নোংরা হইয়া যাইতেছে।

কোথা পালাচ্ছ ? শুনে যাও ?

একধাপ সিঁড়িতে উঠিয়া গিরি দাঁড়াইল এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার যা বলিতে আসিয়াছে শুনিল। তারপর কাতরভাবে অভিমানের ভঙ্গিতে খোঁচা দেওয়ার সুরে বলিল, তা খাবেন কেন গরীবের বাড়ীতে !

আমার ভীষণ মাথা ধরেছে গিরি।

মাথা আমারও ধরে। আমি তো খাই !

তুমি এক নম্বরের পেটুক, খাবে বৈকি !

আমি পেটুক না আপনি পেটুক ? সেদিন অতগুলো ক্ষীরপুলি—গিরি খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ডুরে শাড়ী সংক্রান্ত কুৎসিত সঙ্কেতের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের মন হইতে মিলাইয়া গেল রোদের তেজে কুয়াশার মত। একটু গ্লানিও সে বোধ করিতে লাগিল। নিজের অতিরিক্ত পাকা মন নিয়া জগতের সরল সহজ মানুষগুলিকে বিচার করিতে গিয়া হয়তো আরও কতবার সে অমনি অবিচার করিয়াছে। নিজের মনের আলোতে পরের সমালোচনা সত্যই ভাল নয়।

কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত করিয়া সে বলিল, সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব কিনা, তাই খেতে আসতে পারব না।

খেয়ে গিয়ে বুঝি শুয়ে থাকা যায় না ?

খেলে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। আজ উপোস দেব ভাবছি।

গিরি গম্ভীর হইয়া বলিল, না খেলে মাথাধরা আরও বাড়বে। শরীরে রক্ত কম থাকলে মাথা ধরে। খাদ্য থেকে রক্ত হয়।

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, তোমার সেই ডাক্তার বলেছে বুঝি যে তোমার নাড়ী খুঁজে পায় নি ?

কয়েক মাস আগে গিরির জ্বর হইয়াছিল, দেখিতে আসিয়া ডাক্তার নাকি তার কব্জি হাতড়াইয়া নাড়ী খুজিয়া পান নাই! হয়তো নাড়ী খুব ক্ষীণ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, গিরির পাল্‌স নাই। সেই হইতে গিরি সগর্বে সকলের কাছে গল্প করিয়া বেড়ায়, সে এমন আশ্চর্য মেয়ে যে তার পাল্‌স পর্যন্ত নাই। সকলের যা আছে তার যে তা নাই, এতেই গিরির কত আনন্দ, কত উত্তেজনা। রাজকুমারের কাছেই সে যে কতবার এ গল্প বলিয়াছে তার হিসাব হয় না। রাজকুমার অনেকবার তাকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, কি ভাবে মানুষের হার্টের কাজ চলে, কি ভাবে শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল করে—অনেক কিছু বুঝাইয়া বলিয়াছে। বোকা মেয়েটাকে নানা কথা বুঝাইয়া বলিতে তার বড় ভাল লাগে। কিন্তু গিরি বুঝিয়াও কিছু বুঝিতে চায় না।

সত্যি আমার নাড়ী নেই। আপনার বুঝি বিশ্বাস হয় না?

বাঁচিয়া থাকার সঙ্গে নাড়ীর স্পন্দন বজায় থাকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাটা রাজকুমার অনেকবার গিরিকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, কোনদিন তার হাত ধরিয়া নাড়ীর অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে নাই। আজ সোজাসুজি গিরির ডান হাতটি ধরিয়া বলিল, দেখি, কেমন তোমার নাড়ী নেই।

গিরি বিব্রত হইয়া বলিল, না না, আজ নয়। এখন নয়।

রাজকুমার হাসিমুখে বলিল, এই তো দিব্বি টিপ্ টিপ্ করছে পাল্‌স্।

গিরি আবার বলিল, থাক না এখন, আরেকদিন দেখবেন।

গিরির মুখের ভাব লক্ষ্য করিলে রাজকুমার নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ছাড়িয়া দিয়া তফাতে সরিয়া যাইত এবং নিজের পাকা মনের আলোতে জগতের সহজ সরল মানুষগুলিকে বিচার করিবার জন্য একটু আগে অনুতাপ বোধ করার জন্য নিজেকে ভাবিত ভাবপ্রবণ। কিন্তু গিরির সঙ্গে তামাসা আরম্ভ করিয়া অন্যদিকে তার মন ছিল না।

হাসির বদলে মুখে চিন্তার ছাপ আনিয়া সে বলিল, তোমার পালস্ তো বড আস্তে চলছে গিরি। তোমার হার্ট নিশ্চয় খুব দুর্বল। দেখি—

ডুরে শাড়ীর নীচে যেখানে গিরির দুর্বল হার্ট স্পন্দিত হইতেছিল, সেখানে হাত রাখিয়া রাজকুমার স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করিতে লাগিল। গিরির মুখের বাদামী রঙ প্রথমে হইয়া গেল পাঁশুটে, তারপর হইয়া গেল কালোটে। একে আজ গায়ে তার সেমিজ নাই, তারপর চারিদিকে নাই মানুষ। কি সর্বনাশ!

ছি ছি! এসব কি!

রাজকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি হয়েছে?

গিরি দমক মারিয়া তার দিকে পিছন ফিরিয়া, একবার হোঁচট খাওয়ার উপক্রম করিয়া তরতর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। রাজকুমার হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। একি ব্যাপার?

ব্যাপার বুঝা গেল কয়েক মিনিট পরে উপরে গিয়া। গিরির মা পাটিতে পা ছড়াইয়া হাতে ভর দিয়া বসিয়া আছেন। দেখিলেই বুঝা যায়, সবে তিনি শয়নের আরাম ছাড়িয়া গা তুলিয়াছেন,—বসিবার ভঙ্গিতেও বুঝা যায়, মুখের ভঙ্গিতেও বুঝা যায়। মানুষটা একটু মোটা, গা তোলার পরিশ্রমেই বোধ হয় একটু হাঁপও ধরিয়া গিয়াছে।

রাজকুমার বলিতে গেল, গিরি—

গিরির মা বাধা দিয়া বলিলেন, লজ্জা করে না? বেহায়া নচ্ছার কোথাকার।

এমন সহজ সরল ভাষাও যেন রাজকুমার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

গিরির মা আবার বলিলেন, বেরো হারামজাদা, বেরো আমার বাড়ী থেকে।

গিরির মার রাগটা ক্রমেই চড়িতেছিল। আরও যে কয়েকটা শব্দ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সেগুলি সত্যই অশ্রাব্য।

রাজকুমার ধীরে ধীরে রসিকবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, ক্ষুব্ধ আহত ও উদ্‌ভ্রান্ত রাজকুমার। ব্যাপারটা বুঝিয়াও সে যেন ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ যেন একটা যুক্তিহীন ভূমিকাহীন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তার কেবলি মনে হইতে লাগিল, দামী জামা কাপড় পরিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল, হঠাৎ কি ভাবে যেন পচা পাঁক ভরা নর্দমায় পড়িয়া গিয়াছে। এইরকম একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার পর্যায়ে না ফেলিয়া এ ব্যাপারটা যে সত্য সত্যই ঘটিয়া গিয়াছে একথা কল্পনা করাও তার অসম্ভব মনে হইতেছিল।

নিছক দুর্ঘটনা,—কারও কোন দোষ নাই, দোষ থাকা সম্ভব নয়। ভুল বুঝিবার মধ্যে তো যুক্তি থাকে মানুষের, ভুল বুঝিবার সপক্ষে ভুল যুক্তির সমর্থন? গায়ে কেউ ফুল ছুঁড়িয়া মারিলে মনে হইতে পারে ফাজলামি করিয়াছে, সহানুভূতির হাসি দেখিয়া মনে হইতে পারে ব্যঙ্গ করিতেছে, কিন্তু ফুল আর হাসির আঘাতে

হত্যা করিতে চাহিয়াছে একথা কি কোনদিন কারো মনে হওয়া সম্ভব ? কতটুকু মেয়েটা! বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করিবার সময় বুকটা তার বালকের বুকের মত সমতল মনে হইয়াছিল। যে মেয়ের দেহটা পুরুষের উপভোগের উপযুক্ত হইতে আজও পাঁচ সাত বছর বাকী আছে সেই মেয়ের মনে তার সহজ সরল ব্যবহারটির এমন ভয়াবহ অর্থ কেমন করিয়া জাগিল ?

মাথা ধরার কথাটা কিছুক্ষণের জন্য রাজকুমার ভুলিয়া গিয়াছিল, বাকী যে কয়েকটা কর্তব্য পালন করিবে ঠিক করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সেগুলির কথাও মনে ছিল না। নিজের বাড়ীর দরজার সামনে পৌঁছিয়া মাথাধরা আর দরকারী কাজের কথা একসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু ফিরিতে আর সে পারিল না, নিজের ঘরখানার জন্য তার মন তখন ছটফট করিতেছে। জিনিষপত্রে ঠাসা ওই চারকোণা ঘরে যেন তার মাথাধরার চেয়ে কড়া যে বর্তমান মানসিক যন্ত্রণা তার ভাল ওষুধ আছে।

কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজু ভাই, এক মিনিটের জন্যে ?

এবার দেখা গেল, মনোরমা তার দেড় বছরের ছেলেকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। কচি কচি হাত দিয়া খোকা তার আঁচলে ঢাকা পরিপুষ্ট স্তন দুটিকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। রাজকুমারের দৃষ্টি দেখিয়া মনোরমা মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, এমন দুষ্ট হয়েছে ছেলেটা! খায় না কিন্তু ঘুমোনোর আগে ধরা চাই। মনে মনে খাওয়ার লোভটা এখনো আছে আর কি।

তুমিই ওর স্বভাবটা নষ্ট করছ দিদি। ধরতে দাও কেন ? মনোরমা আবার মৃদু হাসিল।

দ্যাখো না ছাড়াবার চেষ্টা করে ?

সরল সহজ আহ্বান, একান্ত নির্বিকার। পঞ্চাশ বছরের একজন স্ত্রীলোক যেন তার কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথা হইতে দু'টি পাকা চুল তুলিয়া দিতে বলিতেছে দশ বার বছরের এক বালককে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর বাড়ী ঘুরিয়া আসিবার আগে হইলে হয়তো রাজকুমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা অস্বস্তি বোধ করিত না, এখন মনোরমার প্রস্তাবে সে যেন নিজের মধ্যে কুঁচকাইয়া গেল।

মনোরমা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, খোকাকে ছোঁয়ার নামেই ভড়কে গেলে! ছোট ছেলেপিলেকে ছুঁতেই তোমার এত ঘেন্না কেন বল তো রাজু ভাই ?

রাজকুমার বিব্রত হইয়া বলিল, না না, ঘেন্না কে বললে, ঘেন্না কিসের !

তারপর অবশ্য মনোরমার স্তন হইতে খোকার হাত দু'টি ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা তাকে করিতে হইল। মনোরমা স্নেহের আবেশে মুগ্ধ চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল তার আধ ঘুমন্ত খোকার নির্বিকার প্রশান্ত মুখে কান্না-ভরা প্রচণ্ড প্রতিবাদের দ্রুত আয়োজন আর জগতের অষ্টমাশ্চর্য দেখিবার মত বিস্ময়ভরা চোখ মেলিয়া রাজকুমার দেখিতে লাগিল মনোরমার মুখ ! খোকার কচি হাত আর মনোরমার কোমল স্তনের স্পর্শ যেন অবিস্মরণীয় সুগন্ধি অনুভূতিতে ভরা তেজস্কর রসায়নের মত তার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে লাগিল। তার আহত মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল।

খোকার হাত বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা গেল না, তীক্ষ্ণ গলার প্রচণ্ড আর্তনাদে কাণে তালা ধরাইয়া সে তখন প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়িবার জন্য ছটফট করিতেছে।

মনোরমা বলিল, দেখলে ?

রাজকুমার মেঝেতে বসিয়া বলিল, হুঁ, ছোড়ার সত্যি তেজ আছে !

মনোরমার হাসিভরা মুখখানা মুহূর্তে অন্ধকার হইয়া গেল। ভুরু বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলিল, ছোঁড়া বলছ কাকে শুনি ?

রাজকুমার থতমত খাইয়া গেল।—আহা এমনি বলেছি, আদর করে বলেছি—

মনোরমার রাগ ঠাণ্ডা হইল না।—বেশ আদর তো তোমার ! আমার ছেলেকে যদি আদর করে ছোঁড়া বলতে পার, আমাকেও তো তবে তুমি আদর করে বেশ্যা বলতে পার অনায়াসে ! এ আবার কোন্ দেশী আদর করা, এমন কুচ্ছিৎ গাল দিয়ে !

ছোঁড়া কথাটা তো গাল নয় দিদি !

নয় ? ছোঁড়া কাদের বলে শুনি ? যারা নেংটি পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় পকেট মারে, মদ-গাঁজা ভাং খায়, মেয়েদের দেখলে শিস্ দেয়, বিচ্ছিরি সব ব্যারামে ভোগে—আমি জানি না ভেবেছ !

অনেক প্রতিবাদেও কোনও ফল হইল না, আহতা অভিমানিনী মনোরমার মুখের মেঘ স্থায়ী হইয়া রহিল ! নিজেই অবশ্য সে কথাটা চাপা দিয়া দিল, বলিল সে যাকগে, থাক, ওকথা বলে আর হবে কি, আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কথাই রইল।

রাজু ভাই' তুমি কিছু ভেবে কথাটা বলোনি, —কিন্তু বেশ বুঝা যাইতে লাগিল, মনে মনে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আছে।

ফোন করেছ?

না, এইবার যাব।

ফোন করতেই না গেলে?

না, গিরিদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ফোন করার কথাটা মনে ছিল না।

খেয়াল খুসীর বাধা অপসারিত হওয়ায় একটু পরেই খোকা আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গম্ভীর মুখে অকারণে খোকার মুখে একটা চুমা খাইয়া মনোরমা বলিল, গিরিদের বাড়ী কেন?

গিরির মা রাত্রে খেতে বলেছিল, তাই বলতে গিয়েছিলাম, আজ আর খেতে যেতে পারব না।

কে কে ছিল বাড়ীতে? গিরি কি করছিল?

গিরি মার কাছে শুয়েছিল। ওরা দুজনেই বাড়ীতে ছিল, এসময় আর কে বাড়ী থাকবে?

দরজা খুলল কে?

এ রীতিমত জেরা। মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য যেন একটু কমিয়াছে, গলার সুরে বেশ আগ্রহ টের পাওয়া যায়।

রাজকুমারের একবার ক্ষণেকের জন্য মনে হইল, মনোরমাকে সব কথা খুলিয়া বলে। গিরি আর গিরির মা তাদের অসভ্য গেঁয়ো মনোবৃত্তি নিয়া অকারণে বিনা দোষে তাকে আজ কি অপমানটা করিয়াছে আর মনে কত কষ্ট দিয়াছে, সবিস্তারে জানাইয়া মনোরমার সহানুভূতি আদায় করিয়া একটু সুখ ভোগ করে। খোকাকে ছোঁড়া বলার জন্য মনোরমা এমন খাপছাড়া ভাবে ফোঁস করিয়া না উঠিলে সে হয়ত বিনা দ্বিধাতেই ব্যাপারটা তাকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দিত। এখন ভরসা পাইল না। খোকাকে উপলক্ষ করিয়া অসাধারণ ধীরতা, স্থিরতা, সরলতা আর সুবিবেচনার পরিচয় দিয়া মনোরমা তার মনে যে অগাধ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়াছিল, কয়েক মিনিট পরে খোকাকে উপলক্ষ করিয়াই মনোরমা নিজেই আবার সে শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সব কথার ঠিক মানেই যে মনোরমা বুঝিবে, সে ভরসা রাজকুমারের আর নাই। কে জানে নিজের মনে ব্যাপারটার কি ব্যাখ্যা করিয়া সে কি ভাবিয়া বসিবে তার সম্বন্ধে!

তাই সে বিরক্ত হওয়ার ভান করিয়া জবাব দিল, গিরি দরজা খুলল, কে

আবার খুলবে ?

মনোরমা কতক্ষণ কি যেন ভাবিল। মুখের গাম্ভীর্য ক্রমেই তার কমিয়া যাইতেছিল।

একটা কথা তোমায় বলি ভাই, রাগ কোরো না কিন্তু। তোমার ভালর জন্যই বলা। আমি কিছু ভেবে বলছি না কথাটা, শুধু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। জেনে শুনে যদি দরকার মত তোমার সাবধান করেই না দিলাম, আমি তবে তোমার কিসের দিদি ? অত বেশী যখন তখন গিরিদের বাড়ী আর যেও না।

কেন ?

আহা, কেমন ধারা মানুষ ওরা তা তো জান ? গেঁয়ো অসভ্য মানুষ ওরা, কুলি মজুরদের মত ছোট মন ওদের, সব কথার বিচ্ছিরি দিকটা আগে ওদের মনে আসে। বড় হলে ভাই বোন যদি নির্জনে বসে গল্প করে, তাতেও ওরা ভয় পেয়ে যায়। বড় সড় একটা মেয়ে যখন বাড়ীতে আছে, কি দরকার তোমার যখন তখন ওদের বাড়ী যাবার ? বিপদে পড়ে যাবে একদিন।

ওইটুকু একটা মেয়ে—

মনোরমা বাধা দিয়া বলিল, ওইটুকু মেয়ে মানে ? আজ মেয়ের বিয়ে দিলে ওর মা একবছর পরে নাতির মুখ দেখবার আশায় থাকবে। ওরা তো আর তোমাদের মত মানুষ নয় রাজু ভাই যে ওইটুকু দেখায় বলেই ভাববে আজও মেয়ের ফ্রক পরে থাকার বয়েস আছে। যেমন ধরো ও বাড়ীর রিণি, গিরির চেয়ে বয়সেও বড় এমনিও বড় দেখায় ওকে। সেদিন রিণিকে একা নিয়ে তুমি বায়স্কোপ দেখাতে গেলে, একদিন গিরিকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেখো তো ওর বাপ মা কি বলে ?

মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য একেবারেই উপিয়া গিয়াছে, তার সুন্দর মুখখানিতে থম থম করিতেছে কথা বলার আবেগ।

তারপর ধর সরসী। ওর বাড়ন্ত গড়ন দেখলে আমারি ভয় করে, সে দিন তুমি ওর হাত ধরে টানছিলে—

তামাসা করছিলাম।

তামাসাই তো করছিলে। কিন্তু একদিন তামাসা করতে গিয়ে ওমনি ভাবে গিরির হাত ধরে টেনো দিকি কি কাণ্ডটা হয় ! সরসীর বাপ মা হাসছিল, গিরির বাপ মা তোমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। তুমি তো আর সামলে সুমলে চলতে জান না নিজেকে, তাই বলছিলাম, নাই বা বেশী মেলামেশা করলে ওদের সঙ্গে ?

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া নিজেও মনোরমা কাত হইয়া তার পাশে শুইয়া পড়িল।

কালীকে আনতে যাবে না রাজু ভাই ?

যাব।

ঘরে গিয়া রাজকুমার বিছানায় শুইয়া পড়িল। মাথা ধরার কথাটা আবার সে ভুলিয়া গিয়াছে। শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া সে আকাশ পাতাল ভাবিতে থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, তবে, তবে কি গিরি আর গিরির মার কোন দোষ ছিল না, সেই-বোকার মত একটা অসঙ্গত কাজ করিয়া তার স্বাভাবিক ফল ভোগ করিয়াছে? মনোরমা পর্যন্ত জানে যে গিরির হাত ধরিয়া টানার অপরাধে তাকে জ্যান্ত পুড়াইয়া মারাটাই গিরির বাপ মার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। তাই যদি হয়, এমনি সব রীতিনীতি চালচলনের মধ্যে এমনি সব মনের সাহচর্যে গিরি যদি বড় হইয়া থাকে আর দশটি মেয়ের মত, তবে তো সে থাপছাড়া কিছুই করে নাই, ও অবস্থায় তার মত আর দশটি মেয়ে যা করিত সেও তাই করিয়াছে। এবং মনোরমার কথা শুনিয়া তো মনে হয় ওরকম আর দশটি মেয়ের অভাব দেশে নাই।

বুঝিয়া চলিতে না পারিয়া সেই কি তবে অন্যায় করিয়াছে? কিন্তু রাজকুমারের মন সায় দিতে চায় না। ব্যাপারটা যদি সংসারের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত থাপছাড়া একটা দুর্ঘটনা নাও হয়, অসাধারণ কোন কারণে ভুল করার বদলে আর দশটি মেয়ের মত নিজের রুচি মাফিক সঙ্গত কাজই গিরি করিয়া থাকে, গিরির মার গালাগালিটাও যদি সংসারের সাধারণ চলতি ব্যাপারের পর্যায়ে গিয়া পড়ে তবে তো সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া দাঁড়ায় আরও কদর্য! এমন বীভৎস মনের অবস্থা কেন হইবে মানুষের? এমন পারিপার্শ্বিকতাকে কেন মানুষ মানিয়া লইবে যার প্রভাবে মানুষের মন এতখানি বিকারগ্রস্ত আর কুৎসিত হইয়া যায়?

মাথাটা আবার ভার মনে হইতে লাগিল। সত্যই কি আজ তার মাথা ধরিবে, না, অনেক চিন্তা আর উত্তেজনার ফলে আজ মাথাটা এরকম করিতেছে? একবার স্যর কে, এল-এর বাড়ী গেলে হয় না, সে যে আজ তার পার্টিতে যাইতে পারিবে না এই কথাটা রিণিকে বলিয়া আসিতে? এবং একবার রিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আসিতে?

রাজকুমারের মনে হইতে লাগিল, একবার রিণিদের বাড়ী গিয়া খেলার ছলে রিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আর ব্লাউসের একটা বোতাম পরীক্ষা করিয়া সে যদি

আজ প্রমাণ না করে যে ভদ্র মানুষ সব সময় সব কাজের কদর্থ মানে করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে না, তবে তার মাথাটা ধীরে ধীরে বোমায় পরিণত হইয়া ফাটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল!

রিণি চমৎকার গান গাহিতে পারে। অন্ততঃ লোকে তাই বলে। গলাটি তার মৃদু ও মিহি, স্বরগুলি তার কোমল ও করুণ, গান সে শিখিয়াছে নামকরা এক ওস্তাদের কাছে। ওস্তাদের বুদ্ধি ছিল তাই তিনি শিষ্যাকে কিছুমাত্র ওস্তাদি শিখাইবার চেষ্টা করেন নাই, শুধু শিখাইয়াছেন মোলায়েম স্বর। কেউ কেউ অবশ্য বলে যে রিণি গান করে না, বিড়াল ছানার ছাড়া ছাড়া করুণ আওয়াজটাকেই একটানা উচ্চারণ করিয়া যায়, তবু অনেকের কাছেই রিণির গান ভাল লাগে। মনটা উদাস হইয়া যায় অনেকের, ঘুমের বাহন ছাড়াই স্বগত স্বপ্ন নামিয়া আসে অনেকের চোখে, লজ্জা ও বেদনার সঙ্গে অনেকের মনে হয় যে এত ঘষামাজার পরেও তো তারা মার্জিত জীবনযাত্রার পথে বিনা চেষ্টায় পিছলাইয়া চলিবার মত মোলায়েম হইতে পারে নাই।

স্যর কে, এল-এর বাড়ীর সদরের সুশ্রী দরজাটি পার হইয়া ভিতরে পা দেওয়া মাত্র টের পাওয়া যায়, বাহিরের রাস্তাটা কি নোংরা। কতবার রাজকুমার এ দরজা পার হইয়াছে কিন্তু একবারও দরজাটি পার হওয়ার একমুহূর্ত আগে এই অভিজ্ঞতা তার মনে পড়ে না। স্যর কে, এল-এর বাড়ীর ভিতরটা শুধু দামী ও সুশ্রী আসবাবে সুন্দরভাবে সাজানো নয়, সদর দরজার এপাশে এবাড়ীর বিস্ময়কর রূপ ও শ্রীর মহিমাটাই শুধু স্পষ্ট হইয়া নাই, কি যেন একটা ম্যাজিক ছড়ানো আছে চারিদিকে,—পার্থক্য ও দূরত্বের ইঙ্গিতভরা এক অহঙ্কারী আবেষ্টনীর দুর্বোধ্য প্রভাবের ম্যাজিক।

বাড়ীতে ঢুকিলেই রাজকুমার একটু ঝিমাইয়া যায়। একটা অদ্ভুত কথা তার মনে হয়। মনে হয়, অনেকদিন আগে একবার এক পাহাড়ে একজন সংসারত্যাগী কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর গুহায় ঢুকিয়া তার যেমন গা ছমছম করিয়াছিল, এখানেও ঠিক তেমনি লাগিতেছে। আরাম উপভোগের আধুনিকতম কত আয়োজন এখানে, তবু তার মনে হয় এ বাড়ীতে যারা বাস করে তারা যেন ধুলামাটির বাস্তব জগতকে ত্যাগ করিয়াছে, রক্তমাংসের মানুষের হাসিকান্নায় ভরা সাধারণ স্বাভাবিক জীবনকে এড়াইয়া চলিতেছে।

উপরে গিয়া রাজকুমার টের পাইল, রিণি বড় হল ঘরে গান গাহিতেছে।

আজ পার্টিতে যে গানটি গাহিবে খুব সম্ভব সেই গানই প্র্যাকটিস করিতেছে। ঘরে গিয়া রাজকুমার রিণির কাছে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। বড় কোমল গানের কথাগুলি, বড় মধুর গানের সুরটি। রাজকুমার হয়তো একটু মুগ্ধ হইয়া যাইত, কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে টের পাইয়াও রিণি টের না পাওয়ার ভান করিয়া আপন মনে গাহিয়া চলিতেছে বুঝিতে পারিয়া গানটা আর রাজকুমারের তেমন ভাল লাগিল না।

গান শেষ করিয়া রিণি মুখ তুলিল। রাজকুমারের উপস্থিতি টের পাইয়াও টের না পাওয়ার ভান করিয়া এতক্ষণ গান করুক, ভাবাবেশে কি অপরূপ দেখাইতেছে রিণির মুখ!

এ গানটা গাইলেই আমার এমন মন কেমন করে! মনে হয় আমি যেন একা, আমি যেন—

ধীরে ধীরে রাজকুমারের হাত ধরিয়া রিণি তাকে আরেকটু কাছে টানিয়া আনিল, নিজের মুখখানা আরও উঁচু করিয়া ধরিল তার মুখের কাছে। গান গাহিয়া সে সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। রাজকুমারের কাছে আর কোনদিন সে এভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ে নাই।

প্রথমটা রাজকুমার বুঝিতে পারে নাই, তবে রিণির চোখ ও মুখের আহ্বান এত স্পষ্ট যে বুঝিতে বেশীক্ষণ সময় লাগা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। বুঝিতে পারিয়াই সে বিবর্ণ হইয়া গেল।

না, ছি।

ও!

রিণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু তফাতে সরিয়া গেল। চোখে আর আবেশের ছাপ নাই, মুখে উত্তেজনার রঙ নাই। চোখের পলকে সে যেন পাথরের মূর্তি হইয়া গিয়াছে।

কি চাই আপনার?

কিছু চাই না, এমনি তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আমার বড় মাথা ধরেছে, আজ আর তাই তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে পারব না।

রিণি বলিল, তা নিজে অসভ্যতা করতে না এসে, একটা নোট পাঠিয়ে দিলেই পারতেন? যাকগে, মাথা যখন ধরেছে, কি করে আর যাবেন!

রাজকুমার মরিয়া হইয়া বলিল, তোমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করব ভেবেছিলাম রিণি!

রিণি যেন আশ্চর্য হইয়া গেল—আমার সঙ্গে গল্প! আচ্ছা বলুন।

গল্প তাই জমিল না। একজন যদি মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া সুকৌশলে অতি সূক্ষ্ম ও মার্জিত ভাবে খোঁচা দিয়া জানাইয়া দেয় যে অপর জন মানুষ হিসাবে অতি অভদ্র, গল্প আর চলিতে পারে কতক্ষণ?

কয়েক মিনিট পরেই রাজকুমার উঠিয়া গেল।

বিদায় নিয়া রাজকুমার তো ঘরের বাইরে চলিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে রিণি আবার আরম্ভ করিয়া দিল তার গানের প্র্যাকটিস। রাজকুমার তখন সবে সিঁড়ি দিয়া কয়েক ধাপ নামিয়াছে। রিণির গানের সেই অকথ্য করুণ সুর কাণে পৌঁছানো মাত্র সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এত তাড়াতাড়ি রিণি নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারিয়াছে! সে তবে লজ্জা পায় নাই, অপমান বোধ করে নাই, বিশেষ বিচলিত হয় নাই? ব্যাপারটা রাজকুমারের বড়ই খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। সাগ্রহে মুখ বাড়াইয়া দিয়া চুম্বনের বদলে ধিক্কার শোনাটা এমনভাবে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া তো মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

রেলিং ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার ভাবিতে থাকে। তার ব্যবহারকে রিণি অসভ্যতা বলিয়াছিল। লজ্জা পাওয়ার বদলে সমস্তক্ষণ রিণির কথায় ব্যবহারে ও চোখের দৃষ্টিতে একটা অবজ্ঞা মেশানো অনুকম্পার ভাবই স্পষ্ট হইয়া ছিল। তখন রাজকুমার ভাবিয়াছিল, ওসব প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া। এখন তার মনে হইতে লাগিল, তার মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়া প্রথমে একটু রাগ এবং তারপর বিরক্তি ও অনুকম্পা বোধ করা ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় রিণির মনে ঘটে নাই। শ্রীমতী গিরিন্দ্রনন্দিনী ও তার মাকে আজ যেমন তার বর্বর মনে হইয়াছিল, তার সম্বন্ধেও রিণির ঠিক সেই রকম একটা ধারণাই সম্ভবত জন্মিয়াছে।

এবং সেজন্য রিণিকে দোষ দেওয়া চলে না। সত্যই সে রিণির সঙ্গে ছোটলোকের মত ব্যবহার করিয়াছে। কি আসিয়া যাইত রিণিকে চুম্বন করিলে? চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার চেয়ে এমন কি গুরুতর নরনারীর আলগা চুম্বন? একটু প্রীতি বিনিময় করা, একটু আনন্দ জাগানো, মৈত্রীর যোগাযোগকে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্পষ্টতরভাবে অনুভব করা। রিণি তাই চাহিয়াছিল। কিন্তু নিজে সে গিরিন্দ্রনন্দিনীর পর্যায়ের মানুষ কিনা, চুম্বনের জের চরম মিলন পর্যন্ত টানিয়া না চলাটাও যে যুবকযুবতীর পক্ষে সম্ভব এ ধারণাও তার নাই কিনা, তাই সে ভাবিতেও পারে নাই রিণির আহ্বানে সাড়া দিলেও তাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা বজায়

থাকিবে, অসঙ্গত ঘনিষ্টতায় পরিণত হইয়া যাইবে না।

চুম্বন অবশ্য নরনারীর মিলনেরই অঙ্গ, সুপবিত্র কোন আধ্যাত্মিক মিথ্যার ধোঁয়া সৃষ্টি করিয়া রিণির সঙ্গে তার চুম্বন বিনিময়কে সে ব্যাখ্যা করিতে চায় না। কেন সে ভাবিতে পারে নাই চুম্বনের ভূমিকাতেই সমাপ্তি ঘটানোর মত সংযম তাদের আছে? চোখ মেলিয়া রিণির রূপ সে দেখিয়া থাকে, কাছাকাছি বসিয়া হাসিগল্পের আনন্দ উপভোগ করে, মাঝে মাঝে স্পর্শ বিনিময়ও ঘটিয়া যায় কিন্তু আত্মহারা হইয়া পড়ার প্রশ্নও তো তাদের মনে জাগে না। সে কি কেবল এই জন্য যে ওই পর্যন্ত ঘনিষ্টতা দশজনে অনুমোদন করে? চুম্বন বিনিময়ে অনুমতি দেওয়া থাকিলে তো আজ তার মনে হইত না রিণিকে চুম্বন করা বিবেকের গায়ে পিন ফুটানো এবং একবার পিন ফুটাইলে একেবারে ছোরা বসাইয়া বিবেককে জখম না করিয়া নিস্তার থাকিবে না!

কেবল সে একা নয়, সকলেই এই রকম। অনেক পরিবারে পনের বছরের মেয়েরও বাপ ভাই ছাড়া কোন পুরুষের সামনে যাওয়া বারণ। এমন একটি মেয়ে যদি কেবল চুপি চুপি দুটি কথা বলার জন্যও পাশের বাড়ীর ছেলেটাকে ডাকে, ছেলেটা কি ভাবিবে? রিণি চুম্বন চাওয়ার খানিক আগে সে যা ভাবিয়াছিল।

এমন একটা বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে তারা মানুষ হইয়াছে যে, অস্বাভাবিক মিথ্যা অসংযমকেই তারা স্বাভাবিক সত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছে। মানুষ কেবল পরের নয়, নিজেরও সংযমে বিশ্বাস করে না। অসংযমের চেয়ে সংযম যে মানুষের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক, এ যেন কেউ কল্পনাও করিতে পারে না।

হঠাৎ রিণির গান বন্ধ হইয়া যাওয়ায় রাজকুমার সচেতন হইয়া উঠিল যে, সিঁড়ির মাঝখানে সে অনেক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি সে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে হলঘরের এক কোণে অবনীবাবুর মেয়ে মালতী বসিয়াছিল। সামনে ছোট টেবিলটিতে একটি বই ও খাতা। খুব সম্ভব কলেজ হইতে ফিরিবার সময় স্যর কে, এল-এর বাড়ীতে ঢুকিয়াছে। এখানে একা বসিয়া দু'হাতের আটটি আঙ্গুলে টেবিলের উপর টোকা দিয়া টুকটাক আওয়াজ তুলিবার কারণটা রাজকুমার ঠিক বুঝিতে পারিল না। আট আঙ্গুলে টোকা দেওয়ার কারণ নয়, এখানে একা বসিয়া থাকিবার কারণ। মালতী বড় চঞ্চল। চাঞ্চল্যটা শুধু আঙ্গুলে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সে যে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, এটা সত্যই আশ্চর্যের ব্যাপার।

রাজকুমারকে দেখিবামাত্র টোকা দেওয়া থামিয়া গেল। চোখে মুখে তার যে দুষ্টামি ভরা চকিত হাসি খেলিয়া গেল, বনের হরিণী হাসিতে জানিলেও তার নকল করিতে পারিত না। সোজাসুজি তাকানোর বদলে মাথা একটু কাত করিয়া কোণাকুণি রাজকুমারের দিকে তাকাইয়া বলিল, এর মধ্যে তাড়িয়ে দিল?

তাড়িয়ে দিল মানে?

ও, তাড়িয়ে দেয় নি? আপনি নিজে থেকে চলে যাচ্ছেন? আমি ভাবলাম আপনাদের বুঝি ঝগড়া হয়েছে, আপনাকে তাড়িয়ে দিয়ে রিণি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

কাঁদছে নাকি?

দিনরাত কাঁদে মেয়েটা, সময় অসময় নেই। আচ্ছা, অর্গান বাজিয়ে কাঁদে কেন বলুন তো? এ আবার কোনদেশী কান্না! আমি যদি কখনো কাঁদি, রিণির মত আপনার জন্যেই কাঁদি, আমাকে আবার একটা অর্গান কিনতে হবে নাকি?

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, রিণিকে জিজ্ঞেস করো অর্গান বাজিয়ে কাঁদে কেন। খুসী হয়ে তোমার একটা চোখ কানা করে দেবে'খন।

পুরোপুরি গম্ভীর হওয়া মালতীর পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার, যতটা পারে গাম্ভীর্যের ভাণ করিয়া সে বলিল, জিজ্ঞেস করিনি ভাবছেন বুঝি? ও যে আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, আমিও কখনো ওদের বাড়ী আসি না, সেটা তবে কি জন্যে?

ওদের বাড়ী এস না মানে? এই তো এসেছ সশরীরে।

আজকের কথা বাদ দিন। আজ না এসে উপায় ছিল না, কলেজ থেকে ফিরছি। দেখি আপনি সরাসর এ বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। ব্যাপারটা ভাল করে না জেনে আর কি তখন বাড়ী ফিরতে পারি, আপনিই বলুন?

রাজকুমার রাগ করিয়া বলিল, ব্যাপার আবার কিসের? শরীরটা ভাল নেই, আজ ওর পার্টিতে আসতে পারব না, তাই বলতে এসেছিলাম।

মালতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার মত সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা ঠিক। শরীর খারাপ বলে যে পার্টিতে আসতে পারবে না, সে নিজেই খারাপ শরীর নিয়ে খবরটা দিতে আসে বটে। বাড়ীতে যখন একটার বেশী চাকর নেই।

অন্য দরকারও ছিল।

আমিও তো তাই বলছি।

দরকার ছিল মানে—

মানে বুঝিয়ে বলতে হবে না স্যর। এতো অঙ্ক নয় যে আপনি বুঝিয়ে না দিলে মাথায় ঢুকবে না। তার চেয়ে বরং—কাছে আসিয়া গলা নামাইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল,—সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ কি ভাবছিলেন তাই বলুন। বলুন না, কাউকে বলব না আমি, আপনার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

মালতী কখনো তাকে স্যর বলে না। রাজকুমার তাকে পড়ায় বটে রোজ, কিন্তু ঠিক গুরু শিষ্যার সম্পর্ক তাদের নয়। তার কথা বলার ভঙ্গি রাজকুমারকে আরও বেশী বিব্রত করিয়া তুলিল। রিণির সঙ্গে সত্যসত্যই কিছু না ঘটিয়া থাকিলে হয় তো সে রাগ করিতে পারিত, যদিও মালতীর উপর রাগ করা বড় কঠিন। মালতী তামাসা করে, সব সময়ে সব বিষয়ে এরকম হাল্কা পরিহাসের ভঙ্গিতেই কথা বলে, কিন্তু কখনো খোঁচায় না। পরিচিত সকলেই যেন তার কাছে নতুন জামাই আর সে তার মুখরা শ্যালিকা। মনে যদি কারও খোঁচা লাগে তার কথায়, সেটা তার মনের দোষ, মালতীর নয়।

হঠাৎ রাজকুমারের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।—কি দরকারে এসেছি, দেখবে ? বলিয়া ঘরের একপাশে টেলিফোনের কাছে আগাইয়া গিয়া রিসিভারটা তুলিয়া নিল। কাল সে কাজে যাইতে পারিবে না রাজেনকে এই খবরটা দিয়া আরও কতগুলি আজে বাজে কথা বলিয়া রিসিভারটা নামাইয়া রাখিল।

দেখলে ?

মালতী এতক্ষণ তার দুষ্টামির হাসি মুখে ফুটাইয়া রাখিয়াছিল, চার পাঁচবার মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, দেখলাম বৈকি, নিশ্চয় দেখলাম। অমন কত দেখছি রোজ ! শ্যামল করে কি জানেন, যখন তখন আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয় আর আমাকে ডেকে বলে,—একটা ফোন করব। অন্য সবাই রয়েছে বাড়ীতে, তাছাড়া ফোন করার জন্য কারও অনুমতি চাওয়ারও ওর দরকার নেই, কিন্তু আমাকে ডেকে ওর বলা চাই। আমি বলি, বেশ তো, ফোন করুন। তার পর একথা সেকথা বলতে বলতে গল্প জমে যায়, বেচারীর দরকারী ফোনটা আর করা হয় না।

কথার মাঝখানে রিণি ঘরে আসিয়াছিল। একবার বলিয়াছিল, মালতী নাকি ?—কিন্তু মালতী তার দিকে চাহিয়াও ছাখে নাই। কথা শেষ হইতে সে তাই আবার বলিল, এই যে মালতী !

মালতী বলিল, হ্যাঁ, আমিই মালতী। চলুন রাজুদা, যাই। বড্ড দেরী হয়ে গেল।

এতক্ষণ রিণির মুখে মৃদু ও স্পষ্ট একটা বিরক্তির ভাবের উপর মাখানো ছিল সবিনয় ভদ্রতার প্রলেপ, এক মুহূর্তে সমস্ত মুছিয়া গিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। এমনভাবে একবার সে ঢোঁক গিলিল যেন কড়া কড়া কতগুলি অভদ্র কথাই গিলিয়া ফেলিতেছে। মন চিরিয়া দেওয়ার মত ধারালো দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড মালতীকে দেখিয়া হঠাৎ সে মুখ ফিরাইল রাজকুমারের দিকে।

শুনে যাও, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মালতী ততক্ষণে আগাইয়া গিয়াছে বাহিরের দরজার কাছে, সেখান হইতে সেও তাগিদ দিয়া বলিল, শীগগির আসুন রাজুদা। দাঁড়াবেন না, চলে আসুন।

সুতরাং রাজকুমারের বিপদের আর সীমা রহিল না। তরুণী দু'টির দৃষ্টি-বিনিময় দেখিয়া তার মনে হতে লাগিল, এই বুঝি একটা খুনোখুনি ব্যাপার ঘটিয়া যায়। রাগে আর আত্মসংযমের চেষ্টায় রিণির সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মালতীর মুখখানা এখনো হাসি হাসি বটে, কিন্তু সে হাসি যেন লড়াই করার ধারালো অস্ত্র। চোখের পলকে চোখের সামনে দু'টি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে যে এমন একটা নাটক সৃষ্টি করিতে পারে, রাজকুমারের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। আড়ালে আড়ালে ভূমিকার অভিনয়টা নিশ্চয় ঘটিয়া গিয়াছে, এ পর্যন্ত সে টেরও পায় নাই। যত আয়োজনই হইয়া থাক, আকাশে তো প্রথমে মেঘ দেখা দেয়, তারপর বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্কেত পাওয়া যায়, তারপর বজ্রপাত। এ যেন ঠিক বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

কি করা যায় এখন? একজন তাকে ডাকিতেছে অন্দরে, একজন ডাকিতেছে বাহিরে। কারও ডাকে সাড়া দিবার উপায় নাই। নিজেকে যদি দু'ভাগ করিয়া ফেলা যায়, তবু দু'জনকে খুসী করা যাইবে না। এমন হাস্যকর অথচ এমন গুরুতর অবস্থায় কি মানুষ কখনো পড়ে? রাজকুমার বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, দু'জনের মধ্যে একটা সাময়িক ও কৃত্রিম আপোষ ঘটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। তার কাছে ছেলেমানুষী মনে হইতেছে, কিন্তু এটা ওদের ছেলেমানুষী নয় যে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে। তার কথার কোন দাম এখন ওদের কাছে নাই। আর কিছুই তার কাছে এখন ওরা চায় না, শুধু চায় যে একজনের হুকুম মানিয়া আরেকজনের মাথা সে হেঁট করিয়া দিবে।

রিণি অধীর হইয়া বলিল, এসো?

মালতী হাসিমুখে বলিল, আসুন?

তখন রাজকুমার সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মালতীকে বলিল, এদিকে এস তো একটু।

মালতী বলিল, আবার ওদিকে কেন? চলুন যাই।

কিন্তু মালতী কাছে আসিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক ভীরু ও কাপুরুষ সৈনিকের মত রাজকুমার তার পাশ কাটাইয়া পলাইয়া গেল বাহিরে! বাহির হইতে দরজার পিতলের কড়া দুটিতে বাঁধিয়া দিল পকেটের নস্যমাখা ময়লা রুমালটি গেট পার হইয়া রাস্তায় পা দিয়া তার মনে হইতে লাগিল, মাথাধরাটা একেবারে সারিয়া গিয়াছে। একটু যেন কেবল ঘুরিতেছে মাথাটা, ছেলেবেলায় নাগরদোলায় অনেকক্ষণ পাক খাইয়া মাটিতে নামিয়া দাঁড়াইবার পর যেমন ঘুরিত।

রিণি আর মালতী যে তারপর কামড়াকামড়ি করে নাই, সেটা জানা গেল সন্ধ্যার পর সরসীর মিটিং-এ গিয়া।

রাজকুমার বাড়ীতেই ছিল। শ্যামল একেবারে স্যর কে, এল-এর গাড়ী লইয়া আসিয়া খবর দিল, সরসী ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, অবিলম্বে যাইতেই হইবে।

মালতীর কাছে আপনি যাবেন না শুনে সরসী একদম ক্ষেপে গেছে। শীগগির চলুন।

রাজকুমারের অচেনা এক ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড বাড়ীতে মিটিং বসি' বসি' করিতেছিল। জন ত্রিশেক মেয়েপুরুষ উপস্থিত আছে। সকলে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে কিনা সন্দেহ, খুব সম্ভব সরসী সকলকে ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিয়াছে। রিণি এবং মালতীও উপস্থিত আছে। কারও মুখে আঁচড় কামড়ের দাগ নাই।

রাজকুমার এক ফাঁকে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, তার পর কি হল?

মালতী হাসিয়া বলিল, কিসের পর?

আমি চলে যাওয়ার পর?

কি আর হবে? ঘণ্টাখানেক গল্প করে আমিও চলে এলাম।

রাজকুমার বিশ্বাস করিল না। মাথা নাড়িয়া বলিল, উহুঁ, মিছে কথা।

তখন মালতী তার দুষ্টামির হাসিকে সরল হাসিতে পরিণত করিয়া বলিল, সত্যি মিছে কথা। ওর সঙ্গে এক ঘণ্টা গল্প করতে হলে আমি দম আটকে মরে যেতাম না। সত্যি সত্যি কি হল তারপর শুনবেন? চাকর পাশের দরজা দিয়ে গিয়ে রুমালটা খুলে দিল। রিণি বলল, যাচ্ছ নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ যাচ্ছি। বলে চলে এলাম। আপনার রুমালটা আমার কাছে আছে, ওটা আর ফেরৎ পাচ্ছেন না।

তা না পেলাম। কিন্তু রিণি শুধু যাচ্ছ নাকি বলেছিল, যাচ্ছ নাকি ভাই বলে নি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ও বলল, যাচ্ছ নাকি ভাই, আর আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই যাচ্ছি।

সরসী খুবসম্ভব এ বাড়ীর মেয়েদের বুঝাইয়া সভায় আনিতে অন্দরে গিয়াছিল, লজ্জা সঙ্কোচে একান্ত বিপন্না আটদশটি মেয়েবৌকে গরু তাড়ানোর মত সভায় আনিয়া হাজির করিল। রাজকুমারকে দেখিয়াই অনুযোগ দিয়া বলিল, বেশ মানুষ তো ? তোমার বক্তৃতার জন্য মিটিং, তুমি বলে বসলে আসতে পারবে না ?

সরসীর রঙ একটু কালো, দেহের গড়নটি অপরূপ। অতি অপরূপ। কালো মেয়েরও যদি রূপ থাকে, তার মত রূপসী মেয়ে সহজে চোখে পড়িবে না। সাধারণভাবে কাপড় পরার কোন এক নতুন কায়দা সে আবিষ্কার করিয়াছে কিনা বলা যায় না, আবরণ যেন তার দেহশ্রীকে ঢাকা দেওয়ার বদলে ছন্দ দিয়াছে।

সমিতি গড়িতে আর মিটিং করিতে সরসী বড় ভালবাসে। ঘরে তার মন বসে না, সারাদিন এইসব ব্যাপার নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনো ব্যস্ত হয় না। সব সময় তাকে ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া মনে হয়। এদিক দিয়া সে মালতীর ঠিক উল্টো। মালতী চঞ্চল কিন্তু অলস, তার চাঞ্চল্য নাচের মত, ছুটাছুটি বা কাজের নামেই তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সরসী একদিন পঞ্চাশটি জায়গায় কাজে যাইতে পারে অনায়াসে, কিন্তু চলে সে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে কথা, শান্ত দৃষ্টিতে তাকায়, কখনো উত্তেজিত হয় না।

প্রথমে যাকে প্রেসিডেণ্ট করা হইয়াছিল হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তিনি একেবারে সহর ছাড়িয়া পলাইয়া যাওয়ায় স্যার কে, এল-কে প্রেসিডেণ্ট করা হইয়াছে। সরসী ছাড়া আর কেউ তাকে এতটুকু সভায় আরেকজনের বদলীতে সভাপতিত্ব করিতে রাজী করাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

সরসীই সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানাইল। গাম্ভীর্য ও সহৃদয়তাব্যঞ্জক একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া স্যার কে, এল এতক্ষণ যেখানে বসিয়াছিলেন, একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তারপর সরসী বক্তা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচয়মূলক কয়েকটি কথা বলিয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

রাজকুমার এক দৃষ্টিতে এতক্ষণ সরসীর দিকে চাহিয়া ছিল, শুধু তার এই বসিবার ভঙ্গিটি দেখিবার জন্য। সরসীর ওঠা বসা চলা ফেরার মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণ আছে, কেবলি তার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। সরসীর আকর্ষণ তার কাছে খুব বেশী জোরালো নয়, কিন্তু সরসীর প্রত্যেকটি সর্বাঙ্গীন অঙ্গ সঞ্চালন মৃদু একটা উত্তেজনা জাগাইয়া তাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

উঠবেন না?

অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য লজ্জিত ভাবে রাজকুমার বক্তৃতা দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্প্রতি সে মাস চারেক মাদ্রাজে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ তাকে মাদ্রাজের নারীজাতির সাধারণ অবস্থা ও প্রগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইবে। একবার রাজকুমার মালতীর দিকে চাহিল। তাকে সচেতন করিয়া দিয়া মালতী ঘাড়ের পিছনটা খুঁটিতে খুঁটিতে দুষ্টামির হাসি মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এখনো সে হাসি তেমনি স্পষ্ট হইয়া আছে। মালতীর এই হাসি দেখিয়া হঠাৎ সরসীর উপর রাজকুমারের বড়ই রাগ হইয়া গেল। চার মাস একটা দেশে থাকিয়াই এ দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার মত জ্ঞান একজন সঞ্চয় করিয়া আসিতে পারে, এমন কথা সরসীর মনে হইল কেমন করিয়া? মাথার কি ঠিক নাই মেয়েটার? কি সে বলিবে এখন এতগুলি লোকের সামনে!

কি বলিবে আগে হইতেই কিছু কিছু সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু মনের মধ্যে সব এমনভাবে এখন জড়াইয়া গিয়াছে যে কি বলিয়া আরম্ভ করিবে ভাবিয়া পাইল না। তিনবার বক্তৃতা সুরু করিয়া তিনবার থামিয়া গেল। কান তার গরম হইয়া উঠিল। লজ্জায় নয়, আতঙ্কে। শেষ পর্যন্ত কিছুই যদি বলিতে না পারে, এমনিভাবে তোতলার মত দুচারটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া যদি তাকে বসিয়া পড়িতে হয়!

অবরুদ্ধ উত্তেজনায় সভা থমথম করিতেছে, একটা অঘটন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তারই প্রত্যাশার উত্তেজনা। মরিয়া হইয়া মনে মনে রাজকুমার বলিতে থাকে, একটা কিছু করা দরকার, দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যে তার কিছু করা দরকার, শুধু ওইটুকু সময় হয়তো তার এখনো আছে। বক্তব্য? নাই বা রহিল বক্তব্য তার বক্তৃতার? বড় বড় কথা নাই বা সে বলিতে পারিল? যা মনে আসে বলিয়া যাক, অন্ততঃ বক্তৃতা তো দেওয়া হইবে। চুপ করিয়া এভাবে দাঁড়াইয়া থাকার চেয়ে সে অনেক ভাল।

একবার সে চাহিল রিণি মালতী সরসীর দিকে, তারপর বলিতে আরম্ভ করিল

মাদ্রাজের মেয়েদের সম্বন্ধে ? কি সে বলিবে মাদ্রাজের মেয়েদের সম্বন্ধে ? যে চিরন্তন রহস্য যুগে যুগে দেশে দেশে নারীজাতিকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে, মাদ্রাজের মেয়েরা তো তার কাছে সে রহস্যের ঘোমটা খুলিয়া তাদের জানিবার বুঝিবার সুযোগ তাকে দেয় নাই। সুতরাং সাধারণ ভাবে দু'চারটি কথা বলাই ভাল। গরম কান ঠাণ্ডা হয়, কথার জড়তা কাটিয়া যায়, মৃদু মৃদু রহস্যের সুরে কখনো গম্ভীর ও কখনো হাসিমুখে রাজকুমার বলিয়া যায়। মাঝে রাঝে তার মনে হইতে থাকে বটে যে সে আবোল তাবোল বকিতেছে, কিন্তু নারীজাতি সম্বন্ধে তার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সভার মেয়েরা একেবারে অভিভূত হইয়া যায়।

রাজকুমার আসন গ্রহণ করিলে শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারের চেয়ে বয়সে দু'এক বছরের ছোট হইলেও লম্বা চওড়া চেহারা আর মুখের ভারিক্কি গড়নের জন্য তাকেই বড় দেখায়। এতক্ষণ সে মালতীর পাশে মুখ ভার করিয়া বসিয়া ছিল। তীব্র দৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড় বিড় করিয়া মন্তব্য করিতেছিল: পাগলের মত কিঁ যে বকে লোকটা! মাথা খারাপ নাকি ? যত সব চালবাজী !—

মালতী ছাড়া আর কেউ মন্তব্যগুলি শুনিতে পাইতেছিল কিনা বলা যায় না, একটা অত্যধিক কড়া কথা কাণে যাওয়ায় মালতী একবার শুধু বলিয়াছিল: কি বললেন ?

আপনাকে বলিনি। রাজুদা কি রকম আবোল তাবোল বকছেন, শুনছেন তো ? দাঁড়ান, ওঁর বাহাদুরী ভেঙ্গে দিচ্ছি। মেয়েদের ধোঁকা দিয়ে—।

কি করবেন ?

দেখুন না কি করি।

ছোটছেলের স্বপ্ন কাম্য খেলনা পাওয়ার মত রাজকুমারকে জব্দ করার কি যেন একটা সুযোগ পাইয়া সে সযত্নে পুষিয়া রাখিতেছে, ফাঁক করিতে চায় না, ভাগ দিতে চায় না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইতে তার উদ্দেশ্য কতকটা আন্দাজ করিয়া মালতী চাপা গলায় বলিল, না না থাক, বসুন। তার পাঞ্জাবীর প্রান্ত ধরিয়া আলগোছে একটু টানও সে দিল, কিন্তু শ্যামল বসিল না।

আপনি কিছু বলবেন শ্যামলবাবু ? এদিকে আসুন।—সরসী বলিল।

এখান থেকেই বলি ?

আচ্ছা বলুন।

অনেকগুলি চোখের, তার মধ্যে বেশীর ভাগ মেয়েলি চোখ, প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টি মুখে আসিয়া পড়িয়াছে অনুভব করিয়া এক মুহূর্তের জন্য শ্যামলের উৎসাহ যেন উপিয়া গেল। এখন মালতী আরেকবার তার পাঞ্জাবীর কোণ ধরিয়া একটু টানিলেই সে হয়তো বসিয়া পড়িত। অসহায়ের মত এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তার চোখে পড়িয়া গেল, রাজকুমারের মুখে মৃদু অমায়িক হাসি ফুটিয়া আছে, ছোটছেলে বাহাদুরী করিতে গেলে স্নেহশীল উদার গুরুজন যেমন প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন।

দেখিয়া শ্যামলের মাথা গরম হইয়া গেল।

—আমার কথা শুনে আপনারা অনেকেই ক্ষুণ্ণ হবেন। আমাকে…কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হবে। বিশ্বনারী বা মাদ্রাজী মহিলাদের সম্বন্ধে নতুন কিছু আপনাদের শোনাবার জন্য আমি উঠে দাঁড়াইনি, রাজকুমারবাবুর বক্তৃতার কয়েকটা মারাত্মক ভুল দেখিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগতভাবে রাজকুমারবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, উনি আমার অনেক দিনের বন্ধু—

রাজকুমারের মুখে আর হাসির চিহ্নও ছিল না। কি সর্বনাশ, এতগুলি লোকের সামনে তাকে অপদস্থ করার জন্য শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরীহ শান্ত ভালমানুষ শ্যামল! রাজকুমারের কোন সন্দেহই ছিল না যে সে অনেক ভুল করিয়াছে। এখন তার আতঙ্ক জন্মিয়া গেল যে ভুলগুলি নিশ্চয় সাধারণ তুচ্ছ ভুল নয়, শ্যামল চোখে আঙুল দিয়া ভুলগুলি দেখাইয়া দিলে তার আর মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় থাকিবে না। সাংঘাতিক হাস্যকর ভুল না হইলে শ্যামল কি সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিত? না জানি কি ভাবিবে সকলে, মনে মনে কত হাসিবে, তার জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতার খোলসটা যখন শ্যামল ছিঁড়িয়া ফেলিতে থাকিবে। রাজকুমারের সর্বাঙ্গ ঘামিয়া গেল। এতদিন সে জানিত, তার সম্বন্ধে মানুষ কি ধারনা পোষণ করে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই, এই সমস্ত অল্পবুদ্ধি অগভীর নরনারীর মতামতকে সে গ্রাহ্যও করে না। এক মুহূর্ত আগেও সে নিজের কাছে স্বীকার করিত না বক্তৃতা না জমিলে মন তার খারাপ হইয়া যাইবে। এখন শ্যামলের উদ্যত আঘাতে নিজের বাহাদুরীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, লোকে তাকে কি ভাবে তা কত দামী তার নিজের কাছে। অবজ্ঞার ভয়ে মরণ কামনা করার মত দামী সকলের তাকে বাহাদুর মনে করা।

রাজকুমারের অপরিচিত একটি মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিলেই বুঝা

যায় সে খাঁটি মাদ্রাজী মেয়ে। আর দশজন মেয়ের মধ্যে বসিয়াছিল বলিয়া এতক্ষণ সে রাজকুমারের নজরে পড়ে নাই, আসরে খাঁটি একজন মাদ্রাজী মেয়ে উপস্থিত আছে জানিলে রাজকুমারের বক্তৃতাটা আজ কি রকম দাঁড়াইত কে জানে!

মেয়েটি বলিল, রাজকুমারবাবু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন। ভুল দেখিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে কি? এটা ডিবেটিং সোসাইটির মিটিং নয় আশা করি?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ঠিক তো, রাজকুমার যাই বলিয়া থাক, তার বক্তৃতায় সমালোচনা করিবার কি অধিকার শ্যামলের আছে?

স্তর কে, এল হাসিমুখে বলিলেন, শ্যামল রাজকুমারের ভুল দেখিয়ে দিচ্ছে না, আমাদের যাতে ভুল ধারণা জন্মায় সেজন্য নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছে। কি বল শ্যামল?

শ্যামল তাড়াতাড়ি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। যেমন ধরুন রাজকুমারবাবু বিশ্বের নারীজাতির বিস্ময়কর মিলের কথা বলেছেন। পৃথিবীর যে কোন একটি দেশের পুরুষের সঙ্গে অন্য যে কোন একটি দেশের পুরুষের যতটা পার্থক্য দেখা যায়, দুটি দেশের মেয়েদের পার্থক্য নাকি তার চেয়ে অনেক কম। কথাটা কি ঠিক? আমাদের দেশের পুরুষরা যখন বিলাতী পুরুষদের সাজপোষাক চালচলন অনুকরণ করে তখন অতটা খারাপ দেখায় না, কিন্তু মেয়েরা ওদেশের মেয়েদের অনুকরণ করলে সেটা উদ্ভট আর হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় পুরুষ সহজেই সাজপোষাক চালচলনে তো বটেই, প্রকৃতিতে পর্যন্ত সায়েব হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মেয়েরা কোনদিন মেমসায়েব হতে পারে না। রাজকুমারবাবু যে বিশ্বের নারীজাতির কথা বলেছিলেন তার কারণ বিশ্ব শব্দের একটা মোহ আছে, প্রথমে সকলে বিশ্বের কথাটা মনে পড়িয়ে দিলে সকলের মন উদার হয়ে যায়, বাজে কথাও সকলে বড় বড় অর্থে গ্রহণ করে। ও একটা প্যাঁচ ছাড়া কিছু নয়। রাজকুমারবাবু—

মাদ্রাজী মেয়েটি আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ জানাইল, এটা কি ব্যক্তিগত আক্রমণ হচ্ছে না?

স্তর কে, এল হাসিমুখেই সায় দিয়া বলিলেন খানিকটা হচ্ছে বৈকি!

শ্যামল জোর দিয়া বলিল, না না, ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে কেন, রাজকুমার-বাবুর সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই! আমি বলছিলাম, মাদ্রাজের নারীদের

অবস্থা সম্বন্ধে রাজকুমারবাবুর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, তিনি তাই বিশ্বের নারীজাতির কথা তুলেছিলেন, সমগ্রতার অস্পষ্টতায় যাতে খুঁটিনাটির অভাবটা চাপা পড়ে যায়। মাদ্রাজের নারীরাও বিশ্বের নারীজাতীর অন্তর্গত বৈ কি! মাদ্রাজের নারীদের সম্বন্ধে রাজকুমারবাবু যে সব কথা বলেছেন তার অধিকাংশ বিশ্বের যে কোন দেশের নারীজাতির সম্বন্ধে বলা যায়। মাদ্রাজী মেয়েদের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা রাজকুমারবাবু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যুগোপযোগী সংস্কারকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করবার অশিক্ষিত পটুতা তাদের নাকি বিস্ময়কর! স্কুল কলেজের শিক্ষার হিসাবে তারা নাকি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করে বাংলার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছেন, কিন্তু জীবন-যাত্রাকে নতুন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় সব প্রদেশকে হার মানিয়েছেন। এ ধারণা রাজকুমারবাবু যে কোথায় পেলেন কল্পনা করা কঠিন। মাদ্রাজের মেয়েরা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিশেষ কোন সংস্কারের আমদানী করেছেন, অথবা ও বিষয়ে তাঁদের উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা গিয়েছে বলে তো মনে হয় না। নতুন আলো চোখে লাগা আর সেই আলোয় নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে যাচাই করার অসুবিধা ও সুযোগের অভাব অন্য সব প্রদেশের মত মাদ্রাজের মেয়েদেরও কিছুমাত্র কম নয়।

রাজকুমার চুপ করিয়া শুনিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, এইবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সব সময় তার মুখে যে মৃদু একটু বিবর্ণতার ছাপ থাকে, রাগে এখন তাহা মুছিয়া গিয়াছে। তবু সে শান্ত কণ্ঠেই বলিল, আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি শ্যামল। আমি বলেছি অন্য প্রদেশের চেয়ে মাদ্রাজে মেয়েরা পরিবর্তনকে গ্রহণ করছে একটু ব্যাপকভাবে, সামান্য হলেও তার ব্যাপ্তি আছে। বাংলায় মেয়েদের খুব সামান্য একটা অংশ অনেক এগিয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা এত কম যে ধর্তব্যের মধ্যেই বলা চলে না। বাকী সকলে অর্থাৎ বাংলা দেশের মেয়ে বলতে যাদের বুঝায় তারা পড়ে আছে একেবারে পিছনে। মাদ্রাজের মেয়েদের একটা ক্ষুদ্র অংশবিশেষ এভাবে এগিয়ে না গিয়ে সকলে মিলে অল্প অল্প অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাপারটা কেমন হয়েছে জান, বাংলায় একটুখানি নারীপ্রগতি যেন সঞ্চিত হয়েছে কাঁচের সরু নলে, গভীরতা আছে কিন্তু ব্যাপ্তি নেই আর মাদ্রাজের নারী-প্রগতিটুকু সঞ্চিত হয়েছে থালায়, গভীরতা নেই কিন্তু বিস্তার আছে। আমি মনে করি, মৃত-দেহের একটা আঙ্গুল প্রাণ পেয়ে যতই তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে জীবনের প্রমাণ দিক, তার চেয়ে সর্বাঙ্গে একটুখানি প্রাণ সঞ্চার হয়ে শরীরটা যদি এক ডিগ্রিও গরম হয়, তাও অনেক ভাল।

রাজকুমার ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার ডবল উপমার ধাক্কায় শ্যামলের এতক্ষণের বড় বড় কথাগুলি যেন ধুলা হইয়া বাতাসে উড়িয়া গেল।

কিন্তু শ্যামল তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারকে জব্দ করিতে উঠিয়া নিজে জব্দ হইয়া আসন গ্রহণ করার মত মানসিক অবস্থা তার ছিল না। প্রাণপণ চেষ্টায় একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে বলিতে গেল, রাজকুমারবাবু যে সব—

রিণি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনো মাদ্রাজে গেছেন শ্যামলবাবু?

শ্যামল দমিয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, আমি—? না, যাইনি।

ও! কিছু মনে করবেন না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

শ্যামল বোধ হয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল সুযোগ পাইল না। পাঞ্জাবীর ডানদিকের পকেটে তার এমন জোরে টান পড়িল যে আপনা হইতেই সে বসিয়া পড়িল।

মালতী বলিল, চুপ করে বসে থাকুন।

কেন? আমার যা বলবার আছে—

চুপ্। একটি কথা নয়। মুখ বুঁজে বসে থাকুন।

না বস্‌ব না। আমি যাই।

বসে থাকুন। সকলের সঙ্গে যাবেন।

মালতীর চাপা গলার তীব্র ধমকে শ্যামল যেন শিথিল, নিস্তেজ হইয়া গেল।

তারপর রিণি যখন সভাশেষের গান ধরিয়াছে, মেয়েরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা আরম্ভ করিয়াছে, মাদ্রাজী মেয়েটির সঙ্গে সরসী রাজকুমারের পরিচয় করাইয়া দিল। মেয়েটির নাম রুক্মিণী, সরসীর সঙ্গে পড়িত। এখন নিজে আর পড়ে না, একটি স্কুলে মেয়েদের পড়ায়।

আপনি সুন্দর বলেছেন।

রাজকুমার সবিনয়ে হাসিল।

আমি ভাবছিলাম একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বলবেন, এতো ভারি আশ্চর্য, আমাদের দেশের মেয়েদের কথা তিনি ভাল করে জানবেন কি করে? খুব আগ্রহ নিয়ে তাই আপনার কথা শুনতে এসেছিলাম। ভারি খুসী হয়েছি আপনার বক্তৃতা শুনে। কেবল একটা কথা—দ্বিধা ও সঙ্কোচের ভঙ্গিতে রুক্মিণী এতক্ষণ ইতস্ততঃ করিল যে রাজকুমারের মনে হইল কথাটা বুঝি শেষ পর্যন্ত না বলাই সে ঠিক করিয়াছে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

আচ্ছা, মাদ্রাজের দু'চার জন মেয়েও কি বাংলার কাঁচের নলের মেয়েদের—মানে, যারা খুব এগিয়ে গেছেন তাদের সমান হতে পারেন নি ?

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিল, তা পেরেছেন বৈকি, অনেকেই পেরেছেন।

রুক্মিণী খুসী হইয়া বলিল, থ্যাঙ্কস।

তাই বটে। একজন মাদ্রাজী মেয়েও যদি চরম-কালচারী বাঙ্গালী মেয়েদের সমান না হইতে পারিয়া থাকে, রুক্মিণী তবে দাঁড়ায় কোথায় ? রাজকুমার মনে মনে ভাবিল, রুক্মিণী মেয়েটি বেশ।

সকলের আগে স্যর কে, এল বিদায় নিলেন। তাঁর অম্বলের অসুখ, লাইট রিফ্রেশমেণ্টও সহ্য হইবে না। তা ছাড়া, এই সব ছেলেমানুষের সভায় যদি বা এতক্ষণ থাকা গিয়াছিল, সভা এখন বৈঠকে পরিণত হইয়াছে, এখন আর থাকা চলে না। তাঁর কাজও আছে।

রাজকুমার বলিল, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

পথে স্যর কে, এল আপন মনেই নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন, উপভোগ্য একটা রসিকতার রস যেন মন হইতে তাঁর কিছুতেই মিলাইয়া যাইতেছে না।

অদেকদিন আগে এমনি একটা আসরে উপস্থিত ছিলাম রাজু। বিলাতে।

এমনি আসর ?

অবিকল এই রকম। ইয়ং বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস্। আমার মতই একজন আধবুড়োকে প্রেসিডেণ্ট করেছিল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ রাজু। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা সভা করে কিন্তু প্রেসিডেণ্ট করে বুড়োকে ? কম বয়সী কাউকে প্রেসিডেণ্ট করতে বোধ হয় তাদের হিংসা হয়। কিম্বা হয়তো প্রেসিডেণ্ট বলতেই এমন একটা গম্ভীর জবরদস্ত মানুষ বোঝায় যে বুড়ো ছাড়া প্রেসিডেণ্টের আসনে কাউকে বসাবার কথা তারা ভাবতেও পারে না।

রাজকুমার হাসিল।—বর্ণনাটা কিন্তু আপনার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

স্যর কে, এল-ও হাসিলেন।—কিছু কিছু খাপ খায় বৈকি। বয়স তো হয়েছে, আমি হলাম অতীতের জীব, তোমাদের কাছে আমি বুড়ো, স্থিতি লাভ করেছি। আমাকে প্রেসিডেণ্টের আসনে বসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চপলতা করা কত সুবিধা বলতো !

চপলতা স্যার কে, এল ?

চপলতা রাজু, নিছক চপলতা। তোমাদের কপাল ভাল, এত সহজে এত সস্তায় চপল হতে পার। আমার আধ বোতল শ্যাম্পেন দরকার হয়, তিন চারটা

ককটেল। তাও কি তোমাদের মত চপলতা আসে! হয় দার্শনিক চিন্তা আসে, নয় ঘুম পায়।

স্যর কে, এল-এর বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াইল। স্যর কে, এল কিন্তু নামিলেন না।

এক কাপ কফি খেয়ে যাবে রাজু?

কফি? কফি খেলে রাত্রে ঘুম হয় না।

রাজকুমার নামিয়া গেল। আসরে তার ভাল লাগে নাই, বক্তৃতা শুনিয়া সকলে খুব হৈ চৈ করিয়াছে বটে শেষের দিকে, নিজে কিন্তু সে ভুলিতে পারে নাই আগাগোড়া সবটাই তার ফাঁকি; সকলকে ভাঁওতা দিয়া সে হাততালি পাইয়াছে এবং একটু চিন্তা করে এমন যারা আসরে ছিল তাদের কাছে তার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সাফল্যের আনন্দের সঙ্গে সে তাই লজ্জাও বোধ করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। শ্যামলের ব্যবহারেও মনটা বড় বিগড়াইয়া গিয়াছিল। সেখানে যেন বাতাসে পাখা মেলাইয়া উড়িয়া বেড়ানোর মত হাল্কা মনে হইয়াছিল নিজেকে। তখন বুঝিতে পারে নাই। এখন স্যার কে, এল-এর সঙ্গে এতটুকু পথ গাড়ীতে আসিয়া এমন ভারি বোধ হইতেছে নিজস্বতাকে যে সাধ যাইতেছে ফুটপাতে গা এলাইয়া শুইয়া পড়ে।

স্যার কে, এল ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, ক্লাব।

বাড়ীর দরজা পর্যন্ত আসিয়া স্যার কে, এল ফিরিয়া গেলেন ক্লাবে এবং কোথাও যাইবার কথা ভাবিতে না পারিয়া রাজকুমার ফিরিয়া গেল নিজের ঘরে।

আবার কি মাথা ধরিয়াছে তার? কেমন একটা ভোঁতা যন্ত্রণা বোধ হইতেছে মাথার মধ্যে। চারকোণা ঘরের বাতাস যেন চারিদিক হইতে মাথায় তার চাপ দিতেছে।

রাজকুমার মালতীকে পড়াইতেছিল।

সারাদিন অবিরাম বর্ষণের পর বৃষ্টি থামিয়াছিল সন্ধ্যার একটু আগে, কিন্তু মেঘ তখনও আকাশ ঢাকিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। যে কোন মুহূর্তে আবার ঝমাঝম ধারাপাত শুরু হইয়া যাইতে পারে।

প্রথমে মালতী ভাবিয়াছিল, আজ কি রাজকুমার এই বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাকে পড়াইতে আসিবে? তারপর আবার তার মনে হইয়াছিল, পড়াইতে যে রকম ভালবাসে রাজকুমার, যতটুকু সময়ের জন্যই হোক বৃষ্টিটাও যখন থামিয়াছে, হয় তো সে আসিতেও পারে!

তাই, রাজকুমার আসিবে কি আসিবে না ঠিক না থাকায় দুপুরের গুমোটের স্বেদে আত্মগ্লানিময় শরীরটিকে সযত্ন প্রসাধনে একটু চাঙ্গা করিয়া তুলিয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

না আসে রাজকুমার নাই আসিবে। যদি আসে—

রাজকুমার আসিল এবং কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কেবল পড়িতে নয় পড়াইতেও সে খুব পটু। মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অনেক সময় কথার অভাবে তাকে মূক হইয়া থাকিতে হয় কিন্তু আলাপ আলোচনার উপরের স্তরের চিন্তাগুলিকে খুব সহজেই শব্দের রূপান্তর দিতে পারে। কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার সময় সে মসগুল হইয়া যায়।

পড়ার সময় মালতীও কোন রকম দুষ্টামি করে না। ইচ্ছাও হয় না, সাহসও পায় না। এ সময় বাজে কথায় রাজকুমার বড় বিরক্ত হয়। একদিন স্বভাব দোষে অতি হাল্কা আর অতি সূক্ষ্ম একটা খোঁচা দেওয়া রসিকতা করিয়া বসায় রাগ করিয়া রাজকুমার তিন দিন তাকে পড়াইতে আসে নাই। পড়ানোর জন্য রাজকুমার বেতন পায়, তবু।

বৃষ্টি না নামিলে হয়তো রাজকুমার মালতীকে আজ পড়াইতে আসিত না।

বিশ্বজগতের সম্রাট আজ আর সে নয়, সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি আসার সময় পর্যন্ত সে যা ছিল। মানুষের মনের এটা কি জটিল রাজনীতির ব্যাপার কে জানে, সারাদিনের অবিরাম বর্ষণ হঠাৎ থামিয়া যাওয়াকে উপলক্ষ করিয়াই এক মুহূর্তে রাজা ভিখারী হইয়া যায়। বেশ ছিল সে সারাদিন। সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছিল, রোদ নাই, জমাট বাঁধা কালো মেঘের গভীর ছায়া নামিয়াছে। কি যে তৃপ্তি বোধ হইয়াছিল রাজকুমারের। তারপর বৃষ্টি নামিতে জাগিয়াছিল উল্লাস, জীবনে ফাঁকি ছিল না, অপূর্ণতা ছিল না, নিজের ঘরটিতে বন্দী হইয়া থাকিয়াও মনে হইয়াছিল বাহিরের যে জগৎ জলে ভাসিয়া যাইতেছে তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? ঘরে বন্দী থাক দেহ, কোটি বছর অমনি তৃপ্তি আর আনন্দের সঙ্গে মন রাজত্ব করুক নিজের রাজ্যে।

তারপর বৃষ্টি থামিয়া গেল। মেঘের ওপারেও তখন রোদ নাই। মেঘের ছায়া ধীরে ঢাকিয়া যাইতেছে গাঢ়তর রাত্রির ছায়ায়। তখন মনে হইয়াছিল, বৃষ্টি যখন নাই, এবার বাহির হওয়া যাইতে পারে—বাড়ীর বাহিরে যে জগতে গিরি, রিণি, সরসী আর মালতী বাস করে সেই জগতে। কিন্তু এই বাদল দিনের শেষে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হওয়া যায়, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো যায় যত খুসী, ওদের

কারো বাড়ী যাওয়ার অজুহাত তো তার নাই ! যার কাছেই যাক, সে ভাবিবে ভিখারী আসিয়াছে ঃ রাজাকে ভিখারী সাজিয়া আসিতে দেখিয়া শুধু কথা ও হাসি ভিক্ষা দিতেই কত সে কার্পণ্য করিবে কে জানে !

ওরা কেউ তো বুঝিবে না কি ভাবে সারাদিন ঘরে আটক থাকিয়াও একাই সে অনেক হইয়া নিজের জগৎ ভরিয়া রাখিয়াছিল, আবার কি ভাবে সে একা হইয়া গিয়াছে, চার জনের একজনের সঙ্গেও দুটি কথা বিনিময়ের সুযোগ পর্যন্ত নাই বলিয়া মন তার কেমন করিতেছে।

না বুঝিলে কি আসিয়া যায় ? নিজেকে সে যে ভুলিতে আসিয়াছে একথা মনে করার বদলে যদি অন্যকে ভুলাইতে আসিয়াছে ভাবে, কি ক্ষতি আছে তাতে ? মনে মনে না হয় ওরা কেউ একটু হাসিবে, না হয় বলিবে মনে মনে, হে আত্মভোলা মহাপুরুষ, তোমার এত দিনের উদাসীন অবহেলার ফাঁকিটা তবে আজ ধরা পড়িয়া গেল ? হে সিনিক, শেষ পর্যন্ত আমিই তবে তোমাকে রোমান্সের মধুতে ডুবাইয়া দিয়াছি ? এই হাসি হাসিবার এবং এই কথা বলিবার অধিকার ওদের চিরন্তন, একদিন না হয় অধিকারটা সে খাটাইতে দিল ?

কিন্তু মন মানে নাই রাজকুমারের। উপযাচকের কলঙ্ক জুটিবার ছেলেমানুষী ভয়ের জন্য নয়, এই কলঙ্ক যে আরোপ করিবে তারই ভয়ে। যে জটিল সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে ওদের সঙ্গে তার জট খুলিবে না, কেউ সহজ হইতে পারিবে না। একা থাকিতে না পারিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এ একাকীত্ব যে তার কাছে অর্থহীন, দুর্বোধ্য রহস্যের মত, কাছে বসিয়া কথা বলিলে, কাছে আসিয়া এক হওয়ার খেলা খেলিলে যে এই একাকীত্বের দুঃখ তার ঘুচিবে না, এ সত্য অন্যের কাছে কোন মতেই সত্য হইয়া উঠিবে না। মানুষ দুটি থাকিবে আড়ালে, একের সভ্যতা শুধু পীড়ন করিবে অপরকে।

কেবল মালতীর কাছে যাওয়ার একটা বাস্তব অজুহাত আছে। মালতীও অনেক কিছু মনে করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পীড়ন করার সুযোগ পাইবে না। বেতন পায় তাই বাদল অগ্রাহ্য করিয়া পড়াইতে আসিয়াছে, এই বর্ম গায়ে আঁটিয়া কিছুক্ষণ মালতীর সঙ্গে কাটাইতে পারিবে। তা ছাড়া, কথা আর হাসি ওখানে দরকার হইবে না, বাড়তি অস্বস্তির যন্ত্রণা জুটিবে না। পড়ানো তার কাজ—বেতনভোগীর নিছক কর্তব্য পালন করা। সেটুকু করিলেই চলিবে।

বাহিরে আবার যখন বৃষ্টি নামিল, ঘরের মধ্যে রাজকুমার বোধ হয় তখন ভুলিয়াই গেল কোথায় বসিয়া কাকে সে পড়াইতেছে। শুকনো কথার শব্দ জলের

শব্দে খানিকটা চাপা পড়িয়া গেল। ভাল করিয়া শুনিবার জন্য টেবিলের উপর হাত রাখিয়া মালতী সামনের দিকে আরও ঝুঁকিয়া বসিল।

রাজকুমার হঠাৎ থামিয়া গেল, সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, তুমি কিছু শুনছো না মালতী।

শুনছি। সত্যি শুনছি। কি করে জানলেন শুনছি না?

আমি জানতে পারি।

মালতী নীরবে আস্তে আস্তে কয়েকবার মাথা নাড়িল। অর্থাৎ সেটা সম্ভব নয়, কিছু জানিবার ক্ষমতা রাজকুমারের নাই।

রাজকুমার শ্রান্তভাবে একটু হাসিল।—যাক্‌গে, আজ পড়াতেও ভাল লাগছে না।

ভাল লাগছে না?

মালতী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসু চোখ তুলিল। অর্থাৎ তাই যদি হয়, এতক্ষণ মসগুল হইয়া তুমি তবে কি করিতেছিলে?

রাজকুমার চেয়ারটা পিছনে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পূবের দেয়াল ঘেঁষিয়া দুটি বই-ভরা আলমারি অযথা গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, রাজকুমারের মনের গাম্ভীর্যের রূপধরা ব্যঙ্গের মত। হাজার মানুষের মনের যে গঞ্জনাকে প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়া সে মনকে ভারি করিয়াছে, আলমারির এই বইগুলির চেয়ে তার ওজন কম নয়। চাপ দেওয়া ওজন—বুকের উপর বইগুলি স্তূপ করিয়া রাখিলে শুধু কাগজের যে চাপে পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিবে, অদেহী অক্ষরের পেষণ তার চেয়ে ভারি।

এক দিকের দুটি জানালাই খোলা। এদিক দিয়া ছাট আসে না। পাশের একতলা বাড়ীর ফাঁকা ছাতে বৃষ্টি-ধারা আছড়াইয়া পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। বই-এর আলমারি ছাড়িয়া রাজকুমার জানালায় গেল, আবার ফিরিয়া আসিল।

এখন যাই মালতী।

বৃষ্টি পড়ছে যে?

তাই বটে, বৃষ্টি পড়িতেছে। মালতী যখন মনে পড়াইয়া দিয়াছে এখন বৃষ্টি মাথায় করিয়া চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। মালতীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া রাজকুমার বলিল, নোট নিয়েছ?

চতুষ্কোণ টেবিলের অন্য তিন দিকের যেখানে খুসী দাঁড়াইয়া এ প্রশ্ন করা চলিত, মালতীর খাতাও দেখা চলিত। কিন্তু চতুষ্কোণ ঘরের মতই চতুষ্কোণ

টেবিলেও মাঝে মাঝে প্রান্তরের বিস্তৃতি পায়, এত দূর মনে হয় একটি প্রান্ত হইতে আরেকটি প্রান্ত !

মালতীর খোলা খাতার সাদা পৃষ্ঠা দুটিতে একটি অক্ষরও লেখা হয় নাই, দুটি পৃষ্ঠার যোগরেখার উপর লিখিবার কলমটি পড়িয়া আছে। রাজকুমার হাত বাড়াইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে গেল অন্য পৃষ্ঠায় কিছু লেখা আছে কিনা। তার বুকে লাগিয়া মালতীর মাথাটিও নত হইয়া গেল। রাজকুমারের আঙ্গুলে তারের মত সরু একটি আংটী, তাতে এক বিন্দু জলের মত একটি পাথর। দু'হাতে সেই আংটী পরা হাতটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আরও মাথা নামাইয়া আংটীর সেই পাথরটিতে মুখ ঠেকাইয়া মালতী চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সে যেন পিপাসায় কাতর, জল-বিন্দুর মত ওই পাথরটি পান করিয়াই পিপাসা মিটাইতে চায়।

তখন এক কোমল অনুভূতির বন্যায় রাজকুমারের চিন্তা আর অনুভূতির জগৎ ভাসিয়া গেল, মনে হইল শুধু মমতায় এবার তার মরণ হইবে। মালতীর একটি চুলের জন্য তার একি মায়া জাগিয়াছে! এক মুহূর্তের বেশী সহ্য করাও কঠিন এমন এই আত্মবিলোপ। মালতীকে বিশ্বজগতের রাণী করিয়া দিলে তার সাধ মিটিবে না, ফুলের দুর্গে লুকাইয়া রাখিলে ভয় কমিবে না, তাই শুধু মালতী ছাড়া কিছুই সে রাখিতে চায় না, নিজেকে পর্যন্ত নয়।

কয়েক মুহূর্তে শ্রান্ত হইয়াই সে যেন ধীরে ধীরে মালতীর চুলে মাথা রাখিল।

মুখ তোলো, মালতী।

মালতী মুখ তুলিল। তারপর ব্যস্তভাবে উঠিয়া সরিয়া গেল।

রাজকুমার বলিল, কি হয়েছে মালতী ?

মালতী মৃদুস্বরে বলিল, শ্যামল এসেছে।

কোথায় শ্যামল ?

মালতী ততক্ষণে খোলা দরজার কাছে আগাইয়া গিয়াছে। দরজার বাহিরে গিয়া সে ডাকিল শ্যামল ?

শ্যামল চলিয়া যাইতেছিল, বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। জামা কাপড় তার ভিজিয়া চুপ্‌সিয়া গিয়াছে! দরজার বাঁ দিকের আধভেজান জানালাটির নীচে মেঝেতে অনেকখানি জল জমিয়া আছে। শ্যামলের গা বাহিয়া তখনও জল পড়িতেছিল।

মালতী বলিল, এ কি ব্যাপার শ্যামল ?

শ্যামল বলিল, একটা ফোন করতে এসেছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি নামল—

রাজকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের আগে তার চোখে পড়িল জলে ভেজা শ্যামলের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। শিশু যেন হঠাৎ ভয় পাইয়া দিশেহারা হইয়া গিয়াছে।

মালতী বলিল, বৃষ্টি নেমেছে অনেকক্ষণ, এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে কি করছিলে? বৃষ্টি যখন নামল, বাড়ী ফিরে গেলে না কেন? রাস্তায় ভিজে গেলে, তবু ফোন করতে এলে কি বলে?

জেরায় কাতর শ্যামল বলিল, দরকারী ফোন কি না, ভাবলাম একটু ভিজলে আর কি হবে! একটা শুকনো কাপড় আর গেঞ্জি দেবে আমাকে?

মালতী দ্বিধা করিল, যতক্ষণে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে, ততক্ষণ। তারপর বলিল, শুকনো কাপড দিয়ে কি করবে, রাস্তায় নামলেই তো কাপড় আবার ভিজে যাবে। একেবারে বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়ো। বড়ো ছেলেমানুষ তুমি,—সত্যি।

একখানা শুকনো কাপড় দিয়া বৃষ্টি ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না দিয়া ভিজা কাপড়ে তাকে এক রকম তাড়াইয়া দেওয়া হইল। শ্যামল হয় মালতীর কথার মানেই বুঝিতে পারিল না অথবা বুঝিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না, এমনি এক অদ্ভুত বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সে খানিকক্ষণ মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর নীরবে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ঘরে গিয়া টেবিলের দুপাশের দুটি চেয়ারে বসিয়া দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল। মালতীর মুখখানি অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে-ই অস্ফুটস্বরে বলিল, শ্যামল সব দেখেছে।

সব? সব মানে কি? রাজকুমার আশ্চর্য হইয়া গেল। জানালা দিয়ে দেখছিল?

হ্যাঁ তুমি যখন পড়াও, প্রায়ই এসে বারান্দায় কেউ না থাকলে জানালা দিয়ে উঁকি দেয়।

রাজকুমার আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। প্রাণপণে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, তার মানে—?

মালতী সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই। এমন ছেলেমানুষ আর দেখিনি। একটু বয়স বাড়লেই এ ভাবটা কেটে যাবে জানি তবু এমন বিশ্রী লাগে মাঝে মাঝে! এ সব নীরব পূজার ন্যাকামি কোত্থেকে যে শেখে ছেলেরা!

ছেলেরা! যাদের সঙ্গে কলেজে পড়ে মালতী তারা কচি ছেলের দলে গিয়া পড়িয়াছে, এতই সে বুড়ী! রাজকুমারের এবার আপনা হইতেই হাসি আসিল।

একখানা শুকনো কাপড় চাইল, তাও দিলে না?

খুব অন্যায় হয়ে গেছে, না? একটু উদ্বেগের সঙ্গেই মালতী জিজ্ঞাসা করিল। তারপর মাথা নীচু করিয়া বলিল, দিতাম, অন্যদিন হলে দিতাম। আজ কাপড় দিলে বসে থেকে আমাদের জ্বালাতন করত।

আর পড়বে?

না। কি হবে পড়ে?

বলিয়া অনেকক্ষণ পরে মালতী তার দুষ্টামি ভরা হাসি হাসিল।

বৃষ্টি থামিল রাত্রি দশটার পর।

রাস্তায় কিছু কিছু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, জুতা ভিজাইয়া বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে নিজেকে বড় নোংরা মনে হইতে লাগিল রাজকুমারের। পথের সমস্ত ময়লা যেন জলে ধুইয়া তারই পায়ে লাগিতেছে।

গলির মধ্যে তার বাড়ীর সামনে শ্যামলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রাজকুমার ঠিক আঘাত পাওয়ার মতই চমক বোধ করিল। এখনও শ্যামলের জামা কাপড় ভিজিয়া চপ্ চপ্ করিতেছে। মালতীর বাড়ী হইতে বাহির হইবার পর হইতে এতক্ষণ সে কি এখানে দাঁড়াইয়া আছে? অথবা বাড়ী হইতে শুকনো জামাকাপড় পরিয়া আসিয়া আবার জলে ভিজিয়াছে?

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে রাজকুমারবাবু।

এসো না, ভেতরে এসো।

না, এখানে দাঁড়িয়েই বলি।

রাজকুমার একটু রাগ করিয়া বলিল, শ্যামল, মালতীর কথা বলবে বুঝতে পারছি, কিন্তু ভিজে কাপড়ে জলকাদায় দাঁড়িয়ে না বললে কি চলবে না তোমার? এমন ছেলেমানুষ তো তুমি ছিলে না, কি হয়েছে তোমার আজকাল? বলিয়া রাজকুমার দরজায় কড়া নাড়িল।

দরজা খুলিবার সময়টুকুর মধ্যে শ্যামল একবার কয়েক পা আগাইয়া আবার আগের জায়গায় গিয়া দাঁড়ায়। যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না রাজকুমারের বাড়ীতে ঢুকিবে কি ঢুকিবে না। ভিতরে গিয়া তাকে রাজকুমারের একবার ডাকিতে হয়।

শ্যামল আগেও কয়েকবার রাজকুমারের কাছে আসিয়াছে, মনোরমা তাকে চিনিত। তাকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠে, ভিজে চুপচুপে হয়ে এত রাতে তুমি কোথা থেকে এলে ভাই? ও কালী, কালী, তোর রাজুদার ঘর থেকে একখানা শুকনো কাপড় এনে দে শীগগির।

গিরির সমবয়সী একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়। গিরির চেয়ে তার স্বাস্থ্য ভাল, বোধ হয় সেইজন্যই তার মুখে কচি ভাবের খানিকটা স্নিগ্ধ লাবণ্য আছে। মনোরমার তাগিদ সহিতে না পারিয়া রাজকুমার সরসীর সভার পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর গিয়া কালীকে নিয়া আসিয়াছে।

রাজকুমারের সঙ্গে এত বড় (বার তের কম বয়স নয় গৃহস্থ মেয়েদের) মেয়েকে পাঠানো সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া মনোরমা আগেই মাসীর কাছে পত্র দিয়াছিল, তবু কালীর মা, মেয়েকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস পায় নাই। কালীর সঙ্গে তার সাত বছরের একটি ভাইও আসিয়াছে।

কালী বলে, কি দিদি?

মনোরমা বলে, বললাম যে? শুকনো কাপড় নিয়ে আয় রাজুদার ঘর থেকে।

মনোরমার উদারতায় মনে মনে রাজকুমারের হাসি পায়। শ্যামলের জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, আহা, অসুখ যদি করে ছেলেটার?—ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইয়াছে, কিনা মনোরমা, তাই হাতের কাছে আলনাতে স্বামীর শুকনো কাপড় আলনাতেই থাক, রাজকুমারের ঘর হইতে কাপড় আনা হোক একখানা কালীকে দিয়া। এত হিসাব করিয়া অবশ্য মনোরমা কথাটা বলে নাই। তার মনেও আসে নাই এ মানে। এটা শুধু অভ্যাস।

থাক, আমার ঘরে গিয়েই কাপড় ছাড়বে'খন।

বলিয়া শ্যামলকে নিয়া রাজকুমার ঘরে চলিয়া যায়। কালী মুচকি মুচকি হাসিতেছে দেখিয়া মনোরমা রাগের সুরে বলে, হাসছিস যে?

কালী তেমনি ভাবে হাসিতে হাসিতেই বলে, তুমি যেন কি দিদি! বলিয়া এক দৌড় দেয় ঘরের মধ্যে, সেখানে তার মুচকি হাসি শব্দময় হইয়া উঠে!

ঘরে একটিমাত্র চেয়ার, একটির বেশীকে স্থান দেওয়াও মুস্কিল। শ্যামল সেই চেয়ারে বসে, রাজকুমার পা ঝুলাইয়া বসে তার খাটের বিছানায়।

এখন তার মনে হইতে থাকে, রাস্তায় সংক্ষেপে কথা সারিয়া শ্যামলকে বিদায় দিলেই ভাল হইত। শ্যামলকে ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ অতখানি মমতা ও সহানুভূতি বোধ করিয়াছিল কেন কে জানে! মনে হইয়াছিল, ধীর স্থির শান্তভাবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ওর মানসিক বিপ্লব যতটুকু পারা যায় শান্ত করার চেষ্টা করা তার কর্তব্য। মর্মাহত ছোট ভাইটির মত ছেলেটাকে কাছে টানিয়া সান্ত্বনা না দিলে অন্যায় হইবে। কারণ, তার বয়স বেশী, অভিজ্ঞতা বেশী, জ্ঞান বেশী, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বেশী।

এমন খারাপ লাগিতেছে এখন! উপদেশ দিয়া এই বয়সের দুরন্ত হৃদয়াবেগ-সম্পন্ন ছেলেমানুষটিকে শান্ত করা! সে তো পাগলামির সামিল।

একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া শ্যামল অন্যদিকে তাকায়, হঠাৎ কিছু বলিতে পারে না। এ তো জানা কথাই যে মনের মধ্যে তার ঝড় চলিতেছে, কথা আরম্ভ করা তার পক্ষে সহজ নয়। বাড়ীর সামনে রাস্তায় প্রথম ঝোঁকে অনেক কথাই সে বলিয়া ফেলিতে পারিত, এতক্ষণের ভূমিকার পর খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

আপনি ওকে বিয়ে করবেন?

শ্যামলের কথা শুনিয়া রাজকুমার কিছুমাত্র আশ্চর্য হইল না। এই রকম প্রশ্নই সে প্রত্যাশা করিতেছিল।

একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

আপনি তা বুঝতে পারছেন।

না, বুঝতে পারছি না। তুমি মালতীর অভিভাবক নও, আত্মীয়ও নও। আমাকে এ প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই।

আমার অধিকার আছে।

শ্যামল এমন জোরের সঙ্গে কথাটা ঘোষণা করিল যে কথাটার সহজ মানে বুঝিতে রাজকুমারের একটু সময় লাগিল। মনে হইল সত্য সত্যই মালতী সম্পর্কে অন্য অধিকারও বুঝি শ্যামলের আছে।

কিসের অধিকার তোমার? তুমি নিজে মালতীকে বিয়ে করতে চাও, এই অধিকার?

শ্যামলের মেরুদণ্ড সিধা হইয়া গেল। সোজা রাজকুমারের চোখের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট উচ্চারণে প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়া দিয়া সে বলিল, বিয়ে করি বা না করি, ওকে আমি স্নেহ করি। আপনাদের ওসব কথার মারপ্যাচ আমি বুঝি না, সোজাসুজি এই বুঝি মালতীর এতটুকু ক্ষতি হলে আমার সহ্য হবে না। সেই দাবীতে আমি আপনাকে স্পষ্ট একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি, সোজা ভাষায় জবাব দিন।

তুমি বড় ছেলেমানুষ শ্যামল।

বাজে কথা বলে লাভ কি?

তারপর দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া গেল।

শ্যামল খালি গায়ে বসিয়া আছে, রাজকুমারের শুকনো কাপড়খানা শুধু সে পরিয়াছে, জামা গায়ে দেয় নাই। প্রয়োজনের বেশী সামান্য একটু ভদ্রতাও সে

যেন রাজকুমারের কাছে গ্রহণ করিতে চায় না। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন তার দেহের, বোধ হয় অল্পদিন আগে ব্যায়াম আরম্ভ করিয়াছে, পেশীগুলি স্পষ্ট ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে কিন্তু এখনও কঠিন হয় নাই। প্রথম হইতেই রাজকুমার কেমন মৃদু একটু ঈর্ষা বোধ করিতেছিল। এতক্ষণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সুগঠিত মাংসপেশীর জন্য একজন তরুণকে সে হিংসা করিবে? এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে! কিন্তু ছেলেটার তেজ দেখিয়া রাগে ভিতরটা জ্বালা করিতেছে জানিয়া, গলা ধাক্কা দিয়া ছেলেটাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে হইতেছে বলিয়া, ঈর্ষার অস্তিত্বটা আর নিজের কাছে অস্বীকার করা গেল না।

একটু আগে যার উপর গভীর মমতা জাগিয়াছিল, এখন তাকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে, মালতীর প্রতি তার প্রথম যৌবনের ভাবপ্রবণ অন্ধ ভালবাসার সুযোগ নিয়া হীন কাপুরুষের মত অকারণ নিষ্ঠুর আঘাত করিবার সাধ জাগিতেছে।

শ্যামল বলিল, বলুন? জবাব দিন?

তুমি যাও শ্যামল।

আমার কথাটার জবাব দিন আগে? আপনার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দিন, আমি এক সেকেণ্ডও আপনাকে জ্বালাতন করব না।

মুখখানা শ্যামলের কালো হইয়া গিয়াছিল, রাজকুমারের সাড়া শব্দ না পাইয়া হাতের উল্টা পিঠ দিয়া সজোরে সে একবার কপালটা মুছিয়া ফেলিল। কপাল তার ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বুঝতে আমি পারছি, উদ্দেশ্য ভাল হলে এত ইতস্ততঃ করতেন না। তবু আপনার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই।

শুনে কি করবে?

প্রশ্নটা যেন বুঝিতেই পারিল না, এমনি ভাবে শ্যামল খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, কি করব? তা জানি না? আপনি তো জানেন আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

তুমি শুধু জানতে চাও?

একমুহূর্তে রাজকুমার যেন নিজেকে ফিরিয়া পাইল। কি ছেলেমানুষীই এতক্ষণ সে করিয়াছে এই ছেলেমানুষের সঙ্গে! জীবনের কেনাবেচার হাটে যাকে শুধু খেলনা দিয়া ভুলানো যায়, তার সঙ্গে এত সাবধানতার সঙ্গে শুরু করিয়াছে সুখ

দুঃখ হাসি কান্নার পণ্য নিয়া বুঝাপড়ার তর্ক।

রাজকুমার একটা সিগারেট ধরাইল, কথা কহিল ধীরে ধীরে, অন্তরঙ্গ ভাবে, বন্ধুর মত।

তোমাকে একটা কথা বলি শ্যামল। মালতীকে তুমি ভালবাস। তোমার এ ভালবাসা দু'দিনের নয় নিশ্চয় ? বিয়ে না হলেও চিরদিন তুমি মালতীকে ভালবেসে যাবে নিশ্চয় ?

কিন্তু—

কিন্তু জানি। তুমি বলতে চাও, তোমার কথা আলাদা। মালতীর জীবনে এতটুকু দুঃখ আনার চেয়ে মরে যাওয়া তুমি ভাল মনে কর। করণ, তুমি যে ভালোবাসো মালতীকে !—টোকা দিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া গলার সুর বদলাইয়া,—কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি না, তাই আমার সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনার সীমা নেই। তোমার মতে, ভালবাসাটা তোমার একচেটিয়া সম্পত্তি, এ জগতে আর কেউ ভালবাসতে পারে না, আর কারও ভালবাসার অধিকার নেই।

অন্ততঃ আপনার নেই।

শুনিয়া আহত বিস্ময়ে রাজকুমারের মুখে কথা ফুটিল না।

শ্যামল একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিল, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, সে শ্রদ্ধা বজায় থাকলে মালতীর সম্বন্ধে আমার এতটুকু ভাবনা হ'ত না। কিন্তু আপনি নিজেই আমার শ্রদ্ধা ভেঙ্গে দিয়েছেন।

সেদিন সভায় তোমায় অপদস্থ করেছিলাম বলে ?

না। গিরির সঙ্গে কুৎসিৎ ব্যবহার করেছিলেন বলে।

তারপর শ্যামল চলিয়া যাওয়ার আগে আরও যে দু'চারটি কথা বলিল, রাজকুমারের কাণে গেল না। যেমন বসিয়াছিল তেমনি ভাবে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন অকথ্য গালাগালি দিয়াই তবে গিরীন্দ্রনন্দিনীর জননী তাকে রেহাই দেয় নাই, প্রায়শ্চিত্তের জেরটা যাতে আরও টানিয়া চলিতে হয় তার ব্যবস্থাও করিয়াছে।

গিরীন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে তার কুৎসিৎ ব্যবহারের সংবাদ আরও কত লোকে জানিয়াছে কে জানে !

জীবনে এই প্রথম মিথ্যা দুর্ণামের সংস্পর্শে আসিয়া রাজকুমারের মন যেন দিশেহারা হইয়া গেল। কতবার ভাবিল যে, লোকে যা খুসী ভাবুক, তার কি আসিয়া যায়, সে তো কোন অন্যায় করে নাই ! সে কেন জ্বালাবোধ করিবে তার

সম্বন্ধে কে কোথায় কি মিথ্যা ধারণা পোষণ করিতেছে ভাবিয়া? কিন্তু জ্বালা সে বোধ করিতেই লাগিল। অন্যায় না করুক, সেদিন ভুল সে করিয়াছিল, বোকামি করিয়াছিল। ভুলের শাস্তিও মানুষকে পাইতে হয় বৈকি। গরম চায়ে পর্যন্ত মুখ পুড়িয়া যায়।

এ দুর্নামের প্রতিবাদে তার কিছু বলিবার উপায় পর্যন্ত নাই। শ্যামলকে সমস্ত ব্যাপারটি খুলিয়া বলিলেও সে বুঝিত না, বিশ্বাসও করিত না। শ্যামলের মত অন্য সকলেও বুঝিবে না, বিশ্বাস করিবে না। নীরবে এ অপবাদ তাকে মানিয়া নিতে হইবে!

এমনি যখন মানসিক অবস্থা রাজকুমারের, অবরুদ্ধ নিরুপায় ক্রোধের উত্তেজনায় ভিতরটা যখন তার ফেনার মত ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছে আর সমস্ত জগতের উপর ভয়ঙ্কর একটা প্রতিশোধ নেওয়ার অন্ধ কামনা জাগিয়াছে, তখনকার মত জগতকে পাওয়া না গেলেও হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই আঘাত করার জন্য ছটফট করিতেছে, ঘরে তখন আসিল কালী।

বলিল দিদি ডাকছে, খেতে চলুন।

গিরির সমবয়সী কালী। গিরির মত সেও সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বর্বরতার আবহাওয়ায় স্নেহহীন মায়ের কোলে মানুষ হইয়াছে। গিরিকে নিয়া একটা বদনাম যখন তার রটিয়াছে, কালীকে নিয়া আরেকটা বদনামও রটুক। রটুক, কি আসিয়া যায়? মনটা শান্ত হওয়ার সময় পাইলে নিজের খাপছাড়া খেয়ালে নিজেরই তার হাসি পাইত। এখন মনে হইল, খেয়ালটা না মিটাইতে পারিলে কোনমতেই তার চলিবে না।

কালী, শোনো।

কালী নির্ভয়ে কাছে আগাইয়া আসিল—কি?

তোমার নাড়ী আছে কালী? অসুখ হলে ডাক্তাররা হাত ধরে যে পালস দ্যাখে, সেই নাড়ী।

আছে না? ও পাল্‌স সবারি থাকে।

কালীর মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তোমার পালস্ নেই। এক একটি মেয়ের থাকে না।

পাল্‌স না থাকলে কেউ বাঁচে? মরে গেলে তখন পাল্‌স থাকে না। এই দেখুন—কালী ডান হাতটি বাড়াইয়া দিল।

কব্জি ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষার সুবিধা দেওয়ার জন্য ঘেঁসিয়া আসিল আরও কাছে।

তখন খেয়াল করে নাই, কিন্তু মনের মধ্যে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তির সময় রাজকুমারের মনে পড়িয়াছে, হাত ধরা মাত্র গিরীন্দ্রনন্দিনী কেমন যেন শক্ত হইয়া গিয়াছিল। কালীর কৌতুকের হাসি আর নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব রাজকুমারের মনে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিল। এরকম হওয়ার তো কথা নয়!

ইস্! তোমার পালস্ তো ভারি দুর্বল কালী?

কালীর হাসি মিলাইয়া গেল।

সত্যি?

তোমার হার্ট নিশ্চয় ভারি দুর্বল।

আমি তো জানি না।

দেখি তোমার হার্ট—?

গিরির হৃদ্‌স্পন্দন শুধু সে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল, কালীর হৃদ্‌স্পন্দন সে পরীক্ষা করিতে গেল এক হাতে তাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়া যাইতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ কালী নিস্পন্দ হইয়া রহিল, তারপর রাজকুমারের হাত সারাইয়া দিয়া নিজেও একটু তফাতে সরিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া শঙ্কিত প্রশ্ন আর মৃদু ভয় ও ভৎর্সনা দু'চোখে ফুটাইয়া রাজকুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত পরে ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রাজকুমার ভাবিল, এবার মনোরমা আসিবে। আসিয়া অকথ্য গালাগালি শুরু করিয়া দিবে।

মনোরমা আসিল। অনুযোগও দিল।

খাবে না রাজু ভাই?

হ্যাঁ, যাই।

কালী নিশ্চয় মনোরমাকে কিছু বলে নাই। কালী ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাওয়ার যতটুকু সময়ের মধ্যে মনোরমা তাকে খাইতে ডাকিতে আসিয়াছে তার মধ্যে এত বড় একটা গুরুতর কথা কালীর বলা ও মনোরমার শোনা সম্ভব নয়। গিরির মত একনিঃশ্বাসে সমস্ত বিবরণই তো কালী জানাইতে পারিবে না। ব্যাপারটার একটু আভাস দিয়াই তার মুখে আর কথা ফুটিবে না। মনোরমাকে তখন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জেরা করিয়া সব জানিতে হইবে। তাতে কিছু সময় লাগিবার কথা। মনোরমার গালাগালিটা তবে ভবিষ্যতের জন্য তোলা রহিল?

খাইতে বসিয়া রাজকুমার ঘাড় হেঁট করিয়া খাইয়া যায়। কাল মনোরমার হুকুমে কালী পরিবেশন করিয়াছিল। মনোরমা কি আজও তাকে ডাকিবে? ডাকিলে কালী যদি না আসে? ব্যাপার বুঝিতে গিয়া মনোরমা যদি সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝিয়া আসে? কি বিপদেই মনোরমা পড়িবে তখন! একটা মানুষকে খাওয়াইতে বসাইয়াছে, তার খাওয়াও নষ্ট করিতে পারিবে না; মনের রাগ চাপিয়াও রাখিতে পারিবে না।

কালীকে তোমার কেমন লাগে রাজু ভাই?

মুখের ভাতটা গিলিতে রাজকুমারকে তিনবার চেষ্টা করিতে হইল।

ভালই লাগে।

বড় লাজুক হয়েছে মেয়েটা। কিছুতে তোমার সামনে আসতে চায় না। তা বড় সড হয়ে উঠছে, একটু লজ্জা হবে বৈকি। চোদ্দ পেরিয়ে পনের পা দিয়েছে।

কালীর বয়সটা রাজকুমার জানিত, তার সাদাসিদে মা'টি রাজকুমারের কাছে বলিয়া ফেলিয়াছিল। কালীর বয়সটা মনোরমা একেবারে দু'বছর বাড়াইয়া দিতে চায় কেন প্রথমটা রাজকুমার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তারপর একটা অবিশ্বাস্য কথা মনে আসায় অবাক হইয়া মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তোমার নামে কালী কিন্তু আমার কাছে একটা নালিশ করেছে রাজু ভাই!

মনোরমার মুখে কৌতুকের হাসি। চোখ দিয়া তার হাসি দেখিতে দেখিতে কান দিয়া তার কথা শুনিয়া রাজকুমারের যেন কিছুক্ষণের জন্য ধাঁধা লাগিয়া গেল। কালী তবে নালিশ করিয়াছে? কালীর নালিশ শুনিয়া মনোরমা তাকে অনুযোগ দিতেছে সকৌতুকে!

তুমি নাকি ওকে মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে যাবে বলেছিলে? বিকেলে আমায় বলছিল, তুমি নাকি ভারি খারাপ লোক, কথা দিয়ে কথা রাখো না। আমি বললাম, যা না, বলগে না তুই তোর রাজুদা'কে? তা মেয়ে বলে কি, লজ্জা করে দিদি!

জলের গেলাস তুলিয়া রাজকুমার গেলাসের অর্ধেকটা খালি করিয়া ফেলিল।

খাওয়ার পর অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসিয়া রাজকুমার সিগারেট টানিতেছে, দরজার কাছে বিছানো বারান্দার বাল্‌বের আলোয় একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। ছায়া আর নড়ে না। মনোরমার ছায়া নিশ্চয় নয়। ছায়া ফেলিয়া কারো ঘরের

বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকার ধৈর্য্য মনোরমার নাই।

রাজুদা?

রাজকুমার সাড়া দিতেই কালী ঘরে আসিল।

মসলা নিন্।

প্রতিফলিত আবছা আলোয় হাত বাড়ানো দেখা যায়। রাজকুমারের হাতের তালুতে মনোরমার সযত্নে প্রস্তুত মসলা দিয়া কালী বলিল, আঁধার দেখে এমন ভয় করছিল! জানি আপনি আছেন, তবু ভাবছিলাম, যদি না থাকেন? আঁধারে আমি বড্ড ডরাই।

আলোটা জ্বালো।

জ্বালবো?

কালী বোকা নয়, কিছু শুধু জানে না। ইঙ্গিতে ও সঙ্কেতের ভাষা এখনো শেখে নাই। মালতী সরসী বা রিণি যদি ছুটিয়া ঘর ছাড়াইয়া চলিয়া যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া এভাবে ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত জ্বালবো?—একটি শব্দে কি মহাকাব্যই সৃষ্টি হইয়া যাইত! কালী শুধু প্রশ্নের ভঙ্গিতে তার কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে।

আলো জ্বালিয়া কালী চলিয়া গেল রাজকুমার ভাবে, অভিধান নিরর্থক। শব্দের মানে তারাই ঠিক করে, যে বলে আর যে শোনে। কাজ ও উদ্দেশ্যের বেলাতেও তাই। কি ব্যাপক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা!

বর্ষা শেষ হইয়াছে।

মাঝে মাঝে বাতাসে হঠাৎ যে শীতের আমেজ পাওয়া যায় এখনো তা ভিজা ভিজা মনে হয়, কান্নার শেষে তোয়ালে দিয়া মুছিয়া নেওয়ার পর মালতীর গায়ের শীতল স্পর্শের মত। কালী মার কাছে চলিয়া গিয়াছিল, কয়েকদিনের জন্য আবার আসিয়াছে। মনোরমার তাড়া নাই, বিফল হওয়ার ভয়ও যেন নাই। কালীর দেহে যৌবনের বিকাশে যেমন এতটুকু ব্যস্ততা দেখা যায় না অথচ বিকাশ তার অনিবার্য গতিতে ঘটিতেই থাকে, মনোরমার অভিযানও তেমনি ধীর স্থির মন্থর গতিতে গড়িয়া উঠে। খেলার ছলে হৃদ্স্পন্দন পরীক্ষা করার বিরুদ্ধে কালীর প্রতিবাদ যেমন রাজকুমারের অজ্ঞাতসারেই তিলে তিলে হুকুম হইয়া মাথা তুলিতে আরম্ভ করে, তাকে ঘিরিয়া মনোরমার জাল বোনাও তেমনি হইয়া থাকে তার অদৃশ্য।

কালীকে মনোরমা কখনো বেশী সাজায় না, তার ঘরোয়া সাধারণ সাজেই বৈচিত্র্য স্থষ্টির চেষ্টা করে। কালীর একরাশি কালো চুল আছে, কোনদিন মনোরমা লম্বা বিনুনী ঝুলাইয়া দেয়, কোনদিন রচনা করে ফুলানো ফাঁপানো খোঁপা। সকালে ঘরের কাজ করার সময় কালীর গায়ে সাদাসিধে ভাবে জড়ানো থাকে নিমন্ত্রণে যাওয়ার জমকালো দামী শাড়ী, বিকালে সযত্ন প্রসাধনের পর তাকে পরিতে হয় সাধারণ মিলের কাপড়।

সকালে কালী কাতর হইয়া বলে, ভাল কাপড়খানা নষ্ট হয়ে যাবে যে দিদি?

মনোরমা বলে, হোক। আঁচলটা জড়া দিকি কোমরে, ঘর দোর ঝাঁট দে রাজুর। খাটের তলায় ঝাঁটাস ভাল করে।

বিকালে আরও বেশী কাতর হইয়া কালী বলে, এটা নয় দিদি, পায়ে পড়ি তোমার, ওটা পরি এখন, আবার খুলে রাখব একটু পরে?

মনোরমা বলে, না, অত ফ্যাশন করে কাজ নেই তোমার। গরীবের মেয়ে গরীবের মত থাকো।

কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলে, বোকা মেয়ে, ছেঁড়া কাপড়ে তোকে যে বেশী সুন্দর দেখায় রে!

রাজকুমারের কাছে, সে আপসোস করে, বড় চপল মেয়েটা রাজু, বড় চঞ্চল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, তাও বলি, মেয়ে যেন মানুষের মন কাড়তে জন্মেছে। কি দিয়ে এখন মায়া জাগায় ছুঁড়ি ভগবান জানেন। ডাইনী এসে জন্মায়নি তো মানুষের পেটে? ক'দিনের জন্যে তো এসেছে, সেখানে পাড়াশুদ্ধ সবাই অস্থির, রোজ সবাই জিজ্ঞেস করে, কালী কবে ফিরবে গো কালীর মা? যদুবাবু মস্ত বড়লোক ওখানকার, বংশ একটু নীচু, তার গিন্নী মাসীকে এখন থেকে সাধাসাধি করছে, ছেলে বিলেত থেকে ফিরলে কালীকে আমায় দিও কালীর মা।

তবে তো কালীর বিয়ের জন্য কোন ভাবনাই নেই।

কে ভাবে ওর বিয়ের জন্য?

মনোরমার কাছে এসব শোনে আর কালীকে রাজকুমার একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে। তার মনে হয়, কেবল কথাবার্তা চালচলন শিক্ষা-দীক্ষার দিক হইতে নয়, কালীর গড়নটি পর্যন্ত যেন ঘরোয়া ছাঁচের, বহুকাল আগে মিসেস বেল্‌নসের আঁকা গত শতাব্দীর বাঙ্গালী নারীর ছবির আদর্শে কালীর দেহ গড়িয়া উঠিতেছে।

এরকম মনে হয় কেন? সাজ পোষাকের এমন কোন নূতনত্ব তো কালীর নাই যে জন্য এরকম একটা ধারণা জন্মিতে পারে। সাধারণ বাঙ্গালী সংসারের আর দশটি মেয়ের মতই তার সাধারণ বেশভূষা। অন্য কোন মেয়েকে দেখিয়া তো আজ পর্যন্ত তার মনে হয় নাই, দেয়াল আর ঘোমটার আড়ালে শুধু একজনের দৃষ্টিকে বিহ্বল করার জন্য তার রূপযৌবন, দেহটি শুধু তার সেবা আর গৃহকর্মের উপযোগী?

রিণি, সরসী আর মালতীর সঙ্গে, আত্মীয় এবং বন্ধু পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, কালীকে মিলাইয়া দেখিয়া রাজকুমার রহস্যভেদের চেষ্টা করে। ট্রামে বাসে ঘোমটা টানা ঘোমটা খোলা বৌ আর স্কুল কলেজের মেয়ে উঠিলে তাদের সঙ্গেও মনে মনে কালীকে মিলাইয়া দেখিতে তার ইচ্ছা হয়।

নিজের এক অলস কল্পনার ভিত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়া এমন এক বিস্ময়কর সত্য প্রথম আবিষ্কারের অস্পষ্টতায় আবৃত হইয়া তার মনে উঁকি দিতে থাকে যে রাজকুমার অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তার এই খাপছাড়া গবেষণার যে একটি অতি বিপজ্জনক দিক আছে এটা তার খেয়ালও থাকে না।

যে রাজকুমারের এতকাল দেখা পাওয়াই কঠিন ছিল হঠাৎ তার ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটিতে থাকায় এবং তার শান্ত নির্বিকার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠায় আত্মীয় জন বন্ধুবান্ধবের বাড়ীর মেয়েদের চমক লাগিয়া যায়। রাজকুমারের ব্যগ্র উৎসুক চাহনি সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কেউ দারুণ অস্বস্তি বোধ করে, কেউ মনে রাখিয়া যায়, কেউ অনুভব করে রোমাঞ্চ। প্রত্যেকে তারা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবিতে থাকে, এতকাল পরে আমার মধ্যে হঠাৎ কি দেখল যে এমন করে তাকিয়ে থাকে? কেউ তার সামনে আসাই বন্ধ করিয়া দেয়, কেউ কথা ও ব্যবহারে কঠিনতা আনিয়া দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করে, কেউ আরও কাছে সরিয়া আসিতে চায়।

রিণি, সরসী আর মালতী রাজকুমারের এই অদ্ভুত আচরণ তিন ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে তিনজনেই, অস্বস্তিও বোধ করিয়াছে প্রায় একই রকম, কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টায় তাদের মনে এমন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার উদয় হইয়াছে যে জানিতে পারিলে মানুষের মন সম্বন্ধেও একটা নূতন জ্ঞান খুব সহজেই রাজকুমারের জন্মিয়া যাইত।

রিণি ভাবে: এতদিনে কি বুঝিতে পারা গেল সেদিন গান প্র্যাক্টিস করার

করার সময় সে অমন আগ্রহের সঙ্গে মুখ বাড়াইয়া দিলে রাজকুমার তাকে কেন অপমান করিয়াছিল? রাজকুমারের মন কবিত্বময়, বাস্তব জগতের অনেক উঁচুতে নিজের মানস-কল্পনার জগতে সে বাস করে; বড় ভাবপ্রবণ প্রকৃতি রাজকুমারের। তার মনের ঐশ্বর্য্য রাজকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছে, তার হাসি কথা গান ভাবালোকের অপার্থিব আনন্দ দিয়াছে রাজকুমারকে, তার সান্নিধ্য অনুভব করিয়াই রাজকুমারের মন এমনভাবে অভিভূত হইয়া গিয়াছে যে একটি চুম্বনের প্রয়োজনও সে বোধ করে নাই। সেদিন রাজকুমার তাই চমকাইয়া গিয়াছিল, কি করিবে ভাবিয়া পায় নাই। গান শুনিতে শুনিতে যে মানুষটা স্বপ্ন দেখিতেছিল হঠাৎ সচেতন হওয়ার পর তার খাপছাড়া ব্যবহারে অপমান বোধ করিয়া সেদিন তার রাগ করা উচিত হয় নাই। হয়তো সেদিন রাজকুমারের প্রথম খেয়াল হইয়াছিল, সে শুধু মন আর হাসি গান কথা নয়, একটা শরীরও তার আছে। হঠাৎ যে রাজকুমার এমন অসভ্যের মত খুঁটিয়া খুঁটিয়া তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা হয়তো তার এই নূতন চেতনার প্রতিক্রিয়া। তার অপূর্ব রূপ প্রথম দেখিতে আরম্ভ করিয়া রাজকুমারের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে।

সরসী ভাবে: এতদিন তার শরীরটাই ছিল রাজকুমারের কাছে বড়। তার দিকে তাকাইলে মানুষ সহজে চোখ ফিরাইতে পারে না, তার এই দেহের বিস্ময়কর রূপ মানুষের মধ্যে দুরন্ত কামনা জাগাইয়া দেয়। এতকাল রাজকুমার তার শরীরটা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে, তাই লজ্জা সঙ্কোচে তার দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারে নাই। তারপর রাজকুমার বুঝি তার অন্তরের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের মন-ভুলানো মেয়েলি হাবভাবের সস্তা অভিনয় সে যে কখনো করে না, লজ্জাবতী লতা সাজিয়া থাকে না, নাকি সুরে কথা বলে না, ভাবপ্রবণতা পছন্দ করে না, বাজে খেয়ালে হাল্কা খেলায় সময় নষ্ট করে না, এসব বোধ হয় রাজকুমারের খেয়াল হইয়াছে। খুব সম্ভব সেদিনের সভায় রাজকুমার তার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তার ভিতরের গভীরতার জন্য রাজকুমার তাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। ভালবাসে বলিয়া এখন আর রাজকুমার তার দিকে চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়।

মালতী ভাবে: ছি ছি, রাজকুমার কেমন মানুষ? সে তো স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই রাজকুমারের এমন পরিচয়ও তাকে পাইতে হইবে। সে ভালবাসে

জানা গিয়াছে কিনা তাই রাজকুমার এখন তাকে যাচাই করিতেছে। তাকে নয়, তার দেহকে। কোথায় তার কোন খুঁত আছে রূপের, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাই এখন বাহির করিতেছে রাজকুমার। ভালবাসার দৃষ্টিতে যদি এমন মনোযোগের সঙ্গে রাজকুমার তাকে দেখিত! কিন্তু চোখে তার ভালবাসা নাই। মনে মনে কি যেন সে হিসাব করিতেছে আর যাচাই করার দৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইতেছে!

কালীও অনেক কথা ভাবে। কিছু সে বুঝিতে পারে না, তার ভয় হয়, লজ্জায় সে আড়ষ্ট হইয়া যায়। আপনা হইতে কখনো যে ডাকিত না, হঠাৎ একবার সে কেন অকারণে কাছে ডাকে? সামনে দাঁড় করাইয়া কেন বলে, এদিক মুখ করো, ওদিকে মুখ করো, পিছন ফিরে দাঁড়াও?

মনোরমাও রাজকুমারের ভাবান্তরে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। এমন বোকা সে নয় যে মনে করিবে কালীকে হঠাৎ বেশী পছন্দ হইয়া যাওয়ায় সর্বদা তাকে ডাকিয়া রাজকুমার তার সঙ্গে ভাব করিতে চায়। পছন্দ হইয়া থাকিলে আর ভাব করার ইচ্ছা জাগিয়া থাকিলে এভাবে যখন তখন বিনা কারণে ডাকার বদলে সে বরং বিশেষ দরকার হইলেও কালীকে ডাকিত না। রাজকুমারকে অন্য সকলে যতটা চেনে মনোরমা তার চেয়ে অনেক বেশীই চিনিয়াছে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহারই রাজকুমার করিয়া থাক, যদি ধরিয়াও নেওয়া যায় যে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সে অন্যায় ব্যবহারই করিয়াছিল, গিরির টানেই সে যে সেদিন তাদের বাড়ী গিয়াছিল, মনোরমা তা বিশ্বাস করে না। গিরির জন্য যাইতে ইচ্ছা হইলে সে কখনো সে বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইত না।

মনোরমা ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না, রাজকুমার তার সমস্ত ভাবনা মিটাইয়া দিল। সকাল বেলা রাজকুমার তাকে বলিল, কালীকে রিণিদের বাড়ী একটু নিয়ে যাচ্ছি দিদি।

ওমা, কেন?

শুধু ঘরে বসে থাকবে? দু'চারজনের সঙ্গে একটু ভাবসাব করে আসুক?

মনোরমার মুখ হাসিতে ভরে গেল।

বেশ তো নিয়ে যাও, আমায় আবার জিজ্ঞেস করা কেন?

কালীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য মনের মধ্যে বহিয়া নিয়া গিয়া রিণি, সরসী, মালতী আর অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে রাজকুমারের বড় অসুবিধা হইতেছিল। ওরকম আন্দাজী গবেষণায় এত বড় একটা তথ্য কি যাচাই করা

চলে ? পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কালীর সঙ্গে অন্য মেয়ের দেহের গড়নের তুলনায় না করিলে অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না।

কালীকে সঙ্গে করিয়া সে দু'বেলা বাহির হয়, এক এক জনের বাড়ী গিয়া কালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেয়। সকলে তারা ভাবে এ আবার কি খেয়াল রাজকুমারের ? মনোরমা খুব খুসী হয়। এতদিন তার শুধু আশা ছিল, এবার তার ভরসা জাগে যে আশা হয়তো তার মিটিবে।

ধীরে ধীরে রাজকুমারের কাছে তার অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট অনুমান স্পষ্ট প্রমাণিত সত্য হইয়া উঠিতে থাকে। দ্বিধা সন্দেহ মিলাইয়া যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হইতেছিল, মাথাটা বুঝি তার খারাপ হইয়া গিয়াছে, পাগলের মত সে অনুসরণ করিতেছে নিজের বিকৃত চিন্তার। এই আত্মগ্লানির বদলে এখন সে অনুভব করিতে থাকে আবিষ্কারের গর্ব।

কালীকে দেখিয়া তার মনে হইয়াছিল, তার দেহের গড়ন ঘরোয়া, অন্তঃপুরের একটি বিশেষ আবেষ্টনীতে একটি বিশেষ জীবনের সে উপযোগী! এখন সে জানিতে পারিয়াছে কেবল কালী একা নয়, সকলের দেহের গড়নেই এই সঙ্কেত আছে, দেহ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় সমাজের নানা স্তরে জীবনের বহু বিচিত্র পরিবেশের কোনটিতে সে খাপ খাইবে।

শুধু মন নয়, দেহের গঠন দেখিয়াও বিচার করিতে হয় কোন জীবন কার পক্ষে স্বাভাবিক, কোন জীবনে কার বিকাশ বাধা পাইবে না।

দেহ ? এতকাল রিণি, সরসী আর মালতীর মনের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল, আজ তাদের দেহ কি বিস্ময়কর সংবাদই তাকে জানাইয়াছে! শুধু মনের হিসাব ধরিয়া সংসারে নিজেদের স্থান বাছিয়া নিতে গেলে জীবন ওদের ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অসংখ্য নারী ও পুরুষের যেমন গিয়াছে।

একদিন সরসীকে রাজকুমার বলিল, রিণি আর মালতীকে নেমন্তন্ন কর না ?

কেন ?

এমনি তোমাদের একটা গ্রুপ ফটো নেব।

কবে ?

কাল সকালে।

হঠাৎ আমাদের ফটো নেবার সখ হল কেন ?

সখের কি কেন থাকে সরসী ?

এসব সখের থাকে। আচ্ছা বলব। কিন্তু সকালে কেন, বিকেলে বললে হবে না ?

তাই বোলো। তিনটে চারটের মধ্যে যেন আসে।

রাজকুমার একটু ভাবিল, খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আচ্ছা, জ্যোৎস্না মমতা ওদের বললে হয় না? আর তোমার সেই রুক্মিণীকে?

ওদেরও ফটো নেবে নাকি?

দোষ কি?

সরসী হাসিল, না দোষ কিছু নেই। হঠাৎ এতগুলি মেয়েকে একত্র করে ফটো নিতে চাইলে একটু খাপছাড়া মনে হবে, আর কিছু নয়। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। কিন্তু জ্যোৎস্না, মমতা আর রুক্মিণীকে নয় চিনলাম, 'ওদের' কারা?

লিষ্ট করে দিচ্ছি।

লিষ্ট? প্রকাণ্ড গ্রুপ হবে বলো? এত সব অদ্ভুত সখ চাপে কেন তোমার? দু'দিন যদি কিছু তুমি না কর, তিন দিনের দিন একটা কিছু করে অবাক করে দেবেই দেবে। এমনি চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় বয়স বুঝি সত্তর পেরিয়েছে, হঠাৎ যে তোমার কি হয় বুঝি না।

রাজকুমার সতেরটি মেয়ের নাম লিখিয়া লিষ্ট করে দিলে সরসী ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, এতগুলি মেয়েকে বলতে হবে? কি ধরণের গ্রুপ হবে এটা? বান্ধবী গ্রুপ না শুধু চেনা মেয়ের গ্রুপ? কুমারী গ্রুপ বলা চলবে না, তিনজনের বিয়ে হয়েছে।

কি যেন বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে চিন্তিতভাবে সরসী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, রাজকুমারের চোখে মানে আবিষ্কার করিতে চায়।

ফটোর কথা মিছে। কি যেন মতলব আছে তোমার। আমায় বলো রাজু।

ওদের সকলকে একত্র করে দেখতে চাই।

কেন?

একটা ব্যাপার বুঝতে চাই। তুমি বুঝবে না, সরসী।

বুঝব না? তোমায় আমি সকলের চেয়ে ভাল বুঝি, তা জানো?

রাজকুমার একটু হাসিল। হাসিটা সরসীর পছন্দ হইতেছে না টের পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার গম্ভীর হইয়া গেল।

জানতাম না, কিন্তু মেনে নিচ্ছি। তবে এটা ঠিক আমার বোঝার কথা নয়। এ অন্য ব্যাপার রাজেনবাবুকে ভাল বুঝলেও তার নতুন মেটিরিয়াল স্পিরিচুয়ালিজমের থিয়োরী কি বুঝতে পারবে ভরসা কর?

থিয়োরী না বুঝতে পারি থিয়োরীটা কোন বিষয়ে সেটুকু বুঝতে পারব বৈকি।

তবে শোন। মেয়েদের দেহের গড়নের সঙ্গে মনের গড়নের সম্পর্কটা বুঝবার চেষ্টা করছি।

ও, তাই বলো!

অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে সরসী যেন হঠাৎ আলো দেখিতে পাইয়াছে। চোখে তার উত্তেজনা দেখা দেয়, মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

রাজকুমার বলিতে থাকে, আমার মতে দেহের গড়নের সঙ্গে মেয়েদের মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সরসী। সুস্থ স্বাভাবিক দেহের কথাই বলছি। যে আবেষ্টনীতেই একটি মেয়ে বড় হোক, তার দেহের গড়নের জন্য মনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবেই। তোমার মানসিক ধর্মের কয়েকটা বিশেষ রূপ আছে, তুমি যদি জন্মের পরদিন থেকে অন্য একটি পরিবারে মানুষ হতে তবু এই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকত। যেমন ধরো, তোমার সাহস। তোমার দেহের গড়ন না বদলিয়ে কোন প্রভাব তোমার সাহস নষ্ট করতে পারত না। প্রকাশটা হয়তো অন্য রকমের হত। অন্য বাড়ীতে অন্য অবস্থায় মানুষ হলে তুমি হয়তো পথকে ভয় করতে, পুরুষকে ভয় করতে, বেলগাছকে ভয় করতে, মার খেয়ে কাঁদতে ভয় করতে, তবু কতগুলি দিকে সাহস তোমার থাকতই। অসুখ বিসুখ বিপদ আপদে বাড়ীর মধ্যে হয়তো একা তোমার মাথা ঠিক থাকতো, হাতে শুধু শাঁখা পরে তুমিই হয়তো হাসিমুখে বড়বাবুর দশহাজার টাকার গয়না পরা বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে, তুমিই হয়তো—

বুঝেছি, বুঝেছি। আর শুনতে চাই না রাজু, থামো। তুমি সত্যি বাঁচালে আমায়। তোমার থিয়োরী না পাগলামি সে তুমিই জানো, ক'দিন থেকে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি এটুকু যে বুঝতে পারছি তাই আমার ঢের! এইজন্য তুমি অমন করে তাকাচ্ছিলে আমাদের দিকে, ট্রামে বাসে আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা ছোঁড়াগুলোও যেমনভাবে তাকাতে পারে না? কি আশ্চর্য মানুষ তুমি রাজু!

রাজকুমারকে সরসী চা করিয়া দিল, তিনরকম খাবার দিল। কথা বলিতে লাগিল অনর্গল। তার হাসি কথা চলাফেরা সব যেন হঠাৎ হাল্কা হইয়া গিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে সরসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তোমার ও থিয়োরী কি শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে খাটে? ছেলেদের বেলা খাটে না? শুধু মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা করার তোমার অত আগ্রহ কেন শুনি।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া রাজকুমার বলিল, ছেলেদের বেলাও খাটে। নিয়ম একই। তবে পুরুষের দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অতটা ঘনিষ্ঠ নয়। দেহের গড়ন অনুসারে মনের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেটা একেবারে চাপা পড়ে যেতে পারে,

থেকেও না থাকার সামিল হয়ে যায়। মেয়েদের ব্যাপার অন্তরকম।

তারা দেহসর্বস্ব বলে ?

না, তাদের দেহ অন্তরকম বলে। দেহের অনুভূতি অন্য রকম বলে। দেহের উপযোগিতা অন্যরকম বলে। আরও অনেক কিছু আছে।

বিদায় দেওয়ার সময় সরসী বলিল, কাল তোমার লিষ্টের সকলকে আসতে বলব, তুমি কিন্তু ওদের জানিও না সখটা তোমার। গ্রুপ ফটো তোলার সখ আমার, তোমায় দিয়ে আমি ফটো তোলাচ্ছি। বুঝতে পারছ ?

পরদিন কালীকে সঙ্গে করিয়া রাজকুমার সরসীর বাড়ী গেল! তিনটি মেয়ে আসিতে পারে নাই। তবু চোদ্দটি মেয়ে আসিয়াছে। কালী আর সরসীকে ধরিলে ষোল জন। এতগুলি মেয়েকে একসঙ্গে পরীক্ষা করার স্থযোগ পাইয়াও রাজকুমার খুসী হইতে পারিল না। এতগুলি দেহ আর মনের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া দেখা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। শুধু কথা বলিয়াই সময় কাটিয়া গেল।

জীবনে রাজকুমারের অনেকবার অনেমরকম ঝোঁক আসিয়াছে। এটা অবশ্য রাজকুমারের একচেটিয়া নয়, নেহাৎ গোবেচারী শ্লথ মানুষেরও ঝোঁক আসে। কোন কোন মানুষ ঝোঁকের মাথায় কখনো কোন কাজ করে না, ভাল কাজও নয়। তুঃখ আর অশান্তি দূর করিয়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে স্থখী করার ঝোঁকও যদি এ সমস্ত মানুষের চাপে, যতক্ষণ ঝোঁক থাকিবে কিছুই তারা করিবে না। ঝিমাইয়া পড়া পর্যন্ত মনে মনে শুধু বিবেচনা করিয়া চলিবে কাজটা উচিত কি না আর লাভ লোকসানের খতিয়ানটা কি এবং নিজের সংযমের বাহুল্যে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবে। সংযম যেন নিছক ধীরতা ও শৈথিল্য।

হঠাৎ-জাগা সমস্ত ইচ্ছাকে রাজকুমার অবশ্য আমল দেয় না, পাগল ছাড়া সেটা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়। তবে ঝোঁকের মাথায় কাজ করার স্বভাব তার আছে। অনেক পুরস্কার ও শাস্তি, আনন্দ ও বিষণ্ণতা এমনিভাবে সে অর্জ্জন করিয়াছে।

এবার যে স্বষ্টিছাড়া খেয়ালটি তাকে আশ্রয় করিল, আবির্ভাবটা তার আকস্মিক নয়। তবু এ খেয়ালটি ঝোঁকের মতই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথমে মনের কোণে কথাটা একবার শুধু উঁকি দিয়া গেল, ভাঙ্গা মেঘের মত মনের আকাশের এক টুকরা অসঙ্গত আলগা চিন্তা। নিজের কাছেই যেন রাজকুমার লজ্জা বোধ করিল। এসব চিন্তা কোথা হইতে ভাসিয়া আসে, আবার কোথায়

চলিয়া যায়। এ চিন্তাটিরও ধীরে ধীরে মনের দিগন্তে মিলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল, তার বদলে দিন দিন যেন স্পষ্টতর ও অবাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

শীতের আমেজে দেহের সঙ্কোচন প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়, কালীর হাতে সেলাই করা পাড়ের কাঁথা গায়ে টানিয়া শেষ রাত্রে বড়ই আরাম বোধ হয়। আধ ঘুম আধ জাগরণের সেই যুক্তিহীন নীতিহীন নিষ্পাপ জগতের অবাস্তব অবলম্বনে একটি অপরূপ নিরাবরণ দেহ আলগোছে ভাসিতে থাকে। বেশী দূরে নয়, হাত বাড়ালেই বোধ হয় স্পর্শ করা যায়, তবু অস্পষ্ট। কোন জীবনের উপযোগী এ দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন পরিচয় আঁকা আছে এই দেহের বাহিরে, কিছুই টের পাওয়া যায় না। ঘুম ভাঙ্গিবার পর ছায়া মিলাইয়া যায়, ওই রকম কয়েকটি দেহ পরীক্ষা করিবার ঔৎসুক্য শুধু জাগিয়া থাকে রাজকুমারের।

মোটা মোটা ডাক্তারি বই আর নোটবুকগুলির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এই কথাটা সে মনে মনে নাড়াচাড়া করে। পরীক্ষার জন্য দেহ ভাড়া করা যায়, কিন্তু সে সব নরনারীর দেহ পরীক্ষা করিয়া তার বিশেষ কোন লাভ হইবে না। যাদের সে জানে, যাদের সুখ-দুঃখ-আশা আকাঙ্ক্ষার সংবাদের সঙ্গে জীবন যাপনের রীতিনীতির পরিচয় সে রাখে, নিরাবরণ তাদের কয়েক জনকে সে যদি দেখিতে পাইত!

কিন্তু এদের কারো কাছে ইচ্ছাটা জানানো পর্যন্ত চলে না।

শোনামাত্র যুগ-যুগান্তরের সংস্কারে ঘা লাগিবে, তাকে মনে করিবে পাগল, অসভ্য, বর্বর। বুঝাইয়া বলিলে যে কেউ বুঝিবে সে ভরসাও রাজকুমারের নাই।

সে যে শুধু একটা সত্যের, একটা নিয়মের সন্ধান চায়, কেউ তা বিশ্বাস করিবে না। যতই ভীরু আর লাজুক মনে হোক, উদ্ধত অত্যাচারী সৈনিক বা যন্ত্রীর জীবন ছাড়া শ্যামলের সুখী হওয়ার উপায় কেন নাই, কঙ্কির মত যতই অবাধ্য ও স্বাধীন মনে হোক রিণিকে, শাসন-পিপাসু শক্তিমান পুরুষের উপর কলা-বৌ-এর মত নির্ভর করিতে না পারিলে রিণির জীবনে সার্থকতা কেন নাই; দেশে দেশে নগরে নগরে যাযাবর জীবন কেন স্যর কে, এল-এর প্রয়োজন ছিল; ইতিমধ্যেই চার পাঁচটি সন্তানের মা হইতে না পারায় সরসী কেন সভাসমিতি করিয়া বেড়ায়; এসব প্রশ্নের জবাব জানিবার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না, কৌতূহলও কারো নাই। এগুলি প্রশ্ন বলিয়াই তারা স্বীকার করিতে চায় কিনা সন্দেহ। মানুষের দেহে এই সব রহস্যের নির্দেশ সন্ধান করা ওদের কাছে অর্থহীন উদ্ভট ব্যাপার, ছি ছি করার ব্যাপার।

কিন্তু যেটুকু সে জানিয়াছে কেবল সেইটুকু জানিয়া থামিয়া থাকার কথা ভাবিলেও এদিকে জীবনটাই যেন অসঙ্গত মনে হয়। ঝোঁকের এই অভিশাপ চিরকালের—যখন যেদিকে গতি, সেদিক ছাড়া অন্য কোনদিকে জগতের সার্থক অস্তিত্ব আছে ভাবা যায় না।

একদিন আলোচনা ও পরামর্শের জন্য রাজকুমার বিকালবেলা হাজির হয় বন্ধু পরেশের কাছে।

পরেশ বলে, এ্যানাটমি শিখতে চাও? সেটা তো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ওর আর কি, পয়সা দিয়ে মড়া কিনবে, ছুরি দিয়ে কাটবে—

মড়া! জীবনের সঙ্গে সে খুঁজিতেছে জীবন্ত মানুষের সংযোগ ও সামঞ্জস্যের রীতি, মড়া কাটিয়া তার হইবে কি?

উৎসাহের সঙ্গে রাজকুমার পরেশকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে আরম্ভ করে।

পরেশ ডাক্তার মানুষ, রাজকুমারের কথা শুনিতে শুনিতে সে হাসিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

হাত দেখার ব্যাপারটা জানি, শরীর দেখাটা নতুন ঠেকছে।

তুমি হাত দেখায় বিশ্বাস কর না?

না। ওসব বুজরুকি।

তুমি যা জান না তাই যদি বুজরুকি হয়—

আমি জানি না বলে নয়। একটা কিছু সম্ভবপর কি না সাধারণ বুদ্ধিতেই মোটামুটি বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ কখনো মানুষের হাতে লেখা থাকতে পারে! হাত দেখে কখনো বলা যেতে পারে একদিন মানুষের জীবনে কি ঘটবে না ঘটবে?

নগেনবাবু যে এক বছরের মধ্যে অন্ধ হয়ে যাবেন, তুমি কি করে জানলে?

সেটা ভিন্ন কথা। নগেনবাবুর চোখে অসুখ হয়েছে, চোখের এই অসুখে বছরখানেকের মধ্যে মানুষ অন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েকটা চেনা লক্ষণ দেখে তুমি জানতে পেরেছ, নগেনবাবুর চোখে অসুখ হয়েছে, কেমন? আগে আরও অনেকের চোখে এই রকম অসুখ হয়েছে, অল্পদিনের মধ্যে তারা অন্ধ হয়ে গেছে, তুমি তাই বলতে পারছ নগেনবাবুও অন্ধ হয়ে যাবেন। মানুষের হাতেও তো চেনা লক্ষণ থাকতে পারে, যা দেখে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে? যেমন ধরো—পরেশের হাত টানিয়া আঙুলগুলির ঠিক

নীচে হাতের তালুতে চারটি চিহ্ন দেখাইয়া দেয়, এগুলো দেখে আমি বুঝতে পারছি ডাক্তারিতে তোমার কোনদিন পশার হবে না।

হাত দেখার বুজরুকির পরেশের হঠাৎ গভীর কৌতুহল দেখা যায়। আগ্রহের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করে, কি করে জানলে ?

আরও অনেকের হাতে এরকম চিহ্ন ছিল, দেখা গেছে তারা খুব ঢিলে অলস প্রকৃতির মানুষ। কোন বিষয়ে চেষ্টাও থাকে না, পরিশ্রমও করতে পারে না। বছর পাঁচেকের মধ্যে তোমার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

পাঁচ বছর পরে সম্ভব ?

তা বলা যায় না। তবে উন্নতি না হওয়ার লিমিট যে পাঁচবছর সেটা জোর করে বলতে পারি। বাপের পয়সাতেই এ'কটা বছর তোমায় চালাতে হবে। অবস্থার ফেরে যদি স্বভাব বদলায়, হাতের এই চিহ্নগুলিও বদলে যাবে, তখন হয়তো তোমার কিছু হতে পারে। বছর পাঁচেক সময় তাতে লাগবেই।

পরেশ মনে মনে চটিয়াছিল, ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, তুমি এত বড় গণৎকার হয়ে উঠেছ তাতো জানতাম না। ডাক্তারি করার আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তো ভুল করেছি !

শুধু ডাক্তারি তো নয়, তা বলিনি আমি। ডাক্তারিতে পশার হবে না, একথা তোমার হাতে লেখা নেই। থাকলেও সে লেখা পড়ার পড়বার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার হাতে লক্ষণ আছে উন্নতি করবার অক্ষমতার। নিজে উপার্জন করে বড়লোক হওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই বলে তোমার যে টাকা হবে না তাও বলা চলে না। অন্য কেউ তোমার টাকা খাটিয়ে তোমাকে আরও বড়লোক করে দিতে পারে, কোন আত্মীয় মারা গিয়ে সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারে, লটারীর টিকিট কিনে টাকা পেতে পার। তোমার হাত দেখে যদি বলি টাকা তোমার হবে না, শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর, সেটা হবে বুজরুকি। কিন্তু যদি বলি নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমে টাকা তোমার হবে না, সেটা হবে বিজ্ঞান। হাত দেখারও খানিকটা বিজ্ঞান, বাকীটা বুজরুকি। আর এই বুজরুকির জন্যই খাঁটি জিনিষটুকুর ওপর লোকের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। বেশী ফাঁকির সুযোগ থাকলে বিজ্ঞান ভেস্তে যায়। ফুটপাতের তিলক আঁটা উড়ে গণৎকারের মত ডাক্তার গজাতে পায় না বলে তোমাদের লোকে বিশ্বাস করে, নিমুনিয়া হলে তোমরা অনেকে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা কর, তবু।

তাই নাকি ?

তাই। বিজ্ঞানের এত উন্নতি কেন সম্ভব হয়েছে জান? জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কথাও কেউ বিশ্বাস করতে পারে না, এই নিয়ম মেনে চলা হয়েছে বলে। সামান্য একটি আবিষ্কার পর্যন্ত তাকে প্রমাণ করতে হবে,—আগে শ' খানেক আবিষ্কারের মানুষকে চমকে দিয়েছে বলেই যে তার একশ' এক নম্বর আবিষ্কারটি মেনে নেওয়া হবে, তা চলবে না। অনুমান করার অধিকার আছে কিন্তু সেটা অনুমান বলেই ঘোষণা করতে হবে। 'আমি বলছি' বলে কোন কথা বিজ্ঞানে নেই।

সত্যি, ভারি আশ্চর্য্য তো!

রাজকুমার মনে মনে হাসে। ঠিক এই প্রতিক্রিয়াই পরেশের কাছে প্রত্যাশা করা চলে। অকর্মণ্য অলস মানুষের স্থিতিশীল অকর্মণ্যতার এও একটা প্রমাণ। যা ভাবে না, যা জানে না, অন্যের কাছে তার ব্যাখ্যা শুনিতে এরা জ্বালা বোধ করে। মনে করে তারই যেন সমালোচনা করিতেছে, উপদেশ দিয়া প্রমাণ করিতেছে, তারই মূর্খতা।

আশ্চর্য্য বৈকি, গাম্ভীর্যের ভাণ বজায় রাখিয়াই রাজকুমার বলিয়া যায়, আমি যে দেহ দেখে মানুষকে জানার কথা বলছিলাম তাও কতকটা হাত দেখার মত। মানুষকে দেখে অনেক সময় তার স্বভাব-চরিত্র টের পাওয়া যায় মানো তো?

কে জানে, জানি না।

যেমন ধরো সুরেশ। দেখলেই টের পাওয়া যায় ছেলেটা বিগড়ে গেছে। অনায়াসে বলা যায় ছেলেটা লেখাপড়াও শিখবে না, মানুষও হবে না। যেখানে ওকে তুমি রাখো, যে কাজেই লাগিয়ে দাও, ও কখনো ভালভাবে চলতে পারবে না।

সুরেশ পরেশের ছোট ভাই—কদিন আগে অতি কুৎসিত একটা অপরাধে ছ'মাসের জন্য জেলে গিয়াছে। সুরেশের পাংশু শীর্ণ মুখে সদা চঞ্চল কুটিল দুটি চোখ দেখিলে অপরিচিত মানুষও সত্যসত্যই টের পাইয়া যাইত তার ভিতরটা কি রকম বিকারে ভরা।

পরেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

একটা রোগী দেখতে যাব!

বলিয়া সে চলিয়া যায় বাড়ীর ভিতর।

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে রাজকুমারের মনে

হয় পরেশকে না চটাইলেই হইত। এরকম সস্তা অভিমান দেখিলেই কেন যে তার আঘাত দিতে ইচ্ছা হয়! ছেলেবেলা ফাঁপানো খেলনা বেলুন দেখিলেই যেমন ফুটা না করিয়া থাকিতে পারিত না, এখন ফাঁকা মানুষের সংস্পর্শে আসিলেই ফাঁকিতে খোঁচা দেওয়ার সাধটা তেমনি সে দমন করিতে পারে না। মানুষের সঙ্গে এই জন্য তার বনে না। আবেগ আর অভিমানে সায় দেওয়ার তোষামোদ জানে না বলিয়া আত্মীয় বন্ধু অনেকের কাছেই সে পছন্দসই লোক নয়। দশজনের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলার প্রধান মন্ত্রটিই সে বাতিল করিয়া রাখে।

ভাবিতে ভাবিতে গভীর একাকীত্বের অনুভূতি তাকে বিষণ্ণ করিয়া দেয়। মানুষের সঙ্গে লাভের এমন একটা জোরালো কামনা সে অনুভব করে যেন বহুদিন অরণ্যে বা প্রান্তরে বাস করিতেছে। ক্লাবের কথা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি সে সেখানে গিয়া হাজির হয়। টেনিস খেলার সখ জাগায় একদিন সে ক্লাবে যোগ দিয়াছিল, তারপর নিয়মিত চাঁদা দিয়া আসিতেছে কিন্তু ক্লাবে যাতায়াত করে কদাচিৎ। এই ব্যাপারটাও আজ যেন তার খেয়াল হইল প্রথম। ক্লাবের সে মেম্বার, ক্লাবে সুযোগ আছে খেলা-ধূলা ও দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করার, কিন্তু ক্লাবের জন্য কোন আকর্ষণ সে অনুভব করে না। মানুষের সঙ্গ সে কি ভালবাসে না? মানুষটা সে কি কুনো? অথবা দশজনের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে না বলিয়া দশজনকে এড়াইয়া চলে?

স্যার কে, এল প্রায়ই ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলিতে আসেন। তিনজন অর্ধ-পরিচিতের সঙ্গে ব্রিজ খেলিতে বসিয়া রাত ন'টার সময় বিরক্তিতে রাজকুমারের চোখে যখন প্রায় জল আসিয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছে, স্যার কে, এল ই তাকে উদ্ধার করিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ তুমি আজ এদিকে? রাজকুমার বলিল, আড্ডা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আড্ডা আমার একেবারে সয় না।

আমারও সয় না। তবু আড্ডা দিই।

পথে স্যার কে, এল-এর এক বন্ধুর বাড়ী হইতে রিণিকে তুলিয়া নেওয়ার কথা ছিল। রিণি এখানে প্রায়ই রাত্রে টেনিস খেলিতে আসে। বিকালে সে খেলে না। খেলার পর যে শ্রান্তি বোধ হয় তাতে নাকি বিকালটা তার মাটি হইয়া যায়। রিণির দেখাদেখি আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নাকি বিকালের বদলে রাত্রে টেনিস খেলার সুবিধা বুঝিতে পারিয়াছে।

তখনও খেলা চলিতেছে। সর্ট আর সার্ট পরা রিণিকে যে সে দেখিতে পাইবে রাজকুমার তা কল্পনাও করে নাই। জোরালো কৃত্রিম আলোয় রিণির দ্রুত সঞ্চরণশীল হাল্কা শরীরটি তার চোখে যেন নতুন একটা বিস্ময়ের মত ঠেকিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ দলের মেয়েটি শাড়ী পরিয়াই খেলিতে নামিয়াছে, মাঝে মাঝে রিণির দিকে চাহিয়া তার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিতেছে মৃদু হাসি।

খেলা দেখার জন্য দাঁড়াইয়া রাজকুমার শেষ পর্যন্ত দেখিয়া গেল শুধু রিণিকে।

খেলার শেষে রিণি বলিল, আরেকটু শীত না পড়লে খেলে আরাম নেই। যত শীত পড়ে তত তাড়াতাড়ি ঘাম শুকিয়ে যায়।

রাজকুমার বলিল, খেললে ঘাম হয় না।

ফ্যাট হয়। আর রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। বাড়ী গিয়ে স্নান করলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবে।

শরীর সম্বন্ধে রিণির যে এতখানি যত্ন আছে রাজকুমারের জানা ছিল না। স্যার কে, এল-এর জন্য আজ গাড়ীতে রিণির পাশে বসিতে না পারায় তার কেমন যেন ক্ষতি বোধ হইতে থাকে। রিণির গলা পর্যন্ত এখন ঢাকা, মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতে গিয়া সে আবরণ সে যেন দেখিতে পায় না, টেনিস কোর্টের রিণিই যেন এত কাছে পিছনের সিটে বসিয়াছে মনে হয়। এই দেহাশ্রয়ী জীবটি আহ্লাদী মেয়ের মত আদরের তাপে গলিতে চায়, শাস্ত সুরক্ষিত সংস্কারময় অন্তঃপুরে স্বামী নামে প্রভুর তত্ত্বাবধানে বাস করিবার শুধু সে উপযোগী—এই সিদ্ধান্ত কি সে করিয়াছে এই রিণির সম্বন্ধে?

রাজকুমারের যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

রিণির সাহস আছে, একগুঁয়েমি আছে, তেজ আছে। এইগুলি সে অর্জন করিয়াছে তার আত্মবিরোধী জীবন যাপনের প্রক্রিয়ায়। রিণিকে সে যদি তার নূতন চিন্তাধারার সন্ধান দেয়? রিণির কাছে সে যদি তার অসঙ্গত দাবী জানায়?

স্যার কে, এল-এর একটা কথাও রাজকুমারের কানে যায় না, নিজে সে কি বলিতেছে আর রিণি কি জবাব দিতেছে তাও ভাল খেয়াল থাকে না।

কথা বন্ধ করিয়া হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া যায়।

শাস্ত মনে কথাটা বিবেচনা করা দরকার। রিণিকে কিছু বলা না বলার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে, ঝোঁকের মাথায় কিছু করিয়া বসিলে চলিবে না। রিণি রাগ করিতে পারে, চিরদিনের জন্য তার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলিয়া দিতে পারে, মনে মনে তাকে ঘৃণা করিতে পারে, দুঃখ পাইতে পারে, হাসিয়া উড়াইয়া দিতে

পারে। অনেক রকম সম্ভাবনাই আছে। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার।

কিন্তু অনুরোধটা জানাইলে রিণির কাছে কি রকম প্রতিক্রিয়া আশা করা উচিত সে বিষয়ে তাকে ভাবিতে হইতেছে কেন? ঠিক কি রকম প্রতিক্রিয়া হইবে এতদিন রিণিকে জানিয়া এটুকুও সে কি অনুমান করিতে পারে না?

রিণি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল, রাজকুমার তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে রিণি। খুব দরকারী কথা।

রিণি আশ্চর্য হয় না। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ খাপছাড়া উত্তেজনার সঙ্গে খুব দরকারী একটা কথা বলিতে চাওয়া, রিণি তার মানে জানে। ঠিক এমনিভাবে ওরা চিরদিন কথাটা জানায়। বলার সুযোগ যখন থাকে তখন কিছু বলে না, আজকালের মধ্যে আবার সুযোগ আসিবে জানিয়াও অপেক্ষা করিতে পারে না; অসময়ে ব্যস্ত হইয়া উঠে।

কি কথা?

ঘরে চলো, বলছি।

দু'চার মিনিটে বলা হবে না বোধ হয়?

না। একটু সময় লাগবে। অনেক কথা বুঝিয়ে বলতে হবে তোমাকে।

আমারও বুঝতে সময় লাগবে নিশ্চয়। মালতীর মত বুদ্ধি তো নেই।

রিণির এই ঈর্ষার খোঁচাটা রাজকুমারকে তিরস্কারের মত আঘাত করিল। মালতীর কথা তার মনেই ছিল না। নূতন চিন্তাটাই কিছুদিন হইতে তার মন জুড়িয়া আছে। মালতী নামে যে একটি মেয়ে আছে জগতে, গত বর্ষার এক সন্ধ্যায় ওই মেয়েটিকে যে জগতের অন্য সব মেয়ের চেয়ে সে কাছে আসিতে দিয়াছে, এসব সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল।

মালতীকে সে আর পড়ায় না। এবার মালতীর পরীক্ষা, ভালভাবে পাশ করার আগ্রহ তার চিরদিন খুব প্রবল। রাজকুমারের কাছে পড়িলে তার আর পাশ করার ভরসা নাই। রাজকুমার তাই নিজেই পড়ানো বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মালতীও আপত্তি করে নাই। তার আসা-যাওয়া যে একেবারে কমিয়া গিয়াছে, বাদ পড়িয়াছে অতি প্রয়োজনীয় অনাবশ্যক কথা বলা, সেজন্যও মালতীর কাছ হইতে কোন নালিশ আসে নাই। হয়তো মালতী ভাবিয়াছে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটানোর ভয়ে সে যায় না, পরীক্ষার আগে আবেগ ও উত্তেজনায় তাকে একটি দিনের জন্যও অশান্ত করিতে চায় না। ভাবিয়া মালতী হয়তো কৃতজ্ঞতাই বোধ করিতেছে।

তার ব্যবহারে মালতী দুঃখ পায় নাই—এই যুক্তি কিন্তু রাজকুমারের নিজের মানসিক শান্তি বজায় রাখিতে কাজে লাগে না। শ্যামলের কথাটা তার মনে পড়িয়া যায়। শ্যামল বলিয়াছিল, মালতীকে ভালবাসিবার উপযুক্ত সে নয়। অসঙ্গত বলিয়া জানিলেও কথাটা এখন তাকে পীড়ন করিতে থাকে। রিণির কাছে যে প্রস্তাব করিতে সে চাহিতেছে, জানিতে পারিলে মালতী ব্যথা পাইবে। সে ব্যথার স্বাদ কত কটু, কত তীব্র তার জ্বালা, রাজকুমার অনুমান করিতে পারে। মালতী তার উদ্দেশ্য বুঝিবে না। রিণির রূপ যে সে দেখিতে চায় না, রিণিকে অনুরোধটা জানানোর আগে তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া আর গলা শুকাইয়া যাওয়ার কারণ যে মনের কোন দুর্বলতা নয়, মালতী তা ধারণাও করিতে পারিবে না, বিশ্বাসও করিবে না! মালতীর কাছে সে উদারতা প্রত্যাশাও করা চলে না। আহত-বিস্ময়ে কত কি যে মালতী ভাবিবে! ক্ষোভ, দুঃখ, ঈর্ষা ও ক্রোধে আরও কত আঘাত যে নিজের জন্য নিজেই সে চয়ন করিবে!

তবে, হয়তো মালতী জানিবে না। না জানার সম্ভাবনাই বেশী। রিণি যদি রাগ করে, চিরদিনের জন্য যদি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দেয়, কারো কাছে সে কোনদিন বলিতে পারিবে না, ছদ্মবেশী এক বুনো জানোয়ারের কোন্ দাবী একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল।

মালতী জানিবে না। তবু রাজকুমার অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। স্তরে স্তরে সঞ্চিত সংস্কারের অবাধ্য প্রতিবাদ একটানা চাপের মত মনে অশান্তি জাগাইয়া রাখে। মালতীর না জানা তো বড় কথা নয়! মালতীর জানার ফলাফলটা সে যতখানি কল্পনা করিতে পারে তারই গুরুত্ব যেন সকলের আগে বিবেচ্য। জানুক, বা না জানুক, আঘাত পাক বা না পাক, যে কাজ করিলে একটি মেয়ের সুখ-শান্তি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে কাজ করা তার উচিত নয়। মনে তার পাপ নাই?—না থাক। পুণ্যের জন্যও অনেক কাজ সংসারে করা যায় না।

রিণির সঙ্গে গুরুতর বুঝাপড়ার লড়াই সুরু করিবার ঠিক আগে এসব চিন্তা রাজকুমারকে একটু কাবু করিয়াছিল বৈ কি। কালও যা করা চলিবে আজ তা না করিয়া পালানোর কথাটাও একবার তবু মনে আসিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার জন্য আরেকটু সময় নিলে কি আসিয়া যায়? হঠাৎ যেন একটু ভয় করিতে লাগিল রাজকুমারের। ভাবনা তার ছিল অনেক, এতক্ষণ ভয় এতটু ছিলনা।

সময় যদি লাগে, তাহলে তুমি বোসো। খেয়ে এসে তোমার দরকারী কথা শুনব।

না, আগেই শুনে যাও।

বেশীক্ষণ লাগবে না নাইতে। মিনিট কুড়ি। কথাটা ততক্ষণ মনে মনে গুছিয়ে নাও বরং, বলতে সুবিধে হবে।

রিণি একটু হাসিল। এমন মধুর হাসি রাজকুমার কোনদিন তার মুখে ছাখে নাই। রিণি যেন হঠাৎ আজ কেমন হইয়া গিয়াছে।

তবে আজ থাক, রিণি।

থাকবে কেন? তোমার আজ কি হয়েছে বলতো? খেলে এসে না নাওয়া পর্যন্ত আমার কি বিশ্রী লাগে তুমি বুঝবে না। বলতে চাও বলো; শুনতে কিন্তু আমার ভাল লাগবে না বলে রাখছি।

কথাটা শোন আগে, বুঝতে পারবে নাইতে যাওয়ার আগে কেন বলতে চাই। আমি বাথরুমে থাকব, রিণি।

বাথরুমে থাকবে?

তোমার নাওয়া দেখব। তুমি নাইবে, আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকব চুপ করে।

রিণি কথা বলিতে পারে না। জোরে তার দাঁতে দাঁত আটকাইয়া গিয়াছে, মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। রাজকুমার সোজা তার চোখের দিকে তাকায় দ্বিধা সঙ্কোচ ভয় সব তার এতক্ষণে কাটিয়া গিয়াছে।

কথাটা তোমার খুব অন্যায় মনে হচ্ছে? এখানে বোসো, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলছি।

বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। কোথায় গিয়েছিলে বাবার সঙ্গে? কটা পেগ গিলেছ?

পেগ? ওসব আমার নেই তুমি জান না?

এতদিন তাই তো জানতাম।

আজ আমার কথা শুনে ধারণাটা বদলে গেছে, না? আমার সব কথা কিন্তু শোনোনি রিণি।

হাত ধরিয়া রিণিকে একরকম সে জোর করিয়া একটা সোফায় বসাইয়া দিল। বড় রাগ হইতেছিল রাজকুমারের। এত কথা ভাবিবার থাকিতে রিণি কিনা ভাবিয়া বসিল মদ গিলিয়া সে তার সঙ্গে ফাজলামি করিতে আসিয়াছে!

আগ্রহের সঙ্গে সে রিণিকে সব বুঝাইয়া দিতে থাকে। বিশেষ করিয়া জোর দেয় তার নিষ্পাপ নির্ব্বিকার মনোভাবের উপর, তার উদ্দেশ্যের আসল

মানের উপর। কি আবেগের সঙ্গেই সে যে বার বার ঘোষণা করে, বাথরুমে রিণিকে দেখিতে যাওয়ার মত অভদ্র ছোটলোক সে নয়, ওরকম ইচ্ছা জাগার মত হীন নয় তার মন।

ব্যাখ্যা করিতে রাজকুমার চিরদিনই ওস্তাদ। বুঝিতে রিণির আর কিছুই বাকী থাকে না। মুখের ভাবে তার পরিবর্তন কিন্তু হয় আশ্চর্য রকম, রাজকুমারের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মনে হয়, রাজকুমারের প্রস্তাব শুনিয়া তার যেন শুধু চমক লাগিয়াছিল, রাজকুমার মদ খাইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া তার যেন দুঃখ হইয়াছিল। এতক্ষণে তার রাগ হইয়াছে, ব্যাখ্যা শুনিবার পর, সব বুঝিবার পর।

বুঝতে পেরেছ রিণি ?

পেরেছি বৈ কি।

গলার আওয়াজেই রাজকুমার সচেতন হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ স্বরকে চাপিয়া এভাবে দাঁতে কাটিয়া রিণিকে সে আর একদিন কথা বলিতে শুনিয়াছিল। গানের আবেশে বিহ্বলা রিণির বাড়ানো মুখের আমন্ত্রণ যেদিন সে গ্রহণ করে নাই। সেদিনও রিণির নাক এমনি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল রাগের মাথায় হঠাৎ বুঝি কামড়াইয়া দিবে—দুরন্ত ছোট মেয়েরা যেমন দেয়।

ম্লান মুখে রাজকুমার একটু হাসিল।

জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, তুমি রাজী নও বুঝতে পারছি।

বুঝবে বৈ কি। তুমি তো বোকা নও।

কিছু মনে কোরো না রিণি।

না। মনে আবার কি করব।

আমি তবে যাই।

যাও। আর এসো না।

আচ্ছা।

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কথাটা তুমি আর একটু উদারভাবে নেবে ভেবেছিলাম, রিণি।

রিণিও উঠিয়া দাঁড়াইল।

তোমায় বোকা ভাবতে পারলে তাই নিতাম। তুমি তো বোকা নও।

রাজকুমার চলিয়া যায়, রিণি পিছন হইতে তাকে ডাকিল।

একটা উপদেশ নিয়ে যাও। আরেকটি মেয়েকে যখন কথাটা বলবে, মালতিকেই বলবে বোধ হয়, কিছু বুঝিয়ে বলতে যেও না। শুধু বোলো যে তোমার এ সাধটা

না মেটালে তুমি পাগল হয়ে যাবে, সায়ানাইড খাবে। হয়তো রাজী হতে পারে।

রিণি কিছুই অস্পষ্ট রাখে নাই। কয়েকটি কথাতেই সব পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছে। যতই অসঙ্গত হোক, শুধু তার ইচ্ছার কথা হইলে নিজের নিরাবরণ দেহটি তাকে দেখাইতে রিণি রাজী হইলেও হইতে পারিত। সত্যসত্যই রাজী সে হয়তো হইত না, কিন্তু একটু দোমনা তো অন্ততঃ হইত। একবারের জন্যও মণে তো হইত কি আসিয়া যায় মানুষটার ব্যাকুল প্রার্থনা মিটাইলে? বিমুখ করিয়া একটু আপসোসও হয়তো জাগিত। নিজের জন্য আবেদন জানানো ছাড়া রিণির মন একটু নরম করারও আর কোন উপায় নাই। কেবল রিণির নয়, সব মেয়ের সম্বন্ধেই এই এক কথা। রিণি তাই বলিয়াছে।

রাজকুমার কি কথাটা জানে না? যুক্তির দাম মেয়েদের কাছে নাই, একটুখানি আবেগের বন্যায় বিশ্বের সমস্ত যুক্তি তর্ক উচিত অনুচিত ভাল মন্দ ভাসিয়া যাইতে পারে, এটুকু জ্ঞান কি সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই এত দিনে? রাজকুমার লজ্জা বোধ করে। রিণি তাকে বোকা মনে করিতে অস্বীকার করিয়াছে, বোকামি কিন্তু সে করিয়াছে সত্যই। সায়ানাইড খাওয়ার কথা বলিলে রিণি গর্ব বোধ করিবে আর নিছক একটা থিওরি যাচাই করিতে তার সাহায্য চাহিলে সে বোধ করিবে অপমান, এটুকু তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল।

তাছাড়া, রিণি প্রত্যাশা করিয়াছিল অন্য কথা। রাজকুমার বিশ্বাস করে না রিণি তাকে ভালবাসে। তাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভাল না বাসিলেও ভালবাসার ঘোষণা শুনিতে কে না ভালবাসে? এদিকটাও তার খেয়াল করা উচিত ছিল।

নিজের চারকোণা ঘরে চারকোণা খাটে রাজকুমার চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে আর উত্তেজিত চিন্তায় ছুটাছুটি করে তার মনে। সিলিং-এর হাত তিনেক নীচে একটা মাকড়শা শূন্যে ঝুলিয়া আছে, সূক্ষ্ম অবলম্বনটি চোখে পড়ে না। কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়া মাকড়শাটি আরও হাতখানেক নীচে পড়িয়া যায়। রাজকুমারের ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া ওঠে। না, দ্বিতীয় বার চেষ্টা করার চেয়ে তার ব্যর্থতাই ভাল।

জীবনে আর কোন মেয়ের কাছে এ দাবী সে করিবে না।

এক কাপ চা আনিয়া কালী বলে, এখন চা খেলে ভাত খাবেন কখন? খিদে নষ্ট হয়ে যাবে।

খিদে থাকলে তো নষ্ট হবে।

খিদে নেই কেন ?

ধরো খেয়ে এসেছি ?

ধরো খেয়ে এসেছি মানে ? খেয়ে এলে খেয়ে এসেছেন, নয়তো খেয়ে আসেননি। কোথায় খেলেন ? কি খেলেন ?

রাজকুমার মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, একটা মেয়ে খাইয়ে দিয়েছে কালী। এত খাইয়েছে কি বলব। পেট ভরে বুক ভরে মাথা পর্যন্ত ভরে গেছে।

মাথা ধরেছে ? শঙ্কিতভাবে কালী প্রশ্ন করে।

ধরে নি, ভরেছে।

রাজকুমারের হাসির জবাবে কালী কিন্তু হাসে না। মুখ ভার করিয়া বলে, আপনার শুধু মেয়ে বন্ধু, গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে বন্ধু। বেটাছেলের মেয়ে বন্ধু থাকতে নেই।

তাহলে তো তোমার সঙ্গে আড়ি করতে হয়।

আমি তো বন্ধু নই। আমি অনেক ছোট।

ওরাও বন্ধু নয় কালী। ওরা আমার চেয়ে অনেক ছোট,—ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ ! কালী অদ্ভুত অবজ্ঞার হাসি হাসে, ধেড়ে ধেড়ে সব মেয়ে, বিয়ে হলে এ্যাদ্দিন—

সাত ছেলের মা হত, না ?

কালী সায় দিয়া বলে, বিয়ে হয়নি কেন ওদের ? পাত্র জোটেনি ?

নাঃ, কই আর জুটল ? আমি একবার বলেছিলাম ওদের, এসো তোমাদের সবাইকে আমি বিয়ে করছি। ওরা রাজী হয়ে গেল। কিন্তু ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে তো সব, ভারি চালাক। প্রত্যেকে বলতে লাগল, আমায় আগে বিয়ে করো, তারপর আর সবাইকে বিয়ে করবে। তার মানে বুঝতে পারছ ?

খুব পারছি। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে দেবে না, একা বৌ হয়ে থাকবে। আমি তো মেয়ে, মেয়েদের ব্যাপার আমি সব জানি।

রাজকুমারও ক্রমে ক্রমে সেটা জানিতে পারিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিল। আজকাল কালীর মুখ ফুটিয়াছে। রাজকুমারের সঙ্গে হাল্কা অথবা ভারি চালে সে অনর্গল আলাপ করিয়া যায়। অভিজ্ঞতার অভাব আছে কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞানের তার অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু তার যে সরলতা মুগ্ধ করে, সেটা ভাণ নয়, মুগ্ধ করার ক্ষমতাই তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। রিণি-মালতী সরসীর চেয়ে কালী বোকা নয় ! কালীও সব বিষয়ে ওদেরি মত। ওদের সঙ্গে

কালীর তফাৎ দুপুরের রোদের সঙ্গে সকালের রোদের তফাতের মত।

সহজভাবে নিশ্চিন্ত মনে কালীর সঙ্গে কথা বলা যায়। এভাবে কারো সঙ্গে কথা বলিবার সুখটা রাজকুমারের এতদিন জানা ছিল না। কথা বলার আগে কিছু ভাবিতে হয় না, ভাবিবার সময় কথা বলিয়া যাইতে হয় না। যতক্ষণ খুসী কথা বলো, এক মিনিট অথবা এক ঘণ্টা। কথা বলতে চাও বলো, কথা শুনতে চাও শোনো, নয়তো খুসীমত চুপ করিয়া থাক, বধির হইয়া যাও। সবই স্বাভাবিক, কেউ রাগ করিবে না। বলার কথাও খুঁজিতে হয় না। রিণি-মালতী-সরসীর সঙ্গে কথা বলার সময় কতবার বলার কথা না থাকায় অস্বস্তি বোধ করিতে হইয়াছে, টানিয়া আনিতে হইয়াছে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি অথবা চেনা মানুষের সমালোচনা। ছেলেমানুষী আবোল-তাবোল কথা শুধু কালীর সঙ্গে বলা যায়।

মনোরমা হেঁসেল আগলাইয়া বসিয়া থাকে, ঘরে দু'জনের গল্প চলে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ে ব্যাথা ধরিয়া গেলে কালী কোণের টুলটা কাছে আনিয়া বসে। কালীর প্রসাধনের গন্ধটি তেজী ও স্পষ্ট। রিণি-মালতী-সরসীর মত কেবল সুবাসের মৃদু ইঙ্গিত নয়।

হঠাৎ এক সময় মনোরমার এদিকে ভয় হয়। এত দেরী? রাজকুমারের সম্বন্ধে ভাবনার কিছু নাই বটে, তবু এত দেরী? বিবাহের আগে শুধু একদিন একজনের সঙ্গে মনোরমা আধ ঘণ্টা নির্জনে গল্প করিয়াছিল। কেউ বাধা দিয়া গল্পের সমাপ্তি ঘটায় নাই, বাধা সে দিয়াছিল নিজেই, নিজেকে বাঁচানোর জন্য। ভাবিয়াছিল, তাই উচিত। দু'দিন পরে যার সঙ্গে বিবাহ হইবে, এখন তার কাছে ধরা না দেওয়াটাই নিয়ম। আজ অসময়। কিন্তু আর তো আসিল না সে মানুষটি। মনোরমা জানে, সেদিন ধরা দিলে সে আসিত। দু'দিনের জন্য নয় চিরদিনের জন্য। সে তো বুঝিতে পারে নাই মনোরমার মনের কথা, হাত ধরা মাত্র তার রক্তেও কি আগুন লাগিয়াছিল—আজও তার তাপে মনোরমার মন জ্বলিয়া যায়। সে ভাবিয়াছিল, মনোরমা বুঝি ঠাণ্ডা, মন তার বরফের দেশ। কল্পনার শীতল মনোরমা তার ভালবাসাকে জুড়াইয়া দিয়াছিল। তা'ছাড়া আর কি কারণ থাকিতে পারে তার না আসার, মনোরমাকে বিবাহ না করার?

সাড়ে ন'টার সময় কালী চা দিতে গিয়াছে, সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। মনোরমার বুক টিপ টিপ করে। এত দেরী। খাইতে আসার তাগিদ দিতে রাজকুমারকে ডাকিতে গিয়া কালীকে বাঁচানোর জন্য মনটা ছটফট করে মনোরমার। কিন্তু সে উঠিতে পারে না। শুধু আজের জন্য বাঁচাইতে গিয়া সে

যদি কালীর চিরদিনের মরার ব্যবস্থা করিয়া বসে ?

তারপর কালীর তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ কাণে আসে। মনোরমা জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। সর্ব্বাঙ্গে তার কয়েকবার শিহরণ বহিয়া যায়। পিঁড়িটা ঠেলিয়া দেয়ালের কাছে গিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া সে চোখ বোজে! হাসি! আর ভয় নাই। যেখানে হাসি আছে সেখানে কোন ভয় নাই।

রাজকুমার একদিন সন্ধ্যার পর মালতীর খোঁজ করিতে গেল। এইটুকু পথ যাইতেই চোখে পড়িল আলো আর দেবদারু পাতায় সাজানো তিনটি বাড়ী। ছাতে সামিয়ানা, শানাই বাজিতেছে। অগ্রহায়ণ মাস, চারিদিক বিয়ের ছড়াছড়ি। রাজকুমারের মনে পড়ে, একটি বন্ধুর বিবাহে তার নিমন্ত্রণ ছিল। দু'টি বছর খুঁজিয়া বাছিয়া একটি মেয়ে পাওয়া গিয়াছে পছন্দমত। এ পছন্দের মানে রাজকুমার জানে। মেয়েটি সুন্দরী নয়, রঙ খুব ফর্সা। তার আরেকটি বন্ধু এ রকম বাছাই করা এক মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। অমন রূপ নাকি খুব কম দেখা যায়। বৌ দেখিয়া তাকে নিজের বৌ হিসাবে কল্পনা করিতে গিয়া রাজকুমার শিহরিয়া উঠিয়াছিল, এমন কুৎসিত ছিল সেই অত্যন্ত ফর্সা রঙের মেয়েটি।

মালতীর বাড়ী গিয়া দেখা গেল, সরসী আর রুক্মিণী আসিয়াছে। দু'জনেই বিশেষভাবে সাজিয়াছে, মালতীও দামী কাপড় পরিয়া নামিয়া আসিল। তিনজনে বিবাহের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে শ্যামলের সঙ্গে।

নিমন্ত্রণে যাওয়ার আগ্রহ তিনজনেরই প্রবল, শ্যামলের দেরীর জন্য কারো কিন্তু বিরক্তি দেখা গেল না।

বোন আর বৌদিকে নিয়ে আসবে।—মালতী বলিল।

দেরী করার অপরাধ তাই শ্যামলের নয়। দু'টি মেয়েকে সঙ্গে আনিতে হওয়ায় দেরী যে তার হইবে, এটা সকলে ধরিয়াই রাখিয়াছে।

রাজকুমার বলিল, আমি তবে বিদায় হলাম।

সরসী বলিল, তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে ?

অনাহূত ?

অনাহূত মানে ? ধীরেনবাবু তোমায় বলেন নি ?

তোমরা ধীরেনের বিয়েতে যাচ্ছ নাকি ? এতো ভারি আশ্চর্য্য যোগাযোগ হল !

আশ্চর্য যোগাযোগ আবার হল কোন্‌খানটায় ? তুমি ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে, আমি চেষ্টা করে একটা চেনা মেয়ের সঙ্গে

তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা যাচ্ছি কন্যা পক্ষে, তুমি যাবে বরযাত্রী হয়ে। এতো সোজা কথা।

আগে জানিলে কথাটা সোজাই মনে হইত। একটা বিবাহ ঘটানোর গর্বে এখন বিশ্বের, সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরসীর আয়ত্তে আসিয়াছে, আশ্চর্য কিছু ঘটিবার উপায় নাই। রাজকুমার যে ঠিক আজ সন্ধ্যাতেই অনেকদিন পরে মালতীর খোঁজ করিতে আসিয়াছে, তাও সরসীরই বাহাদুরী। ধীরেনের দু'বছর খোঁজার পর পছন্দমত মেয়ে পাওয়ার ব্যাপারটা রাজকুমার এবার বুঝিতে পারে। সরসীই তার মনে পড়াইয়া দেয় তার বাড়ীতে মেয়েটিকে রাজকুমার একদিন দেখিয়াছিল। না, দু'বছর খুঁজিয়া পছন্দ করার মত মেয়ে সে নয়। তবে মাঝখানে সরসী ছিল। সেই পছন্দ করাইয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। সরসী সব পারে।

সকলকে আড়াল করিয়া সরসী একাই তার সঙ্গে কথা বলে। চিরদিন তার এই রীতি। দেখা হওয়া মাত্র রাজকুমারকে সে দখল করে। মনে হয়, রাজকুমারের জন্যই সে যেন ওৎ পাতিয়া ছিল। তার সভাসমিতি করিয়া বেড়ানোর মানে আর কিছুই নয়, রাজকুমারের অদর্শনের ক'টা দিন বাজে কাজে কোন রকমে সে সময় কাটায়।

মালতী বলে, তোমায় কেমন আনমনা ঠেকছে আজ?

সরসী সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের হইয়া জবাব দেয়, কবিত্ব করিস নে মালতী, থাম্। একটা মানুষ ভাল করে চুল না আঁচড়ালেই তোর কাছে আনমনা ঠেকে। চিরুণীটা দেখি তোর।

সরসী নিজেই মালতীর চিরুণী দিয়া রাজকুমারের চুল ঠিক করিয়া দেয়। তার পিছনে দাঁড়াইয়া মালতী একটু হাসে।

রুক্মিণী বলে, চুল আঁচড়ালে কি হবে, রাজকুমারবাবুর চেহারাটাই কবির মত।

সরসী মুখে এ কথার প্রতিবাদ করে না, শুধু ভৎর্সনার দৃষ্টিতে রুক্মিণীর মুখের দিকে তাকায়। রুক্মিণী একেবারে বিব্রত হইয়া পড়ে। কারো চেহারা কবির মত, একথা বলা কি অসঙ্গত? প্রশংসার বদলে তাতে কি নিন্দা বুঝায়? কে জানে! অথচ সদ্য পরিচিত একজনকে ঠিক এই কথা বলায় পরদিন সকালে সে বাড়ী আসিয়া রুক্মিণীর সঙ্গে আলাপ করিয়া গিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি সে আবার বলিতে যায়, কবির মত চেহারা মানে—

সরসী বলে, মানে, ওকে তোমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে!

এবার রুক্মিণী নির্ভয়ে সহজ ভাবে জবাব দেয়, তা হয়েছে। তবে একপক্ষের পছন্দে আর লাভ কি!

রাজকুমার মনে মনে তার নিজস্ব অপদেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। কিন্তু উপায় তো নাই, কথার পিঠে কথা চাপাইতেই হইবে। কোন রকমে একটু হাসিয়া সে বলে, এ অনুমানটা আপনার ভুল।

ভুল নয় রাজকুমারবাবু, প্রমাণ আছে। পছন্দ দূরে থাক, আমায় আপনি অপছন্দ করেন।

আগে আপনার প্রমাণ দাখিল করুন, আসামী জবাবদিহি করবে।

রুক্মিণী মৃদু মৃদু হাসে। এ ধরণের আলাপের সময় সকলেই হাসে, তবে ঠিক এ ভাবে নয়! কেমন যেন বাঁকা বাঁকা রুক্মিণীর হাসি। বুঝা যায়, সরসী অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া আছে।

রুক্মিণী বলে, যেমন ধরুন, যাকে পছন্দ করে তার বাড়ী লোকে না ডাকতেই যায়। যাকে পছন্দ করে না যাওয়ার কথা থাকলে তার বাড়ীতেও ভদ্রতার খাতিরে যায়। যাকে অপছন্দ করে তার বাড়ীতে যাওয়ার সব ঠিক থাকলেও যায় না।

তাই বটে। রুক্মিণী একদিন তাকে বাড়ীতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেও যাইবে বলিয়াছিল। কবে ক'টার সময় যাইবে তাও ঠিক ছিল। তারপর রুক্মিণীর অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গিয়াছিল। না যাওয়ার অজুহাত দিয়া ক্ষমা চাহিয়া একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে নাই। রুক্মিণী আহত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে। রাগ করার কথাই।

রাজকুমারের বিপদের টের পাইয়া সরসী মুখ খোলে।

কেন রাজকুমারের চিঠি পাওনি তুমি?

রুক্মিণী বলে, চিঠি? কিসের চিঠি?

রাজকুমার ভাবে, চিঠি? কিসের চিঠি?

সরসী বলে, আমার সামনে ও যে তোমায় চিঠি লিখল? হঠাৎ শিলং যেতে হল ওকে, নিজেই বলতে যাচ্ছিল তোমাকে, আমি বললাম চিঠি লিখে দিলে চলবে। চিঠি পোষ্ট করেছিলে তো রাজকুমার?

রাজকুমার বলে, নিশ্চয়।

সরসী বলে, চিঠির কোন গোলমাল হয়েছিল বোধ হয়। পোষ্টাপিসের ব্যাপার তো।

পোষ্টাপিসের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া সরসী ব্যাপারটা শেষ করিয়া দেয়।

রুক্মিণী নরম হইলেও এত সহজে রাজকুমারকে রেহাই দিতে পারে না।

শিলং থেকে ফিরে একদিন আসতে পারতেন তো ?

এবার আত্মরক্ষার দায়িত্ব রাজকুমারের, সে দুঃখের ভাণ করিয়া বলে, এমন ব্যস্ত ছিলাম, কি বলব আপনাকে। তা ছাড়া হঠাৎ গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতেও ভরসা পাইনে।

আচ্ছা, এবার হঠাৎ গিয়ে আমায় বিরক্ত করার নেমন্তন্ন করে রাখলাম। ভুলবেন না যেন। বলিয়া রুক্মিণী এতক্ষণ পরে ক্ষমার সহজ হাসি হাসিল। অর্থহীন দীর্ঘ ভূমিকার পর।

রাজকুমার ভাবিতে লাগিল, সভ্যতার নামে এরা কি অসভ্যতাই শিখিয়াছে। প্রথমে দেখা হওয়া মাত্র এই হাসি হাসিলে কত সহজ হইয়া যাইত মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করার ইচ্ছা জাগানো।

খানিক পরেই শ্যামল আসিল। ব্যস্তসমস্ত, উদ্বিগ্ন শ্যামল। এক ঘণ্টার বেশী দেরী করিয়া ফেলার অপরাধে সে যেন নিজের মরণ কামনা করিতেছে। সঙ্গে তার বোন সুধা ও বৌদিদি ইন্দিরা। দু'জনের সাজ-সজ্জা একেবারে চমকপ্রদ। শ্যামলের যে মোটে ঘণ্টাখানেক দেরী হইয়াছে তাই আশ্চর্য্য।

রাজকুমারকে দেখিয়া শ্যামলের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। রাজকুমার মালতীকে পড়ানো ছাড়িয়া দিয়াছে জানিয়া সে স্বস্তি পাইয়াছিল।

রাজকুমার মাঝে মাঝে আসে তা সে জানিত কিন্তু সেদিন বর্ষা-সন্ধ্যার ব্যাপারটির পর রাজকুমারকে সে এ বাড়ীতে ছাখে নাই।

রাজকুমার বলিল, কেমন আছ শ্যামল ?

শ্যামল জবাব দিল না।

প্রশ্নের জবাব না দিবার সাধারণ কারণ থাকা সম্ভব মানুষের। হয়তো শ্যামল শুনিতে পায় নাই। মেয়েদের বিয়েবাড়ীতে পৌছিয়া দিবার হাঙ্গামায় যে রকম ব্যতিব্যস্তই সে হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু সেদিন মিটিং-এর কথাটা সকলের মনে ছিল। সকলেরই তাই মনে হইল, সেদিনের অপমানের জন্যই বুঝি শ্যামল রাগ করিয়া রাজকুমারের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মালতীই যেন বিব্রত হইয়া পড়িল সকলের চেয়ে বেশী। শ্যামলকে সে একপাশে ডাকিয়া নিয়া গেল।

রাজুদার সঙ্গে কথা বল না ?

না।

কেন ?

ইচ্ছে হয় না।

ছি ছি, কবে সেই মিটিং-এ কি হয়েছিল, আজও তা মনে করে রেখেছে? দোষ তো ছিল তোমার। তুমি কেন গায়ে পড়ে—

সেজন্য নয়। ও একটা রাস্কেল মালতী।

উত্তেজিত অবস্থায় না থাকিলে কথাটা শ্যামল বলিয়া ফেলিত না। অত বোকা সে নয়। মালতীর মুখের সঙ্গে নিজের মুখখানাও তার বিবর্ণ হইয়া গেল।—তোমার বড্ড মাথা গরম। কাকে কি বলো ঠিক নেই। রাজুদা তোমাকে দশ বছর পড়াতে পারে, তা জানো?

পেটে বিদ্যে থাকলেই লোকের মনুষ্যত্ব থাকে না।

রাজুদা'র মনুষ্যত্ব নেই, মনুষ্যত্ব আছে তোমার! লোকের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা বলতে পারো না তুমি! ওর তুলনায় তুমি তো কেঁচো।

মালতী ছিটকাইয়া রাজকুমারের কাছে সরিয়া গেল।

চলো! চল, আমরা যাই।

শ্যামল কোথা হইতে কার একটি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একটা গাড়ীতে এতগুলি মানুষের যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্ততঃ দু'জনের ট্রামে বা বাসে যাইতেই হইত। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা উঠার আগেই মালতী চুপি চুপি রাজকুমারকে বলিল, শ্যামলের গাড়ীতে আমি যাব না। চল, আমরা ট্রামে যাই।

গাড়ীতে যে জায়গা কম পড়িবে, এতক্ষণে সকলের সেটা খেয়াল হইয়াছিল। সরসী বলিল, গাড়ীতে তো কুলোবে না সকলের। আমি বরং রাজকুমারের সঙ্গে—

মালতী তখন পথ ধরিয়া কয়েক পা আগাইয়া গিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, তোমরা গাড়ীতে যাও। আমরা দু'জন ট্রামে যাচ্ছি। এসো।

সরসীর চোখের সামনে রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া মালতী বড় রাস্তার দিকে চলিয়া গেল।

একটা ট্রাম সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

মালতী বলিল, না। পরের ট্রামে।—এখনও থাকিয়া থাকিয়া মালতী কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কি হয়েছে মালতী?

শ্যামলের সঙ্গে কোনদিন আমি যদি কথা বলি—

এতক্ষণে গলা ধরিয়া মালতীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

কি করেছে শ্যামল ?

আমায় অপমান করেছে !

অপমান করেছে ? কি অপমান ?

তোমায় রাস্কেল বলেছে।

আমায় রাস্কেল বলেছে তাতে তোমার অপমান হল কেন ?

চুপ কর। তামাসা ভাল লাগে না। যা হচ্ছে আমার ! শ্যামল কিনা বলে তোমার মনুষ্যত্ব নেই। নিজে থেকে ভিখিরীর মত আসে, দয়া করে হেসে কথা কই, তাইতে ভেবেছে, কি না জানি মহাপুরুষ হয়ে গেছি আমি। এবার বাড়ীতে এলে দূর করে তাড়িয়ে দেব।

অত রাগ কোরো না, মালতী। বেচারী তোমায় ভালবাসে, সেদিন জানালা দিয়ে আমাদের দেখে ওর মাথা বিগড়ে গেছে। আমাকে গাল তো দেবেই।

মালতী সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, ভালবাসে না ছাই। অত ছোট মন নিয়ে কেউ ভালবাসতে পারে ?

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, ভালবাসে বলেই তো মন ছোট হয়েছে। তা'ছাড়া, আমার ওপর ওর রাগের আরেকটা কারণ আছে।

জানি, কাঁদের বাড়ীর মেয়ের হাত ধরেছিলে তো ?

রাজকুমার আশ্চর্য হইল না।

শ্যামল বলেছে ?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, এমনি শুনেছি। সবাই জানে। ওসব লোকের বাড়ীতে যাওয়ার কি দরকার ছিল তোমার ?

দরকারের কথা পরে বলছি। জেনেও তুমি চুপ করে ছিলে যে ?

তুমিও তো চুপ করে ছিলে ?

রাজকুমার কিছুক্ষণ কথা বলিল না। আরেকটি ট্রাম সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা প্রথমে আমার কাছে এত তুচ্ছ ছিল মালতী বলার কোন দরকার বোধ করিনি। পরে যখন দেখলাম আমার কাছে তুচ্ছ হলেও অন্যের কাছে তুচ্ছ নয়, তখন বলব ভেবেছিলাম। সময়মত নিজেই বলতাম।

আমিও জানতাম তুমি সময় মত নিজেই বলবে। তাই চুপ করে ছিলাম কিন্তু শ্যামলের কি স্পর্দ্ধা ! তোমার সমালোচনা করতে যায় !

আরেকটি ট্রাম আসিতে দেখিয়া মালতী বলিল, যাবে ? আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না।

রাজকুমার বলিল, না, চলো। সকলের সামনে বিয়ে বাড়ী যাব বলে বেরিয়েছি, না গেলে ওরা কি ভাববে?

মালতী হাসিল, লোকে কি ভাববে, তুমি আবার তা ভাবো নাকি? পরের বাড়ীর মেয়ের হাত ধরতে যাও কেন তবে?

এই জন্যে।—বলিয়া রাজকুমার মালতীর হাত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিয়ে বাড়ীতে সময়টা কাটিল ভালই। বন্ধু ও পরিচিত অনেকে উপস্থিত ছিল। রাত দশটার মধ্যে লগ্ন, বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ রাজকুমার বিবাহ দেখিল। কনেকে সত্যই আশ্চর্য রকম সুন্দরী দেখাইতেছে। রঙ তার অত্যন্ত ফর্সা, সাধারণ অবস্থায় দিনের বেলা লাবণ্যের অভাবে চোখে ভাল লাগে না, এখন ক্রীম, পাউডার, স্নো, চন্দন আর ঘামে স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়াছে মুখখানা। খুঁতগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে সাজানোর কায়দায় এবং খুঁতও মেয়েটির কম নয়। রাজকুমার অনাবশ্যক সহানুভূতি বোধ করে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এভাবে সাজিয়া থাকিবার সুযোগ মেয়েটি পাইবে না। দু'পাশে চাপা কপাল, নিভাঁজ চোখের কোণ, নাকের নীচে ভিতর দিকে মুখের অসমতল খাদ, চোয়ালের অসামঞ্জস্য, এ সব লোকের চোখে পড়িতে থাকিবে। তবে, ধীরেনের চোখে হয়তো পড়িবে না। ফর্সা রঙে তার চোখে যে ধাঁধাঁ লাগিয়াছে, সেটা আর কাটিবার নয়। বাড়ীর বৌ-এর রঙের গর্বে বাড়ীর অন্য মানুষেরাও হয়তো তার রূপের অন্য সব ত্রুটির কথা তেমন ভাবে মনে রাখিবে না।

মেয়েটি একটু বোকা এবং অহঙ্কারী। মুখ দেখিয়া এটুকু বুঝা যায়। কাপড়ে পুটুলী করা দেহটি দেখিয়া অনুমান করা যায় ভোঁতা, আনাড়ম্বর, নিষ্ক্রিয় প্রেমের সে উপযোগী। নীরবে অনেকটা নির্জীব পুতুলের মত নিজেকে দান করার জন্য সে চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; ধীরেনের যখন খুসী গ্রহণ করিবে যখন খুসী করিবে না, তার দিক হইতে কখনো কোন দাবী আসিবে না, কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না। স্বামীর সঙ্গে অন্তরালের জীবনটিও প্রথম হইতেই তার কাছে হইয়া থাকিবে প্রকাশ্য উঠা-বসা-চলা-ফেরার জীবনের মতই বাঁচিয়া থাকার নিছক একটা অঙ্গ মাত্র, আবেগ ও রোমাঞ্চের বাড়াবাড়ি যাতে বিকারের সামিল। দাবী সে করিবে সুখ, সুবিধা ও অধিকার, কর্তৃত্ব সে করিবে অনেক বিষয়ে, সংসারে নিজের স্থানটি দখল করিতে কারো সাহায্যের তার দরকার

হইবে না, তার হুকুমেই ধীরেন উঠিবে বসিবে। নিস্তেজ প্রাণহীন শুধু সে হইয়া থাকিবে স্বামীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

মেয়েটির সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু হয়তো স্পষ্টভাবে জানা যাইত, যদি—

মনের চোখে সেইভাবেই দেখিয়াছে। একটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে না, বিবাহের আসরে বন্ধুর কনেকে পর্যন্ত এরকম অভদ্রভাবে কল্পনা করা? এদিকটা রাজকুমারের একবার খেয়ালও হয় নাই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টনীতে মেয়েটির জীবনে কি বৈশিষ্ট্য থাকিবে সেই অনুমানেই মসগুল হইয়া গিয়াছিল। কাপড় ঢাকা দেহ দেখিয়া কতটুকুই বা বুঝিতে পারা যায়? দশ-মিনিটের জন্য যদি ভগবান যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন ঠিক তেমনি অবস্থায় মেয়েটিকে সে দেখিতে পাইত! বন্ধুর দাম্পত্য জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ইতিহাস তার জানা হইয়া যাইত।

এগারটার সময় সরসী কোথা হইতে আসিয়া বলিল, আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে চল।

ওরা?

ওরা পরে যাবে—শ্যামলের সঙ্গে।

ওরা দেরী করছে কেন?

আড্ডা দিচ্ছে এখনো খেতেও বসে নি।

তুমি খেয়েছ?

সন্দেশ মিষ্টি খেয়েছি, আমি নেমতন্ন খাই না।

এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে। আমি অবশ্য ঘরোয়া নেমতন্ন খাই, তুমি বললে তোমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসব। ভোজ কখনো খাই না।

কিছু খেয়েছো তো?

কই আর খেলাম? দু'বার ডাকতে এল, আমি বললাম, সকলের সঙ্গে বসব না। বাস, কেউ আর টুঁ শব্দটি করল না।

তুমি বড় ছেলেমানুষ রাজু। বিয়ে বাড়ী, পাঁচ সাতশো লোক খাবে, প্রত্যেকের বিষয়ে অমন করে খোঁজ খবর রাখতে পারে? বললে না কেন তোমার কিছু এনে দিতে? আমি বসব না মশায়, আমায় একটা প্লেটে সামান্য কিছু এনে দিন, এ কথাটা আর মুখ ফুটে বলতে পারলে না!

কথাটা ওদের বলাই উচিত ছিল না?

তোমরাই আবার মেয়েদের সেন্টিমেণ্টাল বলো। সরসী হাসিয়া ফেলিল,

আমি বলে দিচ্ছি, কিছু খেয়ে নাও। খিদে পেয়েছে নিশ্চয় ?

নিশ্চয় ?

রাজকুমারকে খাবার দেওয়ার কথা বলিতে সরসী কিন্তু যায় না, খোঁপা ঠিক করার অবসরে কত কি যেন ভাবিয়া নেয়।

তার চেয়ে আমার বাড়ী গিয়ে খাবে চলো।

বাঁচালে সরসী। লক্ষ্মী মেয়ে। হাটে বসে খাবার গিলতে সত্যি আমার কষ্ট হয়, সেন্টিমেণ্টাল বলো আর যাই বলো।

আমি কিন্তু এ সব হাটে বসে দশজনের সঙ্গেই খেতে ভালবাসি, রাজু। তোমায় মিছে বলেছিলাম, আমি খুব নেমতন্ন খাই। তোমায় বাড়ী নিয়ে যাব বলে না খেয়ে ওদের আগে চলে এসেছি।

বলো কি সরসী ? আমায় তো সাবধান হতে হবে।

তুমি আবার অসাবধান কবে ? বাস তো কর দুর্গে, সাবধান আবার হবে কি ?

কিসের দুর্গ সরসী ? কার দুর্গ ?

তোমার নিজের দুর্গ। কিসের তা জানি না।

কথার কথা ? কে জানে ! বুঝিতে না পারিয়া রাজকুমার একটু বিরক্তি বোধ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিতেও বাধ' বাধ' ঠেকিতে লাগিল। সরসীর ইঙ্গিত তার জিজ্ঞাসা করিয়াই বুঝা উচিত।

সরসীদের বাড়ীর সকলেই বিয়েবাড়ীতে গিয়াছিল, কেবল কেদার সকাল সকাল ফিরিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। রাত তিনটায় কাসিতে কাসিতে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিবে, তার আগে ভদ্রলোকের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

চাকর দরজা খুলিয়া দিয়া হুকুমের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। সরসী বলিল, তুই শো গে যা লছমন।

একটু পুরানো ধাঁচের বড় চারকোণা বাড়ী, ঘরগুলি প্রকাণ্ড। নীচের হলটিতে রীতিমত সভা বসানো চলে। এই হলে রাজকুমারকে বসাইয়া সরসী খুঁজিয়া পাতিয়া নানারকম খাবার আনিয়া হাজির করিল।

পেট ভরেই খাও। এখন একবার খেয়ে বাড়ী গিয়ে আর খাবার দরকার নেই।

পেট ভরে না খেলেও বাড়ী গিয়ে আর খেতাম না সরসী।

এখনো তোমার হজমের গোলমাল হয় ?

সাবধান থাকলে হয় না।.

খুব গুণের কথা হল, না ? এই বয়সে বুড়োদের মত খাওয়ার বিষয়ে সাবধান হয়ে চলতে হবে ? তুমি একেবারে একসারসাইজ কর না। সারা দিন শুয়ে বসে ঘরের কোণে কাটালে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে ?

সেজন্য খুব বেশী আসত যেত না সরসী। আসল কারণ হল, এক কালে খুব একসারসাইজ করতাম, হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছি। চিরকালের আলসে লোকের শুয়ে বসে থাকাটা দিব্যি সয়ে যায়, হঠাৎ একদিন আলসে হলেই বিপদ।

ছাড়লে কেন ? আবার তো ধরতে পার ?

ধরব। শীগ্‌গির ধরব। দু'চার দিনের মধ্যে।

অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে রাজকুমারের কথা বলার ধরণে সরসী একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে যেন সরসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছে, দেহকে আর অবহেলা করিবে না, অবিলম্বে ব্যায়াম আরম্ভ করিবে। অপরাধের বিলম্বিত প্রায়শ্চিত্ত করার মত। রাজকুমারের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সরসী আর কথা বলে না, নীরবে তাকে দেখিয়া যায়। সেটা বিস্ময়কর ঠেকে রাজকুমারের কাছে।

এবার বিদায় নেওয়া-যাক।

বোসো।

সেটা কি উচিত হবে ? রাত কম হয়নি।

তুমি আমাকে উচিত অনুচিত শেখাতে এসো না।

নিজেও সরসী বসে। বসার পর একসঙ্গে বেশীক্ষণ রাজকুমারের মুখখানা দেখিতে না পারায় এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে বার বার তার মুখের দিকে তাকায়। রাজকুমার নীরবে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। সরসীর কিছু বলিবার আছে অনেক আগেই সে তা অনুমান করিয়াছিল। তার কাছে কিছু আশা করিয়া সরসী সুযোগ পাইয়া এত রাত্রে তাকে খালি বাড়ীতে ডাকিয়া আনে নাই, সরসীর কাছে এসব হঠাৎ পাওয়া সুযোগ সুবিধার কোন মানে নাই। সেরকম ইচ্ছা থাকলে কবে সকলে বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলে বাড়ী ফাঁকা হইবে সে ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া রাজকুমারকে দিয়াই হয়তো সে খালি একটা বাড়ী ভাড়া করার ব্যবস্থা করিত। কোন কারণে তাকে আজ সরসীর দরকার হইয়াছে। খুব সম্ভব তাকে কিছু বলিবে সরসী এবং যতক্ষণ মুখ ফুটিয়া না বলিবে, কি যে সে বলিতে চায় কেউ কল্পনাও করিতে পারিবে না।

সরসীর প্রকৃতি আসলে খুব সহজ ও সরল। দরকারী নির্দোষ মিথ্যা সে অনর্গল

বলিতে পারে, আজ সন্ধ্যায়ও অনায়াসে লাগসই কৈফিয়ৎ রচনা করিয়া নিজেকে সাক্ষী দাঁড় করাইয়া রুক্মিণীর কাছে তার লজ্জা বাঁচাইয়াছিল। বুদ্ধি তার ধারালো, মানুষের কাছে কাজ আদায় করার কোন কৌশল বোধ হয় তার অজানা নাই, সস্তা আবেগ তার কাছে এতটুকু প্রশ্রয় পায় না।

কাল থেকে তোমার কথাই ভাবছি রাজুদা।

কেন?

তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন।

কেমন হয়ে যাচ্ছি?

কি রকম অস্থির দিশেহারা হয়ে পড়ছ। বেঁচে থাকতেই তোমার যেন ভাল লাগছে না, সব সময় একটা কষ্ট ভোগ করছ। অনেকদিন থেকেই তোমার এ ভাবটা লক্ষ্য করছি। কি হয়েছে তোমার?

রাজকুমার নীরবে মাথা নাড়িল।

সরসী ভ্রূ কুঁচকাইয়া একটু ভাবিল।—কি হয়েছে বুঝতে পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু কিছু যে তোমার হয়েছে তাও কি বুঝতে পার না? অসুখ হলে তো সব সময় জানা যায় না কি অসুখ হয়েছে, শরীরটা শুধু খারাপ লাগে। নিজের ভেতরে সেই রকম কিছু বোধ কর না? অসুখের কথা বলছি না? মনে তোমার কোন রকম অস্বস্তি আছে, টের পাও না?

এসব কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন সরসী?

বললাম না তোমার জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে? রিণির কাছে সব শুনে—

তাই বল।

তুমি যা ভাবছ, তা নয়। রিণির কাছে সব শুনে আমার ভাবনা হয় নি, তার অনেক আগে থেকে তোমার সাধারণ চালচলন কথাবার্তার ধরণ দেখেই ভাবনা হয়েছে। তবে রিণির ব্যাপারটা না জানলে আমি হয়তো চুপ করে থাকতাম। মানুষের কত কি হয়, বিশেষ করে তোমার মত যারা নিজের মনের মধ্যেই বেশী করে বাঁচে। তোমার ভেতরে কোন একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, আস্তে আস্তে আবার সামঞ্জস্য হয়ে যাবে মনে করেছিলাম। একবার ভেবেছিলাম, লভে পড়েছ বুঝি, ছেলেখেলা নয়, আসল লভ। তারপর দেখলাম, সে সব কিছু নয়।

কি করে জানলে সে সব কিছু নয়?

সে রোগের সিমটম আলাদা, আমরা চিনতে পারি। একটা মেয়েকে ভালবাসার মানে জানো? সকলকে ভালবাসা, জীবনকে ভালবাসা, বেঁচে থাকতেই মজা লাগা।

তুমি কাউকে ভালবাসো না, নিজেকে পর্যন্ত নয়। সব সময় তুমি ছটফট করছ, কি করলে একটু স্বস্তি পাবে। সর্বস্ব হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন পাগলের মত খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, তুমিও ঠিক তেমনি ভাবে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছ। থিয়োরী? তুমি পাগল রাজুদা। দেহের গড়নের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির সম্পর্ক কি তাই টেষ্ট করার জন্য কেউ এভাবে ব্যাকুল হয়? তোমার আরও সিরিয়াস কিছু হয়েছে, এ শুধু তার একটা লক্ষণ। আমার কান্না পাচ্ছে বুঝতে পারছ?

সেটা সহজেই বুঝা যাইতেছিল। গলা ভারি হইয়া চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছে। রাজকুমার তাড়াতাড়ি বলিল, কেঁদো না সরসী। কান্না আমি সইতে পারি না।

কান্না পেলেই আমি কাঁদি না কি?

তাই তো তোমায় ভালবাসি।

ভালবাসো না, ছাই। পছন্দ কর। ভালবাসলে তো বেঁচে যেত।

রাজকুমার করুণভাবে একটু হাসিল। সরসীকে সে পছন্দ করে, স্নেহ করে, একটু ভয়ও করে। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও সহজ কথাগুলি সরসী ছাড়া কারও কাছে সে শুনিতে পাইত না। অনেক দিন হইতেই সরসী জানে তার ভিতরে কিছু একটা গোলমাল চলিতেছে। নিজের সম্বন্ধে নিজে সে কখনো এভাবে চিন্তা করে নাই। যখন এ বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছে, স্থূল বাস্তব জগতের আপেক্ষিকতার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছে, ব্যাপারখানা কি। নিজের সম্বন্ধে যত কেন জাগিয়াছে, তার সবগুলির জবাব খুঁজিয়াছে যে অভিধানে শুধু সাধারণ চল্‌তি মানে পাওয়া যায়। মুদীর হিসাবে যেন সুখ-দুঃখের হিসাব কষিয়াছে। ভূমিকম্পের কারণ খুঁজিয়াছে মাটির উপরে। আরও যে অনেক উষ্ণগহন স্তর আছে মাটির নীচে এ যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সরসী মনে পড়াইয়া দিয়াছে। গভীর কৃতজ্ঞায় অনেকদিন পরে রাজকুমারের হৃদয়গ্রন্থিতে স্রাব হয় চোখের জলের মত নোনতা সুস্বাদু রসের, শুকনো মন একটু ভিজিয়া ওঠে।

সরসী বলিল, এত বড় হলে বসতে ভাল লাগছে না। ওপরে যাবে? চলো।

উপরে দু'টি পাশাপাশি ঘর সরসীর, একটিতে সে বসে, অপরটিতে শোয়। মাঝখানে একটি দরজা আছে, ঘর দু'টির ব্যবধান বজায় রাখিতে দরজাটি সে অধিকাংশ সময় বন্ধ করিয়া রাখে, সামনের বারান্দা ঘুরিয়া যাতায়াত করে এঘর হইতে ওঘরে।

বসিবার ঘরে রাজকুমারকে বসাইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একপাশে

একটি চারকোণা টেবিলে সরসী লেখাপড়া করে, তার সভাসমিতির কাগজপত্রেই টেবিলের অর্ধেকটা ভরিয়া আছে। ছোট একটি শেল্‌ফে বাছা বাছা বই, প্রত্যেকটি বই রাজকুমারের পড়া। নির্বিচারে ভালমন্দ সব বই পড়ার সময় সরসীর হয় না। রাজকুমারের সঙ্গে তাই তার বন্দোবস্ত আছে, রাজকুমার নিজে পড়িয়া যে সব বই তাকে পড়িতে বলে শুধু সেই বইগুলিই সে পড়ে—তার জ্ঞানবুদ্ধির আয়ত্তের বাহিরের বইগুলি ছাড়া। এঘরে প্রায়ই অনেক মেয়ে জড়ো হয়, সোফা চেয়ারে ঘরটি একটু ঠাসিয়া ফেলিতে হইয়াছে। জানালার কাছে গেরুয়া আস্তরণ ঢাকা একটি ঈজিচেয়ার, সরসী ওখানে বিশ্রাম করে। আস্তরণে মাথার চুলের দাগ পড়িয়াছে টের পাওয়া যায়। সারাদিন ছুটাছুটির পর ওখানে চিৎ হইয়া শ্রান্ত সরসী না জানি কি ভাবে! দশজনের সঙ্গে সরসীর কারবার, সর্বদা সে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, দু'চারজন সঙ্গিনী সারাদিন তার আছেই। সরসীকে এই ঘরে একা কল্পনা করিতে গিয়া রাজকুমারের মনে হয় সে যেন নিজেরই এক রহস্যময় ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতেছে।

সরসীর ফিরতে দেরী হইতেছিল। এত রাত্রে তাকে একা বসাইয়া কি করিতেছে সরসী? আত্মসম্বরণ করিতেছে? রাজকুমার নিজের কাছেই মাথা নাড়ে। যতই বিচলিত হোক সামলাইয়া উঠিতে সরসীর সময় লাগে না, নির্জনতার প্রয়োজন হয় না। নীচে তার যখন কান্না আসিয়াছিল তখনও এক মিনিটের জন্য উঠিয়া গিয়া কাঁদিয়া অথবা কান্না থামাইয়া আসিতে হয় নাই।

রাজকুমার মৃদুস্বরে ডাকে, সরসী?

পাশের ঘর হইতে সরসী সাড়া দেয় আসছি।

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় সরসীর গলা। নীচে অত সহজে যে-কান্না সে আটকাইয়াছিল, ও ঘরে গিয়া সত্যই সত্যই তবে কি সেই কান্নাই সে কাঁদিতেছে? রাজকুমার কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে। রিণির কাছে তার খাপছাড়া প্রস্তাবের বিবরণ শুনিয়া এমন আঘাত লাগিয়াছে সরসীর মনে? রিণিকে কথাটা বলার আগে সে শুধু ভাবিয়াছিল, এসব কাণে গেলে মালতী কত কষ্ট পাইবে। সরসীর কথা তার মনেও আসে নাই। শেষ পর্যন্ত আঘাতটা তবে পাইল সরসী?

রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সরসী বাহির হইতে ঘরে আসিবে। শোয়ার ঘরের দরজা খোলার শব্দে সেদিকে চাহিয়া তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল।

সরসী আগাইয়া আসিল আরও কয়েক পা।

রিণির মত রঙ নেই, আমি কালো। তবু ভাবলাম, তুমি তো রঙ দেখতে চাও না—

তুমি কাঁপছ সরসী।

মনের জোরে কুলোচ্ছে না। কি মনে হচ্ছে জানো? ছুটে গিয়ে খাটে তোষক গদির নীচে ঢুকে পড়ি। কিছু ভাবা আর করার মধ্যে কত তফাৎ! তখন থেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি না ডাকলে দরজা খুলতেই পারতাম না।

তুমি বড় সুন্দর সরসী।

চুপ। ওসব বলো না। দম আটকে মরে যাব।

মরবে না, শোন। তোমার শরীর এমন সুন্দর বলে তোমার মনটাও সুন্দর। তোমায় এখন আমি প্রণাম করতে পারি, জানো?

অনির্বচনীয় আনন্দে রাজকুমারের চিত্ত ভরিয়া যায়, নিরবসন্ন সক্রিয় শান্তির মত এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে। শক্তি ও সহিষ্ণুতার যেন সীমা নাই। শ্রদ্ধা, মমতা, কৃতজ্ঞতা আর সহানুভূতি মেশানো যে মনোভাব সরসীর প্রতি জাগে প্রেমের চেয়ে তা বোধ হয় কম জোরালো নয়। সরসী তাকে বোঝে, বিশ্বাস করে। ব্যাখ্যা করিয়া সরসীকে তার কিছু বুঝাইতে হয় নাই, রিণির কাছে তার বক্তব্যের ভাঙ্গাচোরা বিকৃত বিবরণ শুনিয়া সে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছে তাই মনে করিয়াছে যথেষ্ট। আর জেরা করে নাই, তর্ক তোলে নাই, নিজের হইয়া ওকালতি করার যন্ত্রণা তাকে দেয় নাই, বিনা ভূমিকায় নিজের দেহটি তাকে দেখিতে দিয়াছে। সরসী ছাড়া আর কেউ তা পারিত না।

সরসীর মুখ বিবর্ণ হইয়াই ছিল, ধীরে ধীরে কখন আপনা হইতে তার চোখ বুজিয়া যায়, আর খোলে না।

এবার যাও সরসী।

তোমার কাজ হয়েছে? এসেছি যখন, মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে লাভ হবে না। আর দু'তিন মিনিট কোন রকমে সইতে পারব।

আর দরকার নেই।

সরসী শোয়ার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না কিন্তু বুঝা যায় দরজার কাছেই সে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় দম নিতেছে।

এবার তুমি যাও রাজুদা। আজ আর তোমায় মুখ দেখাতে পারব না।

আচ্ছা।

লছমনকে ডেকে দিয়ে যেও।

আচ্ছা। সরসী ?

না-না-না। বলো না রাজুদা। রাস্তায় নেবে গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে তোমার ভয় হল সরসী ? সামনে থেকে সরে গিয়ে ? আমি অন্য কথা বলছিলাম।

কি কথা ?

আমি কাউকে ভালবাসি না।

সে তো আমিই তোমাকে বলেছি একটু আগে।

তুমি বললে কি হবে, আমি তো জানতাম না। আজ জানতে পেরেছি। তোমায় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যাই। তোমার শরীর আর মন শুধু সুন্দর নয়, তুমি ভাল, তোমার বেঁচে থাকা সার্থক। তুমি আমাকে উঁচুতে তুলে দিয়েছ। তোমার সাহায্য না পেলে কোনদিন হয়তো সেখানে উঠতে পারতাম না সরসী। তুমি আমার আরেকটা উপকার করেছ সরসী। গিরির ব্যাপারটা জানো ?

জানি।

ব্যাপারটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু শকটা কোনমতে কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। একটা জ্বালা বরাবর থেকে গিয়েছিল। তুমি আজ জ্বালাটা দূর করে দিলে। মনে মনে কতখানি কষ্ট পাচ্ছিলাম এতদিন ভাল বুঝতে পারিনি, এখন মন শান্ত হয়েছে, এখন বুঝতে পারছি। কোন মেয়ের সংস্পর্শে এলেই আপনা থেকে মনে হত, এও গিরির জাতের জীব, এর মধ্যেও নিশ্চয় খানিকটা গিরির উপাদান আছে। তোমার সম্বন্ধে পর্যন্ত তাই মনে হ'ত। যুক্তি দিয়ে বুঝতাম অন্য রকম, কিন্তু কিছুতে চিন্তাটা ঠেকাতে পারতাম না। তুমি আজ আমার বিকারটা কাটিয়ে দিয়েছ সরসী।

একটু দাঁড়াও রাজুদা, যেও না।

কয়েক মিনিট পরে সাধারণ একটি শাড়ী পরিয়া ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে দিয়া সরসী এ ঘরে আসিল।

জোরে জোরে মাইল খানেক হেঁটে আসি চলো ? আজ রাতে নইলে ঘুম আসবে না।

রাজকুমার ভাবে, কারো কাছে সে কি কোনদিন কোন অপরাধ করে নাই,

পৃথিবী অথবা স্বর্গ অথবা নরকবাসী কারো কাছে?—যে অপরাধের অনুভূতি তাকে যন্ত্রণা দিতে পারে, যার প্রতিক্রিয়ায় জীবজগতে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে কারও উপরে একটু বিদ্বেষের জ্বালা অনুভব করিতে পারে?

রাগ নাই, অভিমান নাই। একটি মানুষের উপরেও নয়। জড় বস্তুকেও মানুষ কখনো হিংসা করে, হোঁচট লাগিলে অন্ধ ক্রোধে ইটের উপর পদাঘাত করে, কারাগারের লোহার শিক ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু মানুষ নিষ্ক্রিয় নির্জীব পুতুল হইলে একটি পুতুলের মুখ তার পছন্দমত নয় বলিয়া যতটুকু বিরক্তি বোধ করা চলিত, তাও সে বোধ করে না। মানুষের মনের অন্ধকার ও দেহের শ্রীহীনতার অপরাধ সে ক্ষমা করিয়াছে। মানুষ যে কৃপণ তাতে তার কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ, মানুষের কাছে সে কিছু চায় না।

এই নির্বিকার ঔদার্য যেন জীবনের সেরা সম্পদ, কুড়াইয়া পাইয়াছে। দূর হইতে দিনের পর দিন শুধু চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন ধনীর দুলালের খেলনাটি বস্তি-বাসী শিশুর হাতে আসিলে সে যেমন আনন্দে পাগল হইয়া ভাবে, জীবনে তার পাওয়ার আর কিছুই বাকি নাই, আর্ত শান্তি আহরণের সৌভাগ্যে বিপরীত আনন্দের উন্মাদনায় রাজকুমারেরও তেমনি মনে হইতে থাকে, এবারে সে তৃপ্তি পাইয়াছে, সম্মুখে তার পরিতৃপ্ত জীবন।

সকলে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে রাজু? ডার্বি জিতেছ?

একে জিতেছি।—রাজকুমার দেখাইয়া দেয় নিজেকে, কখনো বুকের ডাইনে কখনো বাঁয়ে আঙ্গুল ঠেকাইয়া।

যে কাছে আসে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করে, নদীতে জোয়ার আসার মত এত স্পষ্টভাবে সে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনোরমা বিস্মিত হয়, আশা করিবে কি হতাশ হইবে ভাবিয়া পায় না। আশাভঙ্গের ভয়টাই হয় বেশী। কালীর জন্য যদি বদলাইয়া গিয়া থাকে রাজকুমার, তাকে কিছু না বলিয়াই কি বদলাইত? এখন শুধু এইটুকু আশা করা চলে যে তাকে কিছু না বলিলেও কালীর সঙ্গে হয়তো তার কোন কথা হইয়াছে, হয়তো অন্য কিছু ঘটিয়াছে। অন্য কিছু কি আর ঘটিবে, হয়তো কালীকে একটু আদর করিয়াছে রাজকুমার এবং কি করিবে না করিবে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়া সুখী হইয়াছে। এবার সময়মত একদিন তার কাছে কথাটা পাড়িবে।

মনে মনে মনোরমা কিন্তু মাথা নাড়ে। রাজকুমারের খুসী হওয়া যেন সে রকম নয়। সে শান্তই ছিল চিরদিন, আরও শান্ত হইয়াছে, শুধু চোখেমুখে

ফুটিয়াছে জ্যোতি, কথা ও ব্যবহার হইয়াছে নির্ভয় নিশ্চিন্ত সুখী মানুষের আনন্দময় সহজ আত্মপ্রকাশ। একটু তো উত্তেজনা থাকা উচিত ছিল আনন্দে, কালীকে চায় কি চায় না এ সমস্যার মীমাংসা যদি তার হইয়া গিয়া থাকে, সুরু যদি হইয়া থাকে কালীকে পাওয়ার দিন গোণা? কালীকে সে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে কালী, কি হয়েছে রে?

জিজ্ঞাসা করে অনেক বুদ্ধি খাটানো খানিকটা ভূমিকার পর। সে আর কালী ছাড়া রান্নাঘরে কেউ নাই, তবু হাত ধুইতে ধুইতে কালীকে সে শোয়ার ঘরে যাইতে বলে,—একটা কথা আছে। একটু দেরি করিয়া নিজে ঘরে যায়, দরজা সযত্নে ভেজাইয়া দেয়। তারপর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সুখবর প্রত্যাশা করার মত ব্যগ্রভাবে প্রশ্নটা করে। যদি কিছু ঘটিয়া থাকে কালীর মত বোকা মেয়েরও বুঝিতে বাকী থাকিবে না কোন্ বিষয়ে তার জানিবার আগ্রহ। মুখে কিছু না বলুক, কালীর মুখ দেখিয়াই সে সব বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু হায়, কালীর মুখে বিস্ময় ছাড়া আর কোন ভাব ফোটে না।

কিসের দিদি?

হতাশ ক্রোধে মনোরমা বলে, কচি খুকী তুমি, কিছু জান না। রাজু তোকে কিছু বলেনি? কিছু করে নি?

না তো?

না তো? বড় গর্বের কথা তোর, না? যা চেহারা, যা স্বভাব, কে তোকে পছন্দ করবে!

রাজকুমার আজকাল সকলের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। চেষ্টা না করিয়া কেউ আজকাল রাজকুমারকে কাছে পায় না। কাছে মানে পাশে বা সামনে নয়। সেভাবে কারো কাছ হইতে রাজকুমার নিজেকে দূরে সরাইয়া নেয় নাই। দেখা সাক্ষাৎ সকলের সঙ্গে যেমন চলিতেছিল প্রায় সেই রকমই বজায় আছে। যাদের সঙ্গে শুধু বাহিরের পরিচয় তারা বরং এমন কথাও ভাবে যে আরেকবারের আলাপে মানুষটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই বুঝি খানিকটা বাড়িয়া গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে তার পরিচয় ভূমিকা পার হইয়া জীবনের আনুষঙ্গিক দৃশ্যপট জানাজানিতে অন্ততঃ পৌঁছিয়াছে, যারা উচ্চারণ করার আগেই তার দু'চারটি মনের কথা এতকাল টের পাইয়া আসিয়াছে, চেষ্টা না করিলে তারাও আর মনের তার নাগাল পায় না, ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি তুচ্ছ একটি কথারও পুনরাবৃত্তি যেন হয় না কারও সঙ্গে তার দু'চার ঘণ্টার আলাপে।

তিন দিন তার সঙ্গে মালতীর দেখা হইয়াছে, দশ জনের মধ্যে এবং নির্জনে। তিনদিন নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়া মস্‌গুল মানুষটাকে মালতী দেখিয়াছে, কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারে নাই।

প্রথমেই এই চিন্তা তার মনে আসিয়াছিল, একি শ্যামলের জন্য ? শ্যামল আর তার সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া কি রাজকুমার হঠাৎ এভাবে বদলাইয়া গিয়াছে ? রাজকুমারের পরিবর্তনের কত সম্ভবপর কারণের কথাই সে ভাবিতে পারিত, কত রাগ আর অভিমান জাগিতে পারিত উপেক্ষার মত রাজকুমারের নির্বিকার খাপছাড়া ব্যবহারে, তার বদলে শ্যামলকে কারণ হিসাবে টানিয়া আনিয়া বুকটা তার ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। সত্যই যেন শ্যামলের সঙ্গে তার কিছু হইয়াছে, শ্যামল যেন নিছক তার বন্ধু নয়। শ্যামলের দিক হইতে ধরিলে হয়তো সে তা নয়। হয়তো কেন, মালতী ভাল ভাবেই জানে শ্যামলের মনকে বন্ধুর মন বলিয়া গণ্য করা শুধু ভুল নয়, নিষ্ঠুর অন্যায়। মাঝে মাঝে শ্যামলের জন্য আজকাল জ্বালা করিয়া চোখে তার জল আসে। আজ অপমান করিলেও কাল সে বই ফেরত নেওয়ার ছলে গম্ভীর মুখে বাড়ীতে আসে, বই হাতে পাওয়া মাত্র চোখ, তার ক্রুদ্ধ করুণ ছলছল আশ্চর্য চোখ, আড়াল করিতে অভিমানী শিশুর মত মুখ ফিরাইয়া মাথা উঁচু করিয়া গটগট করিয়া চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু ডাকিবামাত্র ফিরিয়া আসিয়া বলে, কি বলছ শীগগির বলো, আমার কাজ আছে। তবে এটা শুধু শ্যামলের দিক। সে তো কোনদিন তাকে প্রশ্রয় দেয় নাই,—কাছে আসিতে আর কথা বলিতে দেওয়া যদি প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। রাজকুমারের ভাবান্তর তার আর শ্যামলের সম্পর্কেরই কোন জটিল দুর্বোধ্য প্রতিক্রিয়া, প্রথমেই এ কল্পনা কেন তাকে চমকাইয়া দেয় ? তারপর সারাদিন উতলা করিয়া রাখে, নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করায় ? ক'দিন মালতী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে দারুণ কিন্তু সে যেন কেমন এক ধরণের যন্ত্রণা, উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনা আর আত্মহারা অবসাদের বেদনাহীন পীড়ন, গা পোড়ানো জ্বরে হাড় কাঁপানো শীতের মতো।

আজ শ্যামল আসিবে। কাল মালতী নিজে তাকে আসিতে বলিয়াছে। শ্যামলের সঙ্গে তার সিনেমায় যাওয়ার কথা আছে। বাহিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হওয়ার কথা সে ভাবিতেছে, হঠাৎ তার মনে হইল, এভাবে চলিতে পারে না, এভাবে রাজকুমারকে দূরে সরিয়া যাইতে দেওয়া অন্যায়,—তারও অন্যায়, রাজকুমারেরও অন্যায়। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া শুধু উতলা হইলে তার চলিবে না। আজ রাজকুমারকে তার কাছে পাওয়া চাই। শ্যামল যখন আসিল, রাজকুমারের

সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়া মালতী সবে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়াছে।

উৎসাহে শ্যামল অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও মালতী, দেরী হয়ে গেছে।

আমি যাব না!

কেন? লক্ষ্মী চলো। প্লিজ।

কি আশ্চর্য, বলছি তোমার সঙ্গে যাব না, রাজুদার সঙ্গে আমার দরকার আছে, জোর করে নিয়ে যাবে তুমি আমায়?

জোর করে—?

যাব না—তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না কোনদিন। কেন তুমি আমায় জ্বালাতন কর?

আমি তো কিছুই করিনি মালতী?

করনি? দিন রাত পেছনে লেগে আছ তুমি আমার, কিছু করনি? এই যে তাকিয়ে আছ অমন করে, এটা কিছু করা নয় এই যে তর্ক করছ, এটাও কিছু করা নয়—তুমি কিছুই কর না, বড় ভাল ছেলে তুমি। যেতে বলছি, চলে যাও না? তোমার কি মান অপমান জ্ঞান নাই? এত অপমান করি, কিছুতেই তোমার অপমান হয় না?

তুমি আমায় কখনো অপমান করনি!

করিনি? হাজারবার করেছি। অন্য কেউ হলে—

রাগের মাথায় কখনো দু'চারটে কথা বললে, তাকে অপমান বলে না। আসতে বারণ করে নিজেই আবার আসতে বলেছ।

আমি আসতে বলেছি? ছুতো করে তুমি নিজে এসেছো।

ছুতোগুলি তুমি মেনে নাওনি কেন? বই নিতে এসেছি, বইনিয়ে চলে যেতে দিলেই চুকে যেত? দু'চার দিনের বেশী তো আর ছুতো করে আসতে পারতাম না, আপনা থেকে আমার আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত।—মালতীর সঙ্গে কলহ বাধিলে চিরদিন শ্যামলের কথা জড়াইয়া গিয়াছে, আজ তাকে চাপা গলায় ধীরে ধীরে অপরিচিত ভঙ্গিতে কথা বলিতে শুনিয়া মালতীর হঠাৎ কেমন ভয় করিতে লাগিল। শ্যামল ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। রাগে সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তবু সে এত আস্তে এত স্পষ্টভাবে কথা বলিতেছে কি করিয়া?

থাকগে। ওসব কথা থাক শ্যামল।

না, থাকবে না।

মালতী ভীরু চোখ তুলিয়া শ্যামলের মুখের দিকে তাকায়। শ্যামলের চোখে কি হইয়াছে—অমন করিয়া তার দিকে সে তাকায় কেন?

রাজকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর শ্যামলের সম্পর্কে মালতীর মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। নিজে সে যাচিয়া রাজকুমারকে জানাইয়া দিয়াছিল, শ্যামলের সঙ্গে তার সিনেমায় যাওয়ার কথা আছে, শ্যামল এখনই তাকে নিতে আসিবে, কিন্তু রাজকুমারের সঙ্গে সে আজ সন্ধ্যাটা কাটাইতে চায়। ভাবিয়াছিল, শ্যামলকে বাতিল করিয়া তার সঙ্গ চায় শুনিয়া রাজকুমার নিশ্চয় খুসী হইবে। খুসী সে হইয়াছিল কিনা ভগবান জানেন, শ্যামলের সঙ্গেই সিনেমায় যাওয়ার জন্য তাকে রাজী করাইতে কত চেষ্টাই যে রাজকুমার করিয়াছিল! শ্যামলের মনে নাকি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, শ্যামল তাকে ভালবাসে। শেষে রাজকুমার বলিয়াছিল, ওকে অন্ততঃ মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়ে দাও মালতী, মনে যেন দুঃখ না পায়। আমার কাছে আসছ ওকে জানিয়ে দরকার নেই। ওর সম্বন্ধে আমার ভয় আছে মালতী, মাথাপাগলা ছেলে তো, কখন কি করে বসে। তার সঙ্গে সন্ধ্যা যাপনের জন্য রাজকুমারকে রাজী করাইতে রীতিমত চেষ্টা করিতে হওয়ায় মালতীর গা জ্বালা করিতেছিল, এসব কথা শুনিতে শুনিতে তার মনে হইয়াছিল শ্যামলের চেয়ে বড় শত্রু বুঝি তার নাই। হয়তো ঈর্ষাতে নয়, শ্যামলের মনে কষ্ট দেওয়ার ভয়েই রাজকুমার তাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাকে উপেক্ষা করিতেছে। শ্যামল রাজকুমারের পরিবর্তনের কারণ। তাকে ভালবাসিয়া শ্যামল তার সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে।

মিষ্টি কথার বদলে অতি কড়া ভাষাতেই শ্যামলের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া সে তাই বাতিল করিয়া দিয়াছে। রাজকুমারের সঙ্গে তার দরকার আছে একথাটা জানাইয়া দিতেও কসুর করে নাই। এখন শ্যামলের রকম দেখিয়া তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। এতক্ষণ বিশ্বাস করে নাই, এবার মনে হইতে লাগিল রাজকুমার হয়তো ঠিক বলিয়াছে, শ্যামল ভয়ানক কিছু করিয়া বসিতে পারে।

শ্যামল বলিতে থাকে,—তুমি হয়তো সত্যি আমায় অপমান করেছ, বাঁদর নাচিয়েছ, আজ তাড়িয়ে দিয়ে কাল আবার ডেকে পাঠিয়ে পোষা কুকুরের মত খেলা করেছ আমার সঙ্গে। করে থাকলে বেশ করেছ। আমি বোকা, বোকাই থাকতে চাই, আমার যা ইচ্ছা তাই আমি বিশ্বাস করব। তবে তোমাকে আর জ্বালাতন করব না মালতী, প্রতিজ্ঞা করছি। তুমি আর টেরও পাবে না শ্যামল

বলে কেউ এ জগতে আছে। সত্যি বলছি মালতী, কাল থেকে তুমি ধরে নিতে পারবে, আমি বেঁচে নাই।

তার মানে? এসব কি বলছ? কি করবে তুমি? শক্ত করিয়া শ্যামলের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত চোখে তার পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মালতী শিহরিয়া উঠিল, এই সব উদ্ভট মতলব জাগছে তোমার মাথায়। আমি আগেই জানতাম তুমি একটা ভীষণ কাণ্ড না করে থামবে না। তোমার মত যারা ছেলেমানুষ হয়, চিরকাল তারাই লেকে ডুবে, সায়ানাইড খেয়ে জগতের ওপর শোধ নেয়—তোমার মত যারা ভীরু আর কাপুরুষ!

আরও জোরে মালতী শ্যামলের হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, ছাড়িয়া দিলেই সে যেন সঙ্গে সঙ্গে লেকে গিয়া ডুব দিবে অথবা কলেজের লেবরেটারীতে গিয়া সায়ানাইড গিলিবে,—তোমায় একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। এই যে মতলব তুমি করেছ—আগে শুনে নাও আমার কথা—এর মানে তো এই যে আমি অন্যের হয়ে যাব, তুমি তা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারবে না? আমার জন্যই মরবে তো তুমি? কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখছ, আমাকেও তুমি কি ভাবে মেরে রেখে যাবে, এক মুহূর্তের জন্য আমি শান্তি পাব না? আমি কি করে বাঁচব বলতো? আমায় ভালবাস বলে তোমায় মরতে হবে—আমাকে শাস্তি দিয়ে! একে ভালবাসা বলে নাকি? আমায় পেলে না বলে মরতে পারবে, আমার সুখের জন্য বেঁচে থাকার কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না!

শ্যামল মৃদুস্বরে বলিয়াছিল, তা বলি নি মালতী। সায়ানাইড খাওয়ার কথা বলিনি। আমি বলছিলাম, আর তোমায় জ্বালাতন করব না, দূরে সরে যাব।

শুধু দূরে সরে যাবে?

হ্যাঁ, তোমায় আর বিরক্ত করব না।

ও!

মালতী নিশ্চিন্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মুখ দেখিয়া কিন্তু মনে হইয়াছিল সে যেন আহত হইয়াছে, অপমানও বোধ করিয়াছে। যাকে ছেলেমানুষ মনে করিয়া রাখা যায় তার কাছে ছেলেমানুষি করিয়া ফেলার লজ্জায় রাগও কি কম হয় মানুষের!

আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না মালতী!

মালতী চুপ করিয়া ছিল। শ্যামল তাকে বুঝিতে পারে না, রাজকুমার তাকে বুঝিতে পারে না, সে নারী, সে রহস্যময়ী। শ্যামল তাকে পূজা করে, রাজকুমার

তাকে অবজ্ঞা করে, কারণ সে নারী, সে রহস্যময়ী, তাকে কেউ বুঝিতে পারে না!

আমার একটা কথা রাখবে মালতী?

অত ভূমিকা কোরো না। কি কথা?

একমাস বাইরে কোথাও ঘুরে আসবে?

তোমার সঙ্গে?

না। তুমি একা। কোন আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে যাও। পুণায় তোমার মাসীমার কাছে অনায়াসে যেতে পার। যাবে?

তখন মালতীর মনে হইয়াছিল, শ্যামল যেন আর ছেলেমানুষ নাই, ছোট ছোট আবেগে নিজেকে সে খরচ করিয়া ফেলে না, কখন সে যেন পরিণত পুরুষ হইয়া গিয়াছে, ধীর সংযত আত্মপ্রতিষ্ঠ তেজী পুরুষ, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পুরুষ, হাসি কান্না আনন্দ বিষাদের রসজ্ঞ পাকা অভিনেতা। ঠিক কি অনুভূতি তখন তার জাগিয়াছিল আর আনুষঙ্গিক আরও কি সব কথা মনে হইয়াছিল পরে মালতী কোনদিন স্মরণ করিতে পারে নাই। ওই কয়েক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা শুধু তার মনে ছিল, নূতন চিন্তা আর অনুভূতির যেটা ফলাফল, পরবর্তী প্রক্রিয়া। সে অভিজ্ঞতা বড় অদ্ভুত। শ্যামল নিষ্ঠুর, রাজকুমারের চেয়ে নিষ্ঠুর। রাজকুমার কি নিষ্ঠুর? যাকে আপন করতে চাই সে ব্যথা দিবেই, প্রিয় নিষ্ঠুর হইবেই— কারণ জগতে কেউ আপন হয় না, কেউ প্রিয় থাকে না চব্বিশ ঘণ্টা। একদিন রাজকুমার যখন শুধু তার চোখে চোখে চাহিয়াছিল, পলক না ফেলিয়া যতক্ষণ চাহিয়া থাকিবার ক্ষমতা মানুষের আছে ঠিক ততক্ষণ, মালতীর আর্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। এ সহজ সুবোধ্য কথা। কোলের শিশুকেও তো মার মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর মনে হয়। কিন্তু গুরুজনের মত তাকে সহর ছাড়িয়া দূরে কোথাও গিয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়ার সময় শ্যামলকে দেখিবার কয়েকটি মুহূর্তে এ কি অভিজ্ঞতা তার জন্মিয়া গেল যে রাজকুমারের চেয়ে শ্যামলের নিষ্ঠুরতা গভীর ও মর্মান্তিক? তার আঙ্গুলে গোলাপের কাঁটা ফুটিলে যে শ্যামলের মনে হয় তো লক্ষ কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা হয়।

আমার ভালর জন্য বলছ, তোমার কোন স্বার্থ নেই কেমন?

এবার শ্যামল চুপ করিয়া ছিল।

তুমি যাও শ্যামল। আমি বেরুবো।

আমার সঙ্গেই চলো?

তোমার সঙ্গে যাব না।

কখন ফিরবে ?

তুমি আমায় পাগল করে দেবে। যেতে বলছি, যাও না ?

যাচ্ছি মালতী !

যাচ্ছি বলিয়াও শ্যামল মিনিট দুই দাঁড়াইয়াছিল।

আর আসব না তো ?

তার মানে ?

তুমি যদি সত্যি বারণ কর, তা হলে আর আসব না।

মালতী হতাশ ভাবে এতক্ষণ পরে বসিয়া পড়িয়াছিল।

তোমার সঙ্গে সত্যি পারলাম না শ্যামল। কি যে করি তোমাকে নিয়ে আমি ! আমি জানি তুমি একটা ছুতো খুঁজছ, নাটক করার মত খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে আমি সত্যি সত্যি তোমাকে আসতে বারণ করব, তুমি ও আমার হৃদয়হীনতায় আহত হয়ে চলে যাবে, আর আসবে না। প্রথমদিন ভাববে আমি রক্তমাংসের মানুষ নই, পরদিন ভাববে আমি মাটি, পরদিন পাথর, পরদিন লোহা, পরদিন ইস্পাত—বেশ মজা হবে, না ? সব ব্যাপারকে একেবারে চরমে না তুললে কি তোমার চলে না ? তুমি জান ওভাবে তোমাকে আমি যেতে বলতে পারি না। তুমি বোধ হয় ভাব যে মেয়েরা যার সঙ্গে লভে পড়ে তাকে ছাড়া সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সুখ পায় ?

আর কিছু বলতে হবে না মালতী। আমি যাচ্ছি।

শোন। তোমাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। আজ আমার সময় নেই, ক্ষমতাও নেই। কাল সন্ধ্যার পর একবার এসো।

আমাকে আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না, মালতী !

হবে। সব কথায় কথা বাড়াও কেন ? কাল এসো।

না এলে তুমি দুঃখিত হবে ?

শ্যামল ! ফের যদি তুমি আমার সঙ্গে এমনি কর কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

তারপর শ্যামল চলিয়া গেলে এমন শ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত আর অসহায় মনে হইয়াছিল নিজেকে, আধ ঘণ্টা মালতী চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। এখন আবার রাজকুমারের সঙ্গে বুঝাপড়া বাকী আছে। শেষ বুঝাপড়ার কি আছে, কিছুই সে জানে না। কিন্তু আর তার সহ্য হয় না। এই অনির্দিষ্ট অসহ্য-হওয়ার প্রতিকার চাই। এ ভাবে আর চলে না, চলিতে পারে না। হয়

রাজকুমার তাকে লইয়া যাক সমুদ্রতীরের কোন বন্দরে, পাহাড়ের মাথায় কোন সহরে, মাঠের ধারের কোন গ্রামে, সেখানে সন্ধ্যা হইতে তাকে বুকে তুলিয়া এত জোরে পিষিতে থাক যেন শেষ রাত্রে তার দম আটকাইয়া যায়, নয়তো তাকেই অনুরোধ করুক জোরে তার গলা জড়াইয়া ধরিতে যাতে আর রাজকুমার নিঃশ্বাস নিতে না পারে। তার দুর্বোধ্য অর্থহীন যন্ত্রণার মত এইরকম খাপছাড়া ভয়ানক কিছু ঘটুক।

রাজকুমার প্রতীক্ষা করিয়া আছে, সে যাচিয়া দেখা করিতে চাহিয়াছে বলিয়া রাজকুমার তার জন্য রাস্তার ধারে একটা বিলাতী দোকানের লাল বাড়ীর সামনে গাড়ী-বারান্দার নীচে ফুটপাতে দাঁড়াইয়া তার প্রতীক্ষা করিতেছে, ক্রমাগত এই কথাটা মনে পড়িতে পড়িতে মালতীর মস্তিষ্কে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার পাক-খাওয়া কমিয়া আসিল। জীবনে মালতী একবার নাগরদোলায় চড়িয়াছিল, দশ এগার বছর বয়সে। তার দুর্দশা পৌঁছিয়াছিল সেই সীমায় যার পরেই মূর্চ্ছা গিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। উঠিয়া জামা কাপড় বদলানোর সময় আজ তার মনে হইতে লাগিল, এই মাত্র সে যেন নাগরদোলা হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সে জানিত না, সম্প্রতি রাজকুমারেরও একদিন এই রকম মনে হইয়াছিল।

রাজকুমার বলিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছিলাম মালতী, দেখতে দেখতে একটা অন্যায় করে ফেলেছি।

সে কি ?

এদিক থেকে একজন মহিলা আসছিলেন, সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবেন। যখন কাছাকাছি এলেন, আমি বুঝতে পারলাম তিনি আশা করছেন আমি একটু পিছু হটে তাকে পাশ কাটাবার আরেকটু যায়গা দেব। ভদ্রতা করে একপা পিছু হটতে গিয়ে আরেকজনের পা মাড়িয়ে দিলাম, ছোটখাট একটু ধাক্কাও লাগল। যার পা মাড়িয়ে দিলাম তিনি ঠিক মহিলা নন, কমবয়সী একটি বিদেশী মেয়ে।

তারপর ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বুঝলাম অন্ততঃ গালে একটা চড় সে মারবেই। আমি অ্যাপলজি পর্যন্ত চাইলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কুড়ি কি বাইশ সেকেণ্ড। তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল। কি বলে গেল জান ?—সরি।

তারপর ?

তারপর আবার কি ?

তোমার চোখের দিকে কুড়ি-বাইশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকেই মেয়েটার রাগ জল হয়ে গেল কেন বুঝিয়ে বলবে না ? ওটাই তো আসল কথা,—গল্পের মরাল। আচ্ছা আমিই বলছি শোন। ভুল হলে করেক্ট করবে। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল, মানুষ ভাল, মানুষ কখনো অন্যায় করে না, সমস্ত অন্যায় আপনি ঘটে যায়—ওগুলি জীবনের অ্যাক্‌সিডেণ্ট। ঠিক হয় নি ?

মালতী আজ রাজকুমারকে খোঁচা দিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে। মালতীর পক্ষে এটা একেবারে অসম্ভব বলিয়া জানিত কিনা রাজকুমার, তাই অনেকদিন পরে আজ ভাল করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—মুখের ভাব না দেখিয়া কোনো কথার মানে বুঝা যায় না অনেক সময়। সহরের সৌখীন প্রান্তর ডিঙ্গাইয়া শেষ বেলার রোদ তাদের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাপের চেয়ে সে রোদের রঙ বেশী। মালতীর বিবর্ণ মুখে সত্যই তার কথার ব্যাখ্যা ছিল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেছে ?

না। অসুখ করেনি।

বাড়ীতে না ডেকে এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে বললে কেন মালতী ?

বাড়ীর বাইরে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল তাই। হয় নিজের বাড়ীতে নয় অন্য কারো বাড়ীতে তোমার সঙ্গে এতদিন কথা বলেছি। আমায় একদিন সিনেমায় পর্য্যন্ত তুমি নিয়ে যাওনি আজ পর্যন্ত।

রাজকুমার একটু ভাবিল।

সাড়ে ছ'টার সময় স্যার কে, এল-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। পিওন দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এমন করে লিখেছেন দেখা করার জন্য, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে। স্যর কে, এল-কে ফোন করে দি', সাড়ে ন'টার সময় বাড়ী গিয়ে দেখা করব। তারপর সিনেমায় যাবে তো চলো।

না। আগে দেখা করে হাঙ্গামা চুকিয়ে এসো।

তুমি এতক্ষণ কি করবে ?

আমি ? এক কাজ করা যাক, হোটেলে একটা রুম নাও। তুমি স্যর কে, এল-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবে, আমি বিশ্রাম করব—শুয়ে থাকব একটু।

তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, মালতী !

ছেলেমানুষ নই ?

আগে ছিলে, এখন কি আর তোমায় ছেলেমানুষ বলা যায় ? তুমি অনেক কষ্ট

পেয়েছ মালতী ! আজ থেকে তুমি সুখী হবে।

শুনিয়া মালতীর ভয় করিতে থাকে। সুখ-দুঃখের কথা সে কখনো ভাবে নাই। সুখে অথবা দুঃখে কোনদিন তার সচেতন হইতে খেয়াল থাকে নাই আমি সুখী অথবা আমি দুঃখী। নিজের সম্বন্ধে নিজের বিচারে এই হিসাবটা তার চিরদিন বাদ পড়িয়াছে। একটা অজানা মধ্যবিত্ত ফিরিঙ্গি হোটেলের একটি ঘরে তাকে রাখিয়া রাজকুমার স্যর কে, এল-এর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলে নিজেকে মালতীর বড় অসহায় মনে হইতে থাকে। অপরিচিত আবেষ্টনীতে নিজেকে একা মনে করিয়া নয়, বাঁচিয়া থাকার মত সহজ স্বাভাবিক ব্যাপারটা হঠাৎ অতি বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া। তার নিজের একটা জীবন আছে, জীবন যাপনের কঠিন আর জটিল কর্তব্য তাকে পালন করিতে হইবে, কিন্তু সে কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। তার বুদ্ধি নাই, সাহস নাই, অভিজ্ঞতা নাই। রাজকুমার যাই বলুক, সে সত্যই ছেলেমানুষ, এতকাল শুধু ছেলেখেলা করিয়াছে, ছেলেখেলা করা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা তার নাই। জীবন তো ছেলেখেলার ব্যাপার নয় !

হোটেলটি বড় রাস্তা হইতে খানিকটা তফাতে, পথের শব্দ কানে আসে না। হোটেলটিও ছোট এবং প্রায় নিঃশব্দ। হোটেলের লোক খাটে দু'জনের বিছানায় ফর্সা চাদর পাতিয়া পাশাপাশি দু'টি করিয়া বালিশ রাখিয়া গিয়াছে। ছোট গোল চায়ের টেবিলের দু'দিকে দু'খানা চেয়ার ! চারটি বড় বড় জানলায় এমন কৌশলে পর্দা দেওয়া যে ঘরের মধ্যে আলো আসে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি আসে না। দেয়াল যেন সবুজ রঙে গম্ভীর হইয়া আছে। ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধনের আয়োজনের অভাব মালতীর অসম্পূর্ণতার অনুভূতিকে জোরালো করিয়া তোলে। আয়নায় যে মালতীকে দেখা যায় তাকে মালতীর মনে হয় অন্য একটি মেয়ে।

শেষ মুহূর্তে রাজকুমার মালতীকে একা রাখিয়া স্যর কে, এল-এর সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, মালতী রাজী হয় নাই।

না, সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে এসো। আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর মনে মনে ভাববে রিণির বাবা কি জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমার তা সইবে না।

তা ভাবব না মালতী ! ওটুকু মনের জোর আমার আছে।

মনের জোরের কথা নয়।

রাজকুমার চলিয়া যাওয়ার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে মালতী অস্থির হইয়া উঠিল। সময় যে এত শ্লথ, শুইয়া বসিয়া ঘরের মধ্যে পাক দিয়া আর ক্রমাগত

কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটির দিকে চাহিয়া সময়কে যে কিছুতেই তাড়াতাড়ি পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া যায় না, আজ যেন সে তা জানিতে পারিল প্রথম। অথচ মনে মনে সে কামনা করিতে লাগিল, রাজকুমারের ফিরিতে যেন দেরী হয়। অনেক দেরী হয়।

ফিরিয়া আসিতে রাজকুমারের সত্যই দেরী হইয়া গেল।

স্যার কে, এল-এর আফিস বেশী দূরে নয়, টাক্সিতে পৌছিতে রাজকুমারের পাঁচ সাত মিনিটের বেশী সময় লাগিল না। আপিসের লোকজন অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে, কেবল তিনজন কেরাণী তখনো ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিতেছে। নিজের ঘরে স্যার কে, এল পাইপ কামড়াইয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন আর ঘরের কোণে টাইপরাইটের সামনে চুপচাপ বসিয়াছিল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে। বয়স তার রিণির চেয়ে হয় তো বেশী নয় কিন্তু মুখে অনেক বেশী বয়সের ছাপ।

বসো রাজু।

স্যার কে, এল নিজেই বসিলেন।

তুমি এখনো যাও নি যে মিস রেড্‌ল্ ?

স্যার কে, এল নিজেই তাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, মনে ছিল না। মিস রেড্‌ল্ চলিয়া গেলে রাজকুমারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, একটা চিঠি টাইপ করাব বলে ওয়েট করতে বলেছি, এক ঘণ্টার বেশী চুপচাপ ওয়েট করছে! একবার যে মনে করিয়ে দেবে সেটুকু সাহস নেই। খাঁটি ইংরেজ মেয়ে হলে, ইংরেজ কেন, বাঙ্গালী মেয়ে হলে, কখন খেয়াল করিয়ে দিত, চিঠিও টাইপ করানো হত আমার। যাক্‌গে।

মুখে যাকগে বলিলেও বাজে চিন্তাগুলিকে যাইতে দিয়া সহজে কাজের কথা কিন্তু তিনি আরম্ভ করিতে পারেন না। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করেন তার এক দুঃসাহসী টাইপিষ্টের কথা, মাসের শেষে যে ওভারটাইম চার্জ করিয়া তার কাছে বিল পাঠাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবশ্য বিদায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সেটা তার দুঃসাহসের জন্য নয়।

নিজের পাওনা বুঝে নেবার সাহস সকলের থাকবে, আমি তাই পছন্দ করি রাজু। তুমি তো জানো আমাকে, জানো না? আমার প্রিন্সিপাল্ হল, কারো ওপর অন্যায় না করা। তাই বলে অভদ্রতাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আমি তাকে অপিস টাইমের পর থাকতে হুকুম দিই নি, অনুরোধ করেছিলাম।

একেবারে বিল না পাঠিয়ে সেও যদি আমাকে—যাকগে।

রাজকুমার বুঝিতে পারে যে ব্যাপার সহজ নয়। এতক্ষণ স্যর কে, এল শুধু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, দরকারী চিঠি টাইপ করানোর জন্য টাইপিষ্ট বসাইয়া রাখিয়া তার উপস্থিতি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাকে দেখিয়া এখন ভয়ানক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রাণপণে সেটা দমন করার চেষ্টা করিতেছেন। নিজেকে একটু আয়ত্তে না আনিয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার সাহস তাঁর হইতেছে না। তাকে এমন কি বলার থাকিতে পারে রিণির বাবার যা বলা তাঁর পক্ষে এত কঠিন? রিণির মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে স্যর কে, এল-এর পরিচয়, ইদানীং কেবল সে পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, বয়স হইতে শুরু করিয়া অর্থ সম্মান শিক্ষাদান চালচলনের পার্থক্য সত্বেও পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সহানুভূতির একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, এই মাত্র। স্যর কে, এল-এর জীবনে কোন অঘটন ঘটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

হঠাৎ রাজকুমারের মনে হয়, যা ঘটিয়াছে সেটা স্যর কে, এল-এর ব্যক্তিগত কিছু নয়, কেন্দ্র নিশ্চয় রিণি। নিজের জীবনে স্যর কে, এল-এর এমন কিছু ঘটিতে পারে না তাকে যা না বলিলে তাঁর চলে না এবং বলিতে গিয়া এমন নার্ভাস হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু রিণি? কি হইয়াছে রিণির?

রিণি কেমন আছে? অনেকদিন দেখা হয় নি রিণির সঙ্গে।

রিণিও তাই বলছিল। তুমি আর যাও না?

রাজকুমার একটু অস্বস্তির সঙ্গে স্যর কে, এল-এর মুখের দিকে তাকায়। রিণির কথা তোলা মাত্র তাঁর মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, অতি ধীরে ধীরে তিনি কাগজ-কাটা ছুরির ডগা দিয়া রেখা আঁকিয়া চলিয়াছেন ব্লটিং প্যাডের একপ্রান্ত হইতে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। তাঁর কথা, ভঙ্গি ও মুখের ভাবের কোন মানেই রাজকুমার বুঝিতে পারে না। রিণি কি স্যর কে, এল-এর কাছে তার সেই অভদ্র অনুরোধের কথা বলিয়া দিয়াছে? স্যর কে, এল কি সেইজন্য তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? কিন্তু সে যখন আর রিণিকে বিরক্ত করিতে যায় না, পায়ে পড়িয়া তাকে অপিসে ডাকিয়া পাঠাইয়া সে কথা তুলিবার তো কোন অর্থ হয় না।

পরশু রিণি আমাকে সব বলেছে রাজু।

রাজকুমার চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রিণি সব বলিয়াছে। ভাল কথা। স্যর কে, এল তাকে কি বলিবেন? উপদেশ দিবেন? গালাগালি? লজ্জা, ভয়, আপসোস কিছুই রাজকুমার বোধ করে না, রিণির উপর রাগও হয় না। রিণির

মন তার অজানা নয়। সে মনে কত খেয়াল, কত ঝোঁক, কত জিদ, আর কত আত্মপীড়নের পিপাসা আছে সে তার পরিচয় রাখে। এরকম মন যাদের হয়, জীবনকে জটিল করাই তাদের ধর্ম। কোনদিন যদি অসাধারণ কিছু ঘটে জীবনে, সেই ঘটনার জের টানিয়া চলিতে চায় সারা জীবন, প্রেমে অথবা বিদ্বেষে সমাপ্তিতে অস্বীকার করিতে চায়, কারণ, আগেই অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ফেলায় শেষ হইতে দিলেই এখন তাদের লোকসান।

বন্ধু একদিন তার অনাবৃত দেহ দেখিতে চাহিয়াছিল, একি রিণি ভুলিতে পারে অথবা বন্ধুর সঙ্গে শুধু সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াই এমন একটা ব্যাপারকে শেষ হইতে দিতে পারে! স্যর কে, এল রাজকুমারকে পছন্দ করেন? রাজকুমার যে কি ভয়ানক মানুষ তার প্রমাণ দিয়া বাপের ধারণার নাটকীয় পরিবর্তন না ঘটাইয়া রিণি থাকিতে পারিবে কেন? রাজকুমারের প্রতি স্যর কে, এল এর ক্রোধ ও বিদ্বেষ জাগিবে, অতীতে বিলীন হইয়া যাওয়ার বদলে জের টানা চলিতে থাকিবে রাজকুমারের অসভ্যতার, রিণির হৃদয় মনে নূতন করিয়া ছোঁয়াচ লাগিবে উত্তেজনার। আগে হয় তো রাজকুমারের জ্বালা বোধ হইত, গিরির হাত টানার ব্যাপারে যেমন হইয়াছিল। এখন সে রিণির জন্য মমতাই বোধ করে। নিজের জন্য অকারণে যন্ত্রণা সৃষ্টি করার এই নেশা চিরদিন মেয়েটার জীবনে অভিশাপ হইয়া থাকিবে।

তোমার সম্বন্ধে আমার অন্য ধারণা ছিল, রাজু। আমার একটা অহঙ্কার আছে, আমি মানুষ চিনতে পারি। এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা, তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলাম, তুমি এত বড় রাস্কেল। সোজাসুজি কয়েকটা কথা আলোচনা করার জন্য তোমাকে তাই ডেকে পাঠিয়েছি।

আলোচনা করে লাভ কি হবে?

রিণি আমার মেয়ে রাজু। আমার আর ছেলে-মেয়ে নেই!

এ কথাটা কেন বললেন বুঝতে পারছি না।

স্যর কে, এল পাইপটা মুখে তুলিয়া কামাড়াইয়া ধরিলেন, তারপর আবার নামাইয়া রাখিলেন।

তুমি সব অস্বীকার করতে চাও?

না, অস্বীকার করতে চাই না। রিণির সঙ্গে অভদ্রতা করেছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। আমার কি উদ্দেশ্য ছিল বলে লাভ নেই। আপনি বুঝতেও পারবেন না, বিশ্বাসও করবেন না।

অভদ্রতা ! কি বলছ তুমি ?

রাজকুমার কিছুই বলিল না। রিণির সঙ্গে তার ব্যবহারের সংজ্ঞা লইয়া কি স্যর কে, এল তর্ক করিতে চান ? বলিতে চান ওটা অভদ্রতার চেয়ে আরও খারাপ কিছু ?

ফাঁসির ভয় না থাকলে তোমায় আমি খুন করতাম রাজু। তুমি রিণির যা ক্ষতি করেছ সে জন্য নয়, তোমার এই মনোভাবের জন্য। রিণির কাছে সব শুনেও তোমায় আমি একা দোষী করিনি। রিণি ছেলেমানুষ নয়, তারও উচিত ছিল নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। দু'দিন ধরে আমি ক্রমাগত নিজেকে কি বুঝিয়েছি জানো ? কেবল তুমি আর রিণি নও, আরও অনেক ছেলে-মেয়ে এ রকম ভুল করেছে, রিণি আমার মেয়ে বলেই আমার মাথা খারাপ করলে চলবে না, ভুল করলে চলবে না। রিণিকে তুমি বিয়ে করবে কি না, না করলে কেন করবে না, খোলাখুলি ভাবেই এই কথা জিজ্ঞেস করব বলে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এক বছর একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করা যখন তোমার কাছে শুধু অভদ্রতা, তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। তোমাকে বলা বৃথা, তবু বলছি, যদি পার স্যুইসাইড কোরো। তোমার মত মন নিয়ে কারো বেঁচে থাকা উচিত নয়। আচ্ছা, এবার তুমি যাও রাজু।

কথা বলিতে রাজকুমারের সাহস হইতেছিল না। রিণি সব বলিয়াছে যা ঘটে নাই, যা ঘটিতে পারিত না। কিছুই বলিতে বাকী রাখে নাই ! কেন বলিয়াছে ? কি চায় রিণি ? তার উদ্দেশ্য কি ? যতই বিকার থাক মনে, রিণি তো পাগল নয়। তাকে জড়াইয়া বাপের কাছে এই অদ্ভুত অকথ্য কাহিনী সে বলিতে গেল কেন ? তাকে সে পাইতে চায়, বিবাহের মধ্যে, চিরদিনের জন্য ? কিন্তু তাকে পাওয়ার জন্য এই উদ্ভট উপায় অবলম্বন করিবে কেন ? রিণি তো কোনদিন জানিতেও দেয় নাই, তাকে তার চাই।

যদি ধরা যায় তখন রিণিও নিজেকে জানিত না, সেদিনকার রাগারাগির পর এতদিনের অদর্শনে তার খেয়াল হইয়াছে, নিজেই তাকে ক্ষমা করিয়া তাকে তো সে কাছে ডাকিতে পারিত, চেষ্টা করিতে পারিত তাকে জয় করার। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, তাকে পাওয়ার আর কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইলে রিণি যদি এই পাগলামি করিত, তার একটা মানে বুঝা যাইত।

তোমায় যেতে বলেছি রাজু।

কাল আমি একবার রিণির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

স্যর কে, এল সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, কেন ?

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।—আপনার সঙ্গে কথা বলার আগে রিণির সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। এমন তো হতে পারে, আপনি সব কথা জানেন না, রিণি আপনাকে সব বলতে পারে নি ? আপনি ধরে নিন, রিণি আর আমার মধ্যে কয়েকটা ভুল বোঝা আছে, ধরে নিয়ে কাল তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন।

ব্লটিং প্যাডের দিকে চাহিয়া স্যর কে-এল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটু অপেক্ষা করিয়া রাজকুমারও নীরবে বাহির হইয়া গেল।

পথে নামিয়া মালতীর কাছে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাওয়ার জন্য রাজকুমার ট্যাক্সি ডাকিল না, ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিতে লাগিল। দেহে মনে সুন্দর সরসীকে আশ্রয় করিয়া সে যে আনন্দের জগতে উঠিয়া গিয়াছিল, সেখান হইতে আবার মাটিতে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। চলিতে চলিতে রাজকুমারের মনে হয় সে কি সত্যই কিছু পাইয়াছিল, আনন্দ অথবা শান্তি ? এখন তো তার মনে হইতেছে, কয়েকটা দিন সে শুধু অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

চলিতে চলিতে মালতীর কথা ভাবিয়া রাজকুমার শ্রান্তি বোধ করে। কি মধুর ছিল মালতী-সম্পর্কে তার গুরুতর কর্তব্যের কল্পনা কয়েক মুহূর্ত আগে ! মালতীকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে মালতী কি চায়। জীবনের স্রোতে ভাসিয়া চলিতে চলিতে একটি বিচ্ছিন্ন ফুল অস্থায়ী বাধায় আটকাইয়া গিয়াছে, ভাবিতেছে এইখানে বুঝি তার ভাসিয়া চলার শেষ, আবার তাকে ভাসিয়া যাওয়ার সুযোগ দিতে হইবে তার নিজস্ব পরিণতি, স্থায়ী সার্থকতার দিকে। এই কাজটুকু করিবে ভাবিয়াই নিজেকে রাজকুমারের দেবতা মনে হইতেছিল। ভীরু দুর্বল মানুষের মত এখন তার মনে হইতে থাকে, মালতীর মুখোমুখি হওয়া একটা বিপদ, মালতীকে কিছু বুঝানোর চেষ্টা বিপজ্জনক সম্ভাবনায় ভরা।

অবিশ্বাস্য, তবু সত্য। মালতী যে ঘরে তার প্রতীক্ষা করিতেছিল তার রুদ্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার সময় রাজকুমার পুর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল যে, দরজার ওপাশে মালতীর স্পর্শ ছাড়া আর সমস্তই অর্থহীন। কথা অবশ্য সে বলিতে পারে যত খুসী, কিন্তু কথার কোন মানে থাকিবে না। স্যার কে, এল-এর স্যাম্পেনের বোতল খোলার আওয়াজের মত কথা হইবে শুধু তৃষ্ণার সঙ্কেত, পানীয়ের আহ্বান।

আজ হঠাৎ নয়, চিরদিন এমনি ছিল, মনের অনেক দরজার ওপাশে অনেক মালতীর স্পর্শ। এইমাত্র শুধু সেটা জানা গেল। আকাশের মেঘে সে বাসা বাঁধিয়াছিল, সেখান হইতে নামাইয়া আনিয়া রিণি তাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাই জানা গেল। সন্দেহ করার ভরসাও তার নাই। অভিজ্ঞতার মত এভাবে যা জানা যায় তাতে কি আর ভুলের সুযোগ থাকে? একটি রহস্য শুধু এখন বিস্ময়ের মত জাগিয়া আছে যে, মালতী কেন?, যার জন্য নিজের স্নেহকে একদিন ভালবাসা মনে হইয়াছিল, সে কেন? রিণি আর সরসী থাকিতে মালতী কেন এ অভাবনীয় রূপকে পরিণত হইয়া গেল?

চুলোয় যাক। মালতীকে দুয়ার খুলিবার সঙ্কেত জানাইবার পর মালতী দুয়ার খুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত কয়েক মুহূর্ত রাজকুমার ভাবিয়াছিল—চুলোয় যাক। কি আসে যায় মালতী যদি শ্যামলকে ভালবাসে আর সেই ভালবাসাই তাকে ঠেলিয়া দেয় তার পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজকুমারের দিকে, রাজকুমারকে সে শুধু ভালবাসিতে চায় বলিয়া, রাজকুমারকেই তার ভালবাসা উচিত এই ধারণা পোষণ করে বলিয়া? এ তো সর্বদাই ঘটিতেছে। ভালবাসিবার দুরন্ত ইচ্ছা যে ভালবাসা নয় এ জ্ঞান অনেকের যেভাবে আসিয়াছে মালতীরও সেভাবে আসুক—আজ রাত্রি শেষে, অথবা আগামী কাল। সে নিজে অবশ্য সব জানে। কিন্তু জানা কথা না জানার ভাণ করা নিজের কাছে এমন কি কঠিন? তার ফরমূলা তো বাঁধাই আছে—আজিকার রাত্রি স্মরণীয় হোক, কাল চুলোয় যাক।

ঘরের ভিতরে গিয়া এ ভাবটা অবশ্য তার কাটিয়া গেল। কিন্তু জড়ের গতিবেগের মতই আবেগের গতি, বেগ থামিবার পরেও গতি হঠাৎ থামে না। আপনা হইতেই খানিকটা আগাইয়া চলে।

খাটে বসিয়া রাজকুমার বলে, দেরী হয়ে গেছে, না?

মালতী অস্ফুট স্বরে বলে, হ্যাঁ।

একলা কষ্ট হচ্ছিল?

আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

রাজকুমার এতক্ষণে মালতীর দিকে তাকায়। দেয়ালে নীচু ব্র্যাকেটে আলো জ্বলিতেছে, মেঝে আর ওপাশের দেয়ালে মালতীর ছায়া পড়িয়াছে, ছায়ায় তার শাড়ীর বিন্যাস ও অবিন্যাস স্পষ্টতর। পিছনের দেয়ালের পট-ভূমিকায় মালতীকে দেখাইতেছে মনের ক্যামেরায় তোলা পুরাণো ফটোর মত অস্পষ্টতার রহস্যে রহস্যময়ী—আধ-ভোলা স্মৃতি যেন ঘিরিয়া আছে তাকে। তাড়াতাড়ি কয়েকবার

চোখের পলক ফেলিয়া রাজকুমার নিজের চোখের জলীয় ভ্রান্তিকেই যেন মুছিয়া দিতে চায়, তারপর হারাণো গোধূলির নিষ্প্রভ দিগন্তে সোণার থালার মত নতুন চাঁদকে উঠিতে দেখিয়া শিশু যেভাবে চাহিয়া থাকে তেমনি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতে থাকে মালতীকে। সরসীকে তার মনে পড়িতেছে, হৃদয়-সাগর মন্থনে উত্থিতা উর্বশী সরসীকে। সে যেন কতদিনের কথা, রাজকুমার যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। তেমনি অনবদ্য নগ্নতার প্রতিমূর্তির মত মালতীকে ওইখানে, যেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে কৃত্রিম আলোয় সাজানো পুতুলের মত, দাঁড় করাইয়া দু'চোখ ভরিয়া তাকে দেখিবার জন্য রাজকুমারের হৃদয় উতলা হইয়া উঠে। দেহে মনে আবার সে যেন সেদিনের মত নবজীবনের, মহৎ আনন্দের সঞ্চার অনুভব করে। তার আশা হয়, সরসীর মত মালতীও আজ তাকে সমস্ত শ্রান্তি ও ক্ষোভ ভুলাইয়া দিতে পারিবে, আবার নিরুদ্বেগ মুক্তি জুটিবে তার, আবার সে উঠিতে পারিবে তার আকাশের আবাসে, যে কুলায় ছাড়িয়া নিজের ইচ্ছায় সে নামিয়া আসে নাই।

নিজের অজ্ঞাতসারে রাজকুমার উচ্চারণ করিতে থাকে, মালতী! মালতী! পথহারা শ্রান্ত মুমূর্ষু শিশু যেভাবে তার মাকে ডাকিয়া কাতরায়।

কিন্তু মালতী শুধু মাথা নাড়ে। রাজকুমার বুঝিতে পারে-না, আবার আবেদন জানায়। মালতী মাথা নাড়ে আর আঁচলের প্রান্ত দিয়া নিজেকে আরেকটু ঢাকিতে চেষ্টা করে। কথা যখন সে বলে তার কণ্ঠস্বর শোনায় কর্কশ।

মালতী বলে, শোন। আমার কেমন যেন লাগছে।

কেমন লাগছে মালতী?

গা গুলিয়ে বমি আসছে।

ক্রোধ, বিরক্তি আর বিষাদে রাজকুমারের অনুভূতির আধারে ফেনিল আবর্তের সৃষ্টি হয়। তীব্র সঙ্কীর্ণ বেদনার পুনরাবৃত্তিময় সংক্ষিপ্ত আবেদন ক্ষণিকের নির্বিকার শান্তিতে লয় পায় আর আর্তনাদ করিয়া ওঠে। সে অনুভব করে, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে অনুভব করে, ভয় ও শ্রদ্ধার বশ্যতা, কাব্য ও স্বপ্নের মোহ, আবেগ ও উত্তেজনার তাগিদ, কিছুই মালতীকে ভুল করিতে দিবে না। তার দিকে মালতীর গতি বন্ধ করিয়া কোনদিকে তাকে চলিতে হইবে দেখাইয়া দিবার কথা সে যা ভাবিয়াছিল, তার কোন প্রয়োজন ছিল না। মালতী আর আগাইবে না। সে ডাকিলেও নয়, হাত ধরিয়া টানিলেও নয়। শুধু আজ নয়, চিরদিন এই পর্যন্তই ছিল মালতীর ভুলের সীমা। ভুল কি ভুল নয়, তাও হয়তো মালতী জানে না, এখনো হয়তো সে ধরিয়া রাখিয়াছে আজ রাত্রেই তার প্রিয় মিলনের রাত্রি, কিন্তু

রাজকুমার দু'বাহু বাড়াইয়া দিলে সে আসিয়া ধরা দিবে না।

মালতীর সম্বন্ধে এ যে তার কল্পনা নয় সে বিষয়ে রাজকুমারের এতটুকু সন্দেহ থাকে না, অশোকতরুমূলে ক্লেশপাণ্ডুরবর্ণা অধোমুখী সীতার দিকে চাহিয়া দেবতা ব্রহ্মা আর রাক্ষসী নিকষার পুত্র রাবণ যে যন্ত্রণায় অমরত্বের প্রতিকার চাহিত, রাজকুমারও তেমনি যন্ত্রণা ভোগ করে। রাবণের তবু মন্দোদরী ছিল, জীবনে রাবণ তবু ভালবাসিয়াছিল সেই একটি-মাত্র নারীকে, একটু যে ভালবাসিবে রাজকুমার এমন তার কেউ নাই। তা ছাড়া, তার সীতাকে সে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রায় গায়ের জোরের মতই ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে ছল বল কৌশল করিয়া রাখিয়া এতদিন সে মালতীকে হরণ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ ভাবিয়াছিল তার মনটি পর্যন্ত মুক্ত করিয়া শ্যামলকে ফিরাইয়া দিবে। এই উদারতার কল্পনাটুকু পর্যন্ত তার মিথ্যা, অকারণ অহঙ্কার বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল!

নিছক অহঙ্কার, অতি সস্তা আত্ম-তৃপ্তি, নিজেকে কেন্দ্র করিয়া শিশুর মত রূপ-কথা রচনা করা। মালতী কবে তার বশে ছিল যে আজ তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা সে ভাবিতেছিল? কোন দিন কিছু দাবী করে নাই বলিয়াই তার সম্বন্ধে মালতীর মোহ এতদিন টিঁকিয়া ছিল, দাবী জানানো মাত্র মালতী ছিট্‌কাইয়া দূরে সরিয়া যাইত, হয়তো ঘৃণা পর্যন্ত করিতে আরম্ভ করিত তাকে।

বাড়ী যাবে মালতী?

একটু শুয়ে থাকি। বড় অস্থির অস্থির করছে।

রাজকুমার বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে মালতী গিয়া শুইয়া পড়িল।

দরজা বন্ধ করে' এতক্ষণ ঘরে বসে ছিলাম বলে বোধ হয়।

তা হবে।

মিছিমিছি রুমটা নেওয়া হল।

তাতে কি।

সাতটা টাকাই নষ্ট। কি চার্জ! এক রাত্রির জন্য একটা রুম, তার ভাড়া সাত টাকা! কে জানত হঠাৎ এমন বিশ্রী লাগবে শরীরটা?

ও রকম হয় মালতী!

এক হিসাবে ভালই হয়েছে। তুমি বেঁচে গেলে।

মালতীর ঠোঁটে এলোমেলো নড়াচড়া চলে, চোখের পাতা যেন ঘন ঘন ওঠে নামে চুলগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। তার শোয়ার ভঙ্গিতে গভীর অবসন্নতা। মহাকাব্যের শৃঙ্গারশ্রান্তা রমণীর বর্ণনা রাজকুমারের মনে পড়িয়া যায়।

রাজুদা—একটা কথা বলি শোনো। তুমি কি ভাববে জানি না। আমি একটা বিশ্রী উদ্দেশ্য নিয়ে আজ এসেছিলাম। মানে, আমার উদ্দেশ্য ভারি খারাপ ছিল।

বল কি, ভারি আশ্চর্য কথা তো!

মালতীর বিবর্ণ মুখে রঙের প্লাবন আসিয়া আটকাইয়া রহিয়া গেল।

তা নয়। ঠিক তা নয়। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে তা হলে তুমি বাধ্য হয়ে বিয়ে করবে।

কেন? নাও তো করতে পারতাম।

তামাসা করছ? এই কি তোমার তামাসার সময় হল? আমার এদিকে মাথা ঘুরছে, কি ভাবছি কি বলছি বুঝতে পারছি না—রাগ করেছ নাকি? তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ। তাই এমনি ভাবে ছাড়া ছাড়া কথা বলছ—রাগ হয়েছে তোমার।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তার রাগের চিহ্ন খুঁজিতে খুঁজিতে মালতী একেবারে উঠিয়া বসে।

রাগ করেছ কেন? তুমি তো জানো তুমি যা চাইবে তাই হবে, আমি কথাটি বলব না। সত্যি বলছি, বিয়ের কথা আর মনেও আনব না। এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম একলাটি ঘরে বসে। তুমি যখন ওসব অনুষ্ঠান পছন্দ কর না, আমার কাজ নেই বাবা বিয়ে ফিয়েতে। কিন্তু, মালতীর গলায় করুণ মিনতির সুর ফুটিয়া উঠিল, আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে। বলো রাখবে?

কি কথা মালতী?

এক রাত্রির জন্য রুম নিয়ে নয়, চলো আমরা কোথাও চলে যাই দু'জনে, মাস তিনেকের জন্যে। অন্ততঃ দু'মাস। কিছুদিন এক সঙ্গে এক বাড়ীতেই যদি না রইলাম—

আজ রাত্রিকে বাতিল করার সমর্থনে এই জোরাল যুক্তি মালতী আবিষ্কার করিয়াছে। আরম্ভ হওয়ার আগেই কাব্য প্রেম স্বপ্ন আর কল্পনা শুধু মনের উদ্বেগ আর দেহের অস্থিরতায় যে পরিণতি হইয়া গেল তার তো একটা কারণ থাকা চাই? সে কারণটি এই। একটি বিচ্ছিন্ন রাত্রির অসম্পূর্ণ ভাঙ্গা প্রেম তার ভাল লাগিবে না। কাল সকালে ছেদ পড়িবে ভাবিয়া মিলনকে সে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, শুধু এই কারণে দেহমন তার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারকে সে ভালবাসে বৈ কি?

রাজকুমার নীরবে একটু হাসিল। ভাবিল, মালতী তার অর্থহীন হাসির

যা খুসী মানে করুক, কিছু আসিয়া যায় না। মালতীর সঙ্গে বুঝাপড়ারও কোন প্রয়োজন নাই। মালতী একদিন নিজেই বুঝিতে পারিবে। মালতীর পক্ষে সেভাবে সব বুঝিতে পারাই ভাল।

পরদিন ছুটি ছিল, সকালে কয়েকটি বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিল। রাজকুমার বেকার, তার ছুটিও নাই। একটু সে ঈর্ষা বোধ করিল, বন্ধুদের জীবনে কাজের দিনগুলির মধ্যে ছুটির দিন সত্যসত্যই অনেকখানি পৃথক্ হইয়া আসে বলিয়া। অনেক বেলায় সরসীও আসিয়া হাজির। যত বড় বড় ঘটনাই ঘটুক সরসীর জীবনে, কোন দিন তার মনে কিছু ঘটে না, কোনদিন সে বদলায় না, চিরদিন সে একরকম থাকিয়া গেল। আজও তার প্রকাণ্ড একটা মিটিং আছে। রাজকুমার যেন নিশ্চয় যায়। একটু প্রস্তুত হইয়াই যেন যায়, কিছু বলিতে হইবে।

সেদিনের মত কেলেঙ্কারি কোরো না।

কেলেঙ্কারি করেছিলাম নাকি সেদিন?

প্রায়। শেষটা সামলে গেলে তাই রক্ষা। ঘরোয়া মিটিং ছিল বলে সামলে নেবার সুযোগ পেলে, পাবলিক মিটিং হলে আগেই লোকে হাসতে আরম্ভ করত।

তা হইবে। সেদিন মস্ত একটা বাহাদুরী করিয়াছে এ ধারণাটা এতদিন বজায় রাখিতে না দিয়া আগে সরসী এ খবরটা দিলে ভাল হইত।

রিণির কি হয়েছে জানো? সরসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল।

কি হয়েছে?

আমি তো তাই জিজ্ঞেস করছি। বাড়ী থেকে নাকি বার হয় না, কারো সঙ্গে দেখা করে না। পরশু গিয়েছিলাম, দরজা বন্ধ করে ঘরে কি যেন করছিল, দরজা খুলল না, ভেতর থেকেই আমায় বসতে বলল। বসে আছি তো বসেই আছি, দরজা আর খোলে না। দু'বার ডাকলাম, সাড়া ও দিলে না। শেষে আমি যখন ডেকে বললাম, আমার কাজ আছে আমি চললাম, একটা যাচ্ছেতাই জবাব দিলে।

কি বললে?

সে আমি উচ্চারণ করতে পারব না।

আমার সম্বন্ধে কোন কথা?

না। তোমার সম্বন্ধে কি কথা বলবে? একটা বিশ্রী ফাজলামি করলে, একেবারে ইতরামি যাকে বলে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, কালীর সঙ্গে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করিয়া সরসী

চলিয়া গেল। সরসীকে কালী পছন্দ করে না, রাজকুমারের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে দেখিলেই তাঁর মুখ কালো হইয়া যায়। এক মিনিটের বেশী কাছে থাকিতে পারে না কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কাছে আসে। সরসী আর রাজকুমারের মুখের দিকে তাকায়, ঠোঁট কামড়ায়, হঠাৎ একটা খাপছাড়া কথা বলে, দুপদাপ পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

সেদিন মনোরমার তিরস্কারের পর কালী কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। মনোরমা যতটুকু সাজাইয়া দেয় তার উপর সে নিজে নিজে আরেকটু বেশী করিয়া সাজ করে। গায়ে একটু বেশী সাবান ঘষে, মুখে একটু বেশী ক্রীম মাখে, একটু বেশী দামের কাপড় পরে।

সরসী চলিয়া যাওয়ামাত্র সে বলিল, এই মেয়েটা এলে আপনি পৃথিবী ভুলে যান।

এই মেয়েটা আবার কে কালী ?

যার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করলেন—আপনার সরসী ?

ওকে তুমি সরসীদি বলবে।

আমার বয়ে গেছে ওকে দিদি বলতে।

মুখ উঁচু করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া সিধা হইয়া কালী মূর্তিমতী বিদ্রোহের মত দাঁড়াইয়া থাকে, তার চোখ দুটি কেবল জলে বোঝাই হইয়া যায়। রাজকুমার অন্যমনে রিণির কথা ভাবিতেছিল, অবাক হইয়া সে কালীর দিকে চাহিয়া থাকে। এতটুকু মেয়ের মধ্যে ভাবাবেগের এই তীব্রতা সে হঠাৎ ঠিকমত ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না।

কি উদ্দেশ্যে এবং কেন কিছু না ভাবিয়াই; সম্ভবতঃ আহত সকাতর শিশুকে আদর করার স্বাভাবিক প্রেরণার বশে, কালীর দিকে সে হাত বাড়াইয়া দেয়। কালীর নাগাল কিন্তু সে পায় না, দু'হাতে তাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া কালী ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

সমস্ত দুপুর রাজকুমার বিষণ্ন হইয়া থাকে। বাহিরে কড়া রোদ, ঘরে উজ্জ্বল আলো, রাজকুমারের মনে যেন সন্ধ্যার ছায়া, আমাবস্যা রাত্রির ছদ্মবেশী আগামী অন্ধকার। একটা কষ্ট বোধও যেন সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রাত্রি জাগরণের পর যেমন হয়। রাত্রে সে তো কাল ঘুমাইয়াছিল, সমস্ত রাত ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে ?

বিকালে রাজকুমার রিণিদের বাড়ী গেল।

দারোয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল স্যর কে, এল, বাড়ীতেই আছেন, সারাদিন একবারও তিনি বাহিরে যান নাই। রিণির অসুখ, দু'বার ডাক্তার আসিয়াছিল।

অসুখ? নীচের হলে গিয়া দাঁড়াইতে রিণির ভাঙ্গা ভাঙ্গা গানের সুর রাজকুমারের কাণে ভাসিয়া আসে। তারপর হঠাৎ এত জোরে সে বাড়ীর দাসীকে ডাক দেয় যে তার সেই শেষ পর্দায় তোলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন ঘরের দেয়ালে, ঘরের বাতাসে, রাজকুমারের গায়ে আঁচড় কাটিয়া যায়। ডাক্তারকে দু'বার আসিতে হইয়াছিল রিণির এমন অসুখ! আগাগোড়া সবটাই কি রিণির তামাসা? কেবল তার সঙ্গে নয়, বাড়ীর লোকের সঙ্গেও সে কি খেলা করিতেছে—তার বিকারগ্রস্ত মনের কোন এক আকস্মিক ও দুর্বোধ্য প্রেরণার বশে?

ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া রিণিকে দেখিবামাত্র এ সন্দেহ তার মিটিয়া গেল। রিণির সত্যই অসুখ করিয়াছে। তার চুল এলোমেলো, আঁচল লুটাইতেছে মেঝেতে, মুখে ও চোখে একশ' পাঁচ ডিগ্রী জ্বরের লক্ষণ। অথচ শুইয়া থাকার বদলে সে অস্থির ভাবে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে। এক পাশে চেয়ারে মরার মত হেলান দিয়া বসিয়া স্যর কে, এল হতাশভাবে তার দিকে চাহিয়া আছেন।

রাজকুমারকে দেখিয়াও রিণি যেন দেখিতে পাইল না। কেবল স্যর কে, এল হঠাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া রাজকুমারের সামনে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইলেন, রাজকুমারকে কিছু যেন বলিবেন। তারপর একটি কথাও না বলিয়া নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন।

ছোট বুকসেল্‌ফটির কাছে গিয়া একটি একটি করিয়া বই বাছিয়া মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে রিণি গুনগুনানো সুর ভাঁজিতে লাগিল।

রিণি!

কে? অ! রিণি একটু হাসিল, বোসো না? বইগুলো একটু বেছে রাখছি—যত বাজে বই গাদা হয়েছে।

তোমার কি হয়েছে? জ্বর?

কিছু হয় নি তো।

রাজকুমার বসিল। বই থাক রিণি। এখানে এসে বোস।

রিণি চোখের পলকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—ছাখো, হুকুম কোরো না বলছি। একশোবার বলিনি তোমায়, আমার সঙ্গে নরম সুরে কথা কইবে? তোমরা সব্বাই আমায় নিয়ে মজা করো জানি, তা করো গিয়ে যা খুসী, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু

ভদ্রভাবে করবে—রেসপেক্টফুলি।—উঁ? তাই বটে, ভুলে গিয়েছিলাম। কি যেন বললে তুমি?

রাজকুমার অত্যন্ত নরম স্বরে বলিল, বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রিণি আসিয়া পাশে বসিবার পরেও রাজকুমার তার দিকে চাহিয়া থাকে, কোন্ অনুভূতি হৃদয়ে আলোড়ন তুলিয়াছে বুঝিতে পারে না। কাছে আসিবার পর এখন রিণির চোখ দেখিয়া সে যেন বুঝিতে পারে তার কি হইয়াছে। রিণির চাহনি স্পষ্ট ভাবেই তার কাছে সব ঘোষণা করিয়া দেয়, কিন্তু মনে মনে রাজকুমার প্রাণপণে সে সংবাদকে অস্বীকার করে। তার মনে হয়, রিণির সম্বন্ধে এই ভয়ঙ্কর সত্যকে স্বীকার করিলে তার নিজের মাথাও যেন খারাপ হইয়া যাইবে।

রিণি ব্লাউজের বোতাম লাগায় নাই, লুটানো কাপড় তুলিয়া রাজকুমার তার গায়ে জড়াইয়া দিল। রিণির সঙ্গে এখন কথা বলা না বলা সমান, কোন বিষয়েই তার সঙ্গে আলোচনা করার আর অর্থ হয় না। তবু তাকে বলিতে হইবে। রিণি সুস্থ আর স্বাভাবিক অবস্থাতে আছে ধরিয়া লইয়াই তার সঙ্গে তাকে আলাপ করিতে হইবে। নতুবা নিজে সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

তোমার বাবাকে ওসব বলতে গেলে কেন রিণি?

রিণির মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।—বাবাকে? কি বলেছি বাবাকে?

আমার সম্বন্ধে?

তোমার সম্বন্ধে? কই না, কিছুই তো বলিনি বাবাকে তোমার সম্বন্ধে? বাবার সঙ্গে আমি কথাই বলি না যে!

পলকহীন দৃষ্টিতে রিণি রাজকুমারের চোখের দিকে সোজা তাকাইয়া থাকে, তার মুখের ভাবের সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটে না। তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠে ক্রোধের অভিব্যক্তি।

দাঁড়াও ডাকছি বাবাকে।

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া বলে, থাক্, রিণি, থাক্। বারণ কাণে না তুলিয়া সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত আগাইয়া গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া রিণি স্যর কে, এলকে ডাকিতে থাকে, বাবা? বাবা? ড্যাডি? ড্যাডি?

স্যর কে, এল উপরে আসিতেই হাত ধরিয়া তাকে সে টানিয়া আনে রাজকুমারের সামনে, কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, রাজুদার নামে তোমায় আমি কি বলেছি বাবা?

স্যর কে, এল শান্ত কণ্ঠে বলেন, কই না, কিছুই তো বলনি তুমি?

বলেছি। রাজুদা আমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড, তাই বলেছি। নিন্দে করে কিছু বলিনি। বলেছি বাবা ?

না। বল নি।

নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকুমারের পাশে বসিয়া রিণি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া, বিড় বিড় করিয়া আরও কত কি সে বলিতে লাগিল বুঝা গেল না। একটু অপেক্ষা করিয়া স্যার কে, এল চলিয়া গেলেন।

রাজকুমার বলিল, একটু শুয়ে থাকবে রিণি ?

রিণি উদাস ভাবে বলিল, তুমি বললে শুতে পারি।

তোমার শরীর ভাল নেই, শুয়েই থাক। আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

তুমি আর আসবে না।

আসব, নিশ্চয় আসব।

বিনা দ্বিধায় রাজকুমার তাকে শিশুর মত দু'হাতে বুকে তুলিয়া বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। তার অনেক দিনের লিপষ্টিক ঘষা ঠোঁটে আজ শুকনো রক্ত মাখা হইয়া আছে। সন্তর্পণে সেখানে চুম্বন করিয়া সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে স্যার কে, এল টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিয়া ছিলেন, টেবিলে তার মাথার একদিকে একটি আধ খালি মদের বোতল অন্যদিকে শূন্য একটি গেলাস। রাজকুমারের সাড়া পাইয়া মুখ তুলিলেন।

নার্ভাস ব্রেক ডাউন ? রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

স্যার কে, এল মাথা নাড়িলেন।—ইনস্যানিটি।

ডাক্তার কি বললেন ?

এখন আর ওর বেশী কি বলবেন ? সারতেও পারে, নাও সারতে পারে। ভাল রকম এগজামিনের পরে হয়তো জানা যাবে।

পরস্পরের মাথার পাশ দিয়া পিছনের দেয়ালে চোখ পাতিয়া দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

তারপর স্যার কে, এল ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার আলমারি খুলে বোতল নিয়ে কদিন নাকি খুব ড্রিঙ্ক করছিল। কিছু টের পাইনি। ডাক্তার সন্দেহ করছেন খুব ধীরে ধীরে ইনস্যানিটি আসছিল, অতিরিক্ত ড্রিঙ্ক করার ফলে দু'চার দিনের মধ্যে এটা হয়েছে। রিণি ড্রিঙ্ক করত নাকি জানো ?

কদাচিৎ কখনো একটু চুমুক দিয়ে থাকতে পারে, সে কিছু নয়।

স্যার কে, এল-এর মাথা নীচে নামিতে নামিতে প্রায় গেলাসে ঠেকিয়,

গিয়াছিল তেমনি ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামে রিণি যা বলেছিল রাজু ?

সব কল্পনা।

তোমায় নিয়ে কেন ?

তা জানি না।

আবার দুজনে নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

রিণির জন্য সকলের গভীর সহানুভূতি জাগিয়াছে। খবর শুনিয়া মালতী তো একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল। রিণিকে কে পছন্দ করিত না এখন আর জানিবার উপায় নাই। একেবারে পাগল হইয়া রিণি শত্রু মিত্র সকলের জীবনে বিষাদের ছায়াপাত করিয়া ছাড়িয়াছে। দুঃখবোধ অনেকের আরও আন্তরিক হইয়াছে এইজন্য যে তাদের কেবলই মনে হইয়াছে, সকলের মন টানিবার জন্য রিণি যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে পাগল করিয়াছে। অহঙ্কারী আত্ম-সচেতন রিণিকে আর কেউ মনে রাখে না, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন শুধু মনে পড়ে কি তীব্র অভিমান ছিল মেয়েটার, আঘাত গ্রহণের অনুভূতি তার চড়া সুরে বাঁধা সরু তারের মত মৃদু একটু ছোঁয়াচেও কি ভাবে সাড়া দিত।

সরসী অত্যন্ত বিচলিতভাবে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করে, ও কেন পাগল হয়ে গেল রাজু ?

রাজকুমার নির্বোধের মত পুনরাবৃত্তি করে, কেন পাগল হয়ে গেল ?

সরসী তখন নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, না, তুমিই বা জানবে কি করে !

রাজকুমার নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসে।

—কিছুদিন আগে হলে তোমার প্রশ্নের জবাবে কি বলতাম জান সরসী ? বলতাম, রিণি কেন পাগল হয়েছে জানি, আমার জন্য !

তোমার জন্য ?

আগে হলে তাই ভাবতাম। ওরকম ভাবার যুক্তি কি কম আছে আমার ! তুমি সব জান না, জানলে তোমারও তাই বিশ্বাস হত।

সরসী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রাজকুমার অপেক্ষা করে, অনেকক্ষণ ! সরসী কিন্তু মুখ খোলে না।

বলে, কি সব জান না, জানতে চাইলে না সরসী ?

না।

বললে শুনবে না?

শুনব।

মালতীকে আমি পছন্দ করি ভেবে মালতীকে রিণি ইতিপূর্বে দু'চোখে দেখতে পারত না। একদিন নিজে থেকে যেচে আমার দিকে প্রত্যাশা করে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাথা খারাপ হবার গোড়াতে স্যার কে, এল, এর কাছে আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব কথা বলেছিল যে, পরদিন তিনি আমায় ডেকে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন, কেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করব না। এখন রিণি পাগল হয়ে গেছে, কারো কথা শোনে না, আমি যা বলি তাই মেনে নেয়। শুধু তাই নয়, অন্য সময় পাগলামি করে, আমি যতক্ষণ কাছে থাকি শান্ত হয়ে থাকে। আমার জন্যে যে ও পাগল হয়েছে তার আর কত প্রমাণ চাও?

তোমার জন্য পাগল হওয়ার প্রমাণ ওগুলি নয় রাজু! শ্রদ্ধা ভয় বিশ্বাসের প্রমাণ, হয়তো ভালবাসারও প্রমাণ।

হয়তো কেন?

ভালবাসার কোন ধরা-বাঁধা লক্ষণ নেই রাজু।

রাজকুমার কৃতজ্ঞতা জানানোর মত ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য মেয়ে সরসী। আমার বিবরণ শুনে অন্য কোন মেয়ের এতটুকু সন্দেহ থাকত না রিণি আমায় ভালবাসত আর মাথাটা ওর খারাপ হওয়ার কারণও তাই।

রিণি তোমায় ভালবাসত কিনা জানি না রাজু, তবে সেজন্য ওযে পাগল হয় নি তা জানি। একপক্ষের ভালবাসা কাউকে পাগল করে- দিতে পারে না, যতই ভালবাসুক। রিণির পাগল হওয়ার অন্য কারণ ছিল। তোমায় যদি রিণি ভালবেসে থাকে, মনে জোরালো ঘা খেয়ে থাকে, অন্য কারণগুলিকে সেটা একটু সাহায্য করে থাকতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। তোমার মত সাইকলজির জ্ঞান নেই, তবে এটা আমি জোর করে বলতে পারি। ডাক্তারও তো বলেছেন, ধীরে ধীরে ইনস্যানিটি আসছিল। তোমার দায়িত্ব কিসের? তুমি কেন নিজেকে দোষী ভেবে মন খারাপ করছ? তার কোন মানে হয় না।

ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সরসী শেষের দিকে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। আবেগ ও উত্তেজনা চিরদিন সরসীর চোখে মুখে অভিনব রূপান্তর আনিয়া দেয় এবং এই রূপান্তর তার ঘটে এত কদাচিৎ যে, আগে কয়েকবার চোখে পড়িয়া থাকিলেও রাজকুমারের মনে হয় হঠাৎ সরসীকে ঘিরিয়া অপরিচয়ের রহস্য নামিয়া আসিয়াছে।

আমি তো বললাম তোমায়, আমি জানি রিণি আমার জন্য পাগল হয় নি।

তবে তুমি এমন করছ কেন ?

সরসীর প্রশ্নে রাজকুমার আশ্চর্য হইয়া গেল।

কেমন করছি ?

একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়েছ তুমি। মুখ দেখে টের পাওয়া যায় ভয়ানক একটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছ। সবাই বলাবলি করছে এই নিয়ে। তোমার কাছে এ দুর্বলতা আশা করিনি রাজু।

সত্যি কথা শুনবে সরসী ? আমার মন ভেঙ্গে গেছে।

কেন ?

কেন তোমায় কি করে বুঝিয়ে বলব! আমি নিজেই ভাল করে বুঝতে পরি না। কেবল মনে হয় আমার জীবনের কোন সম্ভাবনা নেই, সার্থকতা নেই, আমি একটা ফাকি দাঁড়িয়ে গেছি। চিরদিন যেন ভাঙ্গা-চোরা মানুষ ছিলাম মনে হয়, এখানে ওখানে সিমেণ্ট করে বেঁধে ছেঁদে আস্ত মানুষের অভিনয় করছিলাম, এতদিনে ভেঙ্গে পড়েছি। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের কাছে লজ্জা বোধ করছি সরসী।

সরসী অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে বলে, আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে পার না রাজু ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারলাম না। অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলো।

রাজকুমার অনেকক্ষণ ভাবে। তার চোখ দেখিয়া সরসীর মনে হয়, মনের অন্ধকারে সে নিজের পরিচয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। চোখে তার আলোর এত অভাব সরসী কোনদিন দেখে নাই, এ যেন মুমূর্ষুর চোখ। সরসী শিহরীয়া উঠে। হাতের মুঠি সে সজোরে চাপিয়া ধরে ঠোঁটে, চোখ তার জলে ভরিয়া যায়। রাজকুমার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে প্রথম দিকের কথাগুলি সে শুনিতে পায় না।

রাজকুমার বলে, ঘুরিয়ে বলেও বোঝাতে পারব না সরসী। যদি বলি, ভেতর থেকে জুড়িয়ে যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি, ঠিক বলা হবে না। যদি বলি, বহুকাল থেকে আমি যেন ধীরে ধীরে স্যুইসাইড করে আসছি, তাও ঠিক বলা হবে না। আমার এই কথাগুলি কি ভাবে নিতে হবে জানো ? গন্ধ বোঝাবার জন্য তোমায় যেন ফুল দেখাচ্ছি।

কি ভাব তুমি ? মোটা কথায় তাই আমাকে বলো।

কি ভাবি ? ভাবি যে আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কেন। কারো সঙ্গে আমার বনে

না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সঙ্কীর্ণ জীবন, তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের, ঘৃণা বিদ্বেষের সম্পর্ক। কারো সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কি যেন বিকার আমার মধ্যে আছে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপ-ছাড়া, উদ্ভট। নাড়ী দেখব বলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেঙ্কারী করি, শুধু খেয়ালের বশে রিণি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে সেটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সৌন্দর্যের বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরীর সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল। বুঝতে পার না সরসী তোমাদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগটা কিরকম? তুমি কখনো আমার বিচার কর না, শুধু আমায় বুঝবার চেষ্টা কর, তোমার সঙ্গে তাই প্রাণ খুলে কথা বলি। শুধু ওইটুকু সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার। আমার সঙ্গে শুধু আমার কথা তুমি বলবে, তোমার যেন আর কাজ নেই। তোমার সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল কোনদিন দেখেছ আমার? তোমার সুখ দুঃখের ভাগ নেবার আগ্রহ দেখেছ কখনো? আমার প্রয়োজনে আমার জন্য তুমি একদিন আশ্চর্য সাহস আর উদারতা দেখালে তাই জানতে পারলাম তোমার দেহ মন কত সুন্দর। কিন্তু কৃতজ্ঞতা কই আমার?

কৃতজ্ঞতা চাইনি রাজু।

তুমি না চাও, আমার তো স্বাভাবিক নিয়মে কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত ছিল? ওটা যেন আমার প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছি। তাহলেই ছাখো, তুমি যে আমার কাছে এসেছ, সেটা শুধু বিনা বিচারে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমাকে তোমার গ্রহণ করার চেষ্টার পথে, অন্তরঙ্গতার পথে নয়। অন্য কেউ হলে আপনা থেকে তোমাকে বুঝবার চেষ্টা করত, পরস্পরের জানাবোঝার চেষ্টায় সৃষ্টি হত সুন্দর স্বাভাবিক বন্ধুত্ব। আমার সেটা কোনদিন খেয়াল পর্যন্ত হয় নি।

তুমি আমায় কখনো উপেক্ষা করনি রাজু।

কেন করব? আয়নাকে কেউ উপেক্ষা করে না।

সরসী নতমুখে নিজের আঙ্গুলের খেলা দেখিতে থাকে। আঁচলের প্রান্ত নয়, কোলের কাছে জড়ো করা কাপড়ের খানিকটা পাকাইয়া কখন সে যেন আঙ্গুলে জড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাগ করলে সরসী? স্পষ্ট করে বললাম বলে?

সরসী মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। রাগ করেছিলাম। তুমি জিজ্ঞেস করলে

বলে আর রাগ নেই। রাগ করি আর নাই করি তুমি স্পষ্ট করেই বলো—যত স্পষ্ট করে পার। রাজকুমার বলে, তোমার কথা আর বলব না। এবার মালতীর কথা বলি। মালতীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে জানো? শ্রদ্ধাকে ভালবাসা মনে করার সম্পর্ক। সোজাসুজি ভালবাসলে হয়তো ওকে কাছে আসতে দিতাম না, ভুলেই থাকতাম মালতী বলে একটা মেয়ে এ জগতে আছে। কিন্তু ভিত্তিটা যখন ভুলের, দু'দিন পরে ভুল ভেঙ্গে যাবে যখন জানি, জটিল একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হতে দিতে আমার বাঁকা মনের আপত্তি হবে কেন? তারপর ধর রিণি—

সরসী চেয়ারে পিছনে হেলান দিয়াছিল, সোজা হইয়া বসে। বুঝা যায় মালতীর চেয়ে রিণির কথা শুনতেই তার আগ্রহ বেশী।

রিণি যতদিন সুস্থ ছিল, আমার সঙ্গে বনত না। আমি কাছে গেলেই যেন কঠিন হয়ে যেত! পাগল হয়ে এখন রিণি সকলকে ত্যাগ করে আমায় আশ্রয় করেছে, আমি ছাড়া ওর যেন কেউ নেই। আগে ওকে আমার পছন্দ হত না, এখন ওর জন্য আমার মন কাঁদে। বিশ্বাস করতে পার সরসী? এমন সৃষ্টিছাড়া কথা শুনেছ কোনদিন? সাধারণ রিণির সঙ্গে নয়, পাগল রিণির সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

সরসী বলে, সৃষ্টিছাড়া কথা বলছ কেন? পাগল হয়েছে বলেই তো রিণির জন্য তোমার মমতা জাগা স্বাভাবিক।

রাজকুমার বলে, আমার নয় মমতা জাগল। কিন্তু রিণি? আমি এমন খাপছাড়া মানুষ যে পাগল হয়ে তবে রিণি আমায় সইতে পারল! চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর কথা বলে না? রিণি আমায় তাই দেখিয়েছে সরসী। সুস্থ মনে আমায় বন্ধু বলে গ্রহণ করিতে পারে নি, বিকারে শুধু আমায় চিনেছে।

সরসী কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলে, তাও যদি হয়, কথাটা তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন? খাপছাড়া হওয়াটা সব সময় নিন্দনীয় হয় না রাজু। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চিন্তাশীল প্রতিভাবান মানুষের খাপ না খাওয়াটাই বেশী স্বাভাবিক। সুস্থ অবস্থায় রিণি হয়তো তোমার নাগাল পেত না, তোমার ব্যক্তিত্ব ওকে পীড়ন করত, তাই ও তোমায় সহ্য করতে পারত না। পাগল হয়ে এখন আর ওসব অনুভূতি নেই, তোমায় তাই ওর ভাল লাগে, বিনা বাধায় তোমায় শ্রদ্ধা করতে পারে।

রাজকুমার ম্লানভাবে একটু হাসে। বলে, চিন্তাহীন প্রতিভাবান মানুষ।

চিন্তাগ্রস্ত নিউরোটিক মানুষ বললে লাগসই হত সরসী ! যত চেষ্টাই কর, আমার ট্র্যাজেডিকে আমার মহাপুরুষত্বের প্রমাণ বলে দাঁড় করাতে পারবে না, সরসী। নিজেকে আমি কিছু কিছু চিনতে পারছি।

সরসীর মধ্যে হঠাৎ উত্তেজনা দেখা দেয়, রাজকুমারের বাহুমূল চাপিয়া ধরিয়া সে বলে, পারছ ? তাই হবে রাজু। তাই হওয়া সম্ভব। নিজেকে জানবার বুঝবার চেষ্টা আরম্ভ করে তুমি দিশেহারা হয়ে গেছ। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তোমার কি হয়েছে।

সমুদ্রের সঙ্কেতে প্রতিবছর রাজকুমারের সালতামামী হয় ! দূরের সমুদ্র সহরে তার কাছে আসে। জীবনের কয়েকটা দিন ভরিয়া থাকে ভিজা স্পর্শ, আঁসটে গন্ধ আর বালিয়াড়ির স্বপ্ন। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয়, দীর্ঘকায়া চম্পকবর্ণা এক নারী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাঠ বন নদী গ্রাম নগর পার হইয়া আগাইয়া আসিতেছে, শ্রোণীভারে থম থম করিতেছে তার গগনচুম্বী রসটম্বুর দেহে স্তম্ভিত ছন্দের ঢেউ, কটিতটে সৃষ্টি হইয়াছে নূতন দিগন্তের বঙ্কিম রেখা, মুখ ফিরিয়া খেলা করিতেছে নিশ্বাসে আলোড়িত মেঘ। মনে হয়, আসিতেছে।

পাড়ার একটি ছেলে প্রায় প্রতি রাত্রে বাঁশী বাজায়, রাজকুমার শুধু শুনিতে পায় এই কয়েকটা দিন। একতলার রোয়াকে আর দোতলার বারান্দায় আস্ত ভাঙ্গা কয়েকটি টবের ফুলগুলি চোখে পড়ে, খেয়াল হয় যে পাতার রঙ সত্যই সবুজ। তবু সে বিশ্বাস করে না, মানিতে চায় না যে প্রত্যেক জীবনে আশীর্বাদ থাকিবেই, আশীর্বাদ কখনো ধ্বংস হয় না। নিজেকে সে ধমক দিয়া বলে, আমি অভিশপ্ত। বলে আর তুড়ি উড়াইয়া দেয় সালতামামীর সঙ্কেত ও নববর্ষের প্রেরণা।

ভাবিয়া রাখে, ঘনিষ্ঠভাবে কারো সংস্পর্শে সে আর আসিবে না, কারো জীবনে তার অভিশাপের ছায়া পড়িতে দিবে না। ভগবান জানেন তাকে কেন ওরা শ্রদ্ধা করে, তার প্রভাব ওদের জীবনে কাজ করে কেন। কিন্তু আর নয়। তার সঙ্গে মেলামেশা সহজ ও সহনীয় করিতে ওদের যখন বিকার আনিতে হয় নিজেদের মধ্যে, তার কাজ নাই মেলামেশায়। অন্য কারো সঙ্গে নয়, কালী মালতী আর সরসীর সঙ্গেও নয়।

মনোরমাকে সে বলে, কালীকে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দাও দিদি।

খোকা পাশে ঘুমাইয়া আছে, মনোরমার কোন অবলম্বন নাই। মাথা নীচু করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদুকণ্ঠে সে বলে, গোড়াতেই কেন বললে না

রাজুভাই ? একটা কচি মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে মজা লাগছিল ? বিয়ের যুগ্যি কনের জন্য একটা বর গাঁথতে তার মতলববাজ দিদি কেমন করে ফাঁদ পাতে সেই রগড় দেখছিলে ?

না, দিদি। গোড়া থেকে কালীকে আমার ভাল লেগেছিল।

মুখ তুলিয়া সাগ্রহে মনোরমা বলে, তবে ?

রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আগ্রহ তার আপনা হইতে ঝিমাইয়া যায়। আবার মুখ নীচু করিয়া খোকার বালিশ হইতে একটি পিঁপড়ে ঝাড়িয়া ফেলে, ধীরে ধীরে মেঝেতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলে, তোমার দোষ নেই রাজুভাই, আমার বোকামি হয়েছে। নিজের ইচ্ছেটাই আমি বড় করে দেখছিলাম। যদি বলি কালীর বিয়ের ভাবনা আমাদের ছিল না, বিশ্বাস করবে রাজু ভাই ? তুমি তো দেখে এসেছো, ওর বাবার অবস্থা খারাপ নয়। মেয়েটাকে সস্তায় তোমার ঘাড়ে চাপানো যাবে বলে চেষ্টা করিনি ভাই।

তা জানি দিদি। ওকথা আমার মনেও আসেনি।

ওর বয়সে আমিও ওর মত হাবাগোবা মেয়ে ছিলাম রাজুভাই।

কালী হাবাগোবা মেয়ে নয় দিদি। বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, পাকামি নেই বলে হাবাগোবা মনে হয়।

মনোরমা যেন শুনিয়াও শোনেনা আপন মনে বলিতে থাকে, এমন ঝোঁক আমার কেন চাপল কে জানে ! দিনরাত কেবল মনে হত, তোমার সঙ্গে ভাব হবে, বিয়ে হবে, কালীর জীবন সার্থক হবে, আমারও সুখের সীমা থাকবে না। মস্ত একটা ভার যেন নেমে যাবে মনে হত।

মনোরমাকে দেখিলে চমক লাগিয়া যায়। বিষাদ ও হতাশার যন্ত্রণায় মুখ যেন তার কালো হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। কালীর বদলে তাকেই যেন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে রাজকুমার, বুক তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হাড়-পাঁজর সমেত। মমতা বোধ করার বদলে তাকে রাজকুমারের আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়। তার সংস্পর্শে আসিয়া তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে কালীর কিশোর মনে বিকার আসিতেছে ভাবিয়া সে দুঃখ পাইতেছিল, কালীর মধ্যস্থতায় নিজের মনের আবছায়া গোপনতার অন্তরালবর্তিনী মনোরমা তার সঙ্গে কি অদ্ভুত যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়াছে ঢ্যাখো।

কালীর আবির্ভাবের আগের ও পরের মনোরমার অনেক তুচ্ছ কথা, ভঙ্গি, ভাব ও চাহনি, অনেক ছোট বড় পরিবর্তন, রাজকুমারের মনে পড়িতে থাকে।

মনে পড়িতে থাকে শেষের দিকে তার সমাদর ও অবহেলায় কালীর মুখে যে আনন্দ ও বিষাদের আবির্ভাব ঘটিত, কতবার মনোরমার মুখে তার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছে। কালীর চেয়েও মনোরমার প্রত্যাশা ও উৎকণ্ঠা মনে হইয়াছে গভীর।

মনোরমা মরার মত বলে, আমি ভাবছি ও ছুঁড়ি না সারাটা জীবন জলে পুড়ে মরে। আমি কি করলাম রাজুভাই ?

মনোরমা পর্যন্ত বিকারের অর্ঘ্য দিয়া নিজের জীবনে তাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে, এ জ্বালা রাজকুমার ভুলিতে পারিতেছিল না। অশ্রুজলের ইতিহাস হয়তো আছে, নিপীড়িত বন্দী-মনের স্বপ্ন-পিপাসা হয়তো প্রেরণা দিয়াছে, তবু রাজকুমার মনোরমাকে ক্ষমা করিতে পারে না, নিষ্ঠুরভাবে ধমক দিয়া বলে, কি বকছ পাগলের মত ? কালী তোমার মত কাব্য জানে না দিদি। দিব্যি হেসে,খেলে জীবন কাটিয়ে দেবে, তোমার ভয় নেই।

মনোরমা বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া থাকে। রাজকুমার আঘাত করিলেও সে বুঝি এতখানি আহত হইত না। দুদিন পরে নিজেই সে কালীকে তার মার কাছে রাখিয়া আসিতে যায়। আর ফিরিয়া আসে না। মাসকাবারে তার স্বামী বাসা তুলিয়া দিয়া সাময়িকভাবে আশ্রয় নেয় বোর্ডিং-এ।

রাজকুমার বুঝিতে পারে যে সোজাসুজি তার বাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে উঠিয়া যাইতে মনোরমা সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে। বোর্ডিং-এর ভাত খাইয়া স্বামী তার রোগা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া দু'এক মাস পরেই মনোরমা সহরে অন্য বাড়ীতে নীড় বাঁধিবে। হয়তো কালীর শুভবিবাহের পর। ইতিমধ্যে যদি কালীর বিবাহ না-ও হয়, কয়েক মাসের মধ্যে হইবে সন্দেহ নাই। মনোরমা তখন একদিন এবাড়ীতে আসিবে, কালীর বিবাহে তাকে নিমন্ত্রণ করিতে।

আঘাত করিতে আসিয়া মনোরমার চোখ যদি সেদিন ছল ছল করিয়া ওঠে ? বিষাদ ও হতাশায় আবার যদি মুখখানা তার কালো আর বাঁকা হইয়া যায় ? রোমাঞ্চকর বিষাদের অনুভূতিতে রাজকুমারের সর্বাঙ্গে শিহরণ বহিয়া যায়।

মালতীর সঙ্গে তার প্রায় দেখাই হয় না। মালতীও সাড়া শব্দ দেয় না। সরসীর কাছে রাজকুমার তার খবর পায়। আপনা হইতে সব ঠিক হইয়া যাইবে জানিলেও মালতীর সম্বন্ধে রাজকুমারের ভাবনা ছিল। আপনা হইতে সব ঠিক হইয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটি তো সহজ বা সংক্ষিপ্ত হইবে না মালতীর পক্ষে, কষ্টকর দীর্ঘ মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে তাকে কতদিন কাটাইতে হইবে কে জানে ? তার সাহায্য পাইলে এই দুঃখের দিনগুলি হয়তো মালতীর আরেকটু সহনীয় হইত কিন্তু,

সে সাহস আর রাজকুমারের নাই। নিজের সম্বন্ধে তার একটা আতঙ্ক জন্মিয়া গিয়াছে। কয়েকটা দিন অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া একদিন সে সরসীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিল। অকপটে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া প্রায় করুণ স্বরে প্রশ্ন করিয়াছিল, কি করি বল তো সরসী ?

সরসী বলিয়াছিল, তোমার কিছু করতে হবে না। আমি সব ঠিক করে নেব।

রাজকুমার চিন্তিতভাবে বলিয়াছিল, সেটা কি ঠিক হবে সরসী ? যা বলার আমার বলাই উচিত, আমার হয়ে তুমি কিছু বলতে গেলে হয়তো ক্ষেপে যাবে। এমনিই কি হয়েছে কে জানে, একদিন ফোন পর্যন্ত করল না। যখন তখন ফোনে কথা বলতে পারবে বলে জোর করে আমাকে বাড়ীতে ফোন নিইয়েছে। কিছু বুঝতে পারছি না, সরসী।

এমন অসহায় নম্রতার সঙ্গে রাজকুমারকে সরসী কোনদিন কথা বলিতে শোনে নাই। ধরা গলার আওয়াজ রাজকুমারকে শোনাইতে না চাওয়ায় কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারে নাই।

তুমি কিছু ভেবো না রাজু। তোমার হয়ে মালতীকে বলতে যাব কেন ? যা বলার আমি নিজে বলব, যা করার আমি নিজেই করব। এসব মেয়েদের কাজ মেয়েরাই ভাল পারে। আমায় বিশ্বাস কর, আমি বলছি, মালতীর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। মালতী চুপ করে গেছে কেন বুঝতে পার না ? ওর ভয় হয়েছে।

কিসের ভয় ?

তুমি যদি সত্যি সত্যি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে চাও—এই ভয়। সেদিন নিজে থেকে তোমায় বলেছিল বটে, এখন কিন্তু ওর ভেতর থেকে উল্টো চাপ আসছে। যেতে বললে যাবে কিন্তু ওর উৎসাহ নিবে গেছে। সেদিন হোটেলের রুমে যেমন বুঝতে পারে নি হঠাৎ কেন অসুস্থ হয়ে পড়ল, এখনও বেচারী সেইরকম বুঝতে পারছে না কি হয়েছে, অথচ তোমায় একবার ফোন করার সাহসও হচ্ছে না।

সরসী মালতীর ভার নেওয়ায় রাজকুমার নিশ্চিন্ত হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সরসীর উপর সে নির্ভর করিতে শিখিতেছিল, সব বিষয়ে সরসীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা ও পরামর্শ করার প্রেরণাও তার এই মনোভাব হইতে আসিতেছে। তাকে রিণির প্রয়োজন, তাই শুধু উন্মাদিনী রিণির সাহচর্য স্বীকার করিয়া সকলের জীবন হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে, বাদ পড়িয়াছে সরসী। সরসীকেও সে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিল, মুক্তি পাইতে সরসী

অস্বীকার করিয়াছে। রাজকুমার তাকে ডাকে না, সরসী নিজেই তার কাছে আসে, বাড়ীতে না পাইলে স্যর কে, এল-এর বাড়ী গিয়া তার খোঁজ করে। রিণি তাকে সহ্য করিতে পারে না, নীচে বসিয়া রাজকুমারের সঙ্গে সে কথা বলে। বার বার রিণি তাদের আলাপে বাধা দেয়, রাজকুমারকে উপরে ডাকিয়া অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখে, সরসী ধৈর্য হারায় না, বিরক্ত হয় না, অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে রাজকুমারের মনে হয়, সে যেন সকলকে রেহাই দেয় নাই, তাকেই সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, একমাত্র সরসী তাকে ছাঁটিয়া ফেলে নাই, আরও তার কাছে সরিয়া আসিয়াছে।

স্যর কে, এল-এর বাড়ীতেই রাজকুমারের বেশীর ভাগ সময় কাটে—রিণির কাছে। রাজকুমার না থাকিলে রিণি অস্থির হইয়া ওঠে, কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের চুল ছেঁড়ে, রাগ করিয়া আলমারীর কাচ, চীনা মাটির বাসন ভাঙ্গে, বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, ধরিতে গেলে মানুষকে কামড়াইয়া দেয়, জামা কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া নগ্ন দেহে রাজকুমারের খোঁজে বাহির হইয়া যাইতে চায় পথে। রাজকুমারকে দেখিলেই সে শান্ত হইয়া যায়, আশ্চর্যরকম শান্ত হইয়া যায়। প্রায় স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মত কথা বলে ও শোনে, চলাফেরা করে, খাবার খায়, ঘুমায়। একটু তফাৎ হইতে লক্ষ্য করিলে অজানা মানুষের তখন বুঝিবার উপায় থাকে না তার কিছু হইয়াছে। কোন কোন মুহূর্তে রাজকুমারের পর্যন্ত মনে হয় যে রিণি বুঝি সারিয়া উঠিয়াছে, একটা চমক দেওয়া উল্লাস জাগিতে না জাগিতে লয় পাইয়া যায়। রিণির চোখ! রাজকুমার যত কাছেই থাক, যতই সুস্থ ও শান্ত মনে হোক রিণিকে, দুটি চোখের চাহনি রিণির ক্ষণিকের জন্যও স্বাভাবিক হয় না।

প্রথম দিকে রাত্রে রিণিকে ঘুম পাড়াইয়া রাজকুমার নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু দেখা গেল এ ব্যবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া রিণি হৈ চৈ সৃষ্টি করিয়া দেয়, কেউ তাকে সামলাইতে পারে না, শেষ পর্যন্ত রাজকুমারকে ডাকিয়া আনিতে হয়। রাত্রে রাজকুমারকে তাই এ বাড়ীতে শোয়ার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

স্যর কে, এল কিছু বলেন নাই। রাজকুমার নিজেই তার কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল।

আপনার আপত্তি নেই তো?

না।

লোকে নানা কথা বলবে।

বলুক।

রাত্রে মাথার কাছে বিছানায় বসিয়া শিশুর মত গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া রিণিকে সে ঘুম পাড়াইল, তারপর নিজের ঘরে যাওয়ার আগে কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া নেওয়ার জন্য অনেকবার গেল স্যর কে, এল-এর ঘরে।

আপনি যদি ভাল মনে করেন, রিণিকে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি।

কেন ?

আপনি তো বুঝতে পারছেন, প্রায় স্বামি-স্ত্রীর মতই আমাদের দিনরাত একত্র থাকতে হবে—কতকাল ঠিক নেই।

রাজু, স্ত্রী পাগল হলে স্বামী তাকে ত্যাগ করে।

তবু আপনার মনে যদি—

আমার মনে কিছু হবে না রাজু। শুধু মনে হবে তুমি রিণিকে সুস্থ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছ। সেদিন বলি নি তোমাকে, রিণিকে আমি তোমায় দিয়ে দিয়েছি ? তোমাকে ছাড়া ওর এক মুহূর্ত চলবে না, আমার পাগল মেয়ের জন্য তুমি সব ত্যাগ করবে আর আমি নীতির হিসাব করতে বসব ? তোমাকে আমি বাঁধতে চাই না রাজু। আমি চাই যখন খুসী তোমার চলে যাবার পথ খোলা থাকবে। তুমি ভিন্ন ঘরে বিছানা করেছ, দরকার হলে রিণির ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন নেই। আমার মেয়েকে তুমি ভাল করে দাও, আমি আর কিছু চাই না, রাজু।

সরসীরও এই কথাই বলিল রাজকুমারকে। বলিল যে রিণির সঙ্গে রাজকুমারের এই ঘনিষ্ঠতা তার কাছেও যখন এতটুকু দোষের মনে হইতেছে না, রাজকুমারেরও সঙ্কোচ বোধ করার কারণ নাই। জীবন তো খেলার জিনিষ নয় মানুষের।

আজ কাল পরশুর গল্প

গল্পগুলি একটা বিশেষ ভাবে পর পর সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, যাতে 'আজ কাল পরশুর গল্প' নামটির সঙ্গতি হয় তো আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সাজানোটা এলোমেলো হয়ে গেছে। 'সামঞ্জস্য' গল্পটি শেষে যাওয়া একেবারে উচিত হয়নি। অন্য গল্পগুলিও এরকম আগে পরে চলে গেছে।

গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত এক বছরের মধ্যে লেখা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখ, ১৩৫৩

আজ কাল পরশুর গল্প

মানমুকিয়ার আকাশ বেয়ে সূর্য উঠেছে মাঝামাঝি। নিজের রাঁধা ভাত আর শোল মাছের ঝাল খেতে বসেছে রামপদ ভাঙা ঘরের দাওয়ায়। চালার খড় পুরোনো পচাটে আর দেয়াল শুধু মাটির। চালা আর দেয়াল তাই টিঁকে আছে, ছ'মাসের স্থযোগেও কেউ হাত দেয়নি। আর সব গেছে, বেড়া খুঁটি মাচা তক্তা—মাটির হাঁড়িকলসিগুলি পর্যন্ত। খুঁটির অভাবে দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে। চালাটা কেশব আর তোলেনি। কার জন্য তুলবে? দাওয়ার দু'পাশ দিয়ে মাথা নীচু করে ভেতরে আসা-যাওয়া চলে। অন্ধকার হয়েছে, হোক।

হুমড়ি খেয়ে কাত-হয়ে-পড়া চালার নীচে আঁধার দাওয়ায় নিজের রাঁধা শোলের ঝাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছে রামপদ, ওদিকে খালের ঘাটে নৌকা থেকে নেমেছে তিনটি মেয়েছেলে আর আর একটি ছেলে।

এদের মধ্যে একজন রামপদ'র বৌ মুক্তা। তার মাথায় রীতিমতো কপাল-ঢাকা ঘোমটা। স্থরমার ঘোমটা সীঁথির সিঁদুরের রেখাটুকুও ঢাকেনি ভালো করে। এতে আর শাড়ী-পরার ভঙ্গিতে আর চলনফিরন-বলনের তফাতে টের পাওয়া যায় মুক্তা চাষাভূষো গেরস্থঘরের বৌ, অন্য দু'জন সহুরে ভদ্রঘরের মেয়ে বৌ, যারা বাইরে বেরোয়, কাজ করে, অকাজ কি স্থকাজ তা নিয়ে দেশ জুড়ে মতভেদ। নইলে, শাড়ীখানা বুঝি দামীই হবে আর মিহিই হবে মুক্তার, সাধনা আর স্থরমার কাপড়ের চেয়ে। এর চেয়ে কমদামী ময়লা শাড়ী মুক্তার নেই। নইলে তাই পরে সে গাঁয়ে ফিরত।

তার বুক কাঁপছে, গা কাঁপছে, মুখ শুকিয়ে গেছে। মোটা চট মুড়ি দিয়ে বস্তা হয়ে আসতে পারলে বাঁচত, মানুষ যাতে চিনতে না পারে।

চিনতে পারা হয়তো কিছু কঠিন হত। কিন্তু মানমুকিয়ার কে না জানে মুক্তা আজ গাঁয়ে ফিরছে। বাবুরা আর মা-ঠাকুরুণরা রামপদ'র বৌকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে রামপদ'র ঘরে।

চারটি বাঁশের খুঁটির ওপরে হোগলার একটু ছাউনি—গগনের পানবিড়ির দোকান। পিছনের বড় গাছটার ডালপালার ছায়া এখন চওড়া করেছে হোগলার ছায়া। গাছের গুঁড়িটা প্রায় নালার মধ্যে ও পাশের ধার ঘেঁষে, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে বসতে পারলে হোগলার ছাউনিটুকুও গগনের তুলতে হত না।

ক'জন ঝিমুচ্ছিল বাঁচবার চেষ্টার কষ্টে, খানিকটা তারা সজীব হয়ে ওঠে। বুড়ো সুদাসের চোয়ালের হাড় প্রকাণ্ড, এমন ভাবে ঠেলে বেরিয়েছে যে পাঁজরের হাড় না গুণে ওখানে নজর আটকে যায়।

'রামের বৌটা তবে এল?'

'তাই তো দেখি।' নিকুঞ্জ বলে, তার আধ-পোড়া বিড়িটা এই বিশেষ উপলক্ষে ধরিয়ে ফেলবে কিনা ভাবতে ভাবতে। এক পয়সার চারটে বিড়ি কিনেছিল কাল। আধখানা আছে।

ঘনশ্যামের টিনের চালার আড়ত থেকে গোকুল চার জনের ঠিক সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোবার ছলে ঘনিষ্ঠ দর্শনের পুলক লাভ কবে এদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

গদার বৌ মারা গেছে ও-বছর। ওরা খানিকটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'রাম নেবে ওকে?'

'না নেবে তো না নেবে। ওর বয়ে গেল।' যোয়ান গোকুল বলে, ঘনশ্যামের আড়তে কাজ করে মোটামুটি পেট ভরে খেতে পাওয়ার তেজে।

সুদাস কেমন হতাশার সুরে বলে, 'উচিত তো না ঘরে নেয়া।'

গোকুলকে সে ধমক দেয় না, 'তুই থাম ছোঁড়া বলে।' তীব্র কুৎসিত মন্তব্য করে না মুক্তাকে ফিরিয়ে নেবার কল্পনারও বিরুদ্ধে! গোকুলের কথাতেই যেন প্রকারান্তরে সায় দিয়ে যোগ দেয়, ফিরবার কি দরকার ছিল ছুঁড়ির?

গোকুল ইয়ার্কি দিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ইয়ার্কিতেও বাস্তব যুক্তি টোল খায় না, হাল্কা হয় না।

ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো কঙ্কাল ছিল মুক্তা। সকলের মতো সুদাসেরও চোখে পড়েছে মুক্তার শাড়ীখানা। সকলের মতো সে-ও টের পেয়েছে মুক্তার দেহটি আজ বেশ পরিপুষ্ট।

আঁকা বাঁকা রাস্তা, এপাড়া ওপাড়া হয়ে, পুকুর ডোবা বাঁশবন আমবাগান গাছপালা জঙ্গলে শান্ত। মুক্তা চেনে সংক্ষেপ পথ। যতটা পারা যায় বসতি এড়িয়ে চলতে আরও সে পথ সংক্ষেপ করে প্রায় অগম্য জঙ্গল মাঠ বাগানে তাদের

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তবু গাঁ তো অরণ্য হয়নি, পাড়া পেরোতে হয়, ঘন বসতি কোনটা, কোনটা ছড়ানো। ভদ্র-মানুষেরা তাকায় একটু উদাসীন ভাবে, যারা গুজব শুনেছে তারাও, শুধু ভুরুগুলি তাদের একটু কুঁচকে যায় সকৌতুক কৌতূহলে। চাষা-ভুষোদের কমবয়সী মেয়ে-বৌরা বেড়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, উত্তেজিত ফিসফিসানি কথার আওয়াজ বেশ খানিকটা দূর পর্যন্তই পৌছয়। বয়স্কারা প্রকাশ্যে এগিয়ে যায় পথের ধারে, কেউ কেউ মুক্তাকে কথা শোনায় খোঁচা-দেওয়া. ছ্যাকা-লাগানো কথা। কেউ চুপ করে থাকে, কেমন একটা দরদ বোধ করে, বাছার কচি ছেলেটা মরেছে, কোথায় না জানি বাছা কত লাঞ্ছনা কত উৎপীড়ন সয়েছে ভেবে।

মধু কামারের বৌ গিরির মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকায় তার মস্ত ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার নিরুদ্দেশ হয়েছে বছরখানেক, কিছুদিন আগে গিরিও উধাও হয়ে গেছে।

'ক্যান লা মাগি ?' গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, 'ক্যান ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কি পাটা নিয়ে ? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর-অ দূর-অ ! যা।'

হাঁপাতে হাঁপাতে সে কথা বলে, যেন হল্‌কায় হল্‌কায় আগুন বেরিয়ে আসে হিংসার বিদ্বেষের। স্বরমা স্মিতমুখে মিষ্টি কথায় তাকে থামাতে গিয়ে তার গালের ঝাঁঝে একপা পিছিয়ে আসে। মনে হয় গিরির মা শেষ পর্যন্ত আঁচড়ে কামড়েই দিবে মুক্তাকে। মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে।' এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

মানুষ জমেছে কয়েকজন। একজন, কোমরে তার গামছা পরা আর মাথায় কাপড়খানা পাগড়ীর মতো জড়ানো, হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। একজন বলে, 'বাঃ বাঃ বেশ।' একজন উরুতে থাপড় মেরে গেঁয়ো ভঙ্গিতে হাততালি দেয়।

একটু তফাতে নালা পেরোবার জন্য পাতা তাল গাছের কাণ্ডটায় এ মাথায় বসেছিল গদাধর, বহু দূরের মানুষকে হাঁক দেবার মতো জোর গলায় এমনি সময়ে সে ডাকে, 'গিরির মা। বলি ওগো গিরির মা !'

গিরির মা মুখ ফিরিয়ে তাকাতে সে আবার বলে তেমনি জোর গলায়, 'গিরি যে তোমায় ডাকছে গো গিরির মা কখন থেকে ! শুনতে পাও না ?'

গিরির মা থমকে যায়, দুঃস্বপ্ন-ভাঙা মানুষের মতো ক্ষণিক সম্বিৎ খোঁজে বিমূঢ়ের মতো, তারপর যেন চোখের পলকে এগিয়ে যায়।

'ডাকছে ? অ্যাঁ, ডাকছে নাকি গিরি ? যাইলো গিরি, যাই !'

এতগুলি মানুষ দেখে লজ্জায় সে জিভ কাটে। কোমরে এক-পাক জড়ানো ছেঁড়া কাঁথাখানা চট করে খুলে নিয়ে মাথায় ঘোমটার মতো চাপিয়ে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

ঘরের সামনে পুরোনো কাঁটাল গাছের ছায়ায় বসে রামপদ সবে হুঁকোয় টান দিয়েছিল। তামাক সেজেছে একটুখানি, ডুমুর ফলের মতো। তামাক পাওয়া বড় কষ্ট। মুক্তাকে সাথে নিয়ে ওদের আসতে দেখে সে হুকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। এমনিই পুড়ে যেতে থাকে তার অত কষ্টে যোগাড় করা তামাক।

'আসেন।' রামপদ বলে ক্লিষ্ট স্বরে, দ্বিধা-সংশয়-পীড়ীত ভীরু অসহায়ের মতো। তিন জন কাছে এগিয়ে এসেছে, ওদের দিকে না তাকিয়েই সে অনিশ্চিত অভ্যর্থনা জানায়, চোখ সে পেতে রাখে মুক্তার উপর। খানিক তফাতে থাকতেই মুক্তা থেমে গিয়ে হয়ে আছে কাঠের পুতুল।

'তোমার বৌকে দিয়ে গেলাম ভাই। যা বলার সব তোমায় বলেছি। ওর মন ঠিক আছে। যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে গিয়ে আবার তোমরা ঘর-সংসার পাতো। আর এক দিন এসে আমরা দেখে যাব।'

'দিয়ে তো গেলেন।' বলে উৎসাহহীন বিমর্ষ রামপদ। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একবার সে ঢোক গেলে, চোখের পাতা পিট-পিট করে তার। শীর্ণ মুখখানা বসন্তের দাগে ভরা, চুপসানো বাঁ গালটাতে লম্বা ক্ষতের দাগ। তবু এই মুখেও তার হৃদয়ের জোরালো আলোড়নের কিছু কিছু নির্দেশ ফুটেছে তার শিথিল নিস্তেজ সর্বাঙ্গজোড়া ঘোষণার সুস্পষ্ট মানে ভেদ করে।

'যাবে বলেছিলে, গেলে না কেন রামপদ ?'

'তাই তো মুস্কিল হয়েছে দিদিমণি।'

সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী এরা ক'জন। ঘনশ্যাম এক রকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষা-ভূষোদের, অর্থাৎ চাষী গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সে-ই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে। অন্য ক'জন উপস্থিত ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদ'র। একটু ভাবনা হয়েছে।

একটু!

নৌকাতে পাতবার সতরঞ্চিটা কাঁটাল তলায় বিছিয়ে তিন জন বসে।

রামপদকেও বসায়। মুক্তা এতক্ষণ পরে সরে এসে সুরমার পিছনে গা ঘেঁষে মাটিতেই বসে। ঘোমটা তার ছোট হয়ে গেছে। ছোট ঘোমটার মিথ্যে আড়াল থেকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে রামপদ'র মুখের দিকে। বৌয়ের চোখে এমন চাউনি রামপদ কোন দিন ছাখেনি।

এ সমস্যা তুচ্ছ করার মতো নয়। এক জন বড় মাতবর আর তার ধামাধরা ক'জন তুচ্ছ লোক রামপদ'র পারিবারিক ব্যাপারে নিয়ে কর্তালি না করতে এলে এ হাঙ্গামা ঘটত না। দু'চার জন হয়তো ঠাট্টা বিদ্রূপ করত কিছু দিন, দু'-চার জন হয়তো বর্জনও করত রামপদকে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মাথা ঘামাত না। চারিদিকে যা ঘটেছে আর ঘটছে তার কাছে এ আর এমন কি কাণ্ড? না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল, কত মানুষ কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোন বাড়ীর দশ জন কোথায় গিয়ে ফিরে এল মোটে দু'জন ধুঁকতে ধুঁকতে, কত মেয়ে-বৌ চালান হয়ে গেল কোথায়, এমনি সব কাণ্ডের মধ্যে কার বৌ কোথায় ক'মাস নষ্টামী করে ফিরে এসেছে, এ কি আবার গণ্য একটা করার মতো ঘটনা? এ যেন প্রলয়ের সময় কে কার ডোবার জল নোংরা করছে তাই নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু ঘনশ্যামেরা ক'জন যখন গায়ে পড়ে উস্কে দিতে চাইছে সবাইকে, কি জানি কি ঘটবে।

সুরমা জিজ্ঞেস করে, 'যাই হোক, বৌয়ের জন্য ভাত তো রেখেছ রামপদ?'

'আজ্ঞে আপনারা?'

'আমাদের ব্যবস্থা আছে। বৌকে দু'টি খেতে দাওতো তুমি। চালাটা তোলোনি কেন?'

'তুলব। তুলব।'

সুরমাই বলে কয়ে নিয়ে দু'টি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় রামপদ'র সঙ্গে। বাইরে যা ঘটুক, ওদের মধ্যে আগে একটু কথা আর বোঝা-পড়া হওয়া দরকার। গ্রামের এক জন কর্মী শঙ্করের বাড়ীতে তাদের এবেলা নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল। গ্রামের অবস্থা সে ভালো জানে। তার সঙ্গে পরামর্শ করবারও দরকার হবে।

ঝাঁপটা উঁচু করে তুলে দিতে আরেকটু আলো হয় ঘরে।

'নাইবে?' রামপদ শুধোয়।

'মোর জন্যে রেঁধে রেখোছো!' বলে মুক্তা।

'শোলের ঝাল আর ভাত। আলুনি হৈছে কিন্তু?'

এগার মাস আর অঘটনের ব্যবধান আর কিছুতে নেই, শুধু যেন আছে অতি-বেশী রয়ে' রয়ে, অল্প দু'টি কথা বলায়, নিজের নিজের অনেক রকম ভাবনার গাদা নিয়ে নিজে নিজে ফাঁপরে পড়লে যেমন হয়। চুপ করে থাকার বড় যন্ত্রণা। ভাবনাগুলি নড়তে নড়তে মুক্তার মনে আসে: ছেলেটা তার ছিল সাত মাসের রামপদ যখন বিদেশ যায়। এটা বলার কথা। মুক্তা বাঁচে।'

'খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বালি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরলে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাকপাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি! তাতেই শেষ হল।'

না কেঁদে ধীর কথায় বিবরণটা দেবে ভেবেছিল মুক্তা, কিন্তু তা কি হয়। আগে পারত, না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জীব হয়ে গিয়েছিল অনুভূতি। আজ পুষ্ট শরীরে শুধু ক'মাসের অকথ্য অভিজ্ঞতা কেন বোধকে ঠেকাতে পারবে? গলা ধরে চোখে জল আসে মুক্তা'র।

'শেষ দু'টো দিন যা করলে গো পেটের যন্ত্রণায়, দুমড়ে মুচড়ে ধনুকের মতো বেঁকে—'

মুক্তা এবার কাঁদে।

'কেউ কিছু করলে না?'

'দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল।'

চোখ মুছে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে মুক্তা। এবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কেঁদে ককিয়ে দরদ সে চায় না, সুবিচার চায় না। সব জেনে যা ভালো বুঝবে করবে রামপদ, যেমন তার বিবেচনা হয়।

'খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে একমুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দু'টো মদ্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্যে। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।'

'দাসমশায় তো খুব করেছেন মোদের জন্যে!' রামপদ বলে চাপা ঝাঁঝাঁলো স্বরে। —'যা তুই, নেয়ে আয় গা।'

শোলের ঝাল দিয়ে মুক্তা বসেছে ভাত খেতে, বাইরে থেকে ঘনশ্যাম দাসের

হাঁক আসে ঃ রামপদ!

'তুই খা।'

বলে রামপদ বাইরে যায়। জন পাঁচেক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ঘনশ্যাম এসে দাঁড়িয়েছে সরকারী সমনজারীর পেয়াদার মতো গরম গাম্ভীর্য নিয়ে। শঙ্কর এসেছিল একটু আগে, ঘনশ্যামদের আবির্ভাবে সুরমাদের যাওয়া হয়নি।

বৌ এসেছে রামপদ?'

'আজ্ঞে।'

'ঘরে নিয়েছিস্?'

'আজ্ঞে।'

'বার করে দে এই দণ্ডে। যারা এনেছে তাদের সঙ্গে ফিরে যাক।'

'ভাত খাচ্ছে।'

রামপদ'র ভাবসাব জবাব-ভঙ্গি কিছুই ভালো লাগে না ঘনশ্যামদের। টেকো নন্দী শুধোয়, 'তোর মতলব কী?'

রামপদ ঘাড় কাত করে।—'আজ্ঞে।'

'বৌকে রাখবি ঘরে?'

'বিয়ে করা ইস্তিরি আজ্ঞে। ফেলি কী করে?'

এই নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয় মানসুকিয়ার চাষাভূষোর সমাজে। ঘনশ্যামরাই জোর করে জাগিয়ে রাখে আন্দোলনটাকে। নইলে হয়তো আপনা থেকেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থেমে যেত মুক্তার ঘরে ফেরার চাঞ্চল্য। সামাজিক শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ঘনশ্যামদের নেই, জমিদার দেশে থাকলেও হয়তো তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত। তবে সামাজিক শাস্তিই যথেষ্ট। সবাই যদি সব রকমের বর্জন করে রামপদকে, কথা পর্যন্ত বন্ধ করে, তাতেই পরম শিক্ষা হবে রামপদ'র। সমাজের নির্দেশ অমান্য করলে শুধু এক-ঘরে হয়েই যে সে রেহাই পাবে না তাও জানা কথা। টিটকারী, গঞ্জনা, মারধোর, ঘরে আগুন লাগা সব কিছুই ঘটবে তখন। সবাই এসব করে না, তার দরকারও হয় না। সবাই যাকে ত্যাগ করেছে, যার পক্ষে কেউ নেই, হয় বিপক্ষে নয় উদাসীন, যার উপর যা খুশী অত্যাচার করলেও কেউ ফিরে তাকাবে না, মিলেমিশে সেই পরিত্যক্ত অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে বড় ভালোবাসে এমন যারা আছে ক'জন, তাদের দিয়েই কাজ হয়।

তবে সময়টা পড়েছে বড় খারাপ। প্রায় সকলেই আহত, উৎপীড়িত, সমাজ-

পরিত্যক্ত অসহায়েরই মতো। মনগুলি ভাঙা, দেহগুলিও। আজ কী করে বাঁচা যায় আর কাল কী হবে এই চেষ্টা আর ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত আর বিব্রত সবাই যে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার অবসর আর তাগিদ যেন জীবন থেকে মুছে গেছে। সকলকে উত্তেজিত করতে গিয়ে এই সত্যতা বেরিয়ে আসে। রামপদ'র কাণ্ডের কথাটা হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিয়ে সবাই আলোচনা করতে চায় ধান চাল নুণ কাপড়ের কথা, যুদ্ধের কথা। পেতে চায় বিশেষ অনুগ্রহ, সামান্য সুবিধা ও সুব্যবস্থা। একটু আশা-ভরসার ইঙ্গিত পেলে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যার চিহ্নটুকু দেখা যায় না, রামপদ'র বিচার থেকে রোমাঞ্চ লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায়।

কয়েকজন তো স্পষ্টই বলে বসল, 'ছেড়ে দ্যান্ না, যাক্ গে। অমন্ কত ঘটছে, ক'দিন সামলাবেন? যা দিনকাল পড়েছে।'

আপন জনকে যারা হারিয়েছে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঁচবার জন্য সহরে পালিয়ে, আপনজন যাদের হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ, বিদেশ থেকে ফিরে যারা ঘর দেখেছে খালি, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার আর ব্যাপারটা চাপা দেবার ইচ্ছা তাদেরই বেশী জোরালো। এ রকম কিছুই ঘটেনি এমন পরিবারও ক'টাই বা আছে!

ঘনশ্যাম একটু দমে যায়। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপায় গোকুল।

'বাড়াবাড়ি করলেন খানিক।'

'বটে?'

'সাধু হিদে নখাদের দিয়ে মেরে লাল করে দিতেন এক দিন, চুকে যেত, বিচার-সভা ডেকে বসলেন। দশ জনে যদি দশটা কথা কয়, যাবেন কোথা? দুগ'গার কথা যদি তোলে কেউ?'

'তুই চুপ থাক হারামজাদা।' ঘনশ্যাম বলে ধমক দিয়ে, কিন্তু হাত তার উঠে গিয়ে ঘাঁটতে থাকে বুকের ঘন লোম। জ্বালাও করে মনটা রামপদ'র স্পর্দ্ধায়। সে নাকি দাওয়ায় চালা তুলেছে, বেড়া দিয়েছে, গুছিয়ে নিচ্ছে সংসার। বলে নাকি বেড়াচ্ছে, গাঁয়ে না টিঁকতে দিলে বৌকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও। আগের চেয়ে কত বেশী খাতির করছে ঘনশ্যামকে লোকে আজ, তুচ্ছ একটা রামপদ'র কাছে সে হার মানবে! মনটা জ্বালাও করে ঘনশ্যামের।

পরদিন বসবে বিচার-সভা। সদরে জরুরী কাজ সারতে বেরোবার সময় ঘনশ্যাম ঠিক করে যায় সকাল সকাল রওনা দিয়ে বিকাল বিকাল গাঁয়ে ফিরবে, গিরির কাছে আজ আর যাবে না। কাজ শেষ হয় বেলা দু'টোর মধ্যেই, কিন্তু

মনের মত হয় না, যেমন সে ভেবেছিল সে-রকম। মনটা তার আরেকটু দমে যায়। সাধ হয় একটু বিলাতী খাবার! গিরির সাথে রাত কাটাবার। সময়ের হিসাবেও আটক পায় না। সভা হবে অপরাহ্ণে, সকালে রওনা দিলেও গাঁয়ে সে পৌঁছবে ঠিক সময়ে!

গোকুলকে সবচেয়ে কমদামী বিলাতী বোতল কিনতে দিয়ে সে যায় গিরির ওখানে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের চোখ উঠে যায় কপালে, হাত বুকে উঠে লোম খোঁজে জামার কাপড়ের নীচে। মাদুর পেতে ভদ্রঘরের চারটি মেয়ে গিরিকে ঘিরে বসেছে, দু'জন তার চেনা। মুক্তাকে নিয়ে যারা রামপদ'র কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টা করারও সুযোগ মেলে না, 'এই! শোন, শোন।' বলে গিরি লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরে গলাবন্ধ কোটের প্রান্ত।

'ভাগছো যে? দাঁড়াও, কথা আছে অনেক।'

'ওনারা কারা?'

'তা দিয়ে কাজ কি তোমার?' গিরি ফুঁসে ওঠে। জামা সে ছাড়ে না ঘনশ্যামের, পিছন ছেড়ে সামনেটা ধরে রাখে। কটমটিয়ে তাকায় বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। ঢোঁক গিলে দাঁতে দাঁত ঘষে।

'মা না কি ভালো আছে, বেশ আছে, মোর মা?'

'আছে না?'

'আছে? মাথা বিগড়েছে কার তবে, মোর? ক্ষেপেছে কে, মুই! তা ক্ষেপিছি, মাথা মোর ঘুরতে নেগেছে। ওরে নক্ষীছাড়া, ঠক, মিথ্যুক—'

'ও গিরিবালা!' সুরমা ভিতর থেকে বলে মৃদু স্বরে।

গাল বন্ধ করে নিজেকে গিরি সামলায়, গলা নামিয়ে বলে, 'মোর বাপকে টাকা দিয়ে বিভুঁয়ে মরতে পেঠিয়েছিল কে?'

'ওনারা বলেছে বুঝি?'

'মিছে বলেছে?' গিরি ডুকরে কেঁদে ওঠে বাপের শোকে, 'ও বাবা! মোর নেগে তুমি খুন হলে গো বাবা। এ নচ্ছার মেয়ার ধরে প্রাণ কেন আছে গো বাবা।' ভেতর থেকে আবার সুরমা ডাকে: 'ও গিরিবালা! তোমার বাবা মরেছে কে বললে? খবর তো পাওয়া যায়নি কিছু! বেঁচেই হয়তো আছে, মরবে কেন?'

'নিখোঁজ তো হয়েছে আজ দশ মাস।' গিরি বলে নিজেকে সামলে গলা নামিয়ে।

অন্য ঘরের মেয়েরা জানালা-দরজায় উঁকি দেয়, কেউ কাজের ছুতোয় ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চলাচল করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। অঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার, নালা ছিটাল থেকে উঠে আসছে অশ্লীল গন্ধ। এঁঠো বাসনগুরি অখাদ্যের গন্ধটাও কেমন বদ। সুরমারা চার জনে বেরিয়ে আসে। তাদের দিকে না তাকিয়েই সদর দরজার দিকে যেতে যেতে বলে যায়, 'সকালে আমরা আসব গিরিবালা, তৈরী থেকো।'

'সকালে আসবে কেন?'

'মোকে গাঁয়ে পৌঁছে দিতে, মার কাছে। ঘরে এস, বসবে।'

গিরি তাকে টেনেই নিয়ে যায় ঘরে। ঘনশ্যামের দিশেহারা অবস্থা, শত উপায় শত মতলবের এলোমেলো টুকরো পাক খেতে থাকে তার মাথার মধ্যে, কি করা যায় কি করা যায় এই অন্ধ আতঙ্কের চাপে।

মাদুরে বসে বিড়ি ধরিয়ে কেসে বলে, 'গাঁয়ে গিয়ে কী করবি গিরি? আমি বরং—'

'বরং টরং রাখ তোমার। মার চিকিচ্ছে করাব। সব খরচা দেবে তুমি, যত টাকা নাগে। নয়তো কি কেলেঙ্কারী করি দেখো।' ঘনশ্যামের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে গিরি ফস করে একটা সিগারেট ধরায়। ধপাস করে বসে পা ছড়িয়ে পিছনে একটা হাত রেখে পিছু হেলে। কয়েক মাসের মধ্যেই মুখের স্নিগ্ধ লাবণ্য উপে গেছে অনেকখানি, মাজা রঙের সে আভাও নেই তেমন, কিন্তু গড়নশ্রী হয়েছে আরও অপরূপ, মারাত্মক। সাধে কি ওকে পাবার জন্য অত করেছে ঘনশ্যাম, ছেড়ে দেবে দেবে করেও ছাড়তে পারছে না। কায়স্থের মেয়ে না হলে ওকে সে বিয়েই করে ফেলত এখানে টেনে না এনে।

ছেড়ে দেবে ভাবছিল কিছু দিন থেকে, যদি ছেড়ে দিত! আজ তাহলে এ হাঙ্গামায় তাকে পড়তেও হত না ভদ্রঘরের এই ধিঙ্গি মাগিগুলোর কল্যাণে।

'এত পয়সা করেছে, বিড়ি টানে।' গিরিবালা বলে, মুখ বাঁকিয়ে। বলে সোজা হয়ে বসে, রামপদ'র পেছনে নাকি নেগে তুমি? একঘরে করবে? সাধুপুরুষ আমার! মোর ঘরে ফেরবার পথে কাঁটা দেবার মতলব, না? ওর বৌকে ঘরে ফিরতে না দিলে, মোকে কে ঘরে ফিরতে দেবে শুনি? মোকে একঘরে করবে না সবাই?'

গোকুল মদের বোতল নিয়ে এলে গিরি একদৃষ্টে বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জিভ দিয়ে ঘন ঘন ঠোঁট ভেজায়। মুখের ভাব পলকে পলকে বদলে গিয়ে

ঘনিয়ে আসে রুগ্নের যাতনাভরা লোলুপতা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বিকারগ্রস্তের তীব্র কাতরতা।

'বিলাতী ?'

গোকুল সায় দেয়।

গিরি যেন শিথিল হয়ে ঝিমিয়ে যায়। অতি কষ্টে বলে, 'যাক, এনেছ যখন, খাও শেষ দিনটা। ভোর ভোর উঠে চলে যাবে কিন্তু।'

মদের গ্লাসে দু'-চার বার চুমুক দিয়ে একটু স্থির হয়ে ঘনশ্যাম ভাবে, না, কোন উপায় নেই। ভয় দেখানো, জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভোলানো কিছুই খাটবে না। সে গিরি আর নেই, সেই ভীরু লাজুক বোকা হাবা সরল গেঁয়ো মেয়ে। পেকে ঝানু হয়ে গেছে।

কিছু পেসাদ পেয়ে গোকুল বিদায় হয়। খুব ভোরে এসে সে ঘনশ্যামকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।

রাত বাড়লে গিরি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'কি করি বল ? কাল একবার যেতে হবেই। মার জন্য আঁকুপাঁকু করছে মনটা। তা ভেবো না তুমি। মার একটা ব্যবস্থা করে ফিরে আসব ক'দিন পরে। মাঝে মাঝে গাঁয়ে যেতে দিও মোকে, এ্যাঁ ? ভেবো না, ফিরে আসব।'

গেলাস থেকে উছলে পড়ে শাড়ী ভিজে যায় গিরির। খিল-খিল করে হাসতে হাসতে রাগের চোটে গিরি গেলাসটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের কোণে।

বিচার-সভায় লোক খুব বেশী হল না, মানসুকিয়ার ঘেঁষাঘেঁষি পাঁচ-ছ'টা গাঁ ধরলে। লোক কমেই গেছে দেশে। রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছে বহু লোক। অনেকে আসতে পারেনি আসবে ঠিক করেও, কাঁপতে কাঁপতে জ্বরে পড়ায়। অনেকে ইচ্ছা করে আসেনি। সমাবেশটাও কেমন ঝিম-ধরা নিরুত্তেজ, প্রাণহীন। ক্ষীণ শীর্ণ অবসন্ন সব দেহগুলি, চোখে উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা চাউনি। সভার বাক্‌গুঞ্জনও স্তিমিত। কথা কইতে ভাল লাগার দিন যেন নেই। বছর দুই আড়াই আগে, ঘনশ্যামের এই সদর দাওয়া আর সামনের ফাঁকা জমিতে শেষ সামাজিক বিচার-সভা বসেছিল এই চাষভুষো শ্রেণীর, পদ্মলোচনের বোনের ব্যাপার নিয়ে। কি চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ছিল সে জমায়েতে, মানুষের কলরবে গম্‌গম্ করছিল। কি ঔৎসুক্য ফুটেছিল সকলের মুখে এক বিবাহিতা নারীর কলঙ্কের আলোচনা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষায়। তার তুলনায় এ যেন সরকারী জমায়েত ডাকা হয়েছে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসীদের কি করা উচিত বুঝিয়ে দিতে।

দাওয়ায় বসেছে মাথারা, মাঝ-বয়সী আর বুড়ো মানুষ। ঘনশ্যাম বসেছে মাঝখানে, একেবারে চুপ হয়ে, অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে। তার ভাব দেখে মাথাদের অস্বস্তি জেগেছে—উপস্থিত মানুষগুলির ভাব দেখেও। দাওয়ার এক প্রান্তে মোড়ায় বসেছে শঙ্কর, সে এসেছে অযাচিত ভাবে। কেউ কেউ অনুমান করেছে তার উপস্থিতির কারণ, অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি। অঙ্গনের দক্ষিণ কোণে জন-সাতেকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রামপদ, এদের সঙ্গে আগে থেকে তার ভাব ছিল, বিশেষ করে করালী ও বুনোর সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে বসেছে মুক্তা, গিরির গায়ে লেগে! সে অবশ্য গিরিকে খুঁজে তার গা ঘেঁষে বসেনি, গিরিই তাকে ডেকে বসিয়েছে। পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম হয়নি সভায়।

ঘনশ্যামের দৃষ্টি বার বার গিরির ওপর গিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

বিচারের কাজে গোল বাধে গোড়া থেকেই। পূর্ব-পরামর্শ মতো বুড়ো টেকো নন্দী গৌরচন্দ্রিকা সুরু করলে জমায়েতের মাঝখান থেকে রুক্ষ চুলে, খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়িতে আর একটা হাতাছেঁড়া ময়লা খাকি সার্ট গায়ে পাগলাটে চেহারার বনমালী উঠে চেঁচিয়ে বলে, 'কিসের বিচার? কার বিচার? রামপদ'র বৌ কোন দোষ করেনি।'

সবাই জানে, বনমালীর বৌকে সদরের দত্ত-বাবু ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর ছাড়িয়ে চালান দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। প্রথমে সদরে রেখেছিল বৌ-টাকে, বনমালী হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে যখন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছিল তখন আবার তাড়াতাড়ি কোথায় চালান করে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বনমালী আর হদিস পায়নি। এখনো সে মাঝে মাঝে সদরে গিয়ে সন্ধান করে।

টেকো নন্দী বলে, 'আহা, দোষ করেছে কি করেনি তাই তো মোরা বিচার করব।'

বনমালী রুখে বলে, 'বটে? কোন দোষ করেনি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কি করেনি? এ তো খুড়ো ঠিক কথা নয়। গাঁয়ের কোন ছেলেমেয়ে গাঁ ছেড়ে ক'দিন বাইরে গেলে যদি তার বিচার লাগে, তবে তো বিপদ।'

করালী বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বলে, 'ঠিক কথা, গাঁয়ে খেতে পায়নি, সোয়ামী কাছে নেই, তাই সদরে খেটে খেতে গেছে। ওর দোষটা কিসের?'

কে একজন মাথাটা নামিয়ে আড়াল করে বলে, 'সে-বেলা তো কেউ আসেনি, দু'টি খেতে-পরতে দিতে?'

কানাই বিদেশে তিন ছেলে আর দুই মেয়ে হারিয়ে শুধু নিজের বৌ আর বড় ছেলের বৌকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সে বলে, তাদের তিন জনের কইমাছের প্রাণ, সহজে যাবার নয়, যায়ওনি তাই। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়, সে থর থর করে কাঁপছে, মুখে এক অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনার ভাব। কথা তার এলোমেলো হয়ে যায়, 'প্রাণে বেঁচে ফিরেছে মেয়েটা, ভগবান ছিল না তো কি? ভগবান বাঁচত কি, মেয়েটা ফিরেছে তো মরে এসে। তা ভগবান আছেন।'

কেউ হাসে না। সভায় ভগবান এসে পাড়ায় শঙ্করের মতো অযাচিত আবির্ভাবের কৌতূহলমূলক একটা অনুভূতি জাগে অনেকের মনে।

জমায়েত স্তব্ধ হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শুধু মেয়েদের মধ্যে গুজ-গাজ ফিস-ফাস চলতে থাকে অবিরাম। মুক্তার মত মেয়েরা আবার গাঁয়ে ফিরুক এটা যারা ঠিক পছন্দ করে না তারাও চুপ করে থাকে।

শেষে দাওয়া থেকে ভুবন বলতে যায়, 'কথা হল কি, ও যদি সদরে সত্যি খেটে খেতে যেত, খেটেই খেত—'

গিরি তড়াক করে ঘাড় উঁচু করে গলা চিরে ফেলে, 'খেটে খায়নি তো কি? মোরা এক সাথে খেটে খেয়েছি। এ পাড়ায় দু'বাড়ী ঝি-গিরি করেছি, এক দোকানে মুড়ি ভেজেছি। কোন্ মুখপোড়া বলে খেটে খাইনি মোরা, শুনি তো একবার?

প্রায় সকলেই জানে একথা সত্য নয় গিরির। কয়েকজন স্বচক্ষে মুক্তাকে দেখেছে সদরে। কিন্তু কেউ কথা বলে না। কিছুকাল আগে গাঁয়ে লজ্জাবতী লতার মতো কাঁচা মেয়ে গিরির পরিবর্তনটা সকলকে আশ্চর্য করে দেয়—খুব বেশী নয়। যে দিন কাল পড়েছে। দাওয়ার নাছোড়বান্দা মাথা টেকো নন্দীই শুধু বলে, 'কিন্তু বহু লোকে যে চোখে দেখেছে। ফণি বলছে সে নিজের চোখে—'

মাঝবয়সী বেঁটে ফণি চট করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, 'না না, আমি তা বলিনি। আমি কেন ও-কথা বলতে যাব?'

এতক্ষণ পরে ঘনশ্যাম মুখ খোলে। জমায়েতে টুঁ শব্দ নেই কারো মুখে মেয়েদের ফিসফিসানি ছাড়া, তবু নেতাদের সভার কলরব থামাবার ভঙ্গিতে দু'হাত খানিকক্ষণ তুলে রেখে সে বলে, 'যাক্, যাক্। ভাই সব, আজকালকার দিনে অত সব ধরলে মোদের চলে না। আমি বলি কি, কথাটা যখন উঠেছে, রামপদ'র ইস্তিরি নামমাত্র একটা প্রাচিত্তির করুক, চাপা পড়ে যাক ব্যাপারটা।'

বনমালী ফুঁসে ওঠে, 'কিসের প্রাচিত্তির? দোষ করেনি তো প্রাচিত্তির কিসের?'

গিরি গলা চেরে, 'মোকেও প্রাচিত্তির করতে হবে নাকি? তবে?'

তারপর বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। বনমালীর বৌ চোখ-ভরা জল নিয়ে মুক্তার ঝাপসা মুখখানি দেখে তার চিবুক ধ'রে চুমো খেতে গিয়ে গালটা টিপে দেয়। কয়েকটি স্ত্রীলোক মুখ বাঁকিয়ে আড়-চোখে মুক্তার দিকে চাইতে চাইতে চলে যায়। শঙ্কর নিঃশব্দে মোড়া থেকে উঠে যেমন অযাচিত ভাবে এসেছিল তেমনি অযাচিত ভাবে বিদায় না নিয়ে বনমালীর সঙ্গ ধরে।

বলে, 'যদি খুঁজে পেতে এনে দিই, ফিরিয়ে নেবে ভাই?'

বনমালী আশ্চর্য হয়ে যায়।—'ফিরে নেবে না তো খুঁজে মরছি কেন?'

একটা কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর থেমে যায়। ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থা যে সকলের থাকে না, মন এমন বিগড়ে যায় যে ঘরসংসার আর যোগ্য না তার, সেও যোগ্য থাকে না ঘরসংসারের। কিন্তু কি হবে ও-কথা বলে বনমালীকে? মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি তার বৌয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে, ওকে সে সম্ভাবনার কথা জানিয়ে লাভ নেই। বৌ হিসাবে ওর বৌয়ের মরণ হয়েছে, মনের এমন রোগ হয়েছে যা চিকিৎসার বাইরে অথবা চিকিৎসা করে সুস্থ করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব মানুষের জগতে, সেটা আগে জানা দরকার।

'চেষ্টা করে দেখি কি হয়।' বলে সহানুভূতির আবেগে বনমালীর হাতটা শঙ্কর চেপে ধরে হাতের মধ্যে, কলেজের বন্ধুর হাত যেমন ভাবে চেপে ধরত।

সিকিখানা চাঁদের আলো ছাড়া মানসুকিয়া অন্ধকার সন্ধ্যা থেকে। বেলতলায় ভূতের ভয়—বছরখানেক বছর-দুই আগেও খুব প্রবল ছিল। আজ-কাল বেলতলায় ভূতের ভয়ের প্রসঙ্গই যেন লোপ পেতে বসেছে মানসুকিয়ায়। এই বেলতলায় দাঁড়িয়ে গিরি বলে ঘনশ্যামকে, 'তুমি যদি না বলতে ব্যাপারটা, চাপা দিতে—'

ঘনশ্যাম বলে, 'চোখ-কান নেই? ছাখোনি, আমি কি বলি না বলি তাতে কী আসত যেত? আমি শুধু নিজের অবস্থাটা সামলে নিলাম লোকের মন বুঝে।'

গিরির বাড়ী বেলতলার কাছেই। বেলতলায় সে ভয় পায়নি, বাড়ী যেতে পথের পাশে নালার ওপর তালের পুলটার মাথায় একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে তার বুক কেঁপে যায়।

'কে গা?'

'আমি গা গিরি, আমি।'

'অঃ! এত রাতে এখানে বসে আছ?'

'এই দেখছিলাম, গাঁয়ে তো এলো, গাঁয়ে গিরির মন টিঁকবে কি টিকবে না।'

'কী দেখলে?'

'টিঁকবে না। গিরি, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না। মোর সাথে যদি তোর বিয়েটা হয়ে যেত, মুক্তার মতো একটা ছেলেপিলে যদি হ'ত তোর, ক'বছর ঘর-সংসার যদি করতিস, তবে হয় তো—না, গাঁয়ে মন তোর টিঁকবে না।'

কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে কথা বলতে বলতে, কখন সে তালের পুল ডিঙ্গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কথা শেষ না করে আর গিরির দু'টো ভারি কথা না শুনেই, ভাল-মতো টের পায় না গিরি। মুখ বাঁকিয়ে সিকি চাঁদের আলোর আবছাতে অজানাকে সে অবজ্ঞা জানায়। পরক্ষণে মনে হয় বুকের কাছে কিসে যেন টান পড়ে টন-টন করে উঠেছে বুকের শিরা-টিরা কিছু, তাই ব্যথায় গিরি আরেকবার মুখ বাঁকায়।

গিরির মা শুয়েছিল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে।

গিরি ডাকে, 'মা? ওমা?'

গিরির মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। গিরির মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বলে, 'কে গো বাছা তুমি? হঠাৎ ডেকে চমকে দিলে?'

দুঃশাসনীয়

আগে, কিছুকাল আগে, বেশীদিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, ক্ষেত ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু, বটপুকুরের পূর্বোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম—এসবই যোগাত ভরসা, রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সমস্ত লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এই রকমই বাংলার, রাত্রে সব গ্রাম। গা ছম-ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অভিজ্ঞ এইরকম কোন ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁত-কপাটি লেগে মূর্চ্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কার-বশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার, এ জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ী। বাড়ীর সামনে ভাঙ্গা বেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ও পাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন

করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসী, খুড়ী বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের স্বরে ছায়া বলবে, 'কে ? কে গো ওখানে ?'

কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।

সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ীর ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোন কোন ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোক-সুলভ লজ্জায়। কোন বাড়ীতে কয়েকটি ছায়া থাকে এক সঙ্গে, মা, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন্, শাশুড়ী, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।

ভোলা সন্দী কোমরের ঘুন্সীর সঙ্গে দু' আঙুল চওড়া পট্ট এঁটে তার পাঁচহাতী ধুতিখানা বাড়ীর মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোন সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত পৌছতে পারে—কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে, নইলে বিপদ। ভোলার বৌ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজ ছেলে পটলের বৌ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

'কৎকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা ?'

পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে।

'আর সয় না।'

বলে' শাল কাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাস্ করে ঠুকে দেয়। 'আর সয় না, আর সয় না গো!' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে খুঁটিতে,

গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধুলায় ধুসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা!

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে, নিজেকে আর বৌটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এপাশে রাস্তা এবং ওপাশে ঘুপচিমারা পথের ইয়ার্কি, তার কাছে দু'বিঘে বিচ্ছিন্ন ধান জমির লাগাও বৈকুণ্ঠের মোট আড়াইখানা কুঁড়ে নিয়ে তিন পুরুষের বসতবাটি। আড়াইখানা কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে, তার ঝাঁপের দরজা, বাঁশের দেয়াল, বাঁশের খিল। ঝাঁপে থপ থপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি করছিস বড়। মোর কাছে তোর লজ্জাডা কি?'

তার বৌ মানদা ভেতর থেকে বলে, 'মুখপোড়া বজ্জাত! বোনকে কাপড় দিয়ে বোয়ের সাথে মস্‌করা? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।'

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতায় শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা তক্‌ ঝাঁপের দু'পাশে এমনি গালাগালি চলে দু'জনের মধ্যে। বাড়ীর তিনদিকে মাঠ ভরে শন উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাসরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। শনের বনের মাঝখানের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারসী শাড়ী পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ'কুনের ছাউনীর দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে ত্যাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রি তক্‌, সারা দিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপি চুপি ঘাটে আসত দুটোচারটে বাসন আর কলসী নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগী?

শনক্ষেতের রঙ্গমঞ্চে রঘু একটু মস্‌করা করে বেনারসী পরা মালতীর সঙ্গে, তা দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে সাজা ছেলে সখীর মতো ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রাণুর হাপুসকাঁদা ষোল বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালান চলে। ইস্‌! কি সাদা ওর পরনের ধুতিটা।

'অ বিন্দু! দাঁড়া।' রঘু ডাকে।

বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে

মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে আজ।'

বেনারসী পরা মালতী বলে, 'ইহিরে, খুকী মোর ডর লাখছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল্ কাপড়। যাবি তো চ', নয় কাপড় খুলে দিয়ে যা।'

বৈকুণ্ঠ বলে 'ঝাঁপ ভাঙ্গবো ছোট বৌ।'

মানদা বলে, 'ভাঙ্গো—মাথা ভাঙ্গব তোমার আমি।'

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামীর কাছে মেয়েমানুষের লজ্জা কি?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বছর বার। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগার দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে, বলে, 'মা, ওমা! খিদে পায় যে?'

ভূতি বলে ভেতর থেকে, শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, খে-গে যা নিয়ে।

'পাড়তে পারি না যে। তুই দে।'

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাবো? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটো। ওমা কালী, তুই-ই বল মা, যাবো? বল্ মা, মোর হৃদয়ে থেকে একটা কিছু বল!'

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না। জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুষ্ক, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাদুরটা চোখে পড়ে।

'দাঁড়া একটু।'

মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। একহাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাদুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকে থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তখন মাদুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে সুরু করে কান্না। আর এমনি আশ্চর্য কাণ্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝের ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, 'আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।'

রাবেয়া ক'দিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষীর ঘরের বৌ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাক পাতা কুড়িয়ে এনে খুদ কুঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ! খেতে দিতে না পারার দোষ ও গ্রাহ্য করেনি, পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার আবার সাদি করা কেন?

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, 'আজিজ সায়েব খবর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।'

'সবুর! আর কত সবুর করব? কবরে যেয়ে সবুর করব এবার।'

সেমিজ না পরলে দু'ফেরতা শাড়ী পরা রাবেয়ার অভ্যাস। এক-ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয়নি কোন দিন। পায়খানার চটের পর্দাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষ বাবুর বাড়ীর মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙীন শাড়ী বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ীর মেয়েরা চুমকি বসানো হাল্‌কা শাড়ীর তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী! আল্লা, এ কোন্ মরদের হাতে সে পড়েছিল!

রাত্রের ছায়ামূর্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে দুটো বস্তা চাপানো, চুণের বস্তা! বস্তার নিচেই আমিনার গায়ের চামড়া জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, 'গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে! আজ ঠিক মরব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ শ' চাষী ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর 'আড়াইশ' ভদ্র স্ত্রীপুরুষের কাপড় যোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহাকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উস্কানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সতের জন সাঙ্গপাঙ্গ। সতের মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশ' তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে

কেন অনেক শ' গাঁট ধুতি শাড়ী জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যা হায়রাণির জন্য ক্ষতিপূরণের পাল্টা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে, হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, এবার কাপড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না। মনোহর শা'র প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে, উপায় কি।

দু'জনে আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দিষ্ট-করা কাপড়ের ভাগ, তারই খবর জানতে। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই।

বিকালে ছোটখাট একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পূর্ব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু ভড়কে।

'কী হল ঘোষমশায়, কাপড়ের কী হল ?'

'গোলমাল হয়েছে একটু।'

'গোলমাল ? কিসের গোলমাল ?'

'কলকাতা থেকে মাল আসে নি। ভাই সব, আমরা জীবনপাত করে—'

বঙ্কু'র সাঙ্গপাঙ্গদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সে সময়টা কলেরায় মরমর হয়ে থাকায় মারপিটের নালিশে হাজতে যেতে পারেনি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন! আমি দেখেছি, পুলিস দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুণে গুণে চালান দিল।'

'ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের 'কোটা' আসে নি।'

'কবে আসবে ?'

'আসবে। আসবে। ছুটোছুটি করে মরছি দেখতে পাচ্ছ তো ভাই তোমাদের জন্যে ?'

হতাশ ম্রিয়মাণ জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরী রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনে রাস্তার সেই মোড়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আজিজ, তার পাশে সুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ। সুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলের মতো হাত নেড়ে ইসারা করে, আজিজ জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইসারা দ্যাখে, ড্রাইভারকে কি যেন বলে, থামতে থামতে আবার গর্জন করে লরীটা জোরে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকের আড়ালে। লাল ধূলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, একপা দু'পা এগিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস তখনো ছাড়েনি। বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোষাক-পরা সুদেব, কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্টটা তার কী চকচকে। লালপাগড়ী আঁটা একজন চা আনতে যায় সুবলের দোকান থেকে—চা এবং একটা কিসের যেন চ্যাপ্টা শিশি আর সোডার বোতল। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে, যেন ভেতরে কাঁচা কয়লার আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

'কিসের ভিড় ?'

'কাপড় চায়।'

'হাঃ হাঃ। পরশু পচেটপুরে সার্চে গেছলাম নন্দ জানার বাড়ী। বাড়ীর সামনে যেতেই হাত জোড় করে বলল, কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক, সারা বাড়ী তল্লাস করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে! রসুই ঘরে ফেরারী ছোঁড়াটাকে সরিয়ে সারা বাড়ী সার্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙ্গে একদম ভেতরে আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির সুরু হয়ে গেল মশাই। সব কটাই প্রায় বুড়ী, কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কি বলব আপনাকে। পাতলা একটা উড়নি পরেছে, একদম জালের মতো; গায়ের রঙ দেখে তো আমি মিষ্টার—'

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশী। এভাবে যখন হল না তখন

এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাৎলে দিত।

'জান্ নয় দিলাম রে আব্বাস,' আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কী জন্যি জানটা দিব তা বল্?'

ভোলা বলে, 'লুঠ করে তো আনতে পারি দু'এক জোড়া, কিন্তু তারপর?'

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোট চাঁদটি উঠেই আছে, দিন দিন একটু একটু বড় হবে। ক'দিন পরে জ্যোৎস্নার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কী উপায় হবে কে জানে। চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ীর বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারে বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ী পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা ক'জন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরীর কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরও কত লোকেও তো কাজ করে সতের মাইল দূরে কাপড় তৈরীর কলে, তবে কেন ও অবস্থা তাদের? সবাই ভাববার চেষ্টা করে!

হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

'তবে যে ঢেঁটরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে?' সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে এক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ী গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ী না পাক, কথা সে আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ী ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভাল করে বুঝতে চান আগে। কদিন পরে তিনি একখানা শাড়ী অন্ততঃ আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। তাই হোক্, তাও মন্দের ভাল। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে না আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্ততঃ বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

রাবেয়া বলে, 'জানি।' তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু'চারদিনের মধ্যে শাড়ী পাবার ভরসার খবরটা জানায়।

এবারও রাবেয়া বলে, 'জানি।'

দাওয়ায় এসে রাবেয়া তার কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ী। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধ হয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে,

ফুঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার কয়েকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'খাবেনি ? চল।'

'চল।'

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুঁড়ে দেয় উঠানের কোণে।

'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুটকুট করছে।'

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

'ফের নেয়ে নি।'

ঘরে থেকে ভরা কলসী এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুঠিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

'পানি ঢেলে দিলি সব ?'

'ফের আনব।'

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

নমুনা

কেবল কেশবের নয়, এরকম অবস্থা আরও অনেকের হয়েছে। অন্ন নেই কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দু'তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও, যা দিয়ে খানকয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে।

বছরখানেক আগের কেশব ভাল ছেলে খুঁজেছে, নগদ গহনা জামা কাপড় আর তৈজসপত্র সমেত শৈলকে দান করার জন্য। মেয়েকে যথাশাস্ত্র, যথাধর্ম, যথারীতি দান করতে সে সর্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সর্বস্ব খুব বেশী না হওয়ায় যেমন তেমন চলনসই গ্রহীতাও জোটেনি। শৈলর রূপও আবার এদিকে চলনসই। অথচ বেশ সে বাড়ন্ত মেয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে কখন নিজের, স্ত্রীর, অন্য কয়েকটি ছেলে-মেয়ের এবং ঐ শৈলর পেটের অন্ন—এক পেটা, আধ পেটা, সিকি পেটা অন্ন—যোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, ভাল করে বুঝবার অবকাশও কেশব পায়নি। বড় ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিল, ছেলেটা চাকরি করত স্কুলে তেতাল্লিশ টাকার মাষ্টারি। ছেলেটা মরেছে এক বিশেষ ধরণের বিস্ময়কর ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া জ্বর যে একশো ছয় ডিগ্রিতে ওঠে আর ভরিখানেক সোনার দামে যতটুকু গা-ফোঁড়া ওষুধ মেলে তা যথেষ্ট না হওয়ায় পাঁচ দিনের মধ্যে যোয়ান একটা ছেলে মরে যায় এমন ম্যালেরিয়ার গুণটাই শুধু কেশবের শোনা ছিল।

আরেকটা মেয়েও কেশবের মরেছে, সাধারণ ম্যালেরিয়ায়। এ ম্যালেরিয়া কেশবের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া শত্রু। এর অস্ত্র কুইনিনের সঙ্গেও তার পরিচয় অনেক দিনের। হরি হরি, মেয়েটার যখন এমনি কুইনিন গেলার ক্ষমতা ছিল না, জলে গুলে কুইনিন দিতে গিয়ে ময়দার আঠা তৈরী হয়ে গেল!

সদয় ডাক্তার বলল, 'পাগল, ও খুব ভাল কুইনিন। নতুন ধরণের কুইনিন—খুবই এফেক্‌টিভ। নইলে দাম বেশী নিই কখনো আপনার কাছে?'

মেয়েটা মরে যাওয়ার পর সদয় ডাক্তার রাগ করেছিল। হাকিমের রায় দেওয়ার মতো শাসনভরা নিন্দার সুরে বলেছিল, 'আপনারাই মারলেন ওকে। কুইনিন? শুধু কুইনিনে কখনো জ্বর সারে? পথ্য চাই না? পথ্য না দিয়ে মারলেন মেয়েটাকে, শুধু পথ্য না দিয়ে।'

শৈলর চেয়ে সে মেয়েটি ছোট ছিল মোটে বছর দেড়েকের। তার মুখখানাও ছিল শৈলর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। আজ তার বিনিময়ে অন্ন মিলতে পারত। কয়েক বস্তা অন্ন। নগদ টাকা ফাউ।

কিন্তু সে জন্য কেশবের মনে কোন আফসোস নেই। সে বরং ভাবে সে মেয়েটা মরে বেঁচেছে।

শৈলকে কিনল কালাচাঁদ!

কালাচাঁদের মুখ বড় মিষ্টি। বড়ই মধুর ও পবিত্র তার কথা। মুখখানা তার ফরসা ও ফ্যাকাসে। ছোট ছোট চোখে স্তিমিত নিস্তেজ নিষ্কাম দৃষ্টি। রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধার্মিক বিভীষণ বরাবর যে দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে। এটুকু ছাড়া অবশ্য বিভীষণের সঙ্গে কালাচাঁদের তুলনা চলে না। বছর পাঁচেক আগে কালাচাঁদের দাদা কি ভাবে যেন মারা যায়। দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে স্নেহ করা দূরে থাক, কালাচাঁদ তাকে জোর জবরদস্তি করে একটা বাড়ীর বাড়ীউলি করে দিয়েছিল। সেটি কালাচাঁদের পারিবারিক বাড়ী নয়। অনেক তফাতে ভিন্ন একটি ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়ীতে তখন দশ বারটি মেয়ে বাস করত।

তার পাশের বাড়ীটিও কালাচাঁদ কিছুদিন আগে ভাড়া নিয়েছে। দু'বাড়ীতে এখন মেয়ের সংখ্যা সতের আঠার। কালাচাঁদের মন্দোদরী এখন দুটি বাড়ীর কর্ত্রী। মহিলাটি কয়েক বছরের মধ্যেই আকারে একটু স্থূল হয়ে পড়েছেন। উদর রীতিমতো মোটা। ধপধপে আধাহাতা সেমিজের উপর ধপধপে থান পরলে তাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া দেবীর মতো দেখায়।

দুর্ভিক্ষে সহরে মেয়ের চাহিদা বাড়ায় এবং মফঃস্বলে মেয়ে সস্তা ও সুলভ হওয়ায় কালাচাঁদ এদিক ওদিক ঘুরেছে। দেশের গাঁয়ে এসে তার শৈলকে পছন্দ হয়ে গেল। শৈল অবশ্য তখন কঙ্কালসার, কিন্তু এ অবস্থায় এসে না পড়লে কি

আর এসব ঘরের মেয়ে বাগানো যায়? তাছাড়া, উপোস দিয়ে কঙ্কাল হয়েছে, কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে। শৈলকে সে আগেও দেখেছে। রূপ তার চলনসই হলেও কালাচাঁদের কিছু এসে যায় না। প্রতি সন্ধ্যায় রূপ সৃষ্টি করে দিলেই চলবে। প্রথম কিছুদিন অন্যে তৈরী করে দেবার পর শৈল নিজেই শিখে ফেলবে পথিকের চোখভুলান রূপ সৃষ্টির স্থূল রঙীন ফুলেল কায়দা।

প্রায় কীর্তনীয়ার মোহন করুণ সুরে আফসোস করে কালাচাঁদ বলে, 'আহা চুক্ চুক্! আপনার অদেষ্টে এত কষ্ট ছিল চক্কোত্তি মশায়।'

কেশব স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দরদের স্পর্শে চোখে তার জল নেমে আসবে কালাচাঁদ তা আশা করে না, কিন্তু চোখ দু'টি একটু ছল ছল পর্যন্ত করল না! দেখে সে একটু আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। কি যেন হয়েছে দেশ শুদ্ধ লোকের। সহানুভূতির বন্যা ক্ষীণ একটু সাড়াও জাগায় না। আগে হলে সমবেদনার ভূমিকা করা মাত্র এই কেশব চক্রবর্তী ছেলেমেয়েদের শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, চোখ মুছতে মুছতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিত, ব্যাকুল আগ্রহে চেষ্টা করত সমবেদনাকে জাগিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে। আজ ওসব যেন তার চুলোয় গিয়েছে।

সহরের আস্তানা হতে অনেক গাঁয়ে কালাচাঁদ আসা-যাওয়া করেছে। অনেক উজাড় গাঁ দেখেছে। কিন্তু গাঁয়ে বসে দিনের পর দিন গাঁ উজাড় হতে দেখেনি, নিজে ঘা খায়নি। সে কেন কেশবের নির্বিকার ভাবের মানে বুঝতে পারবে!

কালাচাঁদ কিছু চাল ডাল মাছ তরকারী এনেছিল—একবেলার মতো। এরা অবশ্য দু'বেলা তিন বেলা চালিয়ে দেবে। তা দিক। সে শুধু জিভে একটু স্বাদ দিয়ে পেট একটু শান্ত করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে চায়, পাগল করে দিতে চায়। শৈলর জন্য সে একখানি শাড়ীও এনেছে। কাপড়খানা পরে তার সামনে এসেছে শৈলর মা। শৈলর সেমিজটি প্রায় আস্ত আছে, ছেঁড়া কাপড় পরলেও তার লজ্জা ঢাকা থাকে।

কালাচাঁদ নানা কথা বলে। আসল কথাও পাড়ে একসময়।

'শৈলিকে নিয়ে যাবে? চিকিচ্ছে করাবে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'বড় কষ্ট হয় মেয়েটার কষ্ট দেখে।'

কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক ব্যবসা সম্পর্কে কাণাঘুষা কেশবের কাণেও এসেছিল। সে চাপা আর্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার বাড়ীতে রাখবে? শৈলিকে

বাড়ীতে রাখবে তোমার ?'

'বাড়ীতে নয় তো কোথা রাখবো চক্কোত্তি মশায় ?'

কেশব রাজী হয়ে বলে, 'একটু ভেবে দেখি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, একটু ভেবে দেখি।' কালাচাঁদ খুসী হয়ে বলে, 'বুধবার আসব। একটু বেশী রাতেই আসব, গাড়ীতে সব নিয়ে আসব। কার মনে কি আছে বলা তো যায় না চক্কোত্তি মশায়, আপনি বরং বলবেন যে, শৈল মামাবাড়ী গেছে।' কেশব চোখ বুজে বলে, 'কেউ জানতে চাইবে না বাবা। কারো অত জানবার গরজ আর নেই। যদি বা জানে শৈলি নেই, ধরে নেবে মরে গেছে।'

শৈলকে দেখা যাচ্ছিল। এত রোগা যে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। মনের গহন অন্ধকারে শৈশবের ভয় নড়াচড়া করে ওঠায় কালাচাঁদ একটু শিহরে ওঠে। সারা দেশটাতে বড় সস্তা আর সহজ হয়ে গিয়েছে মানুষের মরণ।

নিরুপায়, তবু ভাবতে হয়। ভাববার ক্ষমতা নেই, তবু ভাবতে হয়। উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে, কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে! ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিমঝিম করে। এ গাঁয়ের রাখালের বোন আর দীনেশের মেয়ে এভাবে বিক্রী হয়েছিল। কালাচাঁদের কাছে নয়, অন্য দু'জন ভিন্ন লোকের কাছে। তবু তো শেষ পর্যন্ত রাখাল বাঁচতে পারেনি। ঘরে মরে পচে সে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। দীনেশ ও তার পরিবারের ঝড়তি পড়তি মানুষ ক'টাকে নিয়ে কোথায় যেন পাড়ি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

তাছাড়া ওরা কেউ বামুন নয়। ঠিক কেশবের মতো ভদ্রও নয়। শুদ্রজাতীয় সাধারণ গেরস্থ মানুষ। ওরা যা পেরেছে কেশবের কি তা পারা উচিত। বুকটা ধড়ফড় করে কেশবের। তার মৃতদেহের নাড়ী সচল হয়। তালাধরা কাণে শঙ্খঘণ্টা সংস্কৃত শব্দের গুঞ্জন শোনে, চুলকানি ভরা ত্বকে স্নান ও তসরের স্পর্শ পায়, পচা মড়ার স্মৃতিভ্রষ্ট নাকে ফুল চন্দনের গন্ধ লাগে। বন্ধ করা চোখের সামনে এলোমেলো উল্টোপাল্টাভাবে ভেসে আসে ছাতনাতলা, যজ্ঞাগ্নি, দানসামগ্রী চেলিপরা শৈল, সারি সারি মানুষের সামনে সারি সারি কলাপাতা। মনে যেন পড়তে থাকে সে শৈলের বাপ!

কচুশাক দিয়ে ফ্যানভাত দু'টি খাওয়ার সময় সারি সারি লোকের সম্মুখে সারি সারি কলাপাতা দেওয়ার জন্য জ্বালগা উনানে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি ও কাড়াইভরা অন্নব্যঞ্জনের গন্ধ ও সান্নিধ্য যেন কেশবের নিশ্বাসকে চিরকালের মতো

টেনে নিয়ে দ্রুত উপে যায়। কে কার বাপ সেটা অগ্রাহ্য করার পক্ষে তাই আবার হয় যথেষ্ট।

শৈলর মা বিনায়, কাঁদে না। ঝিমায় আর গুণগুণানো গানের সুরে বিনায়। শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে। শৈলর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ বলে সে মাঝে মাঝে কথাগুলি শুনতে পায়ঃ তোর মরণ হয় না! সবাই মরে তোর মরণ নেই! ভাইকে খেলি, বোনকে খেলি, নিজেকে খেতে পারলিনে পোড়ারমুখী! মর তুই মর! কলকাতায় যাবার আগে মর!

শৈলর রসকস শুকিয়ে গিয়েছে। মনে তার দুঃখবেদনা মান অভিমান কিছুই জাগে না। খিদের বালাইও যেন তার নেই! কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ো দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়। তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে। প্যাঁচড়া চুলকিয়ে সুখ হয় না; রক্ত বার হলে ব্যথা লাগে না। অথচ পেট মোটা ছোট ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।

বুধবার সকালে পরিষ্কার রোদ উঠে দুপুরে মেঘলা করে, বিকালে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মাধ্যাহ্নে সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে কেশব চক্রবর্তীর বাড়ীশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। কুঞ্জ শানাইওলা তার সঙ্গী আর ছেলে নিয়ে আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের বিয়ে পৈতে মুখেভাতে চিরকাল শানাই বাজিয়ে এসেছে। তার অবর্তমানে সদয়কে শানাইওয়ালা আনতে হয়েছে সদর হতে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ রেখে কোনমতে বাড়ী এসে কেশব সপরিবারে মাদুরের বিছানায় এলিয়ে পড়ল। পেট ভরে খেলে যে মানুষের এরকম দম আটকে মরণদশা হয় এটা তারা জীবনে আজ টের পেল প্রথম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনি-ভাবে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়ে রইল, যেন জ্ঞানহারা মাতালেরা ঘুমাচ্ছে। পথে একবার এবং বাড়ীতে কয়েকবার বমি করায় শৈলর ঘুমটাই কেবল হল অনেকটা স্বাভাবিক। কেশবের পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হওয়ায় সে-ই কাছে বসে তার পেটে খালি হাত মালিশ করে দিতে লাগল। বাড়ীতে তেল ছিল না।

পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংস্কারগুলি ব্যথায় টনটন করছে। কালাচাঁদ এল অনেক পরে, রাত্রি তখন গভীর। পাড়ার খানিক তফাতে নির্জনে গাড়ী রেখে সে একজন লোক সঙ্গে করে এসেছে। শুধু এ পাড়া নয়, সমস্ত গ্রাম ঘুমে নিঝুম। কেবল কেশবের মনে হচ্ছিল অনেক দূরে

সদয় ডাক্তারের বাড়ীতে যেন তখনো অস্পষ্ট সুরে শানাই বাজছে।

কেশব কেঁদে বলল, 'ও বাবা কালাচাঁদ।'

'আজ্ঞে?'

'এমনিভাবে মেয়েকে আমার কেমন করে যেতে দেব, আমার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে?'

'এই তো দোষ আপনাদের। আমাকে বিশ্বাস হয় না? বলুন তবে কী করব। মালপত্র গাড়ীতে আছে। তিন বস্তা চাল—'

কেশব চুপ করে থাকে। টর্চের আলোয় কালাচাঁদ একবার তার মুখ দেখে নেয়। চোখ দেখে নেয়। চাখ ঝলসানো আলোয় বুনো পশুর চোখের মতো কেশবের জলভরা চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে, পলক পড়ে না।

খানিক অপেক্ষা করে কালাচাঁদ বলে, 'চটপট করাই ভাল। এই কাপড় জামা এনেছি, শৈলকে পরে নিতে বলুন। মালপত্র আনতে পাঠাই চকোত্তি মশায়?'

কেশব অস্ফুটস্বরে সায় দেয় না বারণ করে স্পষ্ট বুঝা যায় না। শৈলের মা আরেকটু স্পষ্টভাবে বিনায়।

কালাচাঁদ সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেয়, 'মালগুলো সব আনগে যা বস্তি ওঘেদ নিয়ে। ড্রাইভারকে বলিস যেন গাড়ীতে বসে থাকে।'

মেঝে লক্ষ্য করে কালাচাঁদ টর্চটা জ্বেলে রাখে। অন্ধকারে তার গা ছমছম করছিল। বিচ্ছুরিত আলোয় ঘরে রঙ্গমঞ্চের নাটকীয় স্তব্ধতার থমথমে বিকার সৃষ্টি হয়। কেশব উবু হয়ে বসেছে, তার হাতে শৈলর জন্য আনা রঙীন সাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শৈল।

'একটা তবে অনুমতি কর বাবা।'

কেশবের গলা অনেকটা শান্ত মনে হয়।

'বলুন।'

'শৈলিকে তুমি বিয়ে করে যাও।'

'বিয়ে? আপনি পাগল নাকি?'

শৈলর হাতে জামা কাপড় দিয়ে কেশব গিয়ে কালাচাঁদের হাত ধরে। মিনতি করে বলে যে বিয়ে সে বিয়ে নয়। দশজনের সামনে পুরুত যে বিয়ে দেয়, সাক্ষীসাবুদ থাকে, বরের দায়িত্ব আইনে সিদ্ধ হয়, সে বিয়ে নয়। এ কেবল কেশবের মনের শান্তির জন্য।

'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর

ওকে নিয়ে তুমি যা খুসী কোরো, সে তোমার ধর্মো। আমার ধর্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'

দুজন জোয়ান লোকের মাথায় শৈলর মূল্য এসে পড়েছিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাক্, তবু বেশী লোক সঙ্গে না করে মাঝরাত্রে গাঁয়ের একটা মেয়েকে নিতে আসবার মতো বোকা কালাচাঁদ নয়। একা পেয়ে তাকে কেটে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ।

কেশবের ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে সে বলল, 'যা করবার করুন চটপট্।'

কালাচাঁদের কাছ হতেই দেশলাই চেয়ে নিয়ে কেশব ঘরের এক কোণে শিলারূপী নারায়ণের আসনের কাছে প্রদীপটি জ্বালল। ঘরের বাইরে জ্যোৎস্নায় গিয়ে শৈল নতুন ও রঙীন সায়া ব্লাউজ শাড়ী পরে এল। প্রদীপে সামান্য তেল ছিল। কেশবের নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যাদানের প্রক্রিয়ার সমস্তক্ষণ শৈলর বারবার মনে হতে লাগল, প্রদীপের তেলটুকু মালিশ করলে বাপের পেট-ব্যথা হয়তো তাড়াতাড়ি কমে যেত, অতক্ষণ বাপ তার কষ্ট পেত না পেটের ব্যাথায়।

নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়, 'শীগগির করুন।' ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানত না। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ সব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুল-পাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্‌ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফঃস্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে যে বুড়োর এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।

প্রদীপটা নিবে যাওয়ামাত্র কালাচাঁদ হাত টেনে নিল। তার হাতে শৈলর হাত ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

কালাচাঁদের গা-ও ঘেমে গিয়েছিল। রুমালে মুখ মুছে শক্ত করে শৈলর হাত ধরে টানতে টানতে সে বার হয়ে গেল। নিজেও বিদায় নিল না, শৈলকেও বিদায় নিতে দিল না। দোকানীর কাছে ক্রেতা বা পণ্য কোন পক্ষই বিদায় নেয় না বলে অবশ্য নয়; কালাচাঁদের ভাল লাগছিল না। শৈলও থ' বনে গিয়েছিল।

শিউলি জবা গাছের মাঝ দিয়ে বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তায় পা দিতে দিতে

এ-ভাবটা শৈলর কেটে গেল। সেইখানে প্রথম হাত টেনে প্রথমবার সে বলল, 'আমি যাব না।'

আরও কয়েকবার হাতটানা ও যাব না বলার পর জোরে কেঁদে উঠবার উপক্রম করায় তারই শাড়ীর আঁচলটা তার মুখে গুঁজে দিয়ে কালাচাঁদ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য হাল্কা রোগা শরীরে জোর এল অদ্ভুত রকমের। পরপর কয়েকবার রোমাঞ্চ আসার সঙ্গে হাত পা-ছুঁড়ে সে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেতে লাগল। মুখে গোঁজা আঁচল খসে পড়লেও দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শিথিল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

সব শুনে কালাচাঁদের মন্দোদরী গোসা করে বলল, 'কী দরকার ছিল বাবা অত হাঙ্গামার? আর কি মেয়ে নেই পৃথিবীতে?'

'কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল।'

'ঝোঁক চেপে গেল। মাইরি? ওই একটা বোঁচানাকী কালো হাড়গিলেকে দেখে ঝোঁক চেপে গেল।'

'তুত্তোরি, সে ঝোঁক নাকি?'

কিন্তু মন্দোদরীর সন্দেহ গেল না। পুরুষের পছন্দকে সে অনেক কাল নমস্কার করেছে, আগামাথাহীন উদ্ভট সে জিনিষ। শৈলর জন্য কালাচাঁদের মাথাব্যথা, আদর-যত্ন ও বিশেষ ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে সন্দেহটা দিন দিন ঘন হয়ে আসতে লাগল। সাদা থান ও সেমিজ পরা ভদ্রঘরের দেবীর মতো যে মন্দোদরী, তার চোখে দেখা দিল কুটিল কালো চাউনি।

শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।

একদিন ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে গেল।

শৈলর চেহারাটা তখন অনেকটা ফিরেছে।

'ওকে বাড়ী নিয়ে যাব ভাবছিলাম।'

'কেন?'

'মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বৌ। ঠাকুরের সামনে ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই, এক কোণে পড়ে থাকবে দাসী-চাকরাণীর মতো।'

দু'জনে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেল! বাস্তব, অশ্লীল, কুৎসিত কলহ। কালাচাঁদ রাগ করে একটা মদের বোতল হাতে করে শৈলর ঘরে গিয়ে ভিতর হতে খিল বন্ধ করে দিল!

পরদিন দুপুরে সে গেল বাড়ী। স্ত্রীর সঙ্গে বাকী দিনটা বোঝাপড়া করে সন্ধ্যার পর গাড়ী নিয়ে শৈলকে আনতে গেল।

বাড়ীতে ঢুকতেই মন্দোদরী তাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

'শৈলির ঘরে লোক আছে।'

কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল, মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে।

'লোক আছে! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর ঘরে—'

মন্দোদরী নিঃশব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণতে আরম্ভ করল। গোণা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'লোকটা কে?'

'সেই গজেন। চাল বেচে লাল হয়ে গেছে।'

নোটের মোটা তাড়াটা নাড়াচাড়ার সঙ্গে কালাচাঁদের চোখমুখের নিঃশব্দ বিস্ময় ও প্রশ্ন অনুমান করে সে আবার বলল, 'খেয়াল চেপেছে, ও আবার বেশী টাকা কি? গেঁয়ো কুমারী খুঁজছিল।'

বুড়ী

বুড়ীর বড় পুতি আজ যাবে বিয়ে করতে। ছেলের ছেলে তার ছেলে, বড় সহজ কথা নয়। বুড়ীকে বাদ দিয়েই বাড়ীতে চলেছে আপনজনে ভরাট বাড়ীর ছেলে বিয়ে করতে গেলে যত কিছু কাণ্ড-কারখানা হয়—রাজ সংসারের সাধারণ হৈ-চৈও যেমন ওকে বাদ দিয়ে চলে। তবু যেন বুড়ী আজও হাজির আছে সব কিছুর মধ্যে প্রত্যক্ষে আর পরোক্ষে, বাড়ীর প্রতিদিনের সমবেত জীবনযাত্রাতেও যেমন থাকে। তিন কুড়ি বছরের জীবন্ত উপস্থিতির অভ্যস্ত ডালপালা আর শিকড় নিয়ে আছে—বড় ঘরের পশ্চিমের ওই মরা হাজা শুকনো গাছটার মতো, যার ডালে সারাদিন পাখী কিচির-মিচির করে আর নিশুতি রাতে ভাঙ্গাচোরা হাওয়া আওয়াজ তোলে মরমর মরমর।

ন্যাকড়া কাঁথার কাঁড়ি আর পুঁটুলি বালিশ নিয়ে বুড়ী দাওয়ায় বসে থাকে, দাওয়ার চালা নীচু করে নামানো। মরচে-ধরা কোমর, বাঁকা পিঠ, শনের নুড়ি চুল, লোল চামড়া, ফোকলা মুখ, তোবড়ান গাল, ছানিকাটা নিষ্প্রভ চোখ। লাঠি ধরে গুটি গুটি চলতে ফিরতে পারে, শক্তই আছে মনে হয় চামড়া-ঢাকা হাড় আর পাঁজর-ঢাকা ফুসফুস—বেশ জোরে চেঁচাতে পারে। শুয়ে বসেই থাকে বেশী, বিড় বিড় করে আপন মনেই বক বক করে কাটায় বেশীর ভাগ সময়। থেকে থেকে তারস্বরে সংসারের খুঁটিনাটি অব্যবস্থার সমালোচনা করে। পোড়া তামাকপাতা-গুঁড়ো খায়। মাঝে মাঝে অকারণে অদ্ভুত আওয়াজে খলখলিয়ে হাসে।

'মরণ।' বলে বৌ আর নাতবৌয়েরা। কেউ জোরে, কেউ নীচু গলায়। নীচু গলায় বলে কচি বৌয়েরা। বুড়ীকে মান্য ক'রে নয়, বুড়ী শুনলেও কানে তোলে না, কানে তুললেও কিছু আসে যায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনে শাশুড়ী ননদরা পাছে চটে যায়, এই ভয়।

নন্দ বাহারে চুল ছেঁটেছে নিতাই পরামাণিককে দিয়ে। নগদ আটগণ্ডা পয়সা আদায় করেছে নিতাই, তার ছেলে বরের সঙ্গে যাবে, কত কিছু পাবে, তবু। বাড়ীর সাতজন এই নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিতাইকে মন্দ বলেছে। এরকম দিনে-ডাকাতি এদের সয় না।

বুড়ী ডাকে পুতিকে, বলে, 'অ নন্দ, অ ঘাড়-ছাঁটানি ছোঁড়া, শোন, শোন ইদিকে, একটা কথা বলি। বিয়া তো করবি ছোঁড়া, মেয়াটা কুমারী বটে তো?'

নন্দ'র মা শুনতে পেয়ে জা'কে বলে, 'মরণ। কথা শোন বুড়ীর। তারপর চিন্তিত হয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, 'নয় বা কেন। মেয়া নাকি বড় বাড়ন্ত-ধাড়ী মেয়া।'

'ঘর ভাল।'

'ভাল ঘরে মন্দ বেশী। নয় ধাড়ি করে রাখে মেয়াকে?'

বুড়ীর কাছে উবু হয়ে বসে নন্দ বলে, 'কুমারী না তো কি—তোর মতো বুড়ী?'

'পাবি মোর নাথান কুমারী পিথিমী ঘুঁড়ে?' ফোকলা মুখে বুড়ি গাল-ভরা হাসি হাসে, 'একরাত্তির শুয়েছি তোর দাদুর সাথে? বিয়ের রাতে ভোঁস ভোঁসিয়ে পটল তুলল না তোর দাদু! সে এক কাণ্ড বটে! ভোঁসভোঁসানি শুনে আমি তো ডরিয়ে গিয়ে কান্না ধরেছি গলা ছেড়ে—হাউ-মাউ ক'রে দোর খুলে বাইরে গিয়ে। বাড়ী শুদ্ধ ছুটে এসে বলছে, কী কী, হয়েছে কী? আর হবে কী, মোর কপাল! বুড়োর ততক্ষণে হয়ে গেছে গা।' বুড়ী খলখলিয়ে হাসে।

পুতি কিন্তু তার হাসে না। পুতির মুখে তার দ্বিধা সংশয় সন্দেহ, অবিশ্বাসের পাতলা মেঘ। খানিক ঘাড় বাঁকিয়ে থেকে সে বলে, 'তাও হবে বা। মস্ত ধেড়ে মেয়ে, ওকি ঠিক আছে।'

বুড়ী গালে হাত দেয়।—'মর তুই বাঁদর। নিজে না পছন্দ করলি তুই বড় মেয়ে দেখে?'

'তা তো করলাম—'

'বোকা, হাবা, বজ্জাত! কুমারী মেয়ে নষ্ট হয়? আমি নষ্ট হইছি? বিয়ার রেতে সোয়ামী মোলো, দিন দিন যেন বাড়লো সবার মোকে নষ্ট করার চেষ্টা, নষ্ট হইছি আমি? কুমারী না হই তো তোর বাপের কিরে! মেয়া বদ্দ হয় সোয়ামী পেয়ে, কুমারী কি খারাপ হয় রে বেজন্মার পুত? মরণ তোর!—ষাট, ষাট! দুগ্গা, দুগ্গা! তোর বালাই নিয়ে মরি আমি।'

'সত্যি বলছিস?' পুতি বলে তার মেঘকাটা মুখে আলো ফুটিয়ে।

'না তো কি ?'

কাজ অকাজের ফাঁকে ফাঁকে সবাই ভাখে নন্দ উবু হয়ে বুড়ীর সামনে বসে আছে তো বসেই আছে। কথার যেন শেষ নেই দু'জনের। থেকে থেকে দু'জনে আবার হেসে উঠছে খলখলিয়ে, হি হি করে।

মেনকা হাপুস নয়নে কাঁদে আর বলে, 'আমি কোথায় যাব ? কার কাছে যাব ? মোর কে আছে ?'

নন্দর বৌকে বাড়ীর কারো পছন্দ হয়নি। একে ধাড়ী মেয়ে, তাতে দূর সম্পর্কের মামাবাড়ীতে মানুষ, বিয়েতে পাওনা গণ্ডা জোটেনি ভালরকম, গয়না যা দেবে বলেছিল মেয়ের ধড়িবাজ মামা—তা পর্যন্ত সবগুলি মেনকা নিয়ে আসেনি। তার ওপর নন্দ নিজে পছন্দ করে' বাড়ীর লোকের অমতে তাকে বিয়ে করেছে—বিয়ে করে এনে বাড়ীর লোকের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে মাথায় করে রেখেছে বৌকে। বিয়ে সম্পর্কে ছেলের অবাধ্যতার জ্বালা মানুষের জুড়োয় না, মন বিষাক্ত হয়ে থাকে বৌয়ের ওপরেই। রোজগেরে ছেলের ওপর তো গায়ের ঝাল ঝাড়া যায় না!

তার ওপর বিয়ের এক বছরের মধ্যে নন্দ মারা গেল। বর্ষার শেষে পথঘাট উঠানের কাদা যখন শুকোতে আরম্ভ করেছে, বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে নন্দ তখন বৌ নিয়ে দু'মাসের জন্য পশ্চিমে বেড়াতে যাবার জন্য আয়োজন করছে। এ বাড়ীর কোন বৌ কোন কালে একা স্বামীর সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোথাও বেড়াতে যায়নি।

এমন অলুক্ষুণে বৌকে কে বাড়ীতে রাখবে ?

মেনকার মামাকে লেখা হয়েছিল তাকে নিয়ে যাবার জন্য। সে জবাবও দেয়নি। রাখালের সঙ্গে তাই তাকে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন হচ্ছে। মামাবাড়ীর দরজায় তাকে নামিয়ে দিয়ে রাখাল চলে আসবে, তারপর যা হবে তা বুঝবে মেনকা আর তার মামা।

মেনকা কিন্তু যেতে নারাজ। মামাবাড়ীতে শুধু মারধোর আর ছ্যাকা দেওয়ার ভয় থাকলে কথা ছিল না, মামাবাড়ীতে তাকে ঢুকতেই দেবে না সে জানে। দরজা থেকেই তাকে পথে নামতে হবে।

মেনকা তাই হাপুস নয়নে কাঁদে আর বলে, 'আমি কোথা যাব ? কার কাছে যাব ?'

রোয়াকে বসে বুড়ী ডাকে, 'এই ছুঁড়ি, শোন।'

মেনকা কাছে এসে দাঁড়ায়।

'কাঁদিস কেন হাপুস চোখে, বোয়ান মন্দ মাগী?'

'আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে গো।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছে? কে তাড়িয়ে দিচ্ছে? তাড়িয়ে দিলেই তুই যাবি? তোর শ্বশুর ঘর, কে তাড়াবে তোকে?

মেনকা চুপ করে থাকে।

'মোকে পেরেছিল তাড়াতে? একরাত ঘর করিনি সোয়ামীর, বিয়ের রাতে ছটফটিয়ে মোলো। সবাই বলে, দূর দূর, অলুক্ষণে বৌ! বিয়ে হল, সোয়ামী খেয়ে কুমারী র'ল, একি মেয়ে গা? দূর! দূর! আমি গেলুম? মাটি কামড়ে রইলাম এখানকার। পারল কেউ তাড়াতে মোকে? অ্যাদ্দিন তুই সোয়ামীর সাথে শুলি, বাড়ীর বৌ হয়ে র'লি তোকে যেতে বললে তুই যাবি? মাটি কামড়ে থাক। খুঁটি আঁকড়ে থাক।'

মেনকার চোখে আশার আলো দেখা দেয়। সে সামনে উবু হয়ে বসে বুড়ীর।

বাড়ীর সবাই তাকিয়ে ছাখে মেনকা আর বুড়ীর মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস কথা চলেছে তো চলেছেই, কথার যেন শেষ নেই!

গোপাল শাসমল

সাতপাকিয়ার গগন শাসমলের ছেলে গোপাল গিয়েছিল জেলে। একদিন ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরল। জেলে যাওয়ার সময় তার বাড়ীতে ছিল মণ পঁচিশেক ধান, দুটো বলদ, একটা গরু, পুঁই-মাচা, লাউ-মাচা আর তিনটে সজনে গাছ। বাড়ী ফিরে দেখল, ধান মোটেই নেই, একটা বলদ নেই, গরুটা নেই, পুঁই মাচায় নেই, পুঁই আর লাউ মাচায় নেই লাউ। সজনে গাছ তিনটে আছে। সজনে গাছ তিনটির বয়স প্রায় গোপালের সমান। গাছগুলির অনেক ডাঁটা আর আঠা গোপাল খেয়েছে। জেলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত ডাঁটার চচ্চড়ি এবং ছেলেমানুষ থাকার বয়সটা পার হওয়া পর্যন্ত আঠা। আধপেটা ভাত খেয়ে এই ত্রিশ বছর সে জমাট বাঁধা সজনে আঠা সংগ্রহ করে করে চিউয়িং গাম-এর মতো চিবোতে চিবোতে অনেকক্ষণ ধরে কেবল এই কথাটাই ভাবল যে, জেল-ফেরত ছেলেকে আধপেটা ভাত দিতে মা উপোস দিয়েছে আর বোনকে না খাইয়ে রেখেছে, এতো ভাল কথা নয়। এর চেয়ে জেলে থাকাই যে ভাল ছিল!

তারপর গাঁ ঘুরে আসতে বেরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তার সাধ হতে লাগল, পথের ধুলায় কিম্বা কাঁটা বনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গিয়েছে তার অনুপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে। বেঁচে যারা আছে তারাও জীবন্ত নয়। খুব বেশী জীবন্ত কোনদিনই ছিল না, কিন্তু যে-টুকু ছিল তাতেই দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি পূজাপার্বণে উৎসবে এমন কি সময় সময় মারামারি কাটাকাটিও করেছে গাঁয়ের লোক। আজ সকলে ধীর স্থির শান্ত সুবোধ মানুষ—চোখে হতাশার পর্দা, চলনে হতাশার ভঙ্গি, কথায় হতাশার লম্বা টান, প্রতিটি মানুষ যেন—আর কেন, কি আর হবে, সব মায়া, মরা ভাল ইত্যাদির ক্ষীণ প্রাণবন্ত প্রতীক। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর প্যাঁচড়া। এমন ব্যাপক না হলেও অন্য রোগেরও ছড়াছড়ি। এমন প্যাঁচড়া গোপাল জীবনে কখনো ছাখেনি। যা'কে ভাল করে ধরেছে তার হাড়ে লাগানো মাংসটুকু পর্যন্ত যেন খসে খসে পড়ছে। গফুর আর বনমালীকে দেখে প্রথমে সে ভেবেছিল এ বুঝি কুষ্ঠ বা ওই ধরণের

কোন ব্যারাম। ভূষণের কাছে সে রোগের নামটা শুনল। ভূষণের হাতে ও পায়ে প্যাঁচড়া হয়েছে।

ভূষণ গোপালের মামা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু আরও বুড়ো দেখায়। একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, জোতদার কানায়ের কাছে বিশ বাইশ বছর কাজ করার অবসরে সব আবার ভুলে গেছে।

'কাজ? না, কাজ নেই। অসুখে ভুগলাম দু'মাস, তারপর হাতে পায়ে হল এই প্যাঁচড়া। ভাগিয়ে দিয়েছে।'

আজ শুধু বুড়ো নয়, ভূষণকে কেমন অদ্ভুত দেখায়। মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে দু'হাতের থাবা উঁচু ক'রে তার বসার ভঙ্গিটা পাছা-পেতে-বসা বুড়ো ভালুকের মত। থ্যাবড়া মুখটা এমন লম্বাটে হয়ে গেছে, দু'পাশ থেকে যেন পিষে দিয়েছে কোন জোরালো পেষণ যন্ত্র।

'নগা কিছু করছে না?'

'ঘানি টানছে। তুই যা অ্যাদ্দিন করে এলি। আমায় ছাড়িয়ে দেওয়ায় কানায়ের ওপর চটে ছিল। সীতু, রাখাল, বঙ্কি আর কটা ছোঁড়াকে নিয়ে কেনালে কানায়ের চালের নৌকো ধরিয়ে দিতে গেছল বাহাদুরী করে। ফাটা মাথা নিয়ে ডাকাতির চার্জে জেলে গেছে। ব্যাটা কুপুত্র চণ্ডাল। দু'বেলা খেতে পাবার মতলব ছিল ব্যাটার।'

ভূষণের মেয়ে রতন এসেছিল একখানা তাঁতের কাপড পরে।

'কি যা-তা বলছ বাবা। দাদা গেল তোমার জন্যে শোধ নিতে, তুমি বলছ তার মতলব ছিল। খেতে পাবার জন্যে কেউ জেলে যায়?'

বলে সে হাঁটু-বাঁকাবার যন্ত্রণায় মুখ বাঁকিয়ে গোপালের পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করল।

গোপাল এসে মামাকে প্রণাম করেনি। যাবার সময় ভূষণের পায়ের পাতার আধ হাত তফাতে মাটি ছুঁয়ে সে প্রণাম সারল।

পথে নেমে জোতদার কানায়ের বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল ভাবে, পৃথিবীতে যা সব ঘটছে তা তার বোধগম্য হবে না। বিশ বছরের বেশী যে কাজ করে এসেছে সে, দু'মাস অসুখে ভুগে অশক্ত হয়ে পড়ায় কানাই তাকে ভাগিয়ে দিল! কেবল তাও তো নয়। দু'এক যোজন দূরের হোক, কানায়ের সঙ্গে একটা সম্পর্কও যে আছে, তার ভূষণ মামার। যে সম্পর্কের জোরে তারও অধিকার

আছে কানাইকে বড় মামা বলার।

জোতদার কানায়ের বাড়ীর কাছে এসে কান্নার আওয়াজ শুনে গোপাল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গাঁয়ে পা দেবার পর এই কান্নার শব্দে যেন তার নিজস্ব একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার আবেষ্টনী ভেঙ্গে পড়ল এতক্ষণে, বেলা যখন খতম হয়ে এসেছে। এখন তার খেয়াল হল, গাঁয়ের এতগুলি নারীপুরুষের বুকভরা শোক কান্নায় রূপ পায়নি, কান্না সে শোনেনি গাঁয়ে এসে। মৃত্যুপুরীর নীরবতাকে এতক্ষণ সে অনুভব করেছে কিন্তু কতগুলি জীবন্ত কঙ্কাল চোখে পড়ায় সে অনুভূতিকে বুঝতে পারেনি। অথচ এ অনুভূতি তার কত চেনা! কতবার জনহীন শ্মশানে তার হৃদয় মন এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

দাওয়ায় বসে কানাই আকাশ বাতাসকে শুনিয়ে অদৃষ্টকে শাপ দিচ্ছিল। গোপাল প্রণাম না করায় চটে গেলেও শ্রোতা পাওয়ায় সে খুসী হল। তার ছেলের আজ ফিট হয়েছে। দু'বছরে তেরো হাজার টাকা উপায় করেছে এমন সোনার চাঁদ ছেলে। কোন বিশেষ অপদেবতা বা অপদেবী নজর দিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু কেন এই নজর দেওয়া, এত ধর্মো কর্মো পূজা অর্চনা করার পর।

'দু'বচ্ছর চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ে ভাবনায় দিন কাটাবার জন্যে হবে বা? শশী একটু ভয়-কাতুরে বটে তো।'

'কিসের ভয় ভাবনা?' সবিস্ময়ে কানাই শুধোয়।

'এই ধরা পড়ে জেলে যাবার ভয়। চোরাই কারবারে ভয় তো আছে।'

'কচু আছে। হাজার হাজার লোক করেছে না ও কারবার? তুই বাঁদর, জেল খাটিস। ওর জেলের ভয়টা কিসের?' থেমে গিয়ে কানাই থুতনিটা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ নাড়ে আর লোমবহুল বুকে বাঁ হাতের তালু ঘষে—অম্বলের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে বুকটা।

'সুধাময়ী এসেছে আজ।'

'বটে নাকি? বেশ।'

'এয়েছে মানে আমি আনাইনি—এয়েছে। এনে ফেলে দিয়ে গেছে আমার বাড়ী। বেয়াই বেটা, জানিস গোপাল, বজ্জাতের ধাড়ী।'

গোপাল খবরটা শুনেছিল। কানাইয়ের মেয়ে সুধার বিয়ে হয়েছিল গত বছর আশ্বিন মাসে। এবছর কার্তিকের গোড়ায় সে প্রসব হতে এসেছে বাপের বাড়ী। জামাই এসে রেখে গেছে।

হুঁকো এসেছিল। কানাই হুঁকো টেনে কাসে আর বলে, 'পেটে তিনবার

নাথি মেরেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। তাই ফেলে রেখে গেল হারামজাদার দল। এখন আমি ডাকব ডাক্তার কবরেজ, টাকা খসাবো মুঠো মুঠো—মরবে জানি, তবুও সব করা চাই। কেন বাবা? তিলে তিলে দগ্ধে মারা কেন বাপকে? মরণ সংবাদ দিলেই হত একবারে!'

'ডাক্তার এনেছেন কাকে!'

'মধুকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিয়েছি। ওর গাছগাছড়া অব্যর্থ। ভীমের মাকেও আনিয়েছি। ও বড় ভাল দাই। একাজ করে করে চুল পেকে গেছে।'

গোপাল শোনে আর ভাবে, কানায়ের বাড়ী কেন এসেছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে হঠাৎ উঠে সে বিদায় নেয়।

কানায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে জীবনে প্রথম নিজের বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে গোপাল নিজেকে ধিক্কার দেয়, ভূষণের বাড়ীর কাছে পৌঁছন পর্যন্ত। সুধার রক্তে পৃথিবী ভেবে যাচ্ছে। ভীমের সত্তর বছরের বুড়ী মা, যে কানে কম শোনে, চোখে কম ত্মাখে, সে সুধাময়ীকে মারছে। এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য মনে তার কেটে কেটে বসে গিয়েছে অথচ দুঃখ-বেদনার বদলে সে অনুভব করছে সন্তোষ! যা হওয়া উচিত এ যেন তাই হয়েছে! নিয়ম রক্ষা—নীতির সম্মান বজায় থেকেছে। কানাই কষ্ট পাক, তাতে পরম তৃপ্তি বোধ হোক, ততখানি হিংসুটে ছোটলোক হতে জেলখাটা গোপালের আপত্তি নেই। কিন্তু কানাইকে শাস্তি দেবার জন্য সুধাময়ীর রক্তে পৃথিবী ভাসিয়ে দেওয়ার মতো অমানুষ হওয়া কি তার উচিত?

গাঁয়ের অনেকের বাড়ী ঘুরেও, কার' ক'জন আপনজন না খেয়ে মরেছে শুনেও, ভূষণমামার সঙ্গে আলাপ করে সুধাময়ীর জন্য ব্যথা বোধের অক্ষমতায় গোপাল কাবু হয়ে রইল। ভূষণের বাড়ীর কাছে যখন সে পৌঁছল, সন্ধ্যা উৎরে গেছে। চাঁদ বুঝি উঠবে মাঝ রাতের কাছাকাছি, আকাশের কুয়াশায় তারাগুলি ম্লান, অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। ভূষণের মেয়ে রতন সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে এসে গোপালের হাত ধরল।

'চাল এনেছো তো? আজ আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব। মাইরি বলছি কানাইবাবু—' হুস করে একটা শ্বাস টানার শব্দ হল। 'কে? কে তুমি?' প্রশ্ন না করেই রতন তাকে ছেড়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তখন আবার গোপাল টের পেল পথ নির্জন। সন্ধ্যার খানিক পরেই এত বড় গাঁয়ের মৃত জনহীনতায় একা সে জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দাম্ভিক হয়ে। সুধাময়ীর কথা সে ভুলে গেল। রতনকে সে বড় স্নেহ করত।

মঙ্গলা

শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মঙ্গলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ডোবা থেকে উঠে আসে। পুলিশ হঠাৎ গাঁয়ে হানা দিয়েছিল মাঝরাতে। সেই থেকে এই সকাল পর্যন্ত সে ডোবার জলকাদার আগাছার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়েছে।

হাঙ্গামার পর থেকে এই নিয়ে পুলিশ সাতবার হানা দিল গাঁয়ে। আবার যদি হানা দেয় কিছুকাল পরে, শীত যখন আরও বেড়ে যাবে, এতক্ষণ ডোবায় এভাবে লুকিয়ে থাকতে হলে ডোবার মধ্যে সে জমে কাঠ হয়ে যাবে নিশ্চয়, উঠে আর আসতে হবে না। অঘ্রাণের শেষেই হাত পা তার অসাড় হয়ে গেছে, পৌষ মাঘের বাঘ মারা শীত সইবে কতক্ষণ!

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে দিশেহারা হয়ে ছুটে ডোবায় নামবার সময় বাঁ পায়ের তলাটা কিসে যেন কেটে গিয়েছিল অনেকটা, ভাঙ্গা কাচে না সামুকগুলিতে কে জানে। কত রক্ত যে বেরিয়ে গেছে দেহ থেকে, ঠিকানা নেই। আঁচল জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি বহুক্ষণ, চুইয়ে রক্ত পড়েছে, সে বেশ টের পেয়েছে। আঁচলটা কি লাল হয়েছে ছাখো!

সকাল বেলায় রোদের মৃদু তেজে মঙ্গলার অসাড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ধীরে ধীরে সাড়া আসে, ঘন ঘন কেঁপে কেঁপে সে শিউরে ওঠে। হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে ফুঁপিয়ে। প্রায় জমে যাওয়া অনুভূতিগুলিও যেন তার সূর্যের তাপে এতক্ষণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি শীতের কাঁপুনি কমাতে কানাই এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়েছিল। দু'হাতে ছিলিমটা পাকিয়ে ধরে সাঁ সাঁ করে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আধবোজা গলায় সে বলে, কাঁদিস নি মঙ্গলা। পরের বার জাগব নি আর! ঘরে থাকব। যা করার করবে।'

পাছা টন টন করে ওঠে মঙ্গলার। পাছায় সে বেত খেয়েছিল দু'মাস আগে, সে ব্যথা আজও থাকার কথা নয়। তবে উলঙ্গ করে বেত মারা হয়েছিল বলে বোধ হয় ঘটনার সঙ্গে শারীরিক বেদনাটাও তাজা কটকটে হয়ে আছে স্মৃতিতে।

কানাই-এর ছোট ভাই বলাই ডোবায় না গিয়ে উঠেছিল বাড়ীর দক্ষিণে তেঁতুল গাছটায়। ওদের মতো জলকাদায় ভিজে শীতে কষ্ট না পেলেও সমস্ত শরীরটা তার ব্যথায় টনটন করছে। কলকেটা নিয়ে দাদার দিকে পিছন ফিরে বসে টান দিয়ে সে বলে, 'মোদের আর কিছু করবে না মন করি। ফেরার ক'জনার জন্যে তো হানা দিচ্ছে, মোদের মারধোর আর না করতে পারে।'

'বলেছে তোমার কানে কানে, পীরিতের সাঙ্গাৎ তুমি।'

মঙ্গলা গর্জে ওঠে। সেই সঙ্গে তারস্বরে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগতে যেখানে যত পুলিশ আছে তাদের চৌদ্দপুরুষকে।

বাড়ীর সামনে পথ দিয়ে যেতে যেতে কথাগুলি শুনতে পায় অধর ঘোষাল। হনহনিয়ে বাড়ীর মধ্যে এসে মুখে হাত চাপা দেওয়ার মতো ব্যস্ত বিহ্বল মানায় তাকে থামিয়ে দেয়।

'থাম ছুঁড়ি, থাম। কে গিয়ে খবর দেবেঁ, মরবি যে তখন?'

'ঠিক। সবার হাঁড়ির খবর যাচ্ছে, অবাক কাণ্ড।'

'ভূষণ শালা একজন, ওবাড়ীর ভূষণ মাইতি।'

অধর ব্যাকুলভাবে ধমকে বলে, 'থাক না বাবা, থাক না। অত দিয়ে কাজ কি তোদের, চুপ মেরে থাক না?'

'চুপ মেরেই তো আছি গো বাবু। বোবা বনে গেলাম।' বলে মঙ্গলা এতক্ষণে পিঁড়ি এনে অধর ঘোষালকে বসতে দেয়।

'না, আর বসব না।' বলে অধর ঘোষাল উবু হয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসে।

অধর রোগা, ঢ্যাঙ্গা, চিকণ শ্যামবর্ণ। চুলে সবে পাক ধরেছে কিন্তু ভুরু একেবারে সাদা। শীর্ণতা, লম্বা গলাবন্ধ কোট আর পাকা ভুরুর জন্যে তাকে ভারি হিসেবী, বিষয়ী ও বিবেচক মনে হয়।

'বলতে তো ভরসা হয় না তোদের, পেটে কথা রাখতে পারিস নে। বলে বেড়াবি দশজনকে।'

কিছু বলতে চায় বুড়ো। পেটে কথা চেপে রাখতে পারছে না। তাই এমন মুখের ভঙ্গি করেছে যেন তাদের অবিশ্বাস করেও অনুগ্রহ করার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করছে। অধরের কথা আর ভঙ্গিতে গা জ্বলে যায় মঙ্গলার।

'সুদেব আর ভূদেব কাল রাতে এয়েছিল। মরমর মা'টাকে দেখতে।'

'বটে ?' কানাই আর বলাই-এর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

'সাহস কী, মাগো! গাঁয়ে এল ?' মঙ্গলা বলে।

'খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিল।'

'ধরেছে নাকি ?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে তিনজনে।

অধর মাথা নাড়ে।—'না পালিয়ে গেল। কী করে পালাল ভগবান জানে, চাদ্দিকে ঘিরে ফেলেছিল।' অধরের চোখ প্রায় বুজে আসে, মৃদু ক্ষোভ আর আপসোসের সুরে বলে, 'পুলিশ এবার বলবে, গাঁয়ের লোক ওদের লুকিয়ে রাখছে, সাহায্য করছে। ফের তল্লাসী চলবে নতুন করে, জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হবে, চষে ফেলবে গাঁটাকে। ছাখ দিকি বাপু, তোদের ক'জনার জন্যে গাঁ শুদ্ধু লোকের কি দুর্ভোগ ? নিজের মা বোন বাপ ভায়ের কথাটাও ভাববিনে তোরা ?'

মঙ্গলা থতমত খেয়ে যায়। কথাটা তো ঠিক বলেছে হাড়হাবাতে বজ্জাত বুড়ো!

বজ্জাত ? আজ প্রথম মঙ্গলার খেয়াল হয় গাঁয়ের প্রায় সব লোক কতকাল অধরকে মনে মনে বজ্জাত বলে জেনে রেখেছে তার হিসেব হয় না, অথচ ওর কোন বজ্জাতির খবর তো তারা রাখে না! সে নিজেও মনে মনে লোকটাকে কত খারাপ বলে জেনে এসেছে চিরকাল, অথচ চিরদিন সাধু, ভদ্র, পরোপকারী বিবেচক মানুষ যেন সে, এমনি ব্যবহারই করে এসেছে তার সঙ্গে। ও কেন খারাপ, কোন বিষয়ে অসাধু, অভদ্র, অনিষ্টকারী বা অবিবেচক তাতো সে কিছুই জানে না।

কিছুদিন থেকে একটু বেশী যাতায়াত আর ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করায় মনে হয়েছিল, বুড়ো বুঝি মরেছে। বয়স কাঁচা না থাক, যৌবন যা আছে তাতেই বুড়োকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়তে পারবে ভেবেছিল সে। কিন্তু এক ঘাটের জল খেতে চাওয়ার সাধও তো শেষ পর্যন্ত বুড়োর দেখা যায় নি!

'কতকাল পালিয়ে বেড়াতে পারবি বল ?' খানিক থেমে থেকে, একটু প্রায় ঝিমিয়ে নিয়ে, অধর বলে, 'ধরা পড়বি, দু'দিন আগে আর পরে। নিজেরাই ধরা দে, হাঙ্গামা চুকুক, আমরা বাঁচি। গাঁয়ে বা আসবার কী দরকার ছিল তোদের দু'জনের ? পালিয়েছিস, দূরে পালা, পুলিশ জানুক গাঁয়ের ধারে কাছে তোরা নেই। মাকে দেখতে এয়েছে! কত দরদ মায়ের জন্যে! বুড়ো বাপ খেতুনি খাচ্ছে, মায়ের চিকিচ্ছে নেই, ধরা না দিয়ে দরদ করে দেখতে এলেন মাকে। খুব তো দেখলি, গাঁ শুদ্ধু লোককে হাঙ্গামায় ফেলে গেলি ফের!'

আরেকটু বেলা করে অধর উঠল। যাবার সময় বলে গেল, 'আমার গরুটা খুঁজে দিস, কানাই বলাই। কাল থেকে পাত্তা নেই। খোঁয়াড়ে যদি ফের দিয়ে থাকে যদু দত্ত, দেখে নেব এক চোট যদুকে আমি, এই বলে গেলাম তোদের।'

আরও বেলায় মঙ্গলা বড় পুকুরে নাইতে যায়। গা-গতর জমে থাক, ব্যথা হোক, ভেঙ্গে আসুক, নাইতে হবে, রাঁধতে হবে, পোড়া পেট শুনবে না। দত্তদের বড় পুকুরের ঘাটে মেয়ে পুরুষ নাইতে আর জল নিতে এসেছে, এ ঘাটে বাসন মাজা বারণ। ফিসফাস গুজগাজ চলে গত রাত্রের ব্যাপারের। অধর গোপন কথা কিছু ফাঁস করেনি, সবাই জানে সব কথা। বরং ঘটনা কিছু বেশীই জানে অধরের চেয়ে। কেবল সুদেব আর ভূদেব নয়, ফেরারীদের আরেকজন নাকি গাঁয়ে এসেছিল কাল রাত্রে। কে সে ঠিকমত জানা যায় নি। কেউ বলে দীনু বসাকের ছেলে তিনকড়ি, কেউ বলে সতীশ সামন্তের ভাই যতীশ সামন্ত, কেউ বলে পদ্মলোচন সাউ নিজে। মঙ্গলার হঠাৎ খেয়াল হল অধরের কথার আসল মানেটা। না, তাদের পেটে কথা থাকে না বলে ব্যাপারটা তাদের শোনাতে ভাবনা হয়নি অধরের, ব্যাপারটার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আর পলাতকদের যে সমালোচনা সে শুনিয়েছে তাই ছিল তার গোপন কথা। কে জানে গাঁয়ের মানুষ দুর্ভোগ চায়, না, ফেরারীরা ধরা দিয়ে তাদের একটু স্বস্তি দিক, এটা চায়! সে দিনকাল আর নেই, ঘা খেয়ে খেয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে শান্তশিষ্ট অলস নির্জীব মানুষগুলি। ওদের মন বোঝা ভার।

তবে, কিছুই না করে, বাড়ী বাড়ী অন্তত খানাতল্লাস আর সকলকে জেরা পর্যন্ত না করে, ভোর ভোর পুলিশ গাঁ ছেড়ে চলে গেল কেন ভেবে সবাই অবাক হয়ে গেছে। মঙ্গলাও এই কথাটাই ভাবছিল।

কালু দাসের কচি বৌটা, স্বামী যার এখনো আটক আছে, জলে কলসী আর পা ডুবিয়ে বসে চুপ করে সকলের কথা শুনছিল, মাথাটা একটু হেঁট করে একদৃষ্টে কালচে জলের নীচে খেলায় রত দত্তদের পোষা বড় বড় লালচে রুই কটার দিকে চেয়ে। মঙ্গলা কলসী কাঁখে তুলে উঠছে, সে হঠাৎ বলে, 'যাবে নি? একবার ওনারা এয়েছেন, ফের তো আসতে পারেন, তাই চলে গেছে। ফের ওনারা এলে, তখন ধরবে।'

শুনে কেউ অবাক হয় না, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না। পুলিশ কেন কী করে জানা যেন চাষীর ঘরের এতটুকু কচি বৌয়ের পক্ষে আশ্চর্য নয়। বাড়ীর দিকে চলতে চলতে মঙ্গলা ভাবে, তা বটে, ওরা আসতে পারে আবার। সুদেব আর

ভূদেবের আসবার সম্ভাবনাই বেশী, মায়ের ওদের আজ-মরে কাল-মরে অবস্থা, অন্তেরাও পারে, তাদেরও মা বোন ভাই আছে।

গোলোক যদি আসে? ওর অবশ্য তেমন আপন কেউ নেই এখানে। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা ধরলে আছে, না ধরলে নেই। তবু, কিছুদিন তো ছিল তার কাছে লোকটা, আর ছিল বলেই ওর জন্য ভোগান্তি তার কম হয়নি এবং হচ্ছে না, খবর নিতে কি আসতে পারে না একবার?

যদি আসে, একচোট ওকে নেবে মঙ্গলা। পাছাটা টনটন করে ওঠে মঙ্গলার, কোমরটা একটু বেঁকে গিয়ে কলসীর জল খানিকটা উছলে পড়ে যায়। ইস, কী হয়ে গেছে দেহটা তার এক কলসী জল বইতে এত কষ্ট! জেল হোক, দ্বীপান্তর হোক, ফাঁসি হোক, গোলোকের নাগাল পেলে মঙ্গলা তাকে ধরা দিতে বলবে। নিজে ধরা না দিলে, সেই তাকে ধরিয়ে দেবে। কেন, কিসের অত খাতির ওর।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে মঙ্গলার। পায়ের কাছে ঘাসে কলসীটা নামিয়ে রেখে চারিপাশের জগতকে প্রাণভরে গলা ফাটিয়ে একচোট গালাগালি দিতে মনটা তার ছটফট করে। মাঠ জঙ্গল নালা ডোবাকে, আস্ত আর পোড়া চালার ভস্মগুলিকে, ফসল-ভরা আর ফসল-পোড়া ক্ষেতগুলিকে, অঘ্রাণের সোনার সকালকে, চলমান মানুষ আর গরু বাছুরগুলিকে। মাটিতে পায়ের পাতায় কাটার ব্যথা ভুলে গিয়ে লাথি মারে মঙ্গলা মোটে একবার। গোলোকের কাছে সে সতীত্ব দিতে পারত খুসী মনে আর গোলোকের জন্য তার সতীত্ব গেল আস্তাকুঁড়ে, লাঞ্ছনা হল অকথ্য। পা দিয়ে আবার রক্ত বেরোল, ছ্যাখো! তার খবর নিতে কেন আসবে গোলোক।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অতি কষ্টে বাড়ী গিয়ে মঙ্গলা দুটি ভাত সিদ্ধ করে শুয়ে পড়ে। পা-টা তার একটু একটু করে ফুলতে থাকে সারাদিন, সন্ধ্যার সময় ফুলে ঢোল হয়ে যায়। রাত্রে আরও ফুলবে সন্দেহ থাকে না। পলাশ পাতা পায়ে জড়িয়ে বেঁধে দাওয়ায় শুয়ে মঙ্গলা কাতরায়। জ্বরের ঘোরে তার কেমন নেশার মতো আচ্ছন্ন ভাব এসেছে, মনে তার দেহের জ্বালা যন্ত্রণার অনুভূতি একটু ভোঁতা হয়েছে। কানাই গেছে অধরের হারানো গরুটা ফিরিয়ে দিতে, বেগুন ক্ষেতে ঢোকায় দত্তরা সত্যই নাচালের খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল—আড়াই ক্রোশ পথ। বলাই গেছে বসন্ত কবিরাজের বাড়ী, মঙ্গলার জন্য ওষুধ আনতে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটা লোক সোজা উঠান পেরিয়ে দাওয়া ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেও মঙ্গলা ভয় পায় না।

ঝিমানো সুরে শুধোয়, 'কে ? কে গো ?'

গোলোক বলে, 'আমি গো, তুমাদের দেখতে এলাম।'

'সাঁঝ সকালে জানান দিয়ে দেখতে এলে ? ধরবে যে ?'

'ধরে ধরবে। ধরা দিতেই তো এইছি।'

'ধরা দিতে এয়েছো ? অ !'

'সবাই এইছি ধরা দিতে। পরামর্শ করে এইছি। গাঁয়ের সবাই মোদের বেঁধে ধরিয়ে দেবে—মোরাই বলব ধরিয়ে দিতে, জরিমানাটাও যদি মাপ হয় গাঁয়ের। ইস্, এ যে অনেক জ্বর গো !'

গোলোকের ঠাণ্ডা হাত গা থেকে সরিয়ে মঙ্গলা কপালে রাখে !

'গাঁয়ের লোক ধরিয়ে দেবে ? দিচ্ছে--পায়ে ধরে সাধো. গা। খানিক খানিক খপর কি পায়নি হেথা কেউ, তোমরা কোথায় আছ, কী করছ ? মুখ খুলেছে কেউ ? নাগসায়রে তুমি যেতে পারো, একথাটি বলতে পারতাম না আমি ? বলেছি ? দাঁতে দাঁত কামড়ে থেকেছি আগাগোড়া, মঙ্গলা একটু ঝিমায়। 'ধরা দিতে এয়েছো। এ্যাঁ ? নাই বা দিলে ধরা ? যাক না কিছুকাল। দেখা যাক না কী হয়।'

'নাঃ। মোদের জন্যে গাঁ শুদ্ধ, লোক ভুগবে ? আজ রাতটা যে যার বাড়ী কাটাব, সকালে দত্তদের ওখানে সবাইকে ডাকিয়ে বলব, মোদের আটক করে খপর পাঠাও।'

মঙ্গলা জ্বরের ঘোরে হাসে। 'সবাইকে ডাকিয়ে বললে খপর যাবে না। সবাই মিলে বরং বলবে, পালাও শীগগির। খপর দেবার যে আছে দু' একজন, তারাই খপর পৌছে দেবে ঠিক।'

বলতে বলতে কানাই বলাই এসে গোলোককে দেখে স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

গোলোক বলে, 'ভয় নেই, খপর নিতে এইছি।'

বলাই ঢোক গিলে মঙ্গলাকে বলে, 'কবরেজ মশায় মালিশ দিলে একটা। আর বললে সেঁক দিতে।'

একথার জবাব না দিয়ে মঙ্গলা কানাইকে শুধোয়, 'বুড়ো ঘরে ছিল ?'

'ছিল।'

তখন মঙ্গলা উঠে বসে। বলাই আর গোলককে বলে, 'তোমরা বসে থাকো, এখুনি আসছি।'

কষ্টে দাওয়া থেকে পা নামিয়ে বলাই-এর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'ধরে নিয়ে

চল দিকি ভাই আমাকে একটু। চটপট চল। থামো বাবু তোমরা, ফপরদালালি কোরো না, যা বলছি শোন।'

বলাই-এর ঘাড়ে ভর দিয়ে ফোলা পা-টা টেনে টেনে মঙ্গলা বাইরের কুয়াশায় বেরিয়ে যায়।

কুয়াশা গোয়ালের খড়ের ধোঁয়ায় ভারি হয়েছে।

'কোথা যাবে?'

'চল্ না দাদা।' মঙ্গলা কাতরে ওঠে।

অধরের বাড়ী পৌঁছে মঙ্গলা ভেতরে যায় না, বাড়ীর সামনে কদম গাছটার তলে দাঁড়িয়ে থাকে। বলাই ডেকে আনে অধরকে।

'শোনেন। খপর আছে।'

লণ্ঠনের আলোয় তার মুখের চেহারা দেখে অধরের সাদা ভুরু কুঁচকে যায়। সেই লণ্ঠনের আলোতেই মঙ্গলা অধরের সদরের ঘরের জানালায় দেখতে পায় ভূষণ মাইতির মুখ।

'ওরা আজ গাঁয়ে আসছে, ধরা দিতে। সব ক'জনা আসছে।'

'ধরা দিতে আসছে?'

'হাঁ, সব ক'জনা। গোলোক এসেছিল, মোকে বলে গেল।'

'অ, তা গোলোক চলে গেছে নাকি?'

'আসবে ফের। মোর কাছে থাকবে। বললে কি, আজ রাতটা যে যার ঘরে থাকবে আপনজনের সাথে, কাল সকালে ধরা দেবে। রাতে যদি খপর পেয়ে পুলিশ আসে, তবে নাকি ফের পালাবে, আর আসবেনি ধরা দিতে কোনকালে। বলে কি জানেন, গাঁয়ের লোকের মুখ চেয়ে ধরা দেবো বলে আসছি, একটা রাত যদি না ঘরে থাকতে দেয় তারা, তবে কাজ কি মোদের ধরা দিয়ে! মোর ডর লাগছে গো বাবু। কালকের মতো যদি পুলিশ আসে তো সব্বোনাশ। ওরাও ধরা দেবেনি, মোদেরও মরণ!'

কথাটা বিবেচনা করতে করতে ধীর শান্তভাবে অধর বলে, 'পুলিশ কি খপর পাবে?'

মঙ্গলা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, 'যদি পায়? কী হবে তবে? একজনাও ধরা পড়বেনি জানেন তো, গাঁয়ের আধকোশের মধ্যে পুলিশ এলে গাঁয়ে জানা-জানি হয়ে যায়। কালের মতো পুলিশ আসবে, এসে দেখবে সবাই পালিয়েছে। কী উপায় হবে?'

অধর চোখ বুজে বলে, 'ভগবান যা করেন। আমরা কী কবতে পারি বল? তবে কি জানিস, কাল এসেছিল, আজ আবার পুলিশ আসবে মনে হয় না।'

বাড়ী ফিরে মঙ্গলা শুয়ে পড়ে ধপাস করে।

বলে, 'আলোটা জ্বাল বলাই, যেটুকু তেল আছে জ্বেলেদে! দু'ভাই মিলে রাঁধাবাড়া কর কি আছে ঘরে, একটা লোক এয়েছে, থাকবে একটা রাত, খেতে দিতে হবে না তাকে? আর তুমি একটু মালিশ কর পায়ে।'

নেশা

পুলকেশের সিনেমা দেখার নেশা একেবারে ছিল না। যতীনেরও তাই। সত্যিকারের কোন ভাল ছবির খবর পেলে, রুচি, রসবোধ আর বিচারশক্তি আছে বলে তারা বিশ্বাস করে এমন কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে খবর পেলে হয়তো কখনো নিজেরা শখ করে গিয়ে দেখে আসত ছবিটা। তাছাড়া ইচ্ছে করে কখনোই তারা সিনেমায় যেত না। মাঝে মাঝে তবু যে যেতে হত তার কারণ ছিল ভিন্ন। সিনেমা যাবার ভীষণ শখ আছে অথচ কেউ না নিয়ে গেলে যেতে পারে না এমন যার বা যাদের আব্দার এড়ানো চলে না, তাকে বা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হত।

ছায়াছবি যে একেবারে তারা দুবন্ধু উপভোগ করে না তা নয়। একটু উল্টোভাবে কিছু কিছু উপভোগ করে—দর্শকের যেরকম উপভোগের জন্য ছবিটা মোটেই তৈরী হয়নি। বাংলা আর হিন্দি ছবি হলেই পুলকেশ আর যতীনের অভিনব উপভোগটা জমে বেশী। উদ্ভট অবাস্তব সৃষ্টিছাড়া একঘেয়ে কাহিনী, চরিত্রগুলির অমানুষিক খাপছাড়া আর সঙ্গতিহীন কথাবার্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গি, যেখানে সেখানে গান, উৎকট হাসি কান্না আর ভাঁড়ামি ইত্যাদি তাদের হাসির অনেক খোরাক জোটায়। অন্য সকলের তন্ময়তার মর্যাদা রাখার জন্য যেখানে সশব্দে হাসা সম্ভব হয় না সেখানে মুখে রুমাল গুঁজে হাসিটা চাপা দেয়। সময়টা তাই একরকম তাদের কেটে যায় হাই না তুলে, ঘুম না পেয়ে।

মৃন্ময়ী একদিন আশ্চর্য হয়ে পুলকেশকে বলেছিল, 'তুমি কেঁদে ফেল্লে! দৃশ্যটা খুব করুণ সত্যি কিন্তু—'

'কোন্ দৃশ্যটা?'

'মেয়েটা যেখানে রাতদুপুরে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে—'

'ও দৃশ্যটা করুণ নাকি? আমার তো ভারি কমিক লাগছিল। এত কাণ্ডের

পর অচেনা বাপের সংগে রাতদুপুরে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন মানে হয় ? আমরা নয় জানি ও লোকটা মেয়েটার বাপ। কিন্তু মেয়েটাও কি তা জানে ? আমি তো ভাবছিলাম মেয়েটা যাতে বাড়ীতেই থাকে তার জন্য প্লট এত ঘোরালো করা হচ্ছে !'

মৃন্ময়ী আহত হয়ে বলে, 'ও, তুমি কাঁদো নি ? হাসি চাপছিলে !'

দেহমনে স্বাস্থ্য, জীবনে আনন্দ, অসঙ্গতির হাস্যকর দিকটাই চোখে পড়ে আগে। তাই, জীবনের সংগে ছবিগুলির সংযোগের অভাব দেখে, কষ্টকল্পনা দেখে, সস্তা ও হাল্কা রোমান্সের গেঁজলা রস থই থই করতে দেখে, এমন কি মানুষের মনে ছবিগুলির প্রভাব যে কিছু কিছু ক্ষতিকর তা ভেবেও, পুলকেশরাও বিদ্বেষমূলক সমালোচনার ঝাঁঝ অনুভব করে না। এই সব ছবি দেখার জন্য যারা পাগল তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাবও পোষণ করে না। কেবল এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায় যে ছেলেভুলানো এ জিনিষ দিয়ে বয়স্ক মানুষ নিজেকে ভোলায় কী করে ! নিজেদের ভোলাবার এত জিনিষ রয়েছে জগতে ! এরকম আশ্চর্য হওয়ার মধ্যে নিজেদের বেশ বস্তুতান্ত্রিক ভাবপ্রবণতাহীন মনে হয় বলে খুব তারা গর্ব অনুভব করে !

তারপর জীবন আসে পরবর্তী বাস্তব অধ্যায়ের নিয়ম, অনিয়ম, প্রয়োজন আর ঘাতপ্রতিঘাতের সূচনা নিয়ে। যে ভাবে আরম্ভ করবে ভেবেছিল, পুলকেশ বা যতীন কারো আরম্ভটাই সেরকম হয় না। হাসিমুখেই তারা সেই আরম্ভকে গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন হওয়ার বৈচিত্র্যময় প্রেমের লীলাখেলায় কত সময় যে তার কোথা দিয়ে কেটে যায় !

শেষের তিন বছর একবারও পুলকেশ কোন সিনেমায় যায়নি। এই নিয়েই একদিন মৃণ্ময়ীর সঙ্গে তার দারুণ কলহ হয়ে গেল। সিনেমায় মৃণ্ময়ী হরদম যায়, অন্যের সঙ্গে। কিন্তু কেন তা হবে ? কেন তাকে পুলকেশ একদিন সিনেমায় নিয়ে যেতে পারবে না ? কোন্ স্বামী এ রকম ব্যবহার করে স্ত্রীর সঙ্গে ? তার নিজের যেতে ভাল না লাগুক, মৃণ্ময়ীর কি সখ থাকতে নেই।

'আরেকদিন নিয়ে যাব।'

'আরেকদিন কেন ? আজ নিয়ে চল।'

তাই করতে হল শেষ পর্যন্ত। বহুদিন পরে পুলকেশ সেদিন একটি বাংলা ছবি দেখল। খাপছাড়া অদ্ভুত মনে হল বটে ছবিটা, কিন্তু আজ আর হাস্যকর মনে হল না। এমন কি অজানা নতুন তরুণ ডাক্তার পাড়াগাঁয়ে পা দেওয়া মাত্র কম্পাউণ্ডারের বয়স্থা কুমারী মেয়েকে তার সঙ্গে মাঠে গিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে লাফাতে

লাফাতে ডুয়েট গান করতে দেখেও তার হাসি পেল না, বরং বেশ মিষ্টি আর রসালই লাগলো ব্যাপারটা।

মসগুল হয়েই পুলকেশ শেষ পর্যন্ত ছবিটা দেখে ও শুনে গেল।

পরের শনিবার অফিসের এক সহকর্মীর সঙ্গে সে আবার সিনেমায় গেল। পরের সপ্তাহে গেল তিনবার। কয়েক মাসের মধ্যে সে নিয়মিতভাবে সিনেমায় যেতে এবং ভালমন্দ নির্বিচারে ছবিগুলি তন্ময় হয়ে দেখতে আরম্ভ করল। বন্ধুদের সঙ্গে ছবি আর তারকাদের বিষয় আলোচনা ও তর্ক করে কেটে যেতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

একদিন ম্যাটিনিতে নাচে গানে প্রেমে বিচ্ছেদ আর শেষ মিনিটের মিলনে এক জমকালো ছবি দেখে পুলকেশ বাইরে এসেছে, দেখা হল যতীনের সঙ্গে। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, যতীন ছাতি মাথায় দিয়ে হাঁটছিল ফুটপাতে। যতীনকে হঠাৎ দেখে পুলকেশ চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। তার শরীর ভেঙে পড়েছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে আধময়লা জামা-কাপড। যতীন নিজেই তাকে দেখে কাছে এগিয়ে এল।

এতদিন পরে দেখা, কিন্তু এমনি নির্জীব হয়ে পড়েছে দু'জন যে উল্লাসটা তেমন জোরালো হল না। কিছুটা আশ্চর্য আর কিছুটা খুসী হয়ে পুলকেশ বলল, 'যতীন! কলকাতা এলি কবে?'

যতীন বলল, 'মাসখানেক। তোর বাড়ী যাব যাব ভাবছিলাম, হয়ে ওঠেনি।'

যতীনের মুখে পুলকেশ মদের গন্ধ পায়। চোখে দেখতে পায় নেশার আবেশ। কথায় একটা অস্বাভাবিক টলোমলো প্রফুল্লতা। দুই বন্ধু কথা বলে ধীরে সুস্থে, খবর নেয় আর দেয় ছাড়া ছাড়া ভাবে। এতগুলি বছর ধরে অজস্র কথা জমেছে কিন্তু বলার বা শোনার তাড়া যেন তাদের নেই।

যতীন বলে, 'আয়, বসে কথাবার্তা কই।'

'কোথায় বসবি?'

'আয় না। কাছেই।'

খানিক এগিয়ে বাঁয়ে গলির মধ্যে একটা দেশী মদের দোকানে যতীন তাকে নিয়ে যায়। শনিবারের বিকাল, ইতিমধ্যেই লোক জমে জায়গাটা গমগম করছে—ছেঁড়া কাপড় পরা খালিগায়ের লোক থেকে ফরসা জামাকাপড় পরা পর্যন্ত সব ধরণের বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী লোক। দোকানঘরের বেঞ্চিগুলি সব ভর্তি, দাঁড়িয়ে এবং উবু হয়ে বসেও অনেকে মদ খাচ্ছে। পাশের ঘরে একটা বেঞ্চে জায়গা

ছিল, পুলকেশকে বসিয়ে যতীন বলে, 'বোস, একটা পাঁট আনি। একটু সেলিব্রেট করা যাক।'

'আমি তো ওসব খাই না।'

'একদিন একটু খাবি, তাতে কি হয়েছে? এ্যাদ্দিন পরে দেখা, একটু ফুর্তি না করলে হয়?

এখানে ঢুকেই যতীনকে আগের চেয়ে বেশী তাজা, বেশী উৎসাহী মনে হচ্ছে। সেলিব্রেট করার একটা ভাল উপলক্ষ পেয়ে সে যে ভারি খুশী হয়েছে বেশ বোঝা যায়, বেশী মদ খাওয়ার জন্য নিজের মনটা আর তাকে কামড়াবে না। পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে যুক্তি পেয়েছে, কৈফিয়ৎ পেয়েছে সমর্থন পেয়েছে বেশী মদ খাবার। যতীন মদ আনতে যায়, পুলকেশ বসে বসে ভাবে। যতীনের অধঃপতনে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়।

যতীন এসে বসলে সে জিজ্ঞেস করে, 'কদিন খাচ্ছিস?'

'বছর দু'তিন?'

'এটা ধরলি কেন?'

প্রশ্ন শুনে যতীন হাসে। —'খেলে একটু ভাল লাগে আবার কেন!'

গেলাসে মদ ঢেলে ঢেলে খেতে যতীনের অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে, কথা সে বলতে থাকে তাড়াতাড়ি, বেশী বেশী। একবার চুমুক দিয়েই পুলকেশের সর্বাংগ শিউরে উঠেছিল, বমি ঠেলে উঠেছিল। আর খাবার চেষ্টা না করে সে যতীনের কথা শুনে যায়। অদৃষ্ট বড় খারাপ ব্যবহার করেছে যতীনের সঙ্গে, ঘা মেরে মেরে থেঁতলে দিয়েছে জীবনটা, কোনদিন বিশেষ সুবিধা করতে দেয়নি। চাকরীর গোড়ায় বাপ মারা গেল। কিছু টাকা হাতে পেয়ে চাকরী ছেড়ে একটা ব্যবসা আরম্ভ করেছিল, সুবিধা হল না। বীমার দালালী করেছিল কিছুদিন, সুবিধা হল না। একটা এজেন্সির কারবার ধরেছিল, সেটাতে কিছু হল না। দুটো ছেলে হবার পর বৌটা পড়ল অসুখে, সেই থেকে একটানা ভুগছে। বোনের বিয়ে দিয়েছিল, বোনটাকে তার স্বামী নেয় না। বিরক্ত হয়ে সকলকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সে কলকাতায় নতুন একটা ব্যবসা ফেঁদেছে।

'সংসারের হাঙ্গামা নেই, খরচের টাকা পাঠাই, বাস। এবার ঠিক গুছিয়ে নেব। দু'বছরের মধ্যে যদি না মোটর কিনি তো—'

জমজমাট নেশা হয়েছে যতীনের। সগর্বে বুক ঠুকে সে পুলকেশকে শোনায় ব্যবসাতে তার কেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অল্পদিনে কী ভাবে সে ফেঁপে উঠবে, অন্ত

লোকেরা কী ভুল করে আর সে কী ভুল করবে না, এমনি সব বড় বড় কথা জীবনে অসামান্য সাফল্য লাভের অহঙ্কারেই সে যেন সিধে হয়ে বসে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

পুলকেশ তার দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে, ন'টার শো-এ প্রিয় ছবিটা তৃতীয়বার দেখতে যাবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, না একাই যাবে।

বেড়া

বাড়ীর ঠিক মাঝখানে উঁচু চাঁচের বেড়া! খুব লম্বা মানুষের মাথা ছাড়িয়েও হাতখানেক উঁচু হবে। বেড়া ডিঙিয়ে কারো নজর চলবে না, অবশ্য যদি উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে নজর চালানো না হয়। নজর দেবার অন্য উপায় আছে: ফুটোতে চোখ পাতা।

বাড়ীটাকে সমান দু'ভাগ করেছে বেড়াটা, পশ্চিমের ভিটার লম্বা দাওয়া ভাগ ক'রে, উঠান ভাগ ক'রে সদরের বেড়ার চার হাত ফাঁকের ঠিক মাঝখান দিয়ে খানিক এগিয়ে বাড়ীতে ঢুকবার এই ফাঁক আড়াল ক'রতে দাঁড় করানো সামনের পর্দা-বেড়াটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে ঠেকেছে।

আগে, প্রায় সাত বছর আগে, (গোবর্দ্ধন ও জনার্দনের বাপ) অনন্ত হাতী যখন বেঁচে ছিল, তখন বাড়ীতে ঢুকবার পথ ছিল একটা দক্ষিণ-পূব কোণে। এই পথের সামনেও বসানো ছিল একটা আড়াল-করা পর্দা-বেড়া। ভাগের সময় পথটা পড়েছিল জনার্দনের ভাগে। সদরের বেড়ার আরেক প্রান্তে, অর্থাৎ উত্তর-পূব কোণে বেড়া কেটে নতুন একটা প্রবেশ-পথ করে নিতে অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় গোল বেধেছিল। ঢুকবার-বেরোবার পথই যদি না থাকল, বাড়ীর এমন ভাগ দিয়ে সে কী করবে—গোবর্দ্ধন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মালিকদের মানতে হ'য়েছিল যে তার আপত্তি সঙ্গত। অনেক মাথা ঘামিয়ে তারপর সালিশরা, যাদের প্রধান ছিলেন সদরের সেরেস্তাদারের বাবা প্রাণধন চক্রবর্তী জ্যোতির্বিদ্যাভূষণ, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ভাগের বেড়ার দু'পাশে সদর বেড়া দু'হাত ক'রে কেটে দুই অংশের ঢুকবার-বেরোবার পথ করা হোক, আর পুরনো পর্দা-বেড়া তুলে এনে স্থাপন করা হোক এই বিভক্ত পথের সামনে; কারণ ও-বেড়াটাও দু'ভায়ের বাপের সম্পত্তি। অতএব দু'জনের ওতে সমান অধিকার!

জনার্দন আপত্তি ক'রে বলেছিল আড়াল-করা বেড়া সরালে সদর বেড়ার কোণের পুরনো পথের ফাঁকে রাস্তার লোক যে তার বাড়ীর বৌ-ঝিদের দেখতে পাবে, তার কী হবে? সে এমন কী অপরাধ ক'রেছে যে, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে তাকে বন্ধ ক'রতে হবে বেড়ার ফাঁক! রীতিমত সমস্যার কথা। সালিশরা যখন মীমাংসা খুঁজতে মাথা ঘামাচ্ছেন, গোবর্দ্ধন উদার ও উদাসভাবে বলেছিল, তিন হাত বেড়ার ফাঁক-বন্ধ করার পয়সা খরচ করতে যদি জনার্দনের আপত্তি থাকে, সে এদিকের অংশ নিক। সদর বেড়ার ফাঁকের অসুবিধা ভোগ করতে গোবর্দ্ধন রাজী আছে।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সালিশরা হঠাৎ সমস্যাটার চমৎকার মীমাংসা আবিষ্কার করেন। কেন, দু'পাশে দু'হাত করে পথ করতে সদর বেড়ার মাঝখানে চার হাত অংশ তো কাটতেই হবে, তাই দিয়ে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে জনার্দনের অংশের সদর বেড়ার পুরনো ফাঁক!

এমনি দুর্য্যোধনী জেদি হিংসার চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হ'য়ে ভাগের বেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সাত বছর। অনন্ত হাতীর শ্রাদ্ধের দশ দিন পরে বেড়াটা উঠেছিল! আদালত কুরুক্ষেত্রে তারপর যত লড়াই হ'য়ে গেছে দু'ভায়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে, যত হাতাহাতি গালাগালি হ'য়ে গেছে বাগানের ফল, পুকুরের ঘাট, গাছের মরা ডালের ভাগ নিয়ে তারও যেন প্রতীক হ'য়ে আছে এই বেড়াটিই। জীর্ণ হ'য়ে এসেছে বেড়াটা, এখানে ওখানে মেরামত হ'য়েছে, আর এখানে পড়েছে মাটির চাবড়া, ওখানে গোজা হ'য়েছে ন্যাকড়া, সেখানে সাঁটা হ'য়েছে কাগজ।

বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে উঁকি মারা চলত—দু'পাশ থেকেই। হঠাৎ গোবরগোলা জল বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ত গায়ে। গোবর্দ্ধনের মেয়ে পরীবালা একদিন চোখ পেতে আছে বেড়ার ফুটোয়, জনার্দনের মেয়ে তাকে তাকে থেকে একটা কঞ্চি সেই ফুটো দিয়ে চালান ক'রে দিল তার চোখের মধ্যে। চোখ যায় যায় হল পরীবালার, মাথা ফাটে ফাটে হল গোবর্ধন ও জনার্দন দু'ভায়ের, ক'দিন পাড়ায় কাণ পাতা গেল না দু'বাড়ির মেয়েদের গলাবাজীতে। বেড়ায় কাঁথা-কাপড় শুকতে দিলে অদৃশ্য হ'য়ে যেত। এঁটো-কাঁটা, নোংরা, ছেলেমেয়ের মল বেড়া ডিঙিয়ে পড়ত একপাশ থেকে অন্যপাশে। এ পাশের পুঁই বেড়া বেয়ে উঠে ও পাশের আয়ত্তে একটি ডগা একটু বাড়ালেই টেনে যতটা পারা যায় ছিঁড়ে নেওয়া হত। বেড়া ডিঙিয়ে অহরহ আসা-যাওয়া করত সমালোচনা, মন্তব্য, গালাগালি,

অভিশাপ। চেরা বাঁশের বেড়াটাকে মাঝে রেখে এমন একটানা শত্রুতা চলত দু'পাশের দু'টি পরিবারের মধ্যে যে, সময় সময় মনে হত কবে বুঝি ওপাশের চালা পুড়িয়ে দেবার ঝোঁক সামলাতে না পেরে এপাশে নিজের চালাতেই আগুন ধরিয়ে দেয়!

গোলমাল এখনো চলে, বিদ্বেষ এখনো বজায় আছে পুরো মাত্রায়। তবে গোড়ার দিকের মতো খুটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অহরহ হাঙ্গামা চলে না, গায়ে পড়ে সহজে কেউ ঝগড়া বাধায় না। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হবে দু'পাশের মানুষগুলি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে সংযম অভ্যাস ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। আক্রমণাত্মক হিংসা কমে এসে এখন দাঁড়িয়েছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলাত্মক মনোভাবে। খোঁচাবার ও গায়ের ঝাল ঝাড়বার প্রক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে বেশ কৌশলময় ও মার্জিত হ'য়ে উঠেছে। এ পাশের ছেলেমানুষ কানাই মাঝের বেড়ার মাহাত্ম্য ভুলে ও-পাশে সমবয়সী বলাইয়ের সঙ্গে খেলতে গেলে, শত্রুপক্ষের ছেলেকে আয়ত্তে পেয়েও ও-পাশের কেউ তাকে ধরে পিটিয়ে দেয় না, আচ্ছা ক'রে মার দেওয়া হয় বলাইকে। এ-পাশ থেকে হাঁক ওঠে, কানাই। কানাই এলে তাকে চড়চাপড় মেরে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করা হয়, ও-বাড়ী মরতে গেছিলি কেনরে, বেহায়া পাজী বজ্জাত? ও-পাশ থেকে জবাব আসে বলাই-এর প্রতি আরও জোর গলার শাসানোতে, ফের যদি ও বাড়ীর কারো সাথে তুই খেলিস হারামজাদা নচ্ছার···

দু'পাশেই ছেলেমেয়ে আছে, হাজার বলে তাদের বোঝানও যায় না যে, বেড়ার ও-পাশে যেতে নেই। ছেলেমেয়েরা তাই নিরাপদ থাকে। তবে কুকুর বেড়ালের রেহাই নেই। এপাশের বেড়াল ও পাশে হাঁড়ি খেতে গেলে তার রক্ষা থাকে না।

দু'পাশের হাঁড়িই যখন প্রায় শূন্য থাকছে দুর্ভিক্ষের দিনে, জনার্দনের ছেলে চন্দ্রকুমারের বৌ রাধাবালার পোষা বিড়ালটা মেউ মেউ ক'রে বেড়াচ্ছে খিদেয় কাতর হ'য়ে, গোবর্দ্ধন একদিন কোথা থেকে যোগাড় ক'রে নিয়ে এল আধসেরি একটা রুইমাছ! মাছ দেখে খুসী হ'য়ে হাসি ফুটল সবার মুখে, দু'মুঠো চাল সেদিন বেশী নেওয়া হল এই উপলক্ষে। গোবর্দ্ধনের ছেলে সূর্যকান্তের বৌ লক্ষ্মীরাণী আঁশবঁটি পেতে কুটতে বসল মাছ।

মাছ কাটা শেষ হ'য়েছে, কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যকান্ত বৌয়ের দিকে গোড়ায় যেমন তাকাত প্রায় সেই রকম সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাছের দিকে, কোথা থেকে

রাণীবালার আদুরে বিড়াল এসে এক টুকরো মাছ মুখে তুলে নিল। মাছকাটা বঁটিটা তুলেই সূর্যকান্ত বসিয়ে দিল এক কোপ। রাণীবালার আদুরে বিড়াল একটা আওয়াজ পর্যন্ত না ক'রে মরে গেল। মাছের টুকরোটা মুখ থেকে খসে পড়ায় লক্ষ্মীরাণী সেটা তুলে রাখল চুপড়িতে।

পথের ধার থেকে মরা বিড়ালটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল চণ্ডী বসাক। চাল ছিল না কিন্তু ঘরে তার একটু নুণ আর একটু হলুদ-লঙ্কা ছিল। ঘুরে ঘুরে হত্যা দিয়ে দুটি খুদকুঁড়ো চণ্ডী যোগাড় ক'রে নিয়ে এল। ঝাল ঝাল বিড়ালের মাংস দিয়ে সে-দিন সে দু'বেলা ভোজ খেল সপরিবারে।

হত্যাকাণ্ডের খবরটা রাণীবালা পেল পাঁচুর মার কাছে। ও-বাড়িতে পাঁচুর মা দু'টি চালের জন্য গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধন্না দিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত পায়নি। নিজের চোখে সে ঘটনাটা দেখেছে আগাগোড়া। এ কি কাণ্ড মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করিস, হিংসে করে মা ষষ্ঠীর বাহনকে মারলি একাদশীর দিন, এত শত্রুতা ?

'দু'টি চাল দিবি বৌ ? দে মা, দু'টি চাল ? বিড়াল ছানা দেব তোকে একটা, তোর পায়ে ধরি খুদকুড়ো যা'হোক দুটি দে।'

'কোথা পাব গো ? চাল বাড়ন্ত। খুদকুঁড়ো শাউড়ী আগলে আছে।'

বলে বিড়ালের শোকে রাণীবালা কাঁদতে থাকে, বাড়ীর সকলের কাছে নালিশ জানায়। সামলাতে না পেরে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে, অভিশাপও দিয়ে বসে ও-পাশের খুনেদের। ছেলেবেলা থেকে রাণীবালা বিড়াল পুষতে ভালবাসে, কত পোষা বিড়াল তার মরে আর হারিয়ে গেছে। ও-বাড়ীর লোক হত্যা না ক'রলে হয়তো বিড়ালটার জন্য এত শোক তার হত না।

কিন্তু এমনি অবাক কাণ্ড, এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানোর বদলে জনার্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ' চুপ কর বাছা। বাড়াবাড়ি কোরো না।'

চন্দ্রকান্তও প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'তোমার বিড়াল যায় কেন চুরি করে খেতে ?'

রাণীবালা হকচকিয়ে যায়, ভেবে পায় না ব্যাপারখানা কি। রাগে অভিমানে তার গা জ্বালা করে, ভাবে না খেয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু ভরসা পায় না। কারো পেট কলমীশাক-সেদ্ধ দিয়ে দুটি ভাত খেয়ে ভরে না। কেউ যদি তাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি না করে সে না খেয়ে গোসা ক'রে শুয়ে থাকলেও !

চন্দ্রকান্ত তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়—পুলপারের জমিটা না বেচে আর উপায় নেই। গোবর্ধন ও জনার্দন দু'জনে মিলে না বেচলে জমিটা বেচবারও উপায়

নেই। কাল দু'জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রছে প্রাণধন চক্রবর্তীকে জমিটা বেচে দেবে। এখন কোন কারণে গোবর্দ্ধন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসলে মুস্কিল হবে।

'ঝগড়াঝাটি কারো না খবর্দার, ক'দিন মুখ বুজে থাকো।'

বিড়াল মারার সময় গোবর্দ্ধন উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসে ব্যাপার শুনে সে-ও অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্যকে বলে, 'একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের? এমনি করে ফ্যাকড়া বাধাও, ব্যাস, জমি বেচাও খতম। খেয়ো তখন কচুপোড়া সিদ্ধ ক'রে। খবর্দার, কেউ ঝগড়া করবে না ওদের সাথে। মুখ বুজে থাকো ক'দিন।

সাত বছরের শত্রুতা স্বার্থের খাতিরে একদিন হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল। দু'পারেই কটু কথা যদি বা কিছু বলা হল, হল চুপি চুপি, চাপা গলায়, নিজেদের মধ্যে। এপার কথা বলল না বটে ওপারের সঙ্গে সোজাসুজি কিন্তু ওপারকে শোনাবার জন্যই এপার চেঁচালো, 'ও কানাই, ওদের বেগুণ ক্ষেতে গরু ঢুকেছেরে!' ওপারও চেঁচালো এপারকে শুনিয়ে, 'ও বলাই, ওদের পুঁটু পুকুরপাড়ে একলা গেছে-রে!' আমতলায় কানাই বলাইকে খেলতে দেখে কোন পার কিছু বলল না। এপারের ছেলে ওপারে যাওয়ায় ওপারের ছেলে চড় খেল না। লক্ষ্মীরাণীর বিড়াল প্রায় সারাটা দুপুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল ওপারের দাওয়ার কোণে জড়ো করা ছেঁড়া চটে। হাতটা মনটা বার বার নিসপিস করে উঠলেও রাণীবালা পর্যন্ত তাকে কিছু বললে না। ওপারের পুঁই গাছের সতেজ ডগাটি লক লক ক'রে বাতাসে দুলতে লাগলো এপারের এলাকায়!

কথা যা বলাবলি হল তিনদিনে দু'পারের মধ্যে, তা' শুধু গোবর্দ্ধন আর জনার্দনের জমি বিক্রি নিয়ে গম্ভীর নৈর্বক্তিক কথা, তবু এভাবেও তো সাতবছর তারা কথা বলেনি।

দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়ে টাকা পাবার দিন সকালে বেড়ার এপার থেকেই গোবর্দ্ধন বলে, 'কখন রওনা হবে, জনা?'

'এই খানিক বাদেই', জবাব দিয়ে, একটু থেমে জনার্দন যোগ দেয়, 'ফেলনার জ্বরটা বেড়েছে।'

ফেলনা রাণীবালার ছেলে।

একসাথে বেরোয় দু'জনে, জনার্দন ডাক দিয়ে নিয়ে যায় গোবর্দ্ধনকে। একসাথে বাড়ী থেকে বেরোবার কোন দরকার অবশ্য ছিল না। চক্রবর্তীর বাড়ী হ'য়ে তারা সাব রেজেষ্ট্রারের অফিসে রওনা হবে, একে একে গিয়ে সেখানে জুটলেও চলতো। কিন্তু সাত বছর বিবাদ ক'রে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কাটাবার পর দু'ভাই যখন

শান্ত ভাবে ক'দিন ধরে কথা বলে, তখন কি আর দরকার আছে অত হিসেব করে সব কাজ করার ! দু'জনে চলতে থাকে একরকম নির্বাক হ'য়েই। মাঝে মাঝে এ ওর মুখের দিকে তাকায় আড়চোখে। সাত বছর দু'জনের বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে সংসারের চাপে, দুর্ভিক্ষের গত দু'বছরেই যেন বেশী বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও কি আছে ভগবান জানেন।

'দরটা সুবিধা হল না।'

'উপায় কি ?'

'ডবল দরে এমন জমি মিলবে না।'

'ঠিক। লতিফের সেচা জমির চেয়ে ভাল ফসল দিয়েছে গতবার।' গোবর্দ্ধন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে।—'শোন বলি, জনা। না বেচলে হয় না জমিটা ? এক কাজ করি আয়। না বেচে বাঁধা রাখি, পারি তো ছাড়িয়ে নেব দু'জনে মিলে।'

'চকোত্তি মশায় কি রাজী হবে ?'

'রাজী না হয় তো মধু সা'র কাছে বাঁধা দেব। নয় তো রথতলার নিকুঞ্জকে। বেচে দিলে তো গেল জন্মের মত। যদি রাখা যায় !'

গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন ও জনার্দন—অনন্ত হাতীর দুই ছেলে, কথাটা বিচার ও বিবেচনা ক'রে দেখতে থাকে। দেখে লোকের মনে হয় যেন আলাপ ক'রছে দু'টি সাঙ্গাৎ।

এদিকে জ্বর বাড়তে বাড়তে ফেলনার যায় যায় অবস্থা হয় দুপুর বেলা। চাঁচের বেড়া থাকলেও ওপারে সব টের পায় সবাই। সূর্যের মা ইতস্তত করে অনেকক্ষণ, ফিসফিস ক'রে সূর্য আর লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করে কয়েকবার, 'যাব নাকি ?' তারপর বেলা পড়ে এলে সতীরাণীর বিনুনী কান্না শুনে হঠাৎ মনস্থির করে সাত বছর পরে সূর্যের মা বেড়ার ওপারে যায়, আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ফেলনার শিয়রে চাঁদের মার পাশে। সন্ধ্যার আগে ফেলনা মারা গেলে মড়া কান্না শুনে এপারের বাকী সকলেও হাজির হয় ওপারে। সাত বছরে পাঁচবার মড়া কান্না উঠেছে জনার্দনের অংশে, কিন্তু গোবর্ধনের অংশ থেকে বেড়া পেরিয়ে কেউ কখনও আসেনি। সাত বছর পরে আজ বেড়ার দু'দিকের মেয়েরা বেড়ার একদিকে হ'য়ে একসঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করে। চাঁদ শোকের নেশায় পাগলের মত কাণ্ড আরম্ভ করলে সূর্য তাকে ধরে রাখে। একটু রাত করে গোবর্দ্ধন ও জনার্দন যখন বাড়ী ফেরে তখনও দেখা যায় ওপারের প্রায় সকলেই রয়েছে এপারে, ওপারের ছেলেমেয়েগুলি ঘুমিয়ে

পড়েছে এপারের মাদুরে কাঁথায়, এপারের ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে।

তাই বলে যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি বন্ধ হ'য়ে গেল দু'পারের মধ্যে চিরদিনের জন্য, উঠানের মাঝখানে পুরানো চাঁচের বেড়াটা থেকেও রইল না, তা নয়। মানুষ ত'হলে দেবতা হ'য়ে যেত! তবে পরের আশ্বিনের ঝড়ে পচা বেড়া পড়ে গেলে সেটা আবার দাঁড় করবার তাগিদ কোন পারেরই দেখা গেল না। বেড়াটা ভেঙে জ্বালান হতে লাগলো দু'পারেরই উনানে। দু'পারের ঝাঁটার সঙ্গেও সাফ হ'য়ে যেতে লাগলো বেড়ার টুকরোর আবর্জনা। শেষে একদিন দেখা গেল দাওয়ার বেড়াটি ছাড়া উঠানে বেড়ার চিহ্নও নেই, বাড়ীর মেয়েদের ঝাঁটায় দু'টির বদলে একটি উঠান তকতক ক'রছে।

তারপর ?

কাণকালি গাঁয়ের খালে একবার একটা কুমীর এসেছিল। মানুষখেকো মস্ত কুমীর। পরপর তিনটি বৌকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ের। একজন মাঝবয়সী, দু'জন তরুণী। একজন রোগা ন্যাংলা, একজন বেশ মোটাসোটা, আরেকজন ছিপছিপে দোহরা গোছের লম্বাটে। মোটা বৌটি কুমীরের পেটে গিয়েছিল একাই। অন্য বৌ দু'টির একজনের গর্ভ ছিল সাত আট মাস, অন্যজনের কাঁখে ছিল ছোট একটি শিশু। তার পেটেও একটা কিছু ছিল ক'য়েক মাসের। তাকে যখন কুমীর ধরল, বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য তাকে সে যত জোরে যত দূরে পারে ছুঁড়ে দিয়েছিল। মায়ের প্রাণ তো!

কান্তি দাসের বিধবা বোন সনকা বাচ্চাকে তুলে আনে।

সেই শিশুর বয়স এখন পনের বছর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে! টেরা বাঁকা আধ শুকনো বাঁ হাতটা একেবারেই অকেজো, আঙুল গুলি শক্ত হয়ে গেছে, বাঁকে না। ডান হাতে বেশ জোর আছে, বিশেষ কর্ম্মতৎপর নয় বটে, কারণ কোন কাজেই পটুতা অর্জন করার ধৈর্য তার নেই, কিন্তু হাতটি যেন সব সময়েই কাজের জন্য অস্থির ও চঞ্চল হয়ে থাকে, অথবা অকাজের জন্য। তার বাবা গিরিশ আবার বিয়ে করেছিল এগার মাসের মধ্যেই, কিন্তু প্রথম পক্ষের একমাত্র খুঁতে ছেলেটাকে মানুষ করার ত্রুটি সে করেনি—স্কুলে পর্যন্ত দিয়েছে। স্কুলে গজেন ক্লাস সেভেন পর্যন্ত উঠেছিল। ফেল করে করেই সে ক্লাসে উঠেছিল বরবার কিন্তু একবার ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে উঠেছিল ফাষ্ট হয়ে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই চমকপ্রদ ঘটনায়। কিন্তু শুধু ওই একবার। তার আগে বা পরে আর কখনো সে পরীক্ষায় পাস করেনি—একমাত্র ড্রয়িং-এর পরীক্ষা ছাড়া। ড্রয়িং-এ তার হাতটা ছিল পাকা। এক হাতে এত সহজে এত ভাল ড্রয়িং সে করতে পারত যে, অন্য

ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে থাকত। ড্রয়িং মাষ্টারের চেয়ে তার আঁকা পাখী ও গাছ জীবন্ত হ'ত বেশী। তবে ছেলেবেলাতেই কেমন বখাটে হয়ে গেল ছেলেটা। ক্লাস সেভেনে একবার ফেল করার পর আর তাকে পড়ানোই গেল না। পরপর কয়েকটি কেলেঙ্কারীর পর গিরিশ তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়িয়ে দেবার পরেও সে অবশ্য গিরিশের বাড়ীতেই থাকে। তাড়ানো ছেলের মতো থাকে।

এই বয়সেই দড়ির মতো পাকিয়ে দেহের মাংসপেশীগুলি তার শক্ত হয়ে গেছে, রোগা শরীরটাতে শক্তি আর সহিষ্ণুতা আশ্চর্যরকম। মুখে স্থায়ী ছাপ পড়েছে একটা শ্রান্ত সকরুণ জিজ্ঞাসার, ভাঙা বাঁকা নাকটা যেন জিজ্ঞাসার ভারেই নুয়ে গেছে। আর কী ভীরু তার দুটি চোখ! সবাই যেন যখন তখন তাকে মারে, আপন পর ছোট বড় দেবতা মানুষ নারী পুরুষ যে যেখানে আছে। নিরুপায় সহনশীলতায় সে যেন চুপচাপ সয়ে যায়। অসহ্য হ'লে অন্তরালে কাঁদে।

মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য সে গাঁ ছেড়ে উধাও হয়ে যেত। এবার প্রায় ছ'মাস কোথায় গিয়ে কাটিয়ে এল কেউ জানে না। সবাই যখন ভাবতে আরম্ভ করেছে যে আরও অনেকের মতো সেও দুর্ভিক্ষের কবলে গেছে চিরদিনের মতো, তখন সে একদিন ফিরে এল। সাজপোষাকের তার উন্নতি দেখা গেল অদ্ভুত রকমের—সিল্কের পাঞ্জাবী, ফাইন ধুতি, চকচকে বার্ণিশ করা জুতো। গাঁয়ে থাকবার তার ঝোঁক দেখা গেল না, যদিও গিরিশ আর বাড়ীর লোকের কাছে খাতিরের এবার আর সীমা রইল না তার। দু'একদিন থাকে' ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ জমায়, বড়ই তাকে মিশুক বলে মনে হয় এবার। ক্ষণে ক্ষণে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে উদ্ভট চেহারার একটা কেস বার করে তা থেকে খাঁটি মার্কিন মিলিটারী সিগারেট নিয়ে টানে—আগে সে তামাক আর বিড়ি খেত, মাঝে মাঝে পয়সায় দুটোওলা সিগারেট।

লালু আর মবুবকেও সিগারেট দেয়। ওদের সঙ্গে এবার তার বড় ভাব হয়েছে। লালুর বয়স এগার বছর, মবুবের বার। সমবয়সী বয়স্ক লোকের মতোই তারা তাদের মেয়ে সংক্রান্ত ব্যবসার কথা বলে, অশ্লীল হাসিতামাসাগুলি পর্যন্ত তাদের হয় বয়স্কদের মতো।

গজেন বলে, 'মদনের বোনটা পিছায় কেন রে?'

লালু বলে, 'ডরায়। লালমুখো গোরাদের যদি ধরিয়ে দি?'

'লালমুখো গোরা কিসের?' গজেন বলে বেজার হয়ে।—'মোদের বিবি'সাব কি কয়? মেহের বিবিসাব?'

মবুব বলে, 'কয় কি, তোরা পোলাপান, তোদের কথায় গিয়ে মরব ?'

'পোলাপান ঠাউরেছে, না ?'—একটা কুৎসিত ইঙ্গিতে তারা যে পাকাপোক্ত পুরুষের চেয়ে বেশী কিছু সেটা প্রমাণ করে তিনজনে হাসে। মানুষ বুড়ো হয়ে মরে গিয়ে যত বুড়ো হয় গজেন তার চেয়ে পাকা। হাসাহাসির পর সে বলে, 'তা কথা বেঠিক না। মাগী ছাড়া মাগীরা ভরসা পায় না। চপলার জন্যে এ মুশকিল।'

চপলার খারাপ রোগ হয়েছে, সর্বাঙ্গে ক্ষত। দামী কাপড় পরে হাসিমুখে সে আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কটিবাজারে কাজ করতে যাবার জন্য মেয়েদের ভরসা দিতে পারে না।

কথাটা ভাববার মতো। ভাবতে ভাবতে গজেন বাড়ী যায়। বাড়ী পৌঁছেই ভাত বাড়বার হুকুম দেয়, এখুনি তাকে কটিবাজার রওনা হতে হবে। রোজগেরে ছেলেকে বাড়ীর মেয়েরাই সাগ্রহে ভাত বেড়ে দিত কিন্তু তারা কেউ নড়বার চড়বার আগেই ওবাড়ীর হাবো যেন উড়তে উড়তে পিঁড়ী পেতে তার ভাত বেড়ে এনে দেয়! গজেনের নতুন মা, মাসী আর পিসীরা অসন্তুষ্ট হয়ে আড়চোখে তাকায়। ছুঁড়ি যে গজেনেরি দেওয়া নতুন রঙীন শাড়ি পরে এ বাড়িতে এসে ফর ফর করে উড়ছে, এতে তাদের চোখ জ্বালা করে আরও বেশী।

'ফিরবে কবে ?' সভয় ভক্তিতে হাবো জিজ্ঞেস করে। গলা তার প্রায় বুজে আসে আবেগে।

'পরশু তরশু ফিরব।'

হাবোকে মন্দ দেখাচ্ছে না রঙীন কাপড়ে, গজেন ভাবে। একটু আশ্চর্য হয়েই সে মেয়েটার সারা গায়ে একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নেয়—মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এদিক ওদিক আর তার একান্ত অনুগত এই যে একটা মেয়ে আছে, এর কথা তার খেয়ালও হয় নি একবার। একটু হাবাগোবা মেয়েটা, চোখ একটু ট্যারা, হাড়গিলের মতো রোগা শরীর। কিন্তু বয়েস তো কম! তাছাড়া, এরকম হাবা গোছের মেয়েই ভাল, সহজে বাগানো যায়, ভয় দেখিয়ে সহজে কাবু করা চলে।

'হাবো, সঙ্গে যাবি ? কাজ করে খাবি ? কাপড় গয়না পাবি ?'

'যাবো !'

হাবোর চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

চিরদিন এই মেয়েটা কেন যে তার এত অনুগত গজেন জানে না—পৃথিবীতে এই একজন! কোনদিন ভাবেও না। হাবো তার কাছে অতি সস্তা, তাকে অন্ধ

আবেগের সঙ্গে ভক্তি করে বলে। তার পঙ্গু, বিকারগ্রস্ত জীবনেরই একটা অঙ্গ হিসাবে মেয়েটা তার জীবনে মিশে ছিল বরাবর। আছে তো আছে, এইভাবে। তার নতুন ব্যবসায়ের কাঁচা মাল হিসাবে আজ মনে মনে ওকে যাচাই করতে গিয়ে মেয়েটার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠে তার এলোমেলো ভাবনা জাগে। কেমন আকুপাঁকু করে মনটা নানা বিরুদ্ধ চিন্তায়। বিধবা ভাগ্নী রাসিকে হারাধনের আস্তানায় পৌছে দিতে পারলে কী রকম হয়। রাসি খুব রূপসী, ওকে দেখলে কথাটা সে না ভেবে থাকতে পারে না। ভাবতে গেলে আবার কেমন জ্বালাপোড়া আর অস্থির ভাব সুরু হয়। সে কি আর সত্যি নিজের ভাগ্নীকে হারাধনের কবলে দিয়ে আসবে। কিন্তু তবু ভাগ্নীটার জন্য সে জ্বালাতন হয়ে উঠেছে। তাকে দেখলেই মন তার দাম কষা সুরু করে!

হাবো তার সঙ্গেই বার হয়। অনেকক্ষণ হাঁ করে থাকায় লালা গড়িয়ে পড়েছিল, সসপ্ করে একবার লালা টেনে সে মুখটা বন্ধ করে দেয়। কয়েকটা বাড়ী পরেই হাবোর বাবা দয়ালের খড়ের ঘর। গজেনের সঙ্গে মেয়েকে আসতে দেখে দয়াল ভ্রূকুটি করে তাকায়, কিন্তু গজেন কাছাকাছি এলে তার মুখখানা বেশ অমায়িক মনে হয়।

'তেল একটিন দিলি না বাবা?'

'দেব দেব। পরশু কি তরশু নিয়ে আসব সাথে।'

কোটের বাঁ হাতটা ঝুলছিল লড়বড় করে ডগাটা পকেটে গুঁজে সে খাল ধারে এগিয়ে যায়। মিলিটারী, সরকারী, আধা-সরকারী আর লাইসেনী নৌকা চলছিল খাল দিয়ে। একটা নৌকাকে সে হাঁক দেয়, জানায় তার পাশ আছে। নৌকা ধারে এসে তাকে তুলে নেয়।

কটিবাজারে সমারোহ ব্যাপার। চারদিকে অস্থায়ী চালাঘরের অরণ্য, মাছির মতো মানুষের ভিড়, নতুন রাস্তা কাঁপিয়ে হরদম লরীর আনাগোনা। ফাঁকায় পাহাড় সমান স্তূপাকার চালের পচা গন্ধে চারিদিক্ মসগুল।

হারাধনকে গজেন ক্ষেন্তির ঘরে খুঁজে বার করে। হারাধন লোকটা বেঁটে ও বলিষ্ঠ, ঘাড়ে-গর্দানে এক করা, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মাথার চুলে পাক ধরেছে। এই অবেলায় মদ খেয়ে চোখ লাল করে ফেলেছে।

'মাগী চাই একটা।'

গজেন তাকে খবরাখবর দেবার পর হারাধন বলে এক ঢোঁক মদ গিলে। ছোট ছেলে দিয়ে একদিকে যেমন সুবিধা আছে, অন্যদিকে তেমনি অসুবিধাও

অনেক। ছোট ছেলে যে কোন বাড়ী গিয়ে যে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে পারে, কেউ কিছু সন্দেহ করে না। মেয়েলোক কেউ আনাগোনা করলে বরং খটকা লাগতে পারে লোকের মনে কিন্তু এগার বছরের ছেলে যে মেয়ে ভজানোর কাজে লেগেছে, লোকের এ ধারণা সহজে হয় না। কিন্তু অতটুকু ছেলের কথাতে আবার ভরসা করতে মেয়েরা সাহস পায় না, এই হল মুস্কিল। খাঁটি গেরস্ত ঘরের দু'তিনটি মেয়ে প্রায় তৈরী আছে, চপলার মতো চালাকচতুর হাসিখুসী নাদুসনুদুস একজন মাগীর এখন একবার গাঁয়ে ঘুরে আসা দরকার। শাড়ী গয়না পরে গিয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে আসবে ওদের যে, ওদের জন্যও কেমন পেট-ভরা খাওয়া, ভাল ভাল কাপড় আর দামী দামী শাড়ী গয়না রয়েছে তৈরী হয়ে, কটিবাজারে এসে খেটে উপার্জন করে নিলেই হয়।

'বেশী গয়না না কিন্তু।'

গজেন তা জানে। বেশী গয়না দেখলে খটকা লাগে মানুষের মনে। গরীব মানুষের মনে।

'না, বেশী গয়না না।'

দুদিন পরে ফুল, একটিন কেরোসিন এবং আরও নানারকম জিনিষপত্র নিয়ে গজেন নৌকায় কাণকালি আসে। ফুল দেখতে বিশেষ সুন্দরী নয় কিন্তু তার চেহারায় একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে ঘরোয়া ভাবের। মা শিশুকে আদর করতে করতে একেবারে গদগদ হয়ে পড়লে তখন তার যে রকম মুখের ভঙ্গি হয়, তারই স্থায়ী ছাঁচে ঢেলে যেন মুখখানা গড়া হয়েছে ফুলের। তার কথা মিষ্টি, হাসি মোলায়েম। তবু তাকে যারা চেনে তারা তাকে ভয় করে। এই শান্ত নম্র গেরস্ত বৌটির মতো চেহারার ভিতরে যে বুদ্ধি আছে তার ধারে অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

কাণকালি পৌঁছে একটা দুঃসংবাদ শোনা যায়। কোনো এক নারীসঙ্ঘ থেকে দু'জন মহিলা কর্মী গাঁয়ে এসেছে আগের দিন সকালে। বৈরাগী দাসের সেই বৌটাকে তারা সঙ্গে এনেছে কটিবাজারের বাজার থেকে সংগ্রহ করে, ওদের কথায় জীর্ণ শীর্ণ জ্বরগ্রস্ত বৌটাকে বৈরাগী ক্ষমা করেছে, গ্রহণ করেছে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে মেয়ে দু'জন সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে, লোকের কথায় ভুলে মেয়েরা যেন কোথাও না যায়। লোভে পড়ে গিয়ে দু'দিনে মেয়েদের কি অবস্থা হয়, রোগে ব্যারামে শরীর একটু ভাঙ্গলেই কি ভাবে পথে এসে দাঁড়াতে হয়, বাগে পেলে কি ভাবে দূরে দূরে চালান করে দেওয়া হয়, সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। বৈরাগী দাসের

বৌটাকে সামনে ধরছে প্রমাণ হিসাবে।

সঙ্গে দু'জন বাবু আছে তাদের। লালু আর মবুবকে তারা কত উপদেশই যে দিয়েছে। স্কুলের ছেলে তারা, এই বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে খারাপ কাজে লাগা কি উচিত ? — এমনি বড় বড় কত কথা।

'সিগারেট চাইতে ছোকরা বাবুটা রেগে টং !'

লালু আর মবুব খিলখিলিয়ে হাসে।

গজেন চিন্তিত হয়ে ফুলকে নৌকায় রেখে একাই নেমে যায়। অবস্থাটা ভাল না বুঝে মাগীটাকে সঙ্গে করে গাঁয়ের মধ্যে যেতে তার ভরসা হয় না। কেরোসিন-তেলের টিনটা সে সঙ্গে নিয়ে দয়ালের বাড়ী পৌঁছে দেয়।

তখন শেষ দুপুর। বাকী বেলাটা সারা গাঁয়ে ঘুরে গজেন ভড়কে যায়, চটেও যায়। যারা তাকে দেখতে পারত না কোনদিন তাদের কথা বাদ যাক, জিনিষপত্র-দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে যে সব দুর্বল অসহায় মানুষের কাছে তার বেশ খাতির জমেছিল, তারাও যেন অনেকে কেমন দূরে সরে গিয়েছে, তাকে ভাল করে আমল দিতে চায় না। ঘোষপাড়ায় ঢুকবার পথে পাড়ার পাঁচটা ছেলে তার পথ আটকাল, স্পষ্ট বলে দিল পাড়ায় ঢুকলে তার একটি মাত্র আস্ত হাতটা মুচড়ে ভেঙ্গে দেবে। হাত কার ভাঙ্গে আর কার আস্ত থাকে, গজেন তা দেখে নেবে, কিন্তু অবস্থা তো সুবিধাজনক নয়। মদন আমতা আমতা করে আবোল তাবোল কি যেন বকল। তার বোনটা কথাই বলল না তাদের সঙ্গে। মেহের দরজা খুলল না।

সন্ধ্যার সময় মন খারাপ করে গজেন নৌকায় ফিরে যায়। দুচোখে তার ঘনিয়ে আসে গভীর বিষাদ। নৌকার গলুই-এ বসে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে শুনতে এক অজানা দুর্বোধ্য বেদনার রহস্যময় সঞ্চারে তার মন উদাস অবসন্ন হয়ে আসে। বিকৃত উত্তেজনার অবসান ঘটলেই চিরদিন তার এরকম মন কেমন করে।

ফুল বলে, 'কি গো ভাব লাগলো ?'

'ভাবছি। আজ নামা হয় না, নায়ে থাকবো।'

'ও বাবা, ডর লাগবে।'

'আমি থাকবো।'

'তাতে বুঝি ডর কম ?'

ফুলের পিপাসা পেয়েছিল। আজ আর নামতে হবে না স্থির হওয়ায় সে বোতল বার করে তৃষ্ণা মেটাবার আয়োজন করে। গজেনকে ডেকে নেয় ছই-এর

মধ্যে। সেখানে কড়া মিলিটারী চোরাই মদ আর ফুলের সাহচর্যে ক্রমে ক্রমে গজেনের উত্তেজনা ফিরে আসায় কাব্যিক বিষাদ কেটে যায়।

আরও কিছু পরে বেশ মেতেই ওঠে তারা দুজনে।

ছই-এর বাইরে হাবোকে প্রথম দেখতে পায় ফুল। গজেনকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বলে, 'তুমি কে গো?'

গজেন মুখ ফিরিয়ে বলে, 'কিরে হাবো? কি করছিস হেথা?'

হাবো পা গুটিয়ে হাতে ভর দিয়ে বসে হাঁ করে দেখছিল। মুখ দিয়ে তার লালা গড়িয়ে গড়িয়ে নৌকার পাটাতনে জমেছে। সসপ্ করে লালা টেনে মুখ বন্ধ করে সে উঠে দাঁড়ায়, এক লাফে ডাঙ্গায় পড়ে, ছুট দেয় গাঁয়ের দিকে।

দূরে থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজবার খানিক পরে দয়ালের বাড়ীতে 'আগুন! আগুন!' চীৎকার ওঠে। পাড়ার লোক হৈ হৈ করে ছুটে যায়। পুরো এক টিন কেরোসিন গায়ে বিছানায় ঢেলে হাবো আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘরে পর্যন্ত আগুন ধরে গেছে দয়ালের।

খবর শুনে বৈরাগী দাসের বৌ চোখ বড় বড় করে বলে, 'এক টিন তেল! কুপি জ্বালার তেল মেলে না এক ফোঁটা, ছুঁড়ি এক টিন তেল ঢেলেছে।'

অনেকেই আপসোস করে।

স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই

কৈলাস বসুকে সকলে স্বার্থপর আর সঙ্কীর্ণচেতা বলে জানে। মানুষটার চালচলন আচার ব্যবহার তো বটেই, চেহারাও সকলের এই ধারণাকে অনেকটা সমর্থন করে। বেঁটে, আঁটোসোটো ধরণের মোটা, প্রায় গোলাকার মাথায় বুরুষের মতো শক্ত ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, লম্বা নাকের দু'পাশে মোটা ভ্রুর নীচে খুদে খুদে দু'টি চোখ। চোখ দু'টিকে কটাই বলা চলে। ছোট এবং কটা, তবু সে চোখের দৃষ্টি বড় বড় নিকষ কালো চোখের অধিকারীদের কাছে বড় বেশী স্পষ্ট সমালোচনা আর তিরস্কারে ভরা মনে হয়। মুখের আটক নেই, এমন অভদ্র মানুষকে এড়ানোর মতো সকলের চোখ তাই কৈলাস বসুর চোখকে এড়িয়ে চলে।

কৈলাস কথা যে কম বলে তা নয়, মৃদু রসিকতাভরা হাসির সঙ্গে মিষ্টি কথাই সাধারণত বলে, তবু লোকের মনে হয় সে যেন বড় বেশী গম্ভীর, সব সময় মুখ বুজে কেবল নিজের কথা ভাবছে। কারণটা সম্ভবত এই যে, অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে প্রায়ই তার কথার কোন যোগ থাকে না। অবিনাশ চক্রবর্তীর সঙ্গে হয়তো তার দেখা হয়ে গেল, তাকে চমকিয়ে দেবার জন্য অবিনাশ হয়তো সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'ঘোষালের কীর্তিটা শুনেছেন, দাদা—ওপাড়ার কেদার ঘোষালের নতুন কীর্তি? ছি, ছি! ভদ্দরলোকের এমন পিরবিত্তি হয়, এমন কাজ ভদ্দরলোকে করে!—'

কৈলাস হয়তো জিজ্ঞেস করে, 'ছেলের কোন খপর পেলেন চক্কোত্তি মশায়? চিঠিপত্র এল?'

অবিনাশ একটু দমে যায়। সহরবাসী রোজগেরে ছেলে তাকে ত্যাগ করেছে সত্য, চিঠিও লেখে না খবরও পাঠায় না, কিন্তু এই কি সে কথা তুলবার সময়! সহানুভূতি জানানোর তো সময় আছে? তবু ধৈর্য ধরে অবিনাশ হয়তো বলে,

'না, চিঠিপত্তর পাইনি। কি জানেন দাদা, এ যুগটাই এ রকম, কারও কাণ্ডজ্ঞান নেই। নইলে ঘোষাল এমন কাণ্ডটা করতে পারে? বামুন মানুষ তুই, গলায় তোর পৈতে আছে, সন্দেবেলা তুই কিনা এক জেলেমাগীর ঘরে—'

কৈলাস হয়তো আবার বলে, 'সেই যে পাত্রটির সন্ধান পেয়েছিলেন খুকীর জন্যে, কতদূর এগোল প্রস্তাবটা?'

অবিনাশের হাতদাঁত সুড় সুড় করে, কৈলাসের গালে এক ঘা বসিয়ে দিতে, গায়ের কোথাও কামড়ে দিতে।

নবীন সরকারের দাওয়ায় বসে হয়তো পাঁচজনে নানা কথা আলাপ করছে। সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সেক্রেটারী কিসে সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলল যে, সাত টাকা এগার আনা বিপিন মুদীর দোকানে ধার থেকে গেল, সকলে যখন এ সমস্যার কূলকিনারা পাচ্ছে না, কৈলাস হয়তো তখন আপন মনে বকে চলেছে, এ বছর বর্ষা কম হওয়ার ফলটা এ পর্যন্ত কি দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে। গ্রামান্তরে আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়ার সময় ভূষণের বিধবা শালীর গর্ভটা ঠিক ক'মাসের হয়েছিল, সকলে যখন এই তর্কে মসগুল হয়ে আছে, কৈলাস হয়তো তখন কেবলই সকলকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যে, বিপিন মুদীর দোকানে দুর্গোৎসবের ধারটা সে এখন ঘরের পয়সা দিয়ে মিটিয়ে দেবে বলেনি, কয়েকজনের কাছে তার যে টাকাটা পাওনা আছে, সেটা পেলে তখন মিটিয়ে দেবে।

এ কি কথা বলা? আলাপ করা? এভাবে কথা বলার চেয়ে মুখ বুজে থাকা কি ভাল নয়?

কৈলাস কখনো কোথাও চার আনার বেশী চাঁদা দেয় না, কোন উপলক্ষেই নয়। অন্তত পাঁচ টাকায় বিক্রী করা চলে এমন কিছু বাঁধা না দিলে পাঁচটা টাকা ধার পর্যন্ত দেয় না। পাড়ায় যে থাকে, যার ছেলে সহরে একশ' টাকা বেতনে চাকরী করে, তাকে পর্যন্ত নয়! হাসি মুখে আবার বলে যে, এভাবে টাকা ধার না দিলে শোধ করার কথাটা কারও মনে থাকে না, শোধ করার চেষ্টাও থাকে না। সকলের চোখের উপরে নিজের খুসীমত সে একটি ছোট পাকা বাড়ী তুলেছে—ক'খানা এবং কতবড় ঘর করা উচিত, দরজা জানালা কি রকম হলে ভাল হয়, এসব বিষয়ে কারও একটা পরামর্শও কানে তোলেনি। পথ সংক্ষেপ করতে সকলে পায়ে পায়ে তার জমির' উপর যে পথটি গড়ে তুলেছিল, বিনা দ্বিধায় তার উপর রান্নাঘর তুলে পথটা বন্ধ করে দিয়েছে। অনুযোগ অভিযোগের জবাবে হাসিমুখে বলেছে, কয়েক গজ বেশী হাঁটা মানুষের পক্ষে সমান কথা। পঞ্চাশ হাত তফাতের

পথটাতেই যখন কাজ চলে, সে কেন অন্য যায়গায় রান্নাঘর তুলে অসুবিধা ভোগ করবে ?

কেদার ঘোষাল সকলকে মামলা করার পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু কেউ সাহস করেনি। অন্য লোকে হয়তো মামলার নামেই একটা মিটমাটের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত, তার জমির উপর দিয়ে পাড়ার লোকের হাঁটবার অধিকারের বদলে কমপক্ষে পাড়ার লোককে মস্ত একটা ভোজ দিয়ে দিত। কিন্তু কৈলাস হয়তো মামলার নামেই আগে কলকাতা থেকে উকিল ব্যারিষ্টার আনাবার ব্যবস্থা করে রাখবে।

কৈলাসের স্ত্রী অভয়ার একটু ঝগড়া করা সখ। কিন্তু সাতটি ছেলেমেয়ে আর স্বার্থপর স্বামীর জন্য বেচারীর সখটা ভাল করে মিটতে না মিটতে প্রায় চাপাই পড়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সে অনুযোগ করে বলে, 'মানুষের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে পার না ?'

কৈলাস আশ্চর্য ও আহত হওয়ার ভাণ করে বলে, 'কেন, তোমার সঙ্গে মানিয়ে চলি না ?'

'মানিয়ে যা চল তা ভগবানই জানেন। আমার কপাল মন্দ তাই তোমার হাতে পড়েছিলাম। লোকের নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াও কেন তুমি ? তোমার কি দরকার নিন্দে করে ? সকলকে চটিয়ে লাভ কি শুনি ?'

কৈলাস জবাব দেয় না। এও তার এক ধরণের স্বার্থপরতা, নিজেকে সমর্থন করার জন্যও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করতে চায় না। অভয়ার অনুযোগটাও মিথ্যা নয়। কারও কুৎসা কৈলাস কাণে তুলতে চায় না, উৎসাহী প্রচারককে বাজে কথা বলে দমিয়ে দেয়, তবু যে কী করে কুৎসা-প্রচারক হিসাবে তারই নামে কুৎসা রটে যায় ! তার কথায় লোকে বিশ্বাস করে বলে হয়তো প্রচারকামীরা ইচ্ছা করে তার নামটা ব্যবহার করে। হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে মানুষকে সে এমনভাবে নিজের নিজের অন্যায়গুলি উপলব্ধি করায়, যে অন্যের অপবাদ কাণে এলে সকলের মনে হয়, সে ছাড়া আর কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে পরের অপবাদ দেখিয়ে দেবে ?

কেদার ঘোষালের আধুনিকতম কলঙ্কের সঙ্গে তার নামটা বড়বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। অবিনাশ চক্রবর্তী রাধারমণ ভট্টাচার্যকে বলেছিল, 'কৈলাস বোসের অহঙ্কার আর তো সয় না দাদা। নিজের চোখে যা না দেখবে তাই হেসে উড়িয়ে দেবে, সবাই যেন মিথ্যেবাদী। কেদার ঘোষালের ব্যাপারটা বললাম, শুনে আমার সঙ্গে তামাসা জুড়ে দিল। আমি যেন ওর তামাসার পাত্তর !'

আরও অনেক কথা অবিনাশ বলেছিল ! পরদিন রটে গিয়েছিল, কৈলাস স্বীকার

করেছে যে সে নিজের চোখে কেদার ঘোষালকে জেলেমাগীর ঘরে ঢুকতে দেখেছে। রটনাটি আরও খানিকটা বিকৃতভাবে স্বয়ং কেদার ঘোষালের কাণে গিয়ে পৌঁচেছে!

সুতরাং কেদার ঘোষাল ভয়ানক চটে গেছে! কৈলাস বদনাম রটিয়েছে বলে শুধু নয়, বদনামটা একেবারে মিথ্যা বলে। জেলে পাড়ায় কেদার গিয়েছিল কিন্তু কোন জেলেমাগীর ঘরে ঢোকেনি। কে না জানে যে, আজকাল সে কেবল জেলে-পাড়া নয়, কুমোরপাড়া, তাঁতিপাড়া, বাগ্দীপাড়া সব পাড়াতেই যাতায়াত করছে? মিউনিসিপ্যালিটির সে সদস্য, এখানকার সর্বপ্রধান নেতা, সে যদি ওসব পাড়ায় না যায়, কে যাবে? এতদিন প্রয়োজন ছিল না, যায়নি, এখন প্রয়োজন হয়েছে, যাচ্ছে। ওসব গরীব দুর্ভাগাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সে যে চেষ্টা আরম্ভ করেছে, সেটা তো সকলে জানে? অন্তত, জানা তো উচিত সকলের? তবু তার নামে এই মিথ্যা বদনাম!

আসলে বদনামটা কিন্তু খুব বেশী ছড়ায়নি। দু'চারদিন একটু ফিসফাস করে চুপ করে গিয়েছিল। কেদারের চরিত্রগত বেশ সুনাম আছে চারিদিকে। সকলে তাকে ভদ্র, সংযত, ভালমানুষ বলেই অনেকদিন হতে জানে। মানুষটা সে উদার, পরোপকারী। সর্বত্র সে যে অনেকের চেয়ে বেশী টাকা চাঁদা দেয় তা নয়, মাঝে মাঝে নানা প্রতিষ্ঠানে মোটা টাকা দানও করে। তাকে ছাড়া সভাসমিতি হয় না, নতুন পরিকল্পনা দাঁড়ায় না। স্থানীয় হাসপাতাল, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতি সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তার যোগ আছে। বন্ধু ও পরিচিত সকলেই তাকে পছন্দ করে, অনেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে তার পরামর্শও জিজ্ঞেস করতে আসে।

একটিমাত্র খাপছাড়া বানানো বদনামে এরকম জনপ্রিয় মানুষের সুনাম নষ্ট হয় না। তবু, একটু ভয় পেয়ে ছোট লোকদের পাড়ায় যাওয়া কেদার অনেক কমিয়ে দিল। এক মাসের মধ্যে জেলেপাড়ার ধারেকাছেও ভিড়ল না। কিন্তু একেবারে না গেলেও তো চলে না, নেতৃত্ব বজায় রাখা চাই। তাছাড়া ওদের অবস্থাও সত্যসত্যই বড় শোচনীয় ওদের জন্য যতটুকু পারা যায় না করলেই বা চলবে কেন? তাই, সকালের দিকে মাঝে মাঝে কেদার ওসব পাড়ায় যায় এবং কমপক্ষে সাত আটজন অনুগত ও উৎসাহী কর্মীকে সব সময় বডিগার্ডের মতো সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

আগেও অবশ্য এ-রকম বডিগার্ড দু'একজন কেদারের সঙ্গে থাকত। একা ওসব পাড়ায় যেতে তার চিরদিনই ভয় করে। এখন ছোটখাট একটি দল বেঁধে যায়,

কেউ যাতে আর কোনমতেই ভুল করতে না পারে যে, তার ভাল ছাড়া মন্দ কোন উদ্দেশ্য আছে।

কৈলাসও মাঝে মাঝে ওসব অঞ্চলে যায়, তবে কেদারের মতো কখনও নেতা হিসাবে উপরে উঠবার প্রেরণায়, কখনও গরু ছাগলের মতো যারা জীবন কাটায় তাদের জন্য কিছু করবার সখে, কখনও বা নবযুগের নতুন মতাবলম্বী অল্পবয়সী অনুগত কর্মীদের সমর্থন হারানোর আশঙ্কায় অবশ্য ওদিকে যায় না, নিছক তার নিজের দরকারে। ওখানকার অনেকেই তার কাছে টাকা ধারে। টাকার পরিমাণটা অবশ্য খুবই কম, গরীবকে কৈলাস কখোনো দু'পাঁচ টাকার বেশী ধার দেয় না এবং সুবিধামত হয় টাকায়, নয় মাঠের ধানে, বিলের মাছে, গোয়ালের দুধে, তাঁতের কাপড়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেয়! কৈলাসের নিজের কিছু জমি আছে, সেই জমিতে খেটে যদি কেউ দেনা শোধ করতে চায় তাতেও কৈলাস আপত্তি করে না। তবে সুদটা কৈলাসকে নগদ দিতে হয়—পাঁচ টাকা পর্যন্ত মাসিক এক পয়সা সুদ!

মফঃস্বলের ছোট সহর, কোথায় সহরের শেষ আর গ্রামের আরম্ভ, সরকারী কাগজপত্রের নির্দেশ দেখেও সেটা ঠিক করা যায় কিনা সন্দেহ। একদিন তাই নকুড় পালের বাড়ীর সামনে কৈলাস আর কেদারের দেখা হয়ে গেল। এগারজন বডিগার্ড অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কেদারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, হাত তিনেক তফাতে নকুড়ের আশে-পাশে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার কুড়ি বাইশজন লোক। কমবয়সী ছেলেমেয়েও জুটেছে অনেক, কাছাকাছি প্রায় সমস্ত বাড়ীর বেড়ার ফাঁকে মেয়েদের মুখ উঁকি দিচ্ছে।

সকলকে জড়ো করে কেদার সবে বলতে আরম্ভ করেছিল, কৈলাস একপাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল। কৈলাসের উপর রাগ ছিল, সেইজন্য বোধ হয় তাকে দেখে কেদারের উৎসাহ গেল বেড়ে, অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী আবেগের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে রোগ আর দারিদ্র্যের পীড়ন সকলের কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছে, সকলকে তাই ভাল করে বুঝিয়ে দিল। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সকলের যে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত, এই কথাটা বুঝিয়ে দিতেও তার সময় লাগল অনেকটা।

কেদারের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র কৈলাস সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা, ঠিক বলেছেন।' তারপর মুখে একটা জোরালো আপসোসের আওয়াজ করে বলল 'তবে কি জানেন, বেচারীরা করবে কি, করবার যে কিছু নেই!'

কেদার রাগ করে বলল, 'করবার কিছু নেই মানে?'

'কি আছে বলুন?'

'ওই যে বললাম, সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে?'

বেশ বুঝা যাচ্ছিল কেদারের বক্তৃতা। কৈলাসের মন রীতিমত নাড়া খেয়েছে, এ কথায় সেও যেন রেগে গেল, 'আপনি তো বলে খালাস চেষ্টা করতে হবে বলে। কী চেষ্টা, কিসের চেষ্টা তা বলুন?' তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, 'যাক যাক আমার ওসব কথায় কাজ কি? আপনার ছেলের জ্বর কমেছে কেদারবাবু?—আমার সেই টাকাটা নকুড়?'

নকুড় কাছে এগিয়ে এল, নীচু গলায় বলল, 'আজ তো লাড়াব কর্তা।'

কৈলাস মাথা নেড়ে বলল, 'তাকি হয় হে, আজ না পারলে কবে পারবে? 'পরশু ধান বেচার টাকা পেয়েছ, তিন টাকা তিন পয়সা দিতে পারবে না?'

নকুড় বিড়বিড় করে কি বলতে লাগল, কারও কাণে গেল না। হঠাৎ কেদার বলল, 'আপনই বা এমন নাছোড়বন্দা কেন মশায়? গরীব মানুষ এত করে বলছে, তিনটে টাকার তো মামলা, কদিন পরেই না হয় আদায় করবেন?—আচ্ছা, এই নিন, আমি দিচ্ছি আপনার তিন টাকা শোধ করে। তুমি তোমার সুবিধে মতো আমায় টাকাটা দিও নকুড়, আর যদি নেহাৎ নাই দিতে পার—'

নকুড় প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কেদারকে মনিব্যাগ হতে টাকা বার করে কৈলাসের দিকে বাড়িয়ে দিতে দেখে তাড়াতাড়ি ঠিক ম্যাজিকওয়ালার মতো কোমরের ভাঁজ হতে ঠিক তিন টাকা তিন পয়সা বার করে ফেলল। টাকাটা কৈলাসের হাতে দিয়ে লজ্জার হাসি হেসে সবিনয়ে কেদারকে বলল, 'না, বাবুমশায়, না। মোর থেকে মিটমাট হয়ে যাকগা—হাঙ্গামায় কাজ কি?'

তারপর কৈলাস বলল, 'এবার ফিরবেন তো? চলুন এক সঙ্গেই যাই।'

কৈলাসের আরও কয়েকটি আদায় বাকী ছিল, কেদারও ঠিক করেছিল কিছু তফাতের আরেকটি পাড়া আজ ঘুরে যাবে। নিজের কাজ বাতিল করে দুজনে একসঙ্গে ফিরে চলল পাশাপাশি, নিঃশব্দে—অনেকটা বন্ধুর মতো। কৈলাস নিজে হতে কথা পাড়বে না বুঝে কেদার শেষে বলল, 'আপনি বড় নিষ্ঠুর।'

কৈলাস বলল, 'কী করি বলুন, উপায় কি!'

'আপনার মন বড় ছোট।'

'তা বটে। একজনের তিনটে টাকা বলে উদারতা দেখালেন, ওরকম দু'শো চারশো হলে করতেন কি? এখনও প্রায় তিনশ লোক আমার কাছে টাকা ধারে।'

'আমি হলে চাইতে পারতাম না—দান করে দিতাম।'

'কবার দিতেন? দু'দশ টাকা দিলেই যদি চিরকালের জন্যে ওদের অভাব মিটে যেত তবে আর ভাবনা ছিল না। ফাঁকে তালে কিছু লাভ করার সুযোগ পেলে বরং ওদের স্বভাবটাই বিগড়ে যেত। ওদের আপনি জানেন না। নিজের যার রোজগার নেই অন্যে তার কী করবে, কতকাল করবে? দেশে কি গরীবের সংখ্যা আছে!'

'তাই বলে চুপ করে বসে থাকবেন?'

কৈলাস হাসল।—'বসে আছি? সারাদিন তো খাটছি, মশায়। অতবড় একটা সংসার ঘাড়ে কতকাল ধরে কত খেটেখুটে তবে না আজ অবস্থাটা একটু স্বচ্ছল করেছি। ক্ষমতা তো তেমন নেই, কী আর হবে! কত লোক বসে বসে লাখপতি হয়, আমি জীবন পাত করে যা করলাম ছোট একটা বাড়ী করতেই ফতুর—তাও ঘরে কুলোয় না। ওদের অবস্থা দেখে প্রাণ কি কাঁদে না মশায়? কখন কি সাধ যায় না এর তিনটে টাকা, ওর পাঁচটা টাকা ছেড়ে দি? তারপর ভাবি তাতে আর লাভটা কী হবে! মাঝখান থেকে আর দশজনের কাছে আদায় করার সুখ থাকবে না। হঠাৎ কারও বিপদ আপদ ঘটল, পাঁচটা টাকা শোধ দিতে উপোস করার অবস্থা হল—তার কথা আলাদা। তাও খুব হিসেব করে আদায় বন্ধ করতে হয় মশায়! বড়লোক তো নই, নিজের কটা টাকা ফুরিয়ে গেলে দরকারের সময় দু'পাচটা টাকাও তো কাউকে দিতে পারবো না।'

কৈলাসকে উত্তেজিত মনে হয়। জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। হঠাৎ সুর বদলে, বলে, 'আসল কথা ক্ষমতা নেই, বড় বড় কথা ভেবে করবো কি বলুন? তাতে একুল ওকুল দু'কুল নষ্ট—ছেলেমেয়েগুলির দু'বেলা পেট ভরে ভাত জুটবে না। তার চেয়ে নিজের যেটুকু শক্তি আছে কারো ক্ষতি না করে—'

কেদার বলল, 'হ্যা হ্যা জানি। বক্তৃতায় আপনারা খুব পটু। ক্ষতি করেই বা কত ছাড়েন! কবে আপনি আমায় জেলে মাগীর ঘরে যেতে নিজের চোখে দেখেছিলেন মশায়?'

অভিযোগটা কৈলাস আগাগোড়াই অস্বীকার করল, কিন্তু কেদার বিশ্বাস করল না। মুখ ফুটে অবিশ্বাসটা প্রকাশ করলে কৈলাস হয়তো কথাটা আরও খানিকটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু মুখের উপর মানুষকে ওভাবে মিথ্যাবাদী বলাও কেদারের পক্ষে বড় কঠিন।

পোষ্টাপিসের কাছে ছাড়াছাড়ি হল। কেদারের সঙ্গী একটি ছেলে মন্তব্য

করল, 'চাঁই বটে লোকটা। কেমন আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, এরকম স্বার্থপর ছোট-লোক তো মানুষটা তবু নকুড়, শশী এদের কাছে ওর কী খাতির।'

কেদার বলল, 'খাতির করে, না ডরায় ?'

ছেলেটি বলল, 'না, ঠিক ডরায় না।' ওকে খুব বিশ্বাস করে।'

বিশ্বাস কৈলাসকে সকলেই করে। লতাপাতা ফুল আর রঙীন কাগজে সাজান পাট খড়ির প্রকাণ্ড মঞ্চের চেয়ে ছোট একটা কাঠের টুলের উপর মানুষের যেমন আস্থা থাকে উচ্ছ্বসিত মমতা আর শুভকামনায় ভরপুর অনেক উদারচেতা-মহাপুরুষের চেয়ে স্বার্থপর কৈলাসকে সেইরকম বেশী নির্ভরযোগ্য মনে হয়। লটারীর টিকিটে লাখ টাকা পাওয়া সম্ভব বটে কিন্তু পাঁচ টাকার নোটে পাঁচটা টাকা পাওয়া যাইবে। কৈলাসের কাছে কেউ কোনদিন বিশেষ কিছু আশা করে না কিন্তু অমন তো হাজার হাজার লোক আছে যাদের কেউ কোনদিন কিছুই আশা করে না। জবরদস্তি আদায় করুক, দরকারের সময় পাঁচটা টাকাও সে দেয়। সব সময় নিজের সুখ সুবিধার কথা ভাবুক, অপরকে তার সুখ সুবিধা হতে বঞ্চিত করার চেষ্টা তো সে করে না। আবোল তাবোল কথা তো সে বলে না। মানুষকে সে তো ঠকায় না। নিজের দায়িত্ব আর কর্তব্য তো সে পালন করে। কারও মাথায় হাত বুলিয়ে আদর না করুক কারও পাও তো সে চাটে না।

তবে লোকটা বড় স্বার্থপর, এই যা দোষ। একটু অভদ্রও বটে। সেদিন কেদারের বক্তৃতা শুনেই বোধ হয় কৈলাসের মধ্যে পরের ভাল করার জন্য একটু আগ্রহ দেখা গেল। কয়েকদিন পরে সে নিজেই কেদারের বাড়ী গেল, সবিনয়ে বলল, 'সেদিন ওদের সম্বন্ধে যা বলছিলেন, আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন তো ঘোষাল মশায়। মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে সেদিন থেকে!'

সতরঞ্চি-বিছানো চৌকির উপর সে জেঁকে বসল, হেসে বলল, 'বিবেক, মশায় বিবেক, মুখে যে যাই বলুক, অন্যায় করছে মনে হলে বিবেক খোঁচাবেই খোঁচাবে।'

ঘণ্টাখানেক আলাপ আলোচনার পর কেদারের মুখে যখন উগ্র উত্তেজনা আর কৈলাসের মুখে গভীর অসন্তোষের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘরে তিনজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক আর পাঁচটি কিশোর বসে ছিল, তারা সকলে একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই কৈলাসের দিকে চাইতে লাগল। কথা সে আবোল তাবোল বলেছে, অতিপরিচিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচলিত শব্দের অর্থ পর্যন্ত উলটে দেবার চেষ্টা করেছে, দেশের বৃহৎ ব্যাপারকে রূপ দিতে চেয়েছে ক্ষুদ্র ঘরোয়া ব্যাপারের, তবু তার কথাগুলি কি স্পষ্ট

আর সহজবোধ্য। এসব বিষয়েও যে কৈলাস মাথা ঘামায়, এতক্ষণ এমন তেজের সঙ্গে তর্ক করতে পারে, কেউ তা কখনো কল্পনাও করেনি। তারপর কৈলাস বলল, 'যাকগে, ওসব বড় বড় কথা আমার মাথায় ঢুকবে না। একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে। আপনি তো মিউনিসিপ্যালিটিতে আছেন, নিজের চোখে ওদের পাড়ার অবস্থা দেখেছেনও অনেকবার, যেমন ধরুন নকুড়ের বাড়ীর সামনে রাস্তাটা—'

কেদার তাড়াতাড়ি বলল, চেষ্টা তো করছি। একা কী করব?'

কৈলাসও তাড়াতাড়ি বলল, 'একা কেন? অন্য সকলকে বোঝাতে পারেন না? ওঁরা সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, ওঁদের যদি না বোঝাতে পারেন—'

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। কেদার অবজ্ঞাভরা তামাসার সুরে বলল, 'আপনি পারেন? দেখুন না একবার চেষ্টা করে!'

কৈলাস গম্ভীরভাবে বলল, 'তাই ভাবছি। তবে ঢুকতেই যা হাঙ্গামা, ভাবতেও ভয় করে! আপনার তো সব জানাই আছে!'

কেদার আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বলেন কি মশায়, আপনি এবার দাঁড়াবেন নাকি?'

কৈলাস সায় দিয়ে বলল, 'দেখি একবার চেষ্টা করে। আপনি এক কাজ করুন না, আপনি নিজে না ঢুকে আমায় ঢুকিয়ে দিন না?'

প্রস্তাব শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। কৈলাসের মতো স্বার্থপর মানুষের পক্ষেও কি এমন একটা খাপছাড়া প্রস্তাবকে স্বাভাবিক মনে করা সম্ভব?

সেদিন সন্ধ্যার সময় কৈলাস বাড়ীতে বসে আছে, দু'টি কিশোর তার সঙ্গে দেখা করতে এল। কৈলাস দেখেই চিনতে পারল, সকালে তারা কেদারের বৈঠকখানায় বসেছিল।

'কী মনে করে ভাই?'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম।'

তখনও নির্বাচনের মাস ছয়েক দেরী ছিল। কিন্তু ধরতে গেলে সেদিন হতেই দু'জনে লড়াই সুরু হয়ে গেল। নির্বাচনের মাসখানেক আগে দেখা গেল লড়াইটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রথমটা কৈলাসের বোকামিতে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল লোকটার মাথা বুঝি খারাপ হয়ে গিয়েছে। কেদারের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে তার মতো লোকের দাঁড়ানোর কোন মানে হয়? কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে দেখা গেল, কৈলাস খুব বেশী বোকা নয়। তার দিকেও অনেক সমর্থক জুটে গেছে! যতই জনপ্রিয় হোক, কেদারের শত্রু ছিল

অনেক, তারা কৈলাসকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে। কৈলাসের সবচেয়ে বেশী জুটছে কমবয়সী সামর্থকের দল! এতকাল যারা কেদারের নামে হৈ-চৈ করেছে, বডিগার্ডের মত সঙ্গে থেকেছে, তাদেরও কয়েকজন কৈলাসের দিকে ভিড়েছে।

তবে, ফলটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে বলা যায় না। কেদারের জয়লাভের সম্ভাবনাই বেশী।

এই ঘরোয়া নির্বাচন উপলক্ষে সহর অনেক কাল এ রকম সরগরম হয়ে ওঠেনি। নির্বাচনের অনেকদিন আগে হতেই সকলের মুখে শুধু এই আলোচনা। কৈলাসের দলের ছেলেরা প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, গরীবদের জন্য কৈলাস অনেক কিছু করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকলেও, তার উদ্দেশ্যটা যে কিছু করা প্রায় সকলেই তা বিশ্বাস করেছে। কৈলাসকে সকলে বিশ্বাস করে।

কৈলাসের দলের প্রচারকার্যের বিবরণ শুনতে শুনতে এবং দশজনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কেদার স্পষ্টই বুঝতে পারছে, এবার তার জয় পরাজয় নির্ভর করছে গরীবের জন্য তার কিছু করবার ক্ষমতায় দশজনের বিশ্বাসের উপর। গরীবদের জন্য সকলের এই অর্থহীন মাথাব্যথায় কেদারের বিরক্তির সীমা থাকে না, রাগে গা জ্বলে গিয়েছে, কিন্তু গরীবদের পাড়ায় যাতায়াতটা সে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক।

এমনিভাবে যখন দিন কাটছে, নির্বাচনের আর বাকি আছে মোটে তিনটে দিন, একদিন বিকেলে ওই গরীবদের মধ্যে একটা দাঙ্গাবাধবার উপক্রম দেখা গেল। উপলক্ষটা একটু খাপছাড়া। নকুড়ের বাড়ীর কাছে একটা ফাঁকা মাঠ আছে। কেদার আর কৈলাস দুজনের দলের কর্মীরাই গরীবের পাড়ায় পাড়ায় বলে এসেছিল বিকেলে যেন সকলে ওই মাঠে জমা হয়। এই মাঠে এসে কেদার ও কৈলাসের কথা শুনবার জন্য আগেও কয়েকবার তাদের ডাকা হয়েছে কিন্তু একদিন এক সময়ে দুজনের কথা শুনবার জন্য নয়!

নির্বাচন নিয়ে ভদ্রলোকদের পাড়ার উত্তেজনা গরীবদের পাড়াতেও যথেষ্ট পরিমাণে সংক্রামিত হয়েছিল। বহুলোক মাঠে এসে জড়ো হয়েছে। তারপর কী ভাবে যেন অনুপস্থিত কেদার আর কৈলাসকে নিয়ে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হয়েছে।

সভা আহ্বানের ভুলটা প্রায় শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে কেদার ও কৈলাস সভায় আসেনি। দুজনেই পরম উদারতার সঙ্গে অপরকে সভায় কথা বলার সুযোগটা

দান করেছে। কিন্তু পরস্পরের উদারতার খবর না পাওয়ায় দু'জনের একজনও সুযোগটা গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি।

খবরের জন্য উৎসুক হয়ে কৈলাস ঘরে বসেছিল। হন্তদন্ত হয়ে নকুড়ও একটি ছেলে এসে দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনার খবরটা দিল। শুনে জুতা পর্যন্ত পায়ে না দিয়ে ফতুয়া গায়ে কৈলাস ছুটে গেল কেদারের বাড়ী। ব্যাপারটা কেদারকে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'শীগগির যাই চলুন।'

'কোথায় যাব মশায়? ওই দাঙ্গার মধ্যে?'

'আপনি আর আমি গেলে দাঙ্গা বাধবে না। চলুন, চলুন, দেরী করবেন না!'

কেদার মাথা নেড়ে বলল, 'এতক্ষণে বেধে গেছে—এখন গিয়ে কী হবে!—মাঝখান থেকে মাথাটা ফাটবে শুধু। পুলিশ সামলে নেবে লাঠির ঘায়ে।

কাজেই কৈলাসও দাঙ্গা থামাতে গেল না।

শত্রুমিত্র

আদালতের বাইরে আবার দেখা হয় দুজনের, পানবিড়ি চা মুড়ি মুড়কি আর উকিল মোক্তারের দোকানগুলির সামনে। দু'জনে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। তীব্র বিদ্বেষের আগুনে যেন পুড়ে যায় দু'জোড়া চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় রসুল একটা অকথ্য কুৎসিত কথা বলে। কথাটা দামোদরের কাণে যায় না, ভিতরের হিংসার ধাক্কাতেই সে হাত দুটো মুঠো করে রসুলের দিকে দু'পা এগিয়ে যায় নিজের অজান্তে, উচ্চারণ করে বিশ্রী একটা অভিশাপ, তারপর লাল কাঁকর-বিছানো পথ ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে হন হন করে চলতে আরম্ভ করে কিছুদূরের বড় বট গাছটার দিকে।

বটের ছায়ায় অনেক লোক। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। গাছটার গোড়ার দিকে ঘেঁষে বসে চাঁপা আকাশ পাতাল ভাবছিল। তার মুখের ভাবটা ভ্রূকুটিগ্রস্ত। পাশে বসে বিড়ি টানছিল দেবর মহেশ্বর। মহেশ্বরের তৈলহীন রুক্ষ চুলে নিখুঁত ভাঁজের টেরি।

দুপুরের ঝাঁঝাঁলো চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। বটের বিস্তীর্ণ গাঢ় ছায়া পর্যন্ত গরম। প্রতাপগড়ের বাস ছাড়বে সেই বিকেলে, আদালতের কাজ শেষ হওয়ার পর। এখানেই সময় কাটাতে হবে সে পর্যন্ত।

'ফের আসতে হবে তোমাকে ?'. চাঁপা শুধোয়।

এগার বছরের পুরনো উড়নী বাঁচিয়ে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে দামোদর বলে, 'হ্যাঁ, শালারা সময় নিল বেগতিক দেখে। সাতাশ তারিখ।'

একে দুয়ে দামোদরের অন্য সাক্ষীরা এসে সেখানে জোটে, মোট পাঁচজন। মাথার কাপড় চাঁপা আরেকটু টেনে দেয়। আগে অনেকবার ভেবেছে, এখন অনেকবার ভাবছে, তসরে তাকে কি ছাই মানিয়েছে কে জানে—আর কপালের প্রকাণ্ড চওড়া সিঁদুরের ফোঁটায়। এ বুদ্ধিটা বাতলিয়েছে বুদ্ধিমান কেদার উকিল।

হাকিম নাকি পরম ধার্মিক। এসব দেখলে মন ভেজে। কিন্তু কই ভিজল বুড়োর মন, ওরা আব্দার করতেই তো মুলতুবী করে দিল। মরণও হয় না বুড়ো শকুনটার !

সাক্ষীরা তাদের গায়েরি লোক। মামলা মুলতুবী হওয়ায় তারা খুসী না অখুসী হয়েছে ঠিক বোঝা যায় না। অহঙ্কারে শীর্ণ বুক ফোলাবার চেষ্টা করে সক্রোধে তারা ঘোষণা করে যে রসুল মিয়াকে আজ শেষ করে দিয়েছিল বড় বাঁচা বেঁচে গেছে চালাকি করে। তারা যেন সত্যই রাগ করেছে। অথচ সাক্ষী দিতে আসবার সুযোগ অনেকদিন বাড়ল বলে, আবার কিছু আদায় করা যাবে বলে, ভাবটাও ঠিক যেন তারা চাপতে পারছে না।

সাক্ষীদের মধ্যে গোঁসাই একেবারে চাক্ষুষ। গায়ের গলাবন্ধ ফতুয়াটার মতোই তার মুখ ময়লা, ঢিলে ছেঁড়া ছেঁড়া। সে উৎসাহে ফেলে ফেলে বলে, 'ভাবছ কেন ভায়া, তালিম দেয়া মিছে সাক্ষী তো নই যে জেরায় কুপোকাৎ হব। দিক না উকিল যাকে খুসী, করুক না জেরা যদ্দিন পারে। নিক না সময়।'

হলধর সহজ সরল বোকা চাষী।—'আটগণ্ডা পয়সা বেশী দিতে হবে মোকে। নইলে এসবো নি কিন্তু বলে দিলাম, হাঁ।' ভুবন ঘোষ মাইনর স্কুলের মাঝামাঝি মাষ্টার। সে হটাৎ থলথল করে হেসে বলে—"কাণ্ড বটে বাবা।' এত বেশী হেসে এরকম একটা সাধারণ মন্তব্য করায় মনে হয় সেই বুঝি ব্যাপারটার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে মাথাওলা লোকের মতো। নইলে এমন ভীষণ কাণ্ডে তার কেন মজা লাগবে ?

চাঁপার চোখে জল আসে ! এরা কি নিষ্ঠুর !

হারাধন বাস্তব বুদ্ধির লোক। সে বলে, 'বলি দামোদর, বাস তো ছাড়বে ও বেলা। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে বাবা। খোরাকী বাবদ কি দেবে বলেছিলে, দাও দিকিনি, খেয়ে আসি।'

শুনে সকলের পেটেই খিদের জ্বালা চাড়া দিয়ে ওঠে, চাঁপার পর্যন্ত। সেই কোন সকালে গাঁ থেকে তারা খেয়ে বেরিয়েছে।

প্রতাপগড়ের একটিমাত্র বাস। প্রতাপগড়ের কাছাকাছি গিয়ে শা'পুরে সবাই নামবে। দামোদরেরা বাসে উঠবার খানিক পরেই সাঙ্গোপাঙ্গো সঙ্গে নিয়ে রসুলও উঠে জাঁকিয়ে বসে। আদালতে এপক্ষের আকস্মিক অচিন্তিত চালবাজীতে রসুলের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল, ওরা কায়দা করে দিন ফেলে চালবাজীটা ব্যর্থ করে দেওয়ায় ক্ষেপে গিয়েছিল দামোদর। খুনোখুনি হয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য ছিল

না। এখন সে দিশেহারা উন্মত্ত আক্রোশ আর নেই, এসেছে গভীর হিংসা আর ঘৃণা। আমি মরি মরব ওকে তো মারব, এই বেপরোয়া ভাবের বদলে দুজনের মধ্যেই জেগেছে নিজের কোন ক্ষতি না করে অপরের সর্বনাশ করার কামনা— এমন কি পারলে অপরের সর্বনাশ থেকে নিজের কিছু লাভ করে নেবার সাধ! চাঁপা ঘোমটা টেনে ভালো করে ঢেকে ঢুকে বসে। বাসে তিনজন লালমুখো গোরা মদে চুর হয়ে বসেছিল আগে থেকে, মাঝে মাঝে আড় চোখে সে তাদের দিকে তাকায়। রসুলের দিকে চোখ ফেরাতে তার সাহস হয় না।

সহর থেকে বেরিয়ে রাস্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। পিছন আর সামনে থেকে ধুলো উড়িয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে লরী চলে যায়, শব্দ পেলেই বাস চালক কানাই গতি মন্থর করে যত পারে নর্দমার ধার ঘেঁষে সরে যায়, লরী পেরিয়ে গেলে গাল দিতে থাকে চাপা গলায়! চাঁপা বসেছে রাস্তার ভেতরের দিকের জানালায়—লরী কিছু দূরে থাকতেই সে নিশ্বাস বন্ধ করে চোখ বোজে।

চোখ বুজে থাকার সময়েই একবার প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সে ধাক্কা খেয়ে পাশের বুড়িকে নিয়ে নীচে পড়ে যায়। বাসটাও একটু কাত হয়ে থেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

একজন গোরা চাঁপাকে পাঁজা কোলা করে তুলবার চেষ্টা করতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। দরজা দিয়ে বেরোবার জন্য প্যাসেঞ্জারদের তখন ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। দু'তিনজন দরজা থেকে সোজা নালায় গিয়ে পড়ে। কানাই গালাগালি বন্ধ করে চেঁচায়, 'ভয় নেই, ঠিক আছে! ভয় নেই, ঠিক আছে!'

ঠিকই আছে কলটা। ডাইনের মাডগার্ডটা শুধু ভেঙ্গেছে আর বডির খানিকটা তুবড়ে ভেতরের দিকে দেবে গেছে। আর চার ছ'ইঞ্চির জন্য বাসটা উল্টে নালায় পড়েনি।

নালায় যারা পড়েছিল নামতে গিয়ে তাদের একজনের হাত মচকেছে, হয় তো ভেঙ্গেছে। সঙ্গী জল কাদা সাফ করে দিলে বাসে উঠে সে কেবলি বলতে থাকে, 'নম্বর নিয়েছ কেউ? নম্বর?

আরেকজন বলে, 'আরে মশায়, রাখুন। নম্বর! নম্বর নিয়ে হবে কি?

গাড়ী ছাড়বার আগে কানাই বলে, 'শালারা! যতটুকু উচিত তার চেয়ে এক ইঞ্চি যদি সরি—'

'না না, গোঁয়ার্তুমি কোরো না হে।' মাঝবয়সী মোটা-সোটা একজন প্যাসেঞ্জার বলে।

'কিসের গোঁয়াতু´মি ? ভয় পেলেই ও শালারা মজা পায়। আমি জানি।

বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ক্ষেত মাঠ জলায় আর আকাশে চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে পড়ার ব্যথা ও দুর্ঘটনার আতঙ্ক চাঁপার মিলিয়ে আসে—নতুন আর একটা লরীর আওয়াজ কানে আসার সময়টা ছাড়া। ধরে তুলবার ছলে মাতাল গোরাটার অভদ্র কুৎসিত স্পর্শ টাই সর্বাঙ্গে ভয়ার্ত অস্বস্তিবোধের মত রি রি করতে থাকে। একটা মুখ-ভাঙ্গা বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে ওরা আবার মদ খেতে সুরু করেছে। লরীর ধাক্কা লাগার সময় বোতলের মুখটা বোধ হয় ভেঙ্গে গিয়েছিলো।

পাকুনিয়ার মোড়ে বাস আসে। আরও দুজন গোরা উঠে আসে। দু'জন চাষাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আগের তিনজনের পাশে বসে কিচির মিচির কথা শুরু করে দেয়—একজন হাতের বোতলটা দেখায় তিনজনকে। তিনজন ঘন ঘন তাকায় চাঁপার দিকে, নতুন দু'জন মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে চোখ ফেরানোর সময়টুকু ছাড়া চাঁপার গায়েই চোখ পেতে রাখে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন একতাড়া নোট বার করে চাঁপার দিকে বাড়িয়ে ধরে হাসে। দামোদর আর মহেশ্বর কটকটিয়ে তাকায়। রসুল ভ্রূকুটি করে গোঁফে হাত বুলোয়। চাঁপা তাড়াতাড়ি মুখ বার করে দেয় জানালা দিয়ে বাইরে। গাড়ীশুদ্ধ লোক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

রসুলের মুখের ভাবটা দেখবার এমন জোরালো ইচ্ছা দামোদরের জাগে! তার কেবলি মনে হয়, তার এই অপমানে রসুলের মুখে নিশ্চয় শয়তানী পরিতৃপ্তির হাসি ফুটেছে। তাকাবে না ভেবেও কখন যে সে তাকিয়ে বসে নিজেই টের পায় না। রসুলের মুখে হাসি নেই কিন্তু তার দিকেই সে তাকিয়ে আছে অনুকম্পা-মেশানো অবজ্ঞাভরা এমন এক মুখের ভাব নিয়ে যার অর্থ অতি সুস্পষ্ট। চুপচাপ অপমান সহ্য করার জন্য রসুল তাকে মনে করছে অপদার্থ, অমরদ কেঁচো। কানের কাছে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে দামোদরের। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

মনে মনে বলে, 'রও। টের পাবে। তোমায় যদি না আমি—' কি করলে যে এ অপমানের প্রতিশোধ রসুল পাবে সে ভেবে পায় না।

চাঁপার দিকে গোরাটার নোটের তাড়া বাড়িয়ে ধরার সবটুকু দোষ গিয়ে পড়ে রসুলের ঘাড়ে।

রসুল ভাবে, গোরাটা যদি হাত দিত মাগীটার গায়ে! কি খুসিই সে হত।

তাকে জব্দ করতে চালাকিবাজী খেলার মজাটা টের পেয়ে যেত ব্যাটারা। বলবে না ভেবেও আজিজের কানে কানে কখন যে সে কথাটা বলে ফেলে। অজিজ কনুই দিয়ে তার বুকে একটা খোঁচা মেরে হাসতে থাকে।

আধখানা চাঁদ আকাশে উঠেই ছিল। দিনের আলোটা ম্লান হতে হতে এক সময় আধো জ্যোৎস্না হয়ে যায়। শা'পুরের নির্জন রাস্তার মাথায় বাসটা থামলে রসুলেরাই আগে নেমে যায়।

চাঁপা নামবার সময় একজন গোরা তার আঁচলটা চেপে ধরে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে আঁচল ছাড়িয়ে চাঁপা হুড়মুড় করে বাস থেকে প্রায় নীচে গড়িয়ে পড়ে।

আরও একটু দাঁড়িয়ে বাস ছেড়ে দেয়। তখন সেই চলন্ত বাস থেকে টুপটাপ করে নেমে পড়ে পাঁচজন গোরা।

শা'পুরের রাস্তা ধরে রসুলেরা তখন খানিকটা এগিয়ে গেছে। বড় রাস্তা থেকে শা'পুর প্রায় আধ ক্রোশ তফাতে, আঁকা বাঁকা গাছপালা ঢাকা পথ। প্রথম বাঁকটা ঘুরবার সময় মুখ ফিরিয়ে রসুল দেখতে পায়, চাঁপারা জোরে জোরে পথ হাঁটতে সুরু করেছে, তাদের কয়েক হাত পিছনে আসছে গোরারা।

বাসের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। ক্ষেত মাঠ জলা জঙ্গলের মুখর স্তব্ধতা ঝম ঝম করে চারিদিকে। তারই মধ্যে চাঁপার আর্তনাদ শুনে রসুল ও তার সঙ্গীরা থমকে দাঁড়ায়।

কি হয়েছে তাদের বলে দিতে হয় না। ম্লান জ্যোৎস্নায় তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুটি মূর্ত্তি ছুটে এসে তাদের পাশ কাটিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে উধাও হয়ে যায় গ্রামের দিকে – গোঁসাই আর ভুবন ঘোষ।

হলধরও ছুটছিল, এদের দেখে সে দাঁড়ায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে 'ভাই সর্বনাশ। ছুটে এসো।'

আজিজ বলে, 'যা যা আচ্ছা হয়েছে।'

তখন বোধ হয় সরল সহজ হলধরের খেয়াল হয়, ওরা কারা এবং এরা কারা। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ হাঁ হয়ে যায়, চাঁপার আর্ত্ত চিৎকার শোনা যায় বেশী দূরে নয়।

হাতের লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে রসুল সঙ্গীদের বলে, 'চল যাই'।

অজিজ বলে, 'ওদের বন্দুক আছে।'

'লাঠির কাছে বন্দুক?' বলে রসুল ছুটতে আরম্ভ করে।

রাঘব মালাকর

[পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলা দেশের নর-নারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন···তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন···]

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ফুলবাড়ীর চৌমাথা থেকে নামামাত্র পথটা মাঠ জলা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে দু'ক্রোশ তফাতে মালদিয়া গিয়েছে। এই দু'ক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্যদিন সন্ধ্যায় পথটা থাকে প্রায় জনহীন।

নির্জন হোক, পথটা নিরাপদ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ পথে কোন পথিকের বিপদ ঘটেনি। বছর তিনেক আগে দিনদুপুরে একজনকে পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল শোনা যায়। কেষ্টরামের পোড়া মাদুলী আর চুম্বকপাথরের চিকিৎসাতেও নাকি বাঁচেনি। সাপটাপ হয় তো কামড়েছে দু'একজনকে ইতিমধ্যে, কুকুর হয় তো তেড়ে গেছে ঘেউ ঘেউ করে, গরু শিঙ নেড়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারো হয়নি, কারণ হলে সেটা মানুষের মনে থাকত। রাহাজানির দু'একটা

রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু কবে যে সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না, একেবারে ঘটেছিল কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। এ পথের আশে-পাশের বস্তি-গাঁগুলিতে যাদের বাস, চুরি ডাকাতি তারা যদি করে, ধারে কাছে কখনো করে না। এ পথের একলা পথিকের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, তাকে ভয় দেখাবার ভরসা পর্যন্ত ওদের নেই। ওরকম কিছু ঘটলে দায়ী হবে ওরাই। পুলিশও প্রমাণ খুঁজবে না, জমিদার কার্তিক চক্রবর্তীও নয়—দু'পক্ষের শাসনে থেতো হয়ে যাবে ওরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাদের কুঁড়েগুলি, বাতিল হয়ে যাবে আশে-পাশে বাস করার অনুমতি।

একবার সদরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গোমস্তা রাধাচরণ, সঙ্গে ছিল দু'জন পাইক। জন সাতেক লোক তাদের মারধোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। পরে তারা ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল, ফুলবাড়ীর পাঁচজন আর মালদিয়ার দু'জন—পরে। দু'দিকের চাপে রাঘবের আর কাছাকাছি আরও তিনচারটে বস্তি গাঁয়ের মানুষেরা থেঁতো হয়ে যাবার পরে।

পথ থেকে হাঁক এলে এরা সাড়া দেয়। ভীরু লোক দাবী করলে সঙ্গে পৌছেও দিয়ে আসে এদিকে ফুলবাড়ী বা ওদিকে সড়কের মোড় পর্যন্ত। একলা ভীরু পথিকের ভালোমন্দের দায়িক ওরাই কিনা।

শেষ বেলায় ফুলবাড়ী—মালদিয়া নামমাত্র পথ ধরে বোঁচকা মাথায় দু'জন লোক চলেছে মালদিয়ার দিকে। বেশভূষা বোঁচকার আকার, বয়স, আর গায়ের রঙ ছাড়া দু'জনের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই—অর্থাৎ, লম্বায় চওড়ায় দু'জনেই প্রায় সমান হবে। গায়ের জোরে কিনা বলা অসম্ভব, জোরের পরীক্ষা কখনো হয় নি। রাঘব মালাকরের কোমরে একহাত একটি গামছা জড়ানো, জ্যালজেলে পুরনো গামছা। গৌতম দাসের পরনে প্রমাণসাইজ ঘরে-কাচা আধপুরনো মিলের ধুতি, গায়ে পুরনো ছিটের সার্ট, ঘাড়ের কাছে একটু ছিঁড়েছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। রাঘবের বোঁচকাটা বেশ বড়, গৌতমের বোঁচকা তার সিকির চেয়ে ছোট হবে। রাঘবের আছাঁটা চুলে পাক ধরেছে, গৌতমের ছাঁটা চুলেও তাই, তবে রাঘব পনের বিশ বছরের বড় হবে গৌতমের চেয়ে। রাঘব মিশকালো, গৌতম মেটে।

খান দশেক কুঁড়ের নামহীন গাঁয়ের কাছে এসে একটু হাঁপ ধরে রাঘবের। গতবারের চেয়ে এবারের বোঝাটা বেশী ভারি। দু'চার মিনিটের জন্য বোঝাটা একটু সে নামিয়ে রাখে।

গৌতম বলে, 'আবার নামালি? আজ তোর হয়েছে কি র্যা?'

'ডবল বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বলছ?' আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে এনে ঝেড়ে ফেলে রাঘব বলে, 'বাপ্‌স! কাপড়ের এত ওজন হয় জানতাম না বাপু! এত কাপড় জন্মে দেখি নি দোকান ছাড়া।'

গৌতম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলে, 'কাপড়? কাপড় কিরে ব্যাটা? বললাম না বস্তা নিয়ে যাচ্ছি? মথুর সা বস্তা চেয়েছে চাল চালানের জন্যে?'

'গতবার টের পেইছি বাবু, কাপড়।'

'হ্যাঁ, কাপড়! তোকে বলেছে। সদরে খাঁ খাঁ করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি নিয়ে চলেছি! ব্যাটার বুদ্ধি কত।'

রাঘবের হাসিটা বড় খারাপ লাগে গৌতমের।

'সদরেই তো বেচছো বাবু। গুদোম করেছ মালদিয়ায়। এপথে মাল আনছ মাসে দু'বার চারবার, পাঁচগড়ের পথে রোজ এদিক ওদিক চালান দিচ্ছ খানিক খানিক। মোরা বলি যে ঠাকুরবাবু পাঁচগড়ের পথে বাসে চেপে মালদিয়া যায় না কেনে, ফুলবাড়ী নেমে মজুরি দিয়ে মাল নিয়ে দু'কোশ হাঁটে? পাঁচগড়ের পথে ছোকরা বাবুরা পাহারা দেয়, তাই তো বিপদ।'

'কে বলেছে তোকে? কার কাছে শুনলি?' সভয় গর্জনে গৌতম জিজ্ঞেস করে।

'কে বলবে বাবু? আন্দাজ করিছি। মুখ্যু বলে কি এমন মুখ্যু মোরা?'

গৌতম চট করে একটা বিড়ি ধরায়। একটু ভাবে। রাঘব যে বলল, মোরা আন্দাজ করিছি, তার মানে কি এই যে জানাজানি হয়ে গেছে? মোরা কারা? রাঘব আর তার আত্মীয়বন্ধু কজন, না আরও অনেকে?

'তোকে চার টাকা মজুরি দি রঘু।'

'আজ্ঞে বাবু। তোমার দয়া।'

'তাই বুঝি বলে বেড়াচ্ছিস আমার কারবারের ব্যাপার দশজনকে? তোকে বিশ্বেস করলাম, তুই শেষে নেমকহারামি করলি রঘু?'

দশ কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন—কুকুর পর্যন্ত ডাকে না। পথের পাশে জলায় শালুক ফুটেছে আগুন্তি—দু'মাস আগে পর্যন্ত এই শালুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁগুলির স্ত্রীপুরুষ—অবশ্য সবাই নয়। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পিছনে হেলে যায় রাঘব, আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত গলায় বলে, 'নেমকহারামি ঠাকুরবাবু? বলছ নেমকহারামি? হাটে সেদিন সভা করে

স্বদেশীবাবুরা বললে, যে যা জানো থানায় বলবে। বলিছি থানায়? থানায় মোরা বলতে যাই নি ঠাকুরবাবু ভালোমন্দ। যা বলি তাতেই গুঁতো। বলাবলি করেছি নিজেদের মধ্যে। তোমার তাতে কি?'

'নে নে মোট তোল।' গৌতম বলে খুসী হয়ে, 'চটিস কেন? আট আনা বেশী পাবি আজ, যা।'

রাঘব নিঃশব্দে বোঁচকা মাথায় তুল নেয়, গৌতমের সাহায্যে। ছেঁদো দর্শনের কথা শোনায়, যে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মেরে রাখা হয়েছে কোটি গৌতমকে বহুকাল ধরে: কি ভাবে ভালো থেকে মরলে লাভ আর কি ভাবে খারাপ হয়ে বাঁচলে লোকসান। তেজী গলায় গৌতম কথা কয়। শুনে গলা বন্ধ হয়ে আসে রাঘবের। মন তার মাথা কুটে বলে, হায় কি করিছি, হায় কি করিছি!

পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ী আর মালদিয়ার প্রায় মাঝামাঝি। এটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। থান ত্রিশেক ঘর আছে, আসল পথের সমান চওড়া পথ আছে গাঁ পর্যন্ত সাত আট রশি, নামও আছে গাঁয়ের—পত্তু। এইটুকু এসে রাঘব বোঁচকা নামিয়ে রাখে। আঙুল দিয়ে শুধু কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে খ্যান্ত হয় না, বোঁচকার ওপর চেপে বসে বেশ আনন্দ অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, 'একটা বিড়ি দেন গো ঠাকুরবাবু!'

সাত আট রশি দূরে থান ত্রিশেক ঘরের নামওয়ালা বস্তি-গাঁ, এটাও যেন খানিক আগের দশ-কুঁড়ে গাঁ-টার মতো নিঃশব্দ, জনহীন মৃত। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। পত্তু গাঁয়ের দক্ষিণে ঘন জঙ্গল, নীচু জমিতে বছরে ছ'মাস বর্ষার জল জমে থাকলে শোভাহীন বর্ণহীন বীভৎস জলজ জঙ্গল জন্মে। ঝিল্লীর ডাকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা, অন্ধকার রাত্রির ইঙ্গিত, এখনো সন্ধ্যা নামে নি। বাইরে সন্ধ্যা না নামলেও ঘরগুলির ভিতরে যে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়েছে রাঘব তা জানে! গৌতমও জানে। এ অঞ্চলেরই মানুষ তো সে। রাঘবকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশুর কান্না কানে আসায় গৌতম চমকে উঠে থেমে যায়। কে যেন চাপা দিয়েছে শিশুটির মুখে। গা ছম ছম করে গৌতমের। এই জলা-জঙ্গল, কুঁড়ে, পথ আর এই গামছা-পরা মানুষ এসব পুরনো সবকিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়, মানুষের সদৃশ্যতায়, শিশুর কান্নার মুখ-চাপায়, বোঁচকায় বসবার ভঙ্গিতে।

রাঘবকে সে বিড়ি দেয়। নিজে বিড়ি ধরাবার আগেই রাঘবকে দেয়। বলে,

'টেনে নিয়ে চটপট চল বাবা, পা চালিয়ে বাকী পথটা।'

মেরে দি। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ কচ্ছে, মাইরি বলছি তোকে রঘু, কালীর দিব্যি। চ' যাই চটপট। পৌঁছে দিলে তুইও খালাস। ওখানে খাবি তুই আজ। জানিস, আমার ওখানে খাবি। খেয়ে দেয়ে ফিরিস, নয় শুয়ে থাকবি।'

ঘাড় হেঁট করে রাঘব বসে থাকে বোঁচকায়, করুণ চোখের পলকে তাকিয়েই চোখ নামায়। ধরা গলায় বলে, 'বাবুঠাকুর, এ কাপড় মোদের চাই।'

'কাপড় চাই? আচ্ছা, আচ্ছা দেবখন তোকে একখানা—'গৌতম ঢোক গেলে, 'একজোড়া কাপড়। নে দিকি নি, চল দিকি নি এবার। ওঠ।'

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে, দু'হাতে দু'পা চেপে ধরে বলে, 'আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গে। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে-বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।'

গৌতমের ভয় করে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার ভয় খুব অল্প, তাই মন তার ভয়ের সীমা পেরিয়ে যায়। ঝাঁকড়া চুল ধরে রাঘবকে টেনে তুলে গর্জন করে সে বলে, 'হারামজাদা! গাঁজাখোর! বজ্জাত! ওঠ বলছি! মোট তোল! নন্দবাবুকে বলে তোকে জেল খাটাব ছ'মাস। ভৈরববাবুকে বলে তোকে চালা কেটে তুলে দেব দেশ থেকে। মোট তোল, পা চালিয়ে চল।'

'মেয়েগুলো ন্যাংটা বাবুঠাকুর? মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—

'ন্যাংটো তো ঘরে ঘরে···'

বলেই গৌতম অনুতাপ করে। এমন কুৎসিত কথা বলা উচিত হয়নি, রাঘবের মা-বোন মেয়ে-বৌকে এমন কদর্য গাল দেওয়া দুটো মন-রাখা কি কি কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ভীষণ কথাটা, গৌতম তাই মনে মনে স্থির করার চেষ্টা করে। বেশী নরম হলে ব্যাটা পেয়ে বসবে। বেশ লাগসই, যুতসই, ওজনসই কথা বলা চাই।

'কাপড় তবে রইলো বাবুঠাকুর।'

বলে রাঘব হাঁক দেয় গলা চড়িয়ে। মৃত পত্তুগাঁ যেন জীবন্ত প্রাণ পেয়ে কলরব করে ওঠে, কিলবিল করে বেরিয়ে আসে উলঙ্গ প্রায় স্ত্রী-পুরুষ। পত্তুতে এত লোক থাকে না, অন্য সব বস্তি-গাঁয়ের লোকেরাও আজ ওখানে এসে জড়ো হয়েছিল। গৌতম প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে পালাবার উপক্রম করে। রাঘব লাফিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে।

'আর হয় না বাবুঠাকুর। বললাম দান করে দিয়ে যাও কাপড়গুনো, তা তো শুনলে না।'

'নে না কাপড়গুনো বাবা। সব কাপড় নে। আমায় ছেড়ে দে।'

'আর তা হয় না বাবুঠাকুর। দান দিয়ে যেতে সে ছিল ভিন্ন কথা। কাপড় লুট হল এখন, তোমায় ছেড়ে দিয়ে মরব মোরা?'

উত্তেজিত মানুষগুলিকে রাঘব সংযত রাখে। তাঁর ধমকে অন্য সকলের চেঁচামেচি বন্ধ হয়, কিন্তু ভয়াতুর কয়েকজনের আর্ত ও তীব্র প্রতিবাদ সে থামাতে পারে না। বুড়ো নরহরি কপাল চাপড়ে চেঁচায়, 'মারবি তুই, সবাইকে মারবি তুই রাঘব! পুলিশ আসবে সবাইকে বেঁধে মারবে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। ওরে বাবা রে, সব্বোনাশ করলে রাঘব।'

দুটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে কান্না ধরে।

তিনজন মাঝবয়সী লোক চোখ পাকিয়ে বলে, 'মোরা এর-মধ্যি নাই, রাঘব।'

রাঘব বলে, 'নাই তো দাঁড়িয়ে রইছ কেনে? কাপড়ের ভাগ নিও না, যাও গা।'

কাপড়ের বোঁচকা আর গৌতমকে গাঁয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাঘবের ঘরের দাওয়ায় বোঁচকা নামিয়ে বড়দের মজলিস বসে, এবার কি করা উচিত আলোচনার জন্য। কি করা হবে না হবে সব ঠিক হয়ে আছে কদিন থেকে, গৌতমকে পুঁতে ফেলার জন্য জঙ্গলে গভীর গর্তও কেটে রাখা হয়েছে একটা, তবু একটু আলোচনা না করে তারা পারে না! কাপড়গুলি তাড়াতাড়ি বিলি করে ফেলা দরকার, বাইরের যারা তারা ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে, এখানকার যারা তারা যাবে যার যার ঘরে। এত লোক বেশীক্ষণ জমায়েত হয়ে থাকা উচিত নয়, কে যাবে পথ দিয়ে। কার কি চোখে পড়বে কে বলতে পারে। রাঘব থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, ধারালো দা উঁচু করে একদম চুপ হয়ে যেতে বলে সবাইকে—গোলমাল শুনে কেউ যদি ব্যাপার দেখতে আসে পথ থেকে? তাকেও তো পুঁততে হবে বাবুঠাকুরের সঙ্গে। একটা লোক নিখোঁজ হওয়া এক কথা। বেশী লোক নিখোঁজ হলে হাঙ্গামা হবে না?

'কথা যে কইবে সে কাপড় পাবে না।'

রাঘবের গর্জনের চেয়ে বলরামের এই ঘোষণায় কাজ হয় বেশী। সবাই চুপ হয়ে যায় একেবারে, যারা প্রতিবাদী ছিল তারা পর্যন্ত। বুড়ী পচার মা শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

গৌতমের কান্না, বিলাপ, অনুনয় বিনয়ের অন্ত ছিল না, রাঘব একবার দা'টা উচিয়ে ধরার পর সেও থেমে গিয়েছিল। এবার সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'আমায় ছেড়ে দে বাবা তোরা। আমায় মেরে কি হবে তোদের? কাপড় পেয়েছিস, বামুনের ছেলেকে মেরে কেন মহাপাপ করবি? ছেড়ে দে আমায়।'

বলরাম বলে, 'কি করে ছাড়ি? ছাড়া পেলে তুমি গিয়ে তো পুলিশ আনবে বাবুঠাকুর।'

গৌতম পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, বাপ-মার নামে আর দেব-দেবীর নামে দিব্যি গালে, পুলিশকে সে কিছু বলবে না।'

'এ কথা কি মনে থাকবে বাবুঠাকুর?'

তখন হতাশ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে' গৌতম বলে, 'শোন বলি, পুলিশকে আমি বলতে পারি না। সাধ থাকলেও পারি না।'

'পার না?'

'না। বললে আমারি জেল হবে। এ কাপড চোরাবাজারের মাল, পুলিশ যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কি জবাব দেব বল? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার তো ফাঁক হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের। চোরা মাল না হলে কি এ পথে মাল নিয়ে আসি, তোরাই বুঝে গ্যাখ। পুলিশ কেন, তোরা কাপড় লুটে নিয়েছিস, কারো কাছে বলবার উপায় নেই আমার।'

রাঘব বলে, 'তা বটে। এটা তো খেয়াল করি নি মোরা।' সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এতক্ষণে। বাবুঠাকুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে এভাবে মারতে কি সায় দেয় মানুষের মন! বাবুঠাকুর নিজেই যখন চোর, তার চোরাই মাল কেড়ে নিলেও কি করতে পারবে বাবুঠাকুর? ওকে ছেড়ে দিলে তাদের কোন ভয় নেই।

রাঘব বলে, 'তবে তুমি যাও বাবুঠাকুর। অপরাধ নিও না।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গৌতম পড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে গলার আওয়াজ বার হয় না। কাঠের মতো শুকনো গলায় ক'বার ঢোক গিলবার চেষ্টা করে সে কোনমতে বলে, 'জল। জল দে একটু।'

'মোদের ছোঁয়া জল যে বাবুঠাকুর।'

গৌতম মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলে, 'দে।'

জল খেয়েই সে পালায়।

পরদিন পুলিশ আসে দল বেঁধে, বিকেলের দিকে। দলিলপত্র তৈরী করে আটঘাট বেঁধে, সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে এক বেলা সময় লাগে, নইলে সকালেই পুলিশ আসত। নাথগঞ্জের গগন সা'র প্রকাশ্যে কাপড়ের দোকানও একটা আছে।

তিন দিন আগের তারিখে মালদিয়া গাঁয়ের জন্য কিছু কাপড় বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে, গৌতম মুখোপাধ্যায়কে এজেন্ট নিযুক্ত করে, যথাশাস্ত্র খাতাপত্র রসিদ ইত্যাদি ঠিক করে ফেলায় পতুগাঁয়ে লুট-করা কাপড়গুলির চোরাই মালত্বের দোষ কেটে যায়।

পতুগাঁয়ে গিয়ে পুলিশ ছাখে ধড়পাকড় ইত্যাদির চেয়েও ঢের বেশী গুরুতর ও সঙ্গত অনেকটা কারণ উপস্থিত হয়েছে। লুট করা কাপড়ের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গত রাত্রে। খুন হয়েছে দু'জন, আহত হয়েছে অনেক। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই।

যাকে ঘুষ দিতে হয়

মোটর চলে, আস্তে। ড্রাইভার ঘনশ্যাম মনে মনে বিরক্ত হয়, স্পিড দেবার জন্য অভ্যাস নিসপিস করে ওঠে প্রত্যঙ্গে, কিন্তু উপায় নেই। বাবুর আস্তে চালাবার হুকুম। কাজে যাবার সময় গাড়ী জোরে চললে তার কোন আপত্তি হয় না কিন্তু সস্ত্রীক হাওয়া খেতে বার হলে তারা দুজনেই কলকাতার পথে মোটর চড়ে—নিজেদের দামী মোটর চড়ে-বেড়াবার অকথ্য আনন্দ রয়ে-সয়ে চেটেপুটে উপভোগ করতে ভালোবাসে।

এত বড়, এত দামী, এমন চকচকে মোটর গড়িয়ে চলেছে সহরের পিচ-ঢালা পথে, শুধু এই সত্যটাই যেন একটানা শিহরণ হয়ে থাকে সুশীলার। তারপর আছে পুরনো, সস্তা, বাজে মোটর গাড়ীর চলা দেখে মুখ বাঁকানোর সুখ। আর আছে বোঝাই ট্রাম বাসের দিকে তাকিয়ে তিন বছর আগেকার কল্পনাতীত স্বপ্নজগতে বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিচরণের অনুভূতি। ট্রামের হাতল ধরে আর বাসের পিছনে মানুষকে ঝুলতে দেখে সুশীলার মায়া হয়, এক অদ্ভুত মায়া! যাতে গর্ব বেশী। তিন বছর আগে মাখনকেও তো এমনিভাবে ঝুলতে ঝুলতে কাজে যেতে হত। স্বামীর অতীত সাধারণত্বের দুর্দশা আজ বড় বেশী মনে হওয়ার ট্রাম-বাসের বাদুড়ঝোলা মানুষদের প্রতি উত্তপ্ত দরদ জাগে সুশীলার! মাখন সিগারেট ধরিয়ে এপাশে ধোঁয়া ছেড়ে ওপাশে সুশীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রায় সবিনয় নিবেদনের সুরে বলে, 'কে ভেবেছিল আমরা একদিন মোটর হাঁকাব?'

সুশীলা বিবেচনা করে জবাব দেয়। সে মধ্যবিত্ত ভালোঘরের মেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশ-করা গরীবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ওমা, এত ভালো ছেলের চাকরী কিনা একশ' টাকার! কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে। চালাকও হয়েছে সে আজকাল একটু। ভেবে চিন্তে তাই সে বলে, 'আমি জানতাম।'

মাখনের মনে পড়ে স্থশীলার আগের ব্যবহার। একটু খাপছাড়া স্থরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'জান্তে ?'

'জানতাম বৈকি ! বড় হবার, টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা তোমার ছিল আমি জান্তাম। তাই না অত খোঁচাতাম তোমাকে! টের পেয়েছিলাম, নিজেকে তুমি জানো না। তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমায় মরিয়া করে জিদ জাগালাম—'

'সত্যি ! তোমার জন্যে ছাড়া এত টাকা—ড্রাইভার, আস্তে চালাও।'

স্থশীলা তখন বলে, 'কিন্তু যাই বলো, দাস সাহেব না থাকলে তোমার কিছুই হত না।'

মাখন হাসে, বলে, 'তা ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলেও আর দাস সাহেব ফাঁপতো না। কি ঘুষটাই দিয়েছি শালাকে !

'কত কনট্রাক্ট দিয়েছে তোমাকে !'

'এমনি দিয়েছে ? এত ঘুষ কে দিত ?

গাড়ী চলছে। আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলছে। আরেকখানা গাড়ী, দামী কিন্তু পুরনো, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খানিক এগিয়ে স্পিড কমিয়ে প্রায় থেমে গেল। মাখনের গাড়ী কাছে গেলে পাশাপাশি চলতে লাগল দাস সাহেবের গাড়ীটা।

'কোথায় চলেছেন ?'

'একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

দাস সাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলা-ফিরা করছে টের পায় স্থশীলা। অন্দর থেকে উঁকি দিয়ে বৈঠকখানায় দাস সাহেবকে সে অনেকবার দেখেছে। লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কুঁচকে যায়। এই মহাপুরুষটি তার স্বামীকে ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামী মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাস্থর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার সামিল। 'আপনার স্ত্রী ?'

'আজ্ঞে।'

দাস সাহেবের প্রশ্নের মানে মাখন বোঝে। তার মতো হঠাৎ লাখপতি কয়েকজনকে সে জানে, যারা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে—বাড়ীর স্ত্রী বাড়ীতেই থাকে।

স্থশীলা ভাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। যে-রকম উনি বুড়িয়ে গেছেন অল্প দিনে! ওঁর কাছে আমাকে নেহাৎ কচিই দেখায়। দুটি গাড়ীই ততক্ষণে থেমেছে। পিছনে অন্য গাড়ীর হর্ন শুরু করেছে অভদ্র আওয়াজ।

দাস সাহেব নেমে এ গাড়ীতে এসে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয় এ

গাড়ীর পিছনে আসতে। দাস সাহেব ভেতরে ঢোকা মাত্র মাখন আর সুশীলা টের পায় এই বিকেল বেলাই সে মদ খেয়েছে।

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেন নি ?'

'এই যে দিচ্ছি। শুনছো, ইনি আমাদের মিঃ দাস।'

পরনের বেনারসীর রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গীতে একটু হাসে, নববধূর মতো ! বৌয়ের মতোই যে তাকে দেখাচ্ছে সুশীলার তাতে সন্দেহ ছিল না। দাস সাহেব আলাপী লোক, অল্প সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলে। যে চাপা ক্ষোভ সুরু হয়েছিল মাখনের মনে অল্পে অল্পে তলে তলে তা বাড়তে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে একজন যখন কোথাও যাচ্ছে, বিনা আহ্বানে কেউ এভাবে গাড়ী চড়াও হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপে না—অন্তত যাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও মানুষটা যদি বোধ করে। বার বার এই কথাটাই মাখনের মনে হতে থাকে যে, অন্য কেউ হলে তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার কথা দাস ভাবতেও পারত না।

দাস বলে, 'চা খেয়েছেন ?'

সুশীলা বলে, 'না।'

'আসুন না আমার ওখানে, চা'টা খাওয়া যাবে।'

মাখনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাস যোগ দেয়, 'সেই কনট্রাক্টের কথাটাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আপনাকে খুঁজছিলাম।'

মাখনের দু'চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। সুশীলার নিঃশ্বাস আটকে যায়। আজ ক'দিন ধরে মাখন এই কনট্রাক্টটা বাগাবার চেষ্টা করছিল—প্রকাণ্ড কনট্রাক্ট, লাখ টাকার ওপর ঘরে আসবে ! দাস যেন কেমন আমল দিচ্ছিল না তাকে, কথা তুললে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদকে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে আর তার সঙ্গে দাসের দহরম দেখে ব্যাপার অনেকটা অনুমান করে নিয়ে আশা এক রকম মাখন ছেড়ে দিয়েছিল। দাস আজ ও-বিষয়েই তার সঙ্গে কথা কইতে চায় ! এই দরকারে তাকে খুঁজছিল !

সম্রান্ত সহরতলীতে দাসের মস্ত বাড়ী। সামনে সম্রান্ত বাগান। অনেকগুলি চাকর-খানসামা নিয়ে এত বড় বাড়ীতে দাস একা থাকে। বিয়ে করেনি, বৌ নেই। আত্মীয়স্বজনদের সে সাহায্য করে কিন্তু কাছে রাখে না। সখ হলে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গ উপভোগ করে দু'চার দিনের জন্য, ছুটি ভোগ করার মতো।

যেই আসুক সাহেব বাড়ী নেই বলে দরজা থেকে বিদায় করে দেবার হুকুম জারি করে দাস তাদের ভেতরে নিয়ে বসায়। ঘরের সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র

তাকিয়ে তাকিয়ে গ্যাখে সুশীলা, নিজেদের বাড়ীতে এখানকার কোন বিশেষত্ব আমদানী করবে মনে মনে স্থির করে। তারপর আসে চা। একথা হতে হতে আসে কনট্রাক্টের কথা। সুশীলার সামনেই আলোচনা চলতে থাকে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে সব কথা শোনবার ও বোঝবার চেষ্টা করে, উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে। মাখনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবার পর সুশীলার দিকে দাসের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না, কথাতেই তাকে মসগুল মনে হয়। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঘরে আলো জ্বলে স্নিগ্ধ।

তারপর দাস বলে, 'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বসুন, ফোন করে আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সুশীলার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'খালি কাজের কথা বলছি, রাগ করেবেন না।'

সুশীলা তাড়াতাড়ি বলে, 'না, না।'

দাস চলে গেলে চাপা গলায় সুশীলা বলে, 'সোয়া লক্ষের মতো হবে।'

'বেশীও হতে পারে।'

'ফেরবার পথে কালীঘাটে পূজো দিয়ে বাড়ী যাব।' গলা বুজে আসে সুশীলার।

খানিক পরে ফিরে আসে দাস।

'মাখনবাবু?

'আজ্ঞে?'

'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। আপনাকে গিয়ে একবার কথা বলতে হবে।' কাগজপত্রগুলি নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান। দুটো সই করিয়ে নিয়ে আসবেন। দাস নিশ্চিন্ত ভাবে বসে।—'আমরা ততক্ষণ গল্প করি। আপনাদের না খাইয়ে ছাড়ছি না।' দাস একটা সিগারেট ধরায়! সুশীলাকে বলে, 'উনি ঘুরে আসুন, আমরা ততক্ষণ আলাপ জমাই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গম্ গম্ করতে থাকে। মাখন আর সুশীলা দুজনেরি মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে—অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ!

তারপর মাখন বলে, 'তুমি চা'টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি।'

সুশীলা ঢোক গিলে বলে, 'দেরী কোরো না।'

'না, যাব আর আসব।'

গাড়ী রাস্তায় পড়তেই মাখন ড্রাইভারকে বলে, 'জোরসে চালাও! জোরসে!'

কৃপাময় সামন্ত

রঘুনাথ বিশ্বাসের আমবাগানের পাশ দিয়ে আসার সময় কৃপাময় সামন্তের সামনে একটা সাপ পড়ল। সংকীর্ণ মেটে পথ, পাশের কচুবন থেকে লেজটুকু ছাড়া সবটাই প্রায় বেরিয়ে এসেছে সাপটার, হাত দুই সামনে। পথ পার হয়ে ডাইনে আগাছার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে। বেশ বড় সাপ, কৃপাময়ের পদক্ষেপের স্পন্দন অনুভব ক'রে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবে সেই পলকের মধ্যেই লাঠির ঘায়ে ওটাকে মেরে ফেলা যায়। লাঠি উঁচু ক'রে কৃপাময় থেমে গেল। কেন, তা না জেনেই। নাতিকে মারবার জন্যে হাত তুলবার পর আপনা থেকে হাতটা যেমন তার শূন্যে আটকে যায়।

ভোরে সামনে দিয়ে, এত কাছ দিয়ে, সাপ চলে গেলে বোধ হয় কিছু হয়। মঙ্গল অথবা অমঙ্গল। কৃপাময় ঠিক জানে না। চলতে আরম্ভ ক'রে সে ভাবে, চুলোয় যাক। মঙ্গল অমঙ্গলের এ সব ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দেশ যে পাঠায় সে-ও চুলোয় যাক। সাপটাকে না মারবার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপসোস করতে থাকে।

বাগান পেরিয়ে পুব-পাড়ার বাড়িগুলি, কয়েকটা কাছাকাছি কয়েকটা তফাতে, তফাতে এলোমেলোভাবে সাজানো পাকা বাড়ি চোখে পড়ে মোটে একখানা। চারিদিকে বর্ষার পরিপুষ্ট জঙ্গল বাড়ির বেড়া ঘেঁষে, ঘরের ভিটা ছুঁয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

পাকা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন চিবোতে চিবোতে ভূধর সরকার গুণে নিচ্ছিল মাচার লাউ।

'ছেলের চিঠি পেয়েছো নাকি হে সামন্ত?'

রোজ সে এ প্রশ্ন করে। রোজ কৃপাময়ের পিত্তি জ্বলে যায়।

'আজ্ঞে না। চিঠি পাইনি।'

'এত বিলম্ব করে কেন চিঠি দিতে? চিঠিপত্তর লিখতে তো দেয় জেল থেকে। না স্বদেশী বলে কড়াক্কড়ি বেশি?'

'কি জানি।'

ভূধরের বুক লোমবহুল, ভুরু ঘন লোমের মোটা আঁটি। সহানুভূতির সকাতর ধীর উচ্চারণে সে বলে, 'দ্যাকো দিকি ব্যাপার। বলি, তুই একছেলে বাপের, তোর কি স্বদেশী করা পোষায়? কেন রে বাপু, বিয়ে থা করেছিস, ছেলে হয়েছে একটা, কাঁচা বয়েস বৌটার—অাঁ, কি বললে?'

কৃপাময় কিছু বলেনি, ভূধরের নিজের মন কথা কয়েছে কৃপাময়ের হয়ে। এসব কথায় কৃপাময় মুখ ফুটে সায় দেয় না, দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথাটা শুধু একটু নাড়ে। ভূধর বোধ করে অস্বস্তি আর অপমান। একটু ক্ষোভ জাগে রাগ হয়। তার যে মনে পড়েছে তার ছেলে একটা নয়, যোয়ান মদ্দ পাঁচ পাঁচটা ছেলে, এটা যেন কৃপাময়েরই ব্যঙ্গ করা তাকে। সে যাবে কৃপাময়ের একমাত্র ছেলের জেলে-যাওয়া নিয়ে আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে আর তার মনে পড়বে তার পাঁচ ছেলের কথা? এসব লোকের সঙ্গে কথা না বলাই ভাল। কতদিন সে ভেবেছে কৃপাময়ের সঙ্গে কথা বলার, গায়ে পড়ে যেচে কথা বলার স্বভাবটা ত্যাগ করবে, তবু যে কেন দেখা হলেই ওর সঙ্গে সে কথা কয়!

'মামলাটার কী হোলো সরকারমশায়?'

এ প্রশ্ন তো করবেই কৃপাময়। বড় ছেলে তার ঘুষের মামলায় পড়েছে, এখন সে মামলার কথা না তুললে ব্যঙ্গ সম্পূর্ণ হবে কেন। কড়া কথা ঠেলে আসে ভূধরের মুখে, বলতে ইচ্ছে হয়, তোমার বাহাদুরী রাখো সামন্ত—কিন্তু মুখেই আটকে যায় কথাগুলি। কেন কে জানে!

'চলছে। মামলা চলছে। সাজানো মামলা, ফেঁসে যাবে।'

কৈফিয়তের মতো শোনায়, আবেদনের মতো। তার ছেলে লোক খারাপ নয়, মামলা সাজানো। কৃপাময় বিশ্বাস করুক, মামলা সাজানো। থুতু ফেলার বদলে ভূধর ঢোক গিলে ফেলে। নিমের দাঁতনের জন্যেই নিজের থুতুটা বড় তেতো লাগে সন্দেহ নেই।

'ওরা খুব খুশি হয়েছে, না সামন্ত? গাঁয়ের লোক? খুব ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে?'

একথা ওকে আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম, ভূধর ভাবে। কৃপাময়ও তো গাঁয়ের

লোক। ওরা খুশি হয়ে থাকলে কৃপাময়ও তো খুশি হয়েছে নিশ্চয়। এক মুহূর্তের জন্যে বড় অসহায়, বড় করুন দৃষ্টিতে ভূধর তাকায় কৃপাময়ের দিকে, সে যেন সারা গাঁয়ে বিরোধী মতের, শত্রু ভাবের, ঘৃণা ও হিংসার প্রতিনিধি হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। কৃপাময় জবাব দেবার আগেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে ধাতস্থ হয়। সে ভাবটা কেটে গেলে তখন তার মনে হয় ক্ষনিকের জন্যে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, পেট গরম হয়েছিল। কেন যে বাড়ির সবাই খাও খাও ক'রে তাকে এত বেশী খাওয়ায়! আজ সাবধানে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। দাঁত মেজেই স্বর্ণসিন্দূর খাওয়া চাই।

বিরক্তি চেপে ভেবে চিন্তে কৃপাময় জবাব দেয়, 'ঢাক পিটে বেড়াবে কে ?'

শুনে ভূধরের মনে হয়, কৃপাময় যেন বলতে চায়, তোমার ছেলের কীর্তির কথা ঢাক পিটে রটাবার দরকার হয় না, সবাই জানে। কি আস্পর্ধা লোকটার, এমনভাবে তার সঙ্গে কথা কয়, এমন ভাসা ভাসা উদাসীনভাবে, অবজ্ঞার সঙ্গে। আর নয়। আর একটি কথা সে বলবে না ওর সঙ্গে। নাই পেলে এরা বেড়ে যায়। কৃপাময়ের দিকে প্রায় পিছন ফিরে ভূধর এবার মাটিতে থুতু ফেলে।

কৃপাময় একটু ইতস্ততঃ করে। তার কি উচিত লোকটাকে একটু সাবধান করা ? ফল হয় তো কিছুই হবে না, তবু বলতে বোধ হয় দোষ নেই। দালানের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে এক জোড়া বুভুক্ষু চোখ, ভূধরের সেজ ছেলে সুরেশ। তাকিয়ে সে আছে দালানের দক্ষিণে বাপের বাঁধানো পুকুরঘাটে, যেখানে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কোনো মতে, কিংবা শুধু খানিকটা লজ্জা ঢেকে এসেছে গাঁয়ের ক'জন মেয়ে, না এসে যাদের উপায় নেই, নিরুপায় হয়েও ক'দিন পরে হয়তো যারা আসতেই পারবে না !

'একটা কথা আপনাকে বলি সরকারমশায়।'

'হুম্।' ভূধর ফিরেও তাকায় না।

'আপনার ছেলেকে একটু সাবধান করে দেবেন, ঘোষপাড়ায় যেন না যায়। সবাই ক্ষেপে আছে ওরা, কি করে বসে ঠিক নেই। বৌ-ঝি নিয়ে টানাটানি ওরা সইবে না, এবার পাড়ায় গেলে হয়তো—'

'কোন্ ছেলে ? আমার কোন্ ছেলে বৌ-ঝি নিয়ে টানাটানি করে ?' গর্জন করে ঘুরে দাঁড়িয়ে কৃপাময়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাটে বৌ-ঝিদের নাইতে ও জল নিতে এবং উপরের ধাপে বসে সুরেশকে সিগারেট ফুঁকতে দেখে ভূধর আবার নির্জীব হয়ে যায়।

'আপনি যদি কথা দেন ছেলেকে সামলাবেন, আমি ওদের বলতে পারি। নয় তো আমি যদ্দুর জানি ছেলে আপনার খুন হয়ে যাবে।'

'ছেলেটা গোল্লায় গেছে, সামন্ত।'

কৃপাময়ের হাতের চাপে নরম মাটিতে লাঠির ডগায় টোল পড়ে কয়েকটা। গোল্লায় যাক, চুলোয় যাক। খুন হয়ে ছেলেটার নরকে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপসোস করে।

'ওকে সহরে পাঠিয়ে দেব আজকালের মধ্যে মেজ ছেলের ওখানে।'

'সেই ভালো।'

পরামর্শ দিচ্ছে, উপদেশ! যেন, মহাজন, যেন গুরুঠাকুর, যেন মাষ্টার! ভয় দেখাচ্ছে, যেন পুলিশের দারোগা!

কৃপাময়কে সে কি ভয় করে? কোনো কারণ তো নেই ওকে তার ভয় করার! তার সম্পদ আছে, লোকজন আছে—কৃপাময় গরীব একা। ছেলের বৌ আর ছেলেমানুষ নাতিটা ছাড়া ওর কেউ নেই। ওর অর্ধেক জমি তার কাছে বাঁধা। ইচ্ছা করলে ওকে সে—

'চললে নাকি সামন্ত? একটা লাউ চেয়েছিলে, নেবে তো নিয়েই যাও আজ।'

'আজ্ঞে ঠিক চাইনি, তবে খান যদি—'

'দশজনকে দিয়েই তো খাব হে। নইলে এত লাউ দিয়ে করব কি? ওটা নাও, বড়ও হবে, কচিও আছে।'

প্রথম সোনালী রোদ এসে পড়েছে মাটির পথে, মাঝে মাঝে গাছের ছায়া। বর্ষায় পরিপুষ্ট সবুজ গ্রাম। শ্যাম মাইতি আর গোকুল দাসের পোড়া বাড়ির কালো কাঠ-বাঁশ-ছাই আজও স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, বর্ষাও ধুয়ে নিয়ে যায়নি, নতুন কুটিরও ওঠেনি। কোথায় চলে গেছে ওরা, ফিরে এসে নিশ্চয় আবার ঘর তুলবে।

কৃপাময়ের বাড়ির কাছাকাছি সোনা জেলের বৌ কাতু এইটুকু মোটা কাপড়ে তার যৌবন-উথলানো তাজা দেহটা কতটা ঢাকল কেয়ার না করে মাথায় মাছের চুপড়ি বসিয়ে তার নিজস্ব কোমরদোলানো ছন্দে হন হন করে চলে, কৃপাময়কে পেরিয়ে গিয়ে থামে। ফিরে এসে আবার তার নাগাল ধরে।

বলে, 'খাসা লাউটি বাঃ। কত নিলে গা?'

'সরকার মশায় দিলেন, কাতু।'

'ওমা, হাঁ নাকি? দুটি চিংড়ি দি তবে তোমাকে।'

চুপড়ি নামিয়ে একটা কচু পাতা ছিঁড়ে কাতু এক থাবলা চিংড়ি তুলে দেয়।

কৃপাময় বলে, 'পয়সা নেই কাতু।'

কাতু বলে, 'পয়সা কিসের? তুমি মোর বাপ। তোমার ছেলে মোকে বাঁচালে মিলিটারি থেকে। তোমায় দুটি চিংড়ি দিয়ে পয়সা নোব? ধম্মে সইবে মোর?'

কাতু আরও কিছু চিংড়ি কচু পাতায় তুলে দেয়।

'ছেলে ছাড়া পাবে কবে গো সামন্তমশাই?'

'কতবার শুধোবি কাতু? দেরী আছে, এখনো দেরী আছে।'

'মোকে বলবে, ছেলে কবে আসবে মোকে বলবে। ছেলেকে তোমার রুই খাওয়াবো, পাকা রুই, গোটা রুই আদমুণি। তোমার ছেলে যদি না মোকে বাঁচাত গো সামন্তমশাই—'

কাতুর ওথলানো যৌবনের অশ্লীলতা পর্যন্ত যেন ঢেকে যায় তার চোখ ছলছলানো মুখের মেঘে। এতক্ষণে কৃপাময় একদণ্ড তার দিকে তাকাতে পারে!

'আয়তো কাতু খানিকটা লাউ কেটে দি তোকে। দুটি প্রাণী, এ লাউয়ের আধখানাও খেতে পারব না।'

লাউয়ের ফালি নিয়ে চলে গেলে কৃপাময় বলে ছেলের বৌকে, 'লাউ চিংড়ি তো রাঁধবে বাছা, তেল কি আছে?'

'আছে একটুখানি,' বলে কৃপাময়ের ছেলের ছেঁড়া সেলাই-করা গেঞ্জি গায়ে আর কোমরে ভাঁজ খোলা কাঁথার লুঙ্গি-জড়ানো বৌ।

'তাই রাধোগে তবে।'

বৌ নড়ে না। চোখ তুলে একবার চায়, চোখ নামিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কৃপাময়ের সামনে, গেঞ্জি-পরা লুঙ্গি-জড়ানো রোগা প্রতিমার মতো। জলভরা চোখ দেখে কৃপাময়কে একটু ভাবতে হয়। লাউ-চিংড়ি রাঁধতে বলায় তার ছেলের বৌয়ের চোখে জল আসে কেন? তার ছেলের কথা ভেবে? ছেলে তার বিশেষ লাউ-চিংড়ি খেতে ভালবাসত বলে তো মনে পড়ে না। তাছাড়া তার সামনে এ ভাবে দাঁড়িয়ে তার ছেলের কথা ভেবে বৌ চোখে জল আনত না, আড়ালে যেত।

শেষে বুঝতে পেরে কৃপাময় বলে, 'চাল বাড়ন্ত বুঝি মা? তাই তো!'

নেড়ী

দুর্ভিক্ষের প্রথম চোটটা লাগল তারার মাথায়। তারার ছিল চুলের বাহার, মাথা ভরা চিকণ কাল একরাশি চুল। মাঝে মাঝে কোন কোন মেয়ের এ রকম হয়—চাষাভূষোর ঘরেও। গোড়ায় তেল জুটতো, বাপের বাড়ীতে থাকবার সময় আর শ্বশুরবাড়ী এসে কয়েক বছর, ছেলেমেয়েগুলি জন্মাবার আগে পর্যন্ত। তারপর তেলের অভাবে চুল আবার রুক্ষ হয়ে গেছে। ফুলে ফেঁপে থাকে, ঝাঁকড়া জঙ্গলের মতো দেখায়। চুল বড বেড়ে গেছে মনে হয়। সার না দিলে গগন মাইতির ক্ষেতে ভাল ফসল হয় না, দশটি ছেলেমেয়ে বিয়োবার পরেও তারার মাথায় অযত্নে চুলের ফসল ফলে থাকে অদ্ভুত, সামলাতে তার প্রাণান্ত।

তারপর এলো প্রাণান্তকর অভাবের দিন। ছারেখারে যাবার দিন। দু'দিনে দু'ফোঁটা তেল যা জুটতো তারার মাথায় দেবার, তাও গেল বন্ধ হয়ে। মাথায় জট বাঁধে, হু হু ক'রে উকুনের বংশ বাড়ে আর পাগলের মতো মাথা চুলকে চুল ছিঁড়ে তারা বকতে থাকে, 'মলাম্ রে বাবা, মলাম্। মার ভুতো, কাটারি দিয়ে কোপ মার দিকি একটা, চুকেবুকে যাক্।'

ভীত সন্ত্রস্ত ক্ষুধার্ত গগন বিবর্ণমুখে পরামর্শ করতে আসে, বাঁচন-মরণের কথাতেও তারা মন দিতে পারে না। দু'দণ্ডের বেশী স্থির হয়ে বসতে পারলো তো স্থির করতে পারবে মন! কাতরভাবে সে তাই বলে, 'কি জানি বাবা, যা যুক্তি কর। দাও, বেচেই দাও।' পেটের জ্বালায় বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি কাঁদে, তারা তাদের থাপড়ে দেয়। কান্না ভেসে আসে শূন্যে এদিক ওদিক থেকে, আতঙ্কে বুকটা মুছড়ে যায় তারার, একটু সময় নড়নচড়ন বন্ধ করে নিথর হয়ে বসে থাকে। তারপর আবার হাত উঠে যায় মাথায়, জট ছাড়াতে, চুলকোতে আর উকুন মারতে! চুলের অরণ্য থেকে উকুন খুঁজে এনে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে পুট

করে মারবার মুহূর্তটিতে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ হয়ে যায় তারার কাছে। শরীর বেশ খানিকটা শুকিয়েছে, নোলায় জল কম। তবু জিভে দিব্যি আওয়াজ হয় উস্‌স্—উকুন মারার পুট শব্দের সঙ্গে।

প্রথম মড়া কান্নাটা কিন্তু তার বড়ই জম্‌জমাট হল এই চুলের জন্যে। পাঁচনিখে থেকে মেয়ে মনা এল বিধবা হয়ে, ছেলে হারিয়ে কচি মেয়েটাকে বুকে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে। তার স্বামী মরবার পর শাশুড়ী আর এক ছেলেকে নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে তারা চুল ছিঁড়তে লাগল এলোপাথাড়ি চুলেরই যন্ত্রণায়, কিন্তু তার শোকের প্রচণ্ডতা দেখে সবাই হয়ে গেল হতভম্ব। এমন শোকার্ত হবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছিল খানিকটা, দেহে শক্তিও ছিল না অতখানি।

তারার কোলের ছেলেটাও ছোট। মনা তার মেয়েটাকে মার কোলে তুলে দিয়ে বলে, 'একটু মাই দেমা ওকে। মোর দুধ শুকিয়ে গেছে।' তারার যেন বাকী আছে বুকের দুধ শুকিয়ে যেতে! চালের হাঁড়ি ঝেড়ে সে একটু ধুলো-মেশানো গুঁড়ো বার করে, তাই ফুটিয়ে খাইয়ে দেয় নাতনীকে শুকনো পাতার আগুন জেলে।

তিন দিন পরে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের জন্য তারার কান্নাটা হয় অনেক নিস্তেজ। ছেলেমেয়ে দুটো অসুখে ভুগছিল। ওষুধের অভাবে যে তারা মরল ঠিক তা নয়, আসলে মরল খেতে না পেয়ে রোগটাকে উপলক্ষ করে। থেমে থেমে তারা সুর করে কাঁদল সারাদিন।

আধপোড়া ভাইবোন দুটিকে খালে ভাসিয়ে দেবার পর সকলের সঙ্গে ভুতো বাড়ি ফিরছে। হৃদয়-পণ্ডিতের বাড়ির সামনাসামনি সে পেছিয়ে পড়ল। সকলের খানিক পরেই সেও বাড়ি ফিরল, এইটুকু একটা মরা ছাগল ছানাকে গামছায় জড়িয়ে। ছানাটা গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুলের মাষ্টার হৃদয় পণ্ডিতের ছাগলের। স্কুল উঠে যাওয়ায় হৃদয় এখন জোতদার পূর্ণ ঘোষালের ধানের হিসেব লিখছে।

ছাগলছানার মাংসটা মনা'ই রেঁধে দিল নুন হলুদ দিয়ে, বিনা তেলে। বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসে হবিষ্যিও জুটছিল না বলে ওসব রীতিনীতির কথা ভুলে গিয়ে রাঁধতে রাঁধতেই মনা খানিকটা কচি মাংস খেয়ে নিল। এই নিয়ে হাতাহাতি কামড়াকামড়িও হয়ে গেল ভুতোর সঙ্গে তার। আঠার বছরের মনা আর বিশ বছরের ভুতোর মধ্যে।

পরদিন এল হৃদয়-পণ্ডিত। সদর দাওয়ায় শুয়ে ছাগল তার মাই দেয়

ছানাকটাকে, আর গলা টিপে ভুতো কিনা চুরি করে আনে সেই ছানা !

দাম দে ভাল চসতো গগন। ছেলেকে তোর পুলিসে দেব নইলে।'

'দাম কোথা পাব পণ্ডিতমশাই ?'

মনাকে দেখে হৃদয়-পণ্ডিত যেন একটু আশ্চর্য হয়েই বলল, 'তুই কবে এলিরে মনা ? স্বামী মরল কবে ?' ছ'মাস পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে থেকে হৃদয়-পণ্ডিতের চেহারা, তাকানি, কথার ভঙ্গি সব অদ্ভুত রকম বদলে গেছে ; স্কুলটা না উঠে গেলে কি হত বলা যায় না। চিরকাল যে মহান দারিদ্র্যের আদর্শের শোষণে থেঁতো এবং ভোঁতা হয়ে নির্বিরোধ ভাল মানুষ সেজে ছিল, তাই হয়ত সে থাকত শেষ পর্যন্ত। পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে মিশে ঝড়তি পড়তি উপায়ে টাকা কুড়োতে শিখে হঠাৎ সে মানুষ হয়ে উঠল 'ভাল' টুকুর খোলস ছেড়ে।

ছাগলছানার জন্য আর বেশী হাঙ্গামা সে করল না। ধমক দিয়ে আর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করেই ক্ষান্ত হল। কাঁটাল কাঠের পিঁড়িতে জেঁকে বসল গগনের জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে। ভিটে ছাড়া কিছুই আর নেই গগনের।

'বাঁধা রাখ। রেখে চলে যা বাপ বেটা রোজগার করতে দুটো যোয়ান মানুষ ঘরে বসে না খেয়ে মরছিস্, লজ্জা করে না ?'

যাবার আগে হৃদয়-পণ্ডিত মনাকে বলে গেল, "তুইও দেখছি চুল পেয়েছিস্ মায়ের মতো।"

মনা বল্‌ল, 'উঠেই গেল সব চুল।'

অনেকে গিয়েছে গাঁ ছেড়ে, অনেকে যাই যাই করছে, কেউ আপনজনদের ফেলে একা, কেউ সপরিবারে। ফিরেও এসেছে দু'একজন—আপনজনদের খুইয়ে। এদের কাছে শোনা গেছে, যাবার ঠাঁই নেই কোথাও। যেখানে যাও সেখানেই এই একই অবস্থা।

দিনভর পরামর্শ চলল। ভিটে বেচবে না বাঁধা দেবে, গগন আর ভুতো দুইজনেই যাবে না একজন যাবে, অথবা বাড়ীসুদ্ধ যাবে সকলেই। এবং গেলে কোথায় যাবে।

উকুনের কামড় তারা আর তেমন অনুভব করে না, বোধশক্তি আরও ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে যাওয়ায় কোন পরামর্শ-ই সে দিতে পারে না।

ভুতোকে আর দেখতে পাওয়া যায় না পরদিন। হৃদয়-পণ্ডিতের কাছে পথের

সন্ধান পেয়ে সে একাই সরে পড়েছে।

গগন বলে, 'একা তোমাদের নিয়ে যাই কোথা? নিজে গিয়ে দেখি যদি কিছু হয়।'

বাড়ী বাঁধা রেখে পনের বিশদিনের খোরাক দিয়ে গগন চলে যায়। ফিরে না আসুক পনের বিশদিনের মধ্যে খবর একটা পাঠাবে আর রোজগারের কিছু অংশ।

দুটি দুটি খেতে পেয়ে তারার আবার চুলের যন্ত্রণা অনুভবের শক্তি বেড়ে যায়। তার ভরা বাড়ী কিরকম খালি হয়ে গেছে আবার বুঝতে পেরে মাঝখানের নিঝুম দিনগুলির পর আবার বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে, মনাও গলা মেলায় মার সঙ্গে। মনার মাথাতেও জট বেঁধে উকুন হয়েছে। মা ও মেয়ে বসে কাঁদে আর পরস্পরের মাথার জট ছাড়িয়ে উকুন বাছে।

খোরাক ফুরিয়ে যায়। সময় কাটে একটা মাস। গগনের কোন সংবাদ মেলে না। শোক দুঃখ ও দৈহিক যন্ত্রণাবোধ আবার ঝিমিয়ে আসে দু'জনের। মনার মেয়েটা মরে যায় দুধের অভাবে, কাঁড়া-চাল খাওয়া পেটের অসুখে। তারার কোলের ছেলেটাও মরে একই ভাবে। তারপর একে একে, এবেলা একজন আর ওবেলা একজন করে, আরও একটা ছেলে ও মেয়ে মারা যায় তারার। থাকে দুটি—মরমর অবস্থা। দশটির মধ্যে তারার চারটি সন্তান মরেছিল—এদেশে ওরকম মরতে হয় খুব স্বাভাবিক নিয়মে—আর চারটি মরে দুর্ভিক্ষে।

হৃদয়-পণ্ডিত আসে যায়, পরামর্শ দেয়, উপকার করতে চায় কিন্তু চাল দেয় না। পেটে জ্বালা না থাকলে মানুষ কথা শুনবে কেন! বলে, 'চাল পাব কোথায়, চাল? যা বলি শোন। সদরে চল তোমরা; খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দেব। গগন যদি ফিরে আসে, তোমরাও ফিরে আসবে।'

তারা বলে, 'আপনি বাপ, যা ভাল বোঝেন করেন।'

দু'জনে রাজি হলে হৃদয় মনে মনে একটু হিসেব করে দেখে। মনেও আসে চেষ্টাং কুরুতের সংস্কৃত শ্লোকটা। তাই মনাকে আড়ালে বলে, 'যা করছি সব তোরই ভালর জন্যে মনা। কিন্তু চারজনের ব্যবস্থা কি করতে পারব? খটকা লাগছে। মা না গেলে তুই যদি না যাস—গেলে কিন্তু সুখে থাকতিস্। মাছ দুধ খাবি, শাড়ী গয়না পাবি—'

'বলেছি যাব না?'

'বলিসনি? বলিস্‌নি তো? বেশ বেশ।'

তারার অজান্তেই মনাকে শাড়ী গয়না পরিয়ে মাছ দুধ খাইয়ে সুখে রাখবার

জন্য শহরে পাঠিয়ে নিজের মাছ দুধ খাবার আর স্ত্রীকে শাড়ী গয়না দেবার ব্যবস্থাটা হৃদয়পণ্ডিত করতে পারল।

মাঝরাত থেকে শুরু করে পরের সমস্ত দিনটা মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে দুই ছেলেকে নিয়ে তারা গেল হৃদয়পণ্ডিতের বাড়ী।

'মেয়েটা পালিয়েছে পণ্ডিতমশায়।'

'তাই নাকি ? সত্যি ? ছি ছি।'

'মোকে দিন পাঠায়ে সদরে। কি হবে আর ঘর আগলে থেকে ?'

খানিক চুপ করে থেকে হৃদয়-পণ্ডিত বলে, 'ওতে একটু গোলমাল হয়েছে ভূতের মা। যেখানে পাঠাব বলেছিলাম না, সেখানে আর লোক নেবে না খবর পেয়েছি।'

দুই ছেলেকে আগলে তারা ঠায় বসে থাকে দাওয়ায়। মাথায় তার কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় অজস্র উকুন। সাঁঝ বরণের অন্ধকার চাঁদ উঠে আসায় ফিকে হয়ে আসে। তারা বুঝতে পারে, তার ছেলে দুটো হৃদয়-পণ্ডিতের দাওয়ার মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের সেইখানে রেখে তারা চুপি চুপি রাস্তায় নেমে যায়। হাঁটতে আরম্ভ করে সদরের দিকে।

তারপর অনেক কাণ্ড ঘটে তারার জীবনে। মাসখানেক পরে এক হাসপাতালে আয়নায় নিজের মুখ দেখে তারা প্রশ্ন করে, 'ও কে গো ?'

'দেখত চিন্‌তে পার কি-না। ও হল সাতাইখুনির গগনের বউ তারার মুখ।'

তারা হেসেই বাঁচে না।—'দূর ! তারার মাথা ন্যাড়া হবে কেন গো ? কত চুল তারার মাথায় !'

সামঞ্জস্য

ভিতরে এবং বাইরে শান্ত গম্ভীর হয়ে প্রথম সেদিন বাড়ী ফেরে। অনেক দিন পরে আজ গভীর শান্তি অনুভব করেছে, পরম মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। ভেবেচিন্তে মনস্থির করে ফেলবার পরেই এরকম আশ্চর্য ভাবে শান্ত হয়ে গেছে মনটা।

সারাদিন আপিসে সে আজ কোন কাজ করে নি, করতে পারে নি। জরুরী কাজ ছিল অনেক। অন্যদিন আপিসে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে ভেতরের বিপর্যয়ের হাত থেকে সে খানিকটা মুক্তি পেয়েছে, কাজ যত হয়েছে দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে সে ভুলতে পেরেছে তত বেশী গভীরভাবে। কর্তব্য-পালনের তাগিদ তার মধ্যে চিরদিনই খুব জোরালো, অভ্যাস পুরনো।

কিন্তু কাজও সব সময় ভাল লাগে নি। হঠাৎ মাঝে মাঝে কাজের প্রবল উৎসাহ কি ভাবে যেন মাঝপথে জুড়িয়ে গিয়ে ঘনিয়ে এসেছে গভীর বিষাদ ও অবসাদ। এমনও মনে হয়েছে, এভাবে আর বাঁচা যায় না।

মনে পড়েছে গীতাকে। গীতার সঙ্গে জীবনযাপনের সমগ্র অর্থহীনতাকে।

চার বছরের সংঘাত, বিরক্তি, গ্লানিবোধ আর হতাশার কবল থেকে রেহাই পাবার চরম ব্যবস্থা সে ঠিক করে ফেলেছে। গীতার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে আর সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপ্রধান, আদর্শচ্যুত শ্রীহীন জীবনযাপন করতে হবে না। অতি-বড়, অতি-পালনীয় কর্তব্য পালনের গৌরবও সে অর্জন করবে, আত্মবিরোধী জীবনযাপন থেকেও রেহাই পাবে। শুধু কাপড়-গয়না, ভাল-খাওয়া, আড্ডা সিনেমা নিয়ে আর বিরামহীন আব্দার, মতান্তর, অভিমান, নাকি-কান্না সয়ে অতিষ্ঠ হয়ে থাকতে হবে না। দু'চার দিনের মধ্যেই সুরু হবে আন্দলোন। আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে জেলে যাবে—গীতার নাগালের বাইরে।

গীতার হয়তো শিক্ষা হবে ভালরকম। চাকরীর মায়া না করে, ঘরসংসারের

কথা না ভেবে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেশের জন্য স্বামী তার জেলে যেতে পারে, এর আঘাত হয়তো তাকে একেবারে বদলে দিতে পারে। তার জেলে থাকার সুদীর্ঘ সময়টা এ বিষয়ে চিন্তা করে করে হয়তো সে বুঝতে শিখবে জীবনের গুরুত্ব কতখানি। হাল্কা স্বার্থপর অর্থহীন জীবনের ওপর হয়তো তার স্থায়ী বিতৃষ্ণা এসে যাবে। জেল থেকে বেরিয়ে হয়তো সে সুখী হতে পারবে গীতাকে নিয়ে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আসবে। দেশ ও সমাজের কথা একটু ভেবে, পদে পদে বিরোধিতা করার বদলে কিছু কিছু কাজ আর ত্যাগ স্বীকার করে হাসি মুখে।

পথের মানুষকে আজ তার সুখী মনে হয়। তার মতো ওদের কারো জীবনেও বিরামহীন প্রতিকারহীন সংঘর্ষ স্থায়ী রোগযন্ত্রণার মতো একটানা অশান্তি এনে দিয়েছে কিনা—প্রতিদিনের এই প্রশ্ন আজ যেন মন থেকে মুছে গিয়েছে।

একটা কথা অবশ্য প্রমথ জানে। নিজের কাছে এ বিষয়ে তার ফাঁকিবাজি নেই। দেহমন তার এমনভাবে হাল্কা হয়ে যাবার কারণ অন্য কিছুই নয়, গীতার হাত থেকে মুক্তি পাবার কল্পনাই তাকে এভাবে ভয়মুক্ত করে দিয়েছে। এ-কথাটাকে সে আমল দেয় না, এ নিয়ে ভাবে না। মুক্তিলাভের এ পথ বেছে নেবার আরেকটা দিকও তো আছে। যত অসহ্যই হোক গীতাকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে রেহাই পাবার যত সহজ, সাধারণ, হীন পথই খোলা থাক, ওভাবে সে মুক্তি পাবারও চেষ্টা করে নি, অবস্থার প্রতিকারের অন্যায় ব্যবস্থাও করে নি। স্বামী ও প্রেমিকের কর্তব্য সে পালন করে গেছে বরাবর। গীতাকে ভাল করে জেনেশুনেও ওকে ভালবেসে বিয়ে করার ভুলটা তার, সে ভুলের জন্য গীতাকে শাস্তি দিয়ে মনের জ্বালা জুড়োবার মতো অন্যায় সে কোনদিন করে নি। এ উপায়ের কথা না ভাবলে, এ সুযোগ না পেলে, চিরদিন সে এই আত্মবিরোধভরা বন্দীর জীবনটাই যাপন করত! এ গৌরব সে দাবী করতে পারে।

বাড়ীতে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ল ছোটভাই সুমথের কচি ছেলেটা, বারান্দায় এই অবেলায় ঘুমিয়েছে। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে একটি ছেলে হয়েছে সুমথের, চারবছরের বেশী হয়ে গেল গীতাকে সে একটি সন্তানের মা হতে রাজী করাতে পারল না! মনে মনে সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয়ে যায় প্রমথের।

গীতা বাড়ী ছিল না। নতুন কিছু নয়, আপিস থেকে বাড়ী ফিরে গীতার সঙ্গে তার কদাচিৎ দেখা হয়। জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করার পর সুমথের স্ত্রী তাকে চা জলখাবার দেয়, তার গম্ভীর মুখ দেখে মমতা অনুভব করে। এক সময় সুমথকে সে বলে, 'দাদার মুখ বড় ভার দেখলাম।'

সুমথ গম্ভীরভাবে মাথা হেলায়।—'যা অশান্তি! দাদা বলে সহ্য করে, আমি হলে—'

'কী করতে?'

'দূর করে তাড়িয়ে দিতাম।'

'পারতে না। তুমিও তো দাদার ভাই।'

সুমথ মুখে একটু হাসে, মনে কথাটা মানে না। সে যে দাদার ভাই এ যুক্তি-টাতে নয়, সে হলেও গীতাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারত না, স্ত্রীর এই ঘোষণাকে।

রাত প্রায় আটটার সময় গীতা ফিরে আসে। খুব জমকালো একখানা শাড়ী সে পরেছে, মুখে-চোখে আর চলনে তার উপচে পড়েছে খুসীর ভাব।

'কোথায় গিয়েছিলাম জানো?' বলতে বলতে সামনে এগিয়ে এসে প্রমথের মুখ দেখে সে মুখ বাঁকায়।—'হুঁ, রাগ করেছো তো!'

'না রাগ করি নি। একটা কথা ভাবছিলাম। তোমার ওপর আর কোনদিন রাগ করব না।'

'তার মানে?'

'কাপড় বদলে শান্ত হয়ে বোসো, বলছি।'

'ও বাবা! তবে তো গুরুতর কথা!'

কিন্তু তার না-বলা কথাকে বিশেষ গুরুত্ব যে সে দেয় নি প্রমথ তা বুঝতে পারে। গীতা সম্ভবত ধরে নিয়েছে, সে কিছু উপদেশ ঝাড়বে, কোন কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। গীতার ফিরে আসতে আধ ঘণ্টা সময় লাগায় এই অনুমানটাই সত্য মনে হয়। নতুন কিছু তার বলবার আছে মনে করলে এতক্ষণ কৌতূহল দমন করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে গীতাকে বদলে ফেলার চেষ্টার মধ্যে যে বোকামি ছিল আজ প্রমথের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কতখানি হতাশ আর নিরুপায় বোধ থেকে গীতাকে ওভাবে সংশোধন করার উপায়টা সে অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরেছিল, ভাবতে গিয়ে আসন্ন মুক্তির রূপটাই তার কাছে আরও বিরাট হয়ে ওটে।

আবার তার কথা শুনে গীতা কেমন চমকে যাবে ভেবেও প্রমথ বেশ আমোদ অনুভব করে।

গীতা ফিরে এসে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে টেবিল থেকে রঙীন মলাটের একটি বই তুলে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। প্রমথ যে তাঁকে বিশেষ কিছু

বলবে বলেছিল, সে তা একেবারে ভুলে গিয়েছে মনে হয়। তাকে ডাকতে গিয়ে প্রমথ চুপ করে যায়। মিনিট পনের সে চুপ করে বসে ভাবে। তারপর শান্তভাবেই শোবার ঘরে যায়।

'তোমায় যা বলছিলাম।'

গীতা তার বিছানায় শুয়ে পড়ছিল। বই নামিয়ে হাই তুলে উদাসভাবে বলে, 'কী বলছিলে?'

প্রমথ কাছে গিয়ে বিছানাতেই বসে। গুছিয়েই সে সব কথা বলে, স্পষ্ট জোরালো ভাষায়। কিন্তু গীতার বিশেষ চমক লেগেছে মনে হয় না। কথাটাকে সে তেমন গুরুতর মনে করেছে কিনা সে বিষয়েও প্রমথের সন্দেহ জাগে।

'এই বুঝি তুমি রাগ কর নি?'

'রাগের কথা কী হল?'

'আমার জন্যে জেলে যাবে বলছ, অথচ তুমি রাগ কর নি। কবে ধমক মেরে বলবে তোমার রাগ হয় নি।'

'তোমার জন্যে জেলে যাচ্ছি না গীতু।'

'তবে কী জন্যে? স্বদেশী করে জেলে যাবার জন্যে বুঝি তিনশ টাকার চাকরী নিয়েছিলে, বিয়ে করেছিলে? জেলে যাবে না ছাই, এমনি করে তুমি আমায় বলতে চাও, আমায় নিয়ে কি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ।' গীতার চোখ ছল ছল করে, কী দোষ করেছি বল, মাপ চাইছি। অমন কর কেন?'

প্রমথ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একি অভিনয় না ন্যাকামি? ন্যাকামি হওয়াই সম্ভব। ওর স্বভাবটাই এ-রকম বিকারগ্রস্ত।

'তোমায় বলে কী হবে? তুমি বুঝবে না।'

'বুঝব না? আমি অবুঝ? বোকা? না বজ্জাত?'

প্রথম আর কথা বলে না। শান্ত নির্বিকার হয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তাতে গীতার রাগ যায় আরও বেড়ে। একতরফা কিছুক্ষণ ঝগড়া চালিয়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করে। প্রমথ তখনও বসে থাকে পাথরের মূর্তির মতো, তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

সাত দিন পরে প্রথম গ্রেপ্তার হয় আরও অনেকের সঙ্গে। বিচারে তার জেল হয় তিন বছরের।

জেলে প্রমথের দিন কাটে এক এক। বুড়ী মা, সুমথ ও অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুরা চিঠি লেখে, মাঝে মাঝে দেখাও করতে আসে। গীতা চিঠিও লেখে না দেখাও

করতে আসে না। বিচারের সময় সে কোর্টে আসত, আহত-বিস্ময় আর তীব্র অভিযোগ ভরা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। সুমথের কাছে সে খবর পায় যে বিচার শেষ হবার পরেই গীতা ঢাকায় তার বাবার কাছে চলে গিয়েছে। এটা প্রমথ বুঝতে পারে। কিন্তু দেখা করতে আসে না কেন একটিবার? চিঠি লেখে না কেন?

রাগ হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু এমন রাগ হবার মতোই কি বিকৃত তার মন যে, রাগ কিছুতেই কমে না, অন্তত চিঠির জবাবে দু'লাইন একটা চিঠি লেখার মতো?

প্রমথ ক্ষুব্ধ হয়, মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। এই যদি প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে গীতার মধ্যে তার কারাবরণ করার, ওর হৃদয়মনের কী পরিবর্তন সে আশা করতে পারে!

কিন্তু যাই হোক, মুক্তি সে পেয়েছে। আত্মবিরোধী জীবনের তার অবসান হয়েছে চিরদিনের জন্য। বাকী জীবনটা শান্তিতে হোক অশান্তিতে হোক সুখে হোক দুঃখে হোক, নিজের মতিগতি আর আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বাজায় রেখে কাটিয়ে দিতে পারবে।

জেলে যখন তার দেড় বছর পূর্ণ হয়েছে, হঠাৎ গীতার কাছ থেকে সে অদ্ভুত চিঠি পেল। চিঠিখানা খুব সংক্ষিপ্ত।

গীতা লিখেছে: এতদিন ভেবে ভেবে সে বুঝতে পেরেছে প্রমথ আর তার মধ্যে মনের মিল না থাকলে জীবনে তারা সুখী হতে পারবে না। তাই, নিজেকে গড়ে-পিটে প্রমথের উপযুক্ত করে তুলবার জন্য কিছুদিন সে এক শিক্ষাসদনে গিয়ে থাকবে স্থির করেছে। সে যেন কিছু না ভাবে। যথাসময়ে দেখা হবে।

বার বার প্রমথ চিঠিখানা পড়ে, তার ধাঁধা ঘুচতে চায় না। শিক্ষাসদন? এমন শিক্ষাসদন কোথায় আছে, যেখানে স্ত্রীদের গড়ে-পিটে স্বামীর উপযুক্ত করে তুলবার ব্যবস্থা আছে? সাধন ভজন জপ তপ করে নিজেকে শোধরাবার জন্য কোন সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাবার বুদ্ধি করে নি তো গীতা? অথবা মাথাটা তার খারাপ হয়ে গেছে একেবারে, পাগলামির ঝোঁকে একখানা চিঠি লিখে ফেলেছে আবোল তাবোল। নিজের দোষ যদি বুঝে থাকে গীতা, তাই যথেষ্ট ছিল। আদর্শহীন জীবনের ব্যর্থতা টের পেলে, দায়িত্ববোধ জন্মালে প্রমথ নিজেই তাকে সহজ সাধারণভাবে শুধরে নিত।

মনের মধ্যে নানা ভাবনা পাক খায়, কিন্তু নতুন একটা আনন্দ ও উৎসাহও

প্রমথ অনুভব করে। তার আশা তবে একেবারে ব্যর্থ হয় নি। গীতা অন্তত একটু ভাবতে শিখেছে যে, মনের মিল না হলে তারা সুখী হতে পারবে না!

গীতা কোন ঠিকানা দেয় নি। প্রমথ ঢাকায় তার বাবার ঠিকানায় জবাব দেয়। লেখে যে, গীতা যেন মনে না করে সে তাকে একেবারে তারই মনের মতো ছাঁচে ঢালতে চায়। গীতার ওপর কোনদিন সে জোর খাটায় নি, কোনদিন খাটাবার ইচ্ছেও রাখে না। তাদের বিরোধিতার অবসান হলেই তারা সুখী হতে পারবে ইত্যাদি অনেক কথা।

একেবারে শেষে সে লেখে : শিক্ষায়তনের নামটা কী, গীতা কোন শিক্ষায়তনে যোগ দিয়েছে?

এ চিঠির কোন্ জবাব আসে না।

কয়েকদিন পরে সুমথ দেখা করতে এলে তাকে সে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করে। কিন্তু সুমথ গীতার কোন খবরই বলতে পারে না। গীতা তাদের কাছে চিঠিপত্র-লেখেনি এখনও।

'খবর নেব?'

প্রমথ ভেবেচিন্তে বলে, 'না, থাক।'

মাস চারেক পরে হঠাৎ একদিন প্রমথ জেল থেকে ছাড়া পায় আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে। বাড়ী পৌঁছে সে দুদিন বিশ্রাম করে, তারপর ঢাকা রওনা হয়ে যায়।

গীতার রায়বাহাদুর বাবা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে জামাইকে অভ্যর্থনা করেন, 'এসো। বসো।'

'গীতা ফেরেনি শিক্ষাসদন থেকে?'

'কোন শিক্ষাসদন?'

'ও আমায় লিখছিল শিক্ষাসদনে যাচ্ছে। নাম ঠিকানা জানায় নি কিছু।'

রায়বাহাদুর ভুরু কুঁচকে তাকান।—'শিক্ষাসদন? ও তো জেলে।'

'জেলে?'

'ও মেয়ের কথা বোলো না। পাগলের মতো যা-তা বক্তৃতা দিয়ে সিডিসনের চার্জে ছ'মাস জেলে গেছে। ফাইনের ওপর দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম, ত কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এমন সব কথা বলতে লাগল—' রায়বাহাদুর মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করেন, প্রমথ বুঝতে পারে, এটা আপসোসের আওয়াজ, আগে অনেকবার শুনেছে।—'বেশ মিলেছ তোমরা দু'জনে।'

আবার রেলে ষ্টীমারে পাড়ি দিতে হয়। এবার প্রমথের মনে হতে থাকে মুহূর্তগুলি বড় বেশী দীর্ঘ। ষ্টীমার ও রেল বড় আস্তে চলে, সময় কাটতে চায় না।

জেলে গীতাকে দেখেই সে বুঝতে পারে তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে চিরদিনই ছিপছিপে, এখন বড় বেশী রোগা দেখাচ্ছে। তার চোখে চপল দৃষ্টির বদলে কেমন বিষণ্ণ হাসিভরা গাম্ভীর্য।

প্রমথ অনুযোগ দিয়ে বলে, 'মিছিমিছি জেলে আসবার তোমার কী দরকার ছিল গীতু? প্রতিশোধ নিতে?'

গীতার গলা আরও সরু, আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। প্রমথের কথায় সে যেন খন্‌খন্‌ করে বেজে উঠে, 'প্রতিশোধ কি? জেল না খাটলে তোমার সঙ্গে ঘর করব কী করে? আমাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই তো।'

প্রমথ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, 'তা বেশ করেছ। তবে এর বদলে যদি—'

প্রমথ তার এত বড় কাজকে সমর্থন করে না। রাগে অভিমানে লাল হয়ে যায় গীতার মুখ। 'জেলেও উপদেশ ঝাড়তে এসেছ? কটা দিন নয় সবুর করতে বেরোনো পর্যন্ত!'

প্রমথ ঢোক গেলে। গীতার চোখ মিট মিট করে।

পরিস্থিতি

'প্যানিক' 'সাড়ে সাতসের চাল' ও 'রিক্সাওয়ালা' ছাড়া অন্য গল্পগুলি বছর খানেকের মধ্যে লেখা। 'প্যানিক' যুদ্ধের গোড়ার দিকে লেখা, অন্য দুটি তার পরবর্তী সময়ে।

গল্পগুলি সাজাতে ত্রুটি হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাতে খুব বেশি এসে যাবে বলে মনে হয় না। চারিদিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে, সব কিছু বদলে যাচ্ছে এইটুকুই শুধু গল্পগুলির একতা। সবগুলি গল্প মিলে বিশেষ কোনো অখণ্ড সমগ্রতা বা ধারা কতখানি গড়তে পেরেছে বলা কঠিন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৩

প্যাণিক

আপিসের বাড়িটি পশ্চিমমুখী। বাহিরে আসিয়াই ধনেশের চোখে পড়িল, আকাশটা আশ্চর্যরকম লাল। আকাশের খানিকটা পড়িয়াছে রাস্তার অপর দিকের বাড়ির আড়ালে। অন্তরালের ওই দিগন্তে নিশ্চয় স্তরে স্তরে সাজানো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মেঘ আছে। মেঘের প্রতিফলন ছাড়া আলোর ছটা এত রক্তিম হয় না।

হকারের চীৎকারে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এত জোরে চীৎকার করে কেন? খবর জানিবার তীব্র আগ্রহে মনটা চড়া সুরে বাঁধা তারের মত এমনিই টন টন করিতেছে, ফিস ফিস করিয়া 'জোর খবর' বলিলেই ঝন ঝন করিয়া উঠে। এমন গলা ফাটানো আর্তনাদের তো কোনো প্রয়োজন নাই। দু'টি পয়সা বাহির করিয়া ধনেশ একটা কাগজ কিনিল। অনেকেই কিনিতেছে। রবিবার তার বাড়িতে আড্ডা দিতে আসিয়া একবার চোখ বুলানো ছাড়া খবরের কাগজের সঙ্গে জগদীশ কোনোদিন কোনো সম্পর্ক রাখিত না, সেও আজকাল সকালে বিকালে কাগজ কেনে। একটু বেলা করিয়া তার বাড়িতে গেলেই বিনা পয়সায় কাগজ পড়িতে পাইবে জানে, কিন্তু অতক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না।

স্পষ্টই বলে, 'না ভাই, অত পয়সার মায়া করলে আর চলে না। যে সময় পড়েছে, এক ঘণ্টা আগে জানা পরে জানার ওপরেই হয়তো বাঁচন মরণ।'

এমন করিয়া বলে যে সর্বাঙ্গ যেন সির্ সির্ করিয়া উঠে। মনে হয়, অতি সংক্ষিপ্ত একটি ঘণ্টা সময়ের ওপারেই যেন অনির্দিষ্ট ও অনন্তসাধারণ মরণ ভয়াবহ মূর্তিতে ওৎ পাতিয়া আছে, একটা অদ্ভুত অকথ্য সমাপ্তি ঘটিল বলিয়া!

জগদিশ তবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েকে মামাবাড়ি এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে। বাড়িতে সে থাকে একা, নিজে রান্না

করিয়া খায়। যেমন হোক একজন ভাড়াটে পাইলে বাড়িটা ভাড়া দিয়া কোনো সস্তা মেস বা বোর্ডিং-এ চলিয়া যাইবে। তার ভয় ভাবনা শুধু নিজের জন্য। স্ত্রীপুত্র পরিবারকে কোথাও পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ধনেশের নাই। একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনিও আবার এমন জায়গায় থাকেন যেখানে নাকি ভয় আরও বেশি। এমন সঙ্গতিও তার নাই যে মফস্বলে কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া সকলকে পাঠাইয়া দেয়।

কৃপণ ও বিচক্ষণ জগদীশকে দেখিলে সাধে কি হিংসায় তার বুকটা জ্বলিতে থাকে। মনে হয়, এই লোকটাই বুঝি তার মন্দ অদৃষ্টের জন্য দায়ী।

ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে কাগজ পড়িবার চেষ্টায় জগদীশের গোলগাল মুখে ছোট ছোট চোখ দুটি পিট পিট করিতেছিল, ধনেশকে দেখিতে পায় নাই। ধনেশ নাগাল ধরিয়া বলিল, 'নতুন খবর কিছু নেই।'

জগদীশ বলিল, 'তা নেই, কিন্তু—'

জগদীশের মুখখানি চিন্তিত, বিমর্ষ। মাসখানেক আগে বৌ আর ছেলেমেয়েরা যখন কাছে ছিল, তখনও তার চিন্তার অন্ত ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সক্রিয় উত্তেজনার ভাবও তার মধ্যে দেখা যাইত। এক মাসের মধ্যে মানুষটা কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত পথিক যেমন কয়েক মুহূর্তের জন্য অবসন্নভাবে দাঁড়াইয়া পড়ে, কথা বলিতে শুরু করিয়া সেও আজকাল তেমনিভাবে থামিয়া যায়।

'একটা ব্যাপার ভাল ঠেকছে না।'—ঘাড়ে বসানো মাথাটা জগদীশ ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকে, 'এ আর পি'র একটা বিজ্ঞাপন বার হচ্ছিল, সাইরেন বাজলে আশ্রয় নেওয়ার বিজ্ঞাপন, সেটা আজ ছাপেনি। আজকালের মধ্যে একটা কিছু হবে বোধ হয়, নইলে হঠাৎ—'

ধনেশের মুখ পাংশু হইয়া গেল।—'এমনি হয়তো বন্ধ করেছে।'

'তাই কখনো করে? একটা বিজ্ঞাপন চলছিল, কি দরকার ওদের সেটা বন্ধ করবার? এতো আর তোমার খেয়াল খুশির ব্যাপার নয়, একটা মানে নিশ্চয় আছে। আমি ভাবছিলাম কি—'

কথা বলিতে বলিতে দু'জনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আরও কয়েকজন কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। ঢোঁক গিলিতে গিয়া জগদীশ প্রথম বারের চেষ্টায় ঢোঁকটা গিলিতে পারিল না।

'—আমি ভাবছিলাম, সময় ঘনিয়ে এসেছে, আজ রাত্রেই হয়তো একটা কিছু

হয়ে যাবে, এটা জানাবার জন্য ওরা বিজ্ঞাপনটা বন্ধ করেছে। ভেবেছে, রোজ বিজ্ঞাপন বেরোয়, কেউ পড়ে না, আজ বন্ধ করে দিলে এদিকে সকলের নজর পড়বে। বিজ্ঞাপন ছাপলে যতটা কাজ হেতো তার চেয়ে বেশি কাজ হবে না ছাপলে। এইসব ভেবে—'

অপরিচিত যারা কথা শুনিতে দাঁড়াইয়াছিল, তাদের একজন সায় দিয়া বলিল, 'সেটা সম্ভব। আবার এও হতে পারে যে, খবরটা ওরা চেপে দিতে চায়। বিজ্ঞাপনটা নেই দেখে লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববে এখন দু'চারদিন কোনো ভয় নেই।'

আরেকজন বলিল, 'যা বলেছেন মশায়!'

ট্রামে উঠিয়া বসিয়া জগদীশ বলিল, 'এমন ফ্যাসাদে পড়েছি ভাই কি বলব। দোটানায় পড়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়ে পাঠালাম এক জায়গায় উনি গেলেন আরেক জায়গায়, বিপদের সময় কার কাছে ছুটব আমি? এখানে গেলে ওখানকার ভাবনা, ওখানে গেলে এখানকার ভাবনা।—দাও, একটা বিড়ি দাও।'

'বিড়ি' নেই।'

বিড়ি ছিল। জগদীশকে দিবে না। ট্রামে এতলোকের সামনেই লোকটাকে তার মারিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। সব সময় কেবল নিজের কথা ভাবে, নিজের কথা বলে। ভয়ভাবনা যেন তার একার, একচেটিয়া। ধনেশ যেন নিশ্চিন্ত মনে পরমসুখে দিন কাটাইতেছে, তার ভাবনা করিবারও কিছু নাই, বলিবারও কিছু নাই। এতকালের বন্ধু সে লোকটার, নিজে রাঁধিয়া ভাল খাইতে পায় না ভাবিয়া এক মাসের মধ্যে কতবার ওকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছে, প্রতিদানে তাকে একদিন একটু মুখের সহানুভূতি জানানোর অবসরও ওর হয় না। যখন তখন শুধু শুনাইতে পারে, এবার পাঠিয়ে দাও হে, সকলকে এবার কোথাও পাঠিয়ে দাও, আর দেরী নয়।

জানাশোনা যত লোক শহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে, জগদীশের মত প্রিয়জনকে দূরে পাঠাইয়া নিজে যাওয়ার জন্য যারা প্রস্তুত হইয়া আছে, তাদের বিরুদ্ধে নিরুপায় বিদ্বেষ ও অভিমান গুমরাইয়া গুমরাইয়া মানুষ সম্বন্ধে ধনেশের চেতনায় এক অদ্ভুত বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে। ট্রামে মানুষের ভিড়, পথে অজস্র লোক চলিতেছে। এতলোকের মধ্যে ভয়ার্ত ধনেশের নিজেকে একা, অসহায় মনে হয়। কেউ তার কথা ভাবিবে না, তার দিকে চাহিয়া দেখিবে না। শহরে শুধু চলাফেরা করিতেছে স্বার্থপর, হৃদয়হীন দু'পেয়ে জীব, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের মুখোশ

সকলের খসিয়া গিয়াছে।

মুখ ফিরাইয়া সে দেখিতে পায়, পিছনদিকের লম্বা সিটে বসিয়া একজন কি যেন বলিতেছে, আশেপাশে কয়েকজন মন দিয়া শুনিতেছে। রাস্তায় জগদীশের কথা শুনিয়া এই লোকটিই খবরের কাগজে এ আর পি'র বিজ্ঞাপন না থাকার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিল। বেশ বুদ্ধিমানের মত চেহারা লোকটির। ভিতরের খবরও হয়তো কিছু কিছু রাখে। কাছে গিয়া শুনিলে হইত না কি বলিতেছে।

বাড়ির সামনে ছোট রোয়াকে বসিয়া ছোট ভাই রমেশ পাড়ার ক্ষিতীশের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। তার হাতে ছিল সিগারেট, মুখে ছিল হাসি। ধনেশকে দেখিয়া হাসি মিলাইয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। জ্বলন্ত সিগারেটটা আড়াল করার চেষ্টাও তার দেখা গেল না। ধনেশের সামনে কোনোদিন সে সিগারেট খায় না। ঔদ্ধত্য দেখাইতে চাহিয়াও অভ্যাসের বশেই বোধ হয় একটু তাকে ইতস্তত করিতে হইল, তারপর সিগারেটটা মুখে তুলিয়া টান দিল জোরে।

আজ তিনদিন রমেশের সঙ্গে তার কথা বন্ধ।

রমেশ বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়ার কথা বলিতে আসিয়াছিল। শুনিবামাত্র ধনেশ যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল একেবারে।

'দাও, তাই পাঠিয়ে দাও। আজ পাঠিয়ে দাও—এই দণ্ডে। তুমিও থাকগে' শ্বশুরবাড়ি—আমাদের সঙ্গে থেকে মরবে কেন!'

'চাকরী ছেড়ে আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়ে থাকব, তাই বুঝি ভাবলেন আপনি?'

'ভাবব না? বৌমাকে রাখতে গিয়ে তুমি আবার ফিরে আসবে, অত বোকা বুঝিয়ো না আমায়।'

'না আপনি খুব বুদ্ধিমান। এত যদি বুদ্ধি আপনার, দিনরাত ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন কেন? আপনাকে ক'দিন বারণ করেছি। আপনি কথা শোনেন না, পাগলের মত করতে থাকেন। আপনাকে ওরকম করতে দেখলে বাপ মা ভাইবোনের জন্য ছেলেমানুষের ভাবনা হবে না?'

লাবণ্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া রমেশ বক্তৃতা আরম্ভ না করিলে হয়তো অন্ধ ক্রোধের প্রথম ধাক্কায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেও ধনেশ আত্মসম্বরণ করিতে পারিত। রমেশকেও দোষ দেওয়া যায় না। এ বাড়ির অস্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে লাবণ্যের মাথা খারাপ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। সকলের অবিরাম

পরামর্শ ও আলোচনায় ভয়ংকর সব সম্ভাবনা যতই অনিবার্য ও ঘনিষ্ট হইয়া উঠে, বাপের বাড়ির সকলের জন্য সে তত উতলা হইয়া পড়ে। কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কপাল কুটিয়া অনর্থক করিতে থাকে। সে সমস্ত সহ্য করিতে হয় রমেশকেই।

'ছেলে মানুষ! বয়স ভাঁড়িয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বাপ, ছেলেমানুষ! পারুল ছেলেমানুষ নয়? পারুল যদি এখানে থাকতে পারে, তোমার আহ্লাদী বৌও থাকতে পারবে।

পারুল ধনেশের বড় মেয়ে। বছর সতের বয়স হইয়াছে, মানুষকে বলা হয় চোদ্দ।

'পারুল আমাদের কাছে আছে।'

'বৌমাও তাই আছেন।'

তখন রমেশও আর ধৈর্য ধরিতে পারে নাই।

'সেই জন্যই সরিয়ে দিচ্ছি। এ বাড়িতে মানুষ থাকে না।'

'এ বাড়িতে মানুষ থাকে না, না?—কি থাকে, জন্তু জানোয়ার?'

'পাগল থাকে। আপনার মত যাদের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়ে গেছে।'

ঠিক পাগলের মতই তখন দু'পা সামনে আগাইয়া ধনেশ তার ত্রিশ বছর বয়সের ভাইএর গালে চড় বসাইয়া দিয়াছিল। ধনেশের নিজের বয়স পঞ্চাশের কাছে, চুলে পাক ধরিয়াছে। মাঝখানে তিনটি বোন, তারপর এই ভাই। এত বড় উপযুক্ত ভাইকে চড় মারিয়া বসার ঝোঁক অবশ্য ওই একদিনের একটিমাত্র কলহে জাগে নাই। কিছুদিন হইতে মনটা বিগড়াইয়া যাইতেছিল।

মনে হইতেছিল, রমেশও বুঝি তার অবস্থা বুঝে না, তার কথা ভাবে না, অন্য সকলের মতই সে স্বার্থপর। প্রথমে রমেশের নিশ্চিত নির্বিকার ভাব সে বুঝিতে পারিত না। যে খবর শুনিয়া তার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, খবরটা মন দিয়া শুনিবার আগ্রহ পর্যন্ত রমেশের দেখা যাইত না। পরামর্শ করিতে ডাকিলে কেমন উসখুস করিতে থাকিত, বিরক্ত হইয়া বলিত, অত ভেবে লাভ কি? আপিস যাইতেছে, আড্ডা দিতেছে, গান গাহিতেছে, বৌ আর পারুলকে সঙ্গে করিয়া সিনেমায় যাইতেছে, কিছুই যেন হয় নাই, সর্বনাশ যেন ঘনাইয়া আসে নাই ঘরের দুয়ারে। বিস্ময়ের পর জাগিয়াছিল বিরক্তি ও ক্ষোভ আর সেই মনোভাব মনের মধ্যেই পাক খাইতে খাইতে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল সন্দেহের: ছেলে নাই, মেয়ে নাই, শুধু সে নিজে আর তার বৌ, তাই কি রমেশ এমন নির্ভয় ও নিশ্চিত হইয়া আছে?

তাই বটে। এ যুগের তাই, বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছে এক স্কুলে পড়া ধিঙ্গি মেয়েকে, দিবারাত্রি সে মন্ত্র দিতেছে কানে কানে, তার কি দায় পড়িয়াছে দাদার ভাবনা ভাবিতে গিয়া মাথার টনক নড়িতে দিবার।

রমেশের প্রত্যেক কথা আর কাজে সে এই চিন্তার সমর্থন খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিল। তার সঙ্গে সে যে পরামর্শ করিতে চায় না তার কারণ তার দায়িত্বের ভাগ নেওয়ার ইচ্ছা তার নাই, নিজে কি করিবে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। দূরে সরাইয়া দিতে চায় বলিয়া তাকে সে তিন মাসের ছুটি লইয়া চেঞ্জে যাইতে বলে। পাটনায় একটা চাকরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে? করিবে না, চাকরীর ছলে এই তো তার সরিয়া যাওয়ার সময়! খরচ কমাইয়া টাকা জমাইতেছে, তাকে বলে নাই, তার মানেও ধনেশ জানে। রমেশের গভীর ও চিন্তিত হইয়া উঠিবার কারণ, তর্ক আর কথা কাটাকাটি আরম্ভ করার কারণ, শহরের হাজার হাজার লোক যে স্থানটি নিরাপদ ভাবিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, সেইখানের বাপমা ভাইবোনের জন্য লাবণ্যকে উতলা হইতে পরামর্শ দিবার কারণ, সব ধনেশের কাছে জলের মত পরিষ্কার।

সুতরাং কারণে অকারণে খিটিমিটি বাধিতেছিল। কেউ কারো কথা সহ্য করিতে চায় না, পরস্পরের নিঃশব্দ উপস্থিতি পর্যন্ত সময় সময় দু'জনের অসহ্য মনে হয়। মনের এই চিরন্তন প্যাঁচ, ঢিল দেওয়ার, আলগা করার অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ। তারপর পুলককে উপলক্ষ করিয়া দু'জনের মধ্যে কয়েকবার রীতিমত ঝগড়া হইয়া গেল।

মুখ অন্ধকার করিয়া রমেশ একদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'পুলককে ক্ষেন্তির শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে থাকতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকুক। জবরদস্তি লড়ায়ে পাঠাবার আইন পাশ হচ্ছে শুনলাম।'

'আইন পাশ হলে ওখানে ওকে ধরতে পারবে না?'

'তুমি বোঝো ছাই। কলেজ থেকে নাম, ঠিকানা জেনে খুঁজতে আসবে, এখানে না থাকলে বলতে পারব, কোথায় গেছে জানি না! ঝগড়া করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাও বলতে পারব।' ধনেশের ভুরু কুঁচকাইয়া গেল, 'একথাটা তো আগে খেয়াল হয়নি! কাগজে ওর নামে একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন আগে থেকে ছাপিয়ে দিলে তো মন্দ হয় না?'

'আপনি ওর মাথাটা খাচ্ছেন দাদা। কোথায় আপনি কি গুজব শুনে আসবেন

আর আপনার এতবড় জোয়ান মর্দ ছেলে চোর-ডাকাতের মত লুকিয়ে বেড়াবে! এর চেয়ে লড়ায়ে গিয়ে মরা ভাল। আইন যদি পাস হয়, লড়ায়ে না যেতে চায়, জেলেই নয় যাবে। তাও ঢের ভাল।'

'তুমি তো তা বলবেই।'

একটা বিশ্রী কলহ হইয়া গেল। কাকার কাছে বকুনি আর উপদেশ শুনিয়া পুলক একবার ঠিক করিতে লাগিল ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাইবে না, আবার উমার কান্না ও ধনেশের ধমকধামক যুক্তিতর্কে মত বদলাইয়া ফেলিতে লাগিল। ধনেশ ও রমেশের মধ্যে আরও কয়েকটা সংঘর্ষ হইয়া গেল, প্রচণ্ড এবং কুৎসিৎ। মনে হইল পুলকের ভালমন্দের প্রশ্ন ভুলিয়া রমেশও হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, তার জিদ চাপিয়া গিয়াছে যে পুলককে কোথাও সে যাইতে দিবে না।

এমনি যখন চলিতেছিল, লাবণ্যকে বাপের বাড়ি পাঠানোর কথাটা রমেশ তাকে বলিতে গেল এবং সংক্ষিপ্ত অর্থহীন কলহের পর ধনেশ তার গালে বসাইয়া দিল চড়। ক'দিন পরে মাসকাবারে বেতন ও ছুটি পাইলে রমেশ নিশ্চয় লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিবে। নিজে বোর্ডিং অথবা মেসে চলিয়া যাইবে।

মাঝখানের এ ক'টা দিন এমনিভাবে মুখের সামনে সিগারেট টানিয়া, নির্বিকার উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া, একা লাবণ্যকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া, তার সবচেয়ে গভীর হতাশা ও বিষাদের মুহূর্তে পাশের ঘরে ঠুংরি সুরে গান ধরিয়া দাদাকে আঘাত দেওয়া ও অপমান করার কাজে লাগাইতেছে।

সদরের চৌকাট পার হওয়ার সময় চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনদিনে রমেশের গায়ের জ্বালা কমে নাই। আজ ভাই-এর সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিবে ভাবিয়াছিল। পয়লা কি দোসরা তারিখে লাবণ্যকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতে বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তারপর কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলিবে। বিপদের কথা নয়, ভয়ের কথা নয়, সংসারের সাধারণ কথা। কিন্তু তাকে দেখিবামাত্র সাপের মত ক্রুর ভঙ্গিতে যে ফণা তুলিয়াছে, তার সঙ্গে যাচিয়া কিভাবে কথা বলা যায়।

সিগারেট থাক, সেজন্য নয়। ত্রিশ বৎসরের উপযুক্ত ভাই, সামনে খাইলেও দোষ হয় না। তবু একটু আড়াল দিবার, একঘরে থাকিলেও অন্তত তার পিছন দিকে জানালায় সরিয়া সরিয়া গিয়া সিগারেট টানিবার যে প্রথা ছিল, যুগযুগান্তের সংস্কারের চেয়ে সেটা কম বর্জনীয় নয়। রমেশ যে শত্রুতা করিতে চায় তার এত স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর ইঙ্গিত আর কিসে মিলিত! একটি গাঁট ভাঙ্গিলে শিকল ছিঁড়িয়া

যায়, এই একটি নিয়ম ভাঙ্গিয়া ভাই তার স্নেহমমতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের বাঁধন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

বাড়ির মধ্যে ছোট ছেলেমেয়ে দু'টি প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। একজনকে মারিয়া উপরে গিয়াছে উমা, আরেকজনকে মিটাইতেছে পারুল। ব্যাপারটা বুঝিয়া ধনেশ মুখ খুলিতে না খুলিতে তরবর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া কি জোরে ধাক্কা দিয়াই সে পারুলকে হটাইয়া দিল। বেহায়া নচ্ছার মেয়ে খাইয়া খাইয়া গায়ে তার এতই কি তেল বাড়িয়াছে, সময় নাই অসময় নাই ভাইবোনদের মারে?

'তুমি মারলে আমায়! তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে, কিছু বললে না বাবা?'

পারুলের নাক ফুলিয়া উঠিয়াছে, সাদাটে সরু গলায় তিন চারটা নীল শিরা ফাঁপিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।—'থাকবো না তোমাদের বাড়িতে আমি আর। নার্স হয়ে যাবো—এক্ষুণি নার্স হয়ে যাবো।'

আঁচল ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া মেয়েকে থামাইয়া উমা বলিল, 'কোথা যাচ্ছিস?'

'আমি এক্ষুণি শীলাদির কাছে গিয়ে নাম লেখাবো। ছেড়ে দাও বলছি আমাকে!'

গা ধুইতে নিচে নামিয়াছে, গায়ে জামা নাই। ওসব যেন গ্রাহ্যও করে না, এমনিভাবে পারুল চেঁচাইতে থাকে। উমা আঁচল ছাড়িয়া না দিলে সে যেন বিনা কাপড়েই পথে বাহির হইয়া যাইবে, এমনি উন্মাদিনী মনে হয় তাকে। দেখিলে কল্পনাও করা যায় না, কয়েকমাস আগে এই পারুল ছিল ধীর, শান্ত ও সংযত মেয়ে, চুপচাপ সংসারের কাজ করিত, মুখে ফুটিয়া থাকিত সলজ্জ নম্র হাসি।

'তোরা কি আমায় পাগল করে দিবি!' ধনেশ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

উপরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়া লাবণ্য নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতেছে। নিচের উঠানে যা ঘটিতেছে সে সব যেন অজানা অচেনা প্রতিবেশীর বাড়ির ব্যাপার, তার কিছু বলারও নাই করারও নাই। ভাসুর আসিয়া দাঁড়ানোর অনেক আগে হইতেই সে এইভাবে এইখানে দাঁড়াইয়া উদাসীনের মত সব দেখিতেছিল। মাজা বাসনের তাড়া উমা পা দিয়া ছুঁড়িয়া দিল—দিক। দু'বছরের শিশুকে বেদম মারিয়া উমা উপরে উঠিল,—উঠুক। খেলা ফেলিয়া পাঁচ বছরের মিন্টু উপর হইতে সাবান আনিয়া দিতে না চাওয়ায় পারুল তাকে পিটাইতে

আরম্ভ করিয়াছে,—করুক। মা যদি পাগলা গরুর মত মেয়েকে গুঁতায়, সতর আঠার বছরের মেয়ে যদি সদরের খোলা দরজার সামনে উঠানে কোমর পর্যন্ত উদ্‌লা করিয়া দাঁড়ায়, তাতেও তার কিছু আসিয়া যায় না। তার যে বাপ মা, ভাইবোন ওদিকে মরিয়া গেল, সাতদিন খবর আসে না!

লাবণ্যকে দেখিতে পাইয়া ধনেশ চীৎকার করিয়া বলিল, 'তুমি কি একবার নিচে নামতে পার না বৌমা?'

লাবণ্য ইঞ্চি দুই ঘোমটা টানিয়া দিল। ভাসুরের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাবেলা শাঁকের ফুঁ পড়ে, ঘরে ঘরে ধুনা দেওয়া হয়। বিদ্যুতের বাতি জ্বালিবার আগে মাটির প্রদীপটি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মিনিটখানেকের জন্য আলো দিয়া আসে। কিছুই বাদ যায় না, সব বজায় আছে। রান্নাঘরে রান্না হইতেছে, ছেলেমেয়েরা পড়িতে বসিয়াছে, রমেশের ঘরে রেডিও বাজিতেছে, দুধ খাইয়া প্রতিদিনের মত কোলে শুইয়া ঘুমানোর জন্য খোকা গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব বজায় আছে। সকালে উঠিয়া চা খাওয়া, কাগজ পড়া, স্নানাহার সারিয়া আপিস যাওয়া, ছুটির পর বাড়ি ফেরা, খোকাকে ঘুম পাড়ানো, ছেলেমেয়ের পড়া বলিয়া দেওয়া, ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসা, খাওয়া এবং ঘুমানো। তবু সংসার তার বেঠিক বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া। বাহির হইতে একটা অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত প্রচণ্ড শক্তি চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া তার সংসারের আনাচে কানাচে পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ভিতর হইতে বিরামহীন সক্রিয় একটা শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে ধ্বংসের।

খোকাকে কোলে শোয়াইয়া অভ্যাসমত ধীরে ধীরে তাকে থাবড়াইতে থাবড়াইতে অবসাদে ধনেশের চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। এ, আর, পি বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়াছে, জগদীশ আর ট্রামের সেই কাঁচাপাকা চুল বুদ্ধিমানের মত চেহারার লোকটি বলিয়াছে, আজ রাত্রেই হয়তো কিছু ঘটিবে। এ চিন্তা মন হইতে দূর করিবার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। কিন্তু এই আতঙ্ক পর্যন্ত তার যেন আজ কেমন অবসন্ন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, বুককাঁপানো উত্তেজনায় অবশ করা শিহরণের মত মুহুর্মুহু শিরায় বহিয়া গিয়া মনকে দিশেহারা করিয়া দিতে পারিতেছে না। একসঙ্গে আরেকটা আতঙ্ক তার চেতনাকে দখল করিতে চাহিয়াছে—বাহিরের বিপদ ঘটিবার আগেই তার ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার, সর্বনাশ হওয়ার আতঙ্ক। একটা বিষ যেমন আরেকটা বিষের ক্রিয়া নাকচ করিয়া দেয়, সংসারের ভিত্তি ধ্বসিয়া

পড়িবার উপক্রম হইয়াছে খেয়াল করায় নূতন এক ভয় তার এই কদিনের ভয়কে দুর্বল করিয়া গিয়াছে।

জগদীশ ডাকিতে আসিলে সে তাকে ফিরাইয়া দিল। পড়িতে পড়িতে ছেলে-মেয়েরা অবিরত ঝগড়া আর মারামারি করিতেছে। ওদের স্বাভাবিক দুরন্তপনার মধ্যেও যেন কেমন খাপছাড়া বেপরোয়া হিংস্রভাব দেখা দিয়াছে। মেজাজ যেন ওদেরও তিরিক্ষে হইয়া উঠিয়াছে। তার পর এক সময় ছেলেমেয়েরা ভাত খাইতে গেল, উমার গালাগালি আর মার খাইয়া পলটুর আর্ত ও মিনুর নাকিস্বরে কান্না ধনেশের কানে আসিতে লাগিল। চুপ করিয়া সে ঘরে বসিয়া রহিল। অবসাদ ধীরে ধীরে কেমন একটা মৃদু ও শান্ত নেশায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, দুর্বল জরো রোগীর আলস্যের মত। ঘরের বাহিরে বারন্দায় হঠাৎ পারুল আর লাবণ্যর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হইয়াছে। সেই পারুল আর সেই লাবণ্য! সখির মত গলায় গলায় ভাব ছিল এই দু'টি ভাসুরঝি আর কাকীমার। কাড়াকাড়ি করিয়া লাবণ্য সংসারের কাজ করিত, উমার ছেলেমেয়ে মার চেয়ে কাকীমার আদর পাইত বেশি। সংসারের কাজ করা লইয়া পারুলের সঙ্গে আজ সে ঝগড়া করিতেছে! একতলা হইতে উমা চীৎকার করিয়া একটা বিশ্রী কথা বলিল লাবণ্যকে। লাবণ্য ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিল, 'তোমার খাই না পরি যে যা মুখে আসছে বলছ দিদি?'

লাবণ্য এত জোরে কথা বলিতে পারে? এত কর্কশ তার গলা?

অনেকক্ষণ পরে কি কাজে ঘরে আসিয়া ধনেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। উমা ভাবিয়াছিল, সে বুঝি পাড়ার দশজনের সঙ্গে কথা বলিতে বাহির হইয়াছে। বাড়িতে তার তো চুপচাপ একা বসিয়া থাকা স্বভাব নয়, বাড়ি থাকিলে এতক্ষণ কত আলোচনা, কত পরামর্শ তার চলিতে থাকে।

'কি হয়েছে গো? আজ কিছু হবে নাকি?' ভয়ে উমার কথাগুলি প্রায় জড়াইয়া গেল।

'শরীরটা ভাল নেই। পুলক ফেরেনি?'

'না।. ঘরে বসে আছ, খেয়ে তো নিতে পারতে এতক্ষণ? সারারাত হেঁসেল আগলে বসে থাকব?'

সকালে চার বস্তা চাল, এক বস্তা ডাল এবং নুন, তেল, মসলা মুদি দোকান হইতে আনা হইয়াছিল। বাজারে গিয়াছিল মাছ তরকারী কিনিতে, রসিকবাবু

এমন ভয় দেখাইয়া দিলেন যে মাসকাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে আর ভরসা হইল না, ধার করিয়াই জিনিসগুলি কিনিয়া আনিল। মাস ছয়েকের খাদ্য বাড়িতে সঞ্চয় করা আছে তবু আরও কিছু অবিলম্বে এই দণ্ডে সংগ্রহ করিয়া ফেলাই ভাল। মুদিওয়ালা কি সহজে ধার দিতে চায়! বিশ বছরের যে খদ্দের, তাকে পর্যন্ত কয়েক দিনের জন্য বাকি দিতে সে নারাজ। বিকালে টাকা পাঠাইয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে ধনেশ জিনিসগুলি পাইয়াছিল।

পুলককে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল, এখনও সে ফেরে নাই। ক'দিন সে বাড়ি ফিরতে এমনি রাত করিতেছে। কোথায় যায়, কি করে ছেলেটা, কে জানে। সেও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। তিনচার বছর আগে যখন তার পনের-ষোল বছর, অকারণে তার চেহারা খারাপ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, স্বভাব হইয়াছিল মেয়েদের মত লাজুক, চোখ তুলিয়া কারো মুখের দিকে চাহিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে-বয়সের কদভ্যাস ছেলেকে ধরিয়াছে টের পাইয়া কত রাত্রি ধনেশের তখন ঘুম আসে নাই। তার পর ছেলের চেহারায় লাবণ্য ফিরিয়া আসিলে, স্বভাব স্বাভাবিক হইলে, ধনেশের যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। খাইতে খাইতে ধনেশের মনে পড়িল, কিছুদিন হইতে পুলকের চেহারা আর চালচলনে আবার যেন সেই আগেকার শোচনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। দেখিয়াও এতদিন সে দেখে নাই। চারিদিকের অস্বাভাবিকতার পীড়নে, তার দিশেহারা ভয়-ভাবনার ছোঁয়াচে, আবার কি ছেলেটা বিগড়াইয়া গেল?

মুখে ভাত রুচিল না। অর্ধেক খাইয়া ধনেশ উঠিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল পুলকের। আজ একবার ভাল করিয়া ছেলেটাকে চাহিয়া দেখিতে হইবে, তার কি হইয়াছে। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল, সংসারের কাজ ফুরাইয়া গেল। শুধু আলো জ্বালিয়া ধনেশ আর উমা বসিয়া রহিল ছেলের অপেক্ষায়। শ্রান্তিতে ধনেশের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শঙ্কায় মন তার সজাগ, সচেতন হইয়া রহিল।

পুলক ফিরিয়া আসিল রাত্রি প্রায় একটার সময়। গলিতে রিক্সার আওয়াজ শুনিয়াই ধনেশ ও উমা নিচে নামিয়া সদর খুলিয়া দিয়াছিল। পুলক রিক্সা হইতে নামিল, ভাড়াও মিটাইয়া দিল। সমস্ত শরীর শক্ত আর সোজা করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সময় চৌকাটে পা বাধিয়া দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া ধনেশের ধমকে উমা চুপ করিয়া গেল।

পুলক নিজেই তখন উঠিয়া বসিয়াছে।

ছেলেকে কড়া কথা বলার ক্ষমতা ধনেশের ছিল না। শান্তকণ্ঠে অসহায়ের মত সে শুধু প্রশ্ন করিল, 'মদ খেলি কেন পুলক?'

পুলক বলিল, 'কেন খাব না? ক'দিন বাঁচব আর। তুমি বললে ধরে নিয়ে যাবে, শিবুদাও তাই বললে। শিবুদা বেশ লোক বাবা। বললে কি, দু'দিন বাদে সব তো ফুরিয়ে যাবে, আয় একটু ফুর্তি করেনি।'

সাড়ে সাত সের চাল

আঁধার রাত। গাঁয়ের নিঝুম পথ।

বেলে মাটির কাঁচা নরম পথে সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছিল। পথের এই গুণের কথা সন্ন্যাসীর মনে ছিল না। স্টেশন থেকে তিনমাইল দূর সালাতি পেরিয়ে আরও চার মাইল হেঁটে পলাশমতিতে পৌছবার কষ্ট সন্ন্যাসীর কল্পনায় ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। দেহ বড় দুর্বল, কোমর আর হাঁটুতে ব্যথা, মনে মনে সর্বাঙ্গের পুঞ্জীভূত ব্যথিত অবসাদ। প্রথমটা সন্ন্যাসী স্টেশনে শুয়ে থাকবে ভেবেছিল। চার পয়সা দিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে স্টেশনের শেডটার নিচে চিৎপাত হয়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরে বাড়ির দিকে রওনা হবে!

কিন্তু সন্ন্যাসী হিসেবী লোক, কল্পনা করতেও ভারি পটু। সে হিসেব করে দেখল সাত মাইল পথ তাকে হাঁটতেই হবে, রাতেই হোক বা ভোরেই হোক! এক কাপ চা খেয়ে খিদেকে মেয়ে ফেললেও মরা-খিদে রাত-ভোর জীবনীশক্তি শুষে শুষে আরও একটু কাহিল করে ফেলবে তাকে। ঘুম ভাঙতে হয়তো তার বেলা হয়ে যাবে। জিরিয়ে জিরিয়ে বাড়ি পৌছতে হয়তো এত দেরী হবে যে সঙ্গে তার সাড়ে সাতসের চাল থাকা সত্ত্বেও বাড়ির লোকের মধ্যাহ্ন ভোজনটা ফসকে যাবে।

হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী কল্পনা করে—না খেতে পেয়ে ক'জন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে! ক'জন মর মর হয়ে আছে তাই বা কে জানে! দু'একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌছেচে—তাদের মধ্যে সোনা বৌঠান একজন হতে পারে—তার সাড়ে সাত সের চালের দু'মুঠো সিদ্ধ করে আজ মাঝ রাত্রেও দিতে পারলে যারা জীবন মরণের সীমা রেখায় টলমল করার বদলে বেচে যাওয়ার দিকেই কোনমতে টলে পড়তে পারবে। আবার লড়াই করতে পারবে তারপর। কাল পর্যন্ত দেরী করলে হয়তো—

সর্বনাশ!

সঙ্গে কিছু ছোলাও আছে। সন্ন্যাসী তাই কিছু ছোলা চিবিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে রাত্রেই রওনা দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদকে মোটে ক্ষয় করেছে চারিটি তিথি। এমন জবর জ্যোৎস্নায় নরম পথে হেঁটে মনের মত কষ্ট পাওয়া অসম্ভব। শালা কি টানেই বাড়িটা টানছে তাকে, অনেকেই হয়তো যেখানে ভূত হয়ে গেছে মরে, সোনা বৌঠান শুদ্ধ।

প্রথম গাঁ সালাতিতে বরাবর একপাল কুকুর থাকত। পথিকে গাঁ ভেদ করে যেতে গেলেই তাদের সমবেত চীৎকারে ঘুমন্ত রাত চিরকাল জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনদিন কাউকে তারা কামড়ায়নি, তাড়াও করেনি, শুধু হল্লা করেছে প্রাণপণে। তবু ভয় একটু করেছে পথিকের হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে শক্ত করে। সন্ন্যাসীর হাতে লাঠি ছিল না, গাঁয়ে ঢুকবার আগে একটা ভাঙ্গা বাড়ির বেড়া থেকে একখণ্ড বাখারি সে সংগ্রহ করে নিয়েছিল। কিন্তু থপ্ থপ্ পা ফেলে গাঁয়ের সীমানা সে পার হয়ে গেল, কুকুরের সে প্রচণ্ড কলরব তার কানে এল না। দু'চারটে খেঁকি শুধু নির্জীব ভাঙ্গা আওয়াজে একটু সাড়া জানিয়েই চুপ হয়ে গেল।

মানুষ ও কুকুরের একসঙ্গে মরবার ও গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবার এই অতি ঠাণ্ডা খবর অনুভব করতে গিয়ে সন্ন্যাসীর জ্বরো অনুভূতি ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল—গাঁ পেরিয়ে যাবার পর। এখানে পথের দু'পাশে শুধু মাঠ আর জলা। সামলে নিতে থমকে দাঁড়িয়ে এলোমেলো নিশ্বাস নিতে নিতে সন্ন্যাসী চারিদিকে তাকায়, স্পষ্ট বুঝতে পারে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল এই নির্জন বিস্তৃতির মধ্যে মনটা তার ছোট হয়ে গেল। তারই আতঙ্কে মনটা কুঁচকে গেল, ভাঁজ হয়ে গেল। শালা, চোখেও যে ঝাপ্‌সা দেখছে!

মাথা ঘুরে পড়ে যাবার আগেই সন্ন্যাসী কায়দা করে বসে পড়ে পথে কনুই ঠেকিয়ে মাথাটা নামিয়ে দিল হাতের তালুতে। কতকাল সে পেট ভরে খায়নি, প্রাণপাত করে শুধু খেটেছে। মাঝে মাঝে এরকম হয় তার খানিক পরেই কেটে যায়।

খানিক পরে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার চলতে শুরু করল। হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হল শরীর যেন তার হাল্কা হয়ে গেছে, তার কোন বোঝা নেই! চালের পুঁটলি কাঁধে নেই, সেই পুঁটলির বাড়তি কাপড়টুকুতে বাঁধা ছোলাগুলিও সেই সঙ্গে গেছে। কোথায় পড়ল? কখন পড়ল? কুরু কুরু কুরু

করতে লাগল সন্ন্যাসীর পিঠের খানিকটা মেরুদণ্ড। তার হিসাব, তার কল্পনা, সব, ভোতা হয়ে গেছে। মাথা ঘুরে পড়তে গিয়ে যেখানে বসে পড়েছিল সেইখানেই যে পুঁটলি দু'টির থাকার সম্ভাবনা বেশি, এটুকু খেয়াল করে আশান্বিত হবার ক্ষমতাটুকুও তার নেই।

একটা মৃতদেহকে ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার মত নিজের দেহটাকে সে উল্টো দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। একটু গিয়েই পুঁটলির পাশে বসে মস্ত একটা আটকানো নিশ্বাস ফেলে সে শুধু নিশ্চল হয়ে আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করল।

পলাশমতির কাছে পৌঁছে সন্ন্যাসীর মনে হল, সে যেন আবার আগের গাঁ সালাতিতেই ঢুকতে যাচ্ছে। পথের ধারে সালাতির যে প্রথম ভাঙ্গা বেড়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাখারি সংগ্রহ করেছিল, পলাশমতিতে প্রবেশ পথের ধারেও তেমনি একটি ভাঙ্গা বাড়ি আছে, কেবল বেড়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কানা বাঙ্গার বাড়ি। দেখলেই টের পাওয়া যায় বাড়িটা শূন্য, মানুষ নেই।

'বাঙ্গা!'

সাড়া না পেয়ে অনুমানকে প্রত্যয় করে সন্ন্যাসী এগিয়ে গেল। দু'একটি দুঃস্থ কুকুরের তেমনি ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসছে। কোন বাড়িতে মানুষ আছে কোন বাড়িতে নেই নির্ণয় করতে আর সে সময় নষ্ট করবে না। সোজা বাড়ি চলে যাবে—নিজের বাড়িতে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে দেখতে। বামুন পাড়ার নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'কে?' সন্ন্যাসী সাড়া দিল না। ঘোষালদের আমবাগান থেকে শুকনো পাতায় চারপেয়ে কোন কিছুর চলার মচ মচ শব্দের সঙ্গে তীব্র একটা পচা গন্ধ ভেসে এল। পরের পাড়ার তিনটি বাড়ি পেরিয়ে তাদের টিনের চালার তিনটি ঘরওয়ালা বাড়ি। আট ন' বছর মেরামত হয়নি। তবে যা কিছু থাকবার কথা প্রায় সবই আছে, ভেঙ্গে পড়েনি এখনো। বেড়া নেই। পাশের ছোট কলাবাগান আর শব্জী ক্ষেতের বেড়ার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সামনে লাউ কুমড়ার মাচা দুটি হয়েছে অদৃশ্য।

দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল সন্ন্যাসী। বেড়া আর মাচা নিশ্চয় উনানে পুড়েছে। উনানে আগুন জ্বলেছে তার বাড়িতে, রান্না হয়েছে। হয়তো সবাই বেঁচে আছে বাড়িতে, একজনও মরেনি। কোন মতে কুড়িয়ে পেতে একমুঠো

দু'মুঠো খেয়ে মরমর অবস্থায় ছেলে বুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই বেঁচে আছে।

'মনাদা!'

প্রথমবার একটু আস্তেই ডাকল সন্ন্যাসী। তারপর জোরে।

'মনাদা।'

সাড়া নেই।

'সুবল কাকা।'

সাড়া নেই।

'সুখী পিসি!'

সাড়া নেই।

সন্ন্যাসী একটু দম নিল।

'সোনা বো'ঠান।'

সাড়া নেই।

'সোনা বো'ঠান! সোনা বো'ঠান!'

গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল। তবুও তো সাড়া নেই। তখন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ল, দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে। তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আরেকটি কড়া ভেঙ্গে খসে এসেছে দরজা থেকে।

ভিতরের দুটি ঘরের একটিতে দরজার উপরে শিকলে তালা আঁটা, দরজার পাট থেকে ভেঙ্গে খসে এসে শিকলটা ঝুলছে। অন্য ঘরটির দুয়ার সপাটে খোলা।

কোনো ঘরে কেউ নেই। তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে। সবাই? দাওয়ায় সাড়ে সাতসের চালের পুঁটুলি নামিয়ে সন্ন্যাসী হিসাব আর কল্পনা দিয়ে ব্যাপারটার হদিস পেতে বসল। সবাই যখন বেঁচেছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বৌঠান শুদ্ধু? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকী যারা ছিল?

কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বৌঠান শুদ্ধু?

ভাবতে ভাবতে ঝিমোতে ঝিমোতে একসময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।

প্রাণ

মালতীর ফিরতে আজ দেরী হচ্ছে। বেশি রকম দেরী হচ্ছে। কোথায় উঠে গেছে সূর্যটা আকাশে। ক্লেশকর একটা অনুভূতি পাক দিতে থাকে অটলের মধ্যে তার একঘেয়ে একটানা চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে। মালতীকে আজ সে খুন করবে, নিশ্চয় খুন করবে, যদি—হ্যাঁ, অবশ্য যদি কাজ সে হাসিল করে না আসে। দেরী হোক মালতীর, দেরী হওয়া তার আশ্চর্য নয়, তাতে কিছু এসে যায় না। সেজন্য অটলের রাগ বা জ্বালা নয়। মালতী ফিরে এসে যদি জানায় আজও বাবুর সাথে কথাবার্তা বলে সব ঠিকঠাক করে আসতে পারেনি, লজ্জায় ভয়ে পারেনি, তা হলে অটল ফেটে যাবে রাগে : মালতীকে টের পাইয়ে দেবে তার রাগ কি জিনিস, তার অবাধ্য হওয়ার ফল কি। সে অবশ্য পরের কথা। সব ঠিকঠাক করেই হয়তো আসবে মালতী। দেরী হয়তো হচ্ছে সেইজন্যই। বাবু তো আবার মান্যিগন্যি মানুষ, সুযোগ সুবিধা আড়াল না পেলে মালতীর সাথে কথাই বা বলবে কি করে, লোকে দেখলে বলবে কি! মালতীও হয়তো হাঁ করে আছে সুযোগের জন্য, মেয়ে মানুষ তো। তবে, শকুনটার নজর যখন পড়েছে মালতীর ওপর মালতীর কথায় রাজী সে হয়ে যাবে। খুশি হয়েই রাজী হবে, বেশি রকম আগ্রহের সঙ্গে কথাটা যতবার ভাবে অটল ততবারই মনে মনে ছ্যা ছ্যা করে। জনপ্রাণী থাকলে মালতী যাবে না, তার ভয় হবে লজ্জা করবে, এতে খাঁটি গেঁয়ো ভীরু লাজুক বৌ বলে মালতীর দাম বাড়বে ব্যাটার কাছে। কি বোকাই সে বনবে অটলের বুদ্ধিতে—সে আর মালতী দুজনেই!

কতকাল ঘর ছেড়ে গাঁ ছেড়ে এসেছে, উপোস করে দিন কাটাচ্ছে কি অবস্থায় লজ্জা ঘেন্না বরবাদ করে, আজও সে আছে ভীরু লাজুক গেঁয়ো বৌ! চোখের সামনে কতলোকের কত বৌকে কি হয়ে যেতে দেখল অটল, নিজের বৌ বলে যেন

বাদ পড়েছে মালতী। মালতী অবশ্য বলে যে আজও সে সতী আছে। পেটের দায়ে ছাড়াছাড়ি হোক তাদের সকালে দুপুরে, ফিরতে কোনো কোনোদিন রাত হয়ে যাক যেদিন যেমন কাজ জোটে সারতে তাই বলে সে অসতী হবে কেন, মুখ-পোড়া বজ্জাত!

মালতী ঝগড়া করে, গাল দেয়, কাঁদেও। কে জানে, তাই হয়তো হবে। এত দুর্দশা সয়েও তাকে তো আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে সে এই ভাঙ্গা নোংরা চালায় শেয়াল কুকুর তাড়িয়ে। হয় তো তাই হবে!

কিন্তু মালতী সব ভেঙ্গে দিয়ে এলে তার যে জ্বালা হবে সে কথা ভেবে এখন থেকে দগ্ধ হচ্ছে অটল।

হীরু, খলিল, রাধারা ফিরে এসেছে ছোট মগের কম মাপের পাতলা খিচুড়ি নিয়ে। আর যা কিছু জোটাতে পেরেছে মিলিয়ে একসঙ্গে একবারে খাবে, নইলে মনে হয় যেন এক চুমুক একটু নোনা ঘন জল খাওয়া হল। ভাঙ্গা পোড়ো বাড়িটার সব আনাচ কানাচ ওরা দখল করে আছে, যে কটা ঘরের আধখানা সিকিদার ছাদ ঝুলে আছে তার নিচে, ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়তে থাকলেও সরু ইটের ভাঙ্গা দেয়াল এখনো দাঁড়িয়ে থেকে দুদিক তিনদিক যেখানে আড়াল করছে। সিদ্দিকের বৌ সেদিন মারা পড়েছে সাপের কামড়ে। প্রথম এসে অটল ওখানে আশ্রয় খুঁজেছিল। ঠাকুরদারও ঠাকুরদার আমলের হোক, তার জন্মের আগে থেকে পরিত্যক্ত হোক, ইটের বাড়ি তো, সঙ্গীও আছে। ওরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দল বেঁধে হৈ হৈ করে, তাদের এই ভাঙ্গা চালার আশ্রয় থেকে এখন তারা যেমনভাবে কুকুর তাড়ায়।

"যাসনি বুঝি?' হীরু শুধিয়েছিল ফিরবার সময় দশজনকে শুনিয়ে, 'অ! তোর বৌ—ই তো গেছে!'

দু'মাস কি তিন মাসের ছেলে রাধার বুকে—বুক আর কই, শুধু পাঁজর। চিঁ চিঁ গলায় সে শুনিয়েছিল, 'মরণ হয় না? সরম লাগে না? বেহায়া বাঁদর?'

ওদের হাসি টিটকারীর মানে ছিল সোজা। ওরা টের পেয়েছে, বাবুর নজর পড়েছে মালতীর দিকে। ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে চালা আর নর্দমার মাঝের ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে অটল টানছিল কাল সন্ধ্যায় স্টেশনে কুড়ানো আধপোড়া চুরুটটা। সেই থেকে একটা অসহ্য অনুভূতি কেবলি পাক দিয়ে উঠেছে অটলের মধ্যে: মালতী যেন এসেই গিয়েছে সব কিছু ভেঙ্গে দিয়ে। মালতীর দিকে নজর পড়েছে বাবুর! মালতী এনে দিচ্ছে আর

ঘরে বসে সে রাজভোগ খাচ্ছে! ওরা কি জানে কাল থেকে একটু খিচুড়িও সে খায়নি—একটু দেরী হওয়ায় তারা পায়নি খিচুড়ি। কোথাও কিছু জোটেনি কাল তাদের, কাজে যায়নি মালতী, তার চাপড় খেয়েও যায়নি। এক বেলা পেট ভরল না, বাবুর নজর পড়েছে মালতীর ওপর।

ধুলায় ধূসর হয়ে মালতী ফিরে আসে। কাপড় তার মাটির মতই ময়লা, তারও ওপর আরেক পরল ধুলোর আস্তরণ পড়েছে বেশ বোঝা যায়। বড় রাস্তায় সারাদিন অফুরন্ত ট্রাক চলাচল করে চারিদিক কাঁপিয়ে, ঘন হয়ে ধুলো ওড়ে চারিদিক অন্ধকার করে।

ভর্তি থলিটা মালতী কাঁখে নিয়ে আঁচল দিয়ে ঢেকে আড়াল করে বয়ে এনেছে। নামিয়ে রেখে সে আস্তে আস্তে হাঁপায়। এইটুকু থলি! এক কাঁখে ছেলে, আরেক কাঁখে জলভরা কলসী বয়েছে মালতী ওবছর, ধানসেদ্ধর হাঁড়ি নামিয়েছে অবহেলায়। তখন খাসা চেহারা ছিল ওর। শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে গেছে আজ, হাড়গুলি ঠেলে ঠেলে উঠেছে। তাই বুঝি ভাল লেগেছে বাবুর। ছিপছিপে গড়ন, বয়স কম লাগে—। ছ্যা ছ্যা করে অটল মনে মনে।

'কি আনলি?'

অনেক কিছু দিয়েছে বাবু মালতীকে থলি ভর্তি করে। চাল ডাল তরকারী—আলু বেগুন সিম আর আস্ত একটা বাঁধাকপি। শালপাতায় জড়ানো খানিকটা মাংস। মিকশ্চারের শিশি ভরা সোনালী সরষের তেল। পুরানো একখানা সাফ্ ধুতি আর সাবান—কার্বলিক সাবান।

চেয়ে চেয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছাখে অটল, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মালতী। মিনতি করে বলে, 'ভরে ফ্যালো—ঢেকে ফ্যালো।'

চারিদিকে ফাঁক, বাবু যা আগাম দিয়েছে কে দেখে ফেলবে কে জানে! চোখের পলকে রটে যাবে চালায় চালায় পোড়ো বাড়ির আশ্রয়ে আশ্রয়ে, কত কি উপার্জন করে এনেছে মালতী হিংসায় বিদ্বেষে জ্বলে যাবে কতগুলি বুক, কথায় বিঁধে বিঁধে পাগল করে দেবে মালতীকে।

'নে নেকামি রাখ। বেলা দুপুর হল, রাঁধবি কখন খাবি কখন?'

বাঁধাকপিতে হাত বুলায় অটল, টিপে টিপে দেখে—নারকোলি বাঁধুনির খাসা ঠাসা কপি। ও বছর বাড়ির লাগাও জমিটুকুতে সে কপি লাগিয়েছিল গণ্ডা সাতেক। কি তেজী আর ভারী হয়েছিল কপিগুলি। বিশটা কপি বেচে দিয়েছিল

পঞ্চুকে—ঠক্, চোর, বেজন্মা পঞ্চু ব্যাটাকে। বোকা পেয়ে কি ঠকানটাই তাকে ঠকিয়েছিল। আর শুধু পঞ্চুই বা কেন? নকুড়বাবু, জাফর মিয়া, নায়েববাবু ঠকাতে ছেড়েছে কে তাকে ধানে, জমিতে সবদিক দিয়ে?

প্যান প্যানিয়ে কি বলছে মালতী? শুধু চাল, ডাল সে হাঁড়িতে চড়াতে চায়, অন্য সব আজ তোলা থাক, লুকানো থাক। তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, লোকেও টের পাবে না তারা বিশেষ কিছু রান্না করে খাচ্ছে!

'হাঁড়িতে তরকারী ছেড়ে দি, শীগগির হবে, তেল নুন মেখে—'

বাবুর সঙ্গে মালতী সব ঠিক করে না এলে যে রকম রাগ করবে ভেবেছিল, সেই খুন করা রাগে মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে অটলের। চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে মালতীকে সে মাটিতে পেড়ে ফেলে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে হন্তে কুকুরের মত দাঁত বার করে ফোঁসে, 'খেয়ে এয়েছিস বুঝি পেট পুরে?'

'খেয়ে এলে এত জিনিস দিত?' দমের সঙ্গে আর্তনাদ আটকে মালতী বলে ফিসফিসিয়ে, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলে রাধা, মতি, বিন্থর মা, সুবালা এরা সবাই ছুটে আসবে, টের পেয়ে যাবে সব।

'মেরে ফেলব, খুন করে ফেলব, ন্যাকামি করবি যদি।' বলে অটল তাকে রেহাই দেয়। অটলের খুশিমত রান্নার সমারোহ হবে। ভাত আর ডাল ভিন্ন ভিন্ন নয়—তাতে অনেক সময় লাগবে, উপোসী অটলের অত ধৈর্য নেই। চাল ডাল এক সাথে চড়ুক এক হাঁড়িতে, তাতে সিদ্ধ হোক কয়েকটা আলু আর সিম। বেগুন একটা পোড়া দেওয়া হোক উনানে। মাংস দিয়ে বাঁধাকপির তরকারী হোক অন্য উনানে ভাঙ্গা কড়াইটাতে—অন্য উনান কই? সে ভাবনা মালতীর কেন?

পোড়ো বাড়ির ইঁটের স্তূপ থেকে ইট এনে অটল উনান বানিয়ে দেয়। পোড়ো বাড়ির পিছনের জংলা বাগান থেকে শুকনো ডালপাতা কুড়িয়ে এনে দেয় তিন দফায়—তারপর আরেক বার জ্বালানি সংগ্রহের চেষ্টায় বার হতে গিয়ে থমকে থেমে পেটে কবার হাত চাপড়ে চাপড়ে বলে, 'আমি এক নম্বর বোকা! জানিস বৌ, এক নম্বর বোকা আমি!' টান দিয়ে বেড়ার খানিকটা পেড়ে ফেলে সে মালতীর দিকে এগিয়ে দেয় উনানে গুঁজবার জন্য। 'ছাখ দিকি খেয়াল হয়নি, আজ এখানে শেষ। বেড়াটা থেকে আর কি হবে? মিছে ছুটাছুটি করে মরলাম জ্বালানির লেগে।'

'কেন এমন করতেছ?' মালতী বলে কেঁদে কেঁদে, 'ওরা এসে শুধালে কি

বলবে কোথা এত জিনিস পেলে? চুপচাপ থাকো তোমার পায় ধরি।'

'শুধাবে? কে শুধাবে? মুখে নুড়ো জেলে দেব না!'

মালতী কাঁদছিল আগে থেকেই কিন্তু এবার এতক্ষণে সেটা খেয়াল হয় অটলের। খিদের জন্য তো নয়, খিদে মরে গেছে অনেকদিন, একবেলা পেট ভরে খাবার জিদে তার যেন নেশা হয়েছিল, গায়ে জোর বেড়েছিল। আর কিছু করার নেই, বসতে না বসতে ঝিম ধরে সে ঝিমিয়ে যায়। কদিন থেকে মালতীর এমনি ধরন ধারণ ধাঁধার মত লাগছে তার কাছে। কদিন থেকে? বাবু যেদিন লোক মারফৎ ওকে বিশেষ টিকিট পাইয়ে দিয়ে সামনে দাঁড করিয়ে দুধ খাইয়েছে, শিশু আর প্রসূতিদের বরাদ্দ দুধ, সেদিন কি তার পরদিন থেকে। বেশ তিরিক্ষে কাঠখোট্টা হয়ে উঠছিল মালতী গেরস্ত ঘরের বৌ মানুষের হায়া টায়া সব ভুলে গিয়ে, মতি রাধা এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাক চতুর হয়ে উঠেছিল একটু বেশী আদায় করার ফন্দি ফিকিরে, কথা বলতে শিখছিল চটাং চটাং। মতি রাধাদের সঙ্গে খেঁকি কুকুরের মত সামনে সে ঝগড়া চালিয়েছে, মুখে তুবড়ি ছুটিয়েছে নতুন সেখা নোংরা কথার। বাবু কদিন দুধ আর খাবার খাওয়াবার পর থেকে কেমন যেন সে ঝিমিয়ে মিইয়ে গেছে, শান্ত ভাল মানুষ হয়ে গেছে। ঘর ছাড়ার পর ঘরের কথা গাঁয়ের কথা অটল কোনোদিন শোনেনি ওর মুখে, এই কদিন মাঝে মাঝে কি যেন ভাবতে ভাবতে আনমনে ঘর সংসার আপন জন চেনা মানুষের কথা সে বলে—পুরানো হারানো দিনের কথা। এতকাল পরে হঠাৎ নতুন করে যেন ওর ঘর সংসারের জন্য কষ্ট আরম্ভ হয়েছে।

রান্না শেষ করে খেয়ে উঠতে বেলা পড়ে আসে। খেতে সময় লাগে খুব কম। যে রকম ভোজ খাবে ভেবেছিল অটল তা হয় না, অল্প খেয়েই পেট ভরে যায়, জিভে স্বাদ লাগে না। না খেয়ে না খেয়ে খাওয়ার ক্ষমতাও গেছে। তবু এ পেট ভরেই খাওয়া, দিনের পর দিন যা খেয়ে পেট ভরত না তার দশগুণ তো বটে—পুষ্টিকর অন্নব্যঞ্জন। খেতে খেতেই কিসের যেন ঝাঁঝ, কত যেন জ্বালা জুড়িয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট অনুভব করে অটল, একটানা একটা যে অদ্ভুত আওয়াজ প্রায় অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তা যেন ঝিমিয়ে আসতে থাকে দুই কানে! খেয়ে উঠে উদ্ভুত অস্বস্তি বোধ হতে থাকে প্রথমটা, হঠাৎ ওজন বেড়ে দেহটা যেন দশগুন ভারি হয়েছে, ভেতর থেকে বুকে কিসের চাপ পড়ায় শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে, মাথাটা হয়ে গেছে হাল্কা, শূন্য। তারপর ঘনিয়ে আসে গভীর আলস্য আর অবসাদ। দুঃখ

কষ্ট অস্বস্তি জ্বালাবোধ সব কমে গিয়ে সৃষ্টিসংসার বুঁদ হয়ে আসে নেশায়, গভীর ঘুমে।

অটলের যখন ঘুম ভাঙল, রাত্রি হয়ে গেছে। এখন খাপছাড়া অদ্ভুত লাগে তার নিজেকে যে খানিক্ষণ ধাঁধা লেগে সে থ' মেরে থাকে। গাঁয়ে নতুন খড়ের মোটা চালার নিচে মাটির পুরু দেয়াল ঘেরা তার নিজের ঘরেই যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, তামাক টানার ইচ্ছায় কাতর হয়ে। হাত দু'তিনবার প্রায় এগিয়ে যায় পাশে মালতীকে ঠেলে দিতে, গলা দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসে তামাক দিতে বলার কথা! রাত দুপুরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তামাক সেজে দিতে বললে মালতী রাগ করত না। তার জানা ছিল, তামাক খেয়ে অটল তাকে আদর করবে।

মালতী আগেই উঠে বসেছিল।

সশব্দে প্রকাণ্ড হাই তুলে অটল জিজ্ঞেস করে, 'ডাকলি না যে?'

'ঘুমুচ্ছো, কি হবে ডেকে?'

গলা ভারি মালতীর, বোধ হয় কাঁদছে। তেমন উদ্ভট লাগে না কান্নাটা এখন। গা জ্বালা করে না। শুধু মনে হয়, মালতী যেন অনেক দূরে বসে কাঁদছে।

'যাবি না?'

'আরও রাত হোক।'

'খেয়ে নিলে হোতো না?'

'পরে খাব। তুমি খাবে তো খাও।'

'থাক, এক সাথে খাব।'

অটলের গলা আশ্চর্য রকম মিষ্টি লাগে মালতীর কাছে, অনেকদিন শোনেনি। গলাটাই কেমন কর্কশ হয়ে গিয়েছিল তার, মাঝে মাঝে মিষ্টি কথা বলতে চাইলেও কড়া শোনাত। মালতী তাই অনেক দিন পরে জোরে কেঁদে ওঠে আদর-চাওয়া ভরসা-চাওয়া পুরানো কান্না।

'আমি যাবনি। ডর লাগছে মোর।'

অটল খিঁচে ওঠে না, ভেঙ্গিয়ে ভেঙ্গিয়ে বলে না যে পথে ঘাটে গণ্ডা গণ্ডা পুরুষ পুরুষ নিয়ে যার কারবার, বাবুর মত ভদ্দরলোকদের কাছে একটা রাত কাটাতে তার ডর লাগছে! হাত বাড়িয়ে সে হাত ধরে মালতীর, ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বলে, 'তোর ডরটা কিসের? একটা রাতও পুরো নয়। বাবু ভদ্দর লোক, লেখাপড়া জানা লোক, গুণ্ডা তো নয়, তোর ডরটা কিসের? একটু না করবি তো এমনি

দিন কাটবে মোদের? দু'দিন বাদে সেই তো পড়বি দালালের হাতে, নয়তো ক্যাম্পে যাবি, ছিনিমিনি খেলবে তোকে নিয়ে? তার চেয়ে বরং একটা রাত, একটা রাতও পুরো নয়, মদটদ খেয়ে বাবু বেহুঁস হয়ে ঘুমোলে দোর খুলে দিবি মোকে—'

বলতে বলতে বাইরের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চালার আবছা অন্ধকারে হুড়মুড় করে এসে ভিড় করে তাদের গত মাসগুলির বীভৎস অভিজ্ঞতা—ক্ষুধার জ্বালা, আশ্রয়ের অভাব, শীত, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নোংরামি, মৃত্যু। অটলের গলা কর্কশ হয়ে উঠতে থাকে, খেঁকি কুরের আওয়াজের আভাস আসে।

'রাতারাতি উধাও হয়ে যাবো দুজনে যা পারি বাগিয়ে নিয়ে। সুখে থাকব। বাবুকে বলেছিস তো বাড়িতে লোক থাকলে যাবি না? লজ্জা করবে?'

'বলেছি।' মালতীর গলাও এবার শুকনো।

রাত বাড়ে। দূর থেকে একটা হল্লার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছিল, ক্রমে সেটা থেমে যায়। পোড়োবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাধা থ্যানথ্যানে গলায় খানিক্ষণ পলাতক একটা মানুষকে গাল দিয়ে শুতে যায়। ওবেলার রান্না অন্নব্যঞ্জন অন্ধকারে বসেই তারা খায়। কলসীর জল ফুরিয়ে এসেছে, জলটুকু খেতেই শেষ হয়ে যায়। অটল ছেঁড়া ন্যাতায় এঁটো হাত মুছে নেয়। রাত আরেকটু বাড়লে দু'জনে পথে বেরিয়ে পড়ে। ছোট একটা পুঁটলি সঙ্গে নেয় অটল। কিই বা আছে নেবার। কাঁথাকাণি চট মাটির হাঁড়ি কলসী ভাঙা কড়াই নিয়ে কি হবে।

কোথাও আলো নেই, দোকান পাট বন্ধ, রাস্তা নির্জন। কুকুরগুলি ছাড়া এরি মধ্যে চারিদিকে সব ময়রে গেছে। বড় রাস্তায় লরী চলার আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়েছে। বটতলায় কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে কয়েকটা মানুষ। জীবনে প্রথম চুরির কথা ভেবে অটলের এখন বেশ ভয় করে, কেঁপে উঠে আঁকু-পাঁকু করতে থাকে বুকটা। কদিন ধরে সব পরিপাটিরূপে ছক কেটে রেখেছে মনের মধ্যে, ভয়ের কথা মনেও আসেনি। নিজেই চাকর ঠাকুর সরিয়ে দিয়ে বাবু থাকবে একা, মদের নেশায় উপভোগের শ্রান্তিতে বেহুঁস হয়ে ঘুমোবে। জাগেই যদি নেহাৎ, লোহার এই যে ডাণ্ডা নিয়েছে অটল কাপড়ের তলে মালতীকে না জানিয়ে, তার এক ঘায়ে আবার বেহুঁস করে দেবে। কে চুরি করেছে জানাজানির ভয় তো সে করে না, জানাজানি যে হবেই কাজটা কাদের, অটল তা জানে। কাজ হাসিল করে পালাতে পারলেই তার হল। দরকার হয়তো মালতীকে ফেলে একাই নয় সে পালাবে। তবে তার ভয়টা কিসের? আজকের আগে তো এ অন্ধ উদ্বেগ আর এলোমেলো

দুর্ভাবনা তার ছিল না। ভয়ের বদলে বরং উল্লাস জাগত বাবুর টাকাপয়সা সব নিয়ে ভাগবার কথা আর দরকার হলে বাবুর মাথায় ডাণ্ডার ঘা বসাবার কথা ভাবলে, ভিতরের অকথ্য একটানা জ্বালা যেন খানিকটা জুড়িয়ে আসত, মনে হত তাকে যেমন মেরেছে আর মারছে সবাই, একটু তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে বাবুকে মেরে। পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে ওঠার পর জ্বালাটা যেন জুড়িয়ে গেছে অনেক। তখন থেকে ভয় ভাবনা উঁকি দিতে শুরু করেছিল, এখন স্পষ্ট আর আর প্রবল হয়ে উঠেছে।

রাতে আবার না খেলেই হত। শরীরটা ভারী লাগছে, অবসাদ বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এত সব হাঙ্গামা না করে যদি ভাঙ্গা কুঁড়ের খড়ের বিছানায় মালতীকে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকতে পারত, শুয়ে থাকলে চলত।

উপোসী পেটে একটু অন্ন পড়তেই কেমন করছে প্রাণটা।

পুরানো প্রাচীর ঘেরা মাঝারি সাইজের বাগানের মাঝখানে পুরানো বাড়ি ভেঙ্গে কে নতুন বাড়ি করেছিল, জবরদস্তি সরকারী দখলে এসে এখন বাবুর বাসা হয়েছে। কাঠের গেট খোলাই ছিল খানিকটা। গেটটা চেপে ধরে মালতী দাঁড়িয়ে পড়তে আস্তে তার কোমরে একটা গুঁতো দিয়ে অটল ফিসফিসিয়ে বল্লে, 'যা। ডর নেই! খানিক বাদে ওদিকে ঘুরে গিয়ে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পিছনে লুকিয়ে থাকবো, বাবু ঘুমুলে খিড়কি খুলে ডাকিস।'

মালতী গেটের ভেতরে ঢোকে, আস্তে গোটটা ভেজিয়ে দিয়ে অটল সরে পড়ে। বুক তার ঢিপ ঢিপ করছে ভয়ে, উত্তেজনায়। নিজেকে সে গাল [illegible] মনে মনে, লাঙল নিয়ে মাঠ চষা বলদের লেজ মলা গেঁয়ো চাষা, তাকে দিয়ে আর কত হবে! কেবলি তার মনে পড়তে থাকে, সে পুরুষ, মালতী মেয়েলোক। তার যদি এই অবস্থা, মালতীর দশা না জানি কি হয়েছে!

বাবুর বাড়ির পিছনে কুয়োর কাছে গরু বাঁধা চালাটার ছায়ায় জবা-গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে বসে একটু বেপরোয়া দুঃসাহসের জন্য সে ভিতরে ভিতরে আকাশ পাতাল হাতড়িয়ে মাথা কপাল খোঁড়ে। সাহস আসে অদ্ভুত রকমের, যা দিয়ে তার কোনো কাজ হবার নয়। এখানে চুপটি মেরে ঘুপটি মেরে বসে না থেকে বাড়ির ভিতরে গিয়ে বাবুর মাথায় এখুনি লোহার ডাণ্ডাটা বসিয়ে দিয়ে সে কাজ হাসিল করার ইচ্ছাটা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে, মনে হয় এভাবেই কাজটা সহজে হবে, ভয় ভাবনার কিছু থাকবে না। দূরে পেটা ঘড়িতে এগারটা বাজে। বাবু কি এখন হাত ধরেছে মালতীর? কাপড়ের নিচে লোহার

ডাণ্ডাটায় হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে অটলের। পেটা ঘড়িতে হয় তো বারটা বাজবে, একটা বাজবে, তারপর মালতী আসবে খিড়কির দরজা খুলে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা অসম্ভব অটলের পক্ষে! আর একমুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব।

মাথায় যেন আগুন জ্বলতে থাকে অটলের। মালতী ভেতরে গেছে, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। দরজা না ভেঙ্গে বাড়ির মধ্যে তার ঢুকবার উপায় নেই। হাঙ্গামা করলেই সর্বনাশ। কোনো রকমে যদি সে ঢুকতে পারত বাড়ির মধ্যে এইদণ্ডে। ঢুকেই তা হলে ডাণ্ডাটা বসিয়ে দিত বাবুর মাথায়। সব চুকে যেত। মালতীও রেহাই পেত। কি ভুলটাই হয়ে গেছে! বাবু ঘুমোলে মালতীকে দরজা খুলতে বলার বদলে মালতীর পিছু পিছু খোলা দরজা ঠেলে সে যদি ভিতরে যেত, ডাণ্ডার এক ঘায়ে পা্ড়িয়ে দিত বাবুকে'

ও বেলা আর এ বেলা পেটে বোঝাই করা পুষ্টিকর অন্নব্যঞ্জন যেন তাপ হয়ে তার রক্তকে গরম করতে থাকে, শক্তি হয়ে দৃঢ় করতে থাকে পেশী আর স্নায়ু। অনেকদিন পরে পেট ভরে খাওয়ার প্রথম নেশা আর অবসাদ কমতে কমতে পেটা ঘড়িতে বারটা বাজলে অটলকে পুরোপুরি সজীব, প্রাণবন্ত করে দেয়। আর সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না মালতীর অপেক্ষায়। বাড়ির চারিদিকে একবার পাক দিয়ে আসবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে সজাগ সজীব মনে হলেও উগ্র অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য তার কেটে গিয়েছে। গুরুভার বিষাদে থম থম করছে ভেতরটা। মনে এসেছে ধীর স্থির একটা সঙ্কল্প। বাবু যদি বেঁহুস হয়ে ঘুমিয়েও থাকে, জাগবার এতটুকু [illegible]শও দেখা না যায়, তবু সে লোহার ডাণ্ডাটা মারবে বাবুর মাথায়। একেবারে শেষ করে দেবে!

দু'দিন তাকে দিয়ে এই বাগান বাবু সাফ করিয়েছিল। মজুরী দিয়েছিল কয়েক-গণ্ডা করে পয়সা। বাগানের মালীর কাজটা পাবার জন্য সে বাবুর পায়ে ধরেছিল। বাবু দিয়েছিল ধমক, তার সরকারী মালী এসে গেছে। তাই না এই অবস্থা আজ তার!

দুটি একটি ছাড়া সব জানালা বন্ধ পিছনের আর পুবদিকের। খোলা জানালায় মোটা পর্দা। একটা জানালার পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে বোঝা যায় ভেতরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বাবুর কি আর ঘুমের তাগিদ আছে আজ। কতরাত অবধি ফুর্তি চলবে কে জানে! দাঁতে দাঁত লেগে যায় অটলের। সামনের দিকে সদর দরজাটা সে আস্তে ঠেলা দেয়। যদি ওরা ভুলে গিয়ে থাকে দরজাটা বন্ধ করতে!

না, দরজা বন্ধই আছে।

পশ্চিম দিক ঘুরে বাড়ির পিছনে ফিরে যেতে গিয়ে অটল থমকে দাঁড়ায়, বুকটা তার ধড়াস্ করে ওঠে, আর্ত চীৎকার ঠেলে আসে, হাতটা উঠে যায় মুখে। গাঁদা ঝোপের মধ্যে ঘুপচি মেরে বসে আছে সাদা ধবধবে কাপড় পরা একটা মানুষ। একদিন পেটভরে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে কতটুকু আর শক্তি আসে মাসের পর মাস ধরে উপবাসক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ দেহমনে, যুগযুগান্তের সঞ্চিত স্তূপাকার অন্ধ আতঙ্কে আলোড়িত হয়ে সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে মূর্চ্ছার উপক্রম হয় অটলের।

ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠে মালতী বলে, 'আমি, শুনছো, আমি!

সম্বিৎ ফিরে এলে প্রথমেই অটলের মনে আসে, তাই বটে, মালতী বাবুর দেওয়া ধোপদুরস্ত ধুতিটা পরেছিল বটে, একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা মালতীকে ওখানে গাঁদা বনে ঘুপটি মেরে বসে থাকতে দেখলে সে নিশ্চয় এমনভাবে ডরাত না, চিনতে পারত।

দু'হাতে গাঁদা গাছ সরিয়ে কাছে গিয়ে অটল উবু হয়ে বসে, দুমড়ে মুচড়ে যায় গাঁদা গাছ তার পায়ের নিচে, জোরালো গন্ধ ওঠে গাঁদার!

'কি হল?'

'আমি—আমি যাইনি।'

'ভেতরে যাসনি?'

'উঁহু।'

ভয়ে কাঁপে মালতী, শব্দ করার ভয়ে খুব আস্তে চেপে চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদে ছোট ছোট ফোঁপানি করে। অটল চাপা গলায় বলে, 'চুপ কাঁদিস না, চুপ। ভেতরে যাসনি একেবারে? দেখা হয়নি বাবুর সাথে?'

'না। খানিক আগে বাবু বেরিয়ে গেটতক্ গেল, তারপর ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল দোরে।'

'আগে যাসনি কেন?'

মালতী জবাব দেয় না। অটলের শান্ত শ্রান্ত গলার আওয়াজে তার ভয় খানিকটা বোধ হয় কমে যায়। আর ফোঁপাবার উপক্রম করে না। খুন যে করবে বলেছিল, খুন যে করতে চায়, সে কি এমন সুরে কথা কয়?

অটলের গলা আরও শ্রান্ত শোনায়: 'সেই থেকে বসে আছিস এখেনে?

'হাঁ। এখান থেকে তোমাকে দেখা যাচ্ছিল!'

পশ্চিমে হেলানো ছোট চাঁদের তেরছা ক্ষীণ আলোয় কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকে বাবুর বাগানের গাঁদা বনে। কালকের খাওয়া ফুলিয়ে যাবে

থলির বাড়তি চাল ডাল তরকারীতে পরশু কি খাবে তাই ভাবে দু'জনে, পরশুর পরদিন—

'আর কি হবে। চল ফিরে যাই।'

গেট দিয়ে বেরিয়ে দু'জনে তারা ফিরে চলে তাদের ভাঙ্গা চালার আশ্রয়ের দিকে। চলতে চলতে মালতীকে ভালভাবে শোনাবার জন্য একবার তার গায়ে হাত দিয়ে অটল বলে, 'কি জানিস, এসব মোদের কাজ নয়কো।'

রাসের মেলা

আজ রাস পূর্ণিমা। রাসের মেলা বসেছে শহরতলীর খালধারের এই রাস্তা আর দু'পাশে যেখানে যেটুকু ফাঁকা ঠাঁই আছে তাই জুড়ে। নামকরা মস্ত মেলা, প্রতিবছর হয়। দোকানপাট বসে অনেক, দূর থেকে বহুলোক আসে কেনাবেচা করতে, অনেকে সারা বছরের দরকারী মাদুর পাটি বঁটি-দা হাতা খুন্তি ঝুড়ি ধামা কুলো ঝাঁটা গেলাস বাটি থালা কেনে এই মেলাতে। মনোহারী কাজের জিনিস ও সখের জিনিস, জামা কাপড়, খেলনা পুতুল, খাবারদাবার এসব যতই কেনাবেচা হোক আসলে গেঁয়ো কারিগরের তৈরী গেরস্তের ওইসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কেনাবেচাটাই মেলার বৈশিষ্ট্য। পাশে ফাঁপতে পারে না, রাস্তা চওড়া কম, একপাশে নর্দমার খাতটা আরও সংকীর্ণ করেছে রাস্তাটাকে, মেলা [illegible] লম্বায় বড় হয়। হরদম লরীগাড়ির চলনে এবড়ো খেবড়ো বড় রাস্তাটা খাল ডিঙ্গিয়েছে কংক্রীটের পুলে উঠে। পুলের খানিক এদিকে ডাইনে গেছে মেলার রাস্তা খালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আধমাইল দূরে রেললাইনের তল দিয়ে উত্তর মুখে সোজা। মেলা বসে রাস্তার এমাথা থেকে রেলের পুল ছাড়িয়ে আরও প্রায় পোয়া মাইল দূর তক। মেলা সব চেয়ে জমাট হয় মাঝামাঝি স্থানে, সেখানে ওদিকে আছে রাস্তা থেকে খাল পর্যন্ত অনেকটা ফাঁকা জায়গা, আর এদিকে আছে পাশের রাস্তাটার ফাঁপোলো মোড়। ফাঁকা জায়গায় থাকে নাগরদোলা, পুতুলনাচ আর সার্কাস, মজার খেলা ও নাচগানের তাঁবু। লোক গিজ গিজ করে এখানে।

রাস্তা আর খালের মধ্যে টিন-ছাওয়া ছোট বড় গোলা ও আড়ত, মাঝে মাঝে দু'একটি জরাজীর্ণ পুরানো দালান। এখানে যে লাখ লাখ টাকার কারবার চলে, ভাঁটার সময় খালের কাদা ঠেলে সালতি ছাড়া ছোট নৌকা চলতে না পারলেও এও বন্দরতুল্য, দেখে তা মনে হয় না—ঠাকুরদাদার জীবদ্দশার শৈথিল্য যেন শুধু

মরচে পড়ে মরছে এখানে, আর কিছু নয়! এ পাশের দোকান ও বাড়িঘরগুলি অনেক উন্নত, যেহেতু আধুনিক।

লড়ায়ের আঁধার বছরগুলিতে মেলা জমেনি। আলো না জ্বালাতে পারলে কি মেলা জমে, দিনে দিনে পাততাড়ি গুটোতে হলে। এ বছর শুধু ওই সাঁঝের বাতি না জ্বালাবার হুকুমটা বাতিল হতেই মেলা জীবন্ত হয়েছে আশ্চর্যরকম। সবাই যেন হাঁ করে অপেক্ষা করছিল লড়াই শেষ হবার জন্য যতটা নয়, লড়াই শেষ হলে সাঁঝ-বাতি জ্বালিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে মেলা করার জন্য। গায়ে গায়ে ঘেঁষে দোকান বসেছে তিন পো মাইল রাস্তার যেখানে ঠাঁই মিলিছে সেখানে, ভদ্রলোকের বাড়ির সামনের একহাত চওড়া রোয়াকটুকু পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে। চৌকী পেতে, কাঠের তক্তায় কিংবা স্রেফ বাঁশ দিয়ে মঞ্চ বেঁধে, চাঁচের বেড়া ও হোগলার চালা তুলে হয়েছে কোনো দোকান, কারো ছাউনি একখানি কুড়িয়ে আনার মত মরচে পড়া ঢেউ টিনের, কারো দু'খানা রিজেক্ট পিপে, কেটেকুটে হাতুড়ি পিটে সোজা করা ছাদ, কারো খোলা আকাশের নিচে ড্যাম রোদবিষ্টি ড্যাম ফ্যাশনের দোকান—যেন পটারী কারখানার নল-ভাঙ্গা কেটলি, চটলা-ওটা হাতলহীন কাপ ইত্যাদির দোকান—দোকানটাই যেন ঘোষণা যে বড়লোক বাবুদের জিনিস, একটু খুঁতওলা জিনিস, তাতে আর কি হয়েছে, এখানে কিনতে পাবে এমন সস্তায় তোমার পয়সায় কুলোয়, এ সুযোগ ছেড়ো না, টিনের মগে চা না খেয়ে বাবুরা যে কাপে খান সেই কাপে, শুধু একটু চটলা-ওঠা হাতলহীন কাপে, চা খাও! আর সত্যি কথা, কাঁপ কেটলির দোকানে কি ভীড় মেয়েপুরুষের, চা খাওয়া যাদের ন'মাসে ছ'মাসে সর্দি কাশির ওষুধ হিসেবে, বিয়োনি মেয়ের ব্যথার জোর বাড়িয়ে তাকে রেহাই দেবার টোটকা হিসাবে।

খাদু বলে, 'মেলা নাকি? মেলা? মেলায় তো যামু তবে আইজ!'

দত্তগিন্নীর গা জ্বলে যায় শুনে,—প্রায় দেড়বছর কাজ করছে যে মন-মরা খাটুনে ভাল ঝিটা হঠাৎ মেলার নাম শুনেই তাকে আহ্লাদে উল্লাসে ডগমগিয়ে উঠতে দেখে।

মুখ ভার করে বলে, 'খাদু, কি করে মেলায় যাবি আজ? আমার শরীর ভাল না। উনি আজ একটায় আসবেন, খেয়ে দেয়ে উঠে আমায় একটু না পেলে, খোকা গোলমাল করলে—'

দত্তগিন্নী হেসে ফেলে, 'বুঝছিস তো খাদু? হপ্তায় একটা দিন দুপুরের ছুটি,

তাও আধখানা। খোকা কাঁদাকাটা করলে বড্ড রাগেন। উনি বিকেলে বেরোবার আগে তো মেলায় তোর যাওয়া হয় না।'

'অ মা!' খাদু বলে অবাক হয়ে, 'তা ক্যান যামু? বেলা না পড়লে নি কেউ মেলায় যায়!'

মেলায় যাবার নামেই যেন বদলে গেছে খাদু। দুর্ভিক্ষের বন্যায় কুটোর মত ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে এই শহরে বাবুদের বাড়ি ঝিগিরিতে। কোথায় দেশ গাঁ আপনজন, জানাচেনা অবস্থায় অভ্যাসের ধাঁচে দিন কাটানোর সুখ আর কোথায় এই বিদেশে খাপছাড়া না-বনা মানুষের ঘরে দাসীপনা, এই দুঃখে সে একেবারে মিইয়ে ছিল। আজ যেন ডাক দিয়েছে আগের জীবন, ছেলেমানুষী ফুর্তি আর উত্তেজনা জেগেছে। চুলে ভাল করে তেল মেখে স্নান করে খাদু। দত্তগিন্নীর সাবানটা একফাঁকে মুখে হাতে ঘষে নেয় একটু। টিনের ছোট তোরঙ্গে তোলা সাফ থানটি বার করে রাখে। সেমিজটা বড় ময়লা হয়েছিল, স্নানের আগেই সাবান দিয়ে সাফ করে রেখেছে।

একটা কথা ভেবে খাদু একটু দমে যায়। এই ঘটির দেশের মেলা না জানি কেমন হবে! খোকাকে কোলে নিয়ে গিন্নীমার পিছু পিছু এক্‌জিবিসনে ঘুরে এসেছে সেদিন, সাজানো গোছানো আলোয় ঝলমলে চোখ ঝলসানো কাণ্ড বটে সেটা, থ' বানিয়ে দেয় মানুষকে, কিন্তু মেলার মজা নেই একফোঁটা, প্রাণ ভরে না ঘুরে ঘুরে। ওমনি এক্‌জিবিসনকে এদেশে মেলা বলে কিনা কে জানে!

বাবু বেরিয়ে যেতে না যেতে সেমিজ কাপড় পরে খাদু বলে, 'যাই মা?'

দত্তগিন্নী মুখ ভার করে বলে, 'যাবার জন্য তরপাচ্ছিস দেখি! যা, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবি, দেরী করিসনে।'

কংক্রীটের পুলটার নিচে মেলার এ মাথায় পৌঁছে খুশিতে হাসি ফোটে খাদুর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে মিশিঘষা কালো মজবুত দাঁতে। এ মেলা মেলাই। গরীব গেঁয়ো মেয়ে-পুরুষের ভিড়, রঙীন কাগজের ঘুর্ণি, ফুল, বাঁশের বাঁশীর ফেরিওলা, মাটির ডুগডুগি বেহালা, পুতুল, কাঠের খেলনা, তেলেভাজার দোকান, হোগলার নিচে মাটিতেই যা কিছু হোক বিছিয়ে পসরা সাজানো—সব আছে! পুলকে কেমন করে ওঠে মনটা খাদুর। হায় গো, কেউ যদি একজন সাথী থাকত তার।

পায়ে পায়ে এগোয় খাদু এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে থেমে থেমে ঘুরে ঘুরে পিছু ফিরে এপাশ ওপাশ গিয়ে গিয়ে। কিনবার জন্য, যা কিছু হোক কিনবার জন্য, মনটা তার নিশপিশ করে। পিঠে সে অনুভব করে আঁচলে-বাঁধা কাঁচা একটা টাকা আর

খুচরো এগার আনার চাপ। কোমরের আঁচলের কোণেও বাঁধা আছে একটাকার চারটে নোট। জীবনে আর কখনো কোনো মেলায় খাদু এত টাকা পয়সা নিয়ে যায়নি, তাও আবার সব তার নিজের রোজগারের টাকা পয়সা। বাপভায়ের কাছে চেয়ে চিন্তে, একরকম ভিক্ষে করে কয়েক গণ্ডা পয়সা নিয়ে সে মেলায় যেত, আজ এসেছে নিজের কামানো পাঁচ টাকা এগার আনা নিয়ে! টাকা থাকার মজাটা যেন খেয়ালও করেনি খাদু এতদিন, আজ যেন তার প্রথম মনে পড়ে যে দত্তগিন্নীর কাছে তার দেড় দু'বছরের মাইনের অনেক টাকা জমা আছে, দু'এক টাকার বেশি কোনো মাসেই সে নেয়নি। সে কত টাকা হবে কে জানে! টাকার জোরে বুকের জোরে যেন বেড়ে যায় খাদুর আজ মেলায় এসে নিজের পয়সা যেমন খুশি খরচ করতে পারবে খেয়াল হওয়ায়।

সেই সঙ্গে এতদিন পরে একটা ভয় ঢোকে খাদুর মনে। এতকালের মাইনের টাকাগুলি জমা রেখেছে দত্তগিন্নির কাছে, হিসেবও জানে না সে কত টাকা হবে, দত্তগিন্নী যদি তাকে ফাঁকি দেয়, যদি একেবারে নাই দেয় টাকা? বোকার মত কাজ করেছে, খাদু ভাবে মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে নিজের কাছে টিনের তোরঙ্গে রাখেনি বলে আপসোস করে খাদু। হায় গো, টাকাগুলি যদি মারা যায় তার!

কি কিনবে ভাবতে ভাবতে সোনার একটা আংটি কিনে বসে খাদু বারো আনা দিয়ে। খাঁটি সোনার নয় কিন্তু ঠিক যেন সোনা, কি সুন্দর যে মানিয়েছে তার বাঁ হাতের সেজো আঙুলে। বিয়েতে একটা আসল সোনার আংটি পেয়েছিল খাদু, বছর না ঘুরতে সে আংটি কেড়ে নিয়েছিল কর্তা তার, ফিরে দেবে বলেছিল বটে কিন্তু আরও যে বছরখানেক বেঁচেছিল তার মধ্যে দেয়নি। ও মিছে কথা, বেঁচে থাকলেও দিত না, খাদু জানে। তারপর কতকাল আংটি পরার সখটা খাদু চেপে রেখেছিল, এতদিনে মিটল। কিন্তু না গো, মিটেও যেন মিটল না, প্রথম বয়সের সাধ কি আর মেটে মাঝ বয়সে, নিজে নিজের সাধ মেটালে, কেউ আদর করে কিনে না দিলে।

বজ্জাতেরা তাকায়, গায়ে গা ঘসে যায় ছলে কৌশলে, খানিক আগে থেকেই পিছু নিয়েছে ওই বাবুসাজা লোকটা। ফিনফিনে পাঞ্জাবীর নীচে গেঞ্জিটা যেমন স্পষ্ট ওর মতলবও স্পষ্ট তেমনি। খাদু ওসব গায়ে মাখে না, রাগ করে না, বিচলিত হয় না। মেলাতে এরকম হয়, কতকগুলি লোক এই করতেই আসে মেলায়, মেয়েলোকের গায়ে একটু গা ঠেকিয়ে মজা পেতে, পুরুষ হয়ে চোরের মত এইটুকু নিয়ে

বর্তে যায় কি ঘেন্না মাগো। আসল বজ্জাত ওই লোকটা যে পিছু নিয়েছে একলা মেয়েলোক দেখে, গুণ্ডা না হলে কেউ কখনো গাড়োয়ানের চেহারা নিয়ে বাবু সাজে। নিক পিছু, ঘুরুক সাথে সাথে। বোকা হাবা মেয়ে ভেবেছে খাদুকে, টের পাবে ভাব করতে এলে, এই ভিড়ের মাঝে খাদু যখন গলা ছেড়ে শুরু করবে গাল দিয়ে ওর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে।

পড়ন্ত রোদের মত তেজ কমে কমে আসে খাদুর আনন্দ ও উত্তেজনার, নিভে যেতে থাকে উন্মাদনা। একা আর কতক্ষণ ভাল লাগে মেলা, কথা কওয়ার কেউ একজন সাথে নেই।

খিদে পায়। এতলোকের মাঝে খেতে লজ্জা করে খাদুর। ভাজা পাঁপড় কিনে আঁচলের তলে লুকিয়ে ফেলে বাঁ হাতে, ডান হাতে এক এক টুকরো ভেঙ্গে নিয়ে এমন ভাবে মুখ দিয়ে চিবোয় যে কেউ টেরও পাবে না পানসুপরি মুখে দিয়ে চিবোচ্ছে না কিছু খাচ্ছে। এমন সময় কাণ্ড ছাখো কপালের, খাদু সোজাসুজি সামনে পড়ে যায় দত্তবাবুর।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে দত্তবাবু উদাসীনের মত এগিয়ে যায় পাশ কাটিয়ে, আস্তে আস্তে থামে, ফিরে কাছে গিয়ে বলে, 'মেলা দেখতে এয়েছিস্?'

যেন মেলাতে মেলা দেখতে আসেনি খাদু, এসেছে ঘাস কাটতে। তিরিশের ওপরে বয়স হবে দত্তবাবুর, বিয়ের চার বছর পরে জন্মেছে খোকাটি, খোকার তিন-বারের জন্মদিন বলে ক'মাস আগে খাওয়া দাওয়া হল বাড়িতে। টুকটুকে ফর্সা রঙের না-মোটা না-রোগা সুন্দর চেহারা দত্তবাবুর, মুখখানা ফ্যাকাসে, চুপসানো। দেখে এমন মায়া হয় খাদুর। গিন্নীমা শুষে শুষে শেষ করে দিয়েছে বাবুকে, টাকার জন্ম আপিসে খাটিয়ে আর বাড়িতে নিজের রাক্ষসী হিড়িম্বার খিদে মিটিয়ে। আড়ি পেতে সব শুনেছে সব জেনেছে খাদু। বৌ-বর খেলো দেলো শুতে গেল মিলল মিশল ঘুমালো, এই তো নিয়ম জানে খাদু, গিন্নীমা যেন মাগী মাকড়সার মত তাতে খুশি নয়, রাত বারোটায় শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে অবসাদে মর মর বরটাকে যে করে হোক জাগিয়ে তুলে খাবেই খাবে, বেশি যদি নেতিয়ে পড়ে তো ঝাঁঝিয়ে ঝাঁঝিয়ে বলবে, মেয়ে বন্ধু তো গাদা গাদা, কার সাথে কারবার করে এলে আজ যে বিয়ে করা বৌকে এত অবহেলা ?

আড়ি পেতে বাবুর কাতরতা দেখতে দেখতে যেন একশো বিছে কামড়েছে খাদুকে, চীৎকার করে বলতে সাধ গেছে, লাথি মেরে রাক্ষসীকে বার করে দিয়ে ঘুমো না, কেমন ধারা পুরুষ তুই !

'এই ক' আনা পয়সা নে, কিছু কিনিস,' দত্তবাবু বলে খানিকটা কাচুমাচু ভাবে, 'আর শোন খাদু, বাড়িতে যেন বলিস না আমায় মেলায় দেখেছিস।'

পয়সা পেয়ে খাদু মুচকে হেসে মাথা নাড়ে। দত্তবাবু এগিয়ে গেলে পিছু থেকে জিভের ডগাটুকু বার করে তাকে অবজ্ঞার ভেংচি কাটে। এমনও পুরুষ হয়, বৌয়ের ভয়ে মনখুশিতে মেলায় আসতে ডরায়!

মেলার মাঝখানে জমজমাট অংশে আটকে যায় খাদু, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এই-খানেই। মোড়ের মাথায় মন্দিরের বদলে একটা চেপ্টা ঘরের মধ্যে সিঁদুরলেপা দাঁত-খিঁচানো ভীষণাকৃতি দানবরূপী প্রকাণ্ড দেবতা, খাদু ভক্তি ভরে প্রণাম করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পুতুল নাচ দ্যাখে, রামায়ণ মহাভারতের রাজা রাণীদের চেয়ে দেখে তার মজা লাগে শণের দাড়িওলা মুনিগুলো আর হনুমানকে। নুলো খঞ্জ অন্ধ ভিখারীদের দিকে না তাকিয়ে সে দু'টি পয়সা দেয় যোয়ান মর্দ ভিখারিকে, কেঁদে কেঁদে ভগবান ভাল করবেন বলার বদলে সে হেড়ে গলায় সবাইকে শাসিয়ে ভিক্ষা চাইছে, তাকে না দিলে তুমি মরবে, তোমার সর্বনাশ হবে। অনেক কিছু কেনার এত সাধ নিয়েও ওই আংটি আর একটি আর্শি ছাড়া আর কিছুই কেনা হয়নি খাদুর, কিছু কিনতে গেলেই মনে হয়েছে, কার জন্য কিনবে, তার কে আছে, কি কাজে লাগবে তার জিনিসটা তার ঘর নেই, সংসার নেই, সাজাগোজা নেই, আরামবিরাম নেই। কি করতে সে মেলায় এলো, কি সুখটা তার হল মেলায় এসে। আপন মনে এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে কি ভাল লাগে মেলায়। এত লোকের হাসি আনন্দ উৎসবের মধ্যে থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে মনটাতে ব্যস্ততা এনে শুধু খাঁ খাঁ করানো।

মেয়েছেলেরাও উঠেছে নাগরদোলায়, দু'জন চারজনে একসঙ্গে, নয়তো পুরুষ সাথীর সঙ্গে, লজ্জা সরম ভুলে আওয়াজ ছাড়ছে অদ্ভুত, দিশেহারা হয়ে আঁকড়ে ধরেছে সাথীকে, খিলখিলিয়ে হাসছে যেন ভূতেপাওয়ার হাসি। একসঙ্গে ওই ভয় আর ফূর্তি, ওপরে উঠে নিচে নেমে দোল খাওয়ার ওই বিষম মজা আর তীব্র সুখের শিহরণ যে কেমন খাদু কি আর জানে না। সাথী কেউ থাকলে সেও একটু নাগরদোলায় চাপত, অনেকদিন পরে আবার একটু চেখে দেখত কেমন লাগে নিজের ভেতরে ওই শিরশির করা।

'কি ভাব?'

মাঝখানে কোথায় সরে গিয়েছিল, আবার পিছু নিয়েছিল লোকটা পুতুল নাচ

দেখবার সময়, এখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে। ঝেঁঝে উঠত খাদু সন্দেহ নেই ; ফোঁস করে উঠে এক নিমিষে টের পাইয়ে দিত বাড়াবাড়ি করতে গেলেই বিষ দাঁতে সে ছোবল দেবে। কিন্তু কথা হল কি, লোকটার কথায় তার দেশী টান। দেশ গাঁয়ের চেনাজানা কেউ যেন ছদ্মবেশে তাঁকে এতক্ষণ ঠকিয়ে এবার নিজেকে জানান দিল কথা কয়ে। তাই শুধু মুখটা গোমড়া করে বলতে হয় খাদুকে, 'কি ভাবুম ?'

'দেইখাই চিনছি দেশের মানুষ তুমি।'

'চিনছ তো চিনছ।'

পাতলা পাঞ্জাবীর নিচে শুধু গেঞ্জী নয়, গেঞ্জী আঁটা চওড়া মোটা শক্ত বুক আর কাঁধ আছে, ঘনকালো কিছু লোম দেখা যায় গেঞ্জির ওপরে। জবরদস্ত গর্দান লোকটার। মুখের চামড়া ক্ষেতমজুরের মত পুরু আর কর্কশ। দু'এক নজরে দেখে খাদু আবার ভাবে আপসোসের সঙ্গে, চাষাভুষোর এমনধারা বেমানান বাবু সাজা কেন ?

'দোলায় চাপবা ?'

'না।'

'ডর নাই, আমারে কোনো ডর নাই তোমার।' লোকটা বলে হঠাৎ আবেগের সঙ্গে, পূবের আকাশের যেখানে আড়াল থেকেই পূর্ণিমার চাঁদ ফ্যাকাসে করে রেখেছে সন্ধ্যাকে সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে একটা বিড়ি ধরায়। সিগারেটের প্যাকেটটা বার করেও আবার পকেটে রেখে বিড়িটা বার করে।

'তোমারে ভাবছিলাম বাবুগো মাইয়া বুঝি, কথা কইবার চাইয়া ডরাইছি। তবু মনডা কইলো কি, না, বাবুগো ঘরের মাইয়ালোক সাহস পাইবো কই যে একা আসবো মেলায় ? কথা কমু ভাবি, ডরাই। হ্যাবে অখনে কইলাম। ডর নাই, আমারে ডর নাই।'

'ডরে তো মরি।' লোকটার কথা শুনে বিষম খটকা লাগে খাদুর মনে। সেও কি তবে বেমানান সাজ করেছে লোকটার মত খাপছাড়া আর হাস্যকর, চাষাভুষো ঘরের মেয়ে হয়ে বাবুর বাঁড়ীর বেশ ধরে ? ছোট একটা তাঁবুতে পরীর নাচ আর ম্যাজিক দ্যাখাচ্ছে। নাচের নমুনা ধরা হয়েছে সবার সামনে। রোগা-ক্যাংটা কালো কুৎসিৎ তিনটি মেয়ে মুখ গলা হাতে পুরু করে রঙ লেপে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাঁবুর সামনে ছোট বাঁশের মঞ্চে ভঙ্গি করছে নাচের, গলা ছেড়ে পাঁচ মেশালি সুরে গান ধরেছে ভাঙা হারমোনিয়ামের সঙ্গে,—একজন ওদের মধ্যে হিজড়ে।

মাঝে মাঝে তাঁবুর সামনের পর্দা সরিয়ে দেখানো হচ্ছে যে শুধু এরা নয় আরও অপ্সরা আছেন ভেতরে, দু'আনা চার আনায় ওই পরীদের মজাদার নাচ দেখার সুযোগ ছেড়ো না, তার সঙ্গে ম্যাজিক, ভাঁড়ামি ! চলা আও, চলা আও—দো দো আনা, চার চার আনা।

'আমার পয়সা আমি দিমু কইলাম।' গায়ে-পড়া ঝগড়ার সুরে খাদু বলে দু'আনা পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে। নাচ দেখতে ভেতরে যাবার তাদের মধ্যে কথাও হয়নি তখন পর্যন্ত, তার হয়ে লোকটির টিকিটের পয়সা দেবার কথা দূরে থাক।

'দিও, তুমিই পয়সা দিও।' লোকটি বলে আমোদ পেয়ে, 'কিন্তু অ্যানে কি দেখবা ? খালি ফাঁকিবাজী, ঠকাইয়া পয়সা নেওনের ফিকির। দেখবা যদি, চীনাগো সার্কাস দেখি গা চল। খাসা দেখায়, পয়সা দিয়া খুসি হইবা।'

'দেখি না কি আছে।'

সব দেখবে খাদু এবার, ভালমন্দ যা কিছু দেখার আছে, এত মানুষ ঠকছে সাধ করে সেও নয় ঠকবে, বিশ্বাসী সাথী যখন পেয়েছে একজন। বিশ্বাস রাখবে কিনা শেষ পর্যন্ত ভগবান জানে, কি বিপদ আজ তার অদেষ্টে আছে তাও জানে ওই পোড়ার-মুখো ভগবান, তবে মেলায় কোনোরকম নষ্টামি গুণ্ডামি যে করবে না লোকটা এটুকু খাদু জানে। বুঝদার বিশ্বাসী সাথীর মতই সে সাথে থাকবে, মনখোলা আলাপী কথায় হাসি তামাসায় খুসি থাকবে দু'জনেই, ভাল লাগবে মেলা দেখা। মতলব যা আছে তা মনেই থাকবে ওর চাপা পড়া।

ঘেন্না জন্মে যায় সস্তা নাচ, বাজে ম্যাজিক, বগলে লাঠি খুঁচিয়ে কাতু-কুতু দেওয়ার মত ভাঁড়ামি দেখে। তবু শেষ পর্যন্ত থাকে খাদু, উপভোগও করে। এও মেলারই অঙ্গ। জেনে শুনে কত বাজে জিনিস কেনে পয়সা দিয়ে, অন্য সময় যেভাবে পয়সা নষ্ট করারকথা ভাবলেও গা জালা করত, নইলে আর মেলার উন্মাদনা কিসের। নিজের ভিতর উথলাচ্ছে আনন্দ আর উত্তেজনা, তাই দিয়ে ফাঁকিকেও সার্থকতা দেওয়া যায়। মেলায় না হলে একটা পয়সা দিয়েও কি কেউ দেখতে চাইত এসব।

বয়সের পাকামি আছে, সে যাবার নয়, তবে ছেলেবয়সের আবেগপুল-কের বন্যাও থৈ থৈ করছে মনে। ফাঁকি যাচাই করতে করতেও উৎসুক লোভী মন নিয়ে খুসি হয়েই খাদু ছাখে হিমালয় পারের অজগর সাপ, এক ছেলের দুই মাথা, জন্ম থেকে জোড়া লাগা দুই মেয়ে।

অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কয় খাদু, ছেলে কাঁখে বৌটির সঙ্গে, কুলো আর পাখা হাতে বিধবাটির সঙ্গে একপাল বৌ ছেলে নাতিনাতনী নিয়ে বেসামাল সধবা গিন্নীটির সঙ্গে। দেখা হয় চেনা মানুষের সঙ্গে। সুবলের মা পাড়ার তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। চুপি চুপি শুধোয় সুবলের মা, 'সাথে কে ?'

'ঘ্যাশের মানুষ, কুটুম।' খাদু বলে নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে।

চাঁদ উঠেছে আকাশে, নিচে অসংখ্য আলো জ্বলছে মেলার। একজিবিসনের চোখ ঝলসানো বাড়াবাড়ি আলো নয়, কাছে তেল মোম গ্যাসের শিখা, কোনোটা কাঁচের মধ্যে কোনোটা খোলা, তফাতে জ্যোৎস্নারাতের তারার মত।

'আরও দেখবা ?'

'দেখুম না ; চীনা সার্কাস ? তুমিই তো কইলা'

চীনা সার্কাসের তাঁবুটা অনেক বড়। চার আনা টিকিটের দাম। লোক টানবার জন্য সামনে খেলার নমুনা দেখানো হচ্ছে এখানেও, ভিন্ন রকম নমুনা। মেয়ে আছে তিনটি, দু'জন হলদে রঙের চীনা, একজন কালো রঙের বাঙালী। কালো হলেও ছিরি ছাঁদ আছে মেয়েটির, রঙ মেখে ভূতও সাজেনি, সস্তা ঢংএর ভঙ্গিও নেই। চীনা মেয়ে দুটিকে বড় ছোট বোন মনে হয় খাদুর। পিছু বেঁকে পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে, হাতের ভরে শূন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে, ছোট লোহার চাকার ভেতর দিয়ে কৌশলে গলে গিয়ে ওরা খেলার নমুনা দেখাচ্ছে! আঁটো সাঁটো যোয়ান বয়সী চীনাটি দু'হাতের দু'টি ছড়ির ডগায় বসানো প্লেট দুটিকে বন বন করে ঘোরাচ্ছে। আরেকজন, তাকে ওর ভাই মনে হয় খাদুর, পাঁচ ছটা লোহার শিকের আস্ত চাকা নিয়ে চাকার সঙ্গে চাকা আটকে আবার খুলে ফেলছে, কি করে কে জানে! ভেতর গিয়ে খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় খাদু। পাঁচ ছ'বছরের একটা ছেলে, সে দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে মাটি না ছুঁয়ে শূন্যে পাক খেয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, বড় একজনের মাথায় হাতের ভর দিয়ে শূন্যে পা তুলে দিচ্ছে, এসব দেখে রোমাঞ্চ হয় খাদুর। টেবিলে কাঠের গোলায় বসানো তক্তার দু'পাশে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তক্তা গড়িয়ে গড়িয়ে একটি মেয়ের দোল খাওয়া দেখে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেজো চীনা মেয়েটিকে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে টেবিল ডিঙোতে দেখে, আগুনের চাকার মাঝখান দিয়ে গলে যেতে দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়, ভাবে, কত কাল ধরে কি ধৈর্যের সঙ্গে তপস্যা করে না জানি এসব কসরৎ আর কায়দা ওরা আয়ত্ত করেছে।

থাদু সব চেয়ে অভিভূত হয় ভেবে যে এক সংসারের বাপ ছেলে মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে এমন চমৎকার সার্কাস দেখাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে দলের সবাইকে দেখার পর এতে আর তার সন্দেহের লেশটুকু নেই। চেহারার মিল নয় নাই ধরতে পারল সে ওদের, বয়স কখনো সবার খাপ খায় এমন ভাবে এক পরিবারের না হলে—বুড়ো একজন বাপ, মাঝবয়সী, যোয়ান, কিশোর আর ছেলেবয়সী এই চার ছেলে, তিন চার বছর বয়সের ফারাকের দুটি যোয়ান আর ন'দশ বছরের একটি, এই তিন মেয়ে। মা বুঝি নেই ওদের। বৌ মরেছে বুড়ো বেচারার। আহা।

যোয়ান মেয়ে দু'টির দু'জনেই মেয়ে না একজন ছেলের বৌ একজন মেয়ে কিম্বা দু'জনেরই ছেলের বৌ, এই একটু খটকা থাকে থাদুর। সিঁদুরও দেয় না যে আন্দাজ করে নেবে। কালো মেয়েটা এদের সঙ্গে কেন, সেও আরেক ধাঁধা থাদুর।

'আমাগো মাইয়াটা কি করে চীনাগো লগে?' সে শুধোয় সঙ্গীকে।

'ভাড়া করছে।'

এরা নাকি সাধারণত অল্প বয়সে চুরি করা অথবা অনাথা মেয়ে, সংসারে যাদের দেখবার শুনবার কেউ নেই। বড় হলে কাউকে দিয়ে করানো হয় দেহের ব্যবসা, কেউ শেখে চুরি চামারির কায়দা, কেউ শেখে কসরৎ। এ মেয়েটা হয় তো ভাড়াও খাটছে, নতুন খেলাও শিখছে চীনাদের কাছে, পরে আরও দাম বাড়বে। অবাক হয়ে শোনে থাদু। বিরাট এ জগৎ সংসার, অদ্ভুত কাণ্ড কারখানার সীমা নেই তাতে। কোথাকার এই বিদেশী পরিবার সার্কাস দেখিয়ে পয়সা রোজগার করছে, কোথায় কার ঘরে জন্মে আজ ওদের সঙ্গে খেলা দেখাচ্ছে এই কালো মেয়েটা। এক দুর্বোধ্য বিস্ময়কর অনুভূতিতে বুকটা তার কেমন করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে ভাবে, মানুষ কি যে করে সংসারে আর কি যে করে না!

নাগরদোলার বুক-শিরশির-করা সুখটা তিনচার পাকের বেশি সয় না থাদুর, কাতর হয়ে বলে, 'নামুম। থামান যায় না?'

'যায় না?'

জোরে হাঁক দিয়ে নাগরদোলা থামাতে বলে লোকটি, যেন হুকুম দেয়' আর এমন আশ্চর্য, তার হুকুমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামতে আরম্ভ করে দোলা।

পাশ থেকে উঠে লোকটি আগে নামতে গেলে খাদুর খেয়াল হয়, লজ্জাসরম ভুলে দু'হাতে কিভাবে ওকে সে আঁকড়ে ধরেছে।

'ডর করে নাকি?'

'না।' খাদু জোর দিয়ে বলে, 'গা গুলায়।'

মেলায় মানুষ কমতে শুরু করেছে। বিকালে মানুষের জোয়ার এসেছিল, তাতে ধরেছে ভাঁটার টান। মেলা আর ভাল লাগে না, শ্রান্তি বোধ করে খাদু। মেলায় ছড়ানো নিজেকে এবার গুটিয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়। ফিরে গেলে ঘ্যান ঘ্যান করবে দত্তগিন্নী, কৈফিয়ৎ চাইবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর দত্তবাবুর বুড়ি মায়ের ঘুপচি ঘরটির মেঝেতে বিছানা বিছিয়ে শোয়া। সারারাত বুড়ি কাশবে, বার বার উঠবে। ভাবলেও মনটা বিষন্ন হয়ে যায় খাদুর।

কিন্তু বাড়ি সে যে যাবে, বিশ্রাম সে যে করবে, সে তো এতক্ষণের সাথীটি রেহাই দিলে তবেই? এবার সময় হল ওর মতলব হাসিলের। বেশ ভাল করেই জড়িয়ে জড়িয়ে ফাঁদে ফেলেছে তাকে। এতক্ষণ ভুলিয়ে ভালিয়ে বাগিয়েছে, এবার কোন ভয়ংকর স্থানে নিয়ে যাবে কে জানে, যা খুশি করবে তাকে নিয়ে, হয়তো ছেড়ে দেবে দলের খুনে গুণ্ডাদের হাতে, হয়তো শেষরাতে গলাটা কেটে ফাঁক করে ভাসিয়ে দেবে খালে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে খাদুর। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে লোকটা কিছুক্ষণ থেকে, বার বার চোখ বুলোচ্ছে তার পা থেকে মাথা অবধি। গায়ে কাঁটা দেয় খাদুর।

'যাইগা অখন রাইত হইছে।' সে বলে ভয়ে ভয়ে।

'যাইবা? রাইত হয় নাই বেশি।' ক্ষুব্ধ চিন্তিতভাবে লোকটা খাদুর নতুন ভাব্লাব লক্ষ্য করে, 'চল যাই, দিয়া আসি তোমারে। কলাপাড়া নন্দ লেন কইল না?'

'আমি যাইতে পারুম।' ক্ষীণস্বরে খাদু বলে।

'পারবা না ক্যান? বাড়িটা চিনা আসুম, বুঝলা না?'

বোঝে না? সব বোঝে খাদু। চলুক সাথে, বড় রাস্তা ধরে সে যাবে, রাস্তায় এখন গাড়ি ঘোড়া লোকজনের ভিড়। পাড়ায় গিয়ে নির্জন গলিতে ঢুকবে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে তার ভয়টা কি, লোকজন জেগেই আছে সব বাড়িতে এখন।

'কি কিনা দিমু কও।'

'কিছুটি না।'

'তোমার খালি না আর না।' লোকটা বলে বেজার হয়ে।

কংক্রীটের পুলের গোড়ায় বড় রাস্তার পাড়ে লোকটা রিক্সা ডেকে বসে একটা খাদুকে চমকে আর ভড়কে দিয়ে।

'না না, রিক্সা লাগবো না।'

'লাগবো।' ধমকে দিয়ে বলে এবার লোকটা, 'সব কথায় না না কর ক্যান? উইঠা বস রিক্সায়, কওতো হাঁইটা যামু নে আমি লগে।'

খাদু কিছু বলে না, কি আর বলবে। লোকটা তার পাশে উঠে বসে। আংটিপরা হাতে একবার হাত বুলিয়ে দেয় ধমক দেবার দোষ কাটিয়ে সান্ত্বনা দিতে। ঘেমে জল হয়ে গেছে খাদুর গা তখন, হাত পা যেন অবশ হয়ে এসেছে।

রিক্সা চলে ঘণ্টা বাজিয়ে, চলতে চলতে লোকটা হঠাৎ বলে রিক্সাওয়ালাকে, 'ডাইনে যাও।'

'না না, বড় রাস্তায় চলুক।'

'এইটা রাস্তা না?'

রিক্সা ঢোকে ডাইনের রাস্তায়। এটা সোজা পথ কলাপাড়া যাবার খাদু জানে, কিন্তু বড় রাস্তা ছেড়ে রিক্সা যখন ঢুকেছে এই গলিতে তখনি খাদু জেনেছে কলাপাড়ায় নন্দ লেনে দত্তবাড়িতে আর সে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। দু'পাশে ঘিঞ্জি বস্তি, টিন আর খোলার চালে জ্যোৎস্না, সরু সরু গলিতে অন্ধকার। ওর মধ্যে কোথায় যেন জোরালো হল্লা চলেছে, মেয়েমানুষ গানও গাচ্ছে হারমোনিয়ামের সঙ্গে! এর মধ্যে নিয়ে যাবে কি লোকটা তাকে? এ অঞ্চল পেরিয়ে রিক্সা রাস্তায় বাঁক ঘুরলে খাদু একটু স্বস্তি পায়। এ অঞ্চলটা শান্ত, দু'পাশে কাঁচা পাকা বাড়িতে গেরস্থ, আধা-গেরস্তের বাস।

কিন্তু খানিক এগিয়েই লোকটা থামতে বলে রিক্সাওয়ালাকে। ঘনিষ্ঠ স্বরে বলে, 'আমার ঘরখান চিনাইয়া দেই তোমারে, কি কও?'

পুরানো একটা পাকা গ্যারেজ ঘর, দরজা এখন তালা বন্ধ। এখানে সে থাকে, রাঁধে বাড়ে খায়, ঘুমোয়। পাশে গায়ে গায়ে লাগানো টিনের চাল ও টিনের বেড়ার একটা ঘর, সামনে দোকানের মত মস্ত দু'পাট কপাট, ওপরে নিচে দুটো তালা আঁটা। ওপরে একটা তেরাবাঁকা সাইনবোর্ড, দু'পাশে সাইকেলের দু'টো পুরানো টায়ার ঝুলছে। এটা তার সাইকেল মেরামতি দোকান—দামোদর সাইকেল ওয়ার্কস!

'নাম কই নাই তোমারে? আমার নাম দামোদর।'

রিক্সার যোয়াল নামিয়ে রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে তাদের নামবার অপেক্ষায়। শক্ত করে পাশটা চেপে ধরে ঝোঁক ঠেকিয়ে খাদু কাঠ হয়ে বসে থাকে।

'নামবা না ?'

'না। তুমি নাম।'

চাঁদের আলোয় পথের আলোয় বেশ দেখা যায় মুখে যেন তপ্ত রাগের ছ্যাকা লেগেছে দামোদরের। একহাতে সে খাদুর আংটিপরা হাতের কব্জি চেপে ধরে, এত জোরে ধরে যেন খেয়াল নেই ওটা মেয়েছেলের নরম হাত, হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে মট করে, আরেক হাতে সে মুঠো করে ধরে খাদুর বুকের কাপড় সেমিজ।

'মার। আমারে মাইরা ফেলাও।' খাদু কেঁদে ফেলে হুস করে, জোরে নয়, চেপেচুপে, ক'হাত দূরে রিক্সাওয়ালাও টের পায় কি না পায়! আগে থেকে সে যেন তৈরী হয়েই ছিল এমনিভাবে কাঁদবার জন্য।

দামোদর ভড়কে গিয়ে বুকের কাপড় হাতের কব্জি ছেড়ে দেয় তৎক্ষণাৎ। থ' বনে গিয়ে গুম হয়ে থাকে কয়েক লহমা। তারপর রিকসাওয়ালাকে চলতে বলে কলাপাড়ার দিকে।

রিক্সাওয়ালা চলতে আরম্ভ করলে খাদুকে বলে, 'ব্যারাম স্যারাম নি আছে মাথার ?'

সে রাস্তা থেকে বড রাস্তায় পড়ে রিক্সা, আবার ইঁটের রাস্তায় বাঁক নেয় শহরতলীর শান্ত নিঝুম উঠতি ভদ্রপাড়ার এলাকায়। মাঠ, পুকুর বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো নতুন বাড়ি, ছোট সীমায় ঠাসা গরীবের পুরনো বস্তি। শরীর জুড়ানো হাওয়া বইছে অবাধে, শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁর ডাক, কোনো বাড়ির ছাদ থেকে ভেসে-আসা বাঁশীর বাবুয়ানি মিহি সুর। আকাশে মুখ তুলে চাঁদ দেখতে হয় না, চারিদিকে চাঁদেরই আলো চোখের সামনে ছড়ানো।

নন্দ লেনের মোড়ে ঘন তেঁতুল গাছের ছায়া। খাদু দাঁড়াতে বলে রিক্সাওয়ালাকে। 'তোমার লগে দেখলে বাড়ির লোক কি কইবো ? আমি নামি।'

'নাম।'

খাদু রিক্সায় বসে থেকেই হাত বাড়িয়ে দত্তবাবুর বাড়ির হদিস তাকে বাৎলে দেয়, বলে, 'ডাইনা দিকে তিনখান বাড়ির পরের বাড়িখান, দোতালা বাড়ি। দেইখাই চিনবা।'

'বাড়ি চিনতে হাঙ্গামা কি।' দামোদর বলে উদাস গলায়, 'নন্দ লেনে

দত্তবাবুর বাড়ি খুঁইজা নিতে পারতাম না?'

ফুরফুরে হাওয়ায় তেঁতুলগাছের ছায়া ঘেঁষে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে খাদু যেন চোখের সামনে দেখতে পায় দত্তবাড়ির অন্তঃপুর, খোকার কান্নায় স্বামীর পাশে শুতে দেরী হচ্ছে বলে রেগে গজর গজর করে শাপছে তাকে, মাছের মত মরা চোখে চেয়ে দেখছে ঘুমকাতুরে গাল-চুপসানো দত্তবাবু, নিচের ঘরে চৌকীতে কাঁথার বিছানায় বসে দত্তবাবুর বুড়ি মা কেশে চলেছে খক খক করে আর মেজেতে শুয়ে খাদু ঝি এপাশ ওপাশ করছে অজানা কষ্টে। আজ রাতে কব্জিটা টন টন করবে।

'হাতটা মুচরাইয়া দিছ একেবারে, ব্যথা জানায়।' আহত কাক্ত তুলে ধরে খাদু তাতে অন্য হাতের তালু ঘসে আস্তে আস্তে।

'যাইট, সোনা যাইট।' দামোদর বলে ব্যঙ্গ করে, 'কবিরাজী ত্যাল আইনা লাগাইও, মাথায়ও মাইখো ঘইষা ঘইষা।'

লোক আসতে দেখে খাদু তেঁতুলগাছের ছায়ায় পিছিয়ে যায়। রিক্সা আর গাছের ছায়ায় তার আবছা মূর্তির দিকে চাইতে চাইতে মানুষটা চলে গেলে এগিয়ে আসে। রিক্সাওয়ালা তখন যোয়াল তুলে ধরেছে রিক্সার।

'আসি গো ঠাইরান।' বলে খাদুর কাছে বিদায় নিয়ে দামোদর রিক্সাওলাকে বলে, 'যাও জোরসে চলো। বখশিস দিমু।'

খাদু বলে, 'শোন, শুনছ? একটা কথা ভাবতেছিলাম।'

রিক্সা থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে দেয় দামোদর।

খাদু বলে, 'তুমি তো বাড়ি চিনা গেলা আমার। কই দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনলা আমারে, তোমার ঘর চিনা নিতে পারুম কিনা ভাবি।'

'কি করবা তবে?' দামোদর জিজ্ঞেস করে ভয়ে উৎকণ্ঠায় গলা কাঁপিয়ে।

'গিয়া দেইখা চিনা আসুম?' খাদু বলে প্রায় অস্ফুট স্বরে। দামোদর স্পষ্ট শুনতে পায় প্রত্যেকটি কথা। রাসপূর্ণিমার বিনিদ্র রাত্রি হলেও সেখানে তাদের আশে পাশে আর তো কোন শব্দ ছিল না।

মাসি পিসি

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাঁটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইট-পাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রীটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটি-বাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দু'জন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, ষোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাঁটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দু'হাত চওড়া হয় কি না হয়। দু'মাথায় দাঁড়িয়ে দু'জন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দু'জনেরি কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে; নক্‌সা পাড়ের সস্তা শাদা শাড়ি। আঁটোসাটো থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

মাসিপিসি ফিরছে কৈলেশ, বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসিপিসির সালতি ক'হাতের মধ্যে এসে গেছে।

ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসিপিসি সালতির গতি ঠেকায়। আহ্লাদী সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটাটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, বেলা আর নেই কৈলেশ। পিছন থেকে পিসি বলে, অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।

মাসিপিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খপরটা গোপন, দু'জনে লম্বা লম্বা সালতির দু'মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদী যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি, কৈলাশ শুরু করে, মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো—

মাসি বলে, খুন্‌সুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দা কথাটা কি তাই কও, বললে না যে খপর আছে কি?

পিসি বলে, খপরটা কি তাই কও। বেলা বেশী নেই কৈলেশ।

মাসিপিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, জগুর সাথে দেখা হল কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এট্‌টু—মানে আর কি চা খেতে গেছি, চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।

মাসি বলে, চায়ের দোকানে না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কি?

পিসি বলে, শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বারোমাস সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কি বললে জগু?

কৈলাশ কাঁপড়ে পড়ে আড় চোখে চায় আহ্লাদীর দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসিপিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, মাল খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছি জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সে জগু নেই। বৌকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এলো তা মেয়া দিলে না, তাইতে

নিতে আসে না আর। আমি বলি কি, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।

মাসি বলে, পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছ্যাকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়ি বাঁধা হয়ে থাকতে দিন ভোর রাত ভোর?

পিসি বলে, লাথির চোটে ফের গভ্‌ভোপাত হতে? না মরতে?

গভ্‌ভোপাত? কৈলাশ বলে আশ্চর্য হয়ে, ফের গভ্‌ভোপাত? সত্যি নাকি মাসি? এ যে প্যাঁচালো ব্যাপার হল পিসি?

মাসি বলে, কিসের প্যাঁচালো ব্যাপার কৈলেশ? মুয়ে নুড়ো জ্বালব তোমার ফের যদি বলবে তুমি বেয়াক্কেলে কথা। জগু আসেনি ঘন ঘন ওকে নিতে? থাকেনি দু'দিন চারদিন করে?

পিসি বলে মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালমন্দ দশটা জিনিস।

মাসি বলে, ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।

পিসি বলে, না কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছল ছল চোখে এক একবার তাকায় আহ্লাদীর দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালর জন্যেই তাকে জোর জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল রহমান। আহ্লাদীর সঙ্গে তার চেহারার কোনো মিল নেই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদীর ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে যখনি সে তাকায় আহ্লাদীর দিকে।

কৈলাশ বলে তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেয়ার জন্যে। তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে, পয়সা কামাচ্ছ। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামী নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবে আজ কালের মধ্যে। মরবে তোমরা

জানো মাসি, জানো পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।

আহ্লাদী একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মত। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কয়েকবার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামীর কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?

বলে, মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তর তর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা বড় সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাঁটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারিদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে, ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কি তার পাখা ঝাপটানি।

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেকদিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবরা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত—ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা যোগার করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দু'জোড়া থান পরন—খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দু'জনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে আহ্লাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসিপিসির সেবাযত্নেই আহ্লাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপমাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কি করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে

মাসিপিসি আহ্লাদীর জীবনের জন্তে লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না পেল যদি তো না খেয়েই।

অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারিদিকে না খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাইতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি, একদিন মাসি বলে পিসিকে, একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দু'টো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।

শহরের বাজারে তরিতরকারী ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজী হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয় তো মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসব্জী ফলমূল নিয়ে মাসিপিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসিপিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখদুঃখের কথা তারা কাকেই বা বলবে কেই বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেশারেশিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির ওপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হত এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হত তাদের দেখে। সে কি রাগ, সে কি তেজ, সে কি গোঁ! মনে হত এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসব্জী বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়া মাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উপে গিয়ে দু'জনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদীর ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের নিজের পেটভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দু'জনেরই এখন আহ্লাদী আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে

তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদীকে হয়তো শ্বশুরবাড়ি যেতে হত, মাসিপিসিও বিশেষ কিছু বলত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসিপিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়ে ছিল, আহ্লাদীকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদীকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু অহ্লাদীতে বর্তেছে, জগুর বউ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমত আছে মোটে, বাকী গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদীকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দু'জনের মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদীকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, ডরাস্‌নি আহ্লাদী। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয়তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?

পিসি বলে, দু'দিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে কই না, আমি তো ওসব কিছু বলিনি কৈলেশকে!

মাসি বলে, চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা! মা মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।

পিসি বলে, ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদী। তোর পিসে ছিল জগুর মত, মাল টানত আর মোকে মারত। খোকাটা কোলে আসতে কি হয়ে গেল সেই মানুষ! চুপি চুপি এনে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলিতো ওঠে বসতে বলিতো বসে, রাত দুপুরে চুর হয়ে এসে হাতে পায়ে ধরে বলে, একবারটি খোকাকে কোলে দে পদী—খোকা যেতে পাগলের মত দিবারাত্তির মাল খেয়ে খেয়ে নিজেও গেলো।

মাসি বলে, তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ী ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কি ছ্যাচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদী, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ী ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।

পিসি বলে, তুইও যাবি, সোয়ামীর ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডর কিসের?

বাড়ি ফিরে দীপ জেলে মাসিপিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদীর পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসিপিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাছরা, নোংরা, নর্দমার মত লাগে। মাসিপিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কি ভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসিপিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরীতরকারীর মত তাকেও কেনা যায় কিনা যাচাই করবার জন্ত। গাঁয়েরও কতজন তার কতরকমের দর দিয়েছে মাসিপিসির কাছে। মাসিপিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসিপিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসিপিসি, কি দুর্ভোগ তাদের তার জন্ত। মাসিপিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদী। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসিপিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদীকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সড়গড় হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দু'জনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে একথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদীর কথা আহ্লাদীর সুখদুঃখ, আহ্লাদীর সমস্যা, আহ্লাদীর ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষ মানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত ওটা করা উচিৎ নয় এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এইভাব দেখাবে মাসিপিসি—আহ্লাদীকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামী এসেছে বলে সেও যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে ক'দিন থাকে জামাই সে যেন অনুভব করে, সেই এখানকার কর্তা, সেই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসিপিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে দু'জনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দু'জনের। এখন এল চৌকিদার কানাই! হাঙ্গামা না করতেও আসে না রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই-চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসিপিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দু'জনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাই-এর সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসিপিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ী আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।

মাসি বলে, এত রাতে?

পিসি বলে, মরণ নেই?

কানাই বলে, দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবে গো দিদিঠাকরুনরা। বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।

মাসিপিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসিপিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুণ্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটিবাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনেস্টবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদীকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?

পিসি বলে, আমি যাই চল?

কর্তা ডেকেছেন দু'জনকে।

মাসিপিসি দু'জনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।

পিসি বলে, সকড়ি হাত ধুয়ে আসি, এক দণ্ড লাগবে না।

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদা'র মত মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাবো।

পিসি বলে, এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?

কানাই ফুঁসে ওঠে, না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালয় ভালয়, ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, বটে? ধরে বেঁধে টেনে

হিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির কোপে গলা ফাঁক করে দেব।

পিসি বলে, আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু'একটার।

দু'পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসিপিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যই তারা খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসিপিসির।

মাসি বলে, শোন কানাই, এ কিন্তু একি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েলোক পারব না জানি কিন্তু দুটো একটাকে মারব জখম করব ঠিক।

পিসি বলে, মোরা নয় মরব।

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসিপিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশেপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনার্দন! ওগো কানুর মা, বিপিন, বংশী···

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদীকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসিপিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্তে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্ম যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হল সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসিপিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, জানো বেয়ান, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি?

পিসি বলে, তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে ফেলায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।

খানিক চুপচাপ ভাবে দু'জন।

মাসি বলে, সজাগ রইতে হবে রাতটা।

পিসি বলে, তাই ভাল। কাঁথা কম্বলটা চুপিয়ে রাখি জলে, কি জানি কি হয়।

আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদীর ঘুম না ভাঙ্গে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদীর বাপের আমলের গরুটা নেই, মাটির গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরানো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো সহজ হয়। ঘড়ার আর হাঁড়ি কলসীতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরী হয়ে থাকে মাসিপিসি।

অমানুষিক

সে ছিল ওরকম অনেকের একজন। আধ পেটা সিকি পেটার বেশি না খেয়ে, কখনো বা দু'চারদিন স্রেফ উপোস দিয়ে দেশের চলতি দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে টিকে থাকত, যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংসলোভী পোষা রাক্ষসগুলি চড়চড় করে দুর্ভিক্ষ চরমে তুলে দেওয়ায় যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ছিদামের ইতিহাসটাও আর দশজনের মত সাধারণ, যদিও ভয়াবহ। প্রথমে গেল তৈজসপত্র, তারপর গেল গাইটা। কুন্তার রুপোর পৈছেটা দিল সে নিজেই, কানের লুকানো মাকড়ি খুঁজে বার করে কেড়ে নিতে হল জমিটুকু যাওয়ার পর। ভিটেটুকু বাঁধা পড়লো সকলের শেষে,—মাকড়ি আগে যাবে না ভিটে আগে যাবে এই নিয়ে মনান্তর হয়েছিল কুন্তার সঙ্গে ছিদামের। সবই যে যাবে, তখন একরকম স্থির নিশ্চয়ভাবে জেনে গিয়েছে ছিদাম, ছেলেটাও তার তখন মরে গেছে। তবু ঘরদুয়ারটা সে নিজের আয়ত্তে রাখতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। অদৃষ্টে বিশ্বাস আর তার ছিল না, কোনো কিছুতেই বিশ্বাস আর তার ছিল না, ধুঁকতে ধুঁকতে তবু এক দুর্লভ স্বপ্নের রঙ একটু সে মনে পুষে রেখেছিল যে মাথা গুঁজবার ঘরটা থাকলে হয়তো বেঘোরে প্রাণটা তার যাবে না, আবার একদিন সব আসবে, জমি জমা গাইবাছুর তৈজসপত্র কুন্তার গয়না, কুন্তার গর্ভে সন্তান। ললিতবাবুর কাছে বাড়িটা বাঁধা দেবার পর তাই সে হতাশায় ঝিমিয়ে গিয়েছিল, হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

একদিন ভোরবেলা বুড়ী মা, যোয়ান বৌ আর কচি মেয়েটাকে ছেড়ে রওনা দিয়েছিল অন্যকোথাও কিছু করা যায় কিনা এইরকম একটা অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। মরবে তো তারা সকলেই। সেও মরবে, বৌ মরবে, মেয়েটাও মরবে, মাও মরবে। দেখা যাক বাঁচবার কোনো পথ যদি খুঁজে পাওয়া যায় পৃথিবীর কোথাও, যেখানে রোজ ইস্টিমার ভেড়ে, বড় বড় লোক থাকে বড় বড় দালানে, বড় বড় কারবার

চলে বড় বড় আড়তে, রোজ দু'বার বায়োস্কোপ দেখান হয়, হাকিমরা বসবাস করে।

কিছুই সে প্রায় সঙ্গে নেয়নি। শুধু ছেঁড়া ধুতি আর পিরানের বাণ্ডিলটা, তার মধ্যে কষে আর তিনপুরুষের তাবিজটা, তামার। বাহুতে আঁটা তাবিজটা খুলে সে বাণ্ডিলে ভরেছিল অবিশ্বাসে। ফেলে দিতেও পারত, তা দেয়নি। কোনো কিছু ফেলে দেবার স্বভাব তার নয়। তাছাড়া, গায়ে না রাখুক একেবারে ফেলে দিতে মনটাও খুঁত খুঁত করেছিল।

কুঞ্জা শুধিয়েছিল সসন্দেহে, যাও কই?

অসি, দেইখ্যা আসি। কিছু নি করণ যায়।

কুঞ্জার মনে বুঝি খটকা লেগেছিল তার হাতের বাণ্ডিল আর ভাবসাব দেখে। গাঁয়ের আরও কত লোক এরকম 'আসি' বলে চলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ক্ষীণ আর্তস্বরে সে বলেছিল, কই যাও কইয়া যাও, মরা মুখ দেখবা।

কমু অনে। ফির‍্যা আইসা কমু অনে।

হন হন করে এগিয়ে গিয়েছিল ছিদাম কথা আদানপ্রদানের সীমানা ছাড়িয়ে, পালিয়ে যাওয়ার মত। হাপরের মত ফুঁসতে শুরু করেছিল তার দুর্বল ফুসফুসটা ওইটুকু জোরে হেঁটে।

তারপর কতকাল কত পথ হেঁটেছে ছিদাম, কত দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে, বাজারে বাজারে ফালতু ফেলে দেওয়া পচা তরকারী মাছ ডিম কাড়াকাড়ি করে বাগিয়ে নিয়ে কাঁচাকাঁচা খেয়ে খেয়ে, এর বাগানের ফলটা ওর বাগানের মূলটা চুরি করে করে, এ কেন্দ্রে খিচুড়ি নিয়ে আরেক কেন্দ্রে পাবার আশায় ছুটতে গিয়ে দম নিতে পথের ধারে ছায়ায় বা রোদে, রোয়াকে বা ধুলো কাদায় বসে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধুঁকে আর ধুঁকে। এমনিভাবে গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা গেছে, শীত গেছে।

কত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ছিদাম। দেখেছে শুনেছে সে অনেক কিছু, নিজেও করেছে অনেক কাণ্ড। তার মধ্যে গাবোকে বৌ সাজিয়ে তার কোলে হাড়ে চামড়ায় এক করা কুড়ানো বাচ্চাটাকে দিয়ে দুস্থ গৃহস্থ সেজে ভিক্ষা করার অভিজ্ঞতা ছিদাম জীবনে ভুলবে না, ও যেন গজেন অপেরার যাত্রাগান। কাদের ক'শ বছরের পুরানো দালানের এক পরিত্যক্ত অংশে কোলাকুলি দুটো দেয়াল আর এপাশে ভাঙ্গা ইটের স্তূপের মধ্যে তিনকোণা ছাদহীন শাপ-শেয়ালের বাসটিতে সে আশ্রয় নিয়েছিল, গাছতলায় থাকলে পুলিশে জুলুম করে বলে, শীতে জমে যেতে হয় বলে। এখানে আকাশের হিম পড়ুক তার গায়ে, দু'কোণা ভাঙ্গা দেয়াল

ঘুটোতে উত্তুরে হাওয়া আটকাত, পুলিশ সামনের পথ দিয়ে গট্‌মটিয়ে হেঁটে গেলেও লাঠির খোঁচা তাকে দিয়ে যাবার সুযোগ পেত না !

ওইখানেই গাবো এসে জুটেছিল একদিন না ডাকতেই। কুকুর বেড়াল তাড়ানোর মত করে ছিদাম বলেছিল, যা যা, ভাগ্‌।

গাবো তার পিছু নিয়েছিল নিশ্চয়, চট কাপড় কাঁথা মোড়া একটা পুরুষ পদ্মপাতার মস্ত এক খাবারের ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ভাগের আশায়, লোভের বশে। খাবারের ঠোঙ্গাটা সেদিন মরিয়া হয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল ছিদাম, আকাশের চিল যেমন মরিয়া হয়ে মানুষের হাতের খাবারের ঠোঙ্গায় ছোঁ দেয়।

স্টিমার স্টেশন আর রেল স্টেশনের রাস্তা যে মোড়ে মিলেছে, যেখানে অনেকগুলি খাজা গজা রসগোল্লা পান্তোয়ার দোকান আর মুর্গী পাঁঠার মাংস ডিম কারীকোপ্তা ইলিশমাছের ঝোলের ভাতের হোটেল জাঁকিয়ে চলেছে, সেইখানে ভিক্ষা করছিল ছিদাম। তার সামনের দোকান থেকে বেঁটে রোগা নিকেলের চশমা পরা টাকওয়ালা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, যাকে দেখলে মনে হয় কোনো খাতালেখা কর্মচারী, হাকিমের মত জোর গলায় হুকুম দিয়ে খাবার কিনলে সাড়ে তিনটাকার, পরোটা এত, পান্তোয়া এত, অমৃতি এত। চেঙারিতে পদ্মপাতার ঠোঙ্গায় সব খাবার নিয়ে সে যখন চলতে শুরু করল ইস্টিমার ও রেলস্টেশনের উল্টো দিকের পথটাতে, ভিখারী ছিদাম এক নিমেষে হয়ে গেল ডাকাত, আকাশের ছোঁ-মারা চিল। সোজা গিয়ে ছোঁ মেরে ঠোঙ্গাটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশ কাটাল পাশের মেয়ে-বস্তির সরু মোটা গলি ঘুঁজির গোলোক ধাঁধায়। সেখান থেকেই বোধ হয় গাবো তার পিছু নিয়েছিল। সরকারী মেয়ে-বস্তির উচ্ছিষ্ট মেয়ে গাবো।

ধ্যাত্তেরি, ভাগ বলছি হারামজাদি কুত্তি !

গাবো ভাগেনি। ইটের স্তূপ ডিঙ্গিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল তার পায়ে একটা হাত দিয়ে, অরেকটা হাত উঁচু করে ধরা খাবারের ঠোঙ্গাটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে। জোড়াতালি লাগানো গায়ের ঢাকনিটা তার খসে গিয়েছিল। আকাশে কোন তিথির চাঁদ ছিল কে জানে। ছাদহীন পোড়ো বাড়ির আশ্রয়ে ছালা কাপড়ের ঢাকনাহীন গাবোর দেহে পড়েছিল মোটাসোটা চাঁদের তেরছা আলো। খাবারে কিন্তু গাবো বেশি ভাগ বসাতে পারেনি। কিছু খেয়েই সে গলা আটকে বলেছিল, জ-জ-জ জল—

জল খেয়েছিল একগাদা। খেয়ে আস্তে আস্তে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে

গিয়েছিল, যেন মরে গেছে এমনি ভাবে!

বাচ্চাটাকে যোগার করেছিল গাবোই। বুঝিয়ে বলেছিল, শোন বলি। না না, এডা আমার পেটের না। কুড়াইয়া পাইছি, লইয়া আইছি আমাগো রোজগার বাড়ানের লেইগা।

চামড়া ঢাকা একরত্তি একটু প্রাণ, তেলফুরানো পিদীমের নিভু নিভু শিখার মত, চামড়া ভরা ঘা।

রাতটা বাঁচবো?

ক্যান বাঁচবো না? গাবো গার্জে উঠেছিল ক্ষীণকণ্ঠে, মাই দিয়া দুধ পড়ে অখনো, দ্যাখো নাই?

মাই টিপে দুধ বার করে আবার সে দেখিয়েছিল ছিদামকে। বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিয়েছিল মাই। সেই চামড়াঢাকা প্রাণটুকুর যে কোনো মায়ের স্তন্যপানের শক্তিশালী লীলাটা চেয়ে চেয়ে দেখেছিল ছিদাম। তারপর, আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য ইস্টিমারের একজন চাষাভুষো ধরনের যাত্রীর চটলা-ওঠা টিনের স্যুটকেশ চুরি করে সে পোশাক সংগ্রহ করেছিল, ভদ্র চাষী গেরস্তের পোষাক।

দু'খানা ঘরে কাচা ন'হাতি মোটা শাড়িও ছিল সেই টিনের বাক্সে, খুশিতে গদগদ হয়ে গিয়েছিল গাবো।

অনেক আশা নিয়ে মাসখানেক দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছে ছিদাম। গেরস্ত চাষীই সে ছিল ভিক্ষুক হবার আগে, এবার সে ভিক্ষা শুরু করেছে আবার গেরস্ত চাষী সেজে। গাবোকে কুব্জারই মত গেরস্ত চাষীর বৌ সাজিযে সঙ্গে নিয়েছে কোলে মর মর বাচ্চাটাকে দিয়ে। কিন্তু বিশেষ কিছু তারতম্য হয়নি তাদের উপার্জনের। শহরের দালানের বড় বড লোকেরা যেন খেয়ালও করতে চায়নি সন্তান-যুক্ত গেরস্ত চাষী পরিবার ভিক্ষা চাইছে না ছালা জড়ানো ঘেয়ো কুষ্ঠ রোগী ভিক্ষা চাইছে, ভিক্ষাই যাদের ব্যবসা। তারপর বাচ্চাটা মরল। গাবো একদিন কোথায় গেল নীল প্যাণ্ট পরা আধবুড়ো লোকটার সঙ্গে ছিদাম জানতে চায়নি।

তার মন তখন কেমন করছিল ফুলদিয়ার খোড়ো ঘরের একটি স্ত্রীলোকের জন্য, যার নাম কুব্জা, যার কোলে কেবল গ্রীষ্ম বর্ষা শীতের আগে সে রেখে এসেছিল গাবোর কুড়ানো বাচ্চাটার মত চিমসে একটা বাচ্চা মেয়েকে, সুনিশ্চিতভাবে তারই ঔরসে কুব্জার গর্ভে যেটার জন্ম হয়েছিল।

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে, দই-কাদার পিছল পথে ছিদাম থুপ থুপ হাঁটে, বেলা পড়ে এসেছে। এ ছিদাম সে ছিদাম নয় সে তো জানা কথাই। ফুলদিয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে মনটা তার ধাত ফিরে পেয়েছে খানিকটা।

বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা তার জেগেছিল অনেকদিন আগেই। কিন্তু লজ্জা আর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। অসময়ে মা-বৌ-মেয়েটাকে নিশ্চিন্ত মরণের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার লজ্জা, ওরা কেউ বেঁচে আছে কিনা এই ভয়। ঘরে যখন ধান থাকে, তৈজসপত্র থাকে, গাইবাছুর থাকে, বৌয়ের পৈছেটৈছে মাকড়িটাকড়ি রুপোসোনার গয়না, চারিদিকে আশাভরসা ছড়ানো থাকে বিপদে আপদে সাহায্য ও সহানুভূতি পাবার—তখন পুরুষ মানুষ খেয়ালের বশে হোক, বৈরাগ্যে হোক, গোসায় হোক, মা-বৌ-মেয়ে ফেলে গিয়ে অনায়াসে দু'একটা বছর বাইরে কাটিয়ে নির্ভয়ে নিসংকোচে বাড়ি ফিরতে পারে—বাড়ি ফিরেই কৃতার্থ করা যায় বাড়ির লোকগুলিকে। কিন্তু গাঁয়ের যত কাছে এগোচ্ছে থুপ থুপ পা ফেলে তত যেন লজ্জা ভাবনার তোলপাড়টা বাড়ছে ছিদামের মনের মধ্যে। সে অবশ্য পালিয়ে গিয়েছিল তখন, যখন আর কোনো সন্দেহই ছিল না যে সবই মরবে, সে শুদ্ধ। শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যও সে পালায়নি, সবাইকে বাঁচাবার উপায় খুঁজবার জন্যই পাগলের মত নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। কিন্তু এতদিন কাজে লাগলেও ফুলদিয়ায় পা দেবার পর আজ এসব যুক্তি যেন ভাবনার বানে কুটার মত ভেসে যাচ্ছে।

কে যেন মনে বসে প্রশ্ন করছে : সবাইকে বাঁচাতে চাইলে সঙ্গে নিলে না কেন সবাইকে ? তুমি বেঁচেছো—ওরাও বাঁচতো—তোমার মা-বৌ মেয়ে !

হয়তো বাঁচত—কুঞ্জা। কি ভাবে বাঁচতো ছিদাম জানে। গাবোর মত মেয়েটার কংকাল কাঁধে নিয়ে তার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরত ভিক্ষে করে, মেয়েটা মরলে নীল প্যান্ট পরা কারো সঙ্গে চলে যেত অন্য সুখের সন্ধানে।

তবে সে বাঁচতো। সে যখন বাঁচাতে পারল না, কুঞ্জা যেভাবে বাঁচুক তার তো কিছু বলবার থাকত না।

বাড়ি তার নেই, বেদখল হয়ে গেছে, বদলে গেছে—অথবা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। বাড়িটা কি অবস্থায় কার হয়ে আছে এ বিষয়ে খটকা ছিল ছিদামের কিন্তু বাড়ির কেউ যে তার বেঁচে নেই এতে সন্দেহের লেশটুকু তার ছিল না। কুঞ্জা মরে গিয়েছে ধরে নিয়েই অনেকদিন ধরে অনেকরকম উদ্ভট পরিকল্পনা সে গড়ে তুলেছে

কি করে বাঁচানো চলতে পারত কুঞ্জাকে—সকলকে! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা হলেও বড় প্রিয় ছিল পরিকল্পনাগুলি তার কাছে।

তাই, বাড়ি তার ভাল আছে দেখে, বাড়ির সামনের শিউলি গাছটা আজও ঝাঁকিয়ে উঠেছে দেখে আর সেই তলায় সাবান-কাচা তাঁতের কোড়া রঙীম শাড়ি পরা কুঞ্জাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে ছিদাম থ' বনে যায়! কলসী কাঁখে ঘাটেই কুঞ্জা যাচ্ছিল, আগে যেমন যেত। ছালা ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো একটা লোককে বাড়ির বেড়ার সামনে দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম কথা মনে জাগে ছিদামের: আজও কুঞ্জা বেলা শেষ করে ঘাটে যায়? ঘাট অবশ্য লাগাও, তবু—

চেহারা ফিরেছে কুঞ্জার। আজ মেঘলা অবেলায় খাসা দেখাচ্ছে কুঞ্জাকে। এ বড় অদ্ভুত কাণ্ড, নয় কি! বিয়ের সময়কার রোগা প্যাঁটকা মেয়েটা ছ'সাত বছর যদ্দিন স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করল, একটা ছেলে আর মেয়ের মা হয়েও রইল যেন প্যাঁকাটি, স্বামীর দেড় বছরের অন্তর্ধানের সময়টাতে সে মরার বদলে পুড়ন্ত বাড়ন্ত যুবতী হয়ে গেছে!

কুঞ্জা ঝেঁজে বলে, বাড়ন্ত সব, আরেক বাড়ি যাও।

ছিদাম বলে, চিনলা না মোরে? আমি যে ফির‍্যা আলাম।

কুঞ্জা দু'পা এগিয়ে যায়।—তুমি ফির‍্যা আসছ? কন থেইকা আইলা তুমি?

সে যেন ভূত দেখেছে। এই মাটির পৃথিবী না মৃত্যুর দেশ কোথা থেকে আজ সে এই ছায়াচ্ছন্ন পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির হয়েছে এ বিষয়ে তার রীতিমত সংশয়।

ম্রিয়মান ছিদাম বেড়া পেরিয়ে কাছে এগিয়ে আসে, উদাস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, যামু গা?

ক্যান? যাইবা ক্যান? দাওয়ায় কুঞ্জা ভাল পাটি বিছিয়ে দেয় ঘর থেকে এনে, বলে, বসবা এক দণ্ড? জলডা নিয়া আসুম? ঘরে এক পলা জল নাই, কমু কি তোমারে।

কুঞ্জা একরকম পালিয়েই যায় কলসীটা তুলে নিয়ে কিন্তু আদর করে পাটি পেতে বসিয়ে গেছে বলে মনটা বিগড়ে যায় না ছিদামের। ঘাট থেকে ফিরে আসবে কুঞ্জা, তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। ও শুধু একটু দম ফেলতে গেছে, সব কথা বিচার করে দেখতে গেছে ঘরে এক ফোঁটা জল নেই বলে জল আনতে যাবার ছুতো করে! দম ফেলার দরকারটা, বিচার বিবেচনার প্রয়োজনটা জড়িয়ে আছে ওর বেঁচে থাকার, বাগানে ফুল ফোটাবার, রঙীন শাড়ি গায়ে জড়াবার, পরিপুষ্ট

হবার রহস্যের সঙ্গে। তাকে বাইরের দাওয়ায় পাটিতে বসিয়ে নইলে সে কখনো গা ধুতে জল আনতে যায়! তার বাড়ি ছিল এটা। ও ছিল তার বৌ। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘর এবং ঘরের ভেতর দিয়ে আরেক ঘর হয়ে উঠান রসুইঘর গোয়াল সব দেখে ফিরে এসে পাটিতে গুম হয়ে ছিদাম বসে থাকে।

বাইরের দাওয়ায় বসে থাকা পর্যন্ত রহস্য তার আয়ত্তে ছিল, বাড়ির ভেতর ঘুরে আসবার পর সে হার মেনে হাল ছেড়ে দেয়। গাবোর মতই কোনো একটা পুরুষকে বাগিয়ে কুঞ্জা বেঁচে থেকেছে, রঙীন শাড়ি পরেছে, পুড়ন্ত হয়েছে, জানা কথা। কিন্তু তার ঘরে খাট, টেবিল, তাক দেখে আর সে সমস্ত শহুরে শয্যা, জিনিসপত্র, প্রসাধন-সামগ্রী দেখে, ললিত বাবুর বাড়ির বুড়ী ঝি সুবালার মাকে উঠান ঝাঁট দিতে দেখে, রসুই ঘরের নতুন করে গড়া চালার নিচে কোন একজন রাঁধুনী রান্না চাপিয়েছে টের পেয়ে, গোয়ালে দুটো প্রকাণ্ড পশ্চিমা গাই দেখে, হিমসিম খেয়ে গেছে ছিদাম।

বাইরের দাওয়ায় পাটিতে বসে এদিক ওদিক একটু ভাবতে না ভাবতে অনেক পথ হাঁটার ফলে ঝিম না ধরে গেলে ছিদাম বোধ হয় উঠে পালিয়ে যেত আরেকবার।

ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরে তাকে এখানে বসে থাকতে দেখে কুঞ্জা একটু রাগ করে। প্রকাশ্য রাস্তার সামনে এখানে এই বেশে এই চেহারায় বসে থাকাটা কি উচিত হয়েছে ছিদামের, কত লোক না জানি দেখে গেল তাকে, কত লোক না জানি কত কথা বলেছে কুঞ্জার নামে!

কে আর কি কইবো তোমার নামে? কইও আমি ফিরা আইছি। কাইল কইও।

কমু?

কইবা না?

আসো, আসো, আসো—ভিতরে আসো।

কুঞ্জা তাকে একরকম জোর করেই ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে দেয়, খাটে ছিদাম বসে তার জীবনে এই প্রথম, দামী খাটে গদি, তাতে তোশক, আবার চাদর পাতা ধবধবে পরিষ্কার!

তামাক দিবার পার একছিলুম?

কুঞ্জা তাক থেকে টিন সামনে ধরে সিগারেটের। একটা সিগারেট নিয়ে হুস করে একটানে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছিদাম ভাবতে থাকে।

আসি। বলে কুঞ্জা বেরিয়ে যায়। পরে ফিরে এসে বলে, সুবলের মা, ঠাকুর সব কয়টারে বিদায় দিলাম। ব্যাটাব্যাটিরা কি বজ্জাত জানো, কওন মাত্র গেল গিয়া! আমারে মানে না।

কারে মানে?

ললিতবাবুরে।

অস্ফুট ক্ষীণস্বরে কুঞ্জা জবাবটা দেয়, বজ্রের মত স্পষ্ট শোনে ছিদাম। অনেক কিছু চোখে দেখে সে অনুমানে আগেই শুনেছিল বলা যায়, এখন সেটাই প্রমাণিত হল মাত্র। আইনে প্রমাণ না হলে চাষাভুষার মন মানে না।

ললিতবাবু কখন আইবো?

আইজ আইবো না।

ছিদাম ভাবে, তাই এত মেয়েলীপনা! ললিতবাবু আজ আসবে না, যদি আসবার কথা থাকত তবে কুঞ্জার চালচলন কথাবার্তাও অন্যরকম হয়ে যেত।

যামু?

ক্যান যাইবা? বস। কই ছিলা এতকাল?

সে কথার জবাব না দিয়ে হাতপা ধোয়ার প্রয়োজন জানানো মাত্র কুঞ্জা তাকে পরিষ্কার কাপড় ও গামছা দেয়, ভিতরের রোয়াকে জলও দেয় নতুন বালতি ভরা, কাঁসার ঘটি দেয়, নতুন। তৈজসপত্র আবার হয়েছে কুঞ্জার, আগের চেয়ে ভালভাবেই হয়েছে। গয়নাগাঁটি কেমন হয়েছে বলা যায় না, কানে পুরানো মাকড়ি দুটি ফিরে এসেছে চোখে পড়ে। ললিতবাবুর কাছেই মাকড়িটা ছিদাম বিক্রী করেছিল।

খিদেয় নিজেকে অসুস্থ ঠেকছিল ছিদামের। মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার ধুতিখানি পরে ঘরে গিয়ে সে বসেই থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সাগ্রহে কুঞ্জা দু'একটা কথা বলে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে, তাকে কিছু খেতে দেবার কথাই তোলে না। ছিদাম শেষে মরিয়া হয়ে বলে, মুড়ি চিড়া আছে না কিছু?

কুঞ্জা গুটিসুটি মেরে তার দিকে কাত হয়ে বসেছিল, তড়াক করে যেন লাফিয়ে উঠে বলে, দেই, দেই! অখনি দেই।

এক ডালা মুড়ি আর এক খাবলা গুড় সে এনে দেয় ছিদামকে, তিনজনের খাবার মত। ছিদাম মুড়ি চিবোতে চিবোতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

কুঞ্জা দীপ জ্বালে, ধুনো পোড়ায়। বেড়ায় টাঙানো মালা জড়ানো সেই পুরানো আবছা ছবিটার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। মুড়ি চিবানো সাঙ্গ করে

জল খেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে ছিদাম। সন্ধ্যা সেরে আবার নিঝুম হয়ে বসে থাকে কুঞ্জা তার দিকে পাশ ফিরে।

কেমন যেন হয়ে গেছে কুঞ্জা। একসঙ্গে জীবন্ত আর মরা। এতক্ষণের লক্ষণ-গুলি মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় ছিদাম। নিজে থেকে যেচে সে তাকে এতটুকু আদর যত্নও করেনি। তামাক চাইলে সিগারেট দিয়েছে, মুখ হাত ধুতে চাইলে কাপড় গামছা জল দিয়েছে, খেতে চাইলে মুড়িগুড় খেতে দিয়েছে। দিয়েছে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে, আগ্রহে একেবারে যেন অধীর হয়ে পড়ে, কিন্তু চাইলে তবে দিয়েছে, যা চেয়েছে, শুধু সেইটুকু। কিছু যেন খেয়াল নেই কুঞ্জার, মনে নেই। একদিন সে স্বামী ছিল সেটা নয় বাদ গেল, একটা মানুষ ঘরে এলে, একটা মানুষকে ঘরে ডেকে বসালে, তার সুখসুবিধার দিকে যে একটু তাকাতে হয় তাও কুঞ্জা ভুলে গেছে। খেয়ে উঠেছে, তাকে এখন আরেকটা সিগারেট দিলে হয়। না চাইলে কি দেবে! চাইলে হয়তো লাফিয়ে উঠবে দশটা দেবার জন্য।

তবে, গোড়ায় ভড়কে গিয়ে বিদায় নিতে চাইলে কুঞ্জা তাকে বসতে বলেছিল। মুখ ফুটে ছিদামকে বলতে হয়নি, বসুম না কি? তা, এক হিসাবে ধরলে, এতকাল পরে ফিরে এসেই চলে যাওয়ার কথা বলা মানেই তো ডেকে বসতে বলতে মনে করিয়ে দেওয়া!

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে ছিদাম। কুঞ্জাকে এভাবে আবিষ্কার করার অস্বস্তি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু। বাইরে বাদলার আঁধার, ঘরে পিদীমের মিটিমিটি আলো, তারা, দু'জন থাকলেও তাদের ঘিরেই যেন নির্জনতা আর স্তব্ধতা থম থম করছে। তার ভাঙ্গাচোরা নোংরা ঘরখানা সাজানো গোছানো পরিষ্কার, তার কঙ্কালসার বৌটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী যুবতী—নতমুখে ঝিম হয়ে বসে আছে তো বসেই আছে। ছিদামের মধ্যে যুগযুগান্তের পুঁজি করা স্তূপাকার রহস্যানুভূতি আর ভয় পাকিয়ে পাকিয়ে মাথা তুলতে থাকে ধীরে ধীরে। এরকম কত গল্প সে শুনেছে কত লোকের মুখে। দশ পনের বছর পরে বিদেশ থেকে মানুষ ফিরল সাঁজসন্ধ্যায়, দেখল ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছেল তেমনি গিজ গিজ করছে বাড়ি ভরা আত্মীয় পরিজন—অথবা ভেঙ্গেচুরে গেছে ঘরবাড়ি, তার মধ্যে মাথা গুঁজে আছে দু'একজন আপনার লোক। অথচ অনেকদিন আগেই একরাত্রে রোগে কিম্বা দুর্ঘটনায় ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সব মরে বাড়িটা শ্মশান হয়ে গেছে, সন্ধ্যার পর সে পোড়ো বাড়ির ধার দিয়ে কেউ হাঁটে না! বাড়ি যে তার শুধু মায়া, আপনজনেরা রক্তমাংসের জীব নয়, বিদেশী মানুষটা তো শুধু টের পেয়েছে বৌকে কাঠের বদলে

উনানে নিজের পা গুঁজে রাঁধতে দেখে অথবা কোনো জিনিস চেয়ে সেটা আনতে বৌকে একঘর থেকে আরেক ঘরে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখে।

কে জানে এ ঘরবাড়িও তার মায়া কি না! কুব্জা হয়তো সুশ্রী সুন্দর করেছে বাড়িটা, নিজেকে করেছে সুন্দরী তাকে ভোলাবার জন্য! গায়ে হাত দিয়ে দেখবে একবার কুব্জার গায়ে খাঁটি রক্তমাংস কি না?

মা ও মেয়ের কথা এতক্ষণ জিজ্ঞেস করেনি খেয়াল হয় ছিদামের। খানিকটা সে কাছে সরে যায় কুব্জার।

নাই, কেউ নাই, সগ্‌গলে মরছে। কুব্জা বলে মুখ না ফিরিয়েই, আমি পোড়াকপাইলা আমি ছাড়া মইরা জুড়াইয়েছে সব।

ছিদাম একটা হাত রাখে কুব্জার পিঠে। কুব্জা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়, তাকিয়েই থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আবার মুখ সোজা করে আগের মতই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বেড়ার দিকে।

কি বলবে কি করবে তারা ভেবে পায় না, তেমনিভাবেই বসে থাকে দু'জনে। আরেকটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে টানা যেতে পারে, এ কথাটা সবে মনে পড়েছে ছিদামের, বাইরে থেকে ঘা পড়ে সামনের দরজায়।

কেডা? কুব্জা শুধায়।

আমি। জবাব আসে পুরুষের গলায়।

ছিদাম ফিস ফিস করে কুব্জাকে শুধায়, ললিতবাবু নাকি?

কুব্জা মাথা নামিয়ে সায় দেয়।

কি করণ যায় এখন?

কি জানি।

আবার ধাক্কা পড়ে দরজায়, আবার ললিত ডাকে। কুব্জা নড়েও না, সাড়াও দেয় না, উদাসীনের মত বসে থাকে।

খুলে দে। ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই। উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ভিতরের রোয়াক থেকে ভিখারীর ছাড়া পোশাকের বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে বাঁশবনের ধার ঘেঁষে রাস্তায় নেমে পড়ে। টিপি টিপি বৃষ্টিটা তখন ধরেছে। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি, বিদ্যুতের ঘন ঘন চমক ও আওয়াজ।

পেট ব্যথা

কথা মত মানোর মা শেষ রাত্রে ভৈরবকে তুলে দিতে গিয়ে টের পায় সে জেগেই আছে। মুখে আগে ডেকে আর দেখবে কি, একেবারে ঠেলা দিয়ে মানোর মা বলেছে, ওগো ওঠো। শুনছো? ওঠো গো।

তাতে গোসা হয়েছে জাগন্ত ভৈরবের।

এত তাড়া কিসের, আঁ, কিসের তাড়া এত? ঘুমোসনি রাতে বুঝি কত খনে কালীকে তাড়িয়ে হাড় জুড়োবি ভেবে?

এ পর্যন্ত বললে কোনো কথা ছিল না, মানোর মা গায়ে মাখত না কথা। পুরুষ মানুষ অমন বলেই থাকে। কিন্তু উঠে এসে হাইটাই তোলার পর জানলার চাঁদের আলোয় নেংটি ছেড়ে ছেঁড়া মোটা হেঁটো ধুতিটি পরবার সময়তক্ জের চলে ভৈরবের গোসার।

হাঃ, সে বঙ্গে মাঝখানে যত ঘরোয়া কথা হয়েছে তা ডিঙিয়ে তার প্রথম রাগের কথাটাই একটানা বলে যাওয়ার মত, মেয়েলোক নইলে বলে কাকে। পেলে টেলে মেয়ে বেচে দেয় পেটের লেগে। মেয়ের মত পেলে একটা ছাগল বেচতে চেয়ে পাগল হবে সে তো ডাল-ভাত।

এতে অগত্যা গোসা করতে হয় মানোর মাকে।

ছাগল লোকে বেচে না পোড়ার মুখো, অভাবে নয়তো স্বভাবে? মানোর মা বলে কলহের গরম অবস্থায় গাল দেবার সুরে, মেয়ের কথা বলো না যদি সরম থাকে একরত্তি। না খেয়ে মরেছে মেয়েটা, হায় গো! ছাগলটা বেচলে তখন বাঁচতো মেয়েটা। ছাগলের মায়ায় নিজের মেয়েকে খেতে না দিয়ে মারতে পারে কেউ পুরুষলোক ছাড়া! হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে মানোর মা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে।

ছাগল বেচলে বাঁচতো ? মানোর মার ধাঁধায় কাবু হয়ে পড়ে ভৈরব, ছাগল কোথা ছিল তখন ? কালী তো জন্মালে দু'চার দিন আগে, মানো যাওয়ার দু'চার দিন আগে ওই গোয়াল-ঘরটায়।

ওর মা-টাকে বেচা যেত না ? বাচ্চা ক'টাকে ?

কার ছাগল কি বিত্তান্ত কিছু জানি না, বেচে দেব ? আর সবে বিইয়েছে দুটো তিনটে দিন আগে ?

রওনা দেও না ? এসো না গিয়ে ভালয় ভালয় ? মানোর মা বলে লড়ায়ে জেতা রানীর মত, বেলা যে দুপুর হয়ে যাবে সদরে পৌছতে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে ?

গলায় কাপড়ের পাড় বেঁধে কালীকে টানতে টানতে ভৈরব রওনা দেয় সদরের উদ্দেশে শেষ রাত্রির অস্তগামী চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায়। দু'পা গিয়েছে কি না গিয়েছে মানোর মা ছুটে এসে বাঁশের কঞ্চিটা হাতে তুলে দেয়। উপদেশ দেয় যে টানতে টানতে ছাগল নিয়ে যাওয়া চলে তিন কোশ পথ ? কালীকে সামনে দিয়ে পেছন থেকে কঞ্চির বাড়ি মেরে মেরে নিয়ে গেলে যদি ভরসা থাকে আজ সদরে পৌছবার।

উপদেশটা কাজে লাগে ভৈরবের, বৌয়ের উপদেশ। সে যেন জানে না ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কায়দা, জন্ম-ভোর ক্ষেত চষে আর গরু-ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে চুলে তার পাক ধরেছে। তবে কি না কালীকে বার বার কঞ্চির বাড়ি মারতে হয় এই যা দুঃখ। পাড়ের দড়ি বেশ লম্বা ও শক্ত। বাঁধন খুলে পালাবার চেষ্টা করে করে কালী শেষে হার মানে। যুদ্ধের আগের সস্তা শাড়ির পাড়, চওড়া যেমন শক্ত তেমন। ঘরে কাপড় নেই ভৈরবের। এই কটা পাড় আজও টিকে আছে, গরু-বাঁধা দড়ির কাজ পর্যন্ত বুঝি ভাল চলত আজকালকার দড়ির চেয়ে এই পাড় দিয়ে, যদি গরুটা তার থাকত।

কোথা থেকে কার একটা ছাগল এসে তার ভাঙ্গা গোয়ালের ফাঁকা চালাটার নিচে পাঁচটা বাচ্চা বিইয়েছিল। মানোর শোকে কাতর, না খেয়ে না খেয়ে আধমরা মানোর মা শুকনো পাতা জ্বেলে মাঘের বাঘ-মারা শীত থেকে বাঁচিয়েছিল ছাগল আর তার বাচ্চা ক'টাকে নয়তো ছাগলটা বাঁচলেও ক'টা বাচ্চা টিকত কে জানে ! কয়েক দিন পরে জাফর এসেছিল তার ছাগল আর বাচ্চা নিয়ে যেতে। একটা বাচ্চা পুরস্কার দিয়ে গিয়েছিল।

দুধ না খেয়ে বাঁচবে তো ? জাফর শুধিয়েছিল। বাঁচাবো। বলেছিল ভৈরব উদাসীন ভাবে। মনে মনে সে ভাবছিল, বাঁচে তো বাঁচবে, না বাঁচে তো কচি

ছাগলের মাংস এক দিন মন্দ লাগবে না খুদের সঙ্গে দুটো পেঁয়াজ যদি কোনো মতে তুলে আনা যায় কাল্লুর ক্ষেত থেকে।

তার মেয়ে মানো কিন্তু সত্যিই না খেয়ে মরেনি। চলতে চলতে এলোমেলো ভাবনার মধ্যে খাপছাড়া ভাবে ভৈরব অন্তত দশবার মনের মধ্যে জোর গলায় বলে যে মানো না খেয়ে মরেনি। মানোর মা ও-কথা বলে গায়ের জ্বালায়। নয়তো পেটের জ্বালায় মানো মরেছে রোগ হয়ে, ব্যারামে। না খেয়ে না খেয়ে গায়ে শক্তি না থাকায় হয় তো সে মরেছে রোগে, তেমন পথ্য পেলে হয় তো মরত না, তবু না খেয়ে যে মরেছে এ-কথা কোনো মতে মানবে না ভৈরব তার বাপ হয়ে। মানোর মা মরত না তা হলে? যোয়ান মর্দ মেয়েটা খেতে না পেয়ে মরল আর তার মা বেঁচে রইল, এ কখনো হয়! সেও তো মরেনি, তার আর দুটো ছেলে মেয়ে। দুর্ভিক্ষটা কোনো মতে সামলেছে ভৈরব। এক বেলা আধ বেলা শাক-পাতা খুদ-কুঁড়ো কোনো মতে জুটিয়ে হাড় চামড়া টিকিয়ে রেখে কোনো মতে বেঁচে থেকেছে সবাই মিলে,—মানো ছাড়া। মানোর অসুখ হ'ল। ওই অবস্থায় পোয়াতি মেয়ে বাঁচে কখনো অসুখ হলে। অসুখটা যদি না হতো, না খেয়ে মানো মরত না, শাক-পাতা খুদ-কুঁড়ো তারও জুটত, মানোও বেঁচে থেকে দেখত ক্ষেতে ক্ষেতে ভরপুর অজস্র ফসল, অনেক কাল যেমন ফসল কারো মাটিতে ফলেনি।

আর ক'টাদিন পরে মাঠের ফসল তার ঘরে উঠবে—জমিদার অবশ্য যদি কেড়ে না নেয় বাকী খাজনার দায়ে। তা, করালীবাবু কি এমন রাক্ষস হবে যে একটা বছর তাকে সময় দেবে না সামলাবার জন্য, এত বোকা কি হবে করালীবাবু যে সে বুঝতে পারবে না একটা বছর তাকে সময় না দিলে সে উৎখাত হয়ে যাবে, বছর বছর খাজনা দেবার কেউ আর থাকবে না তখন!

আনমনা ভৈরবের সামনে দাঁড়িয়ে কৈলাস বলে, বলি চলেছ কোথা ছাগল নিয়ে শুঁড়ির পো?

গায়ে যেন হাজার বিছে লাগে ভৈরবের। সা' বটে তার উপাধি, কিন্তু পাঁচ-পুরুষে শুঁড়ির কর্ম তো কেউ করেনি তার বংশে, পাঁচ-পুরুষে তারা চাষী। তার এক দূর-সম্পর্কের কুটুম সদরে মদ বেচে টাকা করে। এজন্য তাকে শুঁড়ি বলা আর বাপ মা বৌ মেয়ে তুলে গাল দেওয়া সমান কথা।

এই যাচ্ছি হেথা হোথা।

কৈলাস ব্যাপার বুঝে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। সুর বদলে বলে, রাগ

করো না। ওটা নিছক তামাসা। তামাসা বোঝ না, কেমন চাষী তুমি? যাই হোক, যত হোক, তুমি লোক ভাল, তা কি জানি না আমি? তবে কথা কি জানো, ছাগল নিয়ে যাচ্ছো কোথায়?

সদরে বেচে দেব ছাগলটা। ফসল তোলা-তক্ ক'টাদিন আর চলে না কোনো মতে।

সদরে গিয়ে ছাগল বেচবে? কৈলাস বলে আশ্চর্য হয়ে, তোমার তো আস্পদ্দা কম নয় ভৈরব! গাঁয়ের গরু-ছাগল সব কিনে নিচ্ছি আমি যে যা বেচতে চায়, আমার লোক চাদ্দিকে রয়েছে, বেচতে যাতে কারো অসুবিধা না হয়, তুমি সদরে চলেছ একটা ছাগল বেচতে? আমাকে ছাড়িয়ে উঠতে চাও দেখছি তুমি!

পুবের আকাশে সূর্য তখন কয়েক হাত উঠেছে। কালাপুর ছাড়বার পথ এটা, একটু আগেই পুল। খালের চেয়েও মরা-মজা ছোট-খাটো নদীটা লোকে অনায়াসে হেঁটেই পার হয়ে যেত, পুল তৈরী করে দেবার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কৈলাস গুছিয়ে নিয়েছিল। ভোরের রোদে ঝলমলে বাঁকাটে পুলটার দিকে চেয়ে ভৈরব ভয়ডর ভুলে যায়।

আপনাকে গরু-ছাগল দেওয়া মানে তো খয়রাৎ করা।

বটে না কি? সবাই তাই আমাকে গছিয়ে দিতে পাগল! নাক ঝেড়ে কৈলাস বলে, শোন বলি তোকে ছ'টাকা সবাই পায়, তোকে আট দিচ্ছি আর কাউকে বলিস না। এমনি ছাগলের জন্য আট টাকা করে দিতে হলে ব্যবসা গুটোতে হবে। গাঁয়ে গিয়ে লতিফকে এ চিঠিটা দিবি যা—পেন্সিলে লিখে দিলাম তো কি হয়েছে, ওতেই হবে। ছাগলটা জমা দিলে লতিফ তোকে আটটা টাকা দেবে।

রও, রও। ভৈরব সাতঙ্কে বলে, আট টাকা কিসের? সদরে এ ছাগল আঠারো টাকায় বেচবো।

কৈলাসের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।—বাড়াবাড়ি করিস নে ভৈরব। ছাগল নিয়ে সদরে যাবার তোর রাইট নেই। তা জানিস ব্যাটা?

কি জন্যে? আমার ছাগল আমি যেথা খুশি নিয়ে যাব।

সাইরি? কৈলাস খেঁকিয়ে ওঠে বাঘা কুকুরের মত, আমি দশ-বিশ হাজার চেলে লাইসেন্স নেবো সরকারের কাছ থেকে, আর তোমরা যার যেথা খুশি নিয়ে গরু-ছাগল বেচবে? সরকার আইন করে দিয়েছে, চাল কাপড়, কেরোসিনের মত গরু-ছাগল কেউ গাঁয়ের বাইরে নিতে পারবে না অত টাকা ঢেলে কে নেবে লাইসেন্স?

ভৈরবকে ভড়কে যেতে না দেখে কৈলাস আশ্চর্য হয়ে যায়। ভৈরব নিশ্চিন্ত-ভাবে বলে, বোকা পেলে না কি কৈলাসবাবু? আইন শুধিয়েছি। চালানী কারবারে নামি যদি তো আইন দেখিয়ো তখন।

ভৈরব বলতে শুরু করলে কৈলাস ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে ভাবে। একটা ছাগল কিছুই নয়, কিন্তু লক্ষণটা মন্দ। দশজনে জেনে বুঝে সাহস পেয়ে এ রকম শুরু করলেই তো সে গেছে। এ বিদ্রোহ দমন করা দরকার।

শহরে ঢুকতে না ঢুকতে সহজেই কালী বিক্রয় হয়ে যায় একুশ টাকায়। ভৈরব খুশি হয়। শুধু ভাল দাম পেয়েছে বলেই নয়, গেরস্ত ঘরে কালীকে বেচতে পেরেছে বলে। পোষা ছাগল বেচতে হওয়ার খেদটা তার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল এই ভাবনায় যে কার কাছে কালীকে বেচবে, কেটেকুটে গর্ভিনী কালীকে হয় তো খেয়ে ফেলবে, নয় মাংস বেচে দেবে। যে দিনকাল পড়েছে। কৈলাসের কাছে তো গরু মহিষ পাঁঠা খাসী ছাগলের কোনো তফাৎ নেই, মাংস হলেই হল। কুকুর-বেড়ালও নাকি সে মেশাল দেয়, সে যে মাংস দৈনিক যোগান দেয় তাতে। কালী ভাল ঘরে পড়েছে ফল ফুল আনাজের মস্ত বাগানের মাঝখানে পুরানো একতলা বাড়ি, ছেলে-পুলে নিয়ে সংসারী ভদ্র গৃহস্থ, কালী বিয়োলে তার দুধটা খাবে, কালীকে নয়। বাড়ির লাগাও মাঠ-জঙ্গল আছে, কালী চরে বেড়াতেও পারবে।

কিছু সওদা করতে বাজারে যায় ভৈরব। একখানি গামছা কেনে, শাড়ির বদলে এতেই মানোর মার এক রকম চলে যাবে। আধ সের আলু এক সের ডাল মোট সাড়ে ছ'আনার হলুদ লঙ্কা ধনে আর জিরে, চার পয়সাতে সোডা আর দু'আনার একটি কাপড় কাচা সাবান কিনে গামছায় বাঁধে। শেষে ভেবেচিন্তে দু'আনার তামাক-পাতাও কিনে ফেলে মানোর মার জন্য।

তারপর পথের ধারে তেলেভাজার দোকানে গিয়ে বসে গাঁয়ের দিকে চলতে শুরু করার আগে একটু বিশ্রাম করতে ও কিছু তেলেভাজা খেয়ে নিতে। তেলেভাজা বড়ই পছন্দ করে।

বাদাম তেলের চেনা গন্ধে পুরনো দিনের খিদে যেন পাক দিয়ে চেগে ওঠে ভৈরবের মন ও পেটের মধ্যে। বসে বসে অনেকগুলি তেলেভাজা সে খেয়ে ফেলে, জল ও তেলেভাজায় পেট ভরে যাওয়া পর্যন্ত। পেটভরার আরামে অলস অবশ হয়ে আসে সর্বাঙ্গ, মাথা ঝিমিয়ে আসে মধুর শান্তিতে। শুধু তার জীবনটা নয়, জগৎটাও জুড়িয়ে গেছে ভৈরবের। সামনে নোংরা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে যে মিলিটারী লরীগুলো চলেছে, দিক কাঁপিয়ে সেগুলি চলতে শুরু করার পর দেখতে

দেখতে দুর্দশা তার চরমে এসে ঠেকেছে, সেগুলিও এখন আর বুকের মধ্যে অভিশাপের দপদপানি জাগায় না। রাগ দুঃখ আপসোস দুর্ভাবনা সব তলিয়ে গেছে ভরা-পেটের তেলেভাজার তলে!

ঘুম আসা চোখে ভৈরব বাইরে বেলার দিকে তাকায়। গাঁয়ে যখন ফিরতে হবে, রওনা দেওয়াই ভাল। তেমন নাছোড়-বান্দা হয়ে যদি চেপেই ধরে ঘুম, পথের ধারে কোনো গাছতলায় ঘুমিয়ে নিলেই হবে খানিক। গামছায় বাঁধা জিনিস কাঁধে তুলে আস্তে আস্তে সে হাঁটতে শুরু করে। আসবার সময় চোখে লাগানো ছিল নানা ভাবনার ঠুলি, দেখতে পায়নি, এবার শহর ছাড়িয়েই দু'দিকে ছড়ানো পরের ক্ষেতের ফসল দেখে চোখ তার জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায় ওই সবুজের মতই তাজা খুশিতে। তার নিজের ক্ষেতটুকু যেন লুকিয়ে আছে যে দিকে তাকায় সেইখানে।

ডাক দিয়ে তাকে দাঁড় না করিয়ে এবার কৈলাস সামনে থেকেই তার পথ আটকায়। তার সঙ্গে এবার দু'জন ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার মানুষ।

ছাগল বেচলি ভৈরব?

ভৈরব উৎসাহের সঙ্গে বলে, বেচেছি গো কৈলাসবাবু, তোমার আশীর্বাদে। দর পেয়েছি এক কুড়ি এক টাকা।

তাই না কি! তা বেশ করেছিস, আমার বেচা-কেনার ঝক্কিটা তুই নিজেই পুইয়েছিস। আট গণ্ডা কমিশন দেব তোকে। বার কর দিকি টাকাটা।

কৈলাস তাকে ছোঁয় না, সঙ্গের লোক দু'জন ভৈরবকে ধরে কোমরে-বাঁধা টাকা বার করে তার হাতে দেয়। টাকা পয়সা গুণে হিসাব করতে করতে কৈলাস বলে, হুঁ, খরচা করা হয়েছে এর মধ্যে। দাঁড়া, হিসেব করে তোর পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোর ছাগলের দাম বাবদ আট টাকা আর আট আনা মেহনৎ—সাড়ে আট টাকা। একুশ থেকে সাড়ে আট গেলে থাকে সাড়ে বারো, এই আমি নিলাম সাড়ে বারো, বাকীটা তোর।

এ কেমন ধারা তামাসা কৈলাসবাবু? ছাড়ো আমায়, ছেড়ে দাও।

তামাসা? ব্যাটা, তুই আমার তামাসার পাত্র? দাঁতে দাঁত ঘষে কৈলাস গালে এক চড় বসিয়ে দেয় ভৈরবের, বলিনি তোকে, আমি ছাড়া এ এলাকায় গরু-ছাগল কেনা-বেচার লাইসেন্স কারো নেই, ছাগল বেচতে হলে আমাকে বেচতে হবে? ঘাড়ে তোর ক'টা মাথা রে হারামজাদা, গট-গট করে সদরে চলে গেলি ছাগল বেচতে বারণ না মেনে?

ভৈরব ক্রুদ্ধ অসহায় আর্তনাদের সুরে বলে, ডাকাতি করে গরীবের পয়সা কেড়ে নেবে? নাও—আমি থানায় যাবো, নালিশ করবো।

থানায় যাবি? নালিশ করবি? কৈলাসের মুখে হাসির ব্যঙ্গ দেখা দেয়, যা ব্যাটা থানায়, নালিশ কর গা। বলে তাকে থানার দিকে এগিয়ে দেবার জন্যই যেন পা তুলে জোরে এক লাথি কষিয়ে দেয় তার বাঁ কোমর লক্ষ্য করে। লাথিটা লাগে ভৈরবের পেটে।

পথ-চলতি রাম শ্যাম যদু মধুরা ভৈরবকে জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওদের মধ্যে দু'জন কাছাকাছি এসে পড়েছিল ঘটনাটা ঘটবার সময়। লাথি মারাটা তারা দেখেছে,—কৈলাসকেও কে না চেনে এ অঞ্চলে! তারা কাছে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কৈলাসেরা অবশ্য চলতে শুরু করে দিয়েছিল ভৈরবকে রাস্তায় ফেলে রেখে,—দৌড়ে পালায়নি, কৈলাস আগে আগে হাঁটছিল হেলে-দুলে, পিছনে চলছিল সঙ্গী দু'জন, কিছুই যেন ঘটেনি এমনিভাবে। পথে পড়ে মানুষটাকে দুমড়ে মুচড়ে কাতরাতে দেখে, বমির সঙ্গে রক্ত তুলতে দেখে, রাম শ্যাম গোড়াতে ভড়কেই গিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু যদু মধুরা এসে পড়বার আগেই কাছাকাছি খানা থেকে আঁচলা ভরে জল এনে ভৈরবের মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিতেও আরম্ভ করেছিল।

দু'হাতে পেট চেপে ভৈরবের বেঁকে তেবড়ে যাওয়া কিছুতে কমছে না দেখে সবাই পরামর্শ করে চলতি এক গরুর গাড়িতে চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

আর ভৈরবের এমনি সৌভাগ্য যে, এই অসময়ে বাড়িতে দিবানিদ্রা দেওয়ার বদলে স্বয়ং কুঞ্জ ডাক্তার হাসপাতালে হাজির ছিল। কৈলাসের প্রতিনিধি বলাই-এর সঙ্গে কুঞ্জ ডাক্তারের কুইনিন সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল একটা।

হাসপাতালে পৌঁছেই আরেকবার বমি করে ভৈরব। একগাদা তেলে-ভাজার সঙ্গে উঠে আসে এক গাদা রক্ত। কুঞ্জ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করতে করতে শুধোয়, কি হয়েছে?

মধু বলে, রাস্তায় পড়ে ছটফট করছিল আর রক্ত-বমি করছিল ডাক্তারবাবু। আমরা তুলে এনেছি।

যদু বলে, কারা না কি মার-ধোর করেছে।

শ্যাম বলে, পেটে লাথি মেরেছে এক জন।

রাম বলে, ছি, ছি, পেটে এমন লাথি মানুষ মারে মানুষকে! মরে যদি যায়।

কুঞ্জ ডাক্তার বলে, লাথি মেরেছে? কে লাথি মেরেছে? ধরতে পারলে না তোমরা তাকে?

রাম বলে, আজ্ঞে, লাথিটা মারলেন কৈলাসবাবু।

শুনে বলাই বলে, হুম্।

শ্যাম বলে, মোরা দু'জন আসতেছিলাম, কাছে যেতে যেতে লাথি মেরে কৈলাসবাবু চলে গেলেন সাথের লোক নিয়ে।

আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। থামো বাবু তোমরা একটু, লোকটাকে দেখতে দাও! বলে কুঞ্জ ডাক্তার গম্ভীর মুখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভৈরবকে পরীক্ষা করে, লোক-দেখানো অনাবশ্যক পরীক্ষাও করে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি দিয়ে। বমিটা ভাল করে দেখে। তার পর সে রায় দেয়, কলিক। কলিক হয়েছে।

বলাই বলে, আঃ! তাই বটে। পেট চেপে ধরে মোচড় খাচ্ছে দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

রাম শ্যাম যদু মধুদের শুনিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার বলে, কলিকের ব্যথা উঠেছে। কলিকের ব্যথা হল, যাকে তোমরা শূল বেদনা বলো। ঠেসে তেলেভাজা খেয়েছে, দেখছো না বমি তেলেভাজায় ভর্তি?

মধু বলে, কিন্তু ডাক্তারবাবু—ও রক্তটা?

কলিকে রক্ত ওঠে।

যদু বলে, পর্শু মোকে শূল বেদনায় ধরেছিল ডাক্তারবাবু। রক্ত তো ওঠেনি? বমি হতে পেট ব্যথাটা নরম পড়ল।

রোগের লক্ষণ সবার বেলা এক রকম হয় নাকি?

শ্যাম বলে, আমরা যে দেখলাম ডাক্তারবাবু লাথি মারতে?

দেখেছো তো বেশ করেছো। ডাক্তারের চেয়ে বেশি জানো তুমি? লাথি কে মেরেছে কে মারেনি জানি না বাবু, তেলেভাজা খেয়ে ওর কলিকের ব্যথা উঠেছে।

রাম বলে, কৈলেসবাবু লাথি মারতেই পড়ে গেল, রক্ত-বমি করতে লাগল—

যাও দিকি তোমরা, যাও। যাও, যাও, বাইরে যাও, ভিড় করো না। ওষুধ-পত্তর দিতে দাও মানুষটাকে, চিকিৎসা করতে দাও। বেরোও সব এখান থেকে।

রাম শ্যাম যদু মধুরা হাসপাতালের প্রাঙ্গণে নেমে যায়। ভৈরব দুমড়াতে মোচড়াতে থাকে হাসপাতালের দু'টি লোহার খাটের একটিতে। আরেক বার সে

বমি করে। এবার তেলেভাজা ওঠে কম, রক্ত ওঠে বেশি। মনে হয়, রক্ত বমি করে তার পেট ব্যথা বুঝি একটু নরম হয়েছে তার ছটফটানি অনেকটা কমে আসে।

বাইরে থেকে গুঞ্জন কানে আসে কুঞ্জ ডাক্তারের, বাড়ি যাবার জন্য হাসপাতাল থেকে বেরোতেই ক্রুদ্ধ ঝাপ্‌টার মত এসে লাগে গুঞ্জনধ্বনিটা। ইতিমধ্যে রাম, শ্যাম, যদু মধুদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তেঁতুলগাছটার তলায় জোট বেঁধে তাদের উত্তেজিত আলোচনা চলছে। একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতেই তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে পাশ কাটিয়ে খানিক তফাৎ দিয়ে কুঞ্জ ডাক্তার এগিয়ে যায়।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমের আয়োজন করছে কুঞ্জ ডাক্তার, সেই উদ্ধত ক্রুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি দূর থেকে এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়ায় তার বাড়ির দরজার সামনে।

বাইরে থেকে হাঁক আসে: ডাক্তারবাবু! ও ডাক্তারবাবু! শূলবেদনার রুগী এসেছে আর একজন—কলিকের রুগী।

ভয়ে বিবর্ণ কুঞ্জ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বাইরে গিয়ে দেখতে পায়, তারই সদরের চৌকাটে মুখ থুবড়ে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গোঙাচ্ছে কৈলাস। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

রাম শ্যাম যদু মধুরা বলে, পোলাও মাংস খেয়ে শূলবেদনা ধরেছে ডাক্তারবাবু, কলিক হয়েছে।

শিল্পী

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মত বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মত হন্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দু'দিনে, রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টনটন করে একধরনের উদাসকরা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্নাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনি ধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বৌকে সাথে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু'একখানা ভাল, মদন তাঁতির নাম করা বিশেষ রকম ভাল, কাপড় বুনে দেবার ফরমাস যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে যোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাকাটির মত রোগা। মদনের হাউমাউ চীৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু'বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কি ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে মেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ার বদলে বসে আসে পা'টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘসে। খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মত।

ভুবন পরামর্শ দেয়: উঠে হাঁটো দু'পা। সেরে যাবে।

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশে পাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতিপাড়ার মেয়ে পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে: কি হল গো? বলি হল কি?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বৌটা তার ন'মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বৌকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতি গতির কথা, সবার মত মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বৌ যে না, একগুয়েমী তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দু'চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজী হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কি যন্তনা, বাপ্, একদম যেন মিত্যু যন্তনা, মরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনে টুনে ঠিক করে দিলেন পা'টা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বৌ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই

ছিলেন তা এলেন ভাল তাইতো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা'টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতির বৌয়ের মুখকে তার বড় ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মত। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও—উত্তরে একটা আম গাছের ওপাশে, যার দু'পাশের ডালপালা দু'জনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আটহাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড় ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থম থম করছে: শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িক ভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, ক'খানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ওসব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন!

গগনের বৌ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে! কত ঢং জানে বুড়ো।

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থাম না বুনোর মা? অত কথায় কাজ কি। যন্ত্রনা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এসব কথা—এসব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড় বোকা।

মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস-না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কি? মিহির বাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, একি কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না ওদের! সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্রির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?

নইলে ইদিকে সে পড়তা থাকে না বাপু। কি দরে সুতো কেনা জানো? ভুবন আপসোসের শ্বাস ফেলে, যাক গে, কি করা যাবে। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কি। বুঝিতো সব কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দু'দিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভাল সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপসোস করবে আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসি এসে ঘুর ঘুর করে আশে পাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

ছেলে মেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলে পিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না মদনও বোঝে না। ছেলে মেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের

মত। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরীর বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসী বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মত ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মস্করা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বৌ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভাল বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুসড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভাল।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে!

মদনের মা বৌ ফিরে আসে গুটি গুটি, পেটের ভারে মদনের বৌ থপ থপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে ক'দিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরানো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনো পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল থাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জট বাঁধা চুল চোক্‌লা ওঠা ফাটা চামড়া এসব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড় বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ীর কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনী। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি! মদন তাঁতির কাপড়! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

বলল? বলল ওসব কথা? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড় বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বৌ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে : এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত !

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বৌও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙ্গুল গোঁপদাড়ির মধ্যে ভাঙ্গা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলের তাঁতি মহলে একটা কথা চলিত আছে : মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভাল বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য পশ্চিমে উঠবে-এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজী হয় আজ, কাল তাঁতি পাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড় খামখেয়ালী একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হাহুতাশ করে, এই লম্বাচওড়া কথা কয় যেন রাজামহারাজা !

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তার পরেই মাসির গলা : ও মদন, ছাখসে বৌ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড় বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বৌয়ের। কি হয়েছে মদনের বৌয়ের ? কি হতে পারে ? গুরুতর কিছু যদি হয়…

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বৌয়ের শরীরটা

কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্চ্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব ব্যাথাটাও উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগী এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে তু'মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না?

আথায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় তুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙ্গে না তাই আশ্চর্য।

এখনো গেলে না যে?

যাবো। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত? উদি আব্দার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড় বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বৌ?

ব্যাথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙ্গছে বেশি, ব্যাথা তেমন নয়। তুগ্‌গা বুড়ীকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমত ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ: ভাল কিছু বোনান না, একটু দামী কিছু? সুতো নেই বুঝি?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসী ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?

বেনারসী? বেনারসী না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপসোসের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসী জীবনে বুনিনি।

একঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভাল কাপড়, দামী কাপড় বুনে দিতে হবে! এর চেয়ে কেশবের মত গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কি যেন টেনে ধরে

তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমত ব্যাথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বৌটা গোঙ্গাচ্ছে একটানা।

কি করবে মদন তাঁতি ?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুরশিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁত ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক্, ঠকাঠক্। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে শব্দ পৌছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপাল ? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব ?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে ?

তা ছাড়া কি আর ? কেশব জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, রাতদুকুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধ্ মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে ? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি ?

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙ্গেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি ?

আয় দেখবি।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বাণ্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতি পাড়ায় অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারো চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন তাঁতির বৌটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয়: ভুবনের ঠেঁয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপি চুপি?

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

কংক্রীট

সিমেণ্ট ঘাঁটতে এমন ভাল লাগে রঘুর। দশটা আঙ্গুল সে ঢুকিয়ে দেয় সিমেণ্টের স্তূপে, দু'হাত ভর্তি করে তোলে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ঝুর ঝুর করে ঝরে যায়। হাত দিয়ে সে থাপড়ায় সিমেণ্ট, নয় শুধু এলোমেলোভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করে! যোয়ান বয়সে ছেলেবেলার ধূলোখেলার সুখ। কখনো খাবলা দিয়ে মুঠো করে ধরে, যতটা ধরতে চায় পারে না, অল্পই থাকে মুঠোর মধ্যে। হাসি ফোটে রঘুর ঠোঁটে। এখনো গঙ্গামাটির ভাগটা মেশাল পড়েনি—ও চোরামিটা কোম্পানি একটু গোপন করে। কি চিকন মোলায়েম জিনিসটা, কেমন মিঠে মেঘলা বরণ। মুক্তার বুক দু'টির মত। বলতে হবে মুক্তাকে তামাসা করে, আবার যখন দেখা হবে।

এই শালা খচ্চর!

গিরীনের গাল, ছিদামের নয়। ছিদাম বিড়ি টানছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, ব্যাটার তিনটে আব বসানো কিম্ভুত মুখ দেখলে গা জ্বলে যায় রঘুর, গাল শুনলে আরো বেশি। রুমাল-পোঁছা আসছে বুঝি তার চাকে পাক দিতে, ব্যাটা হলো বোলতা, গিরীন্ তাই সামলে দিয়েছে তাকে। চট্ করে কাজে মন লাগায় রঘু। গিরীনকে ভালো লাগে রঘুর, লোকটা হলো বেড়ালের মত রগ-চটা আর বেঁটে-খাটো ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে হলেও। যত বদমেজাজী হোক, যে কোনো হাসির কথায় হা হা করে হাসে যেন শেয়াল ডাকছে ফুর্তির চোটে। আবার কারো দুঃখদুর্দশার কথা শুনলে বাঘের মত গুম হয়ে যায়, মাঝে মাঝে গলা খাকারি দেয় যেন রোলার মেসিনে পাথর গুঁড়োচ্ছে মড়মড়িয়ে।

রুমাল-পোঁছা এলো না দিকি?

না।

এলো না এলো, তোর কিরে বাপ্পোত্? ছিদাম বলে দাঁত খিঁচিয়ে, ওনার আর কাজ নেই, তোর কাজ দেখতে আসবেন? আমি আছি কি কর্তে?

কথা না কয়ে খেটে যায় রঘু। পোঁছাবাবু আসে এদিক-ওদিক তেরচা চোখে চাইতে চাইতে, দু'বার রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছে ফেলে দশ পা আসতে আসতেই। তার গালভরা নাম বিরামনারায়ণ—এই মুদ্রাদোষে চিরতরে তলিয়ে গিয়ে হয়েছে রুমাল-পোঁছা, সংক্ষেপে পোঁছাবাবু। গিরীন, গফু, ভগলু, নিতাই, শিউলালেরা একটু শক্ত বনে' গিয়েই কাজ করে যায়, ছিদাম যেন খানিকটা নেতিয়ে বেঁকিয়ে যায় পোষা কুকুরের ঢংএ, উৎসুখ চোখে তাকায় বারবার মুখ তুলে, লেজ থাকলে বুঝি নেড়ে দিত।

তোর ওটা এখন হবে না গিরীন, সাফ কথা। হাঙ্গামা মিটলে দেখা যাবে।

দু'মাস হয়ে গেল বাবু। হাঙ্গামার সাথে মোর ওটার—

বাস, বাস। এখন হবে না। সাফ কথা।

রুমালে মুখ পুঁছে এগিয়ে যায় পোঁছাবাবু। রগ-চটা গিরীন রাগের চোটে বিড় বিড় করে বুঝি গাল দিতে থাকে তাকে। ছিদাম একটু অবাক হয়ে ভাবে যে দুপুরের ভোঁ পড়ার মোটে দেরী নেই, টহল দিতে বার হল কেন পোঁছাবাবু অসময়ে। ভোঁ-এর টাইম হয়ে এলে কাজে ঢিল পড়ে কেমন, ফাঁকি চলে কি রকম দেখতে? দেখবে কচু, পোঁছাবাবু টহলে বেরোলে টের পায় সবাই। এর বদলে তাকে ডেকে শুধোলেই সে বলে দিতে পারত সব!

খিদেয় ভেতরটা চোঁ চোঁ করছে রঘুর, তেষ্টায় কিনা তাও যেন ঠিক আন্দাজ করা যায় না, ঘেমে ঘেমে দেহটা লাগছে যেন কলে মাড়া আখের ছিবড়ে। ভোঁ-র জন্য সে কান পেতে থাকে। আগে মুখ হাত ধোবে না সোজা গেটে চলে যাবে, বন্ধ গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে চানা কিনবে না মুড়ি কিনবে, আগে পেট পুরে জল খাবে না দু'মুঠো খেয়ে নেবে আগে, এই সব ভাবে রঘু। মুক্তাকে এনে রাখতে পারলে হত দেশ থেকে, রোজ পুঁটলি করে খাবার সাথে দিত বেন্দার বৌটার মত। বৌ একটা বটে বেন্দার! রঙে ঢঙে ছেনালিতে গনগনে কি বাস্ রে মাগীটা, মুক্তার মত কচি মিষ্টি নয় যদিও মোটে। তবে পুঁটলি করে বেন্দাকে খাবার দেয় সাথে রোজ, রুটি চচ্চড়ি ভাজা, নয়তো ঝাল ঝাল শুখা ডাল, নয়তো চিচিঙার পেঁয়াজ ছেঁচকি।

হঠাৎ বড় শ্রান্ত, অবসন্ন লাগে নিজেকে রঘুর। সে জানে এ রকম লাগলে কি ঘটবে এখুনি। কাশি আসছে। আঁতকানির মত একটা টান লাগে ভেতরে, তারপর শুরু হয় কাশি; কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে রঘু। হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ে, দু'হাতে শক্ত করে নিজের হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতেই মুখ গুঁজে দেয়। এমনি করে

আস্তে আস্তে শ্বাস টানবার চেষ্টা করলে কাশীটা নরম পড়ে, এক দলা সিমেণ্ট-রঙা কফ উঠে আসবার পর কাশিটা থামে।

গিরীন গুম হয়ে তাকিয়ে থাকে বাঘের মত, গলায় দু'বার খাঁকারি দেয় আড়ালের রোলার মেসিনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আমি সাতবচ্ছর খাটছি, তুই শালা দু'চার বছরে খতম হয়ে যাবি।

ট্যাঁক ফ্যা ফ্যা করছে রঘুর, পয়সা নেইকো। বেন্দার ট্যাঁকে দু'এক টাকা আছেই সব সময়, মাল টেনে এত পয়সা ওড়ায়, তবু। রঘু তাই দু'এক আনা ধার করতে যায় বেন্দার কাছে আর তাই সে দেখতে পায় রোলার মেসিনে কেষ্ট বাতাপির পিষে থেঁতলে যাবার রকমটা।

মাটিতে শিকড়-আঁটা গুমোটের গাছের মত রঘু নড়ে চড়ে না, মুখ হাঁ হয়ে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সরে পড়তে গিয়ে তাকে ছাখে বেন্দা, দাঁতে দাঁত ঠেকে গিয়ে খিঁচে উঠে ছিরকুটে যায় বেন্দার মুখ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সাপের হিস্‌হিসানির আওয়াজে সে বলে, যা যা, ভাগ। পালা শীগগির।

দিশেহারা রঘু পালাতে গেলে কিন্তু ফের তাকে ডেকে বেন্দা বলে, শোন্। এখানে এইছিলে খপর্দার বলিসনি কাউকে, মারা পড়বি—খপর্দার।

পাতা হয়ে ঝড়ে উড়ে যেন রঘু ফিরে আসে নিজের জায়গায়, রঘুর প্রাণটা আর কি, নয় তো ফেরে সে পায়ে পায়ে হেঁটেই। মেঘলা গুমোটের কাল ঘাম ছুটেছে, সেটা দেখা যায়। ভাবসাব দেখে মনে হয়, কাশির ধমকটা ঝাঁকি দিয়ে গেছে তাকে, কাবু করে দিয়েছে। কিন্তু রঘু ভাবে তার ভেতরের উল্টেপাল্টে পাক খাওয়াটা বুঝি চোখে পড়েছে সকলের, এই বুঝি কে শুধিয়ে বসে, ব্যাপারখানা কি রে!

জল খেলি? গিরীন শুধোয় বাপের মত স্বরে।

হাঁ খেলাম।

প্রথম ভোঁ বাজে দুপুরের। হাঁপ ফেলবার, ঢিল দেবার, জল চানা খাবার এতটুকু অবকাশ। দমে আর হাত পায়ে একটু ঢিল পড়ে, মনটা শিথিল হবার সুযোগ পায় না কারো। হবু ধর্মঘট নিয়ে ব্যগ্র উত্তেজিত হয়ে আছে মজুরেরা, ও ছাড়া চিন্তা নেই, আলোচনা নেই। তার মধ্যে খবর ছড়ায় দুর্ঘটনার, কি তাড়াতাড়ি যে ছড়ায়। কেষ্ট বাতাপি রোলার মেসিনে পিষে খেতলে মারা গেছে খানিক আগে—এ খবর যে শোনে সে গুম হয়ে যায় খানিকক্ষণের জন্ত, তারপর

অকথ্য বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, এটা কি রকম হল? হু হু করে উত্তেজনা বেড়ে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে থাকে উত্তেজনার, সবার কথার মোট আওয়াজটা নতুন রকমের ধ্বনি হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে খবর পেয়ে কয়েকজন যারা ছুটে গিয়েছিল দেখতে, তারাই শুধু দেখতে পেয়েছে কেষ্ট বাতাপির ছেঁচা দেহটা, জিজ্ঞেস করে ভাসাভাসা শুনতে পেয়েছে কিসে কি ঘটল। তারপর খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকে ওখানে গণ্ডগোল করা বারণ হয়ে গেছে।

ছিদাম বলে, আহা রে! বিষ্যুৎবারের বারবেলায় পেরাণটা গেল কপাল দোষে।

রগচটা গিরীন যেন চটেই ছিল আগে থেকে, শুনেই গর্জে ওঠে, বারবেলার কপাল দোষ! পোঁছা বুঝি বলেছে তোকে বলে বেড়াতে? পোঁছার পা-চাটা শালা মাগী বুড়ো! পোঁছা খুন করিয়েছে কেষ্টকে, জানিস্? বজ্জাত শকুন তুই, চুপ করে থাক।

ছিদাম সরে পড়ে, চমক লেগে, চমৎকৃত হয়ে। কৌতূহলে ফেটে পড়ে তার মনটা। এদিক-ওদিক ঘোরে সে, ছাড়া ছাড়া কথা শুনতে ছোট ছোট দলের উত্তেজিত আলোচনার। কাছে যেতে তার ভরসা হয় না। সবাই হয় তো চুপ হয়ে যাবে, কেউ তাকাবে আড়চোখে, কেউ কটমটিয়ে। যে টুকু সে শোনে তাতেই টের পায়, শুধু গিরীন নয়, অনেকেই বলাবলি করছে ষড়যন্ত্র—গোপন কারসাজির কথা।

আরেকবার ভোঁ বাজে। যে যার কাজে যায়। যন্ত্রের একটানা গম্ভীর গর্জনে চাপা পড়ে যায় বটে কথার গুঞ্জন কিন্তু খাটুনেদের কানাঘুষা চলতে থাকে কাজের মধ্যেই।

ছিদাম আমতা আমতা করে বলে, একটা কথার হদিস পাচ্ছি না, তোকে শুধাই গিরীন। কেষ্ট ভিন্ন ডিপার্টে, রোলার মেসিনে ও গেছল কেন?

বদলি করল না ওকে ক'রোজ আগে? এই মতলব পোঁছা শালার, খুনে ব্যাটা।

হাঁ—? বটে—?

কি তবে? গিরীন ফের চটে যায়, গিরীন, কি বলতে চাস তুই? এক রোজ যে কাজ করেনি সে কাজে বদলি করবার মানেটা কি?

রঘু শোনে। তার খাপছাড়া ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মানে পেয়ে পেয়ে বীভৎসতক হয়ে উঠছিল আগে থেকেই, গিরীনের কথায় মানে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

ছিদামও তাই ভাবছিল।

ম্যানেজারের ডান হাত পোঁছাবাবু। কিছুদিন আগেও বড় খুশি ছিল পোঁছাবাবু তার ওপর। কত গোপন কথা পোঁছা জেনে নিত তার কাছে, ওপরের কত গোপন ব্যাপারের হদিস তাকে দিত, সেই সঙ্গে খোলা হাতে বোতল বোতল মদের দাম বখশিস্। সে রকম অনুগ্রহ পোঁছাবাবু আর তাকে করে না আজকাল, যদিও ছোটখাট দয়া আজও তার জোটে, ছোটখাট কাজে সে লাগে। দোষ তার নিজের। সবাই জেনে গেল তার ব্যাপার আর সাপের মত বিছার মত তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, ফলে আজ তার এই অবস্থা। তার নিজের গোখুরি ছাড়া আন্দাজ কি করতে পারত কেউ। আপসোসে বুকটা বিছার বিষে জ্বলে যায় ছিদামের। নিজের ঘরে সিঁদ দেওয়ার মত কি বোকামিটাই সে করেছে। ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে খাতির করে জানিয়ে জানিয়ে খাতিরের সাঙ্গাতদের কাছে নিজের নাম বাড়াবার কি ভূতটাই চেপেছিল তার ঘাড়ে। তা না হলে কি জানাজানি হয় আর এমনভাবে তার খাতির কমে যায় পোঁছাবাবুর কাছে। বড় বেশি মাল খাচ্ছিল সে কাঁচা টাকা পেয়ে পেয়ে, মাথার তার ঠিক ঠিকানা ছিল না কিছু, বিগড়ে গিয়েছিল একদম! একটু যদি সে সামলে চলত, কর্তারা তাকে খাতির করে এটা চেপে গিয়ে যদি বলে বেড়াতে ওপোর থেকে তাকে পিষে মারছে, আজ কি তাহলে তার অগোচরে কেষ্ট বাতাপিকে রোলার মেসিনে পিষে মারবার ব্যবস্থা করতে পারত পোঁছাবাবু, কয়েকটা নোট তার পকেটে আসত না!

জ্বালা যেন সয় না ছিদামের। এত পাকা বুদ্ধি নিয়ে বোকামি করে সব হারাল, এখন যে একটা চাল চালবার বুদ্ধি গজাচ্ছে মাথায় সেটাকে দাবিয়ে রেখে ফের কি একটা সুযোগ হারাবে বোকার মত। উসখুস করতে করতে এক সময় মরিয়া হয়ে সে বেন্দার কাছে যায়। ভয়ে এদিকে বুকটা কাঁপেও।

কি যে বোকার মত কাজ করিস বেন্দা। চুপি চুপি বলে সে বেন্দাকে।

সরু সরু লাল শিরায় আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বেন্দা বলে, কি বলছ? বোকার মত কি কাজ?

সবাই কি বলাবলি করছে জানিস?

কি বলাবলি করছে? চমকে আঁতকে ওঠে বেন্দা।

হুঁ, হুঁ, ছিদাম মুচকে হাসে প্রাণপণ চেষ্টায়, আরে বাবা, আমার কাছে চাল মারিস কেন? পোঁছাবাবু আমাকে জানে, আমি পোঁছাবাবুকে জানি। সবাই কি বলাবলি করছে জানা দরকার পোঁছাবাবুর।

বেন্দা ঢোক গিলে গিলে ভাবে। তারপর বলে, চলো বলবে চলো পোঁছাবাবুকে।

পোঁছাবাবু বলে, কিরে ছিদাম, খবর আছে?

আজ্ঞে।

পোঁছাবাবু তাকে বসতে বলে, চেয়ারে! প্রায় রোমাঞ্চ হয় ছিদামের বুড়ো শরীরে। চাল খেটেছে তার। কাজে আর সে লাগে না, দরকার তার ফুরিয়ে গেছে, তবু এ ব্যাপারের কিছু সে টের পেয়েছে ধরে নিয়ে একটু কি খাতির তাকে করবেন না পোঁছাবাবু,—ভেবেছিল সে। ঠিকই ভেবেছিল। নিজের পাকা বুদ্ধির তারিফ করে ছিদাম মনে মনে।

যেন আলাপ করছে এমনিভাবে পোঁছাবাবু তাকে জেরা করে। সে টেরও পায় না পোঁছাবাবু কি করে জেনে নিচ্ছে যে সবাই খোলাখুলিভাবে যা বলাবলি করছে তাও সে ভালরকম জানে না, পোঁছাবাবু তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে এর মধ্যেই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে প্রতিবিধানের।

গালে প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে সে বুঝতে পারে চালাকি তার খাটেনি, আরেকটা সে বোকামি করে ফেলেছে।

তবে সে আপনার লোক, যতই বোকা হোক। দুটো টাকা হাতে দিয়ে পোঁছা বলে, কাজ করবি যা। বজ্জাতি করিস না কংক্রীটের গাঁথনি উঠছে, ওর মধ্যে পুঁতে ফেলবে তোকে।

কাজে যখন ফিরে যায় ছিদাম, মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথায় শুধু আছে যে আজ আস্ত একটা বোতল কিনে খাবে, দুটো টাকা তো দিয়েছে পোঁছাবাবু। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে। এবার থেকে সে ওদের দলে।

—শোন বলি গিরীন। কেষ্টকে ওরা মেরেছে টের পেয়েছি। আমি সাক্ষী দেব তোদের হয়ে।

তোর সাক্ষী চাই না।

অতি রহস্যময় দুর্ঘটনা, অতি সন্দেহজনক যোগাযোগ। মুখে মুখে আরও তথ্য ছড়িয়ে যায়, রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে আসে। গোবর্ধন নাকি সময়মত এসেও কার্ড পায়নি ভেতরে ঢুকবার, সে তাহলে উপস্থিত থাকত দুর্ঘটনার সময়, যদি না কোনো ছুতায় সরিয়ে দেওয়া হত তাকে,—নাসিরকে যেমন ঠিক ওই সময় পোঁছা ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য বিষয় নিয়ে বকাবকি করার জন্য। হানিফ ছুটির জন্য

ঝুলোঝুলি করছিল আট দশ দিন থেকে, হঠাৎ কালকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পিষে থেঁতলে মরল কেষ্ট বাতাপি কিন্তু একজনও তার মরণ-চীৎকার শোনেনি, মেসিনের আওয়াজ নাকি চাপা দিতে পারে মরবার আগে মানুষের শেষ আর্তনাদকে! সোজাসুজি প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু সবাই জানে মনে মনে কেষ্ট দুর্ঘটনায় মরেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যানেজারের, রুমাল-পৌছার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল কেষ্ট, বুঝতে কি বাকী থাকে কারো কেন তাকে মরতে হল, কি করে সে মরল।

রঘু টের পায়, ক্ষোভে আপসোসে অনেকে ফুঁসছে মনে মনে গিরীনের মত যে, এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার জোরে পৌছার টুঁটি টিপে ম্যানেজারকে চেপে ধরে বাধ্য করা যায় পুরো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী মানতে।

সে পারে। একমাত্র সে-ই শুধু পারে ওই অস্ত্রটি ওদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বড় যে এক খটকা আছে রঘুর মনে। কারসাজি কি ফাঁস হবে ওপরওলাদের? আটঘাট বেঁধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কি করে রাখেনি ওরা ধরি মাছ না ছুঁই পানির কায়দায়? কোনো যোগসাজস কি প্রমাণ করতে পারবে কেউ? অস্ত্রটা শুধু পড়বে গিয়ে বেন্দার গর্দানে। আর কেউ যদি হত বেন্দা ছাড়া--

গাঁয়ের মানুষ, বন্ধু মানুষ। পয়সা ধার চাইলে কখনো না বলে না, ঘরে বোতল খুললে তাকে ডেকে দু'পাত্র খাওয়ায়। রানী খুশি হয় তাকে দেখলে, এসো বোসো বলে ডেকে বসায় আদর করে, ঘরে রাঁধা এটা ওটা খাওয়ায়, হাসি তামাসা রঙ্গরসে মসগুল করে রাখে। মুক্তার জন্য বুকটা যে খাঁ খাঁ করে তার, তাও যেন ভুলিয়ে দেয় রানী। ওর চলন ফিরন নরনচরন দেখে রক্ত তাজা হয়ে ওঠে তার, বুকের মধ্যে কেমন করে। আর কি বুঝদার মেয়েটা, কত আপন ভাবে তাকে। ক'দিন আগে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সে যে বলা নেই কওয়া নেই জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, সে রাগ করেনি, শুধু একটা ধমক দিয়েছিল। বেন্দাকে কিছু বলেনি, নিজে তফাৎ হয়ে থাকেনি আগেরই মত হাসি খুশি আপন ভাব বজায় রেখেছে।

কিন্তু বেন্দা শুধু খুন করেনি কেষ্ট বাতাপিকে পৌছার টাকা খেয়ে, সে দালাল এই ছিদামের মত। ট্যাঁক তার ফাঁকা থাকে না কখনো, ঘরে বাইরে সে বোতল বোতল মাল টানে, মিহি শাড়ি কিনে দেয় রানীকে, সব পাপের যা সেরা পাপ তারই টাকাতে। রঘুর মাথার মধ্যে বিছার হুলের মত বিঁধে থাকে এই চিন্তা।

ছুটির পর ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মানুষগুলি কেষ্ট বাতাপির দেহটা দাবী করে। ওকে যারা মেরেছে আজ তাদের মারা না যাক, শোভাযাত্রা করে কেষ্টকে তারা শ্মশানে

নিয়ে যাবে। এদের মধ্যে নিজেকে কেমন একা আর অসহায় মনে হয় রঘুর। দুর্বল অবসন্ন লাগে শরীরটা, মুখটা এমন শুকনো যে ঢোক গেলা যায় না। মাথার মধ্যে রোলার মেসিনের ঘর্ঘর আওয়াজ চলে, জ্যান্ত একটা মানুষের খুলি চুরমার হয়ে যায় প্রচণ্ড শব্দে, তারপর সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের নরম মাংস ছেঁচে যাবার রক্তাক্ত শব্দহীনতায়।

বস্তিতে নিজের ঘরটিতেও সে একা। অন্যঘরের বাসিন্দাদের হৈ চৈ বেড়েছে সন্ধ্যার সময়, রোজ যেমন বাড়ে। গলির ওপারে দুটো বাড়ির পরের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছিদামের গলা-ফাটানো বেসুরো গান, এর মধ্যে বুড়ো নেশা জমিয়েছে। একটানা কোঁদল চলছে সামনের বাড়ির তিন-চারটি স্ত্রীলোকের, ওদের মধ্যে কুঞ্জার বয়স গড়ন মুক্তার মত, গলাটা কিন্তু ফাটা বাঁশীর মত—ভাঙ্গা। সন্ধ্যার সময় বাড়ি যেতে বলে বেন্দা কি দরকারে কোথায় গেছে। যাবে জেনেও রঘু মনে মনে নাড়াচাড়া করে, না গেলে কেমন হয়। রানী তাকে টানছে, এখন থেকেই টানছে জোরালো টানে। এই যে তার একা একা মন খারাপ করে থাকা, রানী যেন ম্যাজিকে সব উড়িয়ে দেবে। তবু সে ভাবছে, না গেলে কেমন হয়! মনটা তার বিগড়ে গেছে বেন্দার ওপর, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠছে। সোজা সহজ একটা কথা বার বার মনে পড়ছে যে এ সব লোকের সাথে দহরম-মহরম রাখতে নেই, হোক গাঁয়ের মানুষ, হোক বন্ধু মানুষ, চোর ডাকাত খুনের চেয়ে এরা বদ, এদের সাথে থাকলেই বিপদ। রানী যদি বেন্দার বউ না হত—

মালতীর ন' বছরের মেয়ে পুষ্প এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়ীর মত বলে, কিগো, আজ রাঁধবে না?

ব'লে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকে জবাবের। অসুখবিসুখ যদি হয়ে থাকে, যদি আলসেমি ধরে থাকে না রাঁধবার, যদি বলে, দুটি রেঁধে দিবি পুষ্প, সে ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনবে। পুষ্পর আজ পেটটা ভাল করে ভরবে। উঠোনে পা ঝুলিয়ে ভিজে দাওয়ায় বসে বাতাসের সঙ্গে বকাবকি করছে পুষ্পর মা মালতী। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে, ঠ্যাং ছিঁড়ো না, ঠ্যাং ছিঁড়ো না বলছি! ওবছর পুষ্পর বাপ লক্ষণের পা আটকে গিয়েছিল কলে, পা'টা কেটে ফেলতে হয়েছিল পাছার নিচে থেকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

আলসেমি লাগছে পুষ্প।

মাকে ডাকি ? বলেই পুষ্প ছুট দেয় রঘুর সায় শুনবার আগেই।

রানী আসে রঘুকে ডাকতে।

যাওয়ার যে চাড় দেখি না, হাপিত্যেশ বসে আছে লোকটা ঢেলে টুলে ?

চলো যাই।

গলিতে নেমে ছিদামের গান আরও স্পষ্ট শোনা যায়, কথাগুলি জড়ানো। নেশা আরও চড়িয়ে চলেছে ছিদাম। নয় তো মিনিট কয়েক চেঁচানোর পর সে ঝিমিয়ে যায়, আশেপাশের লোক স্বস্তি পেয়ে বলে, যাক্, শ্যাল শকুনের কোঁদল থামল।

গলি থেকে আরও সরু গলি, তার মধ্যে ঘর বেন্দার কাছেই। লণ্ঠনের আলোয় ফূর্তির সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছে বেন্দা! ভাঁড়ের বদলে আজ কাঁচের গেলাস, কিনেই এনেছে বুঝি। খুরিতে ঝাল মাংস, কাগজে ডাল বাদাম। জলের বদলে চারটে সোডা।

হুঁ হুঁ বাবা, আজ খাঁটি বিলিতি, দামী চিজ্।

কফে গলাটা ধরা ছিল বেন্দার, রঘু ঘড়ঘড় আওয়াজ পায়। একদিনে যেন বেন্দার মুখটা আরও ছুঁচোল হয়ে চামড়া আরও বেশি কুঁচকিয়ে গেছে। মিহি শাড়িটা পরেছে রানী, তলায় বুঝি সালুর সেমিজ, রঙ বেরোচ্ছে। দানা দানা মিহি বুদ্‌বুদ্ উঠছে ভর্তি গেলাসের টলটলে রঙীন পানীয় থেকে।

ঢেলে বসে আছি তোর জন্যে। মাইরি ঠেকাইনি ঠোঁটে।

আজ তার বিশেষ খাতির। হবে না কেন, হওয়াই উচিত। গেলাস তুলে এক-চুমুকে শেষ করে ফেলে রঘু হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে, হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেদিন যেমন সাপটে ধরেছিল রানীকে।

আরে আরে, রয়ে সয়ে খাও। রানী বলে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে তার কাণ্ড দেখে।

বেন্দা বোতল থেকে তার গেলাসে মদ ঢেলে দেয়, খানিকটা সোডা দিয়ে খানিকটা জল মেশায়, সোডায় কুলোবে না।

নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, বাপস! ভাগ্যে এলি এলি তুই এলি আচমকা অন্য কেউ নয়! প্রাণটা লাফিয়ে উঠেছিল কপাতে মানুষ দেখে, তারপর দেখি তুই। ধড়ে প্রাণ এল। আরও দু'বার চুমুক দেয়, খানিকটা বেপরোয়াভাবে বলে, তবে, কি আর হত! একটু হাঙ্গামা, বাস। পোঁছাবাবু ঝানু লোক, ঠিক করে নিত সব।

আরেক গেলাস ঢেলেছে সবে বেন্দা নিজের জন্য, লোক আসে পোঁছাবাবুর কাছে থেকে।

পোঁছাবাবু একবার ডেকেছে বেন্দাকে, এখুনি যেতে হবে, জরুরি দরকার। পোঁছাবাবু আছে ম্যানেজার সায়েবের কাছে, সেখানে যেতে হবে। ম্যানেজার সায়েব নিজের গাড়ি পাঠিয়েছে, বড় রাস্তার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।

ছুত্তেরি শালার নিকুচি করেছে। বেন্দা বলে বেজার হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তুই বোস রঘু, , খা। চটপট আসছি কাজটা সেরে। গাড়ি করে যদি না দিয়ে যায় তো—

বেন্দা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে রানী। টুক করে এসে উবু হয়ে বসেই বেন্দার খালি গেলাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে এক চুমুকে গিলে ফেলে জল বা সোডা না দিয়েই, ঝাঁঝে মুখ বাঁকিয়ে থাকে কতক্ষণ।

রঘুর চাউনি দেখে বলে, কি হল, খাও? হাত ঝাড়িয়ে গলাটা সে টিপে দেয় রঘুর।

ভাল করে বসে আরেকটু ঢালে, এবার সোডা মিশিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খায় একটু একটু করে। রঘুর গেলাস তুলে ধরে তার মুখে।

কাছে ঘেঁসে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, ওকে বোলো না খেয়েছি। ফিরে এসে নেশা চড়লে নিজেই ডাকবে, তখন একটুখানি খাব'খন দেখিয়ে। ফিরতে দেরী আছে একঘণ্টা তো কম করে।

গায়ে লেগে কানে কথা কয় রানী, তার মদ পেঁয়াজের গন্ধ ভরা নিঃশ্বাসে ঝড় ওঠে রঘুর মাথার রঙীন ধোঁয়ায়। গেলাস রেখে সে ধরে রানীকে।

রানী বলে, বাসরে, ধৈর্য নেই এতটুকু? গেলাসটা শেষ কর?

খালি গেলাস মদ সোডার বোতল নিজেই তফাতে সরিয়ে জায়গা করে মুচকে হেসে নিজে থেকেই সে নেতিয়ে পড়ে রঘুর বুকে।

আরেকটু মদ ঢেলে খায়, রঘুকে দেয়। বলে, আর তোমার ভাবনাটা কি? কত বিলিতি খাবে তুমি এবার নিজের রোজগারে। তুমি চালাক চতুর আছো ওর চেয়ে, ওতো একটা গোঁয়ার। এবার কত কাজে লাগাবে তোমায় পোঁছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি।

মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে রঘুর এতক্ষণ পরে।

যাই বাবা ওঘরে, কখন এসে পড়বে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে রানী আবার বলে, একটা কথা বলি শোন। তোমার জন্যেও পোঁছাবাবু টাকা দিয়েছে ওকে, চেয়ে নিও। ভাগ ছাড়বে কেন নিজের? এমনি হয়তো চেপে যাবে, কথায় কথায় বোলো, মোকে কিছু দিলে না পোঁছাবাবু? তাহলে দেবে। চোখ ঠেরে রানী হাসে, বাৎলে দিলাম, ভাগ দিতে হবে কিন্তু মোকে।

কানে ভালো লেগেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে থেঁতলে যাবার যে শব্দ সেই —তার মত। এই কাজ করতে হবে তাকে এবার, বেন্দা যা করে, ছিদাম যা করে। চুপ করে থাকলে তার চলবে না, পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে কাজে লাগাবে বেন্দার মত ছিদামের মত। এই তার পথ! আর একমুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনি ভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হন হন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে। মদের নেশার চেয়ে অন্য নেশাই হয়েছিল জোরালো। ছিদামের ঘরের কাছাকছি সে হোঁচট খায় একটা মানুষের দেহে। নেশার ঝোঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিদাম রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ তাকে তোলেনি। হোঁচট খাওয়ার রাগে একটা লাথি তুলে পা নামিয়ে নেয় রঘু। জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। তার ধৈর্য ধরছিল না কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—রোলার মেসিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্ত বেশি সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

রিক্সাওয়ালা

ময়দানে নধর পরিপুষ্ট গরুগুলি চড়িয়া বেড়াইতেছিল। ভদ্রলোক প্রথমে আঙ্গুল দিয়া কাছাকাছি কয়েকটি, তারপর হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা চারিদিকে ছড়ানো সবগুলি গরু দেখাইয়া বলিলেন, ওরা সব নাকি আদর্শবাদের জীবন্ত রূপক। জীবন্ত, বাস্তব ও প্রামাণিক রূপক। জীবন্ত যে তাতে আর সন্দেহ কি। বাস্তব প্রমাণেই। বাংলার সমস্ত গোহাটা, মাঠঘাট ও গো-পোষা গেরস্ত ঘরে প্রত্যক্ষ, শহর ও মফস্বলের দুধের স্বাদ-গন্ধ ভোলা বা স্বাদ-গন্ধ না-জানা ছেলেপিলেগুলির সংখ্যা ও চেহারায় তথ্যমূলক এবং চিতার ধোঁয়া ও কবরের মাটিতে পরোক্ষ প্রমাণ।—হোয়াট্, অঁা অঁা, হোয়াট? ঠিক না?

তার ঢুলু ঢুলু লাল চোখে জল আসিয়া পড়িল। না চাহিতে গছানো সরকারী বিবৃতির মত আমার পাঁজরে সজোরে আঙ্গুলের খোঁচা মারিয়া স্বীকার করিলেন যে, হুইস্কি খাইতেছিলেন। মোটে চার পেগ। নেশা হয় নাই। নেশা হয় না। নতুন কন্ট্রাক্ট পাইলে, বিলের টাকা পাস হইলে, ট্যাক্সের নোটিশ আসিলে ব্যাঙ্কে কত ছিল কত হইয়াছে আর কত হইবে ভাবিলে এবং এরকম আরও কতগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বুকটা তার ধড়ফড় করে, দিনের বেলাই খান। দিনে শুরু করা প্রায় অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নেশা হয় না। ময়দানে একটু হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন। ভগবান যদি দয়া করেন, ফিরিয়া গিয়া আর গোটা চারেক পেগ খাইলে সন্ধ্যাতক নেশা লাগিতে পারে।

বাঁচাই অসম্ভব দাদা। টাকায় দু'সের দুধ, তার অর্ধেক জল, তাও পাওয়া মুস্কিল। রিক্সাওয়ালা ছ'আনা নিলে—শালা ব্লাডি ডাকাত। ওই হোটেল আর এই মনুমেন্ট, এইটুকু আসতে ছ'আনা—ছ' ছ' গণ্ডা পয়সা! দেশ কি অরাজক?

ভদ্রলোককে নামাইয়া দিয়া রিক্সা রাখিয়া অ্যাসফল্ট দেওয়া ময়দানী ফুটপাথের

প্রান্তে ঘাসের রাজ্যে আসিয়া রিক্সাওয়ালা দু'হাতে পেট চাপিয়া উবু হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ কাশিয়াছিল মনে আছে, ঘুংরী কাশিতে যেমন হয় তেমনিভাবে হুস্‌প হুস্‌প শব্দে আটকানো দম টানিয়া টানিয়া। কেন কাশিয়াছিল জানি। রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে, দশটা মিনিট বসিয়া থাকিতে হয় না, বেশি রেটে ভাড়া মেলে, কতজন্মের পুণ্যফল! টাকার দামের পুরানো সংস্কারটা এখনো টিকিয়া আছে, টাকার দাম যে কমিতে পারে ধারণায় আসে না। খরচ বাড়িয়াছে, সেটা ঠিক কথা, কিন্তু ভিন্ন কথা।

তাই হরে দরে যাতে সমান না দাঁড়াইয়া যায় সে জন্য এরা খরচ কমাইয়াছে। খাওয়ার বাবদেই বেশি যায়, এ খরচটা ছাঁটিয়াছে মোটারকম। একদিন রাত এগারোটার পর কালীঘাট হইতে রিক্সায় টালিগঞ্জ যাইতেছিলাম। রেলের পুলটার কাছে হঠাৎ রিক্সা উল্টাইয়া ডিগবাজী খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলাম। খুব একচোট গালাগালি আর বিরাশী সিক্কা ওজনের একটা চড় বসাইয়া দিব স্থির করিয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখি, রিক্সাওয়ালা সটান মুখ থুবড়াইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে। চড় মারার বদলে পানের দোকান হইতে সরবতের গ্লাসে পান ধোয়া জল আনিয়া লোকটির সেবা করিতে হইল। মাথার উপরে আকাশে চাঁদটা ছিল প্রায় আস্ত। রিক্সাওয়ালাটিকে ভাল করিয়া দেখিব বলিয়াই যেন সেই সময়টুকুর জন্য চাঁদ জ্যোৎস্নার জোর খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াছিল। লোকটির বয়স ত্রিশের নিচে। চিৎ হইয়া শোয়ার জন্য পেটের চামড়া খাদে নামায় ভাঁজ নাই কিন্তু ভাঁজের দাগগুলি বেশ স্পষ্ট। মুখের চামড়া মরা শুকনো ট্যাংরার মত সিটা। চিক্কণ বিবর্ণ গোঁপের উপর বনেদী ধাঁচের চোখা দীঘল নাকটা সশব্দ শ্বাস টানার সঙ্গে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছিল। দূরে সেই শ্বাস টানার শব্দ যেন আরও জোরে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কাছে আগাইয়া আসিতেছিল। একটু পরে টের পাইলাম, রেলগাড়ি আসিতেছে। প্রায় আধ মাইল লম্বা মালগাড়ি টানিয়া একটা ইঞ্জিন আগুনের হলকা ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া পরম উপভোগ্য বিরাট ঝনঝনির কলরবে পুলে উঠিয়া পড়িল।

তখন খেয়াল হয় নাই। আজ ময়দানে এই হৃদয়বান দার্শনিকের জীবন্ত উপমার কথায় মনে হইল, সে রাত্রে কল্পনা করা হয়তো আমার উচিত ছিল যে রিক্সাওয়ালা ও ইঞ্জিনটার একই হাঁপানি রোগ হইয়াছে। একটি খটকা শুধু মনে খচ্‌ খচ্‌ করিতে লাগিল। রিক্সাওয়ালা জিদ ধরিয়াছিল প্রতিদিনকার নিয়ম সে কিছুতেই ভাঙ্গিবে না, খাইতে যদি হয় আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া সোয়ারি পাইলে

সোয়ারি লইয়া ফিরিয়া ছ'আনায় কেনা রুটি ছ'খানি বিনাপয়সায় পাওয়া ছোলার ডাল ও ছ্যাচরাটুকু দিয়া খাইবে। সামনের মিষ্টির দোকানে তাকে ছ'আনার দুধ মিষ্টি খাওয়াইতে আমাকে যেরকম ধস্তাধস্তি করিতে হইয়াছিল, ইঞ্জিনে কয়লা দিতে কি ড্রাইভারের সেরকম হাঙ্গামা ও পরিশ্রম করিতে হয়?

বেচারার করুণ দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইয়াছিল আমাকে পুলিশেরও অধম ভাবিতেছে। আমি দাম দিলে অবশ্য সে খুশি হইয়া খাইত। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়া দিই নাই। কেবল চুক্তির ভাড়াটা চুকাইয়া দিয়া বাকী পথটা হাঁটিয়া গিয়াছিলাম।

আজকাল অভিযোগ শুনিতে পাই রিক্সাওয়ালাদের পায়া ভারি হইয়াছে। সোলজারগুলোকে ঠকিয়ে মোটা পয়সা পায় আমরা ডাকলে কথাই বলতে চায় না। স্পষ্ট মুখের ওপর বলে বসে মশায়, যাব না! অনুযোগে যে পরিমাণ জ্বালা প্রকাশ পায়, কোনো রিক্সাওয়ালা সেই অনুপাতে তেজ দেখাইয়া কোনো ভদ্রলোককে অপমান করিয়াছে বিশ্বাস করিতে পারিলে খুশি হইতাম। খুব খানিকটা খাতির আর সম্মান দেখায় নাই, সত্য বোধ হয় শুধু এইটুকু। ট্যাক্সি-ওয়ালার হুমকি আর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের টিটকারিতে বাবুদের বেশি লাগে না। কিন্তু রিক্সাওয়ালা জাতটাই নিরীহ গোবেচারী ভীরু। তাদের দেহ কাবু হয় জঘন্য শ্রান্তিতে যা প্রায় ক্ষয়রোগ ও হাঁপানি রোগের সমবেত আক্রমণের মত: মৃদু এবং শ্লথ কিন্তু দুর্নিবার। মন কাবু হয় আত্ম-তুচ্ছতার কঠিন রোগে। সবাই গাল দেয়, হুমকি দেয়, ধমকায়। সবাই অন্যায় করে, অবিচার করে, অত্যাচার করে। সুস্থ সবল তেজস্বী মানুষ কয়েকবছর রিক্সা টানিবার পর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ঝিমায়, বিশ্বাস করে যে রিক্সা টানাটাই চুরি করা বা ভিক্ষা করার মত হেয় কাজ। লোকে যে রিক্সা চাপিয়া পয়সা দেয় সেটা শুধু অনুগ্রহ করা নয়, উদারতার পরিচয়ও বটে—রিক্সা টানার অপরাধ ক্ষমা করার উদারতা। অস্পৃশ্যরা কঠিন নোংরা কাজ করিয়া টিকিয়া থাকার সুযোগ পাওয়ার মধ্যে জাতওলাদের যে উদারতা দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় কৃতার্থ বোধ করে। নিরীহতম দু'একটি কেঁচো হয় তো যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার চাপে নিরীহ হেলে সাপ সাজিয়াছে, তাতেই চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছে অনেকের। ছদ্মবেশী বিষাক্ত সাপগুলি যে কিলবিল করিতেছে চারিদিকে তাতে কোনো আপসোস নাই।

এই নিপীড়িত ক্ষয়িষ্ণু মানুষগুলির সহজ সৌজন্য আমাকে মুগ্ধ করে। ভয় বা খাতিরের বিনয় নয়, বকশিসের লোভের খোসামোদ নয়, খাঁটি সৌজন্য। অন্যের

আন্তরিকতাকে চিনিয়া গ্রহণ করিয়া আন্তরিকতার প্রতিদান যার মর্মকথা।

এই রোখো! হিঁয়া রোখো!

সোয়ারির গর্জন শুনিয়াও মোড়ের মাথার কাছে প্রধান রাস্তাটির উপরে সেখানে গাড়ির ভিড়ের মধ্যে রিক্সা থামানো গেল না। একটু আগাইয়া বাঁক ঘুরিয়া বাঁয়ের রাস্তায় ঢুকিয়া রিক্সাওয়ালা গাড়ি নামাইয়া রাখিল। সোয়ারি নামিয়াই রিক্সাওয়ালার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল।

সোয়ারি বাবু নয়। লুঙ্গিপরা গেঞ্জি গায়ে গামছা কাঁধে শ্রেণীর মানুষ। সেখানে কুড়ি পঁচিশটা রিক্সা ছিল, রিক্সাওয়ালারা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া লোকটিকে ঘিরিয়া ধরিল। পথিকও জমিয়া গেল কয়েকজন।

সোয়ারির সেদিকে খেয়াল আছে মনে হইল না। চড় মারিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিয়া সে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে রিক্সাওয়ালার মুখের দিকে তাকাইয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ সে দু'হাতে রিক্সাওয়ালার ঘণ্টাসমেত ডান হাতটি চাপিয়া ধরিল।

মাপ কিজিয়ে ভেইয়া। কসুর হুয়া।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া সে আবার বলিল, মায় কভি এসা নাহি কিয়া। বলিয়া রিক্সাওয়ালার হাতটি তুলিয়া নিজের গালে চড় বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

আরে রাম রাম!

কতক্ষণ দু'জনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আলাপ করিয়াছিল জানি না, মিনিট দশেক পরে বন্ধু আমাকে জোর করিয়া টানিয়া নিয়া গেলেন।

বন্ধু বলিলেন এতে সৌজন্যের কি আছে? তোমার গালে চড় মেরে কেউ যদি ওভাবে মাপ চায়, তুমিও তাকে ক্ষমা করবে।

তাতে অন্তত এটুকু প্রমাণ হয় তো যে ও আমার চেয়ে ছোট লোক নয়?—বলিয়া আমি যোগ দিলাম, আমি শুধু ক্ষমা করতাম। ওদের মুখের ভাব দেখেছিলে, কথা শুনেছিলে? ক্ষমা করে ও রকম দিলদরিয়া হবার ক্ষমতা তোমার আমার নেই।

সেইদিনই রিক্সাওয়ালা মহাবীরের কাছে তার মুস্কিলের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। সোয়ারি নিয়া সে চেতলায় গিয়াছিল। একটি বিধবা স্ত্রীলোককে লইয়া কালীঘাটে আসে। কালীঘাটে আত্মীয়ের বাড়ি স্ত্রীলোকটি আর খুঁজিয়া পায় না। সঙ্গে একটি পয়সাও নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। মহাবীরেরও চেতলা ফিরিয়া যাওয়ার

উপায় নাই। গাড়ি জমা দিতে হইবে। অনেক কষ্টে শেষে চেতলা এলাকার একটি গাড়ির খোঁজ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে তাতে উঠাইয়া দিয়া রেহাই পায়। কালীঘাটে সোয়ারি পৌঁছাইয়া দিয়া গাড়িটি চেতলা ফিরিয়া যাইতেছিল।

ও আপত্তি করল না মহাবীর? ভাড়া ফসকে যাবার ভয় ছিল তো?

আপত্তি কিসের? মহাবীরের ভাড়াও তো একরকম ফসকাইয়া গিয়াছে! বাড়ি ফিরিয়া স্ত্রীলোকটি যদি ডবল ভাড়া দেয়, দেখা হইলে চেতলার সেই রিক্সাওয়ালা—তাকে মহাবীর চেনে না—অর্ধেক মহাবীরকে দিবে। ভাড়া যদি অবশ্য না পায়—

আজ সকালে যা ঘটিয়াছে সেটা শিশুশিক্ষার গল্পের মত শোনাইবে। বেলা তখন সাড়ে দশটা। শহর ব্যস্ত, বিব্রত, উদ্বিগ্ন এবং একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক।

আমি অন্ধ বাবা। আমি অন্ধ ভিখিরী বাবা। আমায় পথটা পার করে দাও! অন্ধ বাবা···

আরও কয়েক মিনিট এভাবে চেঁচানোর পর অন্য কেউ হয়তো তাকে পথ পার করিয়া দিত, একজন রিক্সাওয়ালা আগেই কাজটা করিয়া ফেলিল। অন্ধকে যে দয়া করিল ঘটনাক্রমে সে রিক্সাওয়ালা তাই উল্লেখ করিলাম। রিক্সাওয়ালারাই শুধু অন্ধজনে দয়া করে একথা বলা উদ্দেশ্য নয়।

আমি? আমি কি করিতেছিলাম? আমি দেখিতেছিলাম অন্ধকে কেউ পার করিয়া দেয় কিনা, কে দেয় এবং কি ভাবে দেয়!

প্রাণের গুদাম

গুদামটা আগে ছিল পুরানো একটা শেড, তাড়াতাড়ি টিন দিয়ে চারিদিক ঘিরে ফেলে গুদামে পরিণত করা হয়েছে। টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছে কণ্ট্রাক্টর, মেঝেটা পাকা করে দেবার দায়িত্বও ছিল কণ্ট্রাক্টরের। কথা ছিল নতুন টিন দেবার, কিছু কিছু যে দেওয়া হয়েছে নতুন টিন তাতে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। মেঝেটা উঁচুও করা হয়েছে চারিদিকের জমি থেকে হাতখানেক, গুদামের বাইরের ভিটেটুকুতে সিমেণ্ট ঝক-ঝক করে। ভেতরে ইঁট পড়েছে কি রকম, সিমেণ্ট খরচ হয়েছে কত, লোক খেটেছে কতজন সে সব জানবার প্রয়োজন কারো হয়নি। জেনে লাভও নেই।

মাল বোঝাই হবার আগে গুদামের ভেতরটা ছিল আবছা অন্ধকার। মাল বোঝাই হবার পর তো মেঝে একেবারে আড়াল হয়ে গেছে। তাছাড়া, গুদাম একরকম একটা হলেই হল—মানুষ সহজে কোনো খাদ্য চুরি করে নিতে না পারে এইটুকু ব্যবস্থা থাকলেই যথেষ্ট। তাই বোধ হয় ফাঁকায় খাদ্যের বস্তাগুলি গাদা করে না রেখে শেডের নিচে ঘেরা জায়গায় ঢুকিয়ে সামনে সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের হাত থেকে খাদ্য বাঁচল, সেই সঙ্গে বর্ষা বাদলেও খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। আর কি চাই?

শিবরামের হাত থেকে কণ্ট্রাক্টটা ফসকে চলে গিয়েছিল মিঃ রায়ের হাতে, আত্মীয়তামূলক যোগাযোগের বাড়তি টানে, ঘুষে মিঃ রায় শিবরামকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি একথা নিশ্চয়। শিবরাম ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিল, শুধু টাকার ঘুষের আর সেরকম দাম যেন নেই অনুগ্রহকারীদের কাছে, দেবতার কাছে নিছক চাল-কলার নৈবিদ্যের মত, সেই সঙ্গে ফুল চন্দন ধূপ-ধুনা প্রভৃতিরও দরকার হয়েছে আজকাল। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা থাকে তো ভালই, নয়তো আনাগোনা;

টুকিটাকি উপহার, মিঠেকথা মোসাহেবী এসব উপচারে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেও বজায় রেখে চলতে হয়। মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যে তাহার ভুল হয়নি পরে শিবরাম তার প্রমাণ পেয়েছে। মিঃ রায়ের হাত থেকে কণ্ট্রাক্ট খসে চলে এসেছে তার কাছে। ঘুষ দিয়ে পেরে উঠবে কেন মিঃ রায় তার সঙ্গে, সেই সঙ্গে সে যদি মানুষকে বশ করতেও আরম্ভ করে অন্যভাবে তবে আর কথা কি।

শিবরাম বলেছিল, এমন ফাঁকি আমরাও দিতে শিখিনি, আমাদেরও বিবেক আছে। তিনভাগ টিন মর্চেধরা, ফেলে দিতে হত। ভেতরে একটু সিমেণ্টগোলা জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ইঁট তো দেয়নি ভিটেতে—জঞ্জাল আর আবর্জনায় ফাঁপা করে রেখেছে। এমনিতেই লাখখানেক ইঁদুর বাসা করত, এখন শেয়াল গর্ত খুঁড়ে বাচ্চা মানুষ করবে!

শশাঙ্ক বলে, উপায় কি, এক জায়গায় তো জমা করে রাখতে হবে, বাজারে ছাড়লেই তো পড়বে গিয়ে আপনাদের এজেণ্টদের হাতে। এমনি তবু গরীবদের পাবার ভরসা আছে দু'দশ ছটাক, তখন আর চোখেও দেখতে পাবে না।

ওসব আটাময়দা চাল আমরা খাই না মশায়।

আপনারা ভাল জিনিস খান, কিন্তু বেচেন তো এসব। খাবার জন্যে না কিনুন, চালান দেবেন, নয় চালানী দামে আশেপাশে বেচবেন।

এমনিভাবে কথা বলে শশাঙ্ক, জীর্ণ শীর্ণ আধবুড়ো এক কেরানী। এই দুর্ভিক্ষের দিনে তেত্রিশ-হাজার মন খাদ্য দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেয়ে বুকটা যেন তার ফেঁপে উঠেছে। দায়িত্ব তো ভারি, শুধু দেখা যে বড় বড় তালাগুলি ঠিকমত লাগানো আছে আর দারোয়ান ও পাহারাওয়ালা ক'জন ঠিকমত কাজ করছে। একটা তালা খুলবার ক্ষমতাও তার নেই। তবু তার কথা শুনে মনে হয়, চারিদিকের ওৎ-পাতা মুনাফাখোরদের কবল থেকে সেই বুঝি এই খাদ্যগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচিয়ে সাধারণ দুঃখী লোকের জন্য জমিয়ে রেখেছে। তবে, শশাঙ্ক কখনো শত্রুতা করে না। হাতের তালুতে ভাঁজকরা কিছু নিয়ে ওর হাতে হাত মেলাতে খালি হাত ফিরে আসে, খাতির বাতিল করার বাহাদুরী ওর নেই। তার সরবরাহ আটহাজার মন আটা দেখে সেও মুখ বাঁকিয়েছিল, কিন্তু সময়মত জায়গামত ঠিক কথাটি বলতে কসুর করেনি,—আটা মোটা হলে একটু ভোঁতা গন্ধ ছাড়ে হুজুর, নতুন আটাতেও। লোকে এ আটা পেলে লুফে নেবে!

না বললেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না কিছু। কেনা মাল যেমন হোক গুদামে তোলাই তখন কাজ। পরের কথা পরে।

শশাঙ্ক নিজেও জানে না বিশেষ দরকার না থাকলেও নিবারণ বা মিঃ রায়ের পক্ষ টেনে সময় মত ওসব সমর্থনের কথা কেন সে বলতে যায়। কতটুকুই বা ক্ষমতা তার উপকার করা বা ক্ষতি করার। সব কিছু ঘটে একরকম তার নাগালের বাইরে, দু'চারটে নোট তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয় সে যাতে কোনো গোলমাল না করে, চুপ করে থাকে। মুখটা বন্ধ করে রাখার পুরস্কার ওটা। কেন তবে সে বাহাদুরী করতে যায়? টাকার কৃতজ্ঞতায়? অথবা ওপরওয়ালাকে জানিয়ে দিতে, আমিও আছি এর মধ্যে, কিন্তু ভয় পাবেন না, আমি আপনার অনুগত, আপনারি পক্ষে?

হয় তো ভালই হয়েছে ফলটা। তাকে যে বিশ্বাস করে ওপর থেকে, তার তো প্রমাণই পাওয়া গেল। কিন্তু উপার্জনটা বড় কমে গেছে এই বিশ্বাসের বোঝায়। এই কাজে এসে উপরি তেমন জুটছে না। আগেকার বাটোয়ারার জের টেনে কিম্বা নায়েবের সঙ্গে এখনো তার খাতির আছে এইজন্য ভিক্ষার মত কিছু যদি কেউ দেয়।

বিশেষ কিন্তু আপসোস হয়নি শশাঙ্কের। মনটা তার চিরদিনই একটু স্পর্শপ্রবণ ছিল, চারিদিকের আকাশ ছোঁয়া লোভ ও স্বার্থপরতার চাপে কঠিন হয়ে গেলেও এখনো দুঃখের ছোঁয়া লেগে তাকে একটু উন্মনা করে দেয়। অন্তরের এই বিলাসিতাটুকু সযত্নে বাঁচিয়ে সে পুষে রেখেছে, সময় ও সুযোগ মত উপভোগ করে। চারিদিকে অনাহারে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চোখে দেখে এবং বর্ণনা শুনে ও পড়ে সে দুঃখিত হতে সাহস পায়নি, নিজেকে উদাসীন করে রেখে দিয়েছে। আনমনা হয়ে মানুষ পুত্রশোক ভুলে যেতে পারে, এতো পরের, গরীব দুখীর, না খেয়ে মরার জন্য সমবেদনা বোধ করা।

এখন আর অতটা মনকে বাঁচিয়ে চলবার দরকার হয় না শশাঙ্কের, খেতে না পেলে ক্রমে ক্রমে নানা বয়সের মানুষের কি অবস্থা হয়, কি অবস্থায় তারা মরে পড়ে থাকে পথের ধারে, এসব এখন সে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারে, দীর্ঘ-নিশ্বাসও ফেলতে পারে। তেত্রিশ হাজার মন খাদ্য তার মনে এই জোরের সঞ্চার করছে। এই বিরাট খাদ্যভাণ্ডারের সংস্পর্শে থেকে সে অনুভব করে, আর ভাবনা নেই, না খেয়ে এবার আর মরবে না কেউ এ শহরে বা আশেপাশের গ্রামে। কে পেট ভরে খেল কার আধ পেটা জুটল সে হিসেব চুলোয় যাক, না খেয়ে কেউ আর মরবে না এত খাদ্য থাকতে।

টিনের ফুটো আর ফাঁক দিয়ে খাদ্যের গন্ধ প্রতিদিন নাকে এসে লাগে শশাঙ্কের,

খাদ্যবস্তুর এই অবিস্মরণীয় ঘনিষ্ঠতায় তার হৃদয় স্বস্তিতে ভরে যায়; হাজার হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে এই খাদ্য দুর্দিন পার করে দেবে।

স্টেশনে নেমে লাইন ধরে হেঁটে লেভেল-ক্রশিং-এর রাস্তা দিয়ে শহরে যাবার সময় গুদামটা ডাইনে পড়ে। এ রাস্তায় লোক চলাচল কম, গাড়িঘোড়াই চলে বেশি। দুপুরবেলা হঠাৎ জামাই সত্য এসে প্রণাম করায় শশাঙ্ক টের পায়, একটার গাড়ি থেকে নেমে সত্য বাড়িতে যায়নি, লেভেল-ক্রশিং হয়ে সোজা এখানে এসেছে। কারণটা শশাঙ্ক বুঝে উঠতে পারে না। এইখানে যে তার অপিস হয়েছে আজকাল তাও বা জামাই কি করে জানল সে ভেবে পায় না।

বাড়িতে যাওনি ?

আজ্ঞে না। ভাবলাম যাবার পথে আপনাকে প্রণাম করে যাই। এই নাকি ফুড স্টোরেজ ?

এসে দাঁড়িয়েই মুখ বাঁকিয়েছিল সত্য, মুখের ভঙ্গিটা তার আরও গভীর ভাবোদ্যোতক হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক নিজে থেকে কৈফিয়ৎ দিয়ে, বলে আটা ময়দা থাকলে ওরকম গন্ধ একটু হয়। চলো তোমাকে নিয়ে বাড়ি যাই।

আপিস ?

আপিস আর কি, বসে থাকা। একদিন একটু তাড়াতাড়ি গেলে কিছু হবে না। ন'মাসে ছ'মাসেও এখানে কেউ খোঁজ নিতে আসে না।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কুলির মাথা থেকে সত্যের মালপত্র গাড়িতে তোলা হয়। প্রথম মেয়ের প্রথম জামাই, বিয়েও হয়েছে মোটে বছর দুই, তাকে এভাবে নিজে হাজির থেকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে শশাঙ্ক খুব খুশি হয়। আগের কাজে থাকলে এভাবে হঠাৎ যখন খুশি জামাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভব হত না। তবে, আগের কাজে থাকলে জামাই বাড়ি যাবার পথে তাকে প্রণাম করার জন্য অতটা ঘুরে যেত কিনা সেটা ভাববার কথা বটে।

আপনার ও আটাময়দা কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

গরীব দুখী খেতে পায় না, তাদের আবার ভাল আর খারাপ।

দু'একমাস পরে আর মানুষের গ্রহণের যোগ্য থাকবে না। ভেতরে গিয়ে কেউ কখনো ত্যাখে না ?

কই, না ? দরকার লাগলে বার করা হবে, কে আবার দেখতে যায় গেট খুলে ভেতরে গিয়ে ? তুমি তো ভাবিয়ে দিলে আমায় !

ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখবার কায়দা আয়ত্তে করতে হয়েছে শশাঙ্ককে অনেকদিনের চেষ্টায়, নতুন জামাইকে সঙ্গে রেখে অত ভাবনা ভাবলে চলবে কেন। কিন্তু রাস্তার দু'পাশের শত শত চিহ্ন যেন ষড়যন্ত্র করেছে কথাটা তাকে ভুলতে দেবে না। গাছের ছায়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে গাঁ থেকে পলাতক কঙ্কালগুলি, সূর্যাস্তের সঙ্গে ওদের কতকগুলির জীবন অস্ত যাবে কে জানে। ছায়া না খুঁজে দুপুরের এই খর-রোদে হেঁটেও বেড়াচ্ছে অনেক কঙ্কাল ধুলায় ধূসর, উৎসুক ভয়ার্ত চোখে ঘোড়ার গাড়ির দিকে চেয়ে ওরা কি কামনা করছে শশাঙ্ক জানে। জামায়ের সঙ্গে কথা বলতে বারবার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার ভীরু করুণ উদাস চাউনি দেখে সত্য অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বাড়ি পৌঁছেই শশাঙ্কের ছুটি, জামাইকে লুপে নেয় মেয়েরা। নিচে পিছন দিকের ছোট ঘরখানায় বসে শশাঙ্ক আকাশ পাতাল ভাবে। গন্ধ? গুদামের ভেতর থেকে গন্ধ কিছু বেরোচ্ছে বৈকি, সে তো রোজই টের পাওয়া যায়। সে কি ভেতরের সমস্ত খাদ্য পচবার গন্ধ? অথবা অত খাদ্য একসঙ্গে জমা করা থাকলে এখানে ওখানে একটু আধটু পচন ধরে ওরকম গন্ধ ছাড়ে, যার কোনো প্রতিকার নেই। মানুষের খাদ্য নিয়ে যত সাজানো গুছানো কায়দা করা মিথ্যা কথা শশাঙ্ক শুনেছে আর নিজেও বলেছে আজ সেই কথাগুলিই তার মনের মধ্যে ভাঁজ খুলে খুলে নতুন যুক্তি আর সত্যের রূপ নিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করতে চায়। মেঝেতে যে যে বস্তা লেগে থাকে ড্যাম্প লেগে সে বস্তাগুলি খারাপ হয়ে গন্ধ বেরোয়—কিন্তু উপরের বস্তাগুলির কিছুই হয় না। একটা বস্তা কোনো কারণে আগে থেকেই খারাপ হয়ে থাকলে সেটা ক্রমে ক্রমে চারপাশের অন্য বস্তাগুলি নষ্ট করতে থাকে, তাতেও পচা গন্ধ বার হয়, কিন্তু তাই বলে একটু তফাতের বস্তা কেন নষ্ট হবে! সত্য এসব বিষয়ে কি জানে যে বাইরে থেকে শুধু গন্ধ শুঁকেই সে বলে দিতে পারবে ভেতরের সব জিনিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে! ভাঁড়ারঘরে একটা ইঁদুর পচলেও তো মনে হয় সমস্ত জিনিস বুঝি পচে গলে ভাপ্‌সে উঠেছে। সেই ভুলই হয় তো করেছে সত্য?

মন শান্ত হয় না। তেত্রিশ হাজার মণ খাদ্য যদি সত্য সত্যই নষ্ট হতে বসে থাকে, প্রায় অযোগ্য হয়ে গিয়ে থাকে মানুষের খাবার? তার নিজের কোনো ক্ষতি নেই, শশাঙ্ক জানে। গুদামের জিনিস কি অবস্থায় আছে দেখবার দায়িত্ব তার নয়। সে শুধু দেখবে তালা ঠিক মত লাগানো আছে কি না, পাহারা ঠিকমত চলছে কি না, আর লিখিত হুকুম এলে ঠিক সেই পরিমাণ জিনিস ডেলিভারি হল

কি না। তার বেশি আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা তার নয়। দোষ তাকে কেউ দিতে পারবে না। তবু এই দুর্দিনে তেত্রিশ হাজার মণ খাদ্য নষ্ট হওয়ার কথা ভাবলেও নিজেকে কেমন তার দুর্বল মনে হয়। পুণ্যের বোঝা ফাঁকা দেখলে পাপীর যেমন হয়, তেমনি যেন অসহায় ঠেকে তার নিজেকে।

দুটি ভিক্ষে দাও গো মা।

খিড়কির এই দরজাতে ভিখারিণী এসে জুটেছে, জঙ্গল বাঁশ ঝাড়ের বাধা না মেনে? এঁটো-কাটা ফেলবার আস্তাকুড় বাড়ির পিছনে থাকে বলে বোধ হয়—জঞ্জালও ঘাঁটা চলে, ভিক্ষাও চাওয়া চলে। বাড়ির পিছনে ছিটাল দিয়ে ভিখারীও চলাফেরা করে কম। জানলা দিয়ে শশাঙ্ক চেয়ে থাকে ভিখারিণীর দিকে। জট-বাঁধা রুক্ষ চুলের নিচে শেওলা ধরা মেঝের মত সেঁত সেঁতে মুখ, কোলে একটি শিশু। বাচ্চাটিকে দেখে কেমন একটা ক্লেদাক্ত ভয়ের স্পর্শে সর্বাঙ্গে তার শিহরণ বয়ে যায়, গা ছম ছম করতে থাকে। এতটুকু মানুষের বাচ্চা মাথা উঁচু করে অস্ফুট আওয়াজে কাঁদছে? একটা অপুষ্ট ভ্রূণ যেন অভিনয় করছে জীবন্ত শিশুর। দড়ির মত পাকানো রুগ্ন শিশু দেখেছে শশাঙ্ক, কি করে বেঁচে আছে ভেবে দেহ শির শির করে উঠেছে কিন্তু এ বাচ্চাটার দিকে তাকালে যেন ধাঁধাঁ লেগে যায় চোখে।

ভিখারিণী ক্ষীণস্বরে ডেকে চলে, দুটি চাল কেউ দিয়ে যায় না। জামাইকে নিয়ে বাড়ির সকলে ব্যতিব্যস্ত।

এই শোন্। এদিকে আয়।

ভিখারিণী উবু হয়ে বসেছিল, জানলায় একটু তাকিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট পিষে ফেলে মুখের একটা ভঙ্গি করে। ভেতরটা রি রি করে ওঠে শশাঙ্কের। নির্জন দুপুরে আধবুড়ো ভদ্রলোকও জানালা দিয়ে হাতছানি দিয়ে কেন ডাকে এত বেশি করে ভিখারিণী তা জেনে গেছে, লোল চামড়া বুড়ীর চেয়েও ভাঙ্গা শিথিল ও রোগজীর্ণ ওই বয়সকালের দেহটি নিয়ে!

কচুগাছ সরিয়ে ভিখারিণী জানালার সামনে আসে।

ক'মাসের ছেলে?

বছর পুরবে বাবু।

বছর পুরবে! খানিকক্ষণ শশাঙ্ক কথা কইতে পারে না। কাছে থেকে বাচ্চাটাকে দেখে ভেতরটা তার পাক দিয়ে উঠতে থাকে।

এসব বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ভিখারিণীর পরিচয় আছে, সে বলতে থাকে,. হওয়ার পর বাপ মোলো। আমি না খেতে পেলে দুধ পাবে কোথা? খেতে না

পেয়ে ওমনি হয়ে গেছে।

না খেয়ে হয়েছে? না, ভিক্ষে বেশি পাবি বলে নিজে করেছিস?

কার জন্যে ভিক্ষে করা বাবু? ওরি জন্যে তো। নইলে—ভিখারিণী নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকায়, মরলে বাঁচি, তা মরবে না। আমার পোড়াকপাল তাই বেঁচে রয়েছে, মেরে ফেলতে পারি না তাই!

একবছর আগেও সে গেরস্ত ঘরের বউ ছিল, স্বামী নিয়ে ঘর করত। আজ তার মুখে হৃদয়ের ছায়াপাত হয় না, শুধু জ্বালার প্রতিচ্ছবি ছাড়া। শশাঙ্ক নিজে উঠে গিয়ে কিছু চাল আর বাটিতে দুধ নিয়ে আসে। দুধের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করতে হয়।

জামায়ের এদিকে দুধ কুলোবে না, একবাটি দুধ তুমি দাতব্য করছ!

ওবেলা একসের দুধ বেশি এনে নেব।

খিড়কির দরজা খুলে দুধের বাটি নামিয়ে রেখে শশাঙ্ক ভিখারিণীকে বলে, আমার সামনে বসে খাওয়া ছেলেটাকে পেট ভরে।

আমি খেয়ে ফেলব ভাবছ বাবু? গাছের পাতা ছিঁড়ে চট করে একটা চামচ বানিয়ে সে বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করে, এই জন্য বেঁচে আছে বাবু, তোমাদের দয়ায়। কেন দয়া কর বাবু, কেন দয়া কর? মরলে যে আমি রেহাই পাই!

গুদামের পচা খাদ্যের গন্ধ নাকে লাগায় শশাঙ্ক আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। এখানে গন্ধ আসচে কোথা থেকে? ভিখারিণী উঠে দাঁড়াতে গন্ধটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পচা মানুষের গন্ধও কি পচা খাদ্যের মত? আশ্চর্য কি, খাদ্য থেকেই তো দেহ! ভিখারিণী চলে যাবার পর তেত্রিশ হাজার মণ খাদ্যের রক্ষক বলে নিজের মধ্যে যে অর্থহীন স্বস্তিটা সে গড়ে তুলিছিল তার অস্তিত্বটুকুও যেন আর খুঁজে পায় না। মনে হয় তারই বোকামিতে তারি একটু অবহেলায়, ওই খাদ্যে যতলোকের জীবন রক্ষা হতে পারত ততগুলি লোক মরে পচে উঠতে আরম্ভ করেছে, দায়িত্ব তার। পচা গন্ধে মসগুল হয়ে উঠেছে চারিদিক, সে কি বলে চুপ চাপ বসে রয়েছে শুধু গুদাম পাহারা দিয়ে?

শশাঙ্ককে জামাকাপড় পরতে দেখে তার স্ত্রী বলে, আবার বেরুচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ, সায়েবের সঙ্গে একবার দেখা করব।

জামাই বলছিল তোমার সঙ্গে কি দরকারী কথা আছে।

ডাকবো নাকি, না, আমিই যাব ? শশাঙ্ক ভাবে, জামাইরা সত্যি লাটসাহেব !

তুমিই যাও না, জিজ্ঞেস করো কি বলবে।

খেয়ে উঠে ওপরের ঘরে পান চিবুতে চিবুতে সত্য সিগারেট টানছিল, শশাঙ্ককে দেখে সিগারেটটা একটু আড়াল করে অনেক ভূমিকা ও ভণিতার পর সে তার দরকারী কথায় আসে।

জানেন তো চাকরী করি না, আমি এখন সুখনলালের এজেন্ট। ব্যবসাই করছি বলা চলে একরকম। কমিশন যা পাই কোনোকালে ব্যবসা করে অত পার্সেন্ট লাভ কেউ করেনি। এখন কথা হল কি, আপনার গুদামের আটা ময়দা তো পচে যাচ্ছে।

কথার যোগাযোগটা বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু বুকটা শশাঙ্কের ধরাস্ করে করে ওঠে।

গুদামটা আমার নয় বাবা। সে বলে কোনো মতে।

সত্য হাসে, ও একই কথা। সে যাই হোক, এখনো গুদামের মাল বাজারে বেচা-কেনা চলবে। আমার হাতে কিছু রদ্দিমাল আছে, সেটা বদলে দিতে হবে আপনাকে। তেল যা লাগে খরচ করব, তাতে আটকাবে না। আপনারও কোনো ভয় নেই, চ্যালেঞ্জ করলে বলবেন গুনে ভ্যাখো। যে পরিমাণ নেব ঠিক সেই পরিমাণ রিপ্লেস করব।

পাংশু বিবর্ণ মুখে ঢোঁক গিলে শশাঙ্ক বলে, কিন্তু আমার কাছে তো চাবি নেই।

নিরুপায় হয়ে মিথ্যা কথাই বলে শশাঙ্ক। গুদামের আপিসে সত্যের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা এতক্ষণে তার কাছে পরিষ্কার হয়।

সত্য আশ্চর্য হয়ে বলে, গুদামের চাবি আপনার কাছে নেই ? দরকার হলে গুদাম খোলে কে ?

আমিই খুলি, সায়েব তখন আমাকে চাবি দেয়। অন্য সময় নিজের কাছেই রাখে।

তাই তো ! সত্য বলে চিন্তিত হয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মিঃ নন্দীর কাছে হেঁটে যাওয়ার ধৈর্য শশাঙ্কের থাকে না, সে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বসে। তার চিরকুট পেয়ে খাস কামরায় উঠে গিয়ে সেখানে মিঃ নন্দী তাকে ডেকে পাঠায়।

আটা ময়দা পচে যাচ্ছে ? এইজন্য আপনি এমন ব্যাকুল হয়ে পড়ছেন ?

অতগুলি ফুড হুজুর। কতলোক খেয়ে বাঁচত।

টেঁরো দিয়ে বিতরণ করতে চান কি ?

আজ্ঞে না।

তবে ? মিঃ নন্দীর মুখে হাসি ফোটে, আপনি তো বড় নার্ভাস লোক মশায় ! নষ্ট হয় তো হবে, আমাদের কি করার আছে ! স্টোর করার কথা, আমরা স্টোর করেছি। তার বেশি কিছু করার ক্ষমতাই বা কই আমাদের ? ইনস্ট্রাকসন না পেলে কিছুই করা চলে না। তাছাড়া – মিঃ নন্দীর হাসিটা এবার করুণাদ্যোতক মনে হয়, নানা কোয়ালিটির জিনিস পোরা হয়েছে, সব মাল খারাপ হয়ে দাঁড়ালে ধরা যাবে না। ভাববেন না, সব ঠিক আছে।

বাড়ি ফিরে শশাঙ্ক শোনে, জামাই নাকি সে বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। সন্ধ্যার সময় মিঃ নন্দীর বাংলোতে শশাঙ্কের ডাক আসে। সেখানে সে দেখতে পায় সত্যকে।

মিঃ নন্দী বলে, আপনার কথাটা ভাবছিলাম্ শশাঙ্কবাবু। আটা ময়দা নষ্টই যখন হয়ে যাচ্ছে, কিছু বাজারে গেলেও লোকে খেতে পাবে। ইনি দু'হাজার বস্তা খারাপ মাল বদলে নিতে চান। স্টোর থেকে ওঁকে পছন্দসই দু'হাজার বস্তা দিয়ে, ওঁর বস্তা সেখানে রেখে দেবেন।

কেউ জিগ্যেস করলে—

জিগ্যেস করলে বলবেন, কিছু নতুন মাল এল, কিছু পুরানো মাল চালান গেল। রিপোর্ট ঠিক করে নেব'খন।

শালাশালীরা বলামাত্র জামাই বাড়িতে সে রাত্রে মস্ত ভোজ দেয়, হৈ চৈ চলে অনেক রাত পর্যন্ত। শরীর খারাপের অজুহাতে শশাঙ্ক সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। ঘুম কিন্তু তার আসে না সহজে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে।

সকালে সত্য সত্যই শরীরটা খারাপ লাগে। খেয়ে-দেয়ে আপিসে বেরোবে, সদরের সামনে দেখা হয় গতকালের সেই ভিখারিণীর সঙ্গে।

এগিয়ে এসে নিস্পন্দ বাচ্চাটিকে সে শশাঙ্কের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে।

তোমার দুধ খেয়ে মরেছে বাবু।

ছেঁড়া

সেকেলে বুড়ো ছেঁড়া মাদুরে বসে ঝিমোয়। একেলে বুড়ো তার সামনে এক গাদা বই খাতা নিয়ে বসে থাকে গোমড়া মুখে। ছেঁড়া প্যাকিং কাগজের মলাট দেওয়া ইংরেজী বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল।

ইংরেজী পড়বি না, ইংরেজী? ভাল করে ইংরেজী পড়। বেশি করে পড়। ইংরেজী ভাল জানলে বাস্।

ছেঁড়া ছেঁড়া ঝিমোনো কথা, তবু প্রত্যাশা ও উৎসাহ বেশ আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে পড়ন্ত রোদ কালচে খড়ের জীর্ণ চালায় রংটুকু হারিয়ে সিক্ততায় চিকচিকিয়ে কাঁদছে। পচার চোখ চকচক করে উঠছিল ভেজা গাছপালার দিকে চেয়ে, ওই আড়ালের ওপারে খেলার মাঠের কাদা নদীর ধারের পিছল তীর। শ্রান্তিতে মিইয়ে যায় মুখের ভাব, বসার ভঙ্গি। সারাদিন স্কুল করে এসে আবার পড়া তৈরী করা, দিনের আলোয় যতক্ষণ পড়া যায়। ভাঙ্গা লণ্ঠন জ্বলবে না সন্ধ্যার পর। কেরোসিন নেই। কিন্তু খেলাধুলোও যে চলবে না সন্ধ্যার পর, তা কি ভাবে দাদু, মামীমা মানে।

ইংরেজী পড়, ইংরেজী শেখ। ইংরেজী একটু জানলে, বাস, আর ভাবনা নেই। রাখাল দুটো ইংরেজী কথা কইতে শিখেছিল ফাষ্টোবুক পড়ে, কলকাতায় দালান রেখে গেছে। বোকাসোকা ছিল, তবু। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঝিমোনো কথা, তবু প্রত্যাশা ও ঈর্ষায় সুর মেলে। বাঁধা বলদটা হাড় পাঁজরায় ধুকছে উঠোনের কোণে কাদা গোবরে দাঁড়িয়ে, নিজেকে গুতুচ্ছে থেকে থেকে পোকা মাছির জ্বালায়। আগামী চাষের আয়োজনে লাঙল টানার জন্য ওকে পুষতে হবে দিন মাস ধরে, এবারের কাজ ওর সারা। ও বছরের কুমড়ো মাচাটি ফাঁকা, লিকলিকে সবে উঠেছে মাচাতে। অনেক কুমড়ো দিয়ে গেছে গাছটা। ফুল আর ডগাও খাইয়েছে অনেক। কোথায় যে গেল তার চিহ্ন!

পড়তে বলছি না? চুপচাপ বসে রয়েছিস?

হাতড়ে কঞ্চিটা খুঁজে নিয়ে সেকেলে বুড়ো সপাৎ করে বসিয়ে দেয় পচার পিঠে, মুখবিহীন গোল যে ফোড়াটা বড় হয়ে উঠছে সেটাকে প্রায় ছুঁয়ে।

ফুলু সুখী হয় তার চীৎকার শুনে। বুড়োটা মেরেছে পচাকে, বুড়ো চটেছে পচার ওপর। এই তার অস্থায়ী একটু অবসর ছোঁড়াটাকে দুটো গালমন্দ শাপমন্যি দেবার। বুড়ো চটেছে, কিছু বলবে না। নাতিকে গাল দিতে শুনেও।

চেঁচাল কেনে ষাড়ের মত? মরণ হয় না! ঘরের পক্ষি তাড়াবে চেঁচিয়ে। মরণ নেই! টেনে নিতে পারে না বাপে মায়ে যেথা গেছে?

ননদ পো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সংসারে বাপমাকে খেয়ে। খাওয়া পড়া দিয়ে রেয়াৎ নেই, ইস্কুলে পড়ছেন। বই খাতা কাগজ পেন্সিল, মাস গেলে মাইনে, কত কি। বুড়ো দেয় বটে খরচা, কিন্তু কেন পয়সা ঢালবে বুড়ো ওর পেছনে? ওকে দিতে না হলে তো সংসারে দিত।

দিত কি? গায়ের জোরেই মনকে বলাতে হয়, দিত, দিত, নিশ্চই দিত। মনকে একথা না বললে জোর থাকে না জ্বালার আশা থাকে না মরণ কামনা ফলবে।

মা, ওমা মা! খিদে পায় যে, মা, ওমা, মাগো?…

নাকি সুরে কেঁদেই চলেছে শুনু পিছন থেকে ছেঁড়া পচা কাপড় চেপে ধরে। ওকেও মরতে বলার ঝোঁকে দমক মেরে ঘুরতে যেতেই পাছার কাছে ফেঁসে গেল জ্যালজেলে কাপড়।

খা! খা! খা! মোকে খা! পাঁজর-ভাঙ্গা মরণ কান্না ঠেলে ওঠে বুকের মধ্যে। বুড়ো বেঁচে থাক, পচা সুখে থাক, তার কেন মরণ হয় না ভগবান। দিনে রাতে সাপের ছোবল আর সয় না।

হেথায় কেন গোল কর শুনুর মা। পচা পড়ছে। ইংরেজী পড় পচা! চেঁচিয়ে পড়।

উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যায় ঝমঝমিয়ে। গল গল করে উগলানো ধোঁয়া পিছনে পড়ে থাকছে গুমোটে মরার মত এলিয়ে। দখিন কোণে দূরের ওই লোহার চোঙ্গা থেকে ধোঁয়া সোজা উপরে উঠছে। আকাশের নাগাল পেতে। ওর কাছে স্টেশানটাতে থেমে এসে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা।

কোঠা বাড়ির মনাবাবুর বৌটা কলেরায় মারা গেছে পরশু, ট্রেনে কি মনাবাবু আজ এলো? এতদিন আসেনি, বৌ মরেছে খবর শুনে আসবে নিশ্চয়। ছেলেটা

হল দেড় বছরের, গা ভরা ঘায়ে কি কষ্ট ওইটুকু কচি ছেলের।

গুমুর বাপও যদি আসে এই গাড়িতে! বৌটা তার মরেনি, জলজ্যান্ত বেঁচে আছে মরে যাওয়া উচিত হলেও, তবু যদি এখনি আসে, হঠাৎ কোনো মনের খেয়ালে আসে চার ছ'মাস আসেনি বলে। যদি নিয়ে আসে রেশনের একজোড়া নতুন শাড়ি, রঙীন একটি সায়া, টুকটুকে লাল কি বেগুনি রঙের। আর সস্তা সাদা গোছের ঘি, পাঁপর, চানাচুর লেবেঞ্চুস—

ট্রাক চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে। একটা দুটো তিনটে! ছিঁড়ে দিয়ে গেল সব স্বপ্ন, মাড়িয়ে দিয়ে গেল সাধ। বুক দুরু দুরু করে ফুলুর। এখানে উনুনের সামনে বসে সে দেখতে পায় বড় প্রকাণ্ড জোড়া চাকা রাস্তায় খাদগুলির জল কাদা ছিটিয়ে দিচ্ছে। কানাই আর নিধুর দুটো ঘর ডিঙ্গিয়ে জল কাদা যেন ছিটকে এসে তার গায়ে লাগবে এখানে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে পচা বুড়োকে শুনিয়ে। একটা পাখী শিস দিল এই ঘর ছোঁয়া আমগাছটার ডালে। আমের সোয়াদ এবারও জিভে লাগল না, এবারও তিনটে গাছই বুড়ো জমা দিয়েছিল রামশরণকে। একটা গাছ রাখ নিজেদের জন্যে, ওই বর্ণচোরার গাছটা, সবুজ-কালো আমগুলিতে যেন মধু পোরা, কি রঙ আর কি মিষ্টি গন্ধ। তা নয়, সবগুলি গাছ বুড়ো জমা দিয়েছিল। নাতিকে পড়াবে, ইস্কুলে পড়াবে। মরণ হয় না।

কাঠ কুড়িয়ে ফিরল বুঝি পিসি, ভিজে কাঠপাতা আজ আর জলছে না। এখনো বেলা আছে, আর খানিকক্ষণ খুঁজে পেতে আর কটা বেশি শুকনো ডাল, ঝোপটোপ আনা পোষাল না পিসির, দুবেলা খাবার মুখটা আছে।

পদী আবার চেঁচাচ্ছে। অবেলায় কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে জ্বরটা বাড়ছে আবার। আর কাঁথা নেই চাপা দেবার। যেমন বুদ্ধি বুড়োর, এত বড় মেয়েকে পার না করে ঘরে রেখে পুষছে। গুমুর বাপেরও যেন কোনো চাড় নেই বোনটাকে পার করবার। পই পই করে সে বলেছে গুমুর বাপকে, ফের এ বর্ষায় জ্বরে পড়লে যা ছিরি হবে মেয়ের, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে কেউ আর ছোঁবে না তখন। সেরে উঠে ফের একটু মানুষের মত দেখাতে আরও ছ' মাস এক বচ্ছর। তা কে শোনে কার কথা! মরে যদি যায় তো অবিশ্যি আর—সেই আশায় আছে নাকি বুড়ো আর গুমুর বাপ? যাকগে বাবা যাক, তার অত ভাবনায় দরকার কি। নিজের জ্বালাই বলে তার সয় না। দিনরাত শত বিছায় কামড়ায় আর ছোবল দেয় সাপে।

মা, ওমা, মা, খিদে পায় যে, মা, ওমা, মাগো !…

ওকে ভোলানো গেল না এক কোয়া কাঁঠাল দিয়ে দু'দণ্ডের বেশি। ভুতুড়ি তোলা আছে সকালে সিদ্ধ করা হবে বলে, তাই হাতড়ে কোয়াটা মিলেছিল। আর নেই, আর একটি কোয়াও নেই।

এই যে ভাত নামবে যাদু, খাবে। একটু সবুর, সোনা আমার। হল বলে, এই হল বলে।

শুনু ভোলে না, কেঁদে চলে। কথায় কি খিদে ভোলে কেউ।

আমায় খাবি ? মানা খাবি ? খা।

কোলে নিয়ে শুকনো মাই গুঁজে দিতে যায় শুনুর মুখে, সে দাঁতে দাঁত কামড়ে থাকে। তিন বছর মাই ছেড়েছে দুধ না পেয়ে চার বছরের মানুষ, সে কি আর এ ফাঁকিতে ভোলে।

তখন উনানে চাপানো হাঁড়ি থেকে এক হাতা আধসিদ্ধ জাউ আর পাথরের বাটি থেকে একটু কচু শাক তাকে দেয় ফুলু। ঠাণ্ডা শাকটুকু সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে শুনু। খাওয়ার মত জুড়োলেই খায় জাউটা। তারপর আরও চেয়ে কাঁদে ঢিমে সুরে নেতিয়ে পড়ে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইখানে।

সময় কি পার হয়ে গেছে শুনুর বাপের আসবার, এসেই যদি থাকে ওই গাড়িতে ? এমনি যদি এসে থাকে, মিছিমিছি ? এক কোশ পথ, জলে কাদায় চলার মত নেই। হেঁটে আসতে সময় লাগবে বৈকি।

আসে যদি তো তাকে সে খাওয়াবে কি ? পরশু বাড়ন্ত হবে চাল, কিনে না আনলে। এতগুলি মুখ তো বাড়িতে। বিকালে জাউ বরাদ্দ, নয় তো পচাটে গন্ধের নষ্ট যে চাল বুড়ো সরকারী দোকান থেকে এনেছে সস্তা দরে, ওই চালের ভাত। ভাগ্যে শুনুর বাপের মনিঅর্ডার এসে গিয়েছে ডাকঘর বন্ধ হবার আগে, চাল কেনা যাবে। কটা আর টাকা, কতটুকু চালই বা কেনা যাবে, যা দর বেড়েছে চালের। চাল বাড়ন্ত হবেই এ মাসে, ও আর ঠেকানো যাবে না, পরশুই হবে না চাল বাড়ন্ত এইটুকু শুধু ভরসা টাকাটা এসে পড়ায়। বুড়ো এগার টাকা পেনসন পেয়েছে, আগের জমানো দু'দশ টাকা আছেও নিশ্চয় হাতে, কিন্তু বুড়োর ভরসা করা বৃথা ও নিজে খাবে, নাতিকে খাওয়াবে নাতিকে ইংরেজী পড়াবে ইস্কুলে।

শীতকালের জমাট নারকেল তেলের মত সাদা ঘি আনবে, পাঁপর আনবে লেবেঞ্চুস আনবে শুনুর বাপ, শাড়ি আনবে, সায়া আনবে তার জন্য, এই জাউ আর কচু শাক সে খাওয়াবে নাকি তাকে ? কুলোবে না—এতে তাদেরি আধপেটা

হবে না পদীকে বাদ দিয়েও, ফুলুর বাপ এলে এতে কুলোবে না! চাট্টি চাল নিয়ে সে আবার ভাত রাঁধবে। দুটি যে ডাল আছে তোলা, তাও দিয়ে দেবে হাঁড়িতে। খিচুড়ি হবে না, ডালেচালে সেদ্ধ একটা জিনিস হবে যা হোক কিছু। ভিন্ন করে ডাল রাঁধতে হলে—

নিবু নিবু উননটার দিকে চেয়ে থাকে ফুলু। কাঠির মত সরু কটা শুকনো ডাল আর বাকী আছে, পিসি যা কুড়িয়ে এনেছে সব ভিজে চুপসে, কালও জ্বলবে না। ডাল ভাতে একটা চড়াও সে রাঁধবে তবে কি দিয়ে শুনুর বাপ যদি এসেই পড়ে এখন?

আসবে না এখন আসতেই পারে না। ডাক ধর্মঘট শুরু হয়েছে, এখন কি আর সে ছুটি পাবে একটা দিনের, এমনি অবস্থায় দু'মাসের মধ্যে পেল না? ধর্মঘট শুরু না হলে বরং কথা ছিল। এখন কাজ না করলে তো তাড়িয়েই দেবে একেবারে। বুড়ো তাই বলছিল।

কিন্তু যদি ধর্মঘট করে থাকে ফুলুর বাপ?

নিশুতি রাতের ভিজে অন্ধকারকে ছিঁড়ে দেয় বিদ্বেষী কুকুরগুলির ভীরু আর্তনাদ। শেয়ালের পালা ডাকের জবাব নয় এটা, শেয়াল ডাকেনি কিছুক্ষণের মধ্যে। কি হল, কে এল পাড়ায়, কে জানে। ফুলুর চোখে ঘুম নেই। মাঝরাত্রি পর্যন্ত পেট ভরে অনেক কিছু খাওয়ার কল্পনার অলীক কষ্ট আর উত্তেজনা তাকে জাগিয়ে রাখে, চোখ বুঁজে আর চোখ মেলে সে দেখবার চেষ্টা করে ঘরের আঁধার বেশি কম হল কি না। তাতেও আনমনা হতে পারে না।

মনাবাবু আসেনি বিকালের গাড়িতে। কানাই ছাড়া কেউ আসেনি। কানাই যে এসেছে তাও ফুলু টের পেয়েছে মাত্র খানিক আগে পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ কানাই-এর রামপ্রসাদী গান শুনে। এমন সুন্দর গাইতে পারে কানাই রামপ্রসাদী গান, মদ খেয়ে অনেক রাতে সে গান ধরলে এমন আকুল হয়ে ওঠে ফুলুর প্রাণটা। মন তুমি কৃষি কাজ জান না গানটা গাইতে গাইতে হঠাৎ কেন যে থেমে গেল কানাই।

কার সাথে যেন কথা বলছে। শুনুর বাপের গলা!

বাবা শুনছেন? ওঠেন। ছেলে এয়েছে আপনার।

দোর খুলে দাও?

খুলি।

আঁধার রাতে একা দোর খুলে দিতে ভয় করে শুমুর বাপকেও। সত্যি যদি না হয়, এমন যদি হয় যে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, ঘুমের মধ্যে উঠে গিয়ে দরজা খুলবে অজানার ডাকে, কোথায় চলে যাবে বাইরের রহস্যময় রাত্রির জগতে। পিসিকে ঠেলে তুলে দেয়। শুমুকে কাঁদায়। পচাকে ডাকে জোর গলায়। ঘুমের মোহকে করে নেয় বাস্তব। হুড়কো খুলবার আগে শুধোয়, কে গা?

আমি গো আমি। বীরেন।

বাইরে মেঘ ঢাকা চাঁদের আলোয় রাত্রির রং ফিকে, ঘরে গলা শুনে মানুষ চিনতে হয়। ফুলু হাত ধরে বীরেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে তক্তপোশে বসায়। মুখ না দেখে, মানুষ না দেখে, কুশল জানাজানি কথা বলাবলি কেমন অর্থহীন শোনায়, ব্যাঙের মত মনে হয়।

হঠাৎ যে এলি বীরু? বুড়ো বলে কাঁপা গলায়।

স্ট্রাইক হল যে? শোননি?

সব্বোনাশ! বুড়োর গলায় কাঁপুনি নেই, আওয়াজটা দাপড়ানির, তুই করেছিস কি? অন্য সময় যেমন তেমন, এখন কামাই করলে তাড়িয়ে দেবে যে চাকরী থেকে!

সবাইকে তাড়াবে?

সবাইকে? সবাই কখনো ধম্মোঘট করে? তোর মত হাবা গোবা দু'চার জন গরম গরম কথা শুনে—

ঠিক আছে, ঠিক আছে। সব ডাকঘরে কুলুপ আঁটা। কাজ করব কোথা যে কামাই হবে?

বীরেনের কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে সন্ধ্যা দেখাবার রেড়ির তেলের দীপটা জ্বালে ফুলু। তেলটুকু ফুরিয়ে যাবে, কাল মুস্কিল হবে সাঁঝকে বরণ করা। তা হোক প্রদীপের আলোয় হাঁড়িকুড়ি কাঁথাকানি আম কাঠের সিন্দুক টিনের তোরঙ্গের ঘর সংসার আর মানুষগুলি রূপ নেয়, সব জুড়ে ছেঁড়া ভাঙ্গা চোরা জীর্ণ পুরানো দারিদ্র্যের রূপ।

বেড়ার ওপাশে পদী কাতরায়, দাদাগো, জ্বরে মরলাম গো। একবারটি এলে না দাদা, দেখলে না মোকে?

খুব জ্বর ম্যালোরি ধরেছে। বলেছিলাম না তোমায়? ফুলু বলে বীরেনকে।

অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ। বীরেন বলে আনমনে। শ্রান্তক্লান্ত নয়, তাকে চিন্তিত দেখায়, গম্ভীর।

পিসি বলে অনুযোগ দিয়ে, গেরন গেল, গঙ্গায় ডুব দেওয়ালি না বাবা আমাকে ?

পচা বলে, সবাই স্ট্রাইক করেছে মামা ? বাঃ কি মজা ! আমাদেরো স্কুলে কাল থেকে স্ট্রাইক।

কিসের স্ট্রাইক ? বীরেন জিগগেস করে। বুড়ো উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

মাইনে বাড়িয়েছে না, সেজন্য। আর দু'জনকে তাড়িয়েছে বলে। শিবুদাকে চেনো তুমি, আরেকজনকে চেনো না, তার নাম সতীশ, সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। মাইনে বাড়াবার জন্য মিটিং করেছিল ছেলেদের নিয়ে, সেক্রেটারীর নিন্দে করেছিল, তাই তাড়িয়েছে। ওদের না নিলে, মাইনে না কমালে আমরা আর যাচ্ছিনে

ইস্কুল যাবি না ? টান হয়ে যায় বুড়ো, রাগে থর থর করে কাঁপে। তোর ঘাড় যাবে ইস্কুল। আমি তোকে কাল ইস্কুল নিয়ে যাব। আট গণ্ডা মাইনে বেড়েছে তো তোর বাপের কি ? তুই গুনিস মাইনের টাকা ?

মুখচোরা ভীরু ছেলেটাকে সোৎসাহে মামার সঙ্গে এত কথা বলতে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

পদী উঠে আসে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বেড়ার ওপাশ থেকে। বীরেনের বিয়ের সময় ঘরের মাঝামাঝি মানুষের চেয়ে হাতখানেক উঁচু এই বেড়া উঠেছিল ছেলে বৌকে শুতে দেবার জন্য, এপাশের সব কথা ওপাশে শোনা যায়। শুধু কথা শুনে চলছিল না পদীর।

তিন্যাটুকু খেতে দেয়নি দাদা। 'কাঁদ কাঁদ' সুরে পদী নালিশ জানায়।

জ্বরের মধ্যে কি খাবি ? উঠে এলি কেন আবার ? যা, শুয়ে থাকবি যা।

সবাই ভড়কে যায় তার ধমকে। জ্বর গায়ে বোনটা উঠে এসেছে একটু আদরের জন্য তাকে এমন করে ধমকানো ! ওর ন্যাকামিতে ফুলুরও গা জ্বলছিল, কিন্তু এভাবে ধমকে উঠাতে তারও মন সায় দেয় না। আনমনা গম্ভীর শুধু নয়, শ্বশুর বাপ যেন কেমন শক্ত আর নিষ্ঠুরও হয়ে গেছে।

খারাপ লাগে সকলের, কিন্তু এমন আশ্চর্য ব্যাপার, ধমক যে খায় সে খানিক হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থেকে কথা কয় স্বাভাবিক ভাবে, অভিমানের লেশটুকুর হদিস মেলে না।

একটু উঠলে কি হয়, শুয়েই তো আছি। হাঁ দাদা, গুলিটুলি চলছে নাকি ?

এখনো চলেনি।

কিছু খাবে নাকি তুমি? ফুলু জিগগেস করে ভয়ে ভয়ে। কিছুই নেই খেতে দেবার। শুমুর বাপ সত্যই বাড়ি এসেছে এ আনন্দে এতক্ষণ বার বার ঝাপটা এসে লাগছিল এই লজ্জা ও দুঃখের যে, বাড়ির মানুষটা বাড়ি ফিরেছে এতকাল পরে তাকে খেতে দেবার কিছুই নেই গেরস্ত বাড়িতে।

বীরেন বলে যে এত রাতে কিছু আর খাবে না, গাড়িতে খেয়েছে। মনে শান্তি আসে না ফুলুর। সামনে যদি ধরে দিতে পারত কিছু, তারপর শুমুর বাপ বলত খাবে না, তা হলে ছিল ভিন্ন কথা।

স্থান অদল বদল করে শোয়ার ব্যবস্থা হয়। বেড়ার এক পাশে যায় সকলে, অন্য পাশে ফুলু বীরেন আর শুমু। গাদাগাদি করে শুতে হয় সকলকে, কিন্তু উপায় কি, এতকাল পরে ছেলে বাড়ি এসেছে, ছেলে বৌকে নিরিবিলি শুতে না দিলে চলবে কেন। নিবু নিবু দীপটা ফুলু হাতের বাতাসে নিবিয়ে-দেয়। এবার কথা বলতে হবে চুপি চুপি, প্রায় কানে কানে, নয় তো ওপাশে শুনতে পাবে ওরা।

বুক কাঁপছে শুনে থেকে। কেন করতে গেলে ধর্মঘট?

হু।

এখনো আনমনা অনিচ্ছুক মানুষটা, মোটে চাড় নেই, সাড় নেই। এমন তো করে না কোনোবার বাড়ি এসে। আহত অভিমানে নিজেও চুপ করেই থাকবে কিনা মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ফুলু ভাবে। কিন্তু তা কি পারা যায়। টিপি টিপি শুরু হয়ে জোরে বৃষ্টি নেমে ঝমাঝম আওয়াজ তোলে টিনের চালে। এমনি বৃষ্টি খানিকক্ষণ চললেই শোয়ার দফা শেষ। ভাঙ্গা চালার তিন জায়গা থেকে জল পড়বে ঘরের মধ্যে উঠে সামলাতে হবে। তবে বৃষ্টির শব্দ ওঠায় একটু জোরেই এখন কথা বলা চলবে, শোনা যাবে না।

কি হয়েছে তোমার?

কি হয়েছে? হয়নি কিছু। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম, ভাল লাগছে না এখন।

কাজ থাকবে না? তাড়িয়ে দেবে? উৎকণ্ঠায় ফুলু ব্যাকুল, তবে যে বললে তালা বন্ধ ডাকঘরে, কিছু হবে না কাজে না গেলে?

সে কথা নয়। ভাবছি কি, চলে এলাম, কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতে পাব না। বীরেনের কথা উৎকণ্ঠায় ভরা, তা ছাড়া, চলে এলাম, পিকেটিং এর লোক যদি কম পড়ে? যদি হেরে যাই আমরা?

বললে না হাজার হাজার লোক ধর্মঘট করেছে? ওরা তো আছে।

তা আছে। কিন্তু—

কি বলবে ঠিক করতে পারছে না গুন্নুর বাপ। মনের ভাবটা বুঝিয়ে বলতে পারছে না তাকে এটা সে বুঝেছে যে হঠাৎ বাড়ি চলে এসে এখন ভারি উতলা হয়ে পড়েছে তার মন। এত বড় একটা কাণ্ড করে এসেছে চাকরীর ব্যাপার, এ বাঁচন মরণের কথা। সেখানে কি হচ্ছে জানতে পাবে না ভেবে ব্যাকুল তো হবেই মনটা। কিন্তু ও নেই বলে কিছু হবে না, ধর্মোঘট ভেস্তে যাবে, এ কোন দেশী কথা। এ দুশ্চিন্তার মাথামুণ্ডু মাথায় ঢোকে না ফুলুর। ওই কি কর্মকর্তা ছিল, ধর্মোঘট চালাচ্ছিল? বীরেনের বুকে মাথা রেখে সে তার আঙ্গুলগুলি নিয়ে খেলা করে। বোঝাবার চেষ্টায় বীরেন বলে, কি জান, লড়াই চলছে তো একটা একজন কম হলে জোর তো একটু কমল? তা ছাড়া, আমি চলে এলাম, আর দশজন আমার মত ভাবল, একা একজন চলে গেলে কি হয়, সবাই তো আছে। বুঝলে না? ভাল লাগছে না আমার।

ভেবে আর কি করবে?

না, আমার বিশ্রী লাগছে। মিটিং হবে আমি নেই, পিকেটিং হবে আমি নেই,—

অবিরল জল ঝরে টিনের চালে, বিরাট জনতার গর্জনের মত আওয়াজ চলে অবিরাম। কারো চোখে ঘুম নেই। বীরেন ছটফট করে জ্বরের রোগীর মত। ফুলুকে উঠে প্রদীপটা আবার জ্বালতে হয়, ঘরে জল পড়ছে। মেঝে ভেসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, মেঝেতে আর শোয়া চলবে না, কিছু রাখাও চলবে না। সেকেলে পুরানো তক্তপোশটি আর ও বছরের বানানো বাঁশের ছোট নিচু মাচাটিই এখন সম্বল সকলের। পদ্মীকে মাচাটিতে শুতে দেওয়া হয়। কাঁথা কানি জিনিসপত্র নিয়ে অন্য সকলে ঘেঁষা ঘেঁষি করে আশ্রয় নেয় তক্তপোশে।

ফুলু বসে মেঝেতে একটা পিড়ি পেতে। প্রদীপ নিভে গেছে তেল ফুরিয়ে।

ভোরের আগে বীরেন বলে, আমি রওনা দি। ভোরের ট্রেনটা ধরতে হবে।

বিষ্টি পড়ছে যে?

পড়ুক বিষ্টি। ভিজে ভিজেই যাব।

কাগজ মোড়া শুকনো জামা কাপড়ের পুঁটুলিটা বগল দাবা করে ভিজতে ভিজতে বীরেন স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছে অর্ধেক পথ, পিছনে থেকে ডাক আসে, মামা!

বীরেন দাঁড়ায়। পচা এসে তার নাগাল ধরে। কেঁদে বলে আমি কাল ইস্কুল যাব না মামা।

এই কথা বলতে এলি ভিজে ভিজে অ্যাদ্দূর ?

দাদু জোর করে নিয়ে যাবে ইস্কুলে। এখানে থাকব না আমি। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।

বীরেন হাঁটতে শুরু করে বলে, হাঁট তবে, জোরসে হাঁট। গাড়ি ফেল করলে চড় খাবি।

ওপরে বৃষ্টিপাত, নিচে খাল খন্দ কাদা ভরা পিছল পথ। দু'জনে এগিয়ে চলে পাশাপাশি। বীরেন হাত ধরে পচার।

ভিটে মাটি

চরিত্র

মধু ॥ চাষী যুবক

পদ্মা ॥ শম্ভুর মেয়ে

মাখন ॥ কামার যুবক

স্বর্ণ ॥ ছোটলালের স্ত্রী

ছোটলাল ॥ শিক্ষিত যুবক

সুভদ্রা ॥ ছোটলালের বোন

কাদের ॥ চাষী

আমিরুদ্দীন ॥ চাষী

আজিজ ॥ আমিরুদ্দীনের ছেলে

রামঠাকুর ॥ পুরোহিত ব্রাহ্মণ

নকুড় ॥ গ্রাম্য আড়তদার

ভূষণ ॥ চাষী

শম্ভু ॥ চাষী

প্রথম দৃশ্য

[সকাল। সবে সূর্য উঠেছে। বাড়ীর সামনে আঙ্গনে উবু হয়ে বসে মধু চকচকে ধারালো দা দিয়ে একটা বাঁশ চেঁছে সাফ করছিল। কতগুলি ছোট বড় বাঁশের টুকরো কাছে পড়ে আছে। বাড়ীর দেয়াল মাটির ও চালা ছণের। পাশে একটা লাউমাচা। লাউমাচার পিছনে থানিক তফাতে ডোবা আর বাঁশ ঝাঁড় নজরে পড়ে।

মধুর বয়স সাতাশ আটাশ হবে, দেহ সুস্থ ও সবল। তার গায়ে কোড়া একটা গামছা জড়ানো, পরনে আধ ময়লা মোটা কাপড়, হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত নেমেছে। কোমরে আলগাভাবে একটা গরু বাঁধা দড়ি জড়ানো।

দ্রুতপদে, প্রায় ছুটতে ছুটতে পদ্মা এসে দাঁড়ায় তার চুল এলোমেলো, আঁচল একহাতে কাঁধে চেপে ধরে আছে। এসে দাঁড়িয়ে আঁচল ভাল করে গায়ে জড়িয়ে সে হাঁপাতে থাকে।]

মধু। (উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ্রভাবে) কি হয়েছে পদি ?

পদ্মা। যাবার আগে একটি বার পালিয়ে এলাম।

মধু। (একটু হতাশ ভাবে) যাবার আগে !

পদ্মা। নইলে ছুটে আসি ?

মধু। আমি ভাবলাম তোদের বুঝি যাওয়া হ'লনা তাই ছুটে এয়েছিস ভাল খপরটা জানাতে। খুব ভোরে না কথা ছিল রওনা দেবার ?

পদ্মা। ছিল না ? জিনিষ পত্তর গাড়ীতে বোঝাই দিয়েছে কখন। এটা ওটা ছুতো করে আমি দিলাম বেলা করিয়ে। ভাবছি কখন আসে মানুষটা কখন আসে, পথ চেয়ে রইছি ভোর থেকে। যেতে বুঝি পারলে না একবারটি ? না, মন করলে মরুক গে যাক, পদি গেলে মেয়া জুটবে ঢের !

দেনা শুধলাম। সাত বিঘে বেশী জমি এবার ভাগে চষেছি, কাল পরশু রুইতে সুরু না করলে নয়। এগার কাহণ খড় ধরে রেখেছিলাম, এবার বেচতে হবে। বুড়ো বাপটা সুধু দুধ খেয়ে বেঁচে আছে, লক্ষ্মীকে ফেলে বিদেশে পালালে খেতে না পেয়ে বাপটা আমার মরে যাবে। জমির ধান ঘরে তুললে আমার মা বোন বাপ সারা বছর খাবে। আমার যাওয়ার উপায় নেই, (ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে) কেবল এসব অসুবিধের জন্য নয়, যাবার কথা ভাবলেই মনটা হুহু করে।

পদ্মা। কেন ?

মধু। তুই মেয়ে মানুষ, বাপের ঘরে বড হয়ে সোয়ামীর ঘরে ঘলে যাস ঘরদোর জমিজমার দরদ তুই কি বুঝবি ? বেড়া থেকে একটা কঞ্চি কেউ খুলে নিলে টের পেয়ে যাই। ক্ষেত থেকে এক কোদাল মাটি নিলে মনে হয় এক খাবলা গায়ের মাংস নিয়ে গেছে। সব ফেলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। সবাই পালাক, গাঁ খালি হয়ে যাক, একা আমি আমার ক্ষেতখামার ঘরবাড়ী গাইবাছুর আগলে গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো।

পদ্মা। তবে কি হবে ? তুমি এখানে থাকবে, আমি চলে যাব—

(শম্ভুর প্রবেশ। পঞ্চাশ বছরের গৃহস্থ চাষী)

শম্ভু। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) তুই এখানে ? চাদ্দিকে চুড়ে চুড়ে হয়রান হয়ে গেলাম। কি করছিস তুই এখানে বেহায়া বজ্জাত মেয়ে ?

মধু। আমি একবারটি ডেকেছিলাম।

শম্ভু। কেন ডেকেছিলে ? আমার মেয়েকে তুমি কেন ডাকবে, আমার বিয়ের যুগ্যি এতবড় মেয়েকে ? আস্পদ্দা কম নয় তো তোমার ?

মধু। গাঁ ছেড়ে যাওয়া নিয়ে ক'টা কথা বলার ছিল।

শম্ভু। (হঠাৎ উৎসুক হয়ে) তোমার যাওয়ার কথা ? মত বদলেছ তুমি ? ভগবান সুমতি দিয়েছেন ? শোন বলি মধু, প্রাণের ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছি বটে, মন কি যেতে চাইছে মোর। বুকটা হুহু করছে। ঘরদোর এদিকে নষ্ট হবে, বিদেশ বিভূঁয়ে ওদিকে দশা কি হবে মোদের ভগবান জানেন। তুমি যদি সঙ্গে যাও, বুকে জোর পাই আমি।

মধু। তা হয় না।

শম্ভু। ওই এক কথা তোমার। কেন হয় না শুনি ? বীরু, ভূষণ, কানাই, নকুড়, বনমালী সবাই যেতে পারে, তুমি যেতে পার না ? এমন একগুঁয়ে হয়োনা

বাবা। কথা শোন মোর। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি বড় ঠাকুরের মুখে, বুদ্ধিমান যে হয় সে কি করে? না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। প্রাণ যদি থাকে বাবা, সব বজায় থাকে, প্রাণ যদি যায় তো ঘরদুয়ার, জিনিষপত্তর থেকে কি হয় মানুষের! কিছু কি রাখবে ওরা, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। কিসের ভরসায় তবে গাঁয়ে পড়ে থাকা? আমি তোমায় ভাল ছাড়া মন্দ পরামর্শ দেব না মধু। কথা রাখো আমার, চলো একসাথে যাই।

পদ্মা। তাই চলো। একসাথে চলে যাই।

(মধু একবার তার দিকে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে তাকাল, তারপর চিন্তিতভাবে অন্যদিকে চেয়ে চুপ করে থাকে।)

শম্ভু। (মধুর নীরবতায় উৎসাহিত হয়ে) জান বাবা, কাল আমরা চলে যেতাম, তোমার জন্য প্রাণ হাতে করে একটা দিন দেরী করলাম। শুধু তোমার জন্য। কত কষ্টে মদনের গাড়ী পেইছি মদনকে রাজী করে। বুড়ো ক্যাংটা বলদ দুটো, গাড়ী চলবে টেঙ্গস টেঙ্গস। যাহোক তাহোক, গাড়ীতে সব মালপত্তর বোঝাই দিয়েছি, রওনা হবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, তবু তুমি যদি যাবে বল মধু, আজকেও যাওয়া বন্ধ করে দিতে রাজী আছি। কাল একসাথে রওনা হব। তুমি আমার ছেলের মত, ছেলের চেয়ে বেশী। সেবার যখন ডাকাত পড়ল বাড়ীতে, তুমি সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে সময় মত হাজির হয়েছিলে বলে ধনেপ্রাণে বেচে গেছলাম। সে ঋণ এ জন্মে শোধ হবার নয়। নকুড় তিনশো টাকা পণ দিতে চেয়ে কত সাধাসাধি করেছে, আমি বলেছি, না, আমার জামাই হবে মধু। আজ অবস্থা যেমন হোক, মধুর চেষ্টা আছে, সে উন্নতি করবে। সে আমার ধনপ্রাণ বাঁচিয়েছে, আমার মেয়ের ধম্মো রক্ষা করেছে, সে ছাড়া কারো হাতে আমি মেয়ে দেব না। মোদের সাথে চলো মধু, যে অবস্থায় যেখানে থাকি, এক মাসের মধ্যে শুভকর্ম্মোটা সেরে ফেলব।

মধু। (অন্যমনস্ক ভাব কেটে আত্মস্থ হয়ে) তাই যদি মন থাকে দাসমশায়, বিয়েটা সেরে দিয়ে ওকে রেখে যাও।

শম্ভু। ডাকাত বেটাদের জন্যে?

মধু। আমি বেঁচে থাকতে মোর বৌকে ছোঁবে!

শম্ভু। তুমি বেঁচে থাকলে তো!

মধু। আমি যদি মরি, মোর বৌও মরতে পারবে।

শম্ভু। মেয়ের আমার জোর বরাত বলতে হবে, ওমাসে বিয়েটা হয়ে যায়নি। তোমার বৌ হয়ে মরে কাজ নেই, আমার মেয়ে হয়েই মেয়ে আমার বেঁচে থাকবে।

নকুড়ের প্রবেশ। শম্ভুর সমবয়সী গ্রাম্য মহাজন ও আড়তদার। গায়ে গলাবন্ধ গরম কোট, কাঁধে সস্তা চাদর ও পায়ে চটি।

নকুড়। এই যে পাওয়া গেছে। তা আর দেরী করা কেন, বেলা নেহাৎ মন্দ হয়নি।

শম্ভু। না, আর দেরী নেই। দে'মশায়, আমাকে আর দু'কুড়ি এক টাকা ধার দেবে?

নকুড়। তা—সে নয় দিলাম। টাকাটা লাগবে কিসে?

শম্ভু। মধু বায়নার টাকা দিয়েছিল, সেটা ফেরত দিয়ে যাব। ওর সঙ্গে কোন বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে চাই না। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে যাব।

নকুড়। দিচ্ছি। এক্ষুনি টাকা দিচ্ছি।

(কোমর থেকে থলে বার করে টাকা গুণতে লাগল। বোঝা গেল হঠাৎ সে ভারি খুসী হয়ে উঠেছে। বার বার পদ্মার দিকে তাকাতে লাগল।)

পদ্মা। তুমি আবার দে' মশায়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ বাবা! শোধ দেবে কি করে?

নকুড়। আহা, নাই বা শোধ দিল! আমি কি বলেছি শোধ দিতে হবে।

পদ্মা। টাকা নিলে শোধ দিতে হবে না কি রকম? তুমি নিওনা বাবা দে'মশায়ের টাকা।

শম্ভু। তুই চুপ কর।

মধু। আমার টাকা পরে দিলেও চলবে, দাসমশায়। বায়না হিসেবে রাখতে না চাও, ঋণ হিসেবেই টাকাটা এখন তোমার কাছে থাক্। হাতে টাকা হলে তখন দিও।

নকুড়। (তাড়াতাড়ি কয়েকটি নোট শম্ভুর হাতে দিয়ে) এই নাও দু'কুড়ি এক টাকা। বাড়ী গিয়ে একটা রসিদ দিও—ইষ্টাম্প মারা কাগজ একখানা আছে। হিসেবের জন্য একটা রসিদ নেওয়া—নয় তো তোমাকে টাকা দেব তার আবার রসিদ কি!

শম্ভু। সই করে দেব দে'মশায়, ভেবো না। তোমার বায়নার টাকা ফেরত নাও

মধু। (টাকাটা সামনে ফেলে দিল) আজ থেকে মোর সাথে কোন সম্পর্ক রইল না তোমার। চলো আমরা যাই।

নকুড়। আহা হা—দলিলপত্র ফেরত নাও। এমনি টাকাটা দিয়ে চলে যাচ্ছ কি রকম ?

শম্ভু। দলিলপত্র কিছু নেই।

নকুড়। লেখাপড়া হয়নি কিছু ? এমনি টাকা দিয়েছিল ? তুমি অস্বীকার করলে যে চাইবার মুখটি ছিল না ওর !

শম্ভু। টাকা নিয়েছি, অস্বীকার করব কেন দে'মশায় ?

নকুড়। তা বটে, তা বটে। সে কথা বলছি না। এমনি কথার কথা বলছিলাম আর কি যে টাকা যে, দিয়েছিল ও তার প্রমাণ কিছু নেই।

মধু। রসিদপত্র কিছু নেই, আদালতে নালিশ হত না, তবু একজন আর একজনের টাকা ফেরত দিয়েছে বলে গা জ্বালা করছে দে'মশায়ের।

নকুড়। টাকা তো মিলেছে অত কথা কেন আবার ?

শম্ভু। চলো আমরা যাই। চল্ পদি বাড়ী চল্।

পদ্মা। বাড়ী গিয়ে আর কি হবে বাবা ? আমি ওই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তুমি গিয়ে সবাইকে নিয়ে এসো। মোকে মোড় থেকে তুলে নিও।

শম্ভু। আয় বলছি বেহায়া বজ্জাত মেয়ে !

অন্তরালে রামঠাকুরের গলা শোনা গেল—শম্ভু নাকি হে ! ওহে শম্ভু দাঁড়াও, দাঁড়াও ! রামপ্রাণ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ। পরনে পাটের কাপড়, গায়ে উড়ুনি, পূজার বেশ। বগলে কাপড় জড়ানো পুঁথি, হাতে কুশাসন, ঘণ্টা প্রভৃতি আছে। আর আছে বেখাপ্পা রকমের মোটা একটা লাঠি। উড়ুনির একপ্রান্তে নৈবিদ্যের মত কি যেন বাঁধা। বছর চল্লিশেক বয়স, শুষ্ক শীর্ণ কাঠখোট্টা চেহারা, তবে দুর্বল মনে হয় না। গলার আওয়াজ মোটা ও কর্কশ। জোরে জোরে কথা বলা অভ্যাস।

রামঠাকুর। এই যে নকুড় ও আছ।

নকুড়। প্রণাম হই ঠাকুরমশায় !

রামঠাকুর। কল্যাণ হোক। তোমার সর্বনাশ হবে নকুড়।

শম্ভু। ঠাকুরমশায়, প্রণাম।

রামঠাকুর। কল্যাণ হোক ! তুমি উচ্ছন্ন যাবে শম্ভু।

শম্ভু। সকালবেলা শাপমণ্যি দিচ্ছেন কেন ঠাকুরমশায়?

রামঠাকুর। দেব না? আমাকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি চোরের মত গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছ, অভিশাপ দেব না তো কি আশীর্বাদ করব?

শম্ভু। সে কি কথা ঠাকুরমশায়। আপনাকে ফাঁকি দিলাম কখন? চোরের মতই বা গাঁ ছেড়ে পালাব কেন?

রামঠাকুর। তাই তো পালাচ্ছ বাপু? দিনক্ষণ গুনিয়ে নিলে না, রওনা হবার সময় দু'টো শান্তিবচন বলতে ডাকলে না, আশীর্বাদ নিলেনা, একটা খবর পর্যন্ত দিলেনা, আবার ঠিক আমার গোনা শুভদিনটিতে শুভক্ষণটিতে পালাচ্ছ। বাবুলালবাবুর জন্য কত পাঁজি পুঁথি ঘেঁটে আজকের শুভদিনটি বার করলাম, আমায় ঠকিয়ে আমার শুভদিনটিতে তোমরা যাত্রা করছ। ফাঁকি দেওয়া আর কাকে বলে?

মধু। শুভদিন কি আপনার সম্পত্তি নাকি ঠাকুরমশায়? একজনের জন্য আপনি দিন দেখে দিলে সে দিন অন্য কেউ গাঁ ছেড়ে যেতে পারবেনা?

রামঠাকুর। যেতে পারবে না কেন? আমার দক্ষিণাটা দিয়ে দিলেই যেতে পারবে।

মধু। তাই বলেন, আপনার দক্ষিণা চাই।

শম্ভু। বাবুলালবাবুও কি আজ যাচ্ছেন ঠাকুরমশায়?

রামঠাকুর। এই মাত্র শুভযাত্রা করিয়ে দিয়ে এলাম। কালরাত্রেই বড়বাবু ব্যাকুল হয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। পাঁচসিকে দক্ষিণা হাতে দিয়ে বললেন, কালের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে দিতে হবে ঠাকুরমশায়। ভাল করে পাঁজি পুঁথি দেখুন। পাঁজিতে আজ যাত্রা নিষেধ লিখেছে। বাবুলালের মা বেঁকে বসেছিলেন, আজ যাওয়া চলতেই পারে না। ঘড়ি পেতে আধ ঘণ্টা গুণে আমি বিধান দিলাম, আজ সকাল দশটার মধ্যে কিঞ্চিৎ পূজার্চনাদির পর যাত্রা অতীব শুভ। সকালে গিয়ে পূজার্চনাদি করে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আসছি। বাবুলালবাবু আবার দক্ষিণা দিয়েছেন পাঁচসিকে। বাবুলালবাবু লোক ভাল, তার মঙ্গল হবে। কিন্তু তোমাদের কেমন ধারা বিবেচনা নকুড়? শম্ভু? খবর পেয়েছ বড়বাবুকে বিধান দিয়েছি আজ সকালে যাত্রা প্রশস্ত, বামুনকে ফাঁকি দিয়ে আজকেই—যাত্রা করছ! যাচ্ছ, যাও। বারণ করিনে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। বাবুলালবাবুর যাত্রা শুভ বলে কি, তোমাদেরও আজ যাত্রা শুভ! মানুষে মানুষে তফাৎ নেই? রাশিচক্রের ভেদ নেই?

শম্ভু। রাগ করবেন না ঠাকুরমশায়। দিনক্ষণ দেখার কথা খেয়াল হয়নি মোটে। মাথার কি ঠিক আছে। এই সওয়া পাঁচআনা প্রণামী নিয়ে আশীর্বাদ করুন। (প্রণাম করল) ঠাকুরমশায়কে প্রণাম কর পদ্মি।

পদ্মা প্রণাম করল।

যাত্রা শুভ হবে তো ঠাকুরমশায় ?

রামঠাকুর। হবে বৈ কি। এক কাজ কোরো শম্ভু, নন্দপুরে পৌঁছে দামোদরের পূজো পাঠিয়ে দিও পাঁচসিকে। যাত্রা আরও শুভ হবে। আর তুমি নকুড় ?

নকুড়। আমি দু'দিন পরেই ফিরে আসছি ঠাকুরমশায়। আড়তের মালপত্রের ব্যবস্থা করে একেবারে যখন যাব, আপনাকে প্রণাম করে যাব বৈ কি !

রামঠাকুর। দু'দিনের জন্য হোক, একদিনের জন্য হোক, যাত্রা তো করছ বাপু? বামুনের আশীর্বাদ নিয়েই নয় গেলে ! সওয়া পাঁচআনা পয়সার জন্য অত মায়া কেন ?

নকুড় অগত্যা প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলে।

কল্যাণ হোক। বাস্, এবার তোমরা যেতে পার। দমোদরের পাঁচসিকে পূজো পাঠিয়ে দিতে ভুলো না শম্ভু।

শম্ভু। ভুলব না ঠাকুরমশায়।

(শম্ভু, পদ্মা ও নকুড় চলে গেল)

মধু। আপনি তবে রয়ে গেলেন ঠাকুরমশায় ? ও পাঁচসিকে এসে পৌঁছতে ঢের দেরী।

রামঠাকুর। তোমরা যদ্দিন আছ থাকতেই হবে। যেতে হলে তো সম্বল চাই দু'পয়সা ? যাবার সময় তোমরা কিছু কিছু দিয়ে যাচ্ছ, দেখি যদি তোমাদের সবাইকে শুভযাত্রা করিয়ে নিজের শুভযাত্রার সংস্থান কিছু হয় কিনা। এ বাজারে আমার ব্যবসাটা একটু উঠেছে, এইটুকু যা লাভ মধু। যা মন্দা যাচ্ছিল। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ধাঁধাঁয় পড়ে লোকে শুধু দিচ্ছিল ফাঁকি, বামুনপুরুতকে দুটো পয়সা দিতে জ্বর আসছিল গায়ে। এখন ভয়ের চোটে এমনি দিশেহারা হয়ে গেছে যে আদায় পত্র হচ্ছে কিছু, চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে। একটু উঠেছে ব্যবসাটা ! তবে এ আর ক'দিন ! এরপর যা মন্দাটা আসছে, কারবার গুটোতে হবে।

মধু। আপনার আবার ব্যবসা কি ঠাকুরমশায় !

রামঠাকুর। ব্যবসা বৈকি মধু। অন্ততঃ পেশা তো বটে। আমি কিছু বুঝিনে ভেবো না হে। ভক্তিতে কেউ একটি পয়সা দেয় না, যা দেয় ভয়ে। উকিল, মোক্তার, কোবরেজ, ডাক্তারের মত আমিও মোচড় দিয়ে যা পারি আদায় করে নিই। চলা চাইতো আমার। ওদের মত আমিও চক্ষুলজ্জার বালাই বিসর্জন দিয়েছি।

মধু। যেতে না বলে আপনি সবাইকে যেতে বারণ করেন না কেন ঠাকুরমশায়? যে ভাবে সব দিশেহারা হয়ে সব পালাচ্ছে, দুরবস্থার সীমা থাকবে না। আপনি জোর করে বললে হয় তো অনেকে যাওয়া বন্ধ করবে।

রামঠাকুর। কেউ যাওয়া বন্ধ করবে না বাবা। যে আতঙ্ক জন্মেছে, স্ত্রী পুত্র ফেলে যে সবাই উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দেয় নি তাই আশ্চর্য। কথা কেউ শুনবেনা মধু। যদি শুনত, বলে দিতাম এ বছর যাত্রা করার একটাও ভাল দিন নেই, সম্বৎসর অযাত্রা। যাত্রা করিয়ে কিছু কিছু পাচ্ছি, সে পাওয়ার লোভ নয় ছেড়েই দিতাম।

মধু। লোভ আপনার নেই ঠাকুরমশায়।

রামঠাকুর। আমি কলির ব্রাহ্মণ আমার লোভ নেই, বলো কি হে! লোভ আমার ধর্ম। কথা যারা শুনবে জানি, তাদের থাকতে বলছি মধু। তাও ওই লোভের হিসেবে। সবাই চলে গেলে আমার ব্যবসাই যে মাটি হবে। যত জনকে রাখা যায় ততই আমার লাভ।

ছোটলাল ও মাখন এসে দাঁড়াল। ছোটলাল মধুর চেয়ে কয়েক বছরের বড়, স্বাস্থ্যবান্ সুশ্রী চেহারা, শ্যামবর্ণ। সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের বেশ, মোটা কাপড়, সুতার মোটা কাপড়ের কোট, সস্তা মোটা গরম চাদর। পায়ে জুতো আছে, শিশির ভেজা মাটি লাগানো। মাখন তার সমবয়সী কামারের কাজ করে। গায়ে ফতুয়া, চাদর। কাপড় জামা ঘরে কেচে লালচে রকম সাফ করা। দেখলেই বোঝা যায় কোথাও যাবে বলে তৈরী হয়েছে, কারণ চুলও মোটামুটি আঁচড়ানো।

মধু। আরে, ছোটবাবু!

ছোটলাল। ছোটবাবু ডাকটা বদলাতে পার না মধু? শুনলে মনে হয় আমি যেন তোমাদের জমিদারের ভাই অথবা ছেলে, ছোট তরফ। সবাই ছোটবাবু বলে, তুমি ছোটবাবু বলে আমায় ছোট করে দাও কেন?

রামঠাকুর। ছোট করে দেয়! হা হা হা।

ছোটলাল। জমিদার বলা আর গালাগাল দেওয়া একই কথা ঠাকুরমশায়।

মধু। ওটা বলা কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে ছোটুবাবু। আপনি গেলেন না?

ছোটলাল। কোথায় গেলাম না?

মধু। ঠাকুরমশায় বললেন আপনারা আজ রওনা হয়ে গেলেন। শুনে ভড়কে গেছলাম।

রামঠাকুর। এই তো দোষ তোমাদের মধু। এমনি করে তোমরা গুজব রটাও আবোল তাবোল, মাথা মুণ্ডু থাকে না। আমি কখন বললাম ছোটলালকে রওনা করিয়ে দিয়ে আসছি? রওনা হলেন বাবুলাল।

ছোটলাল। দাদা পালালে আমিও পালাব মধু?

মধু। তাই তো ভাবছিলাম অবাক হয়ে—। বৌঠান ওনারা?

ছোটলাল। আমার বৌ থাকবে, আমার বোনটাও থাকবে। দাদা তার বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে যাবে পুরী।

মধু। যেতে দেবে?

ছোটলাল। তুমি পাগল মধু। সবাইকে কি ওরা আটকাচ্ছে—গুঁতো দিয়ে গাঁয়ে পাঠাচ্ছে আরও গুঁতো দেবার জন্য? যারা ভালো লোক, মিহি লোক, যাদের অনুগ্রহ করলে ফল পাওয়া যায়, তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। পাশ না যোগার করে কি আর দাদা যাচ্ছে। আর সত্যি বলি, দাদার ভাই বলেই আমিও আসতে পেরেছি গাঁয়ে। হয়তো আপসোস করছে সেজন্য এখন!

মধু। তা করছে। মোদের বাঁচাবার চেষ্টায় লেগে যাবেন এমনভাবে তা কি ভাবতে পেরেছিল।

ছোটলাল। দুপুরে একবার এসো মধু ভগবান মাইতির বাড়ীতে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে এখানে ওখানে চলে যাচ্ছে, এটা ঠেকাতে হবে। পরামর্শ করা দরকার।

মধু। মোর সাথে পরামর্শ!

ছোটলাল। সবার সাথেই পরামর্শ দরকার। আচ্ছা আমি যাই, সময় নেই।

ছোটলাল চলে যায়।

মধু। তুই সেজেগুজে চলেছিস কোথা মাখন?

মাখন। শ্বশুর বাড়ী।

মধু। বটে? বৌ ডেকেছে বুঝি?

মাখন। জরুরী ডাক, হুকুম একদম। আজ গিয়ে নিয়ে না এলে একলা চলে আসবে। ওর বাপ ভাই আসতে দিতে চায় না, পৌঁছেও দিয়ে যাবে না। এ গাঁয়ে আসতে ওদের ভয় লাগে। কি করি, আনতে যাচ্ছি।

রামঠাকুর। তুমিও দেবে নাকি কিছু দক্ষিণা ?

মাখন। আজ্ঞে না ঠাকুরমশায়। শুভ-যাত্রা করছি না, মোর এটা অযাত্রা।

রামঠাকুর। না বাবা, না। এটা শুভ যাত্রাই তোমার। লোকে পালাচ্ছে গাঁ ছেড়ে, বৌ ছেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তুমি এ সময় আনতে চলেছ বৌকে! বিনা দক্ষিণাতেই তোমায় আশীর্বাদ করছি, সবার চেয়ে তোমার যাত্রা শুভ হোক।

মাখন। তুই কবে পালাচ্ছিস মধু ?

মধু। আমি পালাব ?

মাখন। শম্ভু মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজ। তুই যাবি না ?

মধু। শম্ভু মেয়ে নিয়ে চুলোয় গেলে মোকেও যেতে হবে ?

মাখন। ও বাবা! বলিস কি রে ?

রামঠাকুর। শম্ভু ওর দাদনের টাকা ফেরত দিয়েছে, সঙ্গে গেল না বলে। নকুড়ের কাছ থেকে ধার করে দিয়েছে অবশ্য।

মাখন। বলিস কি রে ? তুই যে অবাক করে দিলি!

রামঠাকুর। অবাক তোমরা দুজনেই করেছ বাপ। তুমি যাচ্ছ বৌকে আনতে, ও যাবে না বলে ছেড়ে দিচ্ছে হবু বৌকে! হা হা হা! যৌবনের লক্ষণ এই। শাস্ত্রে বলেছে, যৌবন – অগ্নি তাপেন উষ্ণ ভবতি শোণিত। এ কিন্তু আমার শাস্ত্র বাপুসকল, ধোঁকা দেব না তোমাদের, মুখ্যু মুখ্যু সরল মানুষ তোমরা। শাস্ত্রটাস্ত্র পাট করা হয় নি বাপু আমার, দুটো মুখস্ত মন্ত্র বলতে পারি, বসে।

জোরে হাসতে হাসতে রামঠাকুরের প্রস্থান।

মাখন। বেশ লোক ঠাকুরমশায়। ওঁর বড় ভাইটা ছিলেন পয়লা নম্বর ভণ্ড তপস্বী।

মধু। বাবুলাল আর ছোটবাবু যেমন।

মাখন। কিন্তু মধু, এ কাজটা কি ঠিক হলো তোর ?

মধু। কোন কাজটা ?

মাখন। ভূষণের হাতে ছেড়ে দিলি পদিকে? শম্ভুকে বিপদে ফেলে পদিকে ও হাত করবে নির্ঘাৎ। আষ্টে পিষ্টে বেঁধেছে শম্ভুকে।

মধু। আমি কি করব ভাই। সবাইকে বারণ করছি গাঁ ছেড়ে যেতে, জোর গলায় বলেছি গাঁয়ের সবাই পালালেও আমি পালাব না, মা বোনকে পাঠাব না। নিজেই পালাব এখন? মরলেও তা পারব না।

মাখন। এমনি যদি হানা দিতে থাকে?

মধু। তা হলেও পালাব না। আর ও যদির হিসেব ধরলে কি কূল কিনারা পাব ভাই? ছোটবাবু বলেন, যদি লাগিয়ে সব কিছু ঘটানো যায়, সব কিছু বাতিল করা যায়। বুঝে শুনে তলিয়ে বিচার করে দেখতে হবে সব কথা। আমার মনে বড় লেগেছে কথাটা। পালাব কোথায়? সমুদ্দুর ডিঙ্গিয়ে যদি যেতে পারতাম অন্য দেশে তবে নয় কথা ছিল।

মাখন। আমিও তাই ভেবে আনতে যাচ্ছি বৌটাকে।

মধু। ভাল করেছিস। মা বোনকে মামাবাড়ী পাঠাবার কথাটাও কানে তুলি নি আমি। একজনকে ভয় পেতে দেখলে দশজনে ভয় পায়। একজনের সাহস দেখলে দশজনে সাহস পায়।

মাখন। কি কাণ্ডটাই চলেছে দেশ জুড়ে।

মধু। দেশ জুড়ে আর কই চলল ভাই। দেশ জুড়ে চললে কি আর ভাবনার কিছু থাকত, একদিনে সব ভয় ভাবনা চুকে যেত। ছোটবাবু গোড়ায় এসে তাই বলেছিলেন। তখন ভালো রকম বিশ্বাস করিনি কথাটা। এখন সবাই জানছি এ শুধু মোদের এলাকা। ছোট এলাকা পেয়েছে বলেই না বেড়া জালে ঘিরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছে, যা খুসী করছে। এ এলাকার বাইরের মানুষ নাকি জানেও না কি হচ্ছে এখানে। লোকের মুখে দু'চার জন মাত্তর কিছু কিছু শুনছে।

মাখন। শুনছি, কটা গাঁয়ের ধারে কাছে যেতে নাকি ভরসা পায় না। ভাবলে হাতুড়ি ঠুকতে হাতে যেন জোর বাড়ে।

মধু। কি তেজ, বুকের পাঠা, ভাবলে বুক ফুলে ওঠে সত্যি। আবার যখন ভাবি, কটা মোটে গাঁ, তখন দুঃখ হয়। যেমন বন্যা, তেমনি বাঁধ না হলে কি ঠেকানো যায়। বাঁধ বন্যায় ভেসে যায়। তবে সময় আসবে, বাঁধ আমরা বেঁধে তুলব। সবাই মিলে হাত লাগাব। সময় আসুক।

মাখন। সময় কবে আসবে ভাবি।

মধু। আসবে, আসবে। এমনি অবস্থা কি চলতে পারে। সবাই একজোট হবে, হেথা সেথা ছাড়া ছাড়া ভাবে নয়, সব ঠাঁয়ে। সে আয়োজন হয়নি বলে তো মুস্কিল হল মোদের।

ব্যস্ত ভাবে কাদের, আমিরুদ্দীন ও আজিজের প্রবেশ। তিনজনেই চাষী শ্রেণীর লোক। কাদের মাঝ বয়সী, আমিরুদ্দীন বৃদ্ধ, আজিজ যুবক। আজিজের গায়ে পিরান।

কাদের। এই যে মধু ভাই। তোমায় খুঁজছিলাম।

মধু। কি ব্যাপার কাদের ভাই? টাকাটার জন্য?

কাদের। হাঁ। মধু ভাই, মোর টাকাটা দাও। তাড়াতাড়ি দাও।

মধু। দিচ্ছি! দেব যখন বলেছি, টাকা নিশ্চয় দেব।

কাদের। কেউ দিচ্ছে না ভাই। নগদ টাকাটা কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। নালিশের ভয় দেখালে বলে, কর নালিশ। কোথা নালিশ করব, কার কাছে! যদি বা করি, নালিশ করে, ডিগ্রী হতে কত সময় যাবে, ছ'মাস বছর বাদে মামলার খরচ শুদ্ধ তিনগুণ দিতে সবাই রাজী, এখন একটি পয়সা দিতে চায় না। আল্লা, আল্লা! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন।

(মধু কোমরে বাঁধা গেঁজিয়া থেকে ছটি টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা বার করল। শম্ভুর টাকা মাটিতেই এতক্ষণ পড়েছিল, টাকাটা তুলে গেঁজিয়ায় ভরতে গিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল। কাদেরকে তার পাওনা দিল)

মধু। এই যে তোমার ছ'টাকা ছ'আনা।

কাদের। তুমি লোক ভালো তাই চাওয়া মাত্র পেলাম। দে'মশায়ের কাছে দশ মন চালের দাম এক মাসের চেষ্টায় আদায় হল না ভাই। বলেন, আরও দশ মন চাল দিয়ে একসাথে দাম নিয়ে যাবে। আরও দশ মন চাল দিলে খাব কি! চালের দাম কত বেড়ে গেছে, উনি কিনবেন সেই আগের দামে। আল্লা, আল্লা! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন!

মধু। দুর্দিন তো বটেই। কেটে যাবে দুর্দিন। খারাপ সময় চিরকাল থাকে না।

আমিরুদ্দীন। আলাপ সুরু করলে কাদের মিঞা? যেতে হবে না?

মধু। তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন?

আমিরুদ্দীন। আমরা আজ চলে যাচ্ছি।

কাদের। ব্যস্ত হব না মধু? বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার গুটিয়ে যাওয়ার,

হাঙ্গামা কি সহজ! কোন দিকে যাই কি করি ভেবে দিশেহারা হয়ে গেলাম। একটা গরুর গাড়ী মিলল না। একবেলার রাস্তা কদমসাই, চার টাকা কবুল করে গাড়ী পেলাম না। মেয়েদের হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। আল্লা আল্লা! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন।

মধু। নাই না গেলে কাদের?

কাদের। মরতে বলো নাকি তুমি?

আমিরুদ্দীন। শুধু কি মরব? মোদের জান নেবে, মেয়েদের বেইজ্জৎ করবে।

কাদের। কিসের ভরসায় থাকি বলো?

মাখন। কিসের ভরসায় যাচ্ছ? কদমসাই গেলে কি জান বাঁচবে, মেয়েদের ইজ্জৎ বজায় থাকবে কাদের? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তোমাদের মেয়ে বৌ যেখানে হেঁটে যাবে, ওরা সেখানে যেতে পারবে না? সেখানে বিপদ তোমাদের বেশী হবে। আত্মীয় বন্ধু, গাঁয়ের চেনা লোক, সেখানে তোমাদের কেউ সহায় থাকবে না। বিপদ হলে সেখানে তোমাদের কে দেখবে ভেবে দেখেছ? তার চেয়ে নিজের গাঁয়ে থাকাই তো ঢের ভাল। বিপদে আপদে গাঁয়ের লোক দশটা ছুটে আসবে।

কাদের। কে আসবে? সবাই পালাচ্ছে। মানপুরে হানা দেওয়ায় সবাই ডরিয়েছিল। ছোটবাবু ভরসা দিয়ে থাকতে বললেন, শুনে সবার বুকে একটু সাহস জাগল। অনেকে পালাবে ঠিক করেছিল, তারা যাওয়া বাতিল করে দিল। এবার সবাই খবর পেয়েছে ছোটবাবুরা নিজেরাই পালাচ্ছে। শুনে ফের সবাই ভয় পেয়ে গেছে।

(মাখন ও মধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করল)

মধু। ছোটবাবু পালাবেন না কাদের ভাই।

কাদের। (সন্দিগ্ধ ভাবে) পালাবেন না? তবে যে শুনলাম আজ ছোটবাবুরা সব পালাচ্ছেন?

মধু। আজ বাবুলালবাবু চলে গেছেন। ছোটবাবু যাবেন না।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু একা থাকবেন? একা থাকতে ডর কিসের। যখন খুসী যেতে পারবেন। ডর তো বাচ্চা-কাচ্চা মেয়েদের জন্য।

মধু। একা নয় ভাই, তিনিও বাচ্চা নিয়ে, বৌ আর বোনকে নিয়ে থাকছেন। ওকে শাপ দিতে দিতে চলে গেছে বাবুলাল। ওই যে ছোটবাবু ফিরছেন—ওঁকেই জিগ্যেস কর। ছোটবাবু! শুনবেন একবার?

ছোটলাল এল।

ছোটলাল। কি মধু? তোমাদের খবর ভাল?

আজিজ। ছালাম ছোটবাবু।

ছোটলাল। ছালাম। তোমার জ্বর ছেড়েছে আজিজ?

আজিজ। ছেড়ে গেছে।

কাদের ও আমিরুদ্দীন। ছালাম ছোটবাবু। আপনিও পালাচ্ছেন শুনে মোরা ডরিয়ে গেছি। আপনার দাদা চলে গেছেন নাকি?

ছোটলাল। ছালাম, ছালাম। দাদা চলে গেছেন ভাই। অনেক চেষ্টা করলাম রাখবার জন্য, কোন কথায় কান দিলেন না, তিনি ভীরু স্বার্থপর মানুষ। দাদার কথা তোমরা ভাবছ কেন কাদের? এ তো তার বেড়াতে যাওয়ার সামিল। তার টাকা আছে, সহায় আছে, যেখানে যাবেন আরামে থাকবেন। লোকের কথা তো ভাবেন না, কেন থাকবেন হাঙ্গামায়? পশ্চিমে তার বাড়ী আছে। বড়বাবু আমার ভাই, কিন্তু আমি তোমাদের জোর করে বলছি কাদের, তিনি বিদেশী, তোমাদের গাঁয়ের লোক নন। তিনি গাঁয়ে থাকলেও তোমাদের ভরসা করার কিছু থাকত না, তিনি গাঁ ছেড়ে পালিয়েছেন বলেও তোমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। গাঁয়ের এই বাড়ী তার একমাত্র ভিটে নয়, গাঁয়ের এক কাঠা জমি তিনি চাষ করেন না। তার সখ হলে তিনি হাজার বার গাঁ থেকে পালাতে পারেন। কিন্তু তোমাদের সে সখ চাপলে তো চলবে না। তোমাদের পালানো মানে নিজের গাঁ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে, জমিজমা ছেড়ে, গাইবাছুর ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে বিদেশে যাওয়া। বড়বাবু যেখানে যান, কালিয়া পোলাও খেতে পাবেন। তোমরা জমি না চষলে, ফসল ঘরে না তুললে, তোমাদের খাওয়াবে কে?

কাদের। তবে সত্য কথা বলি ছোটবাবু, অত সব হিসাব না করেও যেতে মন চায় না। রাতভোর ঘুমাই নি, ভোরে উঠে ক্ষেতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এত যত্নের নিড়ানো ক্ষেতে আগাছা ভরে যাবে ভাবতে গিয়ে মনটা হু হু করে উঠল। ফিরে এসে ঘরের দিকে চাইলাম, চাল বেয়ে শিশির পড়তে দেখে মনে হল বাড়ীটা যেন কাঁদছে। কিন্তু কি করি, সবাই পালাচ্ছে দেখে ভয় লাগে।

ছোটলাল। সবাই পালাবে না কাদের। তুমি যদি না পালাও, সবাই পালাবে না।

অন্যকে পালাতে দেখে তুমি যেমন ঝোঁকের মাথায় পালাতে চাইছ, তেমনি তোমাকে পালাতে দেখে অন্য আর একজনের পালাবার তাগিত জাগবে। কিন্তু তুমি যদি না পালাও, তোমার দেখাদেখি অন্য দশজনও পালাবে না। মধু পালাবে না কাদের।

কাদের। পালাবে না ?

ছোটলাল। না। শম্ভু ওকে সঙ্গে নেবার জন্য কত চেষ্টা করেছে, বলেছে, ও যদি সঙ্গে যায় সেখানে গিয়েই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে, পনের টাকা অর্ধেক নেবে না। মধু যেতে রাজী হয় নি।

কাদের। তবে কি যাব না ছোটবাবু ?

ছোটলাল। কেন যাবে ? বাড়ী ফিরে যাও, আমি আর মধু তোমাদের পাড়ায় যাচ্ছি। অন্য সকলকে বুঝিয়ে ঠেকাতে হবে। সবাইকে বলো গিয়ে, যত গাঁ আছে সব গাঁ ছেড়ে লোক যদি পালাতে আরম্ভ করে, কি অবস্থা হবে ভাব দেখি ? তুমি সবাইকে বুঝিয়ে বলো গিয়ে কাদের, ভয় পেলে চলবেনা। আমরা আসছি। গাঁ ছেড়ে কেউ যাতে না পালায় তার ব্যবস্থা করতেই হবে কাদের।

কাদের। আচ্ছা ছোটবাবু। ছালাম। টাকাটা তুমি তবে ফেরত নাও মধু ভাই। না যদি যাই আজ টাকা না পেলেও চলবে। তোমার সুবিধা মত দিও।

মধু। না, টাকা নিয়েই যাও। আজ হোক কাল হোক তোমার পাওনা মিটিয়ে তো দিতেই হবে।

কাদের। সবাই যদি তোমার মত পাওনা মিটিয়ে দিত, তবে ভাবনা কি ছিল।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু। দুটো কথা বলবেন, অমনি তোমার মন ঘুরে গেল কাদের মিঞা ?

কাদের। ছোটবাবু ঠিক কথা বলছেন।

আমিরুদ্দীন। জীবন ভোর যাদের কথা শুনে কাটল, আজ তাদের কথা হল বেঠিক। নিজের কাজ বাগাতে ছোটবাবু যা বোঝালেন তাই হল ঠিক।

আজিজ। ছোটবাবুর কথা আমারও মনে লেগেছে বাপজান।

আমিরুদ্দীন। চুপ থাক্। ওসব ছেলেমানুষী কথা তোদের মত ছেলেমানুষের মনেই লাগে। কাদের যাক বা না যাক, আমি যাব ছোটবাবু আজিজকে নিয়ে। তিন তিনটে যোয়ান ছেলেকে আল্লা ডেকে নিয়েছেন, আমার আর

কেউ নাই। একটা ছেলে যদি তিনি রেয়াৎ করেছেন, এই বিপদের মধ্যে ওকে আমি রাখব না।

ছোটলাল। যেখানে যাবে সেখানে বিপদ নেই আমিরুদ্দীন?

আমিরুদ্দীন। বিপদ তো চারিদিকে ছোটবাবু। এখানের চেয়ে সেখানে তবু বিপদ কম। চল্ আজিজ, আমরা যাই।

আজিজ। তুমি আগাও বাপজান, আমি আসছি। ছোটবাবুর সাথে দুটো কথা কয়ে যাই।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবুর সাথে তোর কিসের কথা? চটপট সব সেরে নিয়ে যেতে হবে না? কত পথ হাঁটতে হবে খেয়াল আছে?

আজিজ। যেতে মন চায় না বাপজান। এক কাজ করা যাক। আজ না গিয়ে দু'দিন বাদে যাব।

আমিরুদ্দীন। ছোটবাবু তোর মাথাও বিগড়ে দিয়েছে? চল্, চল্, শীগগির চল এখান থেকে।

আজিজ। রসুলদের খবরটা জেনে আসি।

(আমিরুদ্দীনকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেল)

আমিরুদ্দীন। আরে আজিজ। কোথা যাস্? বদ্ মতলব করবি তো মেরে তোকে লাশ বানিয়ে দেব। ফিরে আয়। ফিরে আয় বলছি! নাঃ, ছোঁড়া পালিয়ে গেল। সারাদিন হয় তো ঘরে ফিরবে না। আজ আর যাওয়া হবে না। আপনি যত নষ্টের গোড়া ছোটবাবু।

কাদের। আঃ—! কি বলো মিঞা?

আমিরুদ্দীন। বলব না? ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিলেন! নিজের কাজ নাই, পেছনে লেগেছেন আমাদের।

আমিরুদ্দীন দ্রুতপদে আজিজের উদ্দেশে চলে গেল।

কাদের। ছেলে ছেলে করে লোকটা পাগল ছোটবাবু। যোয়ান যোয়ান তিনটে ছেলে মরে গেল, শেষ বয়সের এই ছেলেটাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না।

ছোটলাল। ওরকম হয় কাদের, স্নেহে অনেক সময় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

কাদের। ওর ভয় দেখে আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ছোটবাবু। আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালই হল। আমাদের পাড়ায় আসবেন নাকি?

ছোটলাল। তুমি যাও, আমরা আসছি।

কাদের। ছালাম, ছোটবাবু। আল্লা, আল্লা! কি দুর্দিন, কি দুর্দিন!

কাদের চলে গেল।

ছোটলাল। আমি জানতাম মধু। আমি জানতাম, দাদার জন্য এ কাণ্ড হবে। যারা কোনমতে বুক বেঁধে ছিল, তারা ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করবে। দাদার হাতে পায়ে ধরতে শুধু বাকী রেখেছি।

মধু। আপনি যে আছেন তাতে লোক অনেকটা ভরসা পাবে। আপনার জন্য কাদের যাওয়া বন্ধ করল।

ছোটলাল। আমি একা কি করব? এ তো একজনের কাজ নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা না করলে কিছুই করা যাবে না। এইসব সরল অশিক্ষিত লোক দুর্দিনে কর্তব্যের নির্দেশ পাবার জন্য যাদের মুখ চেয়ে থাকে, এ দেশের যারা শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাদের ভেতরটা পচে গেছে মধু। পুরুষানুক্রমে এদেশে তারা জন্মে আসছে, অথচ দেশের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছোটলালদের বাড়ীর সদরের ঘর। পুরোনো পাকা একতালা বাড়ী, প্রাচীনত্বের ছাপ জানালা দরজা দেয়াল সর্বত্রই চোখে পড়ে। দেয়ালে কয়েকখানা বিবর্ণ তৈল চিত্র। ঘর খানা বড়। একদিকে জোড়া দেওয়া তিনটি বড় বড় তক্তপোষ মস্ত ফরাসপাতা, অপরদিকে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল এবং তিনটে কাঠের ভারি চেয়ার।

এখন অপরাহ্ণ। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হেলানো রোদ এসে পড়েছে ফরাসে। পরিশ্রান্ত ছোটলাল একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছে, ফরাসের একধারে বসে রামঠাকুর হুঁকো টানছেন।

রামঠাকুর। চুরুট বল, সিগারেট বল, তামাকের কাছে কিছু নয়। শ্রান্তি দূর করতে তামাক অদ্বিতীয়। এই যে সারাটা দিন দুজনের ছুটোছুটি গেল এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে এ হাট থেকে ও হাটে, দুজনেই আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কি বল বাবা?

ছোটলাল। সে আর বলতে হবে কেন?

রামঠাকুর। তুমি আধ শোয়া হয়ে বিশ্রাম করছ, আমি বসে বসে তামাক

টানছি। পাঁচমিনিট তামাক টেনে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, তুমি এখনো ঝিমুচ্ছো। তামাক ধরো বাবা, তামাক ধরো। এমন জিনিস নেই।

স্বর্ণ ও সুভদ্রা ঘরে এল বাড়ীর ভেতর থেকে। দুজনে তারা প্রায় সমবয়সী। স্বর্ণ একটু রোগা, তার বুকে কাঁথা জড়ানো শিশু। সুভদ্রার স্বাস্থ্য চমৎকার, দেহের গড়ন অসাধারণ। তার মুখেও শ্রান্তির ভাব সুস্পষ্ট।.

স্বর্ণ। বারটা বেজেছে তোমার?

সুভদ্রা। সত্যি দাদা, কোন ভোরে বেরিয়েছ, বাড়ী ফিরে এলে বেলা চারটেয়। সারাদিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই ঘুরে বেড়াচ্ছ, আবার রাতও জাগবে। কি আরম্ভ করে দিয়েছ বলত?

ছোটলাল। নাওয়া নেই খাওয়া নেই তোকে কে বলল? রতনপুরের বড় দীঘিতে নেয়ে দই চিড়ে দিয়ে ফলার করেছি ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে। স্বর্ণ যে অতগুলো কাঁচাগোল্লা দিয়েছিল সঙ্গে, তাও খেয়ে শেষ করেছি।

স্বর্ণ। সুভদ্রা বহুক্ষণ ফিরেছে। প্রায় দশ মিনিট হবে। কি তারও দু'এক মিনিট বেশী। ঘড়ি তোমাদের ভাইবোনের সমান কদমেই চলছে। এসে চা খেয়েছে, এইবার নেয়ে ভাত খাবে। সন্ধ্যার আগে নাওয়া খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে পারবে মনে হয়। অবশ্য এর মধ্যে যদি আবার বেরিয়ে না যেতে হয়।

সুভদ্রা। আমি আর বেরোব না। তুমিও কিন্তু আজ আর বেরোতে পাবে না দাদা।

ছোটলাল। না। য'দ যাই তো গাঁয়ের মধ্যেই থাকব, গাঁয়ের বাইরে যাব না। মেয়েদের ভাব কি রকম বুঝলি সুভদ্রা?

সুভদ্রা। মেয়েদের নিজস্ব কোন ভাব নেই দাদা। পুরুষদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, মেয়েদের মনে সাড়া জাগছে অবিকল সেই রকম। পুরুষদের ভাবনা মেয়েদের জন্য, মেয়েদের ভাবনা পুরুষদের জন্য—ছেলেমেয়েরা কমন ফ্যাক্টর। এক বিষয়ে মেয়েদের খুব শক্ত দেখলাম। মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে ভেবে পুরুষদের আতঙ্ক হয়েছে, মেয়েরা বিশেষ ভয় পায় নি। কথা-বার্তা শুনে যা বুঝলাম, অধিকাংশ মেয়ের বিশ্বাস, নেহাৎ হাবাগোবা মেয়ে না হলে অত্যাচার করার ক্ষমতা কারো হয় না। মেয়েদের নাকি দাঁত আছে, নখ আছে। মেয়েরা নাকি শিং মাছের মত ধরতে গেলে পিছলে পালাতে পারে। ডোবার পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, বালিতে গর্ত খুঁড়ে,

আর ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে মেয়েরা নাকি এমন করে লুকোতে পারে যে পাশ দিয়ে হাজার হাজার লোক চলে গেলেও তাদের একজনও টের পায় না। পুরুষের বেশ ধরে ধুলোবালি মেখে, পাগলী সেজে, গাছের পাতার রস লাগিয়ে হাতে মুখে ঘা করেও নাকি মেয়েরা আত্মরক্ষা করতে পারে। এত করেও যদি নিজেকে বাঁচানো না যায়, মরে যাওয়াটা আর এমন কি কাছে!—ছেলেখেলার ব্যাপার। দুটি ছেলেমানুষ বৌ বিষ দেখলে সিঁদুর কৌটায় ভরে সব সময় আঁচলে বেঁধে রাখে। আর একজন একটা দেশী ক্ষুর ন্যাকড়ায় জড়িয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছে।

ছোটলাল। তোর নিজের মন থেকে বল্‌তো সুভা। মরাটা কি তোর কাছেও ছেলেখেলার মত তুচ্ছ?

সুভদ্রা। সর্বদা নয়, কিন্তু তেমন অবস্থায় তুচ্ছ বৈকি। ধরো দশ পনেরটা গুণ্ডা আমায় জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আর কিছু না পাই নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে হাতের আর্টারিটা কেটে ফেলবার চেষ্টা করব বৈকি।

সুবর্ণ। মাগো মা, কি কথাবার্তা তোমাদের ভাইবোনের! শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।

ছোটলাল। গায়ে কাঁটা দিলে আর চলবে না, লঙ্কা বাটা লাগার মত গা জ্বালা করাতে হবে। তোমাকে পেলেও ওরা ছেড়ে কথা কইবেনা।

সুভদ্রা। তুমি যে রকম সুন্দরী, তোমাকেই বরং আগে ধরবে বৌদি। তবে তোমার ভাগ্যে হয়তো ওপরওলা জুটতে পারে। আমায় টানাটানি করবে বাজে লোকে।

সুবর্ণ। আঃ কি যে কর তোমরা! আমার সামনে এসব বিভৎস আলোচনা করো না।

ছোটলাল। চোখ কান বুজে থাকলে আর চলবে না সুবর্ণ। কি হচ্ছে আর কি হবে জেনে বুকে নিজেদের বাঁচবার উপায় আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রাখতে হবে। পাগলা কুকুর কামড়াবেই, গাছে চড়াটা শিখে রাখা দরকার।

সুবর্ণ। কেন, লাঠি।

ছোটলাল। লাঠি কই? খালি হাতে চাপড় মারলে আরও হন্যে হয়ে বেশী কামড়াবে। হয় তাড়াতে হবে দূর দূর করে, নয় মারতে হবে গলা টিপে।

সেতো আর দু'দশটা গলা বা দুদশ জোড়া হাতের কাজ নয়। সে সময়ও হয়নি এখন। মিলেমিশে গলা সাধতে হবে, হাতে জোর করতে হবে প্রথমে।

সুবর্ণ। সে কত কাল?

ছোটলাল। যত কাল দরকার হয়। পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর। অবিলম্বে আমাদের কাজ হল ধৈর্য ধরে শান্ত থেকে সাময়িক বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচানো। কিছুদিন দরকার হলে তাই গাছে চড়তে হবে। পাগলা কুকুরকে কামড়াবার সুযোগ দিয়ে তো লাভ নেই। কি বিভৎস কাণ্ড হচ্ছে চারিদিকে জানো না তো।

সুভদ্রা। জানে না! বৌদি সব জানে দাদা, সব বোঝে। ওর কথা শুনো না। কিছু যে জানতে চায় না বুঝতে চায় না বলে সব ওর ঢং। সেই যে চটি বইটা এনে দিয়েছিলে আমায় পড়তে, কাল সন্দে বেলা লুকিয়ে উনি সেটা পড়ছিলেন। আমি হঠাৎ গিয়ে দেখি, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, মুখ লাল, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বাচ্চাটা কাঁদছিল, খেয়ালও নেই। আমি যে তুলে আনলাম বাচ্চাকে, তাও টের পায় নি। একটু পরে আবার গিয়ে দেখি বইটা পড়ে আছে কোলের ওপর, দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সুবর্ণ। ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। শুইয়ে দিতে গেলাম। ভাতটাত যদি দয়া করে খান আপনারা, একটু তাড়াতাড়ি আসবেন কি ভেতরে? আর যদি বক্তৃতায় পেট ভরে গিয়ে থাকে তবে অবিশ্যি—

(বলতে বলতে সুবর্ণ ভেতরে চলে গেল)।

সুভদ্রা। আমিও যাই গা ধুয়ে ফেলি। তুমি আসবে না দাদা? ঠাকুরমশায় দু'টি ভাত খাবেন তো? কেউ জানবেনা অব্রাহ্মণের রান্না খেয়েছেন।

রামঠাকুর। দুপুরে পেট ভরে খেয়েছি মা, অবেলায় আর খাব না। রাতে খাইও। তুমিও এখন আর ভাত না খেলে বাবা।

ছোটলাল। খিদে থাকলে তো খাব। ওরা বোধ হয় আসছে সবাই নকুড়কে নিয়ে।

সুভদ্রা। নকুড়কে কেন?

ছোটলাল। বড় গোলমাল আরম্ভ করেছে লোকটা। অনেক চাল আর কেরাসিন ছিল, সব লুকিয়ে ফেলেছে। বিক্রি করছে চুপি চুপি, দশ গুণ দামে। এমন

চালাক, বলছে যে হানা দিতে এসে ওর সব মাল নিয়ে চলে গেছে। সেটা অসম্ভব নয়, গাড়ী বোঝাই দিয়ে মাল পত্তর অন্য গাঁ থেকে লুটে নিয়েছে শুনছি, কিন্তু এ গাঁ থেকে কিছু নেয় নি জানা কথা। নকুড় ওই ছুতো খাটাচ্ছে।

সুভদ্রা। ব্যাটাকে পিটিয়ে দিও আচ্ছা করে।

ছোটলাল। পেটালে কি কাজ হয়। বরং গাঁয়ের লোক সবাই মিলে না ছিড়ে ফেলে, তাই সামলাতে হচ্ছে। বুঝিয়ে দেখতে হবে।

সুভদ্রা। বুঝবে কি? ও সব লোক বড় অবুঝ।

মধু, মাখন, আজিজ, কাদের ও অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে নকুড়ের প্রবেশ। নকুড়ের মুখখানা গোলগাল, তেলতেলা, বোকা ভাল মানুষের মত চেহারা।

নকুড়। প্রাতঃ প্রণাম ঠাকুরমশায়। অবেলায় হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন ছোটবাবু?

ছোটলাল। বলছি। বোসো।

(অনেক তফাতে ফরাসের একপ্রান্তে নকুড় সন্তর্পণে উপবেশন করলে)

তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে নকুড়।

নকুড়। অনুরোধ ছোটবাবু? আপনি হুকুম করবেন।

ছোটলাল। তোমার লুকোনো চাল আর কেরাসিন বার করে ফেলতে হবে নকুড়। গাঁয়ের লোক লণ্ঠন জ্বালাতে পারে নি। প্রদীপ জেলে কোন মতে চালিয়ে দিয়েছে। যা বাতাস ছিল কাল, প্রদীপ নিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া যেতে পারে নি। আমার একটা লণ্ঠন জলেছিল, তাও দশটা বাজতে না বাজতে নিভে গেল।

নকুড়। লুকোনো কেরোসিন কোথায় পাব ছোটবাবু! এক টিন দু'টিন যা আনতাম সদর থেকে, তাই কিছু কিছু বেচছি। চালান বন্ধ, সব বন্ধ, মাল পাব কোথা। আপনি যদি বলেন এক বোতল নয় পাঠিয়ে দেব আপনাকে, নিজের জন্য রেখেছিলাম।

ছোটলাল। কেবল আমাকে দিলে তো চলবে না নকুড়। কেরোসিন তোমার ঢের আছে আমি জানি। পাঁচ সাতটা গাঁয়ের লোকের তিনচার মাস চলে এত কেরোসিন তুমি লুকিয়ে রেখেছো।

নকুড়। কে যে আমার নামে এসব কথা রটাচ্ছে জানি না, ভগবান তার ভাল

করুন। তন্ন তন্ন করে তল্লাস করে তো এক ফোটা কেরোসিন পেলেন না।

ছোটলাল। খুঁজে পাই নি বলেই তো তোমায় আমি ডাকিয়েছি। আমি জানি, কেরোসিন তোমার আছে, কোথায় আছে তাই শুধু জানি না। টাকাতো অনেক করেছ ভাই, এই দুর্দিনে লোকের কষ্ট বাড়িয়ে আর টাকা নাইবা করলে? কত টাকাই বা হবে! ভয়ে লোকে, এমনিতেই গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে, কত যে দুর্দশা ভোগ করছে তার হিসাব নেই। তার ওপর তুমি যদি লোকের অসুবিধে বাড়িয়ে দাও, গাঁয়ে বাস করা অসম্ভব করে তোলো, আরও বহু লোকে পালাবে। অনেকে যাই যাই করেও ঘরবাড়ীর মায়া কাটাতে পারছে না, একটা বাস্তব উপলক্ষ্য পেলেই তাদের মন যাওয়ার দিকে ঝুঁকবে। তুমি সেই উপলক্ষ্য যুগিয়ো না নকুড়।

নকুড়। আপনি আমায় মিছামিছি দুষছেন ছোটবাবু। কেরোসিন লুকিয়ে রেখেছি বলছেন, একটা লুকোনো টিন বার করে আমায় ধরে এনে জুতো মারুন, জেলে দিন, কথাটি কইব না।

ছোটলাল। যারা শুনতে চায়, তাদের এসব কথা শুনিয়ো খুড়ো। অপরাধ প্রমাণ করে শাস্তি দেবার জন্য তোমায় আমরা ডাকি নি। দশ জনের মঙ্গলের জন্য দশ জনের হয়ে আমি তোমায় অনুরোধ জানাচ্ছি। দান করলে লোকের পুণ্য হয়। তোমাকে দান করতে হবে না! লুকোনো মাল তুমি উচিত দামে ছেড়ে দাও, দানের চেয়ে তোমার বেশী পুণ্য হবে।

নকুড়। লুকোনো মাল! লুকোনো মাল! বার বার এই এক কথাই বলছেন। কোথায় আমার লুকোনো মাল? কি মাল? কার কাছে মাল কিনেছি? চালের বস্তা আর কেরোসিনের টিন কি আকাশ থেকে আমার উঠানে পড়ছে, না মাটি ভেদ করে উঠেছে? আমার কি হাজার বস্তা চাল আর হাজার টিন কেরোসিনের ব্যবসা যে অত চাল আর তেল লুকিয়ে ফেলতে পারব? আমি চিরদিন ছুটকো ব্যাপারী—দু'চার বস্তা চাল আনি, দু'চার টিন তেল কিনি, তাই খুচরো বিক্রি করি। যে পরিমাণ চাল আর তেলের কথা বলছেন, কিনবার মত টাকাই আমার নেই।

ছোটলাল। তুমি কি একদিনে কিনেছ খুড়ো, অনেকদিন থেকে সঞ্চয় করেছ। বড় বড় চালান এনেছ, সিকি ভাগও বাজারে ছাড় নি। তোমার ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি খুড়ো, কিন্তু মনুষ্যত্ব একটু দেখাও? তোমার তো ক্ষতি কিছু নেই। লাভ তোমার থাকবেই। অতিরিক্ত

লোভটা শুধু তোমায় ত্যাগ করতে বলছি।

নকুড়। বলছেন তো অনেক কথাই ছোটবাবু—আমি অমানুষ, মিথ্যাবাদী, মহাপাপী, লোভী, বলতে আর ছাড়লেন কই! লাভের কথা বলছেন, এ বাজারে. চাল ডাল তেল নুন বেচে' কি লাভ করার উপায় আছে ছোটবাবু? লোকসান দিয়ে শুধু কোন মতে টিঁকে থাকা।

ছোটলাল। ও, তোমার লোকসান যাচ্ছে! কোন মতে টিঁকে আছ!

রামঠাকুর। নকুড় আমাদের ডুবে গেল ছোটুলাল। টাকায় সব জিনিষে দু'টাকা লাভ হচ্ছে না, একটাকা, দেড়টাকা, পৌনে দু'টাকার মধ্যে লাভটা থেকে যাচ্ছে। ক'মাস আগে কাদেরের কাছে তিন টাকা মণ চাল কিনেছিল—ঠিক কেনে নি, বাগিয়ে নিয়েছিল, আমার চোখের সামনে সেই চাল সাতগুণ দরে বিকিয়ে দিয়েছে।

নকুড়। ঠাকুরমশায়ের তামাসার আর শেষ নেই।

রামঠাকুর। আমার তামাসা নয় নকুড়। তোমার তামাসার প্রতিধ্বনি। দশটা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তুমি যে তামাসা জুড়েছ তাই ভাঙ্গিয়ে দু'টো কথা বলেছি আমি। তামাসার কি অন্ত আছে তোমার! বাইরের দোকানের পিছন দিকের ঘরটাও দোকান করেছ, দু' দোকানে বিক্রী করছ সামান্য যা কিছু বিক্রী না করলে চলবেনা ভেবেছ, তাই। কাউকে বেচছ বাইরের দোকানে, কাউকে বেচছ ভেতরে—একজনের বেশী দোকানে যেতে পারছে না। দাম নিচ্ছ যত খুসী—সাক্ষী থাকছে না কেউ। একে বলছ শুধু তোমায় দিলাম—ওকে বলেছ তোমায় দিলাম।

ছোটলাল। কিন্তু সাক্ষী ওরা সবাই দিচ্ছে খুড়ো। এতো আদালতের সাক্ষী দেওয়া নয়, সবাই বলছে তোমার কাণ্ডের কথা। তুমি লোকসান দিয়ে আড়ত চালাচ্ছ তাও জানতাম না খুড়ো। এবার থেকে তোমাকে যাতে আর লোকসান দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

নকুড়। (মৃদু হেসে) আপনি কি ব্যবস্থা করবেন। এর কোন ব্যবস্থা হয় না। যে বাজার, কেনা দামে জিনিষ বেচলে লোকে নেয় না। কিছু কম দামেই সব ছাড়তে হয়।

ছোটলাল। সে আমরা ঠিক করে দেব। জিনিষ কিনতে চেয়ে কেউ আর তোমায় জ্বালাতন করবে না, তোমাকেও আর লোকসান দিতে হবে না।

নকুড়। (সচেতন ও সন্দিগ্ধ হয়ে) কথাটা ঠিক বুঝলাম না ছোটবাবু।

ছোটলাল। কথা খুব সোজা খুড়ো। এ গাঁয়ের বা আশেপাশের কোন গাঁয়ের কেউ আর তোমার কাছে জিনিস কিনে তোমার ক্ষতি করবে না। এক পয়সার জিনিষ কিনতেও কেউ যাতে তোমার কাছে না যায় সে ব্যবস্থা করব আমরা।

নকুড়। আমায় বয়কট করাবেন ?

ছোটলাল। তোমার ক্ষতি বন্ধ করব। তোমার ভালই হবে। মাল টাল যদি তোমার লুকোনো থাকত তাহলে অবশ্য তোমার অসুবিধে ছিল। তা যখন নেই, তোমার আর ভাবনা কি! তোমার অজান্তে তোমার দোকানের লোক যদি কিছু মাল লুকিয়ে রেখে থাকে আশে পাশে বেচতে না পেরে হয়তো অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। সে জন্যে একটু কড়া পাহারার ব্যবস্থাও আমরা করে দেব। তোমার কাছে যেমন দু'এক বছরের মধ্যেও কেউ, কিছু কিনতে যাবে না, পাহারাও তেমনি দু'এক বছরের মধ্যে শিথিল করা হবে না।

নকুড়। এ তো শত্রুতা ছোটবাবু।

ছোটলাল। চালবাজী কথা ছেড়ে তুমি যদি সোজা ভাষায় কথা কও খুড়ো, তা হলে আমিও স্বীকার করব, এ শত্রুতা। তুমি দেশের লোকের শত্রু, তোমার সঙ্গে শত্রুতাই করব। কিন্তু একথাও মনে রেখো খুড়ো, শত্রুতা করতে আমরা চাই না। আমাদের শত্রুতা করা না করা তোমারি হাতে। লুকোনো মালগুলি ছেড়ে দাও অন্যায় দামে কিছু বিক্রি করো না।

নকুড়। আমার মাল নেই। যা বিক্রি করি, উচিত দামেই করি।

ছোটলাল। তুমি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছো খুড়ো। কেবল আমরা নই, আরও শত্রু তুমি সৃষ্টি করছ চারিদিকে। তাদের শত্রুতা যে কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তোমার সে ধারণা নেই। আমরা তোমার ক্ষতি কিছুই করব না, শুধু তোমার অন্যায় লাভের চেষ্টায় বাধা দেব। অন্য শত্রুরা তোমায় অত সহজে ছাড়বে না খুড়ো। লোকে এমনিতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে, তার ওপর তুমি যদি এ ভাবে চালডাল তেলনুন আটকে রেখে, বেশী দামে বিক্রি করে, তাদের জীবন দুর্বহ করে তোলো, একদিন ক্ষেপে গিয়ে চোখে তারা অন্ধকার দেখবে। সেদিন তোমার গোলা লুট করবে, তোমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে, তোমায় টুকরো টুকরো করে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

নকুড়। আপনার হয় তো তাই ইচ্ছা। সেই চেষ্টাই করেছেন আপনি।

ছোটলাল। তাহলে আর তোমায় ডেকে এনে এসব কথা তবে বলব কেন খুড়ো? আমার ইচ্ছা, আমার চেষ্টার কথা এ নয়। এ হচ্ছে মানুষের মরিয়া হয়ে, হন্যে হয়ে ওঠার কথা। তুমি তাদের মরিয়া করে, হন্যে করে তুলছো। হাটবাজার, কারবার একরকম বন্ধ তা জানি, মাল চালান একরকম বন্ধ করে দিয়েছে তাও জানি, কিন্তু যা আছে তা কেন লুকিয়ে রাখছ? আমাদের পাহারা বসার ঠিক আগে ক'রাত তোমার অনেক গাড়ী গাঁয়ে এসেছিল, আমরা জানি। কি এসেছিল তাই জানি না। তুমি ভেবে ছাখো, বেশী লাভের আশায় খাদ্য আটকে রাখবে, দরকারী জিনিব আটকে রাখবে, লোকে উপোস করে অসুবিধা ভোগ করে তা সয়ে যাবে, তা কি হয় খুড়ো?

নকুড়। মাল আমার নেই। কিন্তু মাল যদি থাকত, নিজের মাল নিয়ে যা খুসী করার অধিকার আমার থাকত না ছোটবাবু? ন্যায্য অধিকার, আইনের অধিকার? আমার পয়সা দিয়ে কেনা জিনিষ খুসী হলে বেচব, খুসী না হলে বেচব না। যত খুসী দাম চাইব। কিনবার জন্য কারো পায়ে ধরে তো সাধি নি আমি।

ছোটলাল। সেধেছ বই কি খুড়ো। এখনো সাধছ! নইলে কেউ তোমার কাছে কিছু কিনতে যাবে না শুনে টনক নড়ে গেল কেন?

নকুড়। টনক আমার অত সহজে নড়ে না ছোটবাবু। আমি বলছি ন্যায়-অন্যায়, উচিত অনুচিতের কথা। আমি কারো ধার ধারি না, কারো চুরি করিনি। আমার পেছনে লাগবেন না ছোটবাবু।

মধু। আর সয়না ছোটবাবু। দে'মশায়ের সঙ্গে কথা কয়ে আপনি পেরে উঠবেন না। ন্যায়-অন্যায় উচিত অনুচিতের কথা নিয়ে মুখে অত খৈ ফুটিও না খুড়ো। নিজের পাতে ঝোল টানা সবাই উচিত মনে করে। তোমার নিজের মাল নিয়ে যা খুসী করার অধিকারের কথা বলছ, সবাই সব বিষয়ে অমনি অধিকার খাটালে তোমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ? এক বিষয়েই বলি। টাকা জমিয়েছো কাঁড়ি কাঁড়ি, একটা পুকুরও কাটাও নি বাড়ীতে। অন্যের পুকুরের জল খাও। যার পুকুর সে যদি আজ তোমায় বলে, আমার পুকুরের জল নিও না? যদি বলে এক কলসী জলের দাম দশটাকা, খুসী হলে নিও, খুসী না হলে নিও না, নেওয়ার জন্য তোমার

পায়ে ধরে সাধিনি ? তখন তুমি কি করবে শুনি খুড়ো ?

নকুড়। তোর কাছে বসে আবোল তাবোল কথা শুনব।

মধু। দে'মশায় আগে তোমাকে একদিন বারণ করেছি। আমায় তুই বলা তোমার সাজে না।

নকুড়। তাই নাকি মধুবাবু ? আপনাকে সম্মান করে কথা কইতে হবে ? অপরাধ নেবেন না মধুবাবু। আপনি এমন মানী লোক জানতাম না বলে অমর্যাদা করে ফেলেছি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমাকে উঠতে হল ছোটবাবু ! দু'দণ্ড বসে কথা কইবার সময় নেই। কাল ভোর ভোর নন্দপুর যাব। তার আবার হাঙ্গামা অনেক। শম্ভুদাসের মেয়ের সঙ্গে কাল আমার বিয়ে ছোটবাবু।

ছোটলাল। তাই নাকি। নন্দপুর যেতে না যেতে এত তাড়াতাড়ি কেন ?

নকুড়। চুকিয়ে ফেলাই ভাল। যে দিনকাল পড়েছে। আপনাকে নেমন্তন্ন করার স্পর্দা নেই ছোটবাবু। বাবুলালবাবু স্নেহ করতেন, বাড়ীতে কাজকর্ম হলে গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসতেন। সেই ভরসাতেই আপনাকে বলা।

ছোটলাল। তোমার বিয়েতে আমি যেতে পারব না নকুড়। ওরকম ভণ্ডামি করা আমার পোষাবে না।

নকুড়। আমার অদেষ্ট ! তা, মধুবাবু, আপনাকেও নেমন্তন্ন করে যাই। দয়া করে যদি যান। ঠাকুরমশায়কে তো বলাই বাহুল্য। উনি পুরোহিত হয়ে সঙ্গেই যাবেন।

রামঠাকুর। পুরুতগিরি আমি ছেড়ে দিয়েছি নকুড়।

নকুড়। আপনিও যাবেন না ঠাকুরমশায় ? আগে যে বলে রেখেছিলেন, আপনাকে পুরুত না করলে ব্রহ্মশাপ লাগবে !

রামঠাকুর। তোমার বিয়েতে মন্ত্র পড়লে ব্রহ্মশাপ আমাকেই লাগবে নকুড়।

নকুড়। এ কি রকম কথা হল ? আপনাকে পুরুত ঠিক করে রেখেছি, এখন বলছেন যাবেন না !

রামঠাকুর। যেতে পারব না বাপু। পুরুতগিরি করা রক্তমাংসে মিশে আছে, কাজে কর্মে ডাক দিলে দেহমনে ফুর্তি লেগে যায়। তোমার বিয়েতে পুরুতগিরি করার ডাক শুনে মনটা কেমন দমে গেছে, গাটা ঘিনঘিন করছে।

নকুড়। পুরুত অনেক পাব।

নকুড় চলে গেল।

ছোটলাল। ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া লাগছে। অজানা অচেনা যায়গায় গিয়ে এত তাড়াতাড়ি শম্ভু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কেন?

রামঠাকুর। নকুড়ের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছে, ওর কি আর নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার ক্ষমতা আছে! যা করাচ্ছে নকুড়।

ছোটলাল। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় লোকটাকে। একদিকে যেমন ভীরু, অন্যদিকে আবার তেমনি একগুঁয়ে। আমার কি মনে হয় জানেন ঠাকুরমশায়? টাকার চেয়ে দশটা গাঁয়ের লোককে জব্দ করার লোভটাই ওর বেশী। সেই উদ্দেশ্যে মাল লুকিয়ে রেখেছে। ভেবেছিলাম, বুঝিয়ে বললে বুঝবে। কিন্তু ওর মতিগতিই অন্যরকম। মাল ও সহজে ছাড়বে না।

রামঠাকুর। তাই মনে হল। ও ভাল করেই জানে আপনি চেষ্টা করলে ওর দোকানদারি বন্ধ করে দিতে পারেন, মাল যেখানে জমিয়ে রেখেছে সেইখানেই সব পচাতে পারেন। শুনে ভরকেও গিয়েছিল, কিন্তু নরম কিছুতে হল না। এসব লোক একেবারে ভাঙ্গে, মচকায় না।

ছোটলাল। হয়তো অন্য কথা ভাবছে। দেখা যাক। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ভেবেচিন্তে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করা যাবে। মাল না সরিয়ে ফেলে সে ব্যবস্থাটা আজ থেকে হওয়া চাই। কাদের, রসুল মিঞাকে কাল সকালে আসতে বোলো তো, মাইতি মশায়ের বাড়ী।

কাদের। বলব।

ছোটলাল। তোমরাও সবাই এসো। আর এক কথা—বিশেষ দরকারী কথা। নকুড়ের ওপর কোনরকম মারধোর গালাগালি কেউ করবে না। সবাই মনে রেখো ভাই, ওরা যেন হানা দিয়ে অত্যাচার করার কোন অজুহাত না পায়, এটা আমাদের দেখা চাই—যত রাগ হোক, যত গা জ্বালা করুক। ঝোঁকের মাথায় কেউ কিছু করব না আমরা।

(ছোটলাল, রামঠাকুর, আর মধু ছাড়া সবাই কলরব করতে করতে চলে যায়)

ছোটলাল। আমি ভেতর থেকে আসছি।

(ছোটলাল ভেতরে যায়)

মধু। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। উঠতে বসতে স্বস্তি ছিল না।

রামঠাকুর। বেশ স্বস্তি বোধ হচ্ছে নাকি তোমার?

মধু। গাঁ ছেড়ে সবাইকে ফেলে পালাবার কতবড় লোভটা ছিল, বামুন পণ্ডিত

মানুষ আপনি, আপনি কি বুঝবেন। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করেছি ঠাকুরমশায়। খালি মনে হয়েছে, গেলেই তো হয় নন্দপুর। কার জন্য, কিসের জন্য এখানে পড়ে আছি! এবার থেকে নির্ভাবনা হলাম।

রামঠাকুর। মালিকহীন বোঁচকা পড়ে থাকতে দেখলে চোরেরও ওই রকম যন্ত্রণাই হয় মধু। মালিক বোঁচকা দখল করলে চোর যেন বাঁচে।

মধু। যা বলেছেন ঠাকুরমশায়।

(খাবারের থালা হাতে ছোটলাল এল)

ছোটলাল। তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম মধু। শিক্ষিত লোকের মন তো! সুভাকে খেতে দেখে হঠাৎ মনে পড়ল, তুমিও তো সারাদিন ঘুরেছ, তোমারও খাওয়া হয় নি। (গলা চড়িয়ে) জল দিয়ে যেও বাইরে একগ্লাস।

(জল নিয়ে সুবর্ণের প্রবেশ)

রামঠাকুর। কেমন লাগছে মধু? ছোটুলাল খাবারের থালা বয়ে এনে দিল, বৌমা জলের গেলাস এনে দিচ্ছেন? ছোটলোক চাষা তুমি, চিরকাল উঠোনের কোণে পাতা পেতে উবু হয়ে বসেছ, বামুন এসে খাবার ছুঁড়ে দিয়েছে পাতে! দেখিস বাবা, লুচি যেন গলায় না ঠেকে, জল খেতে যেন বিষম না লাগে। তোর আবার মন ভাল নয় আজ। আমি আজ উঠি ছোটুলাল। সন্ধেবেলা আবার দামোদরের ব্যাগার ঠেলা আছে।

ছোটলাল। হ্যাঁ, আসুন। বেলা আর বেশী নেই। আপনার ছেলেকে বলবেন আজ রাত্রে তাকে পাহারা দিতে হবে না। সে যেন ভাল করে ঘুমিয়ে নেয়। আজ আরও তিনজন নাম দিয়েছে। আজিজও বলেছে কাল থেকে পাহারা দেবে। ওর বৌয়ের অসুখ কমেছে।

সুবর্ণ। দু'টো ব্যাচে পাহারা দেবার ব্যবস্থা তুলে দিলে?

ছোটলাল। না, দুটো ব্যাচেই পাহারা দেবে। ওই ব্যবস্থাই ভাল, কারো সারারাত জাগতে হয় না। মোট এখন চব্বিশজন হয়েছে, এক রাতে বারজন করে পাহারা দেবে। ন'টা থেকে দু'টো পর্যন্ত ছ'জন, দু'টো থেকে ভোর পর্যন্ত ছ'জন। ছ'জন করে পাহারা দিলেই চলবে, তার বেশী দরকার নেই। বাকী সকলে রেডি হয়েই ঘুমোবে।

রামঠাকুর। মরার মত ঘুমোলেও শিঙের শব্দ শুনবে বাবা। যে আওয়াজ তোমার

ঠাকুর্দার ওই শিঙের। শুধু ওরা কেন, গাঁ শুদ্ধ লোক আঁতকে জেগে যাবে।

ছোটলাল। সবাই ও শিঙে বাজাতে পারে না। শুনেছি, ঠাকুর্দা যখন আওয়াজ করতেন মনে হত শ'খানেক বাঘ একসঙ্গে গর্জন করছে। মধু বেশ জোরে বাজাতে পারে। ওর আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় আরও জোরে ফুঁ দিতে পারলে কি রকম আওয়াজ হত।

রামঠাকুর। কাজ নেই বাবা অত জোরে বাজিয়ে। তোমার পাহারাওয়ালারা যতটুকু জোরে বাজাতে পারবে তাতেই যথেষ্ট হবে। তোমার স্বর্গীয় ঠাকুর্দার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিঙেতে ফুঁ দেবার চেষ্টা যেন ওরা না করে বাবা, বারণ করে দিও। ওদের তাহলে সত্যি সত্যি শিঙে ফুঁকতে হবে।

(রামঠাকুর যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, আমিরুদ্দীন তার গায়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করল। পিছনে পিছনে এল কাদের)

আমিরুদ্দীন। আল্লার কিরে ছোটবাবু, আপনি যদি এমন করে মোর পিছে লাগবে, তোমায় আমি জানে মেরে দেব।

কাদের। একটু সমলে কথা বল মিয়া। চোটপাট কর কেন ?

ছোটলাল। কি হয়েছে আমিরুদ্দীন ?

আমিরুদ্দীন। কি হয়েছে জিগেস করছো আপনি কোন মুখে ? আমার ছেলের পেছনে আপনি লেগেছো ক্যানো শুনি ? ছেলেকে নিয়ে আমি যেথায় খুসী যাব, আপনি বারণ করছ কেন ?

ছোটলাল। আমি সকলকেই গাঁ ছেড়ে পালাতে বারণ করছি আমিরুদ্দীন।

আমিরুদ্দীন। এ চলবে না ছোটবাবু। আপনি এমনি বিগড়ে দিয়েছ, ছেলে মোর কথা শোনা না। আজিজ নাকি রাতে গাঁয়ে পাহারা দেবে ? এসব কি মতলব আপনি দিয়েছো আজিজকে ? বাচ্চা বৌ ঘরে একলা পড়ে রইবে, আজিজকে দিয়ে আপনি রাতভোর পাহারা দেওয়াবে তোমার গাঁয়ে ?

ছোটলাল। গাঁ কি আমার আমিরুদ্দীন। আজিজ কি আমার বাড়ী পাহারা দেবে ? আজিজ পাহারা দেবে তার নিজের ঘরবাড়ী, নিজের বুড়ো বাপ আর বাচ্চা বৌকে। একা নয়, বারজন মিলে পাহারা দেব, তাদের পেছনে থাকবে গাঁয়ের সব লোক। এতদিন সারারাত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে এক রাত শুধু কয়েক ঘণ্টা বাইরে এসে তোমার ছেলে পাহারা দেবে, সবার সাথে তোমরাও যাতে বাঁচো—ওর বুড়ো বাপ, ওর কচি বৌ। ওরা

হানা দিতে এলে আগে থেকে জানা গেলে কতটা রেহাই হয় সে তো গতবার টের পেয়েছ? গতবার তবু ভাল ব্যবস্থা ছিল না। এবার আরও আগে আমরা জানতে পারবো—মেয়েদের নিয়ে লুকোতে পারবো। এ ব্যবস্থা তোমার পছন্দ হয় না আমিরুদ্দীন?

আমিরুদ্দীন। আপনার ওসব মতলব আমি বুঝি না ছোটবাবু। এমনি করে আপনি আজিজকে গাঁয়ে আটকে রাখতে চাও। খাতায় নাম লেখলে, রাতে পাহারা দেওয়ালে, ছেলেমানুষ পেয়ে আপনি ওর দফা নিকেশ করছ। আজিজ পাহারা দেবে না ছোটবাবু। আমি ওকে পাহারা দিতে দেব না।

ছোটলাল। ছেলে তোমার আর ছেলেমানুষ নেই আমিরুদ্দীন। নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়স তার হয়েছে। এতকাল নিজের মতলবে তাকে চালিয়েছ, এবার তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও? তুমি আর ক'দিন বাঁচবে! তখন কি হবে তোমার আজিজের? মতলব পাবে কার কাছে?

আমিরুদ্দীন। (সগর্বে) আরও বিশ বছর বাঁচব আমি। অনেক যোয়ান মরদের চেয়ে আজও গায়ে বেশী জোর আছে ছোটবাবু। লাঠির ঘায়ে আজও দশটা মরদকে ঘায়েল করতে পারি।

ছোটলাল। মরদের মত কথা কও তবে। ছেলেকে মেয়েলোকের মত আড়াল করে না রেখে তাকেও মরদ হয়ে উঠতে দাও।

আমিরুদ্দীন। শোনেন ছোটবাবু। কাল আজিজকে সাথে নিয়ে রসুলপুর যাব। আজিজকে আপনি যদি মানা করবে, ওর মাথা বিগড়ে দেবে একথা সে কথা বলে, আপনাকে আমি দেখে নেব। খুন করে ফাঁসি যাব।

কাদের। সমঝে কথা বল মিয়া। চোট কর কেন?

ছোটলাল। নিজের ছেলেকে এত দরদ কর, অন্যের ছেলের জন্য তোমার দরদ নেই কেন আমিরুদ্দীন? আমায় খুন করেও ছেলেকে তুমি সামলাতে পারবে না। মরদ হবার ঝোঁক তার চেপে গেছে। মরদের কি করা উচিত সে জেনে গেছে।

কাদের। ধরে বেঁধে ছেলেকে ও হয় তো নিয়ে যেতে পারবে ছোটবাবু। আপনি বাধা দেবেন না।

ছোটলাল। আমি তো জবরদস্তি কাউকে আটকাই নি কাদের। জবরদস্তি কজনকে আটকানো যায়?

কাদের। ঠিক কথা। কসুর মাপ করবেন ছোটবাবু, আমিও ভেবেচিন্তে দেখলাম

গাঁয়ে আর থাকা উচিত নয়। ওদের সাথে আমিও কাল চলে যাব। মন ঠিক করে ফেলেছি, আমাকে আর থাকতে বলবেন না।

ছোটলাল। যা বলার ছিল আগে অনেকবার তোমায় বলেছি কাদের।

কাদের। তাই তো আপনাকে না জানিয়ে যেতে পারলাম না। নয় তো চুপে চুপে পালিয়ে যেতাম। আপনি সব ঠিক কথাই বলেছেন। পালিয়ে যাওয়া স্রেফ বোকামি হবে। কিন্তু সবাই যদি থাকে তবে না গাঁয়ে থাকা যায়। সবাই যদি পালায় দু'চারজন থেকে মুস্কিলে পড়ব।

ছোটলাল। (চিন্তিতভাবে) হঠাৎ তোমার মত বদলাবার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সবাই তো পালাই নি কাদের। দু'চার জন মোটে গেছে।

কাদের। আরও যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে গাঁ খালি হয়ে যাবে। তখন হয় তো আর পালাবার ফুরসৎ মিলবে না। তার চেয়ে সময় থাকতে পালানোই ভাল।

ছোটলাল। তাই দেখছি।

কাদের। (অপরাধীর মত) কসুর নেবেন না ছোটবাবু। যেতে মন চায় না। গিয়ে কি মুস্কিলে পড়ব ভাবলে ডর লাগে। কিন্তু উপায় কি বলেন ? বাঁচা তো চাই।

ছোটলাল। কত চেষ্টায় সকলের ভয় অনেকটা কমানো গেছে। তোমরা গেলে আবার সকলের ভয় বেড়ে যাবে। আবার সবাই দিশেহারা হয়ে উঠবে। তোমাদের কেন যে—

আমিরুদ্দীন। ওসব শুনতে চাই না ছোটবাবু।

কাদের। আর কিছু বলবেন না ছোটবাবু।

ছোটলাল। না, আর কিছু বলব না তোমাদের। রসুলপুরে তোমার কে আছে আমির ? কার কাছে যাবে ?

আমিরুদ্দীন। আমার জামাই আছে। নাম খলিল। আমাদের খুব খাতির করে। আমরা গেলে বড় খুসী হবে ছোটবাবু।

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। (আমিরুদ্দীনকে) বাড়ী এসো শীগগির। খলিল এসেছে।

আমিরুদ্দীন। খলিল ? খলিল কোথা থেকে এল ?

আজিজ। রসুলপুর থেকে, আবার কোথা থেকে ?

আমিরুদ্দীন। খলিল এল কেন রসুলপুর থেকে ? আমরা তো যাব রসুলপুরে তার কাছে। আমাদের নিতে এসেছে হবে, অ্যা ?

আজিজ। উহুঁক্। পালিয়ে এসেছে। বাপ দাদা সবাইকে নিয়ে।

আমিরুদ্দীন। আমিনা?

আজিজ। আরে, সব চলে এল, আমিনাকে কি ফেলে রেখে আসবে? আমিনা এসেছে, বাচ্চাকাচ্চা সব এসেছে। দুটো বাচ্চার বেদম জ্বর।

কাদের। ওরা পালিয়ে এসেছে কেন?

আজিজ। মজিলপুরে ঘাঁটি পড়েছে মস্ত।

কাদের। মজিলপুর তো দূর আছে রসুলপুর থেকে।

আজিজ। দূর হলে কি হবে, সবাই আরও দূরে ভাগছে।

(আজিজের সঙ্গে আমিরুদ্দীন চলে গেল।)

কাদের। আমি তবে কি করব ছোটবাবু!

ছোটলাল। তুমিও কি রসুলপুর যাচ্ছিলে নাকি?

কাদের। না, কিন্তু আমি যেখানে যাব সেখান থেকেও সবাই যদি পালিয়ে থাকে! যার কাছে যাব, গিয়ে যদি দেখি সে নেই! যদি বা থাকে, আবার দু'দিন পরে ফের সেখান থেকে যদি অন্য কোথাও পালাতে হয়।

ছোটলাল। তুমিই ভেবে ছাখো কি করবে?

কাদের। তবে কি যাব না ছোটবাবু?

ছোটলাল। তুমিই বুঝে ছাখো।

কাদের। ওই আমিরুদ্দীন বলে বলে মনটা বিগড়ে দিয়েছে ছোটবাবু। ও তো আর যাবে না। আমিই বা তবে কেন যাব মিছামিছি!

ছোটলাল। (হেসে) যেও না।

(একটু দাঁড়িয়ে থেকে উসখুস করে লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে কাদের চলে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্বের দৃশ্য। রামঠাকুর লিখছে। সুভদ্রা, সুবর্ণ, ছোটলাল ও মধু।

সুবর্ণ। সারাদিন ঠাকুরমশায়কে দিয়ে তুমি কি অত লেখাচ্ছ বল তো?

ছোটলাল। কতগুলি লিষ্ট তৈরী করতে দিয়েছি।

সুবর্ণ। কিসের লিষ্ট?

ছোটলাল। গ্রাম মৈত্রী সঙ্ঘের লিষ্ট। প্রত্যেকটি গ্রামকে যতদূর সম্ভব

আত্মনির্ভরশীল হতে হবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে একটা যোগাযোগ না থাকলেই বা চলবে কি করে। আমি এই যোগাযোগটা গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি।

স্বর্ণ। কি রকম যোগাযোগ ?

ছোটলাল। মিলেমিশে পরামর্শ করে বিশেষ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়া, পরস্পরকে সাহায্য করা। সঙ্ঘের প্রত্যেকটি গ্রাম সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ অন্য প্রত্যেকটি গ্রামের জানা থাকবে। লোকসংখ্যা, বাড়ী ঘরের সংখ্যা, স্বাস্থ্যের অবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পথঘাট, যানবাহন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ। এক গ্রামের খবরাখবর নিয়মিতভাবে অন্য গ্রামে যাবে। হাটে নানা গ্রামের লোক জড়ো হয়, প্রত্যেক হাটে সভা করা হবে। মানুষ একা হলে নিজেকে বড় অসহায় মনে করে। আমার সম্পদ আমার একার—এই কথা ভাবতে ভাবতে এমন অবস্থা দাড়িয়েছে যে দেশের বিপদ ঘনিয়ে এলেও না ভেবে পারে না বিপদও তার একার। অন্ধকার পথে অজানা অচেনা একজন মানুষ সাথী থাকলে ভীরু লোকের ও ভূতের ভয় কমে যায়। গ্রামের সকলে মিলেমিশে দুর্দিনকে বরণ করতে তৈরী হয়ে আছে জানলে গ্রামের প্রত্যেকের ভয় কমবে—দশটা গ্রাম মিলেছে জানলে বুকে সাহস জাগবে। সকলের বুকে এই সাহস জাগানো দরকার। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থকে স্পষ্ট অনুভব করিয়ে দিতে হবে, শুধু তার প্রতিবেশী নয়, নিজের গ্রামের লোক শুধু নয়, বিশ মাইল দূরের অজানা গ্রামের অচেনা অধিবাসীও তার সঙ্গী, তার সহায়—পথ যত অন্ধকার হোক, সব কিছুকে সে ড্যামকেয়ার করতে পারে!

সুভদ্রা। এক গ্রামের লোককে আরেক গ্রামে নিয়ে যাবার কি একটা স্কীম করেছ, ও ব্যবস্থাটা আমি ভাল বুঝতে পারি নি দাদা। এদিকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বারণ করছ, আবার ওদিকে গ্রামকে গ্রাম উজার করে অন্য এক গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করছ। কেমন খাপছাড়া ঠেকছে আমার।

মধু। আমিও ভাল বুঝি নি ছোটবাবু।

ছোটলাল। কোথায় কি গুজব শুনেছিস্, তাই খাপছাড়া ঠেকছে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে অন্য গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। মানুষ যাতে আরও নিশ্চিন্তমনে নিজের গ্রামে নিজের বাড়ীতে থেকে চাষবাস কাজকর্ম করতে পারে তারই একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। অতি সহজ

ব্যবস্থা, গ্রাম মৈত্রী সঙ্ঘ গড়ে তোলার ফলে আরও সহজ হয়ে গেছে। সঙ্ঘের একটা নিয়ম—দরকার হলে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোককে আশ্রয় দেবে, নিজেদের বেশী অসুবিধা না ঘটিয়ে যত লোককে আশ্রয় দেওয়া যায়। দরকার হলে, সত্যিসত্যি দরকার হলে অবশ্য। মনে কর তোমার বাড়ীতে একখানা বাড়তি ঘর আছে, দরকার হলেই ঘরখানা তুমি শ্যামপুরের একটি পরিবারকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেবে। মনে করবে বাড়ীতে তোমার কোন আত্মীয় এসেছে। কোন গ্রামে কত বাড়তি লোক গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে তার মোটামুটি একটা হিসেব আমরা করে রেখেছি। সেই হিসেব মত এক গ্রামের লোককে সরিয়ে অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি দরকার হয়—সত্যিসত্যি যদি দরকার হয়।

সুবর্ণ। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। জানা নেই শোনা নেই কারা কোথা থেকে এসে হাজির হবে, তাদের কুটুমের মত আদর করে বাড়ীতে রাখতে হবে। এ ব্যবস্থায় কেউ রাজী হবে না।

ছোটলাল। সঙ্ঘে এখন তেরটা গ্রাম, প্রত্যেক গ্রামের লোক এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। খুব খুসী হয়ে মেনে নিয়েছে, মেনে স্বস্তি বোধ করছে। আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্ন তো শুধু নয়, পাওয়ার প্রশ্নও আছে কিনা। যারা হয় তো বাড়ীঘর ছেড়ে শেষ পর্যন্ত পালাবে না, তারাও চায় যে দরকার হলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মা বৌ আর বোন যাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারে তার একটা ব্যবস্থা থাক। বহু বড়লোকে দূরে পশ্চিমে বাড়ী ভাড়া করে রেখে মাসে মাসে ভাড়া গুণে চলেছে, গরীবের কি ইচ্ছা হয় না তারও ও রকম একটা যাওয়ার যায়গা থাকে? আমাদের ওই রকম একটা যাবার যায়গার ব্যবস্থা সকলের জন্য করা হয়েছে। সকলে তাই আগ্রহের সঙ্গে ব্যবস্থাটা বরণ করে নিয়েছে। যে গাঁয়ে হানা দিচ্ছে সে গাঁ ছেড়ে পালাবার হিড়িক উঠেছিল, সে ঝোঁক লোকের কিছুতেই যেন কমানো যাবে না মনে হয়েছিল। এই ব্যবস্থার কথা জানবার পর সকলে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেছে। তাদের বলা হয়েছে, ঘরবাড়ী ফেলে কেউ পালিও না। তার কোন দরকার নেই। যদি দরকার হয় আমরাই তোমাদের নিরাপদ স্থানে রেখে আসব। সাত মাইল দূরে এক গ্রামে পালাতে চাইছ সেখানে জলের অভাব আর কলেরার প্রকোপ, আমরা

তোমাদের বিশ মাইল দূরের গ্রামে পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমার থাকবার জন্ম ঘর ঠিক করা আছে, তুমি পৌছানো মাত্র তোমার জন্য হাঁড়িতে চাল দেওয়া হবে। প্রথমে লোকের একটু খটকা বাঁধে। তারপর যখন গ্রামের নাম, গৃহস্থের নাম, বাড়ীতে ঘরের সংখ্যা, এই সব বিবরণ লিষ্ট থেকে পড়ে শোনানো হয়, তখন বিশ্বাস জন্মে। মুখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, একটা কালো পর্দা যেন সরে গেল। অবশ্য একটু রিস্ক যে হবে সেটা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ যদি কোন গাঁয়ে এসে এরা হানা দেয়, কিছুই করার নেই। তবে এ কথাটাও ভাবতে হবে যে কবে কোন গাঁয়ে হাজির হবে তাও কিছু ঠিক নেই।

মধু। সবাই ভিটেমাটি আঁকড়েই পড়ে থাকতে চায়। যেতে হবে ভাবলে সবারি মন কেমন করে। একটু ভরসা পেলে, উৎসাহ পেলে, একেবারে বর্তে যায়।

ছোটলাল। ভিটেমাটির মায়া এদেশে সংস্কারের মত, মানুষের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। সাতপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যাদীপ জ্বলবে না ভাবলে এদের বুক কেঁপে যায়। সহরের মানুষ বুঝতে পারে না, তাদের ভাড়াটে বাড়ীতে বাস, বড়জোর একপুরুষের তৈরী বাড়ীতে। প্রথম যারা গ্রাম ছেড়ে সহরে যায়, ভিটেমাটির এই টান তাদের সারাজীবন টানে।

স্বর্ণ। তা সত্যি। দু'এক বছর পরে পরেই বাবা দেশের বাড়ীতে ছুটে যেতেন। কিন্তু ঠাকুরমশায়কে এবার তুমি ছুটি দাও। লিখে লিখে ওঁর নিশ্চয় হাত ব্যথা হয়ে গেছে।

ছোটলাল। আপনার কতদূর হল ঠাকুরমশায়? কপিগুলি অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারবেন তো?

রামঠাকুর। (মুখ না তুলেই) পাঁচসুকিয়া আর লাটুপুর মোটে এই দু'টি গাঁয়ের লিষ্ট বাকী। আধ ঘণ্টার বেশী লাগবে না।

ছোটলাল। সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উপায় কি। আজকেই সোণাপুরের সতীশবাবুকে কপিগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে। আপনি এত উৎসাহের সঙ্গে আমার কাজে লেগে যাবেন, ভাবতেও পারিনি ঠাকুরমশায়। আপনি যে বসে বসে এমন কলম পিষতেও পারেন, তা জানতাম না।

রামঠাকুর। না লিখে না লিখে লিখতেই প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। কম্মো তো পুঁথি সামনে খুলে রেখে যা মুখে আসে বিড় বিড় করে বলা। অতবড়

পণ্ডিত পিতা যে স্কুলে আর বাড়ীতে পড়িয়ে বিদ্যা দিয়েছিলে, এতদিন পরে একটু কাজে লাগল।

ছোটলাল। ফ্যাসাদ হল রাখাল ছোঁড়ার জন্য। আজ সকালে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিছু না বলে কয়ে ভোরে সে হঠাৎ বাড়ী চলে গেছে। ওর মার নাকি মরমর অবস্থা।

রামঠাকুর। মা ওর ভালই আছে। আমিও ছুটে গিয়েছিলাম, শেষ মুহূর্তে স্বর্গে যাবার ভাড়া হিসেবে কিছু পুণ্য আর পায়ের ধুলোটুলো দিয়ে—ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোই পুণ্যের সমান—কিছু যদি আদায় করতে পারি। তা একটা নারকোল, কটা বাতাসা আর পাঁচটি পয়সা দিয়ে যাত্রা শুভ করিয়ে নিলে!

ছোটলাল। কিসের যাত্রা?

রামঠাকুর। ছেলেকে নিয়ে পাণাগড় যাবে। এমনি দু'বার ডেকে পাঠিয়েছিল, ছেলে যায় নি। তাই খবর পাঠিয়েছিল কলেরা হয়েছে।

ছোটলাল। একবার বলে গেলে না। মধুর বাড়ী গিয়েছিলাম, জানত না। আমি দশজনকে পালাতে মানা করছি, আমার নিজের লোক এদিকে পালাচ্ছে। এত করে শেখালাম পড়ালাম রাখালকে, একবার জানিয়ে পর্যন্ত গেলনা।

রামঠাকুর। খবরটা পেয়ে ছোঁড়া একেবারে দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে।

ছোটলাল। (ক্ষুব্ধভাবে) দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে, না? একটু কিছু ঘটলেই সকলে দিশেহারা হয়ে যায়। কোনদিন কিছু ঘটে না কিনা, সকলের তাই এই দশা। চোখ কান বুজে কোনমতে খেয়ে পরে নির্বিবাদে দিন কাটাতে কাটাতে মনের বাঁধন গেছে আলগা হয়ে। মার মরমর অবস্থা শুনে মাকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না, মা মরে যাবে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। আমদের একি অভিশাপ বলুন তো? গাঁয়ে পাহারা দেবার জন্য যখন নাম চেয়েছিলাম, সকলে আঁতকে উঠেছিল।

মধু। মুখ্যু লোক সব, চিরকাল মার খেয়ে আসছে, অল্পেই ভড়কে যায়। কথায় কথায় আঁতকে উঠবার ভাব অনেকটা কিন্তু কেটে গেছে। চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকত, কি করবে জানত না, কিছুই বুঝত না। কি যে ভাববে কেউ ঠিক করে উঠতে পারত না। একটু একটু ভাবতে সুরু করেই অনেকে ধাতস্থ হয়েছে।

রামঠাকুর। উর্দ্ধশ্লেষ্মার চেয়ে সহজ চিকিৎসা।

মধু। এক হিসেবে সহজ আবার এক হিসেবে ভীষণ কঠিন ঠাকুরমশায়। প্রত্যেকে

দশ বিশ গণ্ডা সৃষ্টিছাড়া কথা জিগেস করবে, জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত। তার আবার অর্দ্ধেক কথার জবাব হয় না।

ছোটলাল। তবু তোমার জবাব ওরা ভাল বোঝে মধু। আমি এত পরিষ্কার আর সহজ করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি, মুখ দেখেই টের পাই সব কথা মাথায় ঢুকছে না। তুমি জড়িয়ে পেঁচিয়ে সেই কথাই বল, সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মধু। আমিও মুখ্যু, ওরাও মুখ্যু, তাই আমার কথা সহজে ধরতে পারে।

ছোটলাল। (হেসে) মনে হল যেন গাল দিলে মধু।

মধু। না, ছোটবাবু। আপনার কথাই তো আমি বলি, একটু অন্যভাবে বলি। আপনি কত পড়াশোনা করেছেন, কত ভাবেন, সব কথা নিখুঁতভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে বলতে পারেন। এরা জন্মে থেকে উল্টোপাল্টা এলোমেলো করে সব ভাবতে শিখেছে, গুছিয়ে কিছু বললে বুঝতে পারে না, হ্যাঁ করে থাকে। বেশী বেশী চাষ করা দরকার কেন কানাইকে কাল তা অত করে বোঝালেন, লঙ্কার ক্ষেতে মুগকলায়ের চাষ করতে বললেন। আমি মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, ব্যাটা কিছু বোঝে নি। চালের চালান বন্ধ, ভাত কমিয়ে ডালটাল বেশী খেয়েও মানুষ বাঁচতে পারে, বিশ মণ লঙ্কার চেয়ে একসের মুগকলাই মানুষের বেশী দরকারী, এসব কথা কি ওর মাথায় ঢোকে! ওর মাথায় শুধু ঘুরছে, ক্ষেতে লঙ্কা ভাল ফলে, মুগকলাই সুবিধা হয় না, তবু কেন লঙ্কার বদলিতে মুগকলায়ের চাষ করবে! রাত হলে বাড়ী ফিরে দেখি ধন্না দিয়ে বসে আছে। আমায় দেখেই ভয়ে ভয়ে বলল, কিছু তো বুঝলাম না মধু। মুগকলাই দিলে যা ফসল হবে, লঙ্কা বেচে তার দু'গুণ বাজারে কিনতে পাব। ছোটবাবু মুগকলাই বুনতে তবে বলেন কেন? আমি বললাম, ওরে গোমুখ্যু, শোন। ঘরে তোর আতিথ্ এলো। দু'দিন খায় নি। তুই এক ডালা লঙ্কা আর চাট্টি ভেজানো মুগ সামনে ধরে জিগেস করলি, ওগো অতিথ্ মশায়, পেট ভরে লঙ্কা খাবে না এই দু'টিখানি মুগ চিবোবে? অতিথ্ কি করবে বল তো? তারপর বললাম, লঙ্কা নিয়ে হাটে বেচতে গেলি, গিয়ে দেখলি হাটে শুধু তুই আছিস আর আছে জগন্নাথের বাপ, কলাই বেচতে এসেছে।—

রামঠাকুর। মোটে দু,জন জিনিস বেচতে গেছে, সে কেমন হাট মধু?

মধু। ওমনি করে না বললে আসল কথাটা ওরা ধরতে পারে না ঠাকুরমশায়।

শুনুন তারপর, কানাইকে কি বললাম। বললাম, হাটে একজন খদ্দের এল। বাড়ীতে তার চাল বাড়ন্ত, ডাল বাড়ন্ত, গাছের পাতা খেতে হবে এই অবস্থা। তুই খদ্দেরকে ডেকে বললি, নেন্ নেন্, বড় বড় ভাল লঙ্কা নেন্, চার আনায় বিশ মণ লঙ্কা দেব। জগন্নাথের বাপ তাকে বলল, ভাঙ্গা বোরা পোকায় ধরা কলাই বটে, আট আনায় এক সের পাবে, খুসী হয় নাও, নয় বাড়ী ফিরে যাও! খদ্দের তখন কি করবে রে কানাই? চার আনায় তোর বিশ মণ লঙ্কা নেবে, না আট আনায় পোকা ধরা একসের কলাই নেবে? কলাই না নিয়ে গেলে কিন্তু ছেলেমেয়েকে তার গাছের পাতা খাওয়াতে হবে বাড়ী ফিরে। কানাই তখন বলল, অ! তবে তো ছোটবাবু খাঁটি কথাই বলেছেন।

ছোটলাল। এই জন্যই আমরা দেশের জনসাধারণের কিছু করতে পারিনা, শুধু বক্তৃতা দিয়ে মরি। শেষে রাগ করে বলি, এদের কিছু হবে না, স্বয়ং ভগবানও এদের জন্য কিছু করতে পারবেন না।

রামঠাকুর। তা পারেনও নি। অবতার হয়ে কমবার তো ভগবান জন্মান নি এদেশে!

মধু। যা কিছু করার আপনারাই করতে পারেন ছোটবাবু। তবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে করা দরকার, নইলে ফল হয় না। আপনি আমাদের মনের ঘোরপ্যাচ বুঝতে আরম্ভ করেছেন, অল্পদিনেই আপনার অড়গড় হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে তখন আমাদের ভাষাতেই কথা কইতে পারবেন।

ছোটলাল। আট আনা দিয়ে পোকায় ধরা কলাই কিনতে বললে কিন্তু চলবে না মধু। এক পয়সা বেশী দাম দিয়ে কেউ কিছু যাতে না কেনে সেই কথাই সকলকে আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

মধু। (হেসে) ওরকম বলায় ক্ষতি হয় না ছোটবাবু। জিনিষের জন্য বেশী দাম না দেওয়া ভিন্ন কথা, ওটা কানাইকে বুঝতে হলে ভিন্ন ভাবে বোঝাতে হ'ত। ও তখন লঙ্কার ক্ষেতে মুগকলাই বুনবার কথা ভাবছে সব কথায় ওই এক ছাড়া অন্য মানে তার কাছে ছিল না। কানাইকে ডেকে জিগেস করুন, আপনি আর আমি ওকে কি বলেছিলাম। কানাই জবাব দেবে, লঙ্কার বদলে মুগকলাই চাষ করতে বলেছিলাম। তার বেশী একটি কথাও স্মরণ করে বলতে পারবে না।

ছোটলাল। তা ঠিক। এটা খেয়াল হয়েছে, তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা কখনো করিনি। বেফাঁস কিছু বলার ভয়ে সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকি, ওরা কিন্তু ঠিক মর্ম কথাটি গ্রহণ করে, পণ্ডিতের মত আসল কথাটি তাকে তুলে রেখে কথার মারপ্যাচ নিয়ে তর্ক করে না। কানাই খেয়াল করেনি হাটে মোটে দু'জন লঙ্কা আর কলাই বেচতে যায় না, শুনেই কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের টনক নড়ে গিয়েছিল। এতবড় কথার ভুল! কিন্তু তুমি এবার বাড়ী যাও মধু। সারাদিন অনেক ছুটোছুটি করেছ। তোমার কিছু হলে আমি পড়ব মুস্কিলে।

মধু। আমার কিছু হবে না ছোটবাবু। লিষ্টগুলো সতীশবাবুর কাছে পৌছে দিয়ে বাড়ী যাব।

ছোটলাল। কেষ্টকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি বাড়ী যাও।

মধু। আমি নিয়ে যাই। সোনাপুরে আমার একটু দরকারও আছে।

ছোটলাল। (চিন্তিতভাবে) দু'দিন থেকে তোমার কি হয়েছে বলত? পেটুক যেমন সন্দেশ চায় তুমি তেমনি ছুটোছুটি করার জন্য কাজ চেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছ। এক মূহুর্ত বিশ্রাম করতে হলে ছটফট করতে থাক।

রামঠাকুর। কাল যে শম্ভুর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল নকুড়ের সঙ্গে।

ছোটলাল। (আশ্চর্য হয়ে) তাই নাকি? একথা তো জানতাম না মধু। ভেবেছিলাম, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল, সেটা ভেঙ্গে গেছে, আর কিছু নয়।

মধু। তা ছাড়া আবার কি? ঠাকুরমশায় তামাসা করছেন।

রামঠাকুর। ঠাকুরমশায়ের তামাসার চোটেই দু'দিনে মুখ চোখ তোমার বসে গেছে। পরশু সন্ধ্যায় নকুড় বিয়ের খবরটা জানিয়ে যাওয়ার পর থেকে গায়ে বিছুটি লাগা লোকের মত তিড়িং তিড়িং নেচে নেচে বেড়াচ্ছ।

মধু। হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে, কাজ নেই, সে অপদার্থ মেয়ের জন্য নেচে বেড়াব। ভয়ে যে গাঁ ছেড়ে পালায়—

ছোটলাল। তার দোষ কি মধু? শম্ভু জোর করে নিয়ে গেলে সে কি করবে।

মধু। গোঁ ধরতে পারলে না? বাপের আহ্লাদী মেয়ে, যেতে না চাইলে তার সাধ্যি ছিল ওকে নিয়ে যায়। আসলে ওর ইচ্ছে ছিল বড় লোকের বৌ হবে।

রামঠাকুর। সমস্যায় ফেলে দিলে বাপু। ভয়ে না, বড়লোকের বৌ হবার লোভে মেয়েটা গাঁ ছাড়ল—

নকুড়ের প্রবেশ।

আরে, বলতে বলতে স্বয়ং নকুড় এসে হাজির যে!

নকুড়। পদ্মাকে কোথা রেখেছিস মধু?

মধু। তুই তোকারি কর না দে'মশায়। অনেক বারই তো বলে দিয়েছি।

নকুড়। চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা! তোকে আবার আপনি বলতে হবে! শম্ভুর মেয়েকে চুরি করে কোথায় লুকিয়েছিস বল্ শীগগির।

মধু। (নকুড়ের গলা ধরে) চোর ডাকাত বজ্জাত হারামজাদা আগে তোমার দাঁত কটা ভাঙবে, গাল দেওয়ার জন্য—

(মুখে ঘুঁসি মারতে নকুড়ের একপাটি বাঁধানো দাঁত ছিটকে পড়ল)

রামঠাকুর। বাঁধানো দাঁত! চুকচুক্!

মধু। এ গেল গালাগালির জবাব। এবার জিগেস করব, পদির কি হল। না যদি বল এক্ষুনি সত্যি কথা দে'মশায়—

ছোটলাল। ছেড়ে দাও মধু। লোকে ভাববে গায়ের ঝাল ঝাড়ছ।

(মধু নকুড়কে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালে)

(নকুড়কে) গায়ে জোর নেই মনে সাহস নেই, রাগ সামলাতে পার না? কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত মানুষকে গালাগাল দাও কেন? গোঙিয়ো না বাপু, বেশী তোমার লাগে নি। বাইরে বালতিতে জল আছে, দাঁত কটা ধুয়ে মুখে লাগিয়ে এসো।

(নকুড় দাঁত কুড়িয়ে অস্ফুট কাতর শব্দ করতে করতে বেরিয়ে গেল)

মধু। কেমন রাগ হয়ে গেল ছোটবাবু। নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

ছোটলাল। ওরকম হয়।

মধু। দিদি আর বৌঠান দাঁড়িয়ে আছেন মনেই ছিল না।

সুভদ্রা। সহরেপানা সুরু কোরো না মধু। পদ্মার কি হয়েছে জানবার জন্য মনটা ছটফট করছে।

সুবর্ণ। দাঁত লাগাতে কতক্ষণ লাগাচ্ছে দ্যাখো!

নকুড় ফিরে এল।

ছোটলাল। পদ্মার কি হয়েছে নকুড়?

নকুড়। কাল সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। (কটমট করে মধুর দিকে তাকাল)

স্থবর্ণ। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? সে কি!

স্থভদ্রা। কাল না বিয়ের কথা ছিল তোমার সঙ্গে?

ছোটলাল। বিয়ে হয় নি?

নকুড়। (হঠাৎ ক্রুদ্ধভাব ত্যাগ করে কাতরভাবে) কই আর হল ছোটবাবু, বিয়ের ঠিক আগে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না। (আবার মুখ কালো করে, কটমট করে মধুর দিকে তাকিয়ে) ওর কাজ। নিশ্চয় ওর কাজ। কতকাল থেকে দু'জনে—

ছোটলাল। এবার মধু তোমায় যত মারুক, আর কিন্তু আমি থামতে বলব না, খুন করে ফেললেও না। বড় বেয়াদপ তুমি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা কও।

রামঠাকুর। বিয়ে হয় নি নকুড? চুক্চুক্। হোক না কলিকাল, ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হয় হে বাপু!

ছোটলাল। মধু কিছু করে নি নকুড়। ও কিছুই জানে না। ক'দিন নিশ্বাস ফেলার সময় পায় নি। ওর ক'দিনের চব্বিশঘণ্টার সমস্ত গতিবিধির খবর আমি রাখি।

নকুড়। ও কি আর নিজে গিয়ে শম্ভুদাসের মেয়েকে নিয়ে এসেছে ছোটবাবু, অন্যকে দিয়ে সরিয়েছে। আগে থেকে যোগসাজস ছিল। যাবার দিন একবার পদ্মা পালিয়ে এসেছিল, শম্ভু নিজে এসে ধরে নিয়ে যায়। তখনি দু'জনের পরামর্শ হয়েছিল।

ছোটলাল। আন্দাজে আবোল তাবোল বোকো না। আর তাও যদি হয় নকুড়, সে মেয়ে যদি ওর দিকে এমন করে ঝুঁকেছে জানো, ওকে তুমি বিয়ে করতে গিয়েছিলে কি বলে?

নকুড়। আগে কি জানতাম। এসব ওর আমাকে জব্দ করার ফন্দি। আমাকে জব্দ করবে বলে এই বুদ্ধি খাটিয়েছে। নইলে এতদিন মেয়েকে সরাতে পারত না, বিয়ের রাত্রির জন্য অপেক্ষা করে থাকত? দশজনের কাছে আমার যাতে মাথা হেঁট হয়, সবাই যাতে আমাকে টিটকারি দেয়—

রামঠাকুর। তা এমনিতেই সবাই দেয় নকুড়। এবার থেকে নয় একটু বেশী করেই দেবে। চামড়া তোমার মোটা আছে।

নকুড়। চুপ করুন ঠাকুরমশায়। এর মধ্যে আপনিও আছেন।

রামঠাকুর। আছিই তো। আমিই তো ব্রহ্মশাপ দিয়ে বিয়েটা ফাঁসিয়ে দিলাম।

নকুড়। বাজে কথা বলেন কেন ঠাকুরমশায়? বাজে কথার ধাপ্পায় আমাকে

ভোলাতে পারবেন না। আপনি সব জানতেন। নইলে পরশু বিয়েতে যাবার নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দিতেন না। বিয়ে পণ্ড হবে জানা না থাকলে পাওনা গণ্ডার লোভ সামলানো আপনার কম্মো নয়।

রামঠাকুর। তুমি দেখছি ন্যায়শাস্ত্রেও মহাপণ্ডিত নকুড়, অকাট্য যুক্তি দিয়ে কথা কইতে জানো। প্রমাণ জ্ঞানও তোমার প্রচণ্ড। প্রমাণ যখন আছে, থানায় নালিশ ঠুকে দাও না? বিয়ের কনে চুরি করার অপরাধে আমি আর মধু অসময়টা নিশ্চিন্ত মনে জেলে কাটিয়ে দিই। এ উপকারটা যদি কর, তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করব—সুমতি হোক, সুমতি হোক।

নকুড়। (রাগে কাঁপতে কাঁপতে) জেলে না পাঠাতে পারি সহজে আপনাকে ছাড়ব ভাববেন না ঠাকুরমশায়। (মধুকে) তোকে আমি দেখে নেব মধু। বাবুলালবাবু থাকলে আজ এইখানে তোর পিঠের ছাল তুলে দিতাম। বড়বাবু নেই তাই বেঁচে গেলি। কিন্তু আমি তোকে দেখে নেব।

মধু। (শান্তভাবে) আরেকবার তুই তোকারি করলে চোখে অন্ধকার দেখবে।

(তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে নকুড় চলে যাচ্ছিল, ছোটলাল তাকে ডাকল।)

ছোটলাল। একটা কথা শুনে যাও নকুড়। তোমায় অত করে বলেছিলাম, তুমি মোটে পাঁচ বস্তা চাল আর পাঁচ টিন কেরাসিন বার করেছ। বেশী বেশী দাম যেমন নিচ্ছেলে তেমনি নিচ্ছ।

নকুড়। এই কি আপনার ওসব কথা বলার সময় হল ছোটবাবু?

ছোটলাল। কথাটা কি কম দরকারী?

নকুড়। আমার আর মাল নেই।

ছোটলাল। আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি নকুড। তুমি নিজের সর্বনাশ টেনে আনছ। সবাই জানে তোমার অনেক চাল আর তেল মজুদ আছে। দশটা গাঁয়ের সবাই শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলে নয় নকুড়।

নকুড়। চোর ডাকাত গুণ্ডা অনেক আছে জানি। কিন্তু আমি কি করব। আমার আর কিছু নেই। আপনি যদি দশজনকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেন—

ছোটলাল। আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না।

নকুড় চলে গেল।

সুবর্ণ। কি আশ্চর্য মানুষ তুমি! কাল থেকে পদ্মার খোঁজ নেই, তুমি তেল আর কেরাসিনের আলোচনা আরম্ভ করলে।

সুভদ্রা। পদ্মার খোজ করা আগে দরকার দাদা।

ছোটলাল। তাই ভাবছি। খোঁজাখুঁজি অবশ্য আরম্ভ হয়ে গেছে নিশ্চয়। শম্ভু চুপ করে বসে নেই। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। নন্দপুরে একজন লোক পাঠান দরকার। সেখানে ইতিমধ্যে কোন খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা খবর নেওয়া দরকার। সব বিবরণও ভাল করে জানা দরকার। (সহানুভূতির সুরে) আমার কি মনে হয় জানো মধু? এর মধ্যে পদ্মাকে হয় তো পাওয়া গেছে।

মধু। ও যা কাঠখোট্টা শক্ত মেয়ে, নন্দপুরে যদি নাও ফিরে থাকে, অন্য কোথাও কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ী হাজির হয়েছে নিশ্চয়। পুকুরে ডুবে টুবে মরেছে, আমি তা বিশ্বাস করি না ছোটবাবু। আমার বিশেষ ভাবনা হয় নি।

ছোটলাল। তা দেখতেই পাচ্ছি।

রামঠাকুর। ভাবনার অভাবে মাথা ঘুরে বসে পড়েছ।

মধু। আপনার হয়েছে ঠাকুরমশায়? হয়ে থাকলে কাগজগুলো দিন। আমি একবার সোণাপুর ঘুরে আসি ছোটবাবু।

সুবর্ণ। বাহাদুরী কোরো না মধু। মেয়েটার খোঁজখবর না নিয়ে তুমি সোণাপুর ছুটবে কি রকম? সতীশবাবুর কাছে লিষ্ট নিয়ে যাবার লোক আছে।

মধু। সোণাপুর একবার আমায় যেতে হবে বৌঠান। সেখানে আমার একটি জানা লোকের আজ নন্দপুর থেকে ফেরার কথা। তার কাছে খবর জেনে আসব।

সুভদ্রা। তা হলে যাও। লিষ্টের জন্য দেরী করে দরকার নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে খবরটা নিয়ে এসো।

রামঠাকুর। আমার হয়ে গেছে। (কতগুলি কাগজ গুছিয়ে ছোটলালের হাতে দিল। ছোটলাল সেগুলি দেখে ভাঁজ করে মধুকে দিল।)

লিষ্ট খুব তাড়াতাড়ি সোণাপুর পৌছানো চাই ছোটলাল।

সুবর্ণ। ঠাকুরমশায়, কিছুই কি আপনাকে বিচলিত করতে পারে না? কোনদিন দেখলাম না কোন ব্যাপারে আপনার হাসি তামাসার ভাবটা একটু কমেছে। অথচ কোন ব্যাপার যে তুচ্ছ করেন তাও নয়।

রামঠাকুর। বিচলিত হয়ে পড়ার ভয়েই তো হাসি তামাসা বজায় রেখে চলি, বৌমা। আগে যথেষ্ট বিচলিত হতাম, নিজের ব্যাপারে, পরের ব্যাপারে

সব ব্যাপারে, শেষ পর্যন্ত দেখলাম গরীব পুরুত বামুনের অত বিলাস পোষায় না। তারপর থেকে আর বিচলিত হই না। যদি বা হই, চট করে সামলে নিই।

ছোটলাল। নকুড় আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

রামঠাকুর। আমাকে। ওর বাপেরও সাধ্য নেই আমার কিছু করে। সে ব্যাটা তবু মরে গিয়ে আসল ভূত হয়েছে, নকুড়টা তো এখনো নিছক জ্যান্ত ভূত। ওর কতটুকু ক্ষমতা!

মধু। আমি যাই ছোটবাবু।

রামঠাকুর। একটু আস্তে যেও।

মধু চলে গেল।

সুবর্ণ। তুমি যদি ভাল করে খোঁজ না করাও মেয়েটার কালকেই আমি কলকাতা চলে যাব। এদিকে মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছ, গ্রাম সঙ্ঘ করছ, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ চরকীর মত, একটা মেয়ে হারালে খুঁজে বার করতে পারবে না!

ছোটলাল। হারিয়েছে কি না তাই বা কে জানে?

সুবর্ণ। তার মানে?

ছোটলাল। কেউ হারালে তাকে খুঁজে বার করা সহজ হয়, নিজেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কিনা যে তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে পাক। পালালে কাজটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুবর্ণ। তাই বলে খোঁজ করবে না?

ছোটলাল। করব বৈকি। তবে আমার মনে হয়, পদ্মা নিজেই খোঁজ দেবে আজকালের মধ্যে।

পদ্মার প্রবেশ। ধূলি ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা। দেখলেই বুঝা যায় দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে।

এই যে বলতে বলতে পদ্মা নিজেই এসে পড়েছে।

পদ্মা। আমি পালিয়ে এসেছি।

সুবর্ণ। তা আমরা জানি। বেশ করেছিস। বাপ ধরেবেঁধে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে লক্ষ্মী মেয়েরা পালিয়েই আসে।

পদ্মা। বাড়ীর জন্য মন কেমন করছিল।

রামঠাকুর। তাই বাড়ী না গিয়ে মধু এখানে আছে শুনে ধুলো পায়ে ছুটে এসেছিস বুঝি?

পদ্মা। বড় ভয় করছে আমার। বাবা আমাকে মেরে ফেলবে একেবারে।

ছোটলাল। তোর বাবাকে আমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব'খন। তুই তো পালিয়েছিলি কাল সন্ধ্যাবেলা, সারারাত সারাদিন ছিলি কোথায় ?

পদ্মা। পথ ভুলে সমুদ্দুরে চলে গিয়েছিলাম।

সুবর্ণ। ধন্য মেয়ে তুই। আমাদের হার মানালি। আয় ভেতরে আয়। আমার কাছেই তুই থাকবি এখন, তোর বাপ না আসা পর্যন্ত।

পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে সুবর্ণ ভেতরে গেল।

ছোটলাল। যাক একটা ভাবনা দূর হল। শম্ভুকে একটা খবর পাঠাতে হবে।

রামঠাকুর। সেও এসে পড়েছে।

ধীরে ধীরে শম্ভুর প্রবেশ। তারও ধূলি-ধূসর শ্রান্ত ক্লান্ত মূর্তি।

ছোটলাল। এসো শম্ভু। পদ্মা এখানে আছে!

(শম্ভু নীরবে একটু মাথা হেলিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে শ্রান্তভাবে ফরাসে বসল।)

ওকে কিছু বোলো না শম্ভু।

শম্ভু। ছোটলাল। কেলেঙ্কারি ? কি আর বলব ? কেলেঙ্কারি যা হবার হ'ল। ঠিক লগ্নের সময় মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিয়ের আসরে দশজনের কাছে মাথা কাটা গেল আমার, মুখে চুন কালি পড়ল। নকুড় আবার রটিয়ে দিল, মধুর সঙ্গে পালিয়েছে।

ছোটলাল। এমন হঠাৎ বিয়ের ব্যবস্থা করলে কেন ?

শম্ভু। সে কথা আর বলেন কেন ছোটবাবু। সব নকুড়ের কারসাজি। ওর ভরসায় গেলাম, গিয়ে যা ফ্যাসাদে পড়লাম বলার নয়। কোথায় যাই, কোথায় থাকি, চালডাল কিনতে পাই না, গাছতলায় উপোস দেবার যোগার হল। শেষে নকুড় বললে, বিয়েটা হয়ে যাক তাড়াতাড়ি, সব ঠিক করে দেব। ও ব্যাটা যে এত বজ্জাত তা জানতাম না ছোটবাবু।

ছোটলাল। জেনেও তো বজ্জাতের হাতে মেয়ে দিচ্ছিলে।

শম্ভু। কি করি। পণের টাকা অর্দ্ধেক নিয়ে নিয়েছিলাম আগেই। চটপট বিয়ে না দিলে টাকাটা ফেরত নেবার কথাও বলতে লাগল। সব দিক দিয়ে ক্ষতি হয়ে গেল ছোটবাবু। বাড়ী হয়ে আসছি, বাড়ীর অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। জানালার পাট, আলগা বাঁশ, খুঁটি সব কে নিয়ে গেছে।

পূবের ভিটের চাল থেকে নতুন খড় অর্দ্ধেক কে সরিয়ে ফেলছে।

ছোটলাল। জানি। তোমরা যেদিন গেলে সে দিন রাতেই সব চুরি হয়েছিল। তখনও পাহারা দেবার দলটা ভাঁল গড়তে পারি নি। যা যাবার সেই রাতেই গেছে, পরে আর একটি কুটোও তোমার চুরি যায় নি।

(সুবর্ণ, সুভদ্রা ও পদ্মার প্রবেশ। পদ্মা মমতার একখানা ভাল শাড়ী পরেছে। শম্ভু একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। বাপের দিকে দু'এক পা এগিয়ে পদ্মা দ্বিধা ভরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কাদের ও আজিজ ধরাধরি করে মধুকে নিয়ে এল। মধুর মাথা ফেটে সর্বাঙ্গ রক্তমাখা হয়ে গেছে।)

পদ্মা। ওগো মাগো, একি হল।

সুবর্ণ। কে মারল এমন করে ?

সুভদ্রা। ইস্! বেঁচে আছে তো ?

ছোটলাল। (শান্তভাবে) বেঁচে আছে। ফার্ষ্ট এডের বাক্সোটা নিয়ে এস।

(মধুকে ফরাসে শুইয়ে দিয়ে সে জামার বোতাম খুলে দিল। ফাষ্ট এডের বাক্সটি এলে তুলো দিয়ে রক্ত মুছে ওষুধ পত্র দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে লাগল।)

শম্ভু। এ নকুড়ের কাজ। নিশ্চয়ই এ নকুড়ের কাজ।

ছোটলাল। ওকে কোথায় পেলে কাদের ?

কাদের। শিবু তার গাড়ীতে নিয়ে এসেছে। সোণাপুরে যাবার রাস্তায় রায়বাবুদের আম বাগানের ধারে পড়েছিল, শিবু গাড়ী নিয়ে গাঁয়ে ফিরবার সময় দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

শম্ভু। নকুড়ের এ কাজ!

ছোটলাল। (মধুর জামার পকেট থেকে কাগজ বার করে) কাদের এই কাগজ গুলো এক্ষুনি সোণাপুরে সতীশবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। পারবে তো ?

কাদের। কিসের কাগজ ছোটবাবু? এই কাগজের জন্য ওকে ঘায়েল করে নি তো ?

ছোটলাল। না। ভয় নেই কাদের, তোমাকে কেউ ঘায়েল করবে না।

আজিজ। (সাগ্রহে) আমাকে দিন ছোটবাবু। আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

ছোটলাল। তোকে দিয়ে কাজ করালে তোর বাপ যদি আমায় খুঁন করে ?

আজিজ। বাপজান ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর কিছু বলবে না।

ছোটলাল। তা হলেই ভাল। (কাগজগুলি আজিজকে দিয়ে) এক্ষুনি গিয়ে কিন্তু সতীশবাবুকে দেওয়া চাই।

আজিজ। সোজা চলে যাব ছোটবাবু। পা চালিয়ে যাব।

আজিজ চলে গেল।

স্বর্ণ। তুমি কি গো, এঁ্যা ? এত কাণ্ডের মধ্যে ওই লিষ্টের কথা তুমি ভুলতে পারলে না !

ছোটলাল। ভুললে কি চলে ?

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বিপ্রহর। শম্ভু দাসের বাড়ীর উঠান ও বারান্দা। পদ্মা উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। চুপি চুপি নকুড়ের প্রবেশ।

পদ্মা। (অবিচলিতভাবে) বাবা বাড়ী নেই।

নকুড়। তা জানি। গাঁয়ের লোকও অনেকেই গাঁয়ে নেই। সোণাপুরে মিটিং করতে গেছে। এমন সুযোগ সহজে জোটে না।

পদ্মা। কিসের সুযোগ ?

নকুড়। এই তোর সঙ্গে মন খুলে দুটো সুখ দুঃখের কথা কইবার সুযোগ।

পদ্মা। তোমার সুখ দুঃখের কথা শুনবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না। তুমি মরলে মন্দিরে পূজো পাঠিয়ে দেব। তাই মরগে' যাও না অন্য কোথাও ?

নকুড়। আমার সঙ্গে তুই এমন করিস কেন বল্‌তো পদ্মরাণি ! এত অপমান সয়েও আমি তো কই তোর উপর রাগ করতে পারি না ?

পদ্মা। করলেই পার ? কে তোমার রাগের ধার ধারে !

নকুড়। কেন রাগ করিনি জানিস ? তুই ছেলেমানুষ, নিজের ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা তোর নেই। শোন পদ্ম, তোকে একটা খবর দি'। এ অঞ্চলে কেউ এ খবর জানে না। শুধু আমি জানি। সদরের ম্যাজিষ্টের সাহেবের নাজিরবাবু দু'চার টিন কেরাসিন কিনে রাখবে বলে খুঁজে খুঁজে টিন পাচ্ছিল না, আমি কেনা দামে তেল যোগার করে দেওয়ায় খুসী হয়ে চুপি

চুপি গোপন খবরটা আমায় জানিয়েছে প্রকাশ পেলে বেচারীর চাকরীটা তো যাবেই জেল হয়ে যাবে সাত বচ্ছর।

পদ্মা। (মৃদু কৌতুহলের সঙ্গে) খবরটা কি ?

নকুড়। আজ বিকেলে এ গাঁয়ে তাঁবু পড়বে। ওরা আসছে।

পদ্মা। (ছেলেমানুষী আগ্রহ ও উত্তেজনায়) সত্যি ? আসছে ! ছোটবাবুকে তো খবরটা জানাতে হবে। তুমি একবার যাও না ছোটবাবুকে জানিয়ে এসো ?

নকুড়। পাগল হয়েছিস নাকি ? আমি বলে তোকে বাঁচাবার জন্য গোপন খবরটা তোকে বললাম, ছোটবাবুকে জানাবি কি রকম ? জানাজানি হলে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে না ? তখন কি আর পালাবার উপায় থাকবে !

পদ্মা। তুমি কেমন মানুষ গো দে'মশায় ? যারা তোমার এত করলে, ধনপ্রাণ বাঁচালে, তোমার, তাদের বিপদে ফেলে পালাবে ? পালাবার অসুবিধে হবে বলে খবরটা জানাবে না ?

নকুড়। ছোটবাবু আর মধুকে জানাব ? যারা আমার সর্বনাশ করেছে !

পদ্মা। পোকা পড়বে তোমার মুখে। সবাই যখন হল্লা করে সেদিন তোমার দোকান আড়ৎ ঘরবাড়ী লুটতে গিয়েছিল, কারা গিয়ে বাঁচিয়েছিল তোমায় ? কাঁপতে কাঁপতে কার পায়ে ধরে বাঁচাও বাঁচাও বলে কেঁদেছিলে ? তোমার লোক ক'দিন আগে পেছন থেকে লাঠি চালিয়ে হীরু জেঠার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তোমার বিপদে তাও সে মনে রাখে নি। ওরা গিয়ে না পড়লে তোমার সেদিন কি অবস্থা হত দে'মশায় ? সব লুটেপুটে নিয়ে ঘরদোর আগুন ধরিয়ে তোমায় খুন করে সব চলে যেত। কি রকম ক্ষেপে ছিল সবাই গ্যাখো নি ?

নকুড়। কে ওদের ক্ষেপিয়েছিল শুনি ? মাল লুকিয়ে রেখে ওদের দুরবস্থার একশেষ করেছি বলে বলে কে ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছিল ? তিন চার হাজার টাকা লোকসান গেছে আমার। কত চেষ্টায় কিছু চাল আর তেল সংগ্রহ করে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম আস্তে আস্তে বেচে কিছু পয়সা করব। ছোটবাবু আর মধু আমার সর্বনাশ করলে, বিলিয়ে দিতে হল সব।

পদ্মা। বিলিয়ে দিতে হল কি গো ? ছোটবাবু না নগদ টাকা দিয়ে সব কিনে নিলে তোমার ঠেয়ে ? নিয়ে বিক্রীর জন্যে বঙ্কু শা'র দোকানে জমা রাখলো ?

নকুড়। তুই বড় বোকা পদ্ম। চার হাজার টাকা লাভ হলে রাণীর হালে ভোগ তো করতি তুই। আর মাস ছ'য়ের মধ্যে তলে তলে সব মাল বেচে দিয়ে

টাকাটা গুছিয়ে নিয়ে তোকে সঙ্গে করে চলে যেতাম সেই পশ্চিমে। তোর কপালে নেই, আমি কি করব!

পদ্মা। ছ'মাস ধরে বেচতে? তবে যে বললে ওরা এসে পড়ছে?

নকুড। পড়ছেই তো। ও ছিল আমার আগের মতলব। খবরটা পেলাম বলেই তো যেচে ছোটবাবুকে সব বেচে দিলাম। ও মাল আর হচ্ছে না, ছয়লাপ হয়ে যাবে।

পদ্মা। উল্টাপাল্টা কতই গাইলে এইটুকু সময়ের মধ্যে! তোমার একটা কথাও সত্যি নয়। সব কথা বানিয়ে বললে। সেদিন আর নেই গো দে'মশায়, যা খুসী গুজব রটাবে আর চোখ কান বুজে সব বিশ্বাস করব। কি করে ফাঁকি ধরতে হয় সুভাদিদি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে। ছোটবাবুর কাছে কেঁদে কেঁদে ঘাট মেনেছিলে বলে এতক্ষণ কথা কইলাম তোমার সঙ্গে, হাঁরু জেঠার ছেলের তুমি মাথা ফাটিয়েছিলে তবু। এবার যাও দে'মশায়।

নকুড়। চল্ একসঙ্গেই যাই। আর দেরী করা সত্যি উচিত না। তোকে হাঁটতে হবে না, ঘরের পেছনে আমবাগানে পাল্কী এনে রেখেছি।

পদ্মা। (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধা বড় একটি হুইস্‌ল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে) আমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছ?

নকুড়। ছেলেমানুষ, নিজের ভালমন্দ বুঝবার বয়স তোর হয় নি। মিথ্যে বলি নি পদ্মা, আজ ওরা এসে পড়বে। গাঁকে গাঁ উজার করে দেবে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। কেউ কি বাঁচবে ভেবেছিস?

পদ্মা। তুমি নিশ্চয় বাঁচবে। হাতে পায়ে ধরে তুমি কাঁদতে আরম্ভ করলে তোমায় ওরাও মারতে পারবে না। দলে ভর্তি করে নেবে—জুতো সাফ করার জন্য।

নকুড়। তামাসার কথা নয় পদ্মা। আজ মাঝরাতে হয় তো সব এসে পড়বে, বিছানা থেকে তোকে টেনে নিয়ে যাবে, বিশ পঁচিশ জনে মিলে অত্যাচার করবে, তারপর উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে। কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। আমার সঙ্গে চল, কাশী গিয়ে থাকব দু'জনে, চাকর দাসী রেখে দেব, গা ভরা গয়না দেব, দামী দামী কাপড় দেব, রাণীর মত সুখে থাকবি।

পদ্মা। তুমি বড় বোকা দে'মশায়। বোকার মত ভয় দেখালে। রাণীর মত সুখে থাকবার জন্ত যদি বা তোমার সঙ্গে যেতাম, বাবাকে ও ভাবে মরতে রেখে তো যেতে মন উঠবে না।

নকুড়। তোকে যেতে হবে। এক্ষুনি যেতে হবে। নিতে যখন এসেছি, না নিয়ে যাব না।

পদ্মা। না গেলে ধরে নিয়ে যাবে তো গায়ের জোরে? একা এসেছ, না লোক আছে সঙ্গে?

নকুড়। লোক আছে। জোর জবরদস্তি করতে চাই না বলে তাদের বাড়ীর মধ্যে আনি নি। নিজের ইচ্ছেতেই তুই চল পদ্মা, কটা ছোট জাতের লোক তোকে ছোঁবে, আমার তা ভাল লাগে না।

পদ্মা। ডাকো না তোমার লোককে, আমায় ছোঁবার চেষ্টা করুক।

নকুড়। (পদ্মার নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব দেখে একটু ভড়কে গিয়ে) কি করবি তুই? কি তোর করার ক্ষমতা আছে! ডাকলেই ওরা এসে মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যাবে। কি করে ঠেকাবি তুই? তোর বাবা বাড়ী নেই, গাঁয়ে দু'চারজনের বেশী পুরুষ নেই। কে তোকে উদ্ধার করতে আসবে? (সন্দিগ্ধভাবে) তোর হাতে ওটা কি?

পদ্মা। অস্ত্র। তোমার মত এমনি ভাবে এসে কেউ যাতে আমাদের মুখে কাপড় গুঁজে ধরে নিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য সুভাদিদি এই অস্ত্র দিয়েছে। গাঁয়ের সব মেয়েকে একটি করে দেওয়া হয়েছে। তোমার বৌ থাকলে সেও একটা পেত।

নকুড়। কি অস্ত্র? পিস্তল নাকি?

পদ্মা। পিস্তল নয়, বাঁশী। আমাদের বাড়ীটা অন্য সবার বাড়ী থেকে একটু দূরে কিনা, তাই আমায় সব চেয়ে বড় বাঁশীটা দেওয়া হয়েছে। পাড়ায় যাদের ঘেঁষাঘেষি বাড়ী, তাদের ছোট টিনের বাঁশী,—সরু আওয়াজ বেরোয়। আমার এ বাঁশীটা সদর থেকে কেনা, টিনের বাঁশীগুলো বানিয়েছে মদন কম্মোকার। একদিনে ও তিন কুড়ি বাঁশী বানাতে পারে।

নকুড়। বাঁশী! তাই বল্।

পদ্মা। বাঁশী বলে গেরাহ্যি হল না বুঝি? আমি এটা মুখে তুললে কি হবে জানো? এদিকে ক্ষেন্তি, বকুল, পদীপিসী, মনোর মা, ওদিকে ছুতোর বৌ' মাখনের মা, আন্নাকালী, আর ওই পশ্চিমে বিধু, কৈবর্তী, মালতী ওরা সবাই শুনতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে বাঁধা বাঁশী মুখে তুলে ফুঁ দেবে, নয় তো, শাঁখ বাজাবে সেই বাঁশী শুনে দূরে দূরে যত বাড়ী আছে সব বাড়ীতে বাঁশী আর শাঁখ বাজতে থাকবে। সারা গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে এক দণ্ডে। পুরুষ

যারা আছে দু'দশজন তারা লাঠিসোটা নিয়ে আর মেয়েরা আঁশবটি নিয়ে ছুটে এসে তোমাদের দফা নিকেশ করবে। তার মধ্যে আমিও তোমাদের দু'একজনের দফাটা নিকেশ করে রাখব।

নকুড়। তুই তবে যাবি নে পদ্মা? সত্যি যাবি নে? পাল্কী ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

পদ্মা। তাই যাও ভালয় ভালয়।

(নকুড় তবু একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করল। লোভাতুর চোখে পদ্মাকে দেখতে দেখতে সে যেন হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে মুখ চেপে ধরার সম্ভাবনার কথাই বিবেচনা করতে লাগল। তারপর পদ্মার বাঁশী ধরা হাতটি ধীরে ধীরে মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে তার যেন চমক ভাঙ্গল। আরও এক মুহূর্ত পদ্মার দিকে তাকিয়ে থেকে সে চলে গেল।)

পদ্মা। (আপন মনে) মনে করেছিলাম, সুভাদিদির সব ছেলেমানুষী, এ ছেলেখেলার বাঁশী কোন কাজেই লাগাবে না। কাজে তো লাগল! বাজিয়ে দিলেই হত বাঁশীটা, বুড়োর কিছু শিক্ষে হত। ব্যাটা লোক দিয়ে পেছন থেকে লাঠি মেরে সে মানুষটার মাথা ফাটিয়েছে! যাক গে, মরুক। পাগলামি যা করছে, আমার জন্যেই তো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রাগও হয়, মায়াও হয় বুড়ো ব্যাটার জন্যে।

(হুইসল ও টিনের বাঁশীর আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়ে)

বাঁশী বাজছে না? কার বাড়ীতে আবার কি হল! আমাকেও তো বাজাতে হয়! (সজোরে হুইসেলে ফুঁ দিল) আঁশবটি নিয়ে যাব নাকি? নিয়েই যাই, দু'এক কোপ যদি বসাতে পারি কোন হতচ্ছাড়া চোর ডাকাতকে।

(পদ্মা বাইরে যাবার উপক্রম করতে নকুড়ের গলায় কাঁধের উড়ানিটি বেঁধে রামঠাকুর তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। রামঠাকুরের হাতে মোটা একটি লাঠি।)

রামঠাকুর। ধরেছি পদ্মা। চোরের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে পেছনে আমবাগানে পাঁচ ছ'টা ষণ্ডা ষণ্ডা লোকের সঙ্গে ফিসফাস করছিল। হাঁক দিতেই তারা ভেগেছে। ভাগবে আর কোথায়, যে গ্রামের বাঁশী বাজিয়ে দিয়েছি। গিন্নীর বাঁশীটা কোমরে গোঁজা ছিল!

পদ্মা। করেছ কি ঠাকুরমশায়? এখুনি যে গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে জড়ো হবে। দে'মশায় বিদেয় নিয়ে চলে যাচ্ছিল যে।

নকুড়। ও পদ্মা, বাঁচা আমায়। গলায় ফাঁস লাগল! (রামঠাকুর উড়ানি খুলে নিতে) সবাই এলে বলিস কিন্তু আমি কিছু করি নি, আমি চলে যাচ্ছিলাম। গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলিস পদ্মা। তোর বলতে বলতে যেন কেউ কোপটোপ না বসিয়ে দেয়।

রামঠাকুর। রাম, রাম! বিদেয় কান্না কাঁদতে এসেছিস তাকি জানি আমি! বাজা বাজা শাঁখটা বাজা শীগগির।

(পদ্মা শঙ্খ মুখে তুলে তিনবার বাজালো। চারিদিকে বাঁশীর শব্দ মিলিয়ে গেল।)

নকুড়। তিনবার শাঁখ বাজালে কেউ আসবে না নাকি?

পদ্মা। আসবে। বাঁশী যখন বেজেছে পাড়ায় যারা পাহারা দেয় তাদের একজন খোঁজ নিতে আসবেই। সঙ্গে শাঁখ এনে তুমিও তো তিনবার বাজিয়ে দিতে পারতে!

নকুড়। তা দিতাম না পদ্মা, দিতাম না। আমি তোর অনিষ্ট করতে চাই নি। তোকে আমি ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করি পদ্মা।

রামঠাকুর। কার ছেলেবেলা থেকে?

(মধুর প্রবেশ। মাথায় এখনো তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাতে মোটা একটা লাঠি। সঙ্গে ছোটলাল, কাদের, আমিরুদ্দিন, আজিজ ও শম্ভু।)

শম্ভু। কি হয়েছে পদ্মা?

পদ্মা। দে'মশায় আমার কোন অনিষ্ট করতে না চেয়ে একটা পাল্কী আর পাঁচ সাত জন ষণ্ডা গোছের লোক সাথে নিয়ে এসেছিল—

নকুড়। আমি তোর কিচ্ছুই করিনি পদ্মা!

পদ্মা। ভয় পাচ্ছ কেন দে'মশায়? আমি কি বলেছি তুমি কিছু করেছ? তারপর আমার কোন অনিষ্ট না করেই দে'মশায় চলে যাচ্ছিলেন, ঠাকুরমশায় দেখতে পেয়ে বাঁশী বাজিয়ে গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনেছেন।

রামঠাকুর। গামছা নয়, উড়োনি। পূজোর ফুল পাতা নৈবেদ্য বাঁধা হয়, এ উড়ানি অতিশয় পবিত্র। গলায় দিলে কারো অপমান হয় না। স্পর্শে বরং পুণ্য হয়।

মধু। দুর্মতির কি তোমার শেষ নেই দে'মশায়? কখনো ভুলেও সোজা পথে চলতে পার না? মাঝে মাঝে সাধ যায় তোমার মনটা কি দিয়ে গড়া

তাই দেখতে। আধ পেটা খেয়ে দিন কাটত, নিজের চেষ্টায় অবস্থা ফিরিয়েছ, ঘরবাড়ী টাকা পয়সা লোকজন কোন কিছুর অভাব তোমার নেই। দুঃখকষ্ট সয়ে উন্নতি করার কথা বলতে লোকে তোমার কথা বলে। তুমি তো অপদার্থ নও। বুদ্ধিমান লোক তুমি। সাধ করে কেন বাঁকা পথে চলে অন্যায় কাজ কর? ভাল কর না কর, পরের ধানে মই না দিয়ে শুধু মানিয়ে চললে দশজনে তোমার নাম করত, খাতির করে চলত তোমায়। তার বদলে অন্যায় কাজ তুমি করেই চলেছ একটার পর একটা। তিন গাঁয়ের মানুষ এক হয়ে তোমার ঘরদুয়ার জ্বালিয়ে তোমাকে খুন করতে গেল, গাঁয়ের বাস তুলে তোমায় দেশছাড়া হতে হচ্ছে, তখনও তোমার এই মতিগতি!

নকুড়। (তেজের সঙ্গে) তুই আমাকে তত্ত্ব কথা শোনাস্ না মধু।

মধু। আবার তুই তোকারি আরম্ভ করলে?

নকুড়। মারবি? আয় মধু, মার। আর তোকে আমি ভয় করি না। তোর বাহাদুরী ঢের সয়েছি, আর সইব না। আয় এগিয়ে, এই বুড়ো বয়েসে তোর সঙ্গে আজ আমি হাতাহাতি মারামারি করব। আয় বলছি পাজী বজ্জাত হারামজাদা—গাল দিলাম যাতা বলে, মারমুখো হয়ে আয় দিকি একবার। তুই একটা ছোরা নে, আমায় একটা ছোড়া দে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক তোতে আমাতে। কইরে শুয়ার আয়? আজ যে বড় গাল শুনেও রাগ হচ্ছে না তোর! বাপ তুলে গাল দেব?

মধু। মুখ সামাল দে'মশায়!

নকুড়। তোর ভয়ে? গায়ে তোর জোর বেশী বলে? গাঁয়ে মেয়েগুলো পর্যন্ত ভয় ডর ভুলেছে, কোমরে ছোরা গুঁজে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি পুরুষ হয়ে তোকে ডরাব? নে, গাল আর দেব না কিন্তু খুন তোকে আজ আমি করব মধু। নয় তোর হাতে আজ খুন হব। তুই আমাকে সাতপুরুষের ভিটে ছাড়া করেছিস, কুকুর বেড়ালের মত আমায় গাঁ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে, তোকে যে জ্যান্ত রেখে যাচ্ছিলাম কেন তাই ভাবি। লাঠি, ছোরা, রামদা, যা খুসী একটা নে মধু, চ' দুজনে বাগানে যাই।

শম্ভু। কেন মাথা গরম করছ দে'মশায়? রওনা হয়ে বেরিয়েছ বাড়ী থেকে, যেখানে যাচ্ছিলে চলে চাও।

কাদের। কত বড় খারাপ্ মতলব নিয়ে এ বাড়ী ঢুকেছিলে, ভুলে গেছ এরি

মধ্যে? জেলে না দিয়ে তোমায় এনারা ছেড়ে দিলে। তুমি আবার হম্বিতম্বি করছ!

রামঠাকুর। এ লোকটা কি!

নকুড়। (সকলের মন্তব্য অগ্রাহ্য করে, রামঠাকুরের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে) বাপের ব্যাটা যদি হোস মধু, লাঠি নিয়ে বাগানে চল।

মধু। (হেসে) চলো। এত যদি লাঠি চালাতে জান দে'মশায়, পেছন থেকে লাঠি মেরে জখম করেছিলে কেন? সামনাসামনি আসতে পার নি সেদিন?

নকুড়। আমি লাঠি মারি নি। আমার লোক মেরেছিল! আজ সামনাসামনি মারব।

পদ্মা। (মধুকে) যেও না তুমি। দে'মশায়ের মতলব আমি বুঝেছি। তোমার হাতে খুন হয়ে তোমাকে ফাঁসি দেওয়াতে চায়।

মধু। এত কাণ্ড করেও তোমার সাধ মিটল না? যাবার আগে আবার একটা হাঙ্গামা করতে চাও?

নকুড়। আমি যদি না যাই!

রামঠাকুর। সেকি হে? পাল্কী বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে তুমি না বিদায় কান্না কাঁদতে এসেছিলে? এখন যাব না বলছ কি রকম?

নকুড়। কেন যাব? আমার সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আমি যাব কেন? কি করেছি আমি!

রামঠাকুর। তা বটে।

নকুড়। নিজের পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনেছি, আমি তা মাটিতে পুঁতে রাখি, জঙ্গলে লুকিয়ে রাখি, খানা ডোবায় ফেলে দিই, তোমাদের বলবার কি অধিকার আছে? আমার অন্যায় কোথায়! যার পয়সা নেই, যে কিনতে পারে না, সে এসে ভিক্ষে চাইল না কেন, আমি ভিক্ষে দিতাম। গায়ের জোরে ইচ্ছামত দাম দিয়ে কিনবার কি অধিকার আছে তোমাদের?

(সকলে হেসে ফেলে, পদ্মা শুদ্ধ। নকুড় চেয়ে থাকে উন্মাদের মত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে।)

পঞ্চম দৃশ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। গ্রামের পথ, কাছাকাছি কয়েকখানা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। একদিকে গাছপালা ঝোপ ঝাড়। অন্যদিকে মাঠ, ক্ষেত। চারিদিক নিঃশব্দ, পাখীর ডাক ছাড়া কোন শব্দ শোনা যায় না। ঝোপের আড়ালে লুকানো দু'জন লোক ছাড়া আশেপাশে মানুষ চোখে পড়ে না। লোক দুজনের লুকিয়ে থাকার জন্য নির্জ্জনতা কেমন রহস্যময় মনে হয়। সেই রহস্যের অনুভূতি আরও গভীর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে দু'একজন চাষী শ্রেণীর লোকের ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রবেশ করায়। তারা নিঃশব্দে চলে যায়।

তারপর প্রবেশ করে শম্ভু ও ভূষণ। দুজনে প্রায় সমবয়সী, শম্ভুর চেয়ে ভূষণকে একটু বেশী বুড়ো দেখায়। গাছের আড়াল থেকে মধু ও মাখন বেরিয়ে আসে।

মধু। খবর কি খুড়ো?

ভূষণ। নতুন খবর আর কি। ওই গুজবটাই শুনছি, আজকালের মধ্যে গাঁয়ে হানা দেবে।

শম্ভু। আজ রাতে এলেই বিপদ।

মধু। আজ রাতে এলেও বিপদ, কাল রাতে এলেও বিপদ। বিপদ যা তা আছেই।

মাখন। আমি বলি, দিনের চেয়ে রাতে এলেই ভাল। মেয়েছেলে গরুবাছুর নিয়ে বন জঙ্গল খানা ডোবায় লুকিয়ে পড়া যায়, গুঁতোও দেওয়া যায় ফাঁকতালে দু'একটাকে দু'এক ঘা।

ভূষণ। আর গুঁতো দিয়ে কাজ নেই বাপু, ঢের হয়েছে। গুঁতোর ঠেলা সামলাতে প্রাণ গেল।

মাখন। যাবার জন্যেই তো প্রাণ।

ভূষণ। তোর তামাসা রাখ মাখন। সব সময় ভাল লাগে না তামাসা।

শম্ভু। মোর ভাবনা আজ রাতের লেগে। রাতে মোর পাহারা নয়ানদীঘির মোড়ে। ঘরটা থাকবে খালি। বলায়ের মা থাকবে বলেছে বটে রাতে মেয়েটার কাছে, তা মেয়েমানুষ তো বটে দুজনাই। কি করবে, কোনদিকে যাবে, দিশেমিশে পাবে না হয়তো।

মধু। মোরা তো আছি। কিছু হলে পৌঁছে দেব'খন গড়ে। কিন্তু তোমায় আবার পাহারায় দিলে কেন সামন্তমশায়, মোরা এত যোয়ান মদ্দ থাকতে?

শম্ভু। (সগর্বে) আমি যেচে নিইছি। সবাই বলে এই করেছি, ওই করেছি, আমি পারি নে? বুড়ো এখনো হইনি বাপু, নিজেকে যতই যোয়ান ভাবো।

মধু। তা রাতে কেন? দিনে পাহারা নিলেই হত।

শম্ভু। যেমন লিষ্ট করেছে।

মধু। আচ্ছা, কাল আমি তা ঠিক করে দেব সামন্তমশায়।

(পদ্মা এল শম্ভুরা যেদিক থেকে এসেছিল তার অপর দিক থেকে।)

পদ্মা। বাবা! বাবা!

শম্ভু। কি ছুটোছুটি করিস পদি, বয়েস হয় নি? খুকীটি আছিস এখনো?

পদ্মা। খপর দিতে এলাম।

শম্ভু। কি খপর?

পদ্মা। আজ রাতে পাহারায় যেতে হবে না তোমায়। নিতুর বাবা আর রসিক মামা বললো আমায়।

শম্ভু। বাড়ী এয়েছিল?

পদ্মা। এ্যাঁ? বাড়ী? মোদের বাড়ী? না তো।

শম্ভু। কোথায় বললো তবে তোকে?

পদ্মা। আমি গিছলাম কিনা মাইতি বাড়ী।

শম্ভু। কেন গেছলি মাইতি বাড়ী?

পদ্মা। এমনি গেছলাম!

শম্ভু। সত্যি বল পদি কেন গেছলি তুই মাইতি বাড়ী। ও বাড়ীতে ওনারা পরামর্শ করতে জড়ো হন, ওখানে তোর যাবার কি দরকার?

পদ্মা। তোমার শুধু কেন আর কেন। কেন এই করেছিস, কেন ওই করেছিস। ভাল খপরটা দিলাম।

শম্ভু। কেন গেছলি বল্ পদি।

পদ্মা। তোমার কথা বলতে গিছলাম।

শম্ভু। কেন? আমার কথা বলতে গেছ্‌লি কেন?

পদ্ম। যাব না? দুপুর রাতে বেরিয়ে সারারাত তুমি বাইরে কাটাবে, ঠাণ্ডা লাগবে না তোমার? অসুখ করবে না? সখ হয়েছে, দিনের বেলা পাহারা দিও।

মাখন। মন্দ কি করেছে কাজটা? বুদ্ধি আছে তোর পদি।

পদ্মা। নেই ভেবেছিলে নাকি তবে? নিতুর বাপ কি বললো জান মাখনদাদা, বললো—ভাগ্যে তুই এসে বললি পদি, নয় তো ভুল করে বুড়ো মানুষটাকে রাতের পাহারায় পাঠিয়ে মুস্কিল হত অসুখ বিসুখ হলে।

শম্ভু। (গুম খেয়ে) ছোটলাল যদি রাগ করে?

মধু। (হেসে) ক্ষেপেছ নাকি সামন্তমশায়? ছোটলাল যা করে সবার সাথে পরামর্শ করেই করে। কারো ন্যায্য কথা অমান্য করে না কখনো। বার বার মোদের বলেছে শোন নি—সে হাকিম, না পুলিশ, না জমিদার যে হুকুম জারি করবে?

মাখন। লোক ভাল ছোটলাল। এত বড় বুকের পাটা কিন্তু কি নরম মানুষটা। আবার গরম হলে আগুন।

মধু। কথা বলে খাঁটি। বলে, আমার একার কথা কি কথা? তোমাদের যদি বোঝাতে পারলাম তো ভাল, না পারলে তোমাদের কথার পরে আর কথা নেই। কি ভাবে বোঝালে মোদের, কি ভাবে সামলালে।

ভূষণ। ছোটলাল দেখি দেব্‌তা হয়ে উঠেছে তোমাদের।

মধু। দেব্‌তা কিসের? বন্ধু।

মাখন। তুমি হও না দেব্‌তা?

ভূষণ। চল হে চলো, আমরা যাই।

(পদ্মা, শম্ভু ও ভূষণ চলে গেল। একটু পরেই ছুটে পদ্মা ফিরে এল।)

পদ্মা। মাখনদাদা, কত বড় পেয়ারা হয়েছে ছাখো। তিনটে এনেছি তোমাদের জন্য।

মাখন। আমি দুটো মধু একটা তো?

পদ্মা। ভাগ নিয়ে তোমরা কামড়াকামড়ি কর। আমি কি জানি?

(পদ্মা চঞ্চল পদে চলে গেল।)

মাখন। (পেয়ারা খেতে খেতে) আজকালের মধ্যে মোদের গাঁয়ে হানা দেবে শুনছি পাঁচ সাতদিন ধরে। কদিন এমন চলবে?

মধু। যদ্দিন ওনারা চালান। কাল পলাশপুরে ছোঁ মেরেছে। আজকালের মধ্যে মোদের জুনপাকিয়ায় আসতে পারে, আশ্চর্য কি?

মাখন। আসেই যদি তো আসুক, ঢুকে বুকে যাক। যে কটা মরে মরুক যে কটা ঘর পোড়ে পুড়ুক।

মধু। গায়ের ঝাল কিছু ঝাড়বেই, সে তো জানা কথা। হেথায় হাঙ্গামা বলতে গেলে কিছুই হয় নি, তবে ওদের কি আর বাছ বিচার আছে। এ দুর্দিনে বাঁচবার জন্য একসাথে মিলছি, এটাই মস্ত দোষ হয়েছে হয় তো। পলাশপুরও যখন বাদ গেল না, জুনপাকিয়া সহজে ছাড়া পাবে না।

মাখন। কিন্তু মেয়েদের ইজ্জৎ!

মধু। সেটা কি আর মোরা বেঁচে থাকতে যাবে?

মাখন। গেছে তো অনেক যাগায়, পুরুষরা বেঁচে থাকতেও।

মধু। জুনপাকিয়ায় যাবে না।

মাখন। তোর জুনপাকিয়াও অন্য গাঁয়ের মতই মধু।

মধু। সে তো ঠিক কথাই। এ কি আর একটা গাঁয়ের বাহাদুরী দেখানোর ব্যাপার? কখনো যা ঘটে নি তাই ঘটলো বটে, তবু একজন একা বীর হলে কি হবে। দশটা গাঁর বীরত্বে কি হবে। এটা কি জানিস, বড় একটা চিহ্ন শুধু। তবে ছোটলাল বলে, যা করার তা করতে হবে, যা সওয়ার তা সইতে হবে। দিন তো আসবে একদিন মোদেরও। আর সব সয়ে যাব, মেয়েদের ওপর অত্যাচার সইব না। সরিয়ে ফেলে, লুকিয়ে রেখে, বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছি ওদের—তবু যদি ওদের ওপর ছোঁ মারতে যায়, তখন আর সইব না। প্রাণ থাকতে নয়। তাই বলছিলাম, মোরা বেঁচে থাকতে জুনপাকিয়ায় মেয়েদের ডর নেই। সবাই মরলে তারপর যা হবার হবে।

মাখন। মুখ বুজে সইব, এ যেন এখনও মোর কেমন ঠেকে।

মধু। ওই যে ছোটলাল বললেন, যা করার তা করতে হবে। মুখ থাকতে মুখ বুজবো কেন? তবে যে যার খুসী মত বললে আর করলে কি কোন লাভ আছে।

মধু। তোকে বলি মাখন, কারু কাছে ফাঁস করিস না।

মাখন। তোতে আমাতে বেফাঁস কথা কইবার কি আছে শুনি?—কে? কে যায়?

(চাদর মোড়া এক মূর্তি এল। দ্রুতপদে আসছিল, থমকে দাঁড়াল। কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত।)

আগন্তুক। আমি, আমি। আমি বাবা, আমি।

মধু। দে'মশায় ? এমন করে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়েছ কেন ? মুখ দেখার যো নেই, যেন কনে বৌটি।

নকুড়। যা শীত বাবা।

মধু। সন্দে বেলাই এত শীত ?

মাখন। তা, এই শীতে কোথা গিয়েছিলে খুড়ো ?

নকুড়। বুড়ো মানুষ বাবা, একটু শীতে কাঁপন ধরে। হাড় কন কন করে। তোমাদের বয়েস কি আছে বাবা।

মধু। এমন বুড়ো তুমি নও দে'মশায়। তোমার চেয়ে বুড়ো লোক রাতে পাহারা দিচ্ছে।

মাখন। বিয়ে তো করলে এই শীতে ভূষণ খুড়োর মেয়েটাকে। এমনি চাদর মুড়ি দিয়েছিলে নাকি বিয়ের আসরে ? আচ্ছা, সে নয় খুড়ীকে শুধোবো কেমন কেঁপেছিলে ঠক ঠক করে বিয়ের রাতে। এখন বল দিকি, গিছ্‌লে কোথা ?

নকুড। এই কি জানো, গিছলাম বাবা বীরগাঁ, বোনাইবাড়ী। তোমাদের খুড়ী কাল থেকে ক্ষেপে আছে, খালি বলে যাও, যাও, খপর দিয়ে এসো মোর বোনের। তা' করি কি যেতে হল।

হৃদয় এলো। পরণের গামছা হাঁটুতে নামে নি। আটহাতি ছেঁড়া মোটা ধুতিটি চাদরের মত গায়ে জড়ানো। হাতে একটা মোটা ল্যাঠি। সহজ, সরল চাষী-মজুর—একটু বোকাসোকা।

হৃদয়। দেখলে খুড়ো ? ল্যাগাল ধরেছি ঠিক ! বললে কিনা, মাঠে যাবি তো যা হিদয়, ততখনে ঘর পৌছে যাব। হিদয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পারলে খুড়ো ? ধরিছি না গাঁয়ে ঢোকার আগে ! পয়সা কটা কিন্তুক আজ দিতে হবে খুড়ো। খুদির মা নয়তো খেয়ে ফেলবে মোকে।

মাখন। খুড়োর সাথে গিছলে নাকি হিদয় ?

নকুড়। হ্যাঁ বাবা, হিদয়কে সাথে নিছলাম। আয় হিদয়, যাই। পয়সা দেব তোকে আজই।

মাখন। দাঁড়াও খুড়ো, একটু দাঁড়াও। বলি ও হিদয়, বীরগাঁ গেলে একবার বলে যেতে পারলে না মোকে ? একটা চিঠি দিতাম ছোট মহালের নায়েবকে ?

হৃদয়। বাঃ রে কথা ! বীরগাঁ ? বীরগাঁ গেলাম কবে ? খুড়ো বললো হিদয়, থাসধুয়ো যাবি আসবি মোর সাথে, দশগণ্ডা পয়সা পাবি। আমি বললাম,

খুড়ো, দশগণ্ডা নয়, এগার গণ্ডা দিতে হবে, সাত ক্রোশ রাস্তা। তা খুড়ো বললে, হিদয়, আটগণ্ডা যদি নিস তো খেতে পাবি পেট ভরে, ভাত রুটি মাংসো বিস্কিউট—ব্যাটা জীবনে খাস নি! খুড়ো মোকে ব্যাটা বললে, শুনছো? খুড়ো বলে ডাকি, মোকে বললে ব্যাটা!

নকুড়। ব্যাটা পাগল।

মাখন। খুড়ো, খাসধুরো গিছলে কেন?

নকুড়। তোর তাতে দরকার? মোর যেথা খুসী যাব।

মাখন। চটছো কেন খুড়ো। আমার কি দরকার, গাঁয়ের লোক যে জানতে চাইবে, নকুড় খুড়ো এত ঘন ঘন খাসধুরো যায় কেন, ওনাদের খাস আড্ডায়। তলে তলে কারবার করছে নাকি ওনাদের সাথে?

নকুড়। বড় তোরা বাড়াবাড়ি করিস বাপু। আমি গেলাম দর জানতে সর্ষে আর সোণার, কিসের আড্ডা কাদের আড্ডা কিসের কি, আমি তার কি জানি। তোদের খালি সন্দেহ বাতিক।

মধু। সর্ষে আর সোণার দর?

নকুড়। না তো কি? সর্ষে কিছু ধরা আছে, ভেবেছিনু নতুন সর্ষের সাথে মিশিয়ে বেচব। তা খুড়ী তোদের গোঁ ধরেছে, সাতদিনের মধ্যে গয়না চাই। হঠাৎ বিয়েটা হল, গয়নাগাঁটি তৈরী তো হয় নি কিছু। যত বলি সময় মন্দ, দু'দিন যাক, খুড়ী তোদের কথা শোনেন না।

মাখন। ছেলেমানুষ তো, পদির চেয়ে ছেলেমানুষ। ভাবছে হয় তো ফাঁকি দেবে।

নকুড়। তামাসা রাখ মাখন।

মাখন। তামাসা কি খুড়ো, এমন গোঁ তোমার বিয়ে করার যে শেষে ভূষণ খুড়োর ওই কচি মেয়েটাকে বিয়ে করে বসলে, গাঁয়ের লোককে দেখিয়ে দিলে বিয়ে তোমার ঠেকায় কার সাধ্যি! ভাবলে বুঝি যে গাঁয়ের লোককে জব্দ করলে বিয়ে করে। তোমার তামাসায় আমরা হাসছি কদিন। তা যাক গে খুড়ো সে কথা, সর্ষের ব্যাপারটা কি শুনি।

নকুড়। তোদের বড় জেরা বাপু।

মাখন। জেরা কিসের খুড়ো, সর্ষে বেচে খুড়ীকে গয়না দেবে এ তো সুখবর, আনন্দের কথা। দশবিশ হাজার যা জমা আছে টাকা তোমার, তাতে তো আর গয়না হবে না খুড়ীর—সর্ষে না বেচা হলে বেচারা ফাঁকিতে পড়বে। তা সর্ষে বেচলে?

নকুড়। ভাল দর পেয়েছি। ভাবলাম চুপি চুপি বেচে দেব কাউকে না জানিয়ে, তা তোদের জ্বালায় কি চুপচাপ কিছু করার যো আছে।

মাখন। সর্বে দেখাবে খুড়ো ?

নকুড়। আরে বাবা, সেকি হেথায় রেখেছি ? বীরগাঁয়ের বোনায়ের ওখানে আছে।

মাখন। গল্প বানাতে ওস্তাদ বটে তুমি খুড়ো। বলি হিদয়, খুড়ো কোথা কোথা গিছ্লো রে খাসধুরোয় ?

হৃদয়। কে জানে বাবা। মোকে হীরুর তেলেভাজার দোকানে বসিয়ে রেখে খুড়ো গেল খালধারে তাঁবুর দিকে। তারপর কোথা কোথা গেল ভগবান জানে।

নকুড়। (তাড়া দিয়ে) হয়েছে, হয়েছে। আয় হিদয়, যাই আমরা।

মাখন। একবার মাইতি বাড়ী হয়ে যেতে হবে খুড়ো।

নকুড়। তোর হুকুমে নাকি ?

মাখন। ছি ছি, হুকুম কিসের। এই জোড় হাতের আবদারে। মধু, খুড়োর সাথে ঘুরে আসছি মাইতি বাড়ী। হিদয়, তুমিও এসো সাথে। ভয় নেই। যা যা শুধোবে, ঠিক ঠিক জবাব দিও।

গজর গজর করতে করতে নকুড় চলে গেল। সঙ্গে গেল মাখন ও হৃদয়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল চারিদিক। সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এল। দূর থেকে শোনা গেল এক শাঁখের আওয়াজ— বহুদূর থেকে।

মধু। একটা শাঁখ ! সাঁঝেও তো শাঁখ বাজানো বারণ। কারও বাড়ীতে ভুলে গেল নাকি ?

তারপর কাছে ও দূরে অনেকগুলি শাঁখ একসঙ্গে বেজে উঠল। মধু তার হাতের শাঁখটি মুখে তুলে বাজাল। দূরে শোনা গেল কোলাহল আর্ত্তনাদ ও দমদাম শব্দ। মধু ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে।

তারপর আবার ছুটতে ছুটতে ফিরে এল, সঙ্গে পদ্মা।

মধু। কি বলে তুই এ দিকে এলি বল দিকি।

পদ্মা। না এসে থাকতে পারলাম না। মনে হল এদিকেই ওরা আসছে, কি জানি তোমার কি করবে।

মধু। তাই তুই বাঁচাতে এলি আমায়। যদি বা বাঁচতাম—এবার দুজনেই মরব। অত করে শিখিয়ে দিলাম, গড়ের ধারে যেখেনে গিয়ে লুকোবে সব, সেখানে যাবি। তুই এলি এদিক পানে ছুটে !

পদ্মা। তোমার বোনকে পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে।

(কোলাহল কাছে এগিয়ে আসে)

মধু। বেশ করেছিস। কি করি এখন তোকে নিয়ে আমি।

পদ্মা। আমার জন্যে ভেবো না। দু'জনে লুকোই চলো। ওরা বুঝি এল।

মধু। এই পুকুরে নাম গিয়ে। পানায় গলা ডুবিয়ে থাকবি। নিমুনিয়া হবে নির্ঘাৎ—কিন্তু উপায় কি।

পদ্মা। আর তুমি ?

মধু। যা বলি তা শোন। কথা বলিস না। নিজে যদি বাঁচতে চাস, মোকে বাঁচতে দিতে চাস, কথা শোন। নয় তো দু'জনে মরব।

(অনিচ্ছুক পদ্মা কয়েক পা এগিয়ে গেছে, কাছে বন্দুকের আওয়াজ হল। মধু পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। পদ্মা আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।)

মধু। পালা ! পালা ! বেইজ্জৎ করবে তোকে—পালা।

পদ্মা। না। তোমায় ফেলে পালাব না আমি।

মধু। তুই না থাকলেই বাঁচব পদি। তুই থাকলে আরো মেরে ফেলবে আমায়। তুই কাছে না থাকলে মরার ভান করব—কিছু করবে না। যা—পালা শীগগির। মোকে যদি বাঁচাতে চাস, পালা।

পদ্মা উঠে পালিয়ে যায়। পরক্ষণে অল্প দূর থেকেই শোনা যেতে থাকে তার আকাশচেরা আর্তনাদের পর আর্তনাদ। হঠাৎ সে আর্তনাদ থেমে যায়। মধু প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও কিছুতে উঠতে পারে না, কেবলি পড়ে পড়ে যায়।

—যবনিকা—

গ্রন্থ-পরিচয়

চিন্তামণি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৩। জুলাই ১৯৬৪। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০১।

গ্রন্থজগৎ কর্তৃক প্রকাশিত নূতন সংস্করণ ২৩ শ্রাবণ ১৩৬৯। ১ আগস্ট ১৯৬২।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি স্বর্গত সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও অধুনালুপ্ত 'পূর্বাশা' মাসিকপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি উপন্যাস' নামক একটি সংকলনগ্রন্থে আলোচ্য উপন্যাসটি সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (১ আষাঢ় ১৩৭৮)।

লেখকের পঞ্চদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৫৩। জানুয়ারি ১৯৪৭। প্রকাশক বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৬। লেখকের ভূমিকা সম্বলিত। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স-কর্তৃক প্রকাশিত নূতন সংস্করণ বৈশাখ ১৩৭১।

গ্রন্থরূপে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে গ্রন্থরূপে প্রকাশকালে লেখক উপন্যাসটির কিছু সংশোধন সাধন করেন।

চেক্-ভাষায় অনূদিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতেরোটি গল্পের একটি সংকলন, **OPIUM, A Jine´ Povi´dky,** নামক গ্রন্থে আলোচ্য উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫৬)। চেক্-সংকলনটির অনুবাদক শ্রীঅজিত মজুমদার।

আদায়ের ইতিহাস

ষষ্ঠদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২।

বিভূতি প্রকাশন-কর্তৃক প্রকাশিত নূতন সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬৮।

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি উপন্যাস' নামক সংকলনগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

চতুষ্কোণ

সপ্তদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮। প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরী। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৫। লেখকের ভূমিকা সম্বলিত।

পরবর্তী সংস্করণ-সমূহের প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (৭ ভাদ্র ১৮৮২ শকাব্দ) ও বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস (শ্রাবণ ১৩৭৪)। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক গ্রন্থাবলী' প্রথম ভাগে সংকলিত হয় (জুলাই-আগস্ট ১৯৫০)।

আজ কাল পরশুর গল্প

লেখকের নবম গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩।

প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০। লেখকের ভূমিকা সম্বলিত।

সংকেত ভবন ও সাধারণ পাবলিশার্স কর্তৃক আরো দু'টি সংস্করণ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক গ্রন্থাবলী' প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত (জুলাই-আগস্ট ১৯৫০)।

আলোচ্য গ্রন্থের 'দুঃশাসনীয়' ও 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পদু'টি শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এ সংকলিত হয়েছে (নূতন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭২)।

'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পটির একটি ইংরেজী অনুবাদ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত Primeval And other Stories নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (১৯৫৮)। অনুবাদক শ্রীঅশোক মিত্র।

'আজ কাল পরশুর গল্প', 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা' এবং 'যাকে ঘুষ দিতে হয়'—এই গল্প ক'টির চেক্-অনুবাদ পূর্বোক্ত OPIUM, A Jine´ Provi´dky, নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫৬)।

পরিস্থিতি

দশম গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫৩। অক্টোবর ১৯৪৬।

প্রকাশক অগ্রণী বুক ক্লাব। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬১। লেখকের ভূমিকা সম্বলিত। পরবর্তী কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি।

আলোচ্য গ্রন্থের 'সাড়ে সাত সের চাল', 'মাসি-পিসি', 'শিল্পী', ও 'কংক্রীট' গল্প ক'টি 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর অন্তর্ভুক্ত।

'শিল্পী' গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ Craftsman-নামে Primeval And Other Stories গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

'শিল্পী' ও 'কংক্রীট' গল্প দু'টির চেক্-অনুবাদ OPIUM, A Jine´ Povi´dky নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

ভিটে মাটি

লেখকের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৪৬।

প্রকাশক স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬।

নূতন কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি, এবং গ্রন্থটি বর্তমানে একরূপ দুষ্প্রাপ্য।